উপক্রমণিকা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের আত্মজীবনী-সাহিত্যে মহাত্মা গান্ধীর *আত্মকথা* এক অতি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছে। যদিও *আত্মকথা* রচনার পর আরও পঁচিশ বৎসরেরও অধিক তাঁর জীবন সক্রিয় ছিল এবং বহু গান্ধী-গবেষকের মতে গান্ধী-জীবনের অন্তিম পর্বই সাফল্য-ব্যর্থতার, আলো-আঁধারির পরকলা-দ্যুতিতে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। মূল গুজরাতি ভাষায় স্ব-সম্পাদিত *নবজীবন* পত্রিকায় নিজের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে ধারাবাহিকভাবে এক-একটি অধ্যায় রচনা ক'রে *আত্মকথা* প্রকাশ করেন। তবে বলা বাহুল্য, মুক্তির সন্ধানে অধীর এক জাতির সংগ্রামী নেতা হবার জন্য বিদেশী শাসকেরা তাঁকে একটানা *আত্মকথা* রচনার সুযোগ দেয়নি। বন্দী-জীবনের জন্য মাঝে-মাঝেই তাঁর রচনাধারা ব্যাহত হয়েছিল। স্বীয় জন্ম, বংশ-পরিচয়, শৈশব ও ছাত্রাবস্থার বর্ণনা দিয়ে, ১৯২০ ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের ঘটনাবলী ও ভারতের অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনে তার প্রতিক্রিয়া : নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা ক'রে তাঁর *আত্মকথা* সমাপ্ত করেছেন।

ভারতীয় রাজনীতির ছাত্রেরা জানেন যে ১৯২০ ডিসেম্বরে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে-গান্ধী-যুগের সূচনা, তা স্থায়ী হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের কাল অবধি। তবে ২৬ নভেম্বর ১৯২৫ গ্রন্থাকারে এর প্রথম প্রকাশনার সময়েই তিনি দেশ-বিদেশে খ্যাত ভারতের অভিনব অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রণী নেতা। সম্ভবত ইচ্ছা ক'রেই তিনি নিজের খ্যাতির শীর্ষে ওঠার পরবর্তী কাহিনী স্বয়ং বিবৃত করা থেকে বিরত থেকেছেন। সমগ্র জীবন অহং-কে নিয়ন্ত্রিত করার সাধক বলেছিলেন যে অতঃপর তাঁর জীবন হয়ে যায় উন্মুক্ত পুস্তকের মতো। নিজ জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা জনসাধারণের অজ্ঞাত। সুতরাং এরপর তাঁর বিদায় নেওয়া উচিত। যথাসময়ে সমে উপনীত হওয়া সার্থক শিল্পীর অন্যতম কৃতিত্ব। আর মহাত্মা তো ছিলেন জীবনশিল্পী।

আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে এ-জাতীয় অপর এক শিল্পসুষমামণ্ডিত উদাহরণ যদি দিতে হয়, তবে হাতের কাছে রয়েছে বাঙালির সর্ববিষয়ের দিগ্‌দর্শক রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি*। নিজের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া ও সঙ্গতভাবেই তার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণনার পরেই কবির জবানবন্দীর সমাপ্তি। *কড়ি ও কোমল পর্ব* বর্ণনার পর *জীবনস্মৃতি*-র উপসংহার প্রসঙ্গে

তিনি বলেন, "এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখ দুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এইসমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায়, তবে আর-যাহাকিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানোই হইবে। মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না।" (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫০।) স্মরণীয়, ১৩১৯ সনে *জীবনস্মৃতি*-র প্রথম খশড়ার পর দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি রচনার সময়েও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের কালবৃত্তকে আর সম্প্রসারিত করেননি, যদিও কবির সৃষ্টিক্ষমতা অব্যাহত ছিল তিরোধানের অল্প কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত। যথাসময়ে আমরা দেখব, তাঁর গুরুদেবের মতোই গান্ধীও কেমন একান্ত ঈশ্বর-নির্ভর ছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যের অপর এক সৌন্দর্যসাধক কথাকোবিদ অন্নদাশঙ্করও সময়ে থামার গুরুত্ব সম্বন্ধে অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন। তবে সত্যটা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন নিজ আত্মস্বরূপ বিনু-র বকলমে। বলেছিলেন, কথা অনেক হ'ল। অতঃপর "না-বলার আর্ট" শিখতে হবে।

মহাত্মার পক্ষে এইভাবে বক্তব্যের যতি টানার সপক্ষে অপর একটি কারণও বিবেচনা করা যেতে পারে। কবির মতো তিনি অন্তর্লোকচারী সুন্দরের সাধক-স্রষ্টা ছিলেন না। ছিলেন মূলত জনসেবক, গণশিক্ষক এবং তা-ও জটিল-কুটিল পন্থা-রূপে বিবেচিত রাজনীতির মাধ্যমে। কারণ "রাজনীতির অধ্যাত্মকরণ" ছিল তাঁর অন্যতম অভীষ্ট। রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত নরনারীদের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে স্বভাবতই ভিন্ন মতের অবকাশ থাকে, তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে। আত্মজীবনী যেহেতু নিজের দৃষ্টিকোণ ও বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি, তাই সমাজে নেতৃস্থানীয় কারও পক্ষে এ জাতীয় বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার ব্যাপক প্রচারের প্রভাব, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ—অর্থাৎ সত্য অপর পক্ষেও থাকতে পারে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের একমাত্র নয়, একাধিক বিকল্প সম্ভব—এ জাতীয় সহনশীল মানসিকতার প্রসারের বাধক হয়। অথচ ঐ বহুত্ববাদী সহনশীল মানসিকতাই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভিত্তি। বিশেষ ক'রে আমরা দেখি যে কী স্বদেশে, কী বিদেশে রাজনৈতিক পুরুষেরা জীবন-সায়াহ্নে আত্মজীবনী রচনার কালে নিজেদের দ্বারা গৃহীত তাবৎ পদক্ষেপের সমর্থনে যুক্তিজাল বিস্তার ক'রে থাকেন। নিজের এবং এমন-কি স্ব-দলের ভাবমূর্তি বজায় রাখার স্বার্থে ভুলের স্বীকৃতি কদাচিৎ দিয়ে থাকেন। জনসাধারণের মগজ-ধোলাইয়ের এই মানসিকতা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতিকূল। সৌভাগ্য, গান্ধীজী সে-পথ পরিহার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, কর্মজীবনের মধ্যপথে রচিত *আত্মকথা*-য় তিনি অকুণ্ঠভাবে

নিজের বহু ভুলের কথাও স্বীকার করেন এবং একটি পদক্ষেপকে তো 'হিমালয়-প্রমাণ ভ্রান্তি' আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সত্যনিষ্ঠার কারণে।

২

গান্ধীজীরই জবানবন্দী অনুসারে, নিজ জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করার পিছনে তাঁর একাধিক সহকর্মীর প্রেরণা ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের কারণে দণ্ডিত হয়ে য়ার্বেদা কারাগারে বন্দী থাকাকালে কয়েকজন সহকর্মী-বন্ধু লেখার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করেন। এঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রবণতাসম্পন্ন জনৈক সহকর্মীও ছিলেন যিনি পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে স্বামী আনন্দ নামে হিমালয়বাসী হন। তিনিও গান্ধীজীকে ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করতে থাকেন রচনায় হাত দেবার জন্য। কিন্তু সহবন্দী অপর এক ঈশ্বরপরায়ণ সহকর্মী এর বিরুদ্ধে এক গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। বললেন, "Supposing you reject to-morrow the things you hold as principles today, or supposing you revise in the future your plans of today, is it not likely that the men who shape their conduct on the authority of your word spoken or written, may be misled?"

পূর্বোক্ত যুক্তি গান্ধীজীকে কিছুটা প্রভাবিত করলেও *নবজীবন*-এর জন্য প্রতিশ্রুত নিয়মিত রচনা হিসাবে তিনি *আত্মকথা*-র সাপ্তাহিক কিস্তি রচনায় ক্ষান্তি দেননি, তাঁর স্বীকারোক্তি অনুসারে তিনি একান্তভাবে আত্মচরিত রচনায় প্রয়াসী হননি। জীবনে সত্য নিয়ে যে অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছিলেন, সেগুলির বর্ণনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আর স্বভাবতই সেগুলি শেষ অবধি আত্মজীবনীর রূপ পরিগ্রহ করে। কারণ ঐসব সত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া তাঁর জীবন বলতে পৃথক্ কিছু নেই। যথার্থ বা অমূলক যা-ই হোক্, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ঐসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাহিনী পাঠকদের উপকৃত করবে।

সত্যের পরিধি সম্বন্ধে নিজ ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ক'রে অতঃপর মহাত্মা বলেছেন যে এর মধ্যে অহিংসা, ব্রহ্মচর্য ও আপাতদৃষ্টিতে সত্য থেকে ভিন্ন বিবেচিত মানব-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাপর নীতি ও আচার-আচরণ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষাসমূহের কথাও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে তাঁর পক্ষে অবশ্য "Truth is the sovereign principle, which includes numerous other principles"। তবে সে-সত্য "is not only truthfulness in word, but truthfulness in thought also, and not only the relative truth of our conception, but The Absolute Truth, The Eternal Principle, That is god". পরমুহূর্তেই অনেকান্তবাদী গান্ধীজী স্বীকার করেছেন যে ঈশ্বরের বহু পরিভাষা বিদ্যমান, কারণ তাঁর অভিব্যক্তিও অগণিত। সে-সব তাঁকে অভিভূত করলেও তিনি স্বয়ং কিন্তু ঈশ্বরকে সত্য রূপেই উপাসনা করেন। অপর এক স্থলে তিনি এমন পর্যন্ত বলেছেন যে 'ঈশ্বর সত্য'—এই প্রচলিত বাক্‌শৈলীর পরিবর্তে তাঁর বক্তব্য হ'ল 'সত্যই ঈশ্বর'। তবে তাঁর মধ্যে যথেষ্ট নম্রতা ছিল ব'লে পরমুহূর্তেই তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তখনও পর্যন্ত তাঁর সত্যরূপী ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়নি, যদিও প্রাণপাত প্রয়াস জারি আছে। আর সেই কারণে

যতক্ষণ পর্যন্ত সেই "পরম সত্য"-এর উপলব্ধি না-হচ্ছে ততক্ষণ অবধি তাঁর বোধ অনুযায়ী আপেক্ষিক সত্যকেই আঁকড়ে থাকতে হবে। "That relative truth must, meanwhile, be my beacon, my shield and my buckler." এ পন্থা ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া হ'লেও তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও সহজতম।

কুমারসম্ভব কাব্যে কালিদাস হিমালয়কে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর মানদণ্ড আখ্যা দিয়েছিলেন—পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ। গান্ধীও মানব-সমাজের মানদণ্ড। যে কোনো মানবকের মতো বাল্যাবধি ভূতের ভয়ে ভীত, শৈশবে মিথ্যা কথা বলা ও এমন-কি চুরির ঘটনায় লিপ্ত, যৌবনারম্ভে সমবয়সী স্ত্রীর প্রতি অযৌক্তিক পুরুষ-সুলভ আধিপত্য-প্রয়াসী, সেবাভাবী হ'লেও পিতার মৃত্যুশয্যা পরিহার ক'রে কামাসক্তির তাড়নায় স্ত্রীসঙ্গ ও পরে অনুতাপ—সাধারণ মানুষের তাবৎ দুর্বলতা বালক-কিশোর-যুবক মোহনদাসের মধ্যে ছিল। পেশার সূচনায় স্বদেশে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি আইনজীবীর চাকরী নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে বাধ্য হন। কিন্তু এতসব মানব-সুলভ ক্ষীণতা ও দুর্বলতার মধ্যেই নিরন্তর সত্যরূপী ঈশ্বরনিষ্ঠার বলে বারবার পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে মোহনদাস মহাত্মায় রূপান্তরিত হন।

প্রচণ্ড শীতের রাত। স্বদেশ ও পরিচিতজনদের থেকে বহুদূরে দক্ষিণ আফ্রিকার মরিৎস্‌বার্গ রেল স্টেশনে রেলের প্রথম শ্রেণীর বৈধ যাত্রী হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণাঙ্গ হবার অপরাধে নিক্ষিপ্ত হবার পর অন্ধকার প্রতীক্ষালয়ে কাঁপতে-কাঁপতে তেইশ বৎসর বয়স্ক মোহনদাস ইতিকর্তব্য ভাবতে লাগলেন : "Should I fight for my rights or go back to India, or should I go on to Pretoria without minding the insults, and return to India after finishing the case? It would be cowardice to run back to India without fulfilling my obligations. The hardship to which I was subjected was superficial–only a symptom of the deep disease of colour prejudice. I should try, if possible, to root out the disease and suffer hardship in the process." সাহস, কর্তব্য-ভাবনা ষড়রিপুর দাস মোহনদাসকে সত্যনিষ্ঠ সত্যাগ্রহী মহাত্মায় রূপান্তরিত করল। বিশ্বের ইতিহাসে অন্যায়-অবিচারের প্রতিরোধে অহিংস গণসত্যাগ্রহের একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হ'ল। আর অন্তর্জগতের মানচিত্রে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যে সত্যরূপী ঈশ্বরান্বেষণের সঙ্গে নিরন্তর সাধনা বা আন্তরিক প্রয়াস যুক্ত হ'লে অত্যন্ত সাধারণ নরনারীও নৈতিক শক্তির কোন্ উত্তুঙ্গলোকে উত্তরণ করতে পারেন।

দিলে আর ধার্মিক থাকি না। কোনো ধর্মই নীতিবোধের ঊর্ধ্বে নয়। মিথ্যাবাদী, হিংস্র, অসংযমী মানুষ কখনো তাঁর পাশে ঈশ্বর আছেন এমন দাবি করতে পারেন না।" আগ্রহান্বিত হয়ে প'ড়ে ফেললেন পুরো বইটাই। পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভাবা, যেমন যে-কোনো মনোমতো বই পড়ার সময়েই হয়ে থাকে। উপলব্ধি করলেন, "সত্যই ঈশ্বর।" মনে ব'সে গেল মহাত্মার বিশ্বাস– "চোখের বদলে চোখই যদি নীতি হয় তাহলে পৃথিবী তো একদিন অন্ধ হয়ে যাবে।"

বুঝলেন, মানুষ মিথ্যার আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। তারপর লিখলেন, "আমার নামে সব মামলা বন্ধ হোক্। আমার জন্য সরকারের অমূল্য সময় নষ্টের প্রয়োজন নেই। আমি সব অপরাধ কবুল করব। শাস্তি মাথা পেতে নেব।" চিঠিটি তাঁর মামলাগুলির বিচারককে পাঠিয়ে মনে গভীর শান্তি পেলেন। এ-জাতীয় অনভ্যস্ত চিঠি পেয়ে বিচারক চম্‌কে উঠলেন। গোলেকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর হৃদয় পরিবর্তন ও অনুতাপের কাহিনী শুনলেন। আঠার মাস বিচারাধীন বন্দী গোলেকে তিনি আইন অনুযায়ী মোট ২৫ মাসের কারাদণ্ড দিলেন। স্বেচ্ছায় সত্যের সম্মুখীন হবার জন্য ইতিমধ্যে কারাবাসের মেয়াদ তার থেকে বাদ গেল। গোলে বাকি সময় অন্যান্য কয়েদীদের গান্ধীজীর *আত্মকথা* পড়ানোর কাজে লেগে গেলেন। মুম্বাই সর্বোদয় মণ্ডল *আত্মকথা* ও অন্যান্য গান্ধী-সাহিত্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করল। কারামুক্তির পরও গোলে সর্বোদয় মণ্ডলের প্রতিনিধিরূপে মহারাষ্ট্রের কারাগারে-কারাগারে গান্ধীজীর *আত্মকথা* ও অন্যান্য সাহিত্য পড়াচ্ছেন। তার পরীক্ষা নিচ্ছেন। গোলে এখন পরিবর্তিত মানুষ। একদা সমাজ-বিরোধী আজ গান্ধী-সাহিত্যের প্রচারক।

বিশ্বের কোণে-কোণে গান্ধীজীর *আত্মকথা* পাঠে পরিবর্তিত মানুষের অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান। মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট নামের কথা বলতে হ'লে মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়ার), নেলসন ম্যান্ডেলা, বিশপ টুটু, মায়ানমারের আউং সাং সু-কি, শ্রীলঙ্কার আর্যরত্নে, থাইল্যান্ডের সুলাগ শিবরক্ষ এবং এইরকম আরও অনেকে ছাড়াও আছেন ১৯২১-এ চীনের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রের দাবিতে সৈন্যবাহিনীর ট্যাঙ্কের চাকায় পিষ্ট জনগণ এবং তাদের নেতা ছাত্রদল, উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় গিয়ে যাঁরা গান্ধী ও তাঁর সত্যাগ্রহ সম্বন্ধিত রচনা পাঠে অনুপ্রাণিত হন। জর্মানির "সবুজ দল" অথবা বার্লিনের "গান্ধী কেন্দ্র" ও তার ইজরাইলের উপকেন্দ্র এইরকম নামী-অনামী গান্ধী-জীবন ও কর্মে অথবা সাহিত্যপাঠে উদ্দীপ্ত নরনারীদের কৃতি।

কোনো ঐশী শক্তির দাবি করেননি গান্ধীজী (*Young India*, ২৫. ৮. ১৯২১), এমন-কি 'গান্ধীবাদী' ব'লে কাউকে অভিহিত করা হোক্—এরও প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন তিনি (*Harijan*, 2. 3. 1940), নিজের অনুবর্তী কোনো পন্থ বা সম্প্রদায় সৃষ্টিও তাঁর কাম্য ছিল না। তাঁর বক্তব্য, "আমি নূতন কোনো সত্য প্রচার করতে আসিনি। সত্য আমার কাছে যেমনভাবে উদ্ভাসিত হয় তার অনুসরণ ও প্রতিনিধিত্ব করাই আমার প্রয়াস।"

কোনো-কোনো সমালোচক বলতে পারেন যে তাঁর পূর্বের ও পরের উক্তিতে অসঙ্গতি দেখা যায়। তাঁদের উদ্দেশ্যে মহাত্মার বক্তব্য ছিল, "কোনো প্রশ্নে সর্বদা পূর্বের অভিমতের

সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বলার বদলে সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তি করাই বরং আমার অভীষ্ট। এর পরিণামে আমি এক সত্য থেকে অপর সত্যে উত্তরণ করেছি।... বন্ধুরা পূর্ব-পরে আমার অভিমতের মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষ করলে আমার সর্বশেষ বক্তব্যটিকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করলেই ভালো করবেন, যদি-না অবশ্য তাঁদের পুরাতন ব্যাখ্যাটি মনে ধ'রে থাকে" (*Harijan*, 30. 9. 1939)। খোলা মনের অধিকারী গান্ধীজী যে পরিস্থিতি অনুসারে বদলেছেন, বদলাতে পারেন—এ কথা স্বীকারে সংকোচ বোধ করেননি।

আর এই খোলা মনের অপর নাম হ'ল বিজ্ঞান-মনস্কতা, যা সর্বদা পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া ক'রে থাকে। তিনি ছিলেন সতত বিবর্তনশীল, চিরনবীন, চিরহরিৎ প্রাণবন্ত সত্তা। কোনো মহাপুরুষ নয়, নিজেকে এক সাধারণ মানুষরূপে ঘোষণা ক'রে তিনি বলেন, "ভারত ও মানবসমাজেব আমি এক দীন সেবক এবং এদের সেবাতেই আমি প্রাণোৎসর্গ করার অভিলাষী।" সাধারণ হবার সাধনায় তিনি হন অসাধারণ। জীবনে এবং মরণেও।

পুনরপি, "আমি নূতন কোনো নীতিমালার উপস্থাপনা করিনি, বরং পুরাতন নীতিসমূহকেই নূতনভাবে বলার চেষ্টা করেছি। আমার উপস্থাপনা কতটা যথার্থ তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমার বক্তব্য যেহেতু নিজের আন্তরিক বিশ্বাসসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে এবং যেহেতু অনেক বন্ধুই আশা করেন যে আমি অহিংসার বহু জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারব, আমি তাঁদের কেবল এইটুকুই অনুরোধ করতে পারি যে আমার রচনাগুলি পড়ুন" (*Young India*, 2. 12. 1926)।

গান্ধীর মতে তাঁর অহিংসা ও সত্য একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাই তাঁর অন্তর্জীবন ও বাহ্যকর্ম— উভয়েরই চাবিকাঠি রয়েছে গান্ধীজীর সত্যের মুখোমুখি হবার প্রয়াসে, তাঁর রচনায়। আর সেইসব রচনার প্রথম ধাপ হ'ল তাঁর *আত্মকথা*।

৩

পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে *আত্মকথা*-র প্রথম আত্মপ্রকাশ মূল গুজরাতি ভাষায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক *নবজীবন* পত্রিকায়। তারিখটা ২৬ নভেম্বর ১৯২৫, দুই খণ্ডের পুস্তকের আকারে প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে। মহাদেব দেশাই-কৃত ইংরাজি অনুবাদও ধারাবাহিকভাবে গান্ধী -সম্পাদিত *Young India* সাপ্তাহিকে একই সঙ্গে প্রকাশিত হতে থাকে যার প্রকাশন সম্পূর্ণ হয় ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে। গুজরাতির মতো গ্রন্থাকারে ইংরাজি সংস্করণও (এবং সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়-কৃত বাংলা সংস্করণও) প্রথম দিকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হ'ত। ১৯৪০ থেকে *আত্মকথা* প্রথম একই খণ্ডে প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। সতীশবাবুর বাংলা সংস্করণও অতঃপর অখণ্ড সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হয়।

আত্মকথা-র জনপ্রিয়তার প্রমাণ মিলবে বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। আর তখন সহজেই *বাইবেল*-এর সঙ্গে *আত্মকথা*-র তুলনা মনে এসে

যায়। এত সংখ্যক ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় পৃথিবীর কম গ্রন্থই অনূদিত হয়েছে। আর সেই প্রথম প্রকাশন থেকে অদ্যাবধি কম গ্রন্থেরই এমন চাহিদা দেশ-বিদেশের পাঠক-সমাজে। ভারতে ইংরাজি ছাড়াও হিন্দি, অসমিয়া, বাংলা, ওড়িয়া, উর্দু, তেলুগু, তামিল, কন্নড়, মালয়লম্, মরাঠি, পঞ্জাবি, সিন্ধি ও মণিপুরের মেইতি অর্থাৎ মোট পনেরটি ভাষায় বর্তমানে *আত্মকথা* পাওয়া যায়। এছাড়া অসমের উপজাতীয় বোড়ো ভাষায় ভরতন কুমারাপ্পা কর্তৃক সংক্ষেপিত *আত্মকথা*-র একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং রাজ্যের অপর একটি জনজাতীয় ভাষা ডোঙ্গারিতেও এর অনুবাদ শীঘ্র প্রকাশিত হবে।

ভারতের বাইরে আরবি, স্প্যানিশ, ব্রেজিলিয়ান, নেপালি, জর্মান, পোলিশ, তিব্বতি, সার্বো-ক্রোশ, তুর্কি, সিংহলি, ইতালিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান, ফরাসি, সুইডিশ, হাঙ্গেরিয়ান, ডাচ, স্লোভাক, পর্তুগীজ, সোয়াহিলি, হিব্রু, ফিনিশ– মোট একুশটি ভাষায় এ যাবৎ *আত্মকথা* প্রকাশিত হয়েছে। মহাদেব দেশাই-কৃত *আত্মকথা*-র ইংরাজি অনুবাদ ভারত ছাড়াও ইংলন্ড ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের জন্য ইংরাজি *আত্মকথা* ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রকাশিত হয়েছে ইংলন্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে। *আত্মকথা*-র জনপ্রিয়তার এই কাহিনী সম্পূর্ণ নয়।

ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আমাদের বঙ্গভাষাও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ১৯৬০ -এর দশকে কাঁথির রঘুনাথ মাইতি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত (প্রকাশক : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা) ও বর্তমান প্রতিবেদকের *আত্মকথা*-র ছাত্র সংস্করণের (ভরতন কুমারাপ্পা -সম্পাদিত) অনুবাদের কথা বাদ দিলে এ যাবৎ এর চারটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২৯-এ এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস দ্বারা প্রথম প্রকাশিত *মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা*-র অনুবাদক ছিলেন অনিলকুমার মিশ্র। ১৯৩১-এ *আত্মকথা*-র বঙ্গানুবাদের যে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় তার অনুবাদক ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর গঠনকর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠান খাদি প্রতিষ্ঠানের আজীবন সম্পাদক সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়। তিনি মূল গুজরাতি থেকে বঙ্গানুবাদ করেন। এছাড়া স্বয়ং নিষ্ঠাবান গান্ধীপন্থী জনসেবক ও বহু গান্ধী-সাহিত্যের অনুবাদক হওয়া ছাড়াও মহাত্মার সঙ্গে খাদি প্রতিষ্ঠানের নিকট সম্পর্ক ও সেকালে প্রতিষ্ঠানের কুশল বিক্রয়-ব্যবস্থার জন্য *আত্মকথা*-র এই অনুবাদটিই বঙ্গভাষীদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। তৎসত্ত্বেও অনুবাদের ভাষা তেমন প্রাঞ্জল নয়– এমন ধারণা নূতন যুগের বাঙালি পাঠক-সমাজে গ'ড়ে উঠছিল। শিক্ষায় বিজ্ঞানী এবং উদয়াস্ত জনসেবায় যাঁর জীবন নিবেদিত তাঁর কাছ থেকে স্বভাবতই বঙ্গভাষার সূক্ষ্ম সৌকুমার্য আশা করাও যায় না। ১৯৬০-এর দশকে গান্ধী-স্মারক-নিধির বাংলা শাখা ব্যাপকভাবে বঙ্গভাষায় গান্ধী-সাহিত্যের অনুবাদ ও প্রচারের ব্যবস্থা করে। এরই অঙ্গ হিসাবে ১৯৬৭-তে প্রকাশিত হয় অপর এক গান্ধীপন্থী কর্মী এবং সুলেখক বীরেন্দ্রনাথ গুহের *মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ*। বীরেন্দ্রনাথ গুহও মূল গুজরাতি থেকে অনুবাদ করলেও তাঁর বঙ্গানুবাদের শৈলী ও প্রসাদগুণ সম্বন্ধে একই ক্ষোভ থেকে যায় পাঠক-মনে।

গান্ধী-নিধির বাংলা শাখা *আত্মকথা*-র একটি সহজ কাব্যানুবাদও প্রকাশ করেন যার

রচয়িতা ছিলেন অপর এক কর্মী-লেখক সৌরীন্দ্রকুমার বসু। অনুবাদের নাম : *গান্ধীচরিতকথা* এবং প্রকাশকাল আগস্ট ১৯৭০।

ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্বসহ পশ্চিমবঙ্গেও গান্ধী-শতবার্ষিকী পালন করার আয়োজন হয়েছে এবং এ-রাজ্যে এর জন্য গঠিত হয়েছে 'গান্ধী-শতবার্ষিকী সমিতি'। অন্যান্য গান্ধী-সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে বঙ্গভাষায় ছয় খণ্ডে মহাত্মার মূল রচনাগুলির এক সংকলন ক'রে সুলভ মূল্যে বাঙালি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার সিদ্ধান্ত সমিতি কর্তৃক নেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, *আত্মকথা, দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ*-সহ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা অনূদিত বহু রচনাই তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর অনুবাদের পূর্বোক্ত দুর্বলতা দূরীকরণের জন্য 'শতবার্ষিকী সমিতি'র প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা ক'রে বর্তমান প্রতিবেদক এই বিষয়ে তাঁর সম্মতি লাভ করেন যে প্রতিটি খণ্ডের সম্পাদকেরা তাঁর অনুবাদের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ক'রে নেবেন ভাষায় প্রাঞ্জলতা সুনিশ্চিত করতে। তবে তার জন্য যেন অনুবাদের মূলানুগত্য ব্যাহত না-হয়। শতবার্ষিকী সমিতির *গান্ধী-রচনাসম্ভার*-এর প্রথম খণ্ড—*আত্মকথা* যার অন্তর্ভুক্ত ছিল—তার সম্পাদনা করেন কবি-সাংবাদিক-সাহিত্যিক মৃত্যুঞ্জয় মাইতি। প্রকাশন উপসমিতির সম্পাদক বিশিষ্ট প্রবন্ধকার-সাহিত্য-সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী এবং সভাপতি, প্রমুখ গান্ধীপন্থী কর্মী-সাহিত্যিক ও বাংলা *হরিজন* পত্রিকার সম্পাদক রতনমণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের তত্ত্বাবধানে *আত্মকথা*-সহ অন্যান্য খণ্ডের সম্পাদকদের কৃতি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, *আত্মকথা*-র ঐ পরিমার্জিত সংস্করণই অতঃপর পৃথক্‌ভাবে বঙ্গভাষী পাঠকদের কাছে উপলব্ধ ছিল। কারণ খাদি প্রতিষ্ঠান নিজেদের দ্বারা প্রকাশিত গান্ধী-সাহিত্যের পুনর্মুদ্রণ আর করছিলেন না। ১৯৭০ থেকে গান্ধী-সাহিত্যের মূল প্রকাশক আহমেদাবাদের নবজীবন ট্রাস্টের উদ্যোগে কলকাতার গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির পরিবেশনায় *আত্মকথা*-র যে বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় তা-ও ঐ মৃত্যুঞ্জয় মাইতি -সম্পাদিত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ।

গান্ধী শতবার্ষিকীর বৎসরেই বাংলা *আত্মকথা*-র ক্ষেত্রে একটি নবদিগন্তের সংযোজন হয়। কলকাতার আকাশবাণী কেন্দ্র তার এক পৃথক্ অনুবাদ করিয়ে সপ্তাহে একদিন নিয়মিতভাবে তার প্রসারণের ব্যবস্থা করে। অনুবাদক এবং কলকাতা কেন্দ্রে সেই বঙ্গানুবাদের পাঠক ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির কলকাতার আঞ্চলিক কার্যালয়ের তদানীন্তন প্রধান ক্ষিতীশ রায় মহাশয়। তিনি কেবল সুসাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বভারতীর পুরাতন আশ্রমিক, বিভিন্ন সময়ে ওখানকার নানা বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মী। কবিগুরুর হৃদয়ে গান্ধীর জন্য চিরকালই যেমন একটি স্নেহসিক্ত কোণ ছিল, তেমনি আছে তাঁর শান্তিনিকেতনে গান্ধী-অনুরাগী এক গোষ্ঠী এবং ক্ষিতীশদা ছিলেন তাঁদের অন্যতম সদস্য। আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক সম্বন্ধে পড়াশুনার জন্য বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি রবীন্দ্র-সদনে গিয়ে ক্ষিতীশদার কাছে অনেক সাহায্য পাই। তাব সঙ্গে সেই সৌম্যকান্তি সুপুরুষ উদাত্ত-মধুর কণ্ঠের অধিকারী মানুষটির প্রশ্রয়ের স্মিত হাস্যের অন্তরালে লাভ করি এক স্নেহশীল অগ্রজকে। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী সমন্বয়ের সেই সাহিত্যিক প্রবরের *আত্মকথা*-র মুলানগ এবং সঙ্গে-সঙ্গে

সরল-সাবলীল-প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, এ-গ্রন্থের এযাবৎকালের অনুবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এমনি একটা অভিমত সর্বস্তরে দানা বেঁধেছিল। বলাবাহুল্য, আমি তাই প্রথম সুযোগেই অনুবাদটি গ্রন্থাকারে বাঙালি পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করার প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হই।

দিল্লীতে সর্বভারতীয় গান্ধী-স্মারক-নিধির সম্পাদকের দায়িত্বে থাকার সময়ে নবজীবন ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি জিতেন্দ্রভাই দেশাই শ্রীমন্নারায়ণ-সম্পাদিত তাঁদের ইংরাজি গান্ধী-রচনা-সংকলনের বঙ্গানুবাদ করানোর জন্য আমার সাহায্য চান। এ-রাজ্যের গান্ধী-শতবার্ষিকী সমিতির উত্তরাধিকারী কলকাতার গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির তদানীন্তন সম্পাদক বন্ধুবর ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পাঁচ খণ্ডের সেই বঙ্গানুবাদের সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে নবজীবন ট্রাস্ট কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়। সঙ্গত কারণেই স্থির করা হয়েছিল যে গান্ধী-সাহিত্যের প্রচলিত অনুবাদগুলিকে যথাসম্ভব এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কেবল *আত্মকথা*-র ক্ষেত্রে ক্ষিতীশদার অনুবাদটি কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত করা হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সে ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ ততদিনে ক্ষিতীশদা আর নেই এবং বিদেশবাসিনী তাঁর মেয়েদের সঙ্গে আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও সম্পর্কস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। আমরা নূতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে না-পারায় অবশেষে পূর্ববৎ মৃত্যুঞ্জয় মাইতি -সম্পাদিত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের অনুবাদই নবজীবনের ঐ নির্বাচিত রচনা-সংকলনেও স্থান পায়।

তবে *আত্মকথা*-র সাহিত্যগুণান্বিত রসোপেত বঙ্গানুবাদ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দেবার ইচ্ছা মন থেকে অপসৃত হয়নি। এর সুযোগ মিলল আমাদের বর্তমান রাজ্যপাল এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির নীরব সাধক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গান্ধী মহাশয়ের বদান্যতায়। কথা প্রসঙ্গে তাঁকে একদিন ক্ষিতীশদার বঙ্গানুবাদের বৈশিষ্ট্যের কথা জানাতে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ কালচারাল টেক্সট্‌স্ অ্যান্ড রেকর্ডস্'-এর কর্তৃপক্ষকে আগ্রহী ক'রে তোলেন। বাকি রইল পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তি ও অনুবাদকের উত্তরাধিকারীদের অনুমতি লাভ। সম্প্রতি পরলোকগতা শান্তিনিকেতনের অধ্যাপিকা আরতি সেন-এর সক্রিয় সহযোগিতায় সেই সমস্যার সমাধান এবারে হ'ল। নবজীবন ট্রাস্টের জিতেন্দ্রভাই দেশাইও প্রয়োজনীয় অনুমতি দিলেন। ক্ষিতীশদা-কৃত *আত্মকথা*-র এই প্রসাদগুণ-সম্পন্ন ও বর্তমান প্রতিবেদকের মতে সর্বোৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদের প্রকাশন পূর্বোল্লিখিত সকল গুণীজনদের উৎসাহ, আগ্রহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার পরিণাম। আমাদের মতো সেই সময়ের আকাশবাণী-র শ্রোতা হিসাবে যাঁদের *আত্মকথা*-র নিয়মিত পাঠ শোনার সুযোগ হয়নি, তাঁরা তাঁর অনুবাদের অতিরিক্ত একটা মাত্রা—ক্ষিতীশদার উদাত্ত-মধুর কণ্ঠের পাঠের রসে বঞ্চিত থাকবেন ঠিকই, কিন্তু কী পাইনি তার হিসাব না-মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থে যা পাওয়া যাচ্ছে, তার মূল্যও কম নয়।

মরণশীল দেহী স্বরূপেই অমৃতত্বের শাশ্বত বাসনা মানুষের চিরকালীন। সেই অনির্বাণ পিপাসার পূর্তিতে অমৃতপথযাত্রী এক মানবের অন্তর্লোকের সাধনার ইতিহাস— গান্ধীজীর *আত্মকথা* পরম সহায়ক সিদ্ধ হবে। আজকের এবং উত্তরকালের বঙ্গভাষী তরুণ-তরুণীদের কাছে মানুষের চিরন্তন ঈপ্সা—অমৃতত্ব অর্জনের এই সর্বজন-সুলভ উপাদান তুলে দিয়ে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ কালচারাল টেক্সট্‌স্‌ অ্যান্ড রেকর্ডস্‌' এক মহৎ সামাজিক কর্তব্য পালন করলেন ব'লে সর্বজন কর্তৃক অভিনন্দিত হবেন। গতানুগতিকতাকে সাহস ক'রে বর্জন ক'রে সমাজে নূতন চিন্তা-চেতনার আবর্তনের সৎসাহস নিয়ে যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রারম্ভ, তার পক্ষে এই যুগোপযোগী পদক্ষেপই স্বাভাবিক। আমাকে *আত্মকথা*-র এই নূতন বঙ্গানুবাদের ভূমিকা লেখার অনুরোধ জানিয়ে সম্মানিত করার জন্য 'স্কুল অফ কালচারাল টেক্সট্‌স্‌ অ্যান্ড রেকর্ডস্‌'-এর বর্তমান নির্দেশক শ্রীযুক্ত সুকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আর কৃতজ্ঞতা জানাই ঐ-কেন্দ্রের প্রাক্তন যুগ্ম-নির্দেশক ও বর্তমানে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীস্বপন মজুমদারকে, যাঁর উৎসাহে ও সক্রিয় তত্ত্বাবধানে বইটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে পারল। আর এই অবকাশে স্নেহের ঋণ স্বীকার করি গান্ধী-অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে কর্মরত তিন তরুণতর সহকর্মীর প্রতি যাঁরা *আত্মকথা*-র প্রকাশনার নানা তথ্য সরবরাহ ক'রে আমার সহায়তা করেছেন। এঁরা হলেন দিল্লীর জাতীয় গান্ধী-সংগ্রহালয়ের নির্দেশক ড. শ্রীমতী বর্ষা দাস, সবরমতীর গান্ধী সংগ্রহালয়ের নির্দেশক, আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু শ্রীঅমৃতভাই মোদী এবং বারাকপুর গান্ধী মিউজিয়মের অনুজপ্রতিম নির্দেশক অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী।

আর একটি কথা। আমরা যেন ভুলে না-যাই যে উত্তম সমাজের জন্য আদর্শ নরনারী অপরিহার্য। সমাজের অবিচ্ছেদ্য উপাদান তার সদস্য নরনারীবৃন্দই তো এককভাবে আদর্শের ধারক-বাহক হয়ে তার প্রাণ-কোষ স্বরূপ হন। তাঁরাই হয়ে থাকেন প্রার্থিত সমাজের মূল্যবোধ-সমূহের প্রতীক, সমাজের সম্ভাব্য অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নিত্য প্রাণবন্ত প্রতিরোধ। আদর্শ সমাজ রচনাকারীদের জন্যও তাই *আত্মকথা*-র সার্থকতা বিদ্যমান।

আত্মকথা

অথবা

সত্যের সন্ধানে

ভূমিকা

চার-পাঁচ বছর হ'ল আমার অন্তরঙ্গ কয়েকজন সহকর্মীর ইচ্ছাক্রমে আমি আমার জীবনকথা লিখতে সম্মত হই। লেখা শুরু করতে গিয়ে সবে প্রথম পৃষ্ঠা শেষ করেছি, বোম্বাইয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ায় সব কাজ মুলতবি রাখতে হ'ল। তারপর একটার পর একটা ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল য়ার্বেদায় আমার কারাবাসে। কারাগারে শ্রীযুক্ত জেরামদাস ছিলেন আমার অন্যতম সঙ্গী। তিনি বিশেষ ক'রে বললেন অন্যসব কাজ একপাশে সরিয়ে রেখে আমি যেন আমার জীবনকথা লেখা শেষ করি। তাঁকে আমি বললাম যে ইতিপূর্বেই জেলে ব'সে পড়াশুনা করার জন্য, আমি পঠনীয় বইয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত ক'রে ফেলেছি। সেই পড়ার কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অন্য কাজে হাত দেবার কথা আমি ভাবতে পারি না। য়ার্বেদায় আমার কারাদণ্ডের পুরো মেয়াদটুকু যদি আমায় কাটাতে হ'ত, তাহলে হয়তো আমার জীবনকথা লেখা শেষ করতে পারতাম, কারণ আমায় যখন জেল থেকে খালাস করা হ'ল, মেয়াদ শেষ হতে এক বছর বাকি। সম্প্রতি স্বামী আনন্দ পুরাতন প্রস্তাবটি পুনরুত্থান করেছেন। *দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস* কিছু দিন আগে শেষ করেছি ব'লে, আমারও কেমন যেন ইচ্ছা হচ্ছে *নবজীবন* পত্রে প্রকাশের জন্য জীবনকথা লেখায় হাত দিতে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল আমি বই-আকারে প্রকাশের জন্য আলাদাভাবে লিখি। কিন্তু আমার ততখানি উদ্বৃত্ত সময় হাতে নেই। সপ্তাহে-সপ্তাহে আমি একটি ক'রে পরিচ্ছেদ লিখে যেতে পারিমাত্র। প্রতি সপ্তাহে *নবজীবন*-এর জন্য কিছু-না-কিছু লিখতে তো হয়ই। সে লেখাটা না-হয় আমার জীবনকথা হ'ল। স্বামীজী এতে রাজি হলেন, সুতরাং আমি এখন এই দুরূহ কাজে হাত লাগিয়েছি।

কিন্তু আমার এক ধর্মভীরু বন্ধু আমার মৌনদিবসে তাঁর একটি সংশয়ের কথা আমায় বললেন: "এই দুরূহ অভিযানে কেন আপনি নামতে যাচ্ছেন? আত্মচরিত লেখার রেওয়াজটা তো পশ্চিমের। এক পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে যারা লিখেছে, তারা ছাড়া এ দেশে কে কবে নিজের জীবনকথা লিখতে গেছে? আর কী এমন লেখার আছে যে আপনি আত্মচরিত লিখবেন? আজ যা কিছু আপনি নীতি ব'লে মেনে নিয়েছেন, কাল যদি তা পরিহার করেন, অথবা যেসব কাজের পরিকল্পনা আপনার মাথায় আছে, কাল যদি তা বদ্‌লায়, তাহলে যারা আপনার মুখের কথা কিংবা লিখিত মতামতের ভিত্তিতে তাদের

জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করে, তারা কি বিভ্রান্ত হবে না? সুতরাং ভেবে দেখুন জীবনচরিত লেখা আপনার পক্ষে উচিত হবে কি-না, অন্তত এতদ্দণ্ডে।"

এই যুক্তি আমায় একেবারে প্রভাবিত করেনি, এমন কথা আমি বলব না। কিন্তু সত্যিকার আত্মজীবনী রচনায় আমার আদৌ আগ্রহ নেই। সত্যানুসন্ধানে আমি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, আমি কেবল সেই কাহিনীটুকু বলতে চাই। বস্তুতপক্ষে আমার জীবন যেহেতু এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমষ্টি ছাড়া আর-কিছু নয়, এই কাহিনী হয়তো আত্মজীবনীর রূপ নেবে। আমার ধারণা, অন্ততপক্ষে আমার এ কথা ভাবতে ভালো লাগে যে, আমি যদি এইসব পরীক্ষার কথা একত্র গ্রথিত ক'রে দিই, লোকের তাতে কিছু উপকার হ'লেও হতে পারে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে আমি যেসব পরীক্ষা করেছি, সেগুলি কেবল এ দেশে নয়, তথাকথিত সভ্যজগতে কিছু-কিছু জানা হয়ে গেছে। আমার কাছে তার বিশেষ-কিছু মূল্য নেই, যেমন মূল্য নেই আমার এই 'মহাত্মা' নামের। অধিকাংশ সময় এই উপাধি আমার পক্ষে যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। এই মহাত্মা নাম থেকে আমি কখনও আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি ব'লে আমার মনে পড়ে না। কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে কাজ করার যতটুকু শক্তি আমার আছে, তা আমি পেয়েছি আত্মিক ক্ষেত্রে, আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রে। এইসব পরীক্ষার কথা আমি ছাড়া আর-কেউ তো জানে না, সুতরাং সেই কাহিনী আমাকেই বলতে হয়। সত্যিকার আত্মপরীক্ষায় অহংকারের কোনো স্থান থাকতে পারে না, বরঞ্চ তার ফলে আমার চিত্ত আরো নম্র হবে, নত হবে। যতই আমি আমার অতীত জীবনের ঘটনা অনুধাবন করি, ততই আমার ক্ষুদ্রতা, আমার তুচ্ছতা, আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমার যা লক্ষ্য, গত ত্রিশ বছরের ব্যাকুল সাধনায় যা আমি পেতে চাই, তা হ'ল আত্মজ্ঞান, সাক্ষাৎ ভগবৎ-দর্শন অর্থাৎ মোক্ষ-লাভ। আমি যে প্রাণধারণ ক'রে আছি তা কেবল এই চরম লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে। আমি যা বলি, যা লিখি, রাজনীতিক ক্ষেত্রে আমি যা-কিছু কাজ করি—সব-কিছু এই একটি লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে। কিন্তু যেহেতু আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস ক'রে এসেছি যে যা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব তা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর, আমি একান্ত ধ্যান-ধারণার মধ্যে আমার এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবসিত হতে দিইনি, যা করেছি খোলাখুলিভাবে সকল লোকের সামনে ক'রে এসেছি। আত্মিক দিক থেকে তাতে কিছু ক্ষতি হয়েছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। কোনো-কোনো গূঢ় ব্যাপার আছে যার বিষয়ে মানুষ নিজে জানে আর জানেন তার ভগবান। বাক্যে তা প্রকাশ করা যায় না। আমি যেসব পরীক্ষার কথা বলতে চাই, সেগুলি তেমন নয়। তৎসত্ত্বেও তার আত্মিক কিংবা নৈতিক তাৎপর্য নিশ্চয় আছে, আর ধর্মের মূল কথাটাই তো নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আমার এই সত্যানুসন্ধানের কাহিনীতে ধর্মের সেইসব বিষয় থাকবে, যা না-কি ছেলে-বুড়ো সবাই বুঝতে পারে। আমি যদি অনাসক্তচিত্তে ও যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে সব কথা বলতে পারি, তাহলে জীবন-পরীক্ষায় নিরত আমার মতো আরো অনেকে, তা থেকে এই পথে এগিয়ে যাবার প্রেরণা লাভ করতে পারেন। আমি যে আমার পরীক্ষায় অনেকখানি সফল হয়েছি, সে দাবি আমি করব না। একজন বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণার কাজ নিয়ে যতটুকু

দাবি করতে পারেন, তার চেয়ে বেশি দাবি আমি করছি না। যদিও তিনি পদে-পদে সত্য যাচাই ক'রে নেন, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও যত্নশীল থাকেন, তবু তাঁর সিদ্ধান্ত চরম অভ্রান্ত ব'লে মনে করেন না। বিকল্প প্রমাণের জন্য তিনি অপেক্ষা রাখেন। আমিও গভীরভাবে আত্মানুসন্ধান করেছি, নিজেকে তলিয়ে বুঝবার জন্য প্রচুর প্রয়াস করেছি, মনের নানা অবস্থা খুঁটিয়ে দেখাতে চেয়েছি। তত্রাচ, আমি যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সেগুলি অকাট্য বা চূড়ান্ত ব'লে কখনো দাবি করি না।

আমার একটিমাত্র যে দাবি তা হ'ল এই যে, আমার নিজের কাছে এইসব সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ব'লে মনে হয় এবং অন্তত সাময়িকভাবে চূড়ান্ত ব'লেও মনে হয়। তা যদি না-হ'ত তাহলে এইসব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনো কাজ করতে যেতাম না। এটুকু অবশ্যই বলতে পারি যে, প্রতিপদে আমি গ্রহণ-বর্জনের রীতি মেনে চলেছি ও তদনুসারে কাজও করেছি। আমার বিচারবুদ্ধিতে বা হৃদয়ের অনুভবে যতদিন এইসব কাজের সমর্থন মিলবে ততদিন আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকব।

নিতান্ত পুঁথিগত নীতি নিয়ে আমায় যদি আলোচনা করতে হ'ত, তাহলে আমি কখনও আত্মচরিত রচনায় হাত দিতাম না। কিন্তু যেহেতু আমার উদ্দেশ্য হ'ল জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি যেসব নীতি প্রয়োগ করেছি, তার ফল বলা, সেজন্য আমি ভিন্ন-ভিন্ন পরিচ্ছেদে যেসব কথা লেখার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, তার নাম দিয়েছি 'আমার সত্যানুসন্ধানের কাহিনী'। এই কাহিনীতে সত্যানুসন্ধানের কাহিনী ছাড়াও অহিংসা, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি সদাচার নিয়ে আমার বিভিন্ন পরীক্ষার কথাও থাকবে। কেউ-কেউ সদাচারকে সত্য থেকে পৃথক ক'রে দেখেন, কিন্তু আমার মনে হয়, সত্য এমন একটি মূল নীতি যার মধ্যে অন্য অনেক নীতি বিধৃত হয়ে থাকে। আমি যে সত্যের কথা বলছি, তা কেবল সত্য কথা বলা নয়, সত্য চিন্তা করা ; আমরা যাকে আপেক্ষিক সত্য ব'লে থাকি সেরকম সত্য নয়, পরম সত্য, চিরকালের সত্য। এই সত্য হ'ল সেই শাশ্বত নীতি বা তত্ত্ব যাকে আমরা ভগবান বলি। ভগবানের অসংখ্য সংজ্ঞা আছে, কারণ বহুবিচিত্রভাবে তিনি আমাদের কাছে প্রকাশিত হন। তাঁর এই বিচিত্র প্রকাশ আমি যখন অনুধাবন করার চেষ্টা করি তখন ভয়ে-বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যাই। কিন্তু ভগবানকে আমি ভজনা করি কেবল তাঁর সত্যস্বরূপে। আমি ভগবানকে লাভ করিনি, কিন্তু তাঁকে পাবার জন্য আমার প্রয়াস নিরন্তর। আমার সর্বাধিক প্রিয় বলতে যা কিছু আছে, সব-কিছু আমার অভীষ্ট লক্ষ্যসাধনের জন্য আমি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি। যদি এজন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, আশা করি তা থেকে আমি পশ্চাৎপদ হব না। কিন্তু যতদিন আমি সেই পরম সত্যকে না-পাচ্ছি, ততদিন আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও সাধ্যের পরিমাপে আপেক্ষিক সত্যকেই অবলম্বন ক'রে থাকতে হবে। ততদিন এই আপেক্ষিক সত্যই হবে আমার পথের নিশানা, আমার আত্মরক্ষার বর্মচর্ম। এই পথকে বলা হয়েছে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া', কিন্তু এই পথেই আমি সবচেয়ে সহজে, সবচেয়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হতে পেরেছি ব'লে আমার বিশ্বাস। এই নির্দিষ্ট পথে আমি অবিচল আছি ব'লে, আমার হিমালয়-প্রমাণ ভ্রম-প্রমাদও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। এই দুর্গম পথ আমায় নানাবিধ দুর্গতি থেকে রক্ষা করেছে

ও নিজের আলোয় পথ চিনে এগিয়ে যাবার সাহস দিয়েছে। চল্তি পথে আমি হয়তো-বা সেই পরম সত্যকে, স্বয়ং ভগবানকে, ক্ষীণ আভাসে-ইঙ্গিতে দেখতে পেয়েছি। যতটুকু দেখেছি তা থেকে মনে হয়েছে, একমাত্র তিনিই সত্য, আর সবই মিথ্যা মায়া। এই প্রত্যয় কীভাবে আমার মনে অঙ্কুরিত হ'ল ও বৃদ্ধি লাভ করল, আমার জীবনের কোন্-কোন্ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই প্রত্যয় দৃঢ় হ'ল, এসব কথা যাঁরা জানতে চান, বুঝতে চান বা আমার অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে চান, তাঁদের জন্য আমার এই আত্মচরিত লেখা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যতটুকু করতে পেরেছি, একটি শিশুর পক্ষেও ততটুকু করা দুরূহ হবে না। আমার এ কথা বলার সঙ্গত কারণ আছে। সত্যানুসন্ধানের উপায় এক হিসেবে যেমন কঠিন, অন্য হিসেবে তেমনি সহজ। উদ্ধত ব্যক্তির কাছে যে কাজ অসম্ভব ব'লে মনে হয়, সরলমতি শিশুর কাছে অনেক ক্ষেত্রে সে কাজ সহজসাধ্য। সত্যসন্ধানীকে নম্র হতে হয়, নত হতে হয়—তিনি হবেন 'তৃণাদপি সুনীচেন', ধুলোর চেয়েও তাকে নিচু হতে হয়। পায়ের তলায় ধুলো গুঁড়িয়ে যায়, কিন্তু সত্যসন্ধানীকে হতে হবে ধুলোর চেয়েও অধম। যতদিন তা না-হচ্ছেন ততদিন সত্যের আভাসটুকুও তিনি পেতে পারবেন না। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র সংবাদে এই কথা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে, খ্রীষ্টধর্ম ও ইস্‌লামে এ কথার প্রচুর সমর্থন পাওয়া যায়।

আমার জীবনচরিতে আমি যদি লেশমাত্র অহমিকার পরিচয় দিয়ে থাকি তাহলে আপনারা জানবেন, আমার সত্যানুসন্ধানে কোথাও কিছু ত্রুটি থেকে গেছে এবং আমি ক্ষীণভাবে যা দেখতে পেয়েছি, তা হ'ল মরীচিকার আলো, সত্যের দীপ্তি নয়। আমার মতন শত-সহস্র লোক ধ্বংস পাক্, কিন্তু সত্যের জয় হোক্। আমার মতো মরজগতের মানুষ, যারা ভুল করে, যারা পাপে লিপ্ত, তাদের বিচার করতে গিয়ে আমরা যেন সত্যের মান একচুলও খর্ব না-করি।

আমার আত্মচরিতে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত যেসব উপদেশ-নির্দেশ আছে, আমার বিনীত অনুরোধ কেউ যেন সেগুলি প্রামাণিক ব'লে মনে না-করেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার যেসব বিবরণ দেওয়া হ'ল সে কেবল উদাহরণস্বরূপ। তার অনুসরণে নিজেদের প্রবণতা ও সাধ্য অনুসারে সকলেই নিজের-নিজের মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। ঘটনা যতই অপ্রীতিকর হোক্-না-কেন, আমি কিছু লুকোতে চাই না, রাখ্‌তে ঢাকতে চাই না। সেদিক থেকে এসব উদাহরণ লোকের পক্ষে সত্যই সহায়ক হতে পারে। আমার সকলরকম ভুল-ত্রুটির বিষয়ে আমি পুরোপুরি সব কথা বলতে পারব ব'লে আশা করি। সত্যাগ্রহকে যদি বিজ্ঞান ব'লে ধরা যায়, তাহলে সত্যের অনুসন্ধানে আমি কীরকম অনুশীলন ও গবেষণা করেছি, সেইটুকুই আমার বলার উদ্দেশ্য। আমি যে মানুষটা ভালো, আমি সে কথা বলতে বসিনি। নিজেকে বিচার করতে গিয়ে আমি সত্যের মতো কঠোর হতে চাই। আমি চাই আর সকলেও যেন আমায় কঠোরভাবে বিচার করেন। সেই নিক্তিতে নিজেকে বিচার করতে গিয়ে সুরদাসের মতো আমার বলতে ইচ্ছা হয় :

পাপে রত হীনমতি কী হবে উপায় রে
মন্দভাগ্য মোর মতো কেহ কোথা নাই রে।
জনম লভিনু আমি যাঁহার কৃপায় রে
নিমকহারাম আমি, তাঁরে ছেড়ে যাই রে॥

যাঁকে আমি পিতা ব'লে জানি, আমার জীবনের প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাস যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁর সান্নিধ্য থেকে আমি যে এত দূরে রয়েছি সেই যন্ত্রণায় আমি সর্বক্ষণ কাতর হয়ে থাকি। আমি জানি, আমার মধ্যে যে পাপ আছে, আসক্তি আছে, তাই আমাকে তাঁর কাছ থেকে দূরে রেখেছে। তবু এইসব পাপ ও আসক্তি থেকে আমি মুক্তি পাচ্ছি কই?

আপাতত এখানেই আমার ছেদ টানতে হচ্ছে। এরপর আমার কাহিনীর শুরু।

সবরমতী আশ্রম
১ নভেম্বর ১৯২৫

মো. ক. গান্ধী

প্রথম ভাগ

১. জন্ম ও পিতৃ-পরিচয়

গান্ধীরা জাতে বেনিয়া এবং গোড়ায় হয়তো খুচরো মালের কারবার করতেন। কিন্তু আজ তিনপুরুষ ধ'রে অর্থাৎ আমার পিতামহ থেকে শুরু ক'রে, তাঁরা কাথিয়াওয়াড়ের কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আমার পিতামহ উত্তমচাঁদ গান্ধীকে লোকে সংক্ষেপে উতা গান্ধী ব'লে ডাকত ; নীতি-পালনে নিশ্চয় এঁর খুব নিষ্ঠা ছিল। পোরবন্দর রাজ-দরবারের কানাঘুষো চক্রান্তের ফলে তাঁকে দেওয়ান-পদে ইস্তফা দিয়ে জুনাগড়ে আশ্রয় নিতে হয়। সেখানে গিয়ে তিনি নবাবকে কুর্নিশ করলেন বাঁ হাতে। তাঁর তমিজের অভাব দেখে নবাব-দরবারের একজন পার্শ্বদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন তিনি বাঁ হাতে কুর্নিশ করলেন। জবাবে ওতা গান্ধী না-কি বলেছিলেন, "জানেন না, আমার ডান হাত তো পোরবন্দরের কাছে বাঁধা রেখে এসেছি।"

তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হ'লে ওতা গান্ধী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। প্রথমপক্ষে তাঁর চারটি ও দ্বিতীয়পক্ষে দুটি ছেলের জন্ম হয়। আমার শৈশবে আমি বুঝতেও পারিনি, জানতেও পারিনি, ওতা গান্ধীর এই ছেলেরা সহোদর ভাই নন। এঁদের মধ্যে পঞ্চম ভাই ছিলেন করমচাঁদ গান্ধী, যাকে সবাই কাবা গান্ধী ব'লে ডাকত, এবং ষষ্ঠ বা সর্বকনিষ্ঠের নাম ছিল তুলসীদাস গান্ধী। একের পর এক এই দুই ভাই-ই কালে পোরবন্দরের দেওয়ান হয়েছিলেন। কাবা গান্ধীই আমার পিতা। তিনি রাজস্থানিক সভার সদস্যও ছিলেন। আজকাল এই সংস্থার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু এককালে কাথিয়াওয়াড়ের রাজন্যবর্গ ও তাঁদের জ্ঞাতিকুটুম্বদের ঝগড়াবিবাদ সালিশি-মীমাংসা করার ব্যাপারে এঁর দস্তুরমতো প্রতিপত্তি ছিল। আমার পিতা কিছুকাল রাজকোট এবং বাংকানেড় রাজ্যেও প্রধান আমাত্যের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

পর-পর তাঁর তিনটি স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় কাবা গান্ধী একে-একে চারবার বিবাহ করেছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে তাঁর দুটি কন্যা হয়। চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী পুতলীবাঈয়ের গর্ভে তাঁর একটি কন্যা ও তিন পুত্রের জন্ম হয়। আমি ছিলাম এই ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠ।

আমার বাবা ছিলেন স্বজনহিতৈষী, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক ও সদাশয় মানুষ। কিন্তু তিনি বদমেজাজী এবং হয়তো কিছুটা ইন্দ্রিয়াসক্তও ছিলেন। তার একটা প্রমাণ হ'ল এই যে তিনি যখন চতুর্থবার বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠা পার হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক এবং পরিবারের মধ্যে ও পরিবারের বাইরে, কোনোরকম পক্ষপাতের ঘোরতর বিরোধী ব'লে তাঁর একটা নাম ছিল। যখন যেখানে কাজ করেছেন, রাজভক্তির

জন্য তিনি সুবিদিত ছিলেন। একবার একজন সহকারী পোলিটিক্যাল এজেন্ট রাজকোটের ঠাকুরসাহেবের বিষয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল, বাবা তখন তাঁর প্রভুর সমর্থনে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বয়ং এজেন্ট এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বাবাকে তাঁর সহকারীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। বাবা তাতে রাজি হননি ব'লে এজেন্ট তাঁকে কয়েক ঘণ্টা কয়েদ ক'রে রেখেছিলেন। যখন দেখলেন বাবা তাঁর সঙ্কল্পে অটল, তাঁকে তখন মুক্তি দেওয়া হয়।

ঐশ্বর্য-সঞ্চয়ে বাবার কোনো আগ্রহ ছিল না। তাই তিনি আমাদের জন্য বিষয়-সম্পত্তি বিশেষ-কিছুই রেখে যেতে পারেননি।

ভূয়োদর্শন বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া তাঁর আর কোনো শিক্ষা ছিল না। বড়োজোর তিনি গুজরাতি বিদ্যালয়ে পঞ্চম মান অবধি উঠেছিলেন বলা চলে। ইতিহাস ও ভূগোলে তাঁর কোনো জ্ঞানই ছিল না। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে কাজ-কারবার করার ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তার ভিত্তিতে অনেক সমস্যা তিনি অবলীলায় মিটিয়েছেন, শত-শত লোককে শাসন-নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁর পুথিগত বিদ্যা সামান্যই ছিল। ঘন-ঘন মন্দিরে গিয়ে ধর্মকথা কথকতা ইত্যাদি শোনার ফলে অধিকাংশ হিন্দুদের ধর্ম বিষয়ে যেমন একটা বিচার ও সংস্কার আপনা থেকে গ'ড়ে ওঠে, বাবার বেলা নিশ্চয় তার অন্যথা হয়নি। গান্ধী-পরিবারের বন্ধু একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথায় তিনি শেষ বয়সে *গীতা* পড়তে শুরু করেছিলেন। দৈনিক যখন পূজায় বসতেন, উচ্চকণ্ঠে *গীতা*-র কিছু-কিছু শ্লোক তিনি আবৃত্তি করতেন।

আমার মাকে যখনই মনে করার চেষ্টা করি, যে ছবি আমার চোখের ওপর ভাসে সে হ'ল তাঁর শুচিস্নাত সতীসাধ্বীর মূর্তি। মা ছিলেন গভীরভাবে ধর্মপরায়ণা। পূজা আহ্নিক জপতপ না-ক'রে তিনি কোনোদিন খেতে বসতেন না। হেন দিন ছিল না যখন তিনি পুজো দিতে বিষ্ণুমন্দিরে যাননি। এ ছিল তাঁর নিত্যকৃত্য। যতটুকু মনে প'ড়ে আমি কখনো দেখিনি যে তিনি চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেননি। সবচেয়ে কঠিন ব্রতগুলি তিনি কঠোর নিষ্ঠায়, একটুও ইতস্তত না-ক'রে, পালন করতেন। অসুখ-বিসুখ হ'লেও কোনো শৈথিল্য ঘটতে দিতেন না। মনে পড়ে, একবার চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করার কালে তাঁর অসুখ হয়, কিন্তু তিনি তাঁর ব্রত ভঙ্গ করেননি। একটার পর একটা উপবাস তিনি অবলীলায় পালন করতেন। চাতুর্মাস্যের চার মাস একাহারী হয়ে থাকা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। একবার মনে আছে, তিনি এই চারটা মাস একদিন অন্তর একদিন একবেলা আহার করার ব্রত পালন করেছিলেন। আরেকবার প্রতিজ্ঞা করলেন সূর্যের মুখ না-দেখা পর্যন্ত তিনি আহার গ্রহণ করবেন না। আমরা যারা ছেলেমানুষ ছিলাম, উঠোনে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকতাম। সূর্যের দেখা পাওয়ামাত্র ছুটে গিয়ে মাকে খবর দিতাম। আপনারা নিশ্চয় জানেন অম্বুবাচীর সময় প্রত্যেক সকালে সূর্যের মুখ দেখতে পাওয়া কী শক্ত। কয়েকটা দিনের কথা এখনও মনে প'ড়ে। সূর্যের দেখা পাওয়ামাত্র একছুটে গিয়ে মা-কে তো খবর দিলাম। মা-ও হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন কিন্তু ততক্ষণে সূর্য হয়তো আবার মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। সেদিনটা এবং এমন অনেকদিন মার খাওয়াই হ'ত না। আমাদের প্রবোধ দেবার জন্য বেশ

খুশি-খুশি ভাব ক'রে বলতেন, "তাতে কী হ'ল? আজ ঠাকুরের ইচ্ছে নয় যে আমি খাই।" এই ব'লে তিনি চ'লে যেতেন তাঁর দিনকৃত্য করতে।

মা-র সহজ বুদ্ধি ছিল খুব পরিষ্কার। রাজ্য-শাসনের খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি দস্তুরমতো ওয়াকিফহাল ছিলেন, রাজান্তঃপুরের মহিলারা তাঁর বুদ্ধির খুব তারিফ করতেন। ছেলেবেলায় অনেকসময় আমিও মা-র সঙ্গে-সঙ্গে রাজবাড়ির অন্দরে প্রবেশ করেছি। ঠাকুরসাহেবের বিধবা মায়ের সঙ্গে মা কত কথা আলোচনা করতেন, এখনো সে সব আমার মনে পড়ে।

এইরকম বাপ-মায়ের সন্তানরূপে পোরবন্দরে আমার জন্ম হয় ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর। প্রাচীনকালে এই পোরবন্দরের নাম ছিল সুদামাপুরী। আমার ছেলেবেলা কেটেছে পোরবন্দরে। সেখানকার এক পাঠশালায় আমার হাতেখড়ি হয়েছিল ব'লে মনে পড়ে, আর মনে পড়ে, নামতা শিখতে গিয়ে আমার বেশ কষ্ট হয়েছিল। অন্যসব পড়ুয়াদের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও গুরুমশায়কে গালমন্দ করতে শিখেছিলাম, এছাড়া আমার যে বেশি-কিছু মনে পড়ে না, এ থেকে আমার ধারণা, বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি এ দুটির কোনোটাই ছেলেবেলায় আমার তেমন প্রখর ছিল না।

২. ছেলেবেলা

আমার যখন বছর-সাতেক বয়স, পোরবন্দরের পাট চুকিয়ে দিয়ে, বাবা আমাদের নিয়ে রাজস্থানিক সভার সদস্য হয়ে, রাজকোট চ'লে যান। সেখানে আমি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। সেই বিদ্যালয়ে যেসব শিক্ষকের কাছে আমি পড়েছি, তাদের নামটাম বিবরণ আমার এখনও বেশ মনে আছে। পোরবন্দরে যেমন রাজকোটেও তেমনি, লেখাপড়ার ব্যাপারে আমার এমন কিছু ঘটেনি যা নিয়ে বিশেষ কিছু বলা চলে। ছাত্র হিসেবে আমি নিশ্চয় ছিলাম মাঝারি গোছের—ভালোও না, মন্দও না। এই বিদ্যালয় থেকে আমি চ'লে যাই শহরতলীর আরেক বিদ্যালয়ে। তারপর বারো বছর পার হ'লে পর আমায় হাই স্কুলে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়। যে ক-টা বছর হাই স্কুলে ছিলাম, মনে পড়ে না মাস্টারমশায় কিংবা সহপাঠীদের কাছে কখনও মিথ্যা কথা বলেছি ব'লে। আমি ছিলাম খুব লাজুক প্রকৃতির, মেলামেশায় আমার বিশেষ সঙ্কোচ ছিল। আমার একমাত্র কাজ ছিল বই পড়া ও ক্লাসের পাঠ তৈরি করা। ক্লাস্ শুরু হওয়ার ঘণ্টা পড়তেই হাজিরা দেওয়া এবং ছুটির ঘণ্টা বাজতেই একদৌড়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া—আমার দৈনন্দিন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। একছুটে বাড়ি ফেরার ব্যাপারটা একটুও অতিরঞ্জিত নয়, দেরি করলে পাছে আবার কারও সঙ্গে কথা বলতে হয়—এই নিয়ে আমার যেন একটা আতঙ্ক ছিল। ভয় হ'ত পাছে কেউ আমায় নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করে।

হাই স্কুলে যে বছর আমি সামিল হই, পরীক্ষার সময় এমন একটা ব্যাপার ঘটে, যে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। সে সময়টাতে স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মিস্টার

Giles। বানান পরীক্ষা করার জন্য তিনি আমাদের পাঁচটি শব্দ লিখতে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি শব্দ ছিল Kettle। বানান লিখতে আমি ভুল করেছিলাম। মাস্টারমশায় চেষ্টা করলেন আমার পায়ে তাঁর বুটের আগাটুকু ঠেকিয়ে সতর্ক ক'রে দিতে। আমি তাঁর সঙ্কেত অগ্রাহ্য করলাম। পাশের ছেলেটির শ্লেট্ দেখে আমি ঠিক বানানটুকু টুকে নেব—এই ছিল তাঁর ইঙ্গিত। কিন্তু কিছুতেই এ কথা আমার মাথায় ঢুকল না। আমার ধারণা ছিল, মাস্টারমশায়ের কাজ হ'ল ছেলেরা যাতে না-টোকে, তার তদারকি করা। ফলে হ'ল কী, একা আমি ছাড়া ক্লাসের অন্যসব ছেলে Kettle বানান নির্ভুল লিখল। একা আমিই বোকার মতো ভুল বানান লিখলাম। আমার আসল বোকামি যে কোথায়, ক্লাসের শেষে মাস্টার-মশায় আমায় সে কথা বুঝিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি বুঝতে চাইলে তো। টুক্‌লি করার বিদ্যা আমি কোনোকালে আয়ত্ত করতে পারিনি।

এই ঘটনা সত্ত্বেও মাস্টারমশায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কমেনি। আমার মনের গঠনটাই ছিল এমন যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠদের দোষ-ত্রুটির দিকে নজর দিতাম না। পরে জানতে পেরেছিলাম, ওই মাস্টারমশায়ের মধ্যে আরো অনেক গলদ ছিল, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি হ্রাস পায়নি, কারণ ছেলেবেলা থেকেই এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, জ্যেষ্ঠদের কথা মেনে চলতে হয়, তাঁরা কী করেন না-করেন বিচার বিবেচনা না-ক'রেই।

এইসময়কার আরও দুটি ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সচরাচর পাঠ্য কেতাবের বাইরে আর কোনো বই পড়ায় আমার একটা বিতৃষ্ণা ছিল। প্রতিদিনের বাড়ির পাঠ আমি প্রতিদিন নিয়মিত সেরে ফেলতাম। মাস্টারমশায়দের ফাঁকি দেওয়া যেমন আমার ভালো লাগত না, তেমনি ভালো লাগত না তাঁদের কাছ থেকে শাস্তি পেতে। সুতরাং মন লাগুক্ বা না-লাগুক্ বাড়ির পাঠ আমি নিয়মিত ক'রে যেতাম। হয়তো অমনোযোগের ফলে 'টাস্ক্' করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি থেকে যেত। সে যাই হোক্, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোনো বই আমি পড়ব তখন আমি এ কথা ধারণাও করতে পারিনি। কিন্তু, যেমন ক'রে হোক্ বাবার কেনা একটি বইয়ের প্রতি আমার নজর পড়ে। বইটির নাম ছিল *শ্রবণ পিতৃভক্তি নাটক*। নাটকটি আমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে প'ড়ে ফেলি। এইসময় রাজকোট শহরে একদল ভ্রাম্যমান ছবি দেখানেওয়ালা এসেছিল, একটি ছবি ছিল শ্রবণ কাঁধে ভার বেঁধে, তার অন্ধ মা-বাবাকে ব'য়ে নিয়ে চলেছে তীর্থযাত্রায়। সেই নাটকের বই ও এই ছবিটি আমার মনে গভীর দাগ কাটে। আমি মনে-মনে বলেছিলাম, শ্রবণের আদর্শে নিজেকে গ'ড়ে তুলব। শ্রবণের মৃত্যুতে তার মা-বাবার শোকের উচ্ছ্বাস আমি এখনও ভুলতে পারিনি। সেই শোকগাঁথার করুণ সুর আমায় গভীরভাবে অভিভূত করেছিল ; মনে আছে বাবার দেওয়া একটি মাউথ অর্গ্যানে আমি সেই সুর বাজাতাম।

আরেকটি নাটক নিয়েও আমার অনুরূপ অভিজ্ঞতা ঘটে। ঠিক ওইসময়েই কোনো নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনীত একটি যাত্রা বাবার অনুমতি নিয়ে আমি দেখি। এই হরিশ্চন্দ্রের পালা আমার মন অধিকার ক'রে রেখেছিল অনেকদিন ধ'রে। মনে হ'ত, বারবার দেখলেও আমার

চোখ যেন ক্লান্ত হবে না। কিন্তু যাত্রাগান দেখার ছুটি কি আর ঘন-ঘন মেলে? হরিশ্চন্দ্রের পালায় আমি দিনের পর দিন আবিষ্ট হয়ে থাকতাম। কতদিন যে আমি মনে-মনে হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছি, তার ঠিকঠিকানা নেই। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, নিজের মনকে প্রশ্ন করেছি সবাই কেন হরিশ্চন্দ্রের মতো সত্যানুরাগী হয় না। আমার ধারণা হয়েছিল, হরিশ্চন্দ্র নাটকের গল্প বর্ণে-বর্ণে সত্য। সত্য পথে চলা ও সত্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার আদর্শ আমায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করত। হরিশ্চন্দ্রের কথা ভেবে আমার চোখে জল আসত। সহজ বুদ্ধি থেকে আজ আমি বেশ বুঝতে পারি, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য হতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনেও হরিশ্চন্দ্র ও শ্রবণ আমার কাছে যেন জীবন্ত মানুষ। আমি বেশ বুঝতে পারি, এই বয়সেও যদি আমি ওই দুটি নাটক পড়ি, ঠিক ছেলেবেলার মতো অভিভূত হয়ে পড়ব।

৩. বাল্যবিবাহ

এখন আমি যে বিষয়ের অবতারণা করব, সে সম্বন্ধে কিছু না-বলতে হ'লেই ভালো হ'ত। কিন্তু আমি তো জানি, আমার জীবনকথা বলতে গেলে এরকম অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গ এসে পড়বে, যা নাকি এড়িয়ে যাবার জো নেই। সত্যের পূজারী হয়ে আমি তো সত্য গোপন করতে পারি না। সুতরাং বিশেষ বেদনার সঙ্গে আমায় স্বীকার করতে হচ্ছে, আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর। ওই বয়সের যেসব ছেলেমেয়ে আমার হাতে মানুষ হচ্ছে তাদের যখন আমি ঘুরে বেড়াতে দেখি ও আমার বাল্যবিবাহের কথা মনে করি, তখন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে যেমন করুণা হয়, তেমনি আনন্দ হয় এদের সেই দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করতে হয়নি ব'লে। এরকম অদ্ভুত অল্পবয়সে বিবাহ দেবার আমি কোনো নৈতিক সমর্থন খুঁজে পাই না।

আপনারা যেন ভুলেও না-ভাবেন আমি কেবল বাগ্‌দত্ত হয়েছিলাম, সত্য-সত্যই ওই অল্পবয়সে আমার বিবাহ হয়েছিল। বাগ্‌দান হ'ল পিতামাতার দিক থেকে পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেবার প্রারম্ভিক প্রতিশ্রুতি। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কথা দিয়ে কথা না-রাখতে পারাটা অপরাধ ব'লে গণ্য করা হয় না। বাগ্‌দত্ত ছেলে যদি মারা যায়, তার মৃত্যু মেয়ের পক্ষে বৈধব্যের সূচনা করে না। বোঝাপড়াটুকু মা-বাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, ছেলেমেয়েকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। অনেকসময় বাগ্‌দানের ব্যাপারটা খোলাখুলিভাবে তাদের জানানোও হয় না। পরে শুনেছি না-কি আমার অজান্তে তিন-তিনবার আমি বাগ্‌দত্ত হয়েছিলাম। আমার জন্য নির্বাচিত দুটি মেয়ে পর-পর মারা যায়, তাই থেকেই আমার অনুমান, যে তিনবার আমার বাগ্‌দান হয়। ঝাপ্‌সাভাবে মনে পড়ে, তৃতীয়বার বাগ্‌দান হয় যখন আমার বয়স সাত বছর। কিন্তু এ বিষয়ে আমায় কিছু জানানো হয়েছিল ব'লে মনে

পড়ে না। যাক্, এবার আমার বিবাহের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্—সেসব কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

গোড়াতেই তো বলেছি, আমরা ছিলাম তিন ভাই। বড়দাদার বিবাহ আগেই হয়ে গিয়েছিল। মেজদাদা ছিলেন আমার চেয়ে বছর-দু-তিনের বড়ো ; একজন খুড়তুতো ভাই ছিলেন বয়সে আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়ো। কর্তারা স্থির করলেন যে আমাদের তিনজনেরই একসঙ্গে বিবাহ দেবেন। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা, তাঁরা একটিবারের জন্যও ভেবে দেখেননি। কোথায় তাঁদের সুবিধা, কী করলে খরচপত্রে তাঁদের টান না-পড়ে, এই চিন্তাই তাঁদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছিল।

হিন্দুদের বিবাহ-ব্যাপার তো চারটিখানি কথা নয়। অনেকসময় ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে বাবা-মা সর্বস্বান্ত হয়েছেন ব'লে দেখা গেছে। টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি তো বটেই, সময়েরও দস্তুরমতো অপব্যয় হয়। মাসের পর মাস কেটে যায় কাপড়চোপড় কেনাকাটায়, গয়নাগাটি গড়াতে এবং বিয়ের ভোজের ফিরিস্তি তৈরি করতে। কে কত পদ রাঁধবে, কত-রকম কী পাতে দেবে—এসব নিয়ে পরস্পরে রেষারেষির অন্ত নেই। গানের গলা থাকুক্ বা না-থাকুক্—গলা ফাটিয়ে গান গাইতে গিয়ে মেয়েদের কেবল যে গলা ভাঙে এমন নয়, শরীর-স্বাস্থ্যও ভাঙে এবং প্রতিবেশীদের শান্তিভঙ্গ হয়। এতসব হৈচৈ, হট্টগোল, ভুক্তাবিশিষ্ট জঞ্জালের দুর্গন্ধ—সব-কিছুই প্রতিবেশী বেচারাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হয়, কারণ তারা বেশ জানে যে সময়-সুযোগ এলে তারাও অনুরূপ আচরণ করবে।

কর্তারা ভাবলেন, ছেলেছোকরাদের বিয়ের হ্যাঙ্গাম একসঙ্গে চুকিয়ে দিলে বেশ হয়। খরচা হয় কম কিন্তু আড়ম্বর হয় বেশি। তিন-তিনবার আলাদাভাবে যদি খরচপত্র করতে না-হয়, তাহলে একটি বারের মতো দু-হাতে খরচ করা চলে। বাবা ও কাকা দু-জনেই বুড়ো হয়েছেন। আমরা ছিলাম তাঁদের শেষ বয়সের সন্তান। হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের জীবনের এই শেষ আনন্দ উৎসব তাঁরা বেশ ঘটা ক'রে করবেন। এইসব নানা কথা ভেবে, ঠিক হ'ল যে তিনটি বিয়ে একইসঙ্গে হবে, এবং এর জন্য আয়োজন চলতে লাগল বেশ কয়েকমাস ধ'রে।

এইসব উদ্‌বেগ আয়োজন থেকে আমরা আসন্ন ঘটনার বিষয় জানতে পারি। আমার কাছে বিয়ে মানে ভালো-ভালো কাপড়চোপড, ঢাকঢোল, হট্টগোল, জমকালো মিছিল, আর ভালো-ভালো খাবারদাবার উপরন্তু অচেনা-অজানা একটি মেয়েকে খেলার সঙ্গীরূপে পাওয়া। দেহসম্ভোগের ইচ্ছা এসেছিল পরে। আমার সেই লজ্জার কাহিনী আমি উদ্‌ঘাটন করতে চাই না, তবে আমার সত্যানুসন্ধানের কথার প্রসঙ্গে দু-চারটি ঘটনার উল্লেখ হয়তো করতে হবে। সেসব কথা যথাস্থানে আসবে, কিন্তু এখানে ব'লে রাখা ভালো, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমার আত্মজীবনী রচনায় হাত দিয়েছি, তার সঙ্গে এইসব ঘটনার যোগ যৎসামান্য।

বিবাহের দিন স্থির হয়ে যাবার পর, মেজদা ও আমাকে রাজকোট থেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল পোরবন্দর। এরকম নাটকীয় ব্যাপারের সূচনায় নানারকম হাস্যকর ভূমিকা থাকে যথা গাত্রহরিদ্রা ইত্যাদি। সেসব প্রসঙ্গ বাদ দিলেই ভালো।

আমার বাবা দেওয়ান ছিলেন বটে, কিন্তু দেওয়ানদেরও হুকুমের চাকর হতে হয়, বিশেষত বাবা যখন ছিলেন রাজকোট ঠাকুরসাহেবের একজন প্রিয়পাত্র। ঠাকুরসাহেব তো প্রায় শেষদিন পর্যন্ত বাবাকে রাজকোটে ধ'রে রাখলেন, তারপর যখন ছুটি মঞ্জুর হ'ল তখন রাজকোট থেকে পোরবন্দরের রাস্তাটুকু যাতে দুইদিনে অতিক্রম করা যায় সেইজন্য ঠাকুর-সাহেব ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে ঘোড়ার গাড়ি মোতায়েন রাখতে ব'লে দিলেন। কিন্তু বিধি যদি বাম হন তাহলে মানুষ কী করতে পারে? রাজকোট থেকে পোরবন্দর ১২০ মাইলের রাস্তা, গোরুরগাড়িতে এ রাস্তা পার হতে লাগে নিদেন পাঁচদিন। বাবার যেতে লেগেছিল তিনদিন, কিন্তু তিনদিনের দিন ঘোড়ারগাড়ি উল্‌টে যাওয়ায়, বাবার শরীরের নানা জায়গায় বেশ চোট লাগে। বাবা যখন এসে পৌঁছলেন, সারা দেহে পট্টি বাঁধা। জখম হবার ফলে আসন্ন উৎসবের ব্যাপারে বাবার তো বটেই, আমাদেরও উৎসাহ যেন অনেকখানি ক'মে গেল। কিন্তু তা হ'লে কী হয়, অনুষ্ঠান তো যথানির্দিষ্ট দিনে না-করলেই নয়, বিয়ের দিন তো আর পিছিয়ে দেওয়া যায় না। সে যা-ই হোক্, বিয়ের আনন্দ ও হট্টগোলের মধ্যে বাবার আঘাত পাবার কথাটা কোন্ ফাঁকে যেন ভুলেই গেলাম।

মা-বাবার প্রতি আমার শ্রদ্ধাভক্তি কিছু কম ছিল না, কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের যে আসক্তি থাকে—আমার বেলা তা-ও কিছু কম ছিল না। মা-বাবার একনিষ্ঠ সেবা করতে গেলে সমস্ত সুখ ও আরাম যে বিসর্জন দিতে হয়—এ কথা বুঝতে আমার একটু সময় লেগেছিল। আমার এই ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার বাসনাকে তিরস্কৃত করার জন্যই একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। সে ঘটনার কথা মনে পড়লে এখনও আমার মনে গ্লানি বোধ হয়। সে কথা আমি যথাস্থানে বলব। নিস্কুলানন্দ গেয়েছেন, "মানুষ যতই চেষ্টা করুক্-না-কেন, মন থেকে বাসনা যতক্ষণ-না নির্মূল হয় কেবল বস্তু বা বিষয় পরিহার ক'রে স্থায়ী সুফল ফলতে পারে না।" যখনই আমি এই গান গাই বা শুনি, সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভেবে আমার সমস্ত চিত্ত লজ্জায় ও গ্লানিতে ভ'রে ওঠে।

দৈহিক সমস্ত যন্ত্রণা বাবা অম্লানবদনে সহ্য করলেন ও বিবাহ-উৎসবের যাবতীয় কৃত্যে যোগ দিলেন। সেদিনকার কথা যখন ভাবি, এখনও যেন মনের চোখে দেখতে পাই, বাবা কোথায়-কোথায় ব'সে বিবাহের কোন্-কোন্ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন। তখন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি বালকবয়সে আমার বিবাহ দেবার দরুণ বাবাকে একদিন আমি দোষ দেব। সেদিন যা-যা ঘটেছিল সবই মনে হয়েছিল যেমনটি হওয়া উচিত তা-ই ঘটেছে। মনে-মনে খুব খুশিও হয়েছিলাম, উপরন্তু বিবাহ ব্যাপারে আমার আগ্রহও ছিল বেশ। বাবা সবকিছু এমন সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করলেন যে উৎসবের প্রতিটি ঘটনা এখনও যেন আমার চোখে ভাসছে। বিবাহবেদীতে আমরা কীভাবে বসেছিলাম, কীভাবে সপ্তপদী গমন করলাম, নববিবাহিত দম্পতি হয়ে কেমন আমরা পরস্পরের মুখে মিষ্টান্ন তুলে দিয়েছিলাম, কীভাবে আমাদের মিলিত জীবন শুরু হ'ল প্রথম রাতের বাসরশয্যায়, সেসমস্ত কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। দুটি নিষ্পাপ শিশু সেদিন যেন অপার সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলাম। বাসরঘরে আমায় কী-কী করতে হবে সে বিষয়ে আমার বৌদিদি আমায় দস্তুরমতো তালিম

দিয়ে রেখেছিলেন। আমার স্ত্রীকে কে যে শিখিয়েছিলেন সে আমি জানি না, জানতেও চাই না। এ কথা তো সহজেই অনুমেয় দু-জনে যে দু-জনের মুখের দিকে চাইব তেমন সাহস আমাদের ছিল না। লজ্জায় আমরা দু-জনেই কাঠ। কী ক'রে যে কথা কইব, কী-ই-বা বলার আছে—সুতরাং তালিম নেওয়া সত্ত্বেও আমি খুব বেশি এগুতে পারলাম না। তবে এসব ব্যাপারে খুব যে বেশি তালিমের দরকার হয়, তা নয়। পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারই যথেষ্ট। ধীরে-ধীরে আমাদের মধ্যে ভাব হ'ল, আমরা বেশ সহজে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শুরু করলাম। যদিও আমরা ছিলাম একইবয়সের, দু-দিনে আমি স্বামিত্বের পদাধিকারে প্রভুত্ব করতে লাগলাম।

৪. পতিদেবতা

আমার যখন বিয়ে হয়, নামমাত্র মূল্যে দাম্পত্যপ্রেম, মিতব্যয়িতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি নানা-রকম বিষয় নিয়ে রচিত ছোটো-ছোটো পুস্তিকা বাজারে কেনা যেত। এসব বই দেখলেই আমি আদ্যোপান্ত প'ড়ে ফেলতাম। আমার অভ্যাস ছিল এমন যে, যেসব প্রসঙ্গ আমার মনে ধরত না সেগুলি চট ক'রে মন থেকে মুছে যেত। যা ভালো লাগত আচারে-আচরণে অভ্যাস করতাম। এসব বইয়ে বলা ছিল যে আদর্শ স্বামী আজীবন স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেন। এই কথা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সত্যনিষ্ঠা আমার এমনি স্বভাবগত ছিল যে স্ত্রীকে আমি প্রবঞ্চনা করব—এমন কথা ভাবতেও পারতাম না, আর ওই বালকবয়সে তার কোনো সুযোগও ছিল না।

কিন্তু আমার একনিষ্ঠার অন্য একটা দিকও ছিল। আমি ভাবতাম, একনিষ্ঠা তো একতরফা হতে পারে না, আমি যদি একব্রত হই, আমার স্ত্রীকেও তাহলে একব্রতা হতে হবে। এসব চিন্তার ফলে আমি স্বামী হিসেবে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠলাম। স্ত্রীর পক্ষে যেটা কর্তব্য সেটা যেন আমার সহজাত অধিকারে দাঁড়াল। পতিভক্তি আমি দাবি করতে লাগলাম এবং আমার অধিকার যাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না-হয় সেজন্য তাকে কড়া পাহারায় রাখলাম। স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে আমার কোনো সন্দেহের কারণ ছিল না, কিন্তু ঈর্ষা এমন বস্তু যা যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা রাখে না। তার চলাফেরা গতিবিধি নিয়ে সারাক্ষণ আমার কড়া নজর, সুতরাং ঘরের বাইরে এক পা বেরুতেও তাকে আমার অনুমতি নিতে হ'ত। এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি ও মনকষাকষির সূত্রপাত হ'ল আমাদের দু-জনের মধ্যে। বিধিনিষেধের কারাগারে তাকে যেন বন্দী ক'রে রাখা হ'ল। এত শত বাঁধন মেনে চলবে কস্তুরবাঈ তেমন পাত্রী ছিল না, সে একপ্রকার ইচ্ছা ক'রেই যখন খুশি যেখানে খুশি বেড়াতে বেরুতে লাগল। যতই শক্ত ক'রে তাকে আমি বাঁধতে চেষ্টা করতে লাগলাম, ততই সে যেন বাঁধনছাড়া খেয়ালিপনা করতে লাগল আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার মেজাজও চড়তে লাগল পঞ্চমে। বিবাহিত হ'লে কী হয়, আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করলাম। আমার মনে হয়, এইসব বিধিনিষেধ অমান্য করায়

কস্তুরবার কোনো দোষ ছিল না। নিষ্পাপ সরলা মেয়ে, সে কেমন ক'রে ভাববে যে পূজার মন্দিরে কিংবা বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া তার পক্ষে অন্যায় হবে। আমি যদি তাকে নিয়মের শিকলে বাঁধতে চাই, তাহলে তারও তো অধিকার আছে আমায় সেভাবে বাঁধতে। এসব প্রশ্ন আজ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু তখন তো ছিলাম আমি পতিদেবতা।

আপনারা মনে যেন না-করেন আমাদের বিবাহিত জীবন ছিল নিছক কলহবিবাদের। আমার কঠোর আচরণের ভিত্তি ছিল ভালোবাসা। আমার ইচ্ছা ছিল, আমার স্ত্রীকে যেন আদর্শ স্ত্রীরূপে তৈরি করি। তাকে যেন পবিত্র জীবনযাপনে প্রবৃত্ত করি, সে যেন আমি যা শিখি তাই শেখে, তার জীবনযাত্রা ও ভাবনা-চিন্তায় সে যেন আমার সঙ্গে একাত্ম হয়—এই ছিল আমার উচ্চাশা।

কস্তুরবাঈয়ের মনে এইরকম কোনো বাসনা ছিল কি-না আমি জানি না। সে ছিল নিরক্ষর। তার স্বভাবটাই ছিল সোজা, সহজ। কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা তার ধাতে ছিল না। কাজ একটা ধরলে বেশ তাতে লেগে থাকতে পারত। নারীসুলভ লজ্জাসঙ্কোচ তার যথেষ্ট ছিল—অন্ততপক্ষে আমার সঙ্গে আচরণের বেলা সে যে লেখাপড়া করেনি তাই নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমি যদি বইখাতা নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে ব'সে থাকি তাহলে হয়তো তারও আমার দেখাদেখি বসতে ইচ্ছা হবে--আমার এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হ'ল, অর্থাৎ দেখা গেল আদর্শ স্ত্রী নিয়ে আমি যে উচ্চাশা পোষণ করতাম—সেটা নিতান্তই একতরফা। একটি মেয়েকে কেন্দ্র ক'রে আমি আমার সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বিনিময়ে তার মন আমি সম্পূর্ণভাবে পাব। দেওয়া-নেওয়া না-থাকলেও খুব বেশি মনোবেদনার কারণ ঘটল না কারণ অন্তত একপক্ষে প্রেম ছিল একেবারে খাঁটি।

আমি কস্তুরবাঈকে খুবই যে ভালোবাসতাম সে কথা বলতে আমার বাধা নেই। স্কুলে, ক্লাসে ব'সেও তার কথা মনে পড়ত। রাতের অন্ধকারে সে পা টিপে-টিপে আসছে, শোবার ঘরে তার সঙ্গে দেখা হ'ল—এই চিন্তা সর্বক্ষণ আমার।

কামলিপ্সার বিপর্যয় থেকে আমায় একপ্রকার রক্ষা করেছে, এমন একটি ঘটনার উল্লেখ আমি ইতিপূর্বে করেছি। এই প্রসঙ্গে আরেকটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। বহু ঘটনা থেকে আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি যে যদি কোনো মানুষের অন্তরাশ্রিত উদ্দেশ্য সাধু হয়, নিষ্পাপ হয়, তাহলে শেষপর্যন্ত ভগবান তাকে রক্ষা করেন। হিন্দু সমাজে যেমন বাল্যবিবাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথা রয়েছে, তেমনি এর দোষ-ত্রুটি কাটাবার মতো আরেকটি রেওয়াজ আছে। অল্পবয়স্ক দম্পতিকে তাদের বাবা-মা দীর্ঘকাল ধ'রে একত্রবাসের সুযোগ দেন না। বছরের প্রায় অর্ধেকটা সময় কন্যা থাকে পিতৃগৃহে। আমাদের বেলাতেও তাই ঘটেছিল। প্রথম পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে, অর্থাৎ আমার ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে, আমরা মোটামুটি তিন বছরের বেশি একত্র থাকতে পারিনি। ছ-মাসকাল যেতে-না-যেতে বাপ-মার কাছ থেকে দরবার আসত মেয়েকে তাঁদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার জন্য। বলাবাহুল্য, বাপের বাড়ি ঘন-ঘন যাওয়াটা আমার আদৌ তখন পছন্দ হ'ত না। কিন্তু এটা আমাদের উভয়কে উভয়ের

হাত থেকে রক্ষা করেছে। আঠারো বছর বয়সে আমি বিলেত পাড়ি দিই। তখনকার দীর্ঘ বিচ্ছেদ আমাদের দু-জনের শরীর-স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল। বিলেত থেকে ফেরবার পরেও, আমরা একটানা ছ-মাস একত্র ছিলাম কি-না সন্দেহ। তার কারণ তখন আমায় রাজকোট-বোম্বায়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে হ'ত। তারপর এল দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক—ততদিনে আমি ইন্দ্রিয়লিপ্সা থেকে নিজেকে অনেকটা মুক্ত ক'রে নিতে পেরেছি।

৫. উচ্চ বিদ্যালয়ে

আগেই বলেছি, আমার যখন বিয়ে হয় আমি হাই স্কুলের ছাত্র। আমরা তিন ভাই একই স্কুলে পড়তাম। মেজদা ছিলেন বেশ উঁচু ক্লাসের ছাত্র। আমার চেয়ে বছর পনেরোর বড়ো যে খুড়তুতো ভাই, তিনি আমার চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে ছিলেন। বিয়ের হ্যাঙ্গামে আমাদের দু-জনের একটা বছর মাটি হয়। মেজদার অবস্থা হ'ল আরও সঙ্গীন, তিনি পড়াশুনা একেবারেই ছেড়ে দিলেন। বাল্যবিবাহের ফলে তাঁর মতো আরো কত যে ছেলের অকালে স্কুল ছেড়ে সংসারযাত্রায় যোগ দিতে হয়, সে কথা ভগবানই জানেন। এক কেবল আমাদের এই হিন্দু সমাজে একইসঙ্গে বিবাহ ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা।

আমার লেখাপড়া অব্যাহত থাকল এই কারণে যে হাই স্কুলের মাস্টারমশায়রা মনে করতেন, আমি নিতন্ত মূর্খ নই। তাঁরা সর্বদা আমার প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তখন প্রতিবছর বাবা-মা কি-না অভিভাবকদের কাছে, ছাত্রদের লেখাপড়া ও স্বভাবচরিত্র বিষয়ে রিপোর্ট পাঠানো হ'ত। আমি কখনো খারাপ সার্টিফিকেট পেয়েছি ব'লে মনে পড়ে না। দ্বিতীয় মান থেকে তৃতীয় মানে উত্তীর্ণ হবার সময় আমি প্রাইজও পেয়েছিলাম। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানে থাকাকালীন আমি যথাক্রমে চার টাকা ও দশ টাকার মাসিক বৃত্তি লাভ করি। পরীক্ষায় যে আমি ভালো করেছিলাম, সে আমার কৃতিত্বের জোরে ততটা নয়, যতটা কপালজোরে। কাথিয়াওয়াড়ের সোরাথ অঞ্চলের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদের জন্য এই বিশেষ বৃত্তিগুলি বরাদ্দ ছিল। তখনকার কালে চল্লিশ-পঞ্চাশজনের একটি ক্লাসে সোরাথের ছেলেরা ছিল মুষ্টিমেয়।

যদ্দূর মনে হয়, আমার নিজের কৃতিত্ব বিষয়ে আমার নিজের খুব-একটা উচ্চ ধারণা ছিল না। প্রাইজ ও বৃত্তি যখন পেতাম, আমারই তা খুব আশ্চর্য মনে হ'ত। লেখাপড়ায় ততটা না-হ'লেও, স্বভাবচরিত্র বিষয়ে আমি বিশেষ সাবধানী ছিলাম। সেখানে সামান্যতম খুঁতের কথা কেউ যদি বলতেন তাহলে চোখে আমার জল আসত। স্বভাবচরিত্র নিয়ে শিক্ষকরা কেউ যদি কটূক্তি করতেন, আমার তা দুঃসহ মনে হ'ত। একবার আমি শারীরিক শাস্তি পেয়েছিলাম ব'লে মনে পড়ে। দৈহিক কষ্ট আমার তেমন খারাপ লাগেনি, যতটা খারাপ লেগেছিল, আমি শাস্তির যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়েছিলাম ব'লে। আমি হাউ-হাউ ক'রে কেঁদেছিলাম। এটা যখন ঘটে তখন আমি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় মানের ছাত্র। আমি যখন সপ্তম মানের ছাত্র তখন আরেকবার অনুরূপ ঘটনা ঘটে। সেসময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক

ছিলেন দোরাবজি এদুলজি গিমি। নিয়মশৃঙ্খলায় তাঁর কড়া নজর ছিল, পড়াতেন ভালো, ছেলেরাও তাঁকে ভালোবাসত। উঁচু ক্লাসের ছেলেদের বেলা তিনি ক্রিকেট খেলা ও জিমন্যাস্টিক্ আবশ্যিক ব'লে স্থির ক'রে দিয়েছিলেন। এ দুটির কোনোটাতেই আমার রুচি ছিল না। আবশ্যিক না-হওয়া পর্যন্ত, ব্যায়ামে কিংবা ক্রিকেট-ফুটবল খেলায় আমি কখনো স্বেচ্ছায় যোগ দিতাম না। এই দূরে-দূরে থাকার অন্যতম কারণ ছিল আমার লাজুক স্বভাব। আজ বুঝতে পারি, আমি ভুল করেছিলাম। আমার ধারণা ছিল, বিদ্যাচর্চার সঙ্গে শরীরচর্চার কোনো যোগ নেই। আজ আমি বুঝতে পারি, শিক্ষাব্যবস্থায় মনের বিকাশ ও দেহের বিকাশ দুয়ের প্রতিই সমান নজর দেওয়া উচিত।

ব্যায়াম থেকে বিরত থাকার দরুণ আমার শরীর-স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনো অবনতি যে ঘটেনি, তার কারণ এই ছিল যে রোজ আমি বেশ-খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে বেড়াতাম। বইয়ে পড়েছিলাম, মুক্ত বায়ু সেবন ও নিয়মিত পদচারণা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। কথাটা আমার ভালো লেগেছিল ব'লে আমি প্রত্যহ খানিকটা পায়ে হাঁটা অভ্যাস করেছিলাম, সে অভ্যাস আমি এখনো ত্যাগ করিনি। সেই অভ্যাসের ফলে আমার শরীর-স্বাস্থ্য মোটামুটি বেশ মজবুত ছিল।

আমি যে জিমন্যাস্টিক্ অপছন্দ করতাম তার কারণ ছিল এই যে, বাবাকে সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য আমার গভীর একটা আগ্রহ ছিল। স্কুল শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমি বাড়ি ছুটতাম এই সেবা-যত্নের কাজে হাতে লাগাতে। আবশ্যিক খেলাধুলা বা শরীরচর্চার ব্যবস্থা আমার এ কাজের অন্তরায় হয়েছিল। মিস্টার গিমিকে আমি অনুরোধ জানালাম, আমায় অব্যাহতি দিতে যাতে আমি বাবার কাজ করতে পারি। তিনি রাজি হলেন না। শনিবার দিন আমাদের স্কুল বসত সকালবেলা এবং সকাল-সকাল ছুটি হয়ে যেত। এইরকম এক শনিবার বাড়ি থেকে স্কুলে জিমন্যাস্টিক্ ক্লাসে যোগ দেবার কথা বিকেল চারটেয়। সেদিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। আমার কাছে ঘড়ি ছিল না। আমি স্কুলে পৌঁছবার আগেই দেখি, ছেলেরা সব বাড়ি ফিরে গেছে। পরদিন রোল্ কল্-এর পাতায় আমার নামে অনুপস্থিতি চিহ্ন দেখে, মিস্টার গিমি আমায় ডেকে পাঠিয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি যথাযথ কী ঘটেছিল তাঁকে জানালাম। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না এবং আমার নামে এক আনা কি দু-আনা ফাইন ধার্য করলেন।

আমি মিথ্যা বলেছি, এজন্য আমার শাস্তি হ'ল—এ কথা ভাবতেও আমি মনে-মনে গভীর বেদনা অনুভব করলাম। আমি যে নির্দোষ সে কথা কী ক'রে প্রমাণ করব? কোনো পথ যখন খুঁজে পেলাম না, কেঁদে বুক ভাসালাম। বুঝলাম, সত্যনিষ্ঠ মানুষকে সকল বিষয়ে তটস্থ ও অবহিত থাকতে হয়। স্কুলে থাকতে এই একটি ঘটনা ছিল আমার অনবধানতার প্রথম ও শেষ পরিচয়। অস্পষ্টভাবে আমার এখন মনে পড়ে যে, শেষপর্যন্ত ওই ফাইন দেবার দণ্ড আমি মকুব করাতে পেরেছিলাম। আবশ্যিক ব্যায়ামের ক্লাস থেকে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া গেল কারণ বাবা স্বয়ং হেডমাস্টারমশায়কে লিখে জানালেন যে, স্কুল ছুটির পর তিনি আমায় বাড়ির কাজ করার জন্য বাড়িতেই রাখতে চান।

শরীরচর্চায় আমি মনঃসংযোগ করিনি ব'লে আমার খুব-একটা ক্ষতি হয়নি সত্য, কিন্তু অন্য এক অবহেলার মূল্য আমায় আজও দিতে হচ্ছে। মনে পড়ে না কী ক'রে আমার মাথায় এল যে ভালো হাতের লেখা সুশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হতে পারে না। বিলেত যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে ছিল। পরে যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাই, দেখতে পাই, যে সে দেশে যারা জন্মেছে, শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছে, সেইসব লোকদের (বিশেষত আমার সমব্যবসায়ী উকিলদের) হাতের লেখা একেবারে মুক্তোর মতো। দেখে অমার লজ্জা হ'ত ও হাতের লেখা অবহেলা করেছি ব'লে অনুতাপ হ'ত। বুঝেছিলাম, হাতের লেখা খারাপ হওয়া মানে শিক্ষার ত্রুটি। অবশ্য আমি চেষ্টা করেছি আমার হাতের লেখা শোধরাতে, কিন্তু অতদিন বাদে অনেককালের বদ্ অভ্যাস শোধরানো খুব শক্ত। আমার দুরবস্থা দেখে ছেলেমেয়েরা যেন সাবধান হয়, যেন তারা বুঝতে শেখে যে ভালো হাতের লেখা সুশিক্ষার একটি অঙ্গ-বিশেষ। এখন আমার মনে হয়, লিখতে শেখার আগে প্রত্যেক শিশুকে ড্রয়িং শেখানো উচিত। ফুল, পাখি প্রভৃতি চোখে-দেখা জিনিস আঁকার অভ্যাস আয়ত্ত করার পর, শিশু যদি অক্ষর আঁকতে চেষ্টা করে ও অক্ষর আঁকার ভিত্তিতে হাতের লেখা শেখে, তাহলে তার হাতের লেখা সুন্দর হবে, সুঠাম হবে।

আমার স্কুল-জীবনের আরো দুটি ঘটনার স্মৃতিকথা এখানে ব'লে রাখা দরকার। আগেই বলেছি, বিয়ের জন্য আমার একটা বছর মাটি হয়েছিল। মাস্টারমশায় আমার এই ক্ষতি পূরণ করতে চাইলেন আমায় ডবল প্রমোশন দিয়ে। পড়াশুনায় যারা ভালো, যারা অধ্যবসায়ী, কেবল তাদেরকেই ডবল প্রমোশন দেওয়া হ'ত। তৃতীয় মানে ছ-মাস থেকে, পরীক্ষার পর আমায় চতুর্থ মানে উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তার ঠিক পরেই গরমের ছুটি। চতুর্থ মান থেকে অধিকাংশ বিষয়ে শিক্ষার বাহন হ'ল ইংরেজি। আমি যেন অথৈ জলে পড়লাম। চতুর্থ মানে আমাদের জ্যামিতি শিক্ষা শুরু হ'ল। একে নতুন বিষয় তায় ইংরেজি মাধ্যম—জ্যামিতি বুঝতে আমায় প্রথম-প্রথম বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। পড়াতেন যিনি, খুবই ভালো পড়াতেন, কিন্তু আমার মাথায় কিছুতে ঢুকত না। প্রায়ই হতাশ হয়ে আমি ভাবতাম, ডবল প্রমোশন নেওয়া ভুল হয়েছে, দু-বছরের পড়া একবছরে সারা যায় না, তৃতীয় মানে ফিরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু তাতে কেবল আমার মাথা যে হেঁট হবে তা নয়, আমার মাস্টারমশায়েরও। আমার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রতি আস্থা রেখে তিনিই তো সুপারিশ করেছিলেন, আমায় ডবল প্রমোশন দিতে। নিচে নেমে যাওয়া আমাদের দু-জনের পক্ষে লজ্জাকর হবে, এই কথা মনে রেখে আমি অটল রইলাম। প্রথমে খুব-খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পর, ইউক্লিড্-এর তেরো নম্বর প্রতিপাদ্যে পৌঁছবার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম যে আসলে জ্যামিতি বিষয়টা বুঝতে খুবই সোজা। নিছক বিচার ও যুক্তি-নির্ভর যে বিষয়, তা শক্ত হবে কেন? তখন থেকে জ্যামিতি বুঝতে বা শিখতে আমার সোজা মনে হয়েছে, ভালোও লেগেছে।

জ্যামিতির তুলনায় সংস্কৃত শেখা আমার কঠিনতর লেগেছিল। জ্যামিতির একটা সুবিধা যে সেখানে মুখস্ত করার দরকার হয় না। সংস্কৃতর বেলা আমার ধারণা হয়েছিল যে সব-

কিছু মুখস্ত করা দরকার। জ্যামিতির মতো সংস্কৃত পড়ার শুরু হ'ত চতুর্থ মান থেকে। ষষ্ঠ মানে ওঠার পর আমার ধারণা হ'ল, সংস্কৃত শেখা আমার কর্ম নয়। সংস্কৃতর মাস্টারমশায়ও ছিলেন বেশ কড়া, ছাত্রদের তিনি দস্তুরমতো খাটিয়ে নিতেন। সংস্কৃতের পণ্ডিত ও ফার্সি মৌলবির মধ্যে একটা যেন রেষারেষির ভাব ছিল। ছাত্র-শাসন ব্যাপারে মৌলবি ছিলেন ঢিলেঢালা। ছাত্রেরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করত ফার্সি শেখা বেশ সোজা আর মৌলবি মানুষ ভালো, ছাত্রদের প্রতি মায়া-দয়া রাখেন। লোভে প'ড়ে আমি একদিন ফার্সি ক্লাসে ব'সেও ছিলাম, পণ্ডিতমশায় তাতে বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হন। একদিন তিনি আমায় তাঁর কাছে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, "তুমি যে বৈষ্ণববংশের ছেলে, সে কথা কি ভুলে গেলে? নিজের ধর্মের যে ভাষা, তা তুমি শিখবে না? যদি কোথাও শক্ত লাগে, আমার কাছে এলেই তো পারো, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে তোমরা ভালো ক'রে সংস্কৃত শিখতে পারো। যত এগিয়ে যাবে, ততই শেখার আগ্রহ বাড়বে। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিও না। আবার এসে সংস্কৃত ক্লাসে যোগ দাও।"

তাঁর এই মিষ্ট ভর্ৎসনায় ভারি লজ্জা পেলাম। আমি তাঁর সেই সস্নেহ অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম। আজ কৃষ্ণশঙ্কর পাণ্ড্যর কথা আমি যখন ভাবি, আমার মন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভ'রে ওঠে। তখন সংস্কৃতে যৎসামান্য জ্ঞান যদি না-অর্জন করতাম, তাহলে আজকের দিনে আমাদের ধর্মগ্রন্থে আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ জন্মাত না। সত্য বলতে কী, আমি যে তখন আরো অনেক ভালো ক'রে সংস্কৃত শিখে উঠতে পারিনি, সে কথা ভাবলে আমার গভীর অনুতাপ হয়। পরে আমি যেন বুঝতে পেরেছি, প্রত্যেক হিন্দু ছেলেমেয়ের উচিত ভালো ক'রে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করা।

আমার এখনকার মত হ'ল এই যে ভারতে উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে সর্বত্র মাতৃভাষা ছাড়াও হিন্দি, সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি ও ইংরেজি শেখানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই লম্বা তালিকা দেখে কেউ না-যেন ঘাবড়ে যান। শিক্ষাব্যবস্থা যদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়, যদি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার বোঝা থেকে ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হয়, এইসব ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারটা নিছক শুষ্ক কর্তব্যে পর্যবসিত হবে না, বরঞ্চ আনন্দের কারণ হবে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে একটা ভাষা যদি আয়ত্ত করা যায়, তাহ'লে অন্য ভাষা শিক্ষায় বেগ পেতে হয় না।

সত্য কথা বলতে কী, হিন্দি, গুজরাতি ও সংস্কৃত—এই তিন ভাষাকে একটি ভাষার অন্তর্গত ব'লে ধরা যায়। ফার্সি ও আরবির বেলাতেও একই কথা বলা চলে। যদিচ ফার্সিকে আর্যগোষ্ঠির অন্তর্গত বলা হয় এবং আরবিকে সেমিটিক গোষ্ঠির—এই দুইয়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ, কারণ উভয় ভাষাই দাবি করে যে ইস্‌লামের অভ্যুদয় হবার ফলে ফার্সি ও আরবি ভাষার পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। উর্দুকে আমি পৃথক্ ভাষা ব'লে মনে করি না, কারণ হিন্দি ব্যাকরণের ওপর এর ভিত্তি এবং এর শব্দসম্ভার মূলত এসেছে ফার্সি ও আরবি থেকে। যিনি ভালো উর্দু শিখতে চান তাঁকে যেমন ফার্সি ও আরবি শিখতে হবে, তেমনি যিনি ভালো গুজরাতি, হিন্দি, বাংলা কিংবা মারাঠি শিখতে চান তাঁকে শিখতে হবে সংস্কৃত।

৬. একটি শোচনীয় অধ্যায় ১

হাই স্কুলে থাকতে আমার বন্ধু বলতে বিশেষ কেউ ছিল না, তবে বিভিন্ন সময়ে দু-জন ছাত্রের সঙ্গে আমার কিছু অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত হয়। এদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার বন্ধুতা অল্পকালের মধ্যে ঘুচে যায়—যদিচ তার জন্য আমি ঠিক দায়ী নই। অন্যজনের সঙ্গে আমার বন্ধুতা হবার ফলে, সেই আমায় ছেড়ে চ'লে যায়। এই দ্বিতীয়জনের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হওয়া, আমার জীবনের একটি শোচনীয় অধ্যায় ব'লে আমি মনে করি। এই বন্ধুতা দীর্ঘকাল ধ'রে টিকেছিল। এই বন্ধুতার সূত্রপাত হয়েছিল সংস্কারের ইচ্ছা থেকে।

আমার এই সঙ্গীটি গোড়াতে ছিল আমার দাদার বন্ধু ও সহপাঠী। তার দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা নিয়ে আমি ওয়াকিফহাল ছিলাম, কিন্তু আমার ধারণা ছিল, সে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু। আমার মা, বড়োদাদা ও আমার স্ত্রী এর সংসর্গ পরিহার করার জন্য আমায় সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। স্বামী-সুলভ দাম্ভিকতায় আমার স্ত্রীর উপদেশ আমি ধর্তব্য ব'লে মনে করিনি। কিন্তু বড়োদাদা ও মায়ের মতামত উপেক্ষা করব, ততটা সাহস আমার ছিল না। আমি বন্ধুর হয়ে ওকালতি করার চেষ্টায় তাঁদের বোঝালাম, "তোমরা ওর দোষ-ত্রুটির কথা যা বলছ তা হয়তো সত্যি, কিন্তু ওর মধ্যে ভালো গুণও কিছু আছে যার বিষয়ে তোমরা হয়তো কিছু জানো না। আমি যে ওর সঙ্গে থাকি সে কেবল ওকে শোধরাবার জন্য, সুতরাং ও কী ক'রে আমার বিপথে নিয়ে যাবে? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ও যদি শোধরায়, তাহলে চমৎকার মানুষ হবে। দোহাই তোমাদের, আমি উচ্ছন্নে যাব মনে ক'রে তোমরা মিথ্যে ভয় পেয়ো না।"

আমার সাফাই শুনে তাঁরা যে খুব নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তেমন মনে হয় না। তবে আমার কথা তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন এবং আমাদের বন্ধুতার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করেননি।

এখন আমি বুঝেছি, আমার হিসেবে ভুল হয়েছিল। সংস্কারক যাকে সংস্কার করতে চান তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ না-হ'লেই ভালো। সত্যকার যিনি বন্ধু, তাঁকে বন্ধুর সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হতে হয়। এরকম একাত্মতা সচরাচর চোখে পড়ে না। যাদের স্বভাব ও মনের গঠন একইধরনের, তাদের সৌহার্দ স্থায়ী হয় ও সুফলপ্রসূ হয়। দু-জন বন্ধু, একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরকম অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ যেখানে, একে অন্যের সংস্কারসাধন করবে—তেমন সম্ভাবনা সুদূর। আমার মতে দু-জনের একান্ত অন্তরঙ্গতা সকল ক্ষেত্রেই পরিহার করা উচিত, কারণ মানুষ অন্যপক্ষের ভালোটুকু যতটা-না নিতে পারে, মন্দটা নেয় তার চেয়ে অনেক বেশি। আর, কেউ যদি ভগবানের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করতে বাসনা করে, তাহলে হয় তাকে একা থাকতে হয় নতুবা সকলের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। আমার এ ধারণা ভুল হ'লেও হতে পারে। তবে আমার নিজের ক্ষেত্রে দেখেছি যে, কোনো-একজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুতা করতে যখনই গিয়েছি, আমার হার হয়েছে।

সেই বন্ধুটির সঙ্গে আমার যোগাযোগের সূত্রপাত যখন হয়, সেই যুগে রাজকোটে একটা সংস্কারের ঢেউ এসেছিল। বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পেলাম, আমাদের শিক্ষকেরা অনেকেই

না-কি লুকিয়ে মদ-মাংস খান। রাজকোটের অনেক সম্ভ্রান্ত লোকই এরকম ক'রে থাকেন এবং তাদের দলে না-কি কেউ-কেউ আছেন যারা হাই স্কুলের ছাত্র।

কথাটা শুনে আমি যেমন অবাক্ হলাম তেমন আমার দুঃখও হ'ল। বন্ধুর কাছে যখন আমি জানতে চাইলাম, কেন তারা এরকম ক'রে থাকে, সে আমায় বোঝায় : "জাতি হিসাবে গুজরাতিরা এত কমজোর কেন জানো? আমরা নিরামিষাশী ব'লে। ইংরেজরা আমাদের ওপর প্রভুত্ব করে গায়ের জোরে, কারণ তারা মাংস খায়। দেখেছো তো আমার গায়ে কত জোর, আমি কেমন জোরসে ছুটতে পারি। কেন জানো? আমরা মাংস খাই ব'লে। যারা আমিষ খায় তাদের ফোড়া-পাঁচড়া হয় না, আর হ'লেও ঝট্ ক'রে সেরে যায়। আমাদের যেসব মাস্টার ও শহরের অন্যসব নামজাদা লোক মাংস খান, তাঁরা সবাই বুদ্ধি-বিবেচনা রাখেন, তাঁরা জানেন, আমিষের কত গুণ। তোমারও উচিত মাংস খাওয়া। চেষ্টা ক'রে দেখতে তো দোষ নেই। একবার খেয়ে দেখলে বুঝবে তাকত বাড়ে কি-না।"

মাংস খাওয়ার গুণাগুণ বিষয়ে এতসব কথা সে যে একটিমাত্র আলোচনার বৈঠকে এক নিশ্বাসে বলেছিল, তা নয়। অল্পে-অল্পে, দীর্ঘকাল ধ'রে, সে যেসব যুক্তি-তর্কের সাহায্যে, আমিষ খাওয়ার সপক্ষে আমার মন অনুকূল করার চেষ্টা করেছিল, এ হ'ল তারই সারমর্ম। দাদার ইতিপূর্বেই পতন হয়ে গেছে, সুতরাং সে বন্ধুর কথায় বেশ সায় দিল। দাদা ও আমাদের এই বন্ধুর তুলনায় আমার দৈহিক স্বাস্থ্য যে ক্ষীণ ছিল, সে কথা মানতেই হবে। ওরা দু-জনই ছিল কষ্টসহিষ্ণু, বলিষ্ঠ ও সাহসী। বন্ধুর শারীরিক কৃতিত্ব আমার মনের ওপর যেন জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করল। সে লম্বা পাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতায় অসম্ভব বেগে ছুটতে পারত। হাই জাম্প্ ও লং জাম্প্-এ দস্তুরমতো পারদর্শী ছিল। শারীরিক শাস্তি সহ্য করায় তার আর জুড়ি ছিল না। এইসব দৌড়ঝাঁপের ব্যাপারে তার কুশলতা দেখিয়ে সে মাঝে-মাঝে আমায় হক্‌চকিয়ে দিত। নিজের মধ্যে বাঞ্ছিত গুণের অভাব থাকলে ও অন্য লোকের মধ্যে তার প্রাচুর্য দেখলে মানুষ অবাক্ না-হয়ে পারে না। বন্ধুর কুশলতা দেখে আমারও তাই আশ্চর্য লাগত। ক্রমে আগ্রহ হ'ল তাকে অনুকরণ করার। দৌড়ঝাঁপ আমার ঠিক আসত না, তবু আমার মনে হ'ত, কেন আমার গায়ের জোর ওর মতো হবে না?

তাছাড়া আমি ছিলাম ভীরু প্রকৃতির। চোর, ভূতপ্রেত ও সাপের ভয়ে আমি সারাক্ষণ তটস্থ থাকতাম। রাতে ঘরের বাইরে বেরুব, আমার এমন সাহস ছিল না। রাতের অন্ধকার ছিল আমার আতঙ্কের বিষয়। অন্ধকারে শুয়ে থাকা আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কল্পনায় অনুমান করতাম, এদিক ওদিক চারদিক থেকে যেন ভূত প্রেত চোর সাপ আমায় ঘিরে রয়েছে। শোবার ঘরে বাতি জ্বালিয়ে না-রাখলে আমার চোখে ঘুম আসত না। আমার স্ত্রী তো নাবালিকা ছিলেন না, কৈশোর তিনি তখন অতিক্রম করেছেন। পুরুষ মানুষ হয়ে নিদ্রিতা স্ত্রীকে জাগিয়ে কী ক'রে আমার ভয়ের কথা বলি? আমার চেয়ে তিনি যে সাহসী ছিলেন বেশি, সে কথা আমি জানতাম আর জানতাম ব'লেই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যেত। তাঁর সাপের ভয়, ভূতের ভয় ছিল না। অন্ধকারে তিনি যত্রতত্র চ'লে যেতে পারতেন। বন্ধু আমার এই ভীরু স্বভাবের কথা জানত। খালি হাতে সাপ নিয়ে সে খেলাতে

পারে, চোরকে সে তোয়াক্কা করে না, ভূতপ্রেতে তার বিশ্বাস নেই—এইসব কথা সে আমায় শোনাত, আর অবশ্য বলত এ সমস্তই হ'ল মাংস খাওয়ার ফলে।

তখন প্রত্যেক স্কুলে গুজরাতি কবি নর্মদের একটি ছড়া মুখে-মুখে ঘুরত :

মাংস খেয়ে শক্তিমান্
দেখো ইংরেজ সাজোয়ান।
শাসন করে হিন্দুস্তান
ছোট্টখাট্টো ইন্ডিয়ান।

এসমস্তর প্রভাব থেকে আমি মুক্তি পাব কী ক'রে? আমার হার হ'ল। আমি মনে-মনে বিশ্বাস করতে লাগলাম যে মাংস খাওয়া ভালো, মাংস খেলে আমার শক্তি হবে সাহস হবে, এবং তামাম হিন্দুস্তান যদি আমিষাশী হয়, তাহলেই এ দেশ থেকে ইংরেজ হটানো সম্ভবপর হবে।

পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য একটা দিন স্থির করা হ'ল। অবশ্য সব-কিছু গোপনে করতে হবে। গান্ধী-পরিবার বংশগতভাবে বৈষ্ণব। আমার মা-বাবা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। নিত্য তাঁরা মন্দিরে পূজা অর্চনা করতে যেতেন। বাড়িতেও বিগ্রহ ছিল। গুজরাটে সেকালে জৈন ধর্মের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। আমিষ আহার বিষয়ে কেবল যে বিরোধিতা ছিল এমন নয়, রীতিমতো একটা জুগুপ্সা ছিল। গুজরাটের জৈন ও বৈষ্ণবদের মধ্যে এরকম মনোভাব যতটা প্রবল ছিল তেমনটা ভারতের অন্যত্র কোথাও ছিল না। এই নিরামিষ ঐতিহ্যের মধ্যে আমার জন্ম ও সংস্কার, এই আবহাওয়াতেই আমি মানুষ। তাছাড়া মা-বাবাকে আমি খুবই মান্য ও ভক্তি করতাম। আমি জানতাম যে আমি মাংস খেয়েছি শুনলেই তদ্দণ্ডে শোকের আঘাতে তাঁরা প্রাণত্যাগ পর্যন্ত করতে পারেন। বললে হয়তো আশ্চর্য শোনাবে, কিন্তু ব্যাপারটা গোপন রাখার অন্যতম কারণ ছিল আমার সত্যনিষ্ঠা। সূচনাতেই আমি সাবধান ছিলাম যেন এই প্রসঙ্গ না-ওঠে। মা-বাবাকে না-জানিয়ে মাংস খাওয়াটা একপ্রকার তঞ্চকতা হবে—সে কথা আমি যে না-জানতাম, তা নয়। কিন্তু সংস্কারের নেশা তখন আমায় পেয়ে বসেছে। রসনাতৃপ্তির কোনো প্রসঙ্গ ছিল না। আমি জানতাম না মাংসের স্বাদ উৎকৃষ্ট হবে। আমি চেয়েছিলাম বীর হতে, সাহসী হতে ; আমি চেয়েছিলাম আমার দেশবাসীও যেন বীর ও সাহসী হয় যাতে ক'রে আমরা ইংরেজকে হারিয়ে দিয়ে ভারত স্বাধীন করতে পারি। 'স্বরাজ' কথাটার তখনো প্রচলন হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়, সে আমি জানতাম। সংস্কারের মোহ আমার বুদ্ধি-বিচার আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল। গোপন রাখার ব্যাপারটা স্থিরনিশ্চিত হ'লে পর, আমি এই ব'লে মনকে বোঝালাম যে মা-বাবার কাছ থেকে ব্যাপারটা গোপন রাখলে তাতে ক'রে সত্যের অপলাপ করা হবে না।

৭. একটি শোচনীয় অধ্যায় ২

পরীক্ষার দিন এল। সেদিন আমার মনের ঠিক অবস্থার কথাটা সহজে বোঝানো যাবে না। সংস্কারক হবার আগ্রহ তো ছিলই, সেইসঙ্গে ছিল জীবনের অভ্যস্ত গণ্ডী থেকে বেরিয়ে পড়ার একটা অদ্ভুত অভিনবত্ব। অপরপক্ষে ছিল এমন একটা গুরুতর কাজ চোরের মতো লুকিয়ে করার গ্লানি। এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্যে কোন্‌টি আমার মনের ভাবনাকে বেশি ক'রে দুলিয়েছিল, সে আমি বলতে পারব না। নদীর ধারে একটি নিভৃত জায়গা আমরা খুঁজে বের করলাম। আমার জীবনে সেই প্রথম দেখলাম—মাংস। সেইসঙ্গে পাউরুটিও ছিল। দুটোর কোনোটাই আমি উপভোগ করিনি। পাঁঠার মাংস ছিল একেবারে চামড়ার মতো শক্ত—কিছুতেই আমার গলা দিয়ে গলল না। বমি হবার ফলে আমি আর খেতেও পারলাম না।

সে রাতটা আমার যে কী বিশ্রী কেটেছিল, কী বলব। দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে বার-বার আমার ঘুম ভেঙে গেল। যতবার ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, মনে হয় একটা যেন আস্ত পাঁঠা আমার পেটের ভিতর কাতরভাবে কাঁদছে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম ছুটে গেল, আমি বিছানা ছেড়ে উঠে বসলাম, অনুতাপের আগুনে মন যেন পুড়ে যেতে লাগল। পরমুহূর্তে আমার মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিলাম যে মাংসাহার কর্তব্যকর্ম এবং কর্তব্য করতে দিয়ে অনুশোচনা করাটা কোনো কাজের কথা নয়।

আমার বন্ধু আমায় অত সহজে রেহাই দেবার পাত্র ছিল না। সে তখন মাংস দিয়ে নানারকম উপাদেয় ও মুখরোচক খাবার তৈরি করিয়ে, সুন্দরভাবে সাজিয়ে আমার সামনে ধরতে শুরু করল। নদীর ধারের সেই নিভৃত জায়গার বদলে এখন খাবার ব্যবস্থা হ'ল কোনো একজন নবাবের রাজকোট-স্থিত অতিথিশালার খানা-কামরায়, টেবিল চেয়ার প্রভৃতি পেতে। সেখানকার খাস বাবুর্চির সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে বন্ধু এইরকম ব্যবস্থা করেছিল।

তার এই লোভনীয় টোপ ফেলা বিফলে গেল না। পাউরুটির প্রতি আমার বিরাগ অন্তর্হিত হ'ল. বেচারা পাঁঠার বিষয়ে মায়া-মমতার বালাই আর রইল না। মাংসে ততটা রুচি না-থাকলেও মাংসের তৈরি নানাবিধ খাবারে আমার বেশ রুচিও হ'ল। এরকম চলল প্রায় বছরখানেক ধ'রে। কিন্তু ওইসময়ের মধ্যে পাঁচ-ছটার বেশি ভোজ হয়নি। তার প্রথম কারণ হ'ল এই যে নবাবের অতিথিশালা তো নিত্য খালি পাওয়া যেত না, দ্বিতীয়ত মুখরোচক মাংসের খাবার তৈরি করা তো বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এইসব সংস্কারের কাজে আমার যতটা উৎসাহ ছিল সেই তুলনায় অর্থসঙ্গতি কিছুই ছিল না। প্রতিবারই তাই বন্ধুকেই টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করতে হ'ত। কোথা থেকে সে যে জোগাড় করত তা আমি জানতামই না। কিন্তু জোগাড় করত ঠিকই, কারণ আমায় আমিষাশী করবার জন্য সে যেন কোমর বেঁধে লেগেছিল। টাকা-পয়সা জোগাড় করা তার পক্ষেও সুসাধ্য ছিল না নিশ্চয়, সেজন্য ভোজের ব্যবস্থা হ'ত কালেভদ্রে।

এইসব গোপন ভোজের ব্যাপার যে-যে দিন থাকত, রাত্রে বাড়ি ফিরে আবার খেতে

বসা কিছুতেই সম্ভবপর হ'ত না। মা খেতে ডাকতেন এবং খেতে না-চাইলে কারণ জিজ্ঞাসা করতেন। আমি মাকে ব'লে দিতাম : 'আজ আমার খিদে নেই' কিংবা 'আজ আমার পেট খারাপ।' এসব অজুহাত বানাতে গিয়ে আমার বিবেকে যে না-বাধত, তা নয়। আমি ঠিকই জানতাম এসব আমার বানানো কথা, মিথ্যে কথা এবং তা-ও মাকে ফাঁকি দেবার জন্য। এটাও আমার জানা ছিল যে আমি মাংস খাওয়া ধরেছি জানলে পর মা-বাবা মর্মান্তিক আঘাত পাবেন। এইসব চিন্তা আমাকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল।

তখন আমি মনে-মনে স্থির করলাম, "মাংস খাওয়া বিশেষ দরকার। ভারতীয়দের আহার্য ব্যাপারে সংস্কার ও পরিবর্তন-সাধন ততোধিক দরকার। এ কথা সত্য হ'লেও, মা-বাবার সঙ্গে মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনা, মাংস খাওয়ার চেয়েও অন্যায়। সুতরাং মা-বাবার জীবনকালে মাংস খাওয়ার কোনো প্রসঙ্গই হতে পারে না। তাঁরা যখন থাকবেন না এবং আমার জীবন আমার নিজের মতানুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে পারব, তখন আমি প্রকাশ্যভাবে মাংস খাব। কিন্তু সেদিন না-আসা পর্যন্ত আমি মাংস থেকে বিরত থাকব।"

আমার এই সঙ্কল্পের কথা আমি বন্ধুকে জানিয়ে দিলাম। তারপর থেকে আমি কখনও মাংস ছুঁইনি। মা-বাবা জানতেও পারেননি, তাঁদের দুই ছেলে এককালে আমিষাশী হয়েছিল।

মা-বাবার সঙ্গে মিথ্যাচরণ করব না এইরকম শুদ্ধভাবনা থেকে আমি মাংস খাওয়া ছেড়েছিলাম সত্য, কিন্তু বন্ধুর সঙ্গ আমি ছেড়ে দিইনি। তাকে শোধরাবার উৎসাহে আমি যে প্রায় সর্বনাশের কিনারায় এসে পৌঁছেছিলাম—এটা আমি তখন একটুও বুঝতে পারিনি।

আমার এই বন্ধুটিই পারলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের পাপে আমায় লিপ্ত করত। আমি বলতে গেলে একচুলের জন্য রক্ষা পেয়েছিলাম। বন্ধুটি একবার আমায় গণিকালয়ে নিয়ে গিয়েছিল, ও নানারকম উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে আমায় একটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সব ব্যবস্থা আগের থেকে ঠিক ক'রে রাখা হয়েছিল। টাকা-পয়সার লেনদেন আগেই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাপের গহ্বরে প্রবেশ ক'রেও আমি যে আমার নিজের মোহ থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম—ভগবৎ-কৃপা ছাড়া এটা সম্ভবপর হ'ত না। আমি স্ত্রীলোকটির বিছানায় তার একপাশে বসেছিলাম, কিন্তু আমার যেন বাক্‌রোধ হয়েছিল। স্ত্রীলোকটি যে ধৈর্য হারিয়ে তন্মহূর্তে অকথ্য গালাগাল দিতে-দিতে আমায় ঘর থেকে বের ক'রে দেয়—এতে কিছু আশ্চর্য হবার নেই। সেইসময় আমার মনে হয়েছিল, আমার পৌরুষ লাঞ্ছিত হ'ল। মনে-মনে বলেছিলাম, "ধরণী দ্বিধা হও।" কিন্তু পরবর্তীকালে বারবার ভগবানকে প্রণাম জানিয়েছি যে তিনি আমায় চরম সর্বনাশ থেকে রক্ষা করেছেন। আমার জীবনে এইরকম ঘটনা ঘটেছিল চারবার, প্রত্যেকবারই আমি যে রক্ষা পেয়েছি সে আমার নিজের চেষ্টায় যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ভগবানের করুণা ও আমার সৌভাগ্যের ফলে। নীতির কঠোর বিচারে প্রত্যেকবারই আমার স্খলন হয়েছে—এ কথা মানতেই হবে, কারণ কামলিপ্সা ও দেহসম্ভোগ, এ দুয়ের মধ্যে সত্যকার প্রভেদ নেই। কিন্তু মামুলি বিচারে পাপের চিন্তা থেকে পাপকর্মকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় : দেহ যদি কলুষিত না-হ'ল তাহলেই যেন মানুষ পাপের হাত থেকে রক্ষা পেল। আমি রক্ষা পেয়েছিলাম এই মামুলি বিচারের দিক

থেকে। এমনসব কুকর্ম আছে যা থেকে রক্ষা পেলে কেবল যে সেই মানুষের উপকার হয় তা নয়, তার আশেপাশে আর যে পাঁচজন থাকে তাদেরও উপকার হয়। মোহাবিষ্ট মানুষ যখন ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্য বিচারের ক্ষমতা ফিরে পায়, তখন ভগবৎ-করুণায় তার আস্থাও ফিরে আসে। এ কথা সকলেরই জানা আছে, অনেকসময় লোভ ও মোহ থেকে মুক্তি পাবার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ পাপের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমরা এ কথাও জানি যে বিনা-চেষ্টাতেও অনেকসময় অদৃষ্ট মানুষকে রক্ষা করে। এসব ব্যাপার কেমন ক'রে ঘটে, এর মধ্যে কতখানি মানুষের পুরুষকার আর কতটা অদৃষ্ট বা দৈবাৎ-প্রাপ্ত পরম সৌভাগ্য, সে রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয়নি, হয়তো কোনোকালে হবেও না।

আবার আমাদের গল্পের সূত্র ধরা যাক্। এত-শত কাণ্ড সত্ত্বেও আমার বন্ধুর কুসংসর্গ বিষয়ে আমার চেতনা হ'ল না। আরো অনেক শোচনীয় অভিজ্ঞতার শেষে, তার ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ার পরে তার সম্বন্ধে আমার চোখ খুলেছিল। সেসব প্রসঙ্গ পরে হবে, কারণ এই কাহিনীতে আমরা কালানুক্রম অনুসরণ ক'রে চলেছি।

একটা ঘটনা কিন্তু আমার এখানেই অবতারণা করা দরকার, কারণ এ ঘটনা এইসময়েই ঘটে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না-হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল আমার এই বন্ধুর সংসর্গ। স্ত্রীর প্রতি আমার অনুরাগ ছিল যতখানি, ঈর্ষাও ছিল তদনুরূপ। আমার সেই সন্দেহের আগুনে ইন্ধন জোগাত এই বন্ধুটি। বন্ধুর সততায় আমার আস্থা ছিল প্রচুর। তার প্ররোচনায় হিংসার বশবর্তী হয়ে আমি যে আমার স্ত্রীকে কতভাবে নির্যাতন করেছি, সেজন্য আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারিনি। একমাত্র হিন্দু স্ত্রীরাই হয়তো এরকম নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে পারে। এইজন্যই আমি স্ত্রীজাতিকে ধৈর্যের প্রতিমারূপে শ্রদ্ধা ক'রে থাকি। ভুলবশত একটি চাকরকে যদি সন্দেহ করা হয়, তাহলে সে চাকরি ছেড়ে চ'লে যেতে পারে, অনুরূপ অবস্থায় ছেলে বাপের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে, বন্ধু বন্ধুতার বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। স্ত্রী যদি স্বামীকে সন্দেহ করেন—তো মুখে কিছু বলতে পারেন না, কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে সন্দেহ করেন, তাহলে তার সর্বনাশ। কোথায় সে পাবে তার আশ্রয়ের ঠাঁই? হিন্দু স্ত্রীরা তো আদালতে গিয়ে বিবাহবিচ্ছেদও দাবি করতে পারেন না। আইন তাঁদের দুরবস্থার প্রতিকার করতে পারে না। আমি কিছুতে ভুলে যেতে পারি না, নিজেকে ক্ষমাও করতে পারি না যে একদা আমার হাতে আমার স্ত্রীর চরম দুর্দশা ঘটেছিল।

যখন আমি অহিংসার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে শিখলাম, তখন থেকে সন্দেহের কাঁটা দূর হয়েছে আমার মন থেকে। তখন থেকে আমি ব্রহ্মচর্যের মাহাত্ম্য বুঝতে শিখেছি। আর বুঝেছি স্ত্রী স্বামীর সেবাদাসী নন, তিনি তাঁর সঙ্গিনী ও সহযোগী, দুঃখে-সুখে তাঁর সহভাগী। স্বামীর যেমন অধিকার আছে নিজের পথটুকু বেছে নেবার, স্ত্রীরও আছে সেই অধিকার। ঈর্ষা সন্দেহের বিষবাষ্পে অন্ধকার, সেইসব পুরাতন দিনের কথা যখন ভাবি, আমার নির্বুদ্ধিতা ও ইন্দ্রিয়লিপ্সা জনিত দুর্ব্যবহারের কথা মনে ক'রে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। বন্ধুর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কথা মনে ক'রে মাথা হেঁট হয়ে যায়।

৮. চুরি ও প্রায়শ্চিত্ত

আমার এই চুরি ক'রে লুকিয়ে মাংস খাওয়ার পর্বে এবং তার আগেও আমি এমন কয়েকটি দূষণীয় কাজ করেছি, যার বিষয়ে বলা দরকার। এগুলি ঘটেছিল আমার বিবাহের কিছু আগে বা পরে।

আমি ও আমার এক আত্মীয় ধূমপানের ভক্ত হয়ে উঠি। সিগারেট খেলে উপকার হবে কিংবা সিগারেটের গন্ধ ভালো—এরকম আমাদের মনে হয়নি। মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়াটাই বেশ মজার ব্যাপার ব'লে আমাদের মনে হয়েছিল। আমার কাকার ধূমপানের অভ্যাস ছিল। তাঁর ও অন্যদের দেখাদেখি মনে হ'ল, তাঁদের মতো ধোঁয়া ছাড়তে পারলে বেশ হয়। কিন্তু আমাদের হাতে তো পয়সা ছিল না, সুতরাং আমাদের ধূমপানে হাতে খড়ি হ'ল কাকার ফেলে দেওয়া দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেট টেনে।

কিন্তু সিগারেটের টুক্‌রো তো সবসময় মেলে না, আর খাওয়া গেলেও তা থেকে তো প্রচুর ধোঁয়া বের করা যায় না। বাড়ির চাকরকে দৈনিক যে দু-চারটা পয়সা দেওয়া হ'ত, তা থেকে এক-আধটা সরিয়ে বিড়ি কেনা শুরু করলাম। এখন সমস্যা হ'ল বিড়ি কিনে কোথায় রাখি। বড়োদের সামনে বিড়ি খাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই হতে পারে না। যা হোক্‌, দু-চার পয়সা চুরি ক'রে তো কয়েক সপ্তাহ চালানো গেল। ইতিমধ্যে জানা গেল, একরকম গাছ আছে যার সরু-সরু ডাঁটি ফাঁপা ব'লে আগুন ধরিয়ে বিড়ির মতো টানা যায়। আমরা তা-ই জোগাড় ক'রে ধূমপান ক'রে যেতে লাগলাম।

এরকম বিকল্প ব্যবস্থায় আমাদের তৃপ্তি ছিল না। পরাধীনতা আমাদের কাছে অসহ্য মনে হতে লাগল। মুরুব্বীদের হুকুম ছাড়া একটি কাজ আমরা করতে পারব না—কেন এমন হবে? মনের ধিক্কারে আমরা স্থির করলাম, আত্মহত্যা করা ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু আত্মহত্যা করা হবে কেমন ক'রে? বিষ পাওয়া যাবে কোথা থেকে? শুনেছিলাম, ধুতুরার বীজ খেলে মৃত্যু অবধারিত। বনজঙ্গল ঘুরে আমরা বীজ সংগ্রহ ক'রে আনলাম। স্থির হ'ল আত্মহত্যার পথ সন্ধ্যাবেলা প্রশস্ত। কেদারজীর মন্দিরে গিয়ে আমরা পূজার প্রদীপে ঘি ঢেলে দিলাম, বিগ্রহ দর্শন করলাম, একটি নির্জন জায়গাও বেছে নেওয়া গেল। কিন্তু বিষ খাওয়ার সাহস হ'ল না, ভাবলাম সঙ্গে-সঙ্গে যদি মৃত্যু না-হয়? তারপর মনে হ'ল, ম'রে গিয়েই-বা কী এমন লাভ? পরাধীনতা মেনে নিলেই-বা ক্ষতি কি? দু-চারটা বীজও আমরা মুখে পুরেছিলাম, তার চেয়ে বেশি খেতে সাহস হয়নি। দু-জনেরই মৃত্যুভয় ছিল পুরোমাত্রায়। স্থির হ'ল, রামজীর মন্দিরে গিয়ে মনকে শান্ত করব ও আত্মহত্যার কথা ভুলে যাব।

এই ঘটনা থেকে আমি বুঝেছি, আত্মহত্যার কথা ভাবা যত সহজ, আত্মহত্যা করা তত সহজ নয়। অতঃপর যখনই শুনেছি যে একজন কেউ আত্মহত্যার হুমকি দেখিয়েছে, আমি খুব বেশি বিচলিত হই না।

আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত বাতিল করার ফলে, ফেলে-দেওয়া সিগারেট টানা কিংবা চাকরের পয়সা চুরি ক'রে বিড়ি টানার অভ্যাস যেন আপনা থেকে শুধ্‌রে গেল।

বড়ো হ্য়ে আমার কখনও ধূমপানের ইচ্ছা হয়নি, বরঞ্চ মনে হয়েছে, এই অভ্যাস অসভ্যজনোচিত ; নোংরা ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। দুনিয়া জুড়ে ধূমপানের এই প্রচণ্ড নেশা কেন যে আছে—এ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। রেলযোগে যাতায়াত করার সময়, যখন দেখি কামরা-ভর্তি লোক ধোঁয়া ছাড়ছে, আমার অসহ্য মনে হয়, দম যেন বন্ধ হয়ে আসে।

এই যে চুরির কথা বললাম, এর কিছুকাল পরে আমি আরেকটি চুরি করেছিলাম। অপরাধ হিসেবে এটি গুরুতর ব'লে মনে করি। বিড়ি কেনার জন্য যখন আমি দু-চার পয়সা সরাতাম তখন আমার বয়স দশ-বারো বছর। এবার আমি যে চুরির কথা বলব সেটা ঘটেছিল যখন আমার বয়স পনেরো। এবারকার চুরির ব্যাপারটা ছিল আমার সেই মাংসাহারী দাদার সোনার তাগা থেকে একটা টুক্‌রো কেটে নেওয়া। সে টাকা-পঁচিশের মতো বাজারে একটি দেনা ক'রে বসেছিল। তার হাতে ছিল একটি নিরেট সোনার তাগা। তা থেকে একটা টুক্‌রো কেটে নেওয়া শক্ত হ'ল না।

তাগা কেটে তো ধার শোধ করা গেল। কিন্তু এই হীন কাজ আমার মনের ওপর অসহ্য বোঝার মতো চেপে রইল। আমি সঙ্কল্প নিলাম যে আর কখনও চুরি আমি করব না। মনঃস্থির করলাম যে বাবার কাছে সব কথা স্বীকার করব, কিন্তু জিভে কি ছাই কথা আসে। বাবার কাছে মার খাব সে ভয় আমার ছিল না। তিনি কোনোদিন আমাদের কাউকে মারধোর করেছেন ব'লে মনে পড়ে না। কিন্তু তিনি খুব দুঃখ পাবেন, বেদনা পাবেন, সে ভয় আমার মনে ছিল। তৎসত্ত্বেও আমার মনে হ'ল সব কথা অকপটে স্বীকার না-করলে, পাপের কলঙ্ক আমার মন থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে না।

শেষপর্যন্ত আমি ঠিক করলাম, চিঠি লিখে বাবার কাছে আমার দোষ স্বীকার করব ও তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করব। এক টুক্‌রো কাগজে সব কথা লিখে নিজেই বাবার হাতে দিলাম। চিঠিতে কেবল যে দোষ স্বীকার করেছিলাম তা নয়, লিখেছিলাম এর জন্য তিনি যেন আমায় যথাযোগ্য শাস্তিও দেন। আমার দোষের জন্য তিনি যেন নিজেকে শাস্তি না-দেন, এই অনুরোধ জানিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে ভবিষ্যতে অমি কখনও চুরি করব না।

কাঁপতে-কাঁপতে বাবার হাতে আমার সেই অপরাধ-স্বীকারের চিঠি তুলে দিলাম। সেই-সময় তিনি ভগন্দরের যন্ত্রণায় শয্যাগত ছিলেন। তাঁর শয্যা ছিল কেবল একটি কাঠের শক্ত খাট। তাঁর হাতে চিঠি দিয়ে আমি পাশের একটি তক্তায় ব'সে রইলাম।

বাবা আগাগোড়া চিঠিটি পড়লেন। তাঁর চোখ থেকে মুক্তার বিন্দুর মতো টস্‌টস্‌ জল প'ড়ে চিঠির কাগজ ভিজে গেল। কিছুক্ষণের জন্য তিনি চোখ বুজে কী ভাবলেন, তারপর সেই কাগজ টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন। চিঠি পড়ার জন্য তিনি বিছানা থেকে উঠে বসেছিলেন। আবার তিনি শুয়ে পড়লেন। আমারও চোখে জল ভ'রে এল। বাবার মনে যে কী বেদনা, তা তাঁর মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। সে ছবি আমার কাছে আজও

এমন স্পষ্ট যে, আমি যদি ছবি আঁকিয়ে হতাম তাহলে আজকের দিনেও সে ছবি নিখুঁতভাবে আঁকতে পারতাম।

তাঁর চোখের জলের মুক্তধারায় আমার অন্তর শুদ্ধ হ'ল, পাপের কলঙ্ক ধুয়েমুছে গেল। যাঁরা এধরনের শুদ্ধ প্রেম অন্তরে অনুভব করেছেন, একমাত্র তাঁরাই বলতে পারেন :

প্রেমের বাণে বিঁধছে যার প্রাণ
সে জানে প্রেম
কত যে শক্তিমান্।

আমার কাছে এই ঘটনা হ'ল অহিংসা-নীতির একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তখন যা কেবলমাত্র পিতৃ-স্নেহ ব'লে মনে হয়েছিল, আজ বুঝতে পারি তা শুদ্ধ অহিংসা ছাড়া আর-কিছু ছিল না। এই অহিংসার ভাব যদি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে এই পরশপাথরের ছোঁওয়ায় সব-কিছু রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। এই প্রেমের শক্তির কোনো অবধি নেই।

বাবা যে এরকম শান্তভাবে আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, এ আমি আশা করিনি। বাবার স্বভাব ছিল অন্যরকম। আমি ভেবেছিলাম, তিনি রাগ করবেন, তিরস্কার করবেন, নিজের কপালে করাঘাত করবেন। তা না-হয়ে দেখলাম তাঁর প্রশান্ত মুখ। মনে হয়, অকপটে আমি যে আমার অপরাধ স্বীকার করেছিলাম, এতেই তিনি শান্তি পেয়েছিলেন। যাঁর কাছে দোষ স্বীকার করতে হয়, যদি দোষী স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে সমস্ত অপরাধ খোলসা ক'রে বলে, ও ভবিষ্যতে সে দোষ করবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে সত্যকার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। এতে দণ্ডদাতা ও দোষী দু-জনেরই চিত্ত শুদ্ধ হয়। আমি বুঝেছিলাম, আমার এই স্বীকৃতির ফলে বাবা আমার সম্বন্ধে নির্ভয় হয়েছিলেন ও আমার প্রতি তাঁর স্নেহ সহস্রধারায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৯. পিতৃ-বিয়োগ ও আমার আত্মগ্লানি

যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমার বয়স ষোলো বছর। আগেই বলেছি, বাবা ভগন্দর রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন ও শয্যা নিয়েছিলেন। আমার মা, আমাদের বাড়ির একটি পুরনো চাকর ও আমি, প্রধানত তাঁর পরিচর্যার কাজ করতাম। আমার কাজ ছিল নার্স-এর মতো। আমার বিশেষ-বিশেষ কাজ ছিল বাবার ঘা ধুয়ে পরিষ্কার করা ও তাতে মলম লাগানো, তাঁকে ওষুধ খাওয়ানো এবং যেসব ওষুধ ও অনুপার্জন বাড়িতেই তৈরি করার কথা, সেগুলি তৈরি করা। প্রতিদিন রাত্রে আমি তাঁর পা টিপে দিতাম। তিনি শুতে যেতে বললে কিংবা ঘুমোলে আমিও ঘুমোতে যেতাম। বাবাকে সেবা করার কাজ আমার খুব ভালো লাগত, একদিনের জন্যও এ কাজ আমি বাদ দিয়েছি ব'লে মনে পড়ে না। দিনকৃত্য সারবার পর যেটুকু সময় উদ্বৃত্ত থাকত, তা কাটত স্কুলে অথবা বাবার সেবায়। তাঁর অনুমতি পেলে কিংবা তাঁর শরীর ভালো থাকলে—তবেই আমি সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে আসতাম।

এইরকম সময়ে আমার স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা হয়। আজ বুঝতে পারি, এই ঘটনা আমার

পক্ষে দুইদিক থেকে লজ্জার বিষয় ছিল। প্রথমত ছাত্র অবস্থায় আমার যতখানি সংযম পালন করা উচিত ছিল, তা আমি করিনি। দ্বিতীয়ত ইন্দ্রিয়সম্ভোগের বাসনা আমার কর্তব্যবুদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাভ্যাস করা যেমন আমি কর্তব্য ব'লে মনে করতাম, তার চেয়ে বড়ো কর্তব্য ব'লে মনে করতাম মা-বাবাকে সেবা ও ভক্তি করাকে। বলেইছি তো ছেলেবেলা থেকে আমার আদর্শ ছিল প্রবল। সেই আমি যখন রাতের পর রাত বাবার পা টিপে দিতাম, আমার মন ঘুরঘুর করত শোবার ঘরের দিকে। আর তা-ও এমন অপরিণত বয়সে যেসময় ধর্ম, লোকাচার কিংবা স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম অনুসারে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ ব'লে মনে করা হয়। সেবার কাজ থেকে ছুটি পেলে আমি যেন একটা স্বস্তি অনুভব করতাম। বাবাকে একটি প্রণাম ক'রে সোজা চ'লে যেতাম শোবার ঘরে।

বাবার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। বৈদ্য তাঁদের সবরকম প্রলেপ দেবার ব্যবস্থা করলেন, হেকিম দিলেন মলমপট্টি, টোট্‌কাটুট্‌কিও বাদ গেল না। জনৈক ইংরেজ ডাক্তারও যথাসাধ্য করলেন ও শেষপর্যন্ত বললেন, এক অস্ত্রোপচার করা ছাড়া এ রোগের অন্য কোনো চিকিৎসা নেই। কিন্তু আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক বাধা দিলেন। ওই বয়সে অস্ত্রোপচার করা যুক্তিযুক্ত হবে না ব'লে তিনি রায় দিলেন। কবিরাজ হিসেবে এই চিকিৎসকের বেশ হাতযশ ও নামডাক ছিল, সুতরাং তাঁর উপদেশই মেনে নেওয়া হ'ল। অস্ত্রোপচারের জন্য যেসব ওষুধপত্তর কেনা হয়েছিল, সেগুলি কোনো কাজে লাগল না। আমার মনে হয়, কবিরাজমশায় যদি অস্ত্রোপচার করতে দিতেন তাহলে ঘা সহজেই শুকিয়ে যেত। কথা হয়েছিল, বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা সার্জন অস্ত্রোপচার করবেন। কিন্তু ভগবানের বিধান ছিল অন্যরূপ। মৃত্যু যদি আসন্ন হয় তাহলে আরোগ্যের যথার্থ উপায়টুকু মনে আসে না। অস্ত্রোপচারের জন্য যা কিছু কেনা হয়েছিল সেগুলি সঙ্গে ক'রে বাবা ফিরে এলেন। জিনিসগুলি বেকার প'ড়ে রইল। বাবা জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। দিন-দিন এত দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন যে শেষপর্যন্ত তাঁকে বলা হ'ল তিনি যেন শয্যাশায়ী অবস্থাতেই মলমূত্রাদি ত্যাগ করেন। কিন্তু শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে যেতে তাঁর যতই যন্ত্রণা হোক্-না কেন, তিনি শেষদিন পর্যন্ত সে নির্দেশ মেনে চলেনি। বৈষ্ণব সংস্কারে বাহ্য শুচিতা রক্ষা করার নিয়ম এতই কঠিন।

এরকম দিনকৃত্যের ব্যাপারে শুচিত রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে আমরা শিখেছি যে সবরকম দিনকৃত্য এমন-কি স্নান পর্যন্ত, বিছানায় শুয়ে সারা যায় এবং তাতে পরিচ্ছন্নতার বিন্দুমাত্র হানি হয় না। তাতে রোগীর আরামের ব্যাঘাত তো হয়ই না, বিছানাপত্রও চমৎকার পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয়। এরকম পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা থাকলে বৈষ্ণব শুচিতার হানি হয় ব'লে আমার তো মনে হয় না। কিন্তু তখন শুচিতারক্ষায় বাবার দৃঢ়তা দেখে আমি অবাক্ হতাম ও তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতাম।

শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন সমাগত হ'ল। সেইসময় আমার কাকা ছিলেন রাজকোটে। বাবার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে শুনে তিনি এসে থাকবেন ব'লে মনে পড়ে। দুই ভাইয়ের

মধ্যে গভীর অনুরাগ ছিল। কাকা সারাদিন বাবার বিছানার পাশে ব'সে থাকতেন এবং রাতে সবাইকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে, একপ্রকার জিদ ক'রেই বাবার বিছানার পাশেই শুয়ে পড়তেন। সেই রাতই যে শেষ রাত হবে, সে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। তবে ভয়ের কারণ ছিল যথেষ্ট।

রাত সাড়ে দশটা/এগারোটার সময় আমি যখন বাবার পা টিপছি, কাকা বললেন তিনিই বাবার কাছে বসবেন এবং আমি শুতে যেতে পারি। আমি বেশ খুশি হয়ে সোজা শোবার ঘরে চ'লে গেলাম। স্ত্রী বেচারী তখন ঘুমে অচেতন। কিন্তু আমি থাকতে সে আর কেমন ক'রে আরামে নিদ্রা যায়? আমি তাকে জাগালাম। পাঁচ-সাত মিনিট পরেই আমাদের সেই চাকরটি এসে দরজায় ধাক্কা দিল। আমি ভয়ে চম্‌কে উঠলাম। চাকর বলল, "উঠে পড়ুন, বাবার ব্যারাম খুব বেড়েছে।" বাবা যে খুবই অসুস্থ, সে তো আমি জানতামই। সুতরাং "ব্যারাম খুব বেড়েছে" বলার মানে যে কী তা আমি অনুমান করতে পারলাম। আমি চট্‌ ক'রে বিছানা ছেড়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

"কী হয়েছে? সত্যি বলো।"

"বাবা আর নেই।"

তাহলে সব শেষ। এখন কপালে করাঘাত ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। লজ্জায়, দুঃখে, আত্মগ্লানিতে আমার মন ভ'রে গেল। বাবার ঘরে আমি ছুটে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম, যদি পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় অন্ধ না-হতাম, তাহলে হয়তো অন্তিম সময়ে বাবার কাছ থেকে দূরে থাকার তীব্র বেদনা আমায় সহ্য করতে হ'ত না। তা হ'লে আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পদসেবা করতে পারতাম, হয়তো আমার কোলেই মাথা রেখে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতেন। যে সৌভাগ্য আমার হতে পারত তা এখন কাকার ভাগ্যে ঘটল। তিনি যে তাঁর দাদাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, তাই তাঁকে শেষ সেবা করার গৌরব কাকার কপালেই জুটল। প্রাণ যে শেষ হয়ে আসছে বাবা সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন। ইশারায় তিনি কাগজ-কলম চেয়েছিলেন, কাগজে লিখেছিলেন "শেষ কাজের জন্য তৈরি হও।" অতঃপর তিনি হাতের মাদুলি ও সোনার সুতোয় বাঁধা গলায় যে তুলসীর মালা ছিল, একে-একে ছিঁড়ে ফেললেন। তার একটুক্ষণ পরে তিনি ইহলোক ছেড়ে চ'লে গেলেন।

ইতিপূর্বে আমি যে লজ্জাকর ঘটনার বিষয়ে ইঙ্গিত করেছি তা হ'ল আমার এই দেহলিপ্সার আত্মগ্লানি। যেসময় অতন্দ্র জাগরণে মুমূর্ষু পিতাকে আমার সেবা করা কর্তব্য ছিল সেই সঙ্কট-মুহূর্তে আমি যে কামনার বশবর্তী হয়েছিলাম—এই কলঙ্ক আমার কোনোদিন মুছবে না। এ কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না যে, যদিচ মা-বাবার প্রতি আমার ভক্তি অপার ছিল এবং তাঁদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতেও আমি প্রস্তুত ছিলাম, তবু সেই মুহূর্তেকের কামার্ত অবস্থায় আমার শ্রদ্ধাভক্তিও যেন অমার্জনীয়ভাবে লোপ পেয়েছিল। সেজন্য স্বামী হিসাবে একব্রত হ'লেও আমি নিজেকে কামুক ব'লে মনে করি। এই বাসনার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করতে আমার অনেকদিন লেগেছিল ও অনেক সঙ্কট অতিক্রম করতে হয়েছিল।

আমার এই দ্বিগুণিত আত্মগ্লানির প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখা উচিত। আমার স্ত্রী যে ক্ষীণপ্রাণটির জন্ম দিয়েছিলেন সে বেচারা তিন-চারদিনের বেশি নিশ্বাস

নিতে পারেনি। অন্যরকম যে হতে পারত, তেমন আশা করাটাই অন্যায়। বিবাহিত দম্পতিরা আশা করি আমার এই দৃষ্টান্ত থেকে সাবধান হবেন।

১০. ধর্মবোধের উন্মেষ

ছ-সাত বছর বয়স থেকে শুরু ক'রে ষোলো বছর অবধি আমি যে স্কুলে ছিলাম তখন অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছি। কিন্তু ধর্মশিক্ষা পাইনি। শিক্ষকেরা বিনা-চেষ্টায়, কেবল নিজেদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, যতটুকু ধর্মজ্ঞান দিতে পারতেন, তা পর্যন্ত তাঁরা দিতে পারেননি। কিন্তু আমাদের পরিবেশ থেকে আমি কিছু-কিছু শিক্ষা অবশ্যই লাভ করেছিলাম। 'ধর্ম' কথাটি আমি এখানে খুব ব্যাপক অর্থে ধরেছি, এককথায় বলতে গেলে আমার কাছে ধর্মের অর্থ হ'ল আত্মজ্ঞান অর্থাৎ নিজেকে জানা।

বৈষ্ণব বংশে আমার জন্ম, সুতরাং প্রায়ই আমাদের বিষ্ণু মন্দিরে বা হাবেলিতে যেতে হ'ত। কিন্তু তাতে আমার মন ভরত না। সেখানকার জাঁকজমক আড়ম্বর আমার ভালো লাগত না। তাছাড়া আমি শুনেছিলাম, মন্দিরে হাবেলিতে নানারকম দুর্নীতির প্রচলন আছে। সেসব কথা শুনে অবধি তাদের প্রতি আমার মনে একটি বিতৃষ্ণার ভাব এসেছিল। তাই মন্দির হাবেলি থেকে আমি কিছু পাইনি।

ধর্ম-মন্দির থেকে যা আমি পাইনি, তা আমি পেয়েছিলাম আমাদের বাড়ির একজন পুরাতন দাসীর কাছ থেকে। সে ছিল আমার দাই, ছেলেবেলায় আমি তারই হাতে মানুষ হয়েছি, তার ভালোবাসার কথা আমার এখনও বেশ স্পষ্ট মনে আছে। আগেই বলেছি, ছেলেবেলায় আমার খুব ভূত-প্রেতের ভয় ছিল। রম্ভা বলত, ভূতের ভয়ের মোক্ষম ওষুধ হ'ল রামনাম। রামনামে আমার যতটুকু আস্থা ছিল, রম্ভার কথায় তার চেয়ে আস্থা ছিল অনেক বেশি। সেজন্য ছেলেবয়সে ভূত-প্রেতের ভয় মন থেকে দূর করার জন্য আমি রামনাম জপ করা শুরু করি। বলাবাহুল্য, এ অভ্যাস বেশিদিন টেকেনি। কিন্তু বাল্যকালের নরম জমিতে যে বীজ রোপণ করা যায়, তা সচরাচর বৃথা যায় না। রামনাম জপ করাকে আজ যদি আমি অমোঘ ওষুধ ব'লে মনে করি তাহলে তার একশত কারণ যে রম্ভাবাঈ ছেলেবেলায় আমার মনে এই বীজমন্ত্র রোপণ করেছিল।

সম্পর্কে আমার দাদা একজন ছিলেন যিনি *রামায়ণ*-এর ভক্ত। তিনি আমাদের দুই ভাইকে কী ক'রে রামরক্ষা পাঠ করতে হয়, তা শেখাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। আমরা শ্লোকগুলি মুখস্ত করেছিলাম ও প্রতিদিন প্রাতে স্নানের পর সেইসব শ্লোক নিয়মিত আবৃত্তি করতাম। পোরবন্দরে যতদিন ছিলাম, এই অভ্যেস বজায় ছিল। রাজকোটে পৌঁছেই সব-কিছু ভুলে যাওয়া হ'ল। আসলে এই আবৃত্তিতে আমার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। আমি শ্লোকগুলি অভ্যাসমতো আওড়ে যেতাম, তার কারণ শুদ্ধ উচ্চারণে আমি রামরক্ষা আবৃত্তি করতে পারি, এই নিয়ে আমার কেমন-একটা অহমিকা ছিল।

যে স্মৃতি আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে সে হ'ল বাবার অসুখের সময় *রামায়ণ* *পাঠ*। অসুখের প্রথম অবস্থায় বাবা পোরবন্দরে ছিলেন। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁকে *রামায়ণ* *পাঠ* ক'রে শোনানো হ'ত। পাঠ করতেন শ্রীরামের পরম ভক্ত বিল্বেশ্বরের লাধা মহারাজ। তাঁর সম্বন্ধে একটা প্রসিদ্ধি ছিল এই যে, তাঁর কুষ্ঠরোগ হ'লে পর তিনি ওষুধ-বিষুধের শরণ নেননি। বিল্বেশ্বর মন্দিরে মহাদেবের বিগ্রহের সামনে ভক্তেরা বেলপাতা অঞ্জলি দিত। সেগুলি যখন বাসি হ'ত, মন্দিরের পরিচারকেরা একত্র জড়ো ক'রে ফেলে দিত। লাধা মহরাজ এই বেলপাতা কুড়িয়ে নিয়ে ঘায়ের ওপর বাঁধতেন এবং কেবল রামনাম জপ করতেন। তাঁর এই ভগবৎ-বিশ্বাসের ফলে তিনি কুষ্ঠরোগ থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় হন—লোকে এইরকম বলত। এ কথা সত্য হোক্ বা না-হোক্, আমবা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতাম। যখন তিনি *রামায়ণ* পাঠ করতেন লক্ষ ক'রে দেখেছি, তাঁর দেহে কুষ্ঠরোগের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। লাধা মহারাজের কণ্ঠস্বর ছিল মধুর। তিনি দোঁহা ও চৌপাই সুর ক'রে গাইতেন, তারপর কথার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন তদ্‌গত হয়ে পড়তেন যে শ্রোতারা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। সেসময় আমার বয়স ছিল তেরো বছরের কাছাকাছি, কিন্তু আমার বেশ মনে হয় সেসময় আমি লাধা মহারাজের *রামায়ণ* পাঠ তন্ময় হয়ে শুনতাম। এই থেকেই *রামায়ণ*-এর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার সূত্রপাত। আজও আমার ধারণা *তুলসীদাসী রামায়ণ* ভক্তিসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

এর কয়েকমাস পর আমরা রাজকোট ফিরে এলাম। সেখানে *রামায়ণ পাঠ* হ'ত না। একাদশীর দিন *ভাগবত* পাঠ হ'ত। আমি কখনো-কখনো *ভাগবত পাঠ* শুনতাম, কিন্তু রাজকোটের পাঠক তেমন রস জমাতে পারতেন না। আজ আমি বুঝতে পারি, *ভাগবত* *পাঠে* ভগবৎ-ভক্তি উদ্রিক্ত হ'তে পারে। গুজরাতি অনুবাদে আমি এই গ্রন্থ গভীর আগ্রহে পাঠ করেছি। আমার একুশ দিনের উপবাসের সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এসে মূল *ভাগবত* থেকে অংশবিশেষ আমায় প'ড়ে শোনাতেন। তখন আমার দুঃখ হ'ত যে ছেলেবেলায় তাঁর মতো একজন ভক্তের মুখে আমি *ভাগবত পাঠ* শুনিনি ব'লে। তাহলে অল্পবয়সেই *ভাগবত* গ্রন্থে আমার রুচি হতে পারত। শৈশবে যেসব ধারণা আমরা আয়ত্ত করি. সেগুলি মনের গভীরে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। *রামায়ণ, ভাগবত* প্রভৃতি সদ্ গ্রন্থ ছেলেবেলায় আরো ভালো ক'রে শোনার সৌভাগ্য হয়নি ব'লে, আমার মনে একটা চিরকালের মতো আক্ষেপ র'য়ে গেছে।

রাজকোটে থাকতে আরেকটি শিক্ষা যে আমি পেয়েছিলাম সে হ'ল হিন্দু ধর্মের ভিন্ন-ভিন্ন শাখা ও সম্প্রদায়ের প্রতি সমভাব রক্ষার শিক্ষা। বাপ-মা কেবল যে বিষ্ণু মন্দিরে নিয়মিত যেতেন তা নয়, শিবের মন্দিরে রামের মন্দিরেও যেতেন। হয় আমাদের সঙ্গে নিতেন, কিংবা, আমাদের লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন। জৈন সাধুরা তো প্রায়ই বাবার কাছে আনাগোনা করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার আমাদের বাড়িতে আহারাদি করতেও আপত্তি করতেন না—যদিচ আমরা জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলাম না। এই সাধুরা বাবার সঙ্গে ধর্মকথাও বলতেন, বিষয়কর্মের কথাও বলতেন।

তাছাড়া বাবার কয়েকজন মুসলমান ও পার্সি বন্ধুও ছিলেন। তাঁরা নিজেদের ধর্ম বিষয়ে বাবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। বাবা তাঁদের বক্তব্য খুব শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। আমি নিয়মিত বাবার পরিচর্যা করতাম ব'লে এসব আলাপ-আলোচনা শুনতে পেতাম। এইভাবেই সর্বধর্মসমানত্ব বিষয়ে আমার মনে একটি স্পষ্ট ধারণা গ'ড়ে ওঠে।

এক কেবল খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ে আমি তখন কিছু জানতে বা বুঝতে পারিনি। খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি আমার মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। অবশ্য তার একটা কারণও ছিল। সেইসময়ে আমাদের স্কুলের কাছাকাছি একটা জায়গায় মিশনারি পাদরিরা এসে তাঁদের ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। এসব বক্তৃতায় হিন্দু জাতি ও তাদের দেবদেবীকে প্রচুর গালাগাল দেওয়া হ'ত। এটা আমার অসহ্য লাগত। আমি একবারমাত্র এরকম বক্তৃতা শোনবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু সেই একবারই যথেষ্ট, আমার শোনবার প্রবৃত্তি আর হয়নি। এইরকম সময়ে শোনা গেল এক নামজাদা হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান হয়েছেন। শহরময় রাষ্ট্র হ'ল যে দীক্ষা নেবার সময় তাঁকে গোমাংস ও মদ খেতে হয়েছে এবং পোষাক পরিববর্তন করতেও হয়েছে। খ্রিষ্টান হবার পর তিনি না-কি কোট পাৎলুন ধারণ করেছেন ও মাথায় হ্যাট্ পরতে শুরু করেছেন। এসব খবরে আমার গা যেন রী-রী করতে লাগল, মনে হ'ল যদি ধর্মের নামে গোমাংস খেতে হয়, মদ খেতে হয়, পোষাক-পরিচ্ছদ বদ্‌লাতে হয়, তাহলে সে আবার কেমন ধর্ম! আরও শুনলাম যে নবদীক্ষিত খ্রিষ্টান না-কি তাঁর বাবা-পিতামহের ধর্ম, আচার, রীতিনীতি—এমন-কি স্বদেশের পর্যন্ত নিন্দা গাইতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। এইসব নানা কারণে ছেলেবেলায় খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি আমার কেমন বিরাগের ভাব ছিল।

ইতিপূর্বে আমি সকল ধর্মের প্রতি সমভাবের বিষয়ে যা লিখেছি, তা থেকে কেউ যেন মনে না-করেন আমি ছেলেবেলা থেকেই যথার্থভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলাম। বাবার যে পুস্তক-সংগ্রহ ছিল তা ঘাটতে গিয়ে একদিন একখণ্ড *মনুস্মৃতি* আমার হাতে এল। এই গ্রন্থে সৃষ্টির উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে যা পড়লাম, তা আমার মনে কোনো দাগ তো কাটলই না, বরং উল্‌টে একটা নাস্তিক ভাবের সঞ্চার করল।

আমার এক সম্পর্কে দাদা ছিলেন, ছিলেনই-বা বলি কেন, তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে আমার খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁকে আমার সংশয়ের কথা বললাম। তিনি নিরসন করতে পারলেন না, তিনি আমায় এই ব'লে হটিয়ে দিলেন, "বয়স হলে তুমি নিজেই এইসব সংশয় সমাধান করতে পারবে। ছোটোমুখে এসব বড়ো কথা তুলতে নেই।" আমি চুপ ক'রে যেতাম বটে কিন্তু মনটা কেমন যেন খচ্‌খচ্ করতে থাকত। খাদ্যাখাদ্য ও আচার-বিচার প্রসঙ্গে *মনুস্মৃতি* যেরকম বিধান দিয়েছেন, দেখলাম প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গে তার বেশ বিরোধ রয়েছে। এইসব সংশয়ের বিষয়েও দাদা একইপ্রকার জবাব দিলেন। আমিও নিজেকে বোঝালাম, বয়স যখন বাড়বে বুদ্ধি খুলবে। তখন যদি মন দিয়ে বেশ পড়াশুনো করতে পারি, তাহলে সব কথা ভালো ক'রে বুঝতে পারব। *মনুস্মৃতি* প'ড়ে আমি তাই যদি কিছু শিক্ষা ক'রে থাকি, অহিংসা বিষয়ে কোনো শিক্ষা পাইনি। আমার মাংস খাওয়ার কথা তো আগেই বলেছি। *মনুস্মৃতি*-তে তার যেন সমর্থন আছে। পোকামাকড়

বিছে সাপ ইত্যাদি হত্যা করাও মনে হয়েছিল ন্যায়সঙ্গত। তখনকার দিনে আমি প্রায় যেন কর্তব্যবোধে ছারপোকা ও অন্যান্য পোকামাকড়ের প্রাণ নিয়েছি ব'লে আমার মনে পড়ে।

কিন্তু একটি যে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল তা হ'ল এই যে সমস্ত জগৎসংসার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সত্য হ'ল সবনীতির সার। সত্যানুসন্ধান আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হ'ল। সত্যের মহিমা দিনে-দিনে আমার কাছে বৃদ্ধি পেতে লাগল, সত্যের সংজ্ঞা ক্রমেই বিস্তৃততর হতে লাগল।

একটি গুজরাতি নীতি-কবিতাও সেসময় আমার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর সারমর্ম ছিল এই যে কেউ যদি তোমার অপকার করে, তুমি তার উপকার করো। এই নীতি আমি জীবনের আদর্শ ব'লে গ্রহণ করলাম। যে আমার মন্দ করে, কীভাবে আমি তার ভালো করতে পারি—এ ভাবনা আমায় পেয়ে বসল। আমি এ নিয়ে কত যে পরীক্ষা করেছিলাম তার ঠিক নেই।

সেই গুজরাতি নীতি-কবিতার কথাগুলি ছিল এইরকম :

তৃষ্ণার জল দিলে দাও ফিরে
ক্ষুধার অন্ন তাহাকে,
মিষ্ট কথায় তুষে যদি কেহ
প্রণাম করিও তাহাকে।
পাইপয়সাও দান করে যদি
সোজা দিয়ো প্রতিদান,
পরাণ বাঁচালে অম্লান মুখে
পরাণ করিয়ো দান।
কাজে ও কথায় সঙ্গতি রাখে
হয় যারা জ্ঞানী জন,
যা পেয়েছে তার দশগুণ দেয়
এই সব মহাজন।
সকল মানুষে ভাই ব'লে জনে
মহান মানুষ যারা
অপকার যদি কেহ করে তার
উপকার করে তারা।

১১. বিলেতযাত্রার প্রস্তুতি

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি। তখনকার দিনে পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল দু-জায়গায় ; আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে। কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলের লোকেরা দরিদ্র ছিল ব'লে, আমাদের ছাত্রেরা সচরাচর আমেদাবাদে পরীক্ষা দিতে যেত। তাতে ক'রে কাছাকাছি হ'ত আর খরচপত্রও কম হ'ত। গান্ধী-পরিবারের তখন গরীব অবস্থা, সুতরাং আমিও ঠিক করলাম আমেদাবাদেই পরীক্ষা দিতে বসব। সেই আমার প্রথম একা-একা আমেদাবাদ যাওয়া। ম্যাট্রিক পাশ করার পর মুরব্বীরা ঠিক করলেন, উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁরা আমায় কলেজে ভর্তি ক'রে দেবেন। তখনকার দিনে বোম্বাইয়ে যেমন কলেজ ছিল, সেইরকম একটি কলেজ ছিল ভাবনগরে। খরচপত্র কম হবে ব'লে আমি ভাবনগরের শামলদাস কলেজেই ভর্তি হব স্থির করি। কলেজে ঢুকে আমি যেন অথৈ জলে গিয়ে পড়লাম। সব-কিছু শক্ত মনে হ'ল, কিছুই যেন বুঝতে পারি না। প্রফেসররা যেসব লেকচার দেন তা আমার মাথাতেই ঢোকে না। শামলদাস কলেজের অধ্যাপকেরা প্রথম শ্রেণীর ব'লে পরিগণিত হতেন। আসলে আমিই ছিলাম পড়াশুনায় নিতান্ত কাঁচা। মাসকয়েক পরে কলেজের ছুটি হ'লে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

মাভজী দাবে ব'লে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন আমাদের পরিবারের হিতৈষী বন্ধু। বিষয়কর্মের ব্যাপারে তাঁর বেশ মাথা ছিল ব'লে, আমরা তাঁর পরামর্শমতো চলতাম। বাবা গত হবার পরেও আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। আমি ছুটিতে যখন বাড়িতে ব'সে আছি, সেসময় তিনি একদিন আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলেন। মা ও দাদার সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে তিনি আমার পড়াশুনার বিষয়ে জানতে চাইলেন। আমি শামলদাস কলেজে ভর্তি হয়েছি শুনে বললেন : "দেখো, দিনকাল বদ্‌লে গেছে। ভালোভাবে শিক্ষা-দীক্ষা না-করলে, ছেলেদের মধ্যে কেউ কাবা গান্ধীর গদিতে বসার উপযুক্ত হয়ে উঠবে না। এখন দেখা যাক্, যে ছেলেটি লেখাপড়ায় লেগে আছে, সে বাপের গদি দখল করতে পারে কি-না। তবে বি.এ. পাশ করতেই তো ওর চার-পাঁচ বছর লেগে যাবে। পাশ ক'রেও বড়োজোর পঞ্চাশ-ষাট টাকার চাকরি একটা জুটবে—দেওয়ানগিরি তো জুটবে না। তারপর বি. এ. পাশ ক'রে যদি আমার ছেলের মতো ওকালতি পড়তে যায়, তাহলে আরও কয়েক-বছর লাগবে। ততদিনে দেওয়ানের গদির উমেদার হয়ে বহু পাশ করা উকিল এসে ভিড় করবে। আমি বলি কী, তোমরা ওকে বিলেত পাঠিয়ে দাও। আমার ছেলে কেবলরাম ব'লে যে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টর হয়ে ফিরে আসা খুব সোজা। তিন বছরের বেশি সময় লাগবে না। আর সর্বসাকুল্যে চার-পাঁচ হাজারের বেশি খরচ করতে হবে না। সদ্য বিলেত-ফেরৎ ব্যারিস্টরটিকে দেখেছো তো কেমন ডাঁটের মাথায় থাকে। সে যদি দেওয়ানের পদ চায় তাহলে আজই পেয়ে যেতে পারে। আমি তো বলি, তোমরা কালবিলম্ব না-ক'রে এই বছরের মধ্যেই মোহনদাসকে বিলেত পাঠাও। বিলেতে কেবলরামের চেনাজানা

অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। সে যদি তাদের কাছে মোহনদাসের পরিচয় লিখে পাঠায়, তাহলে বিলেতে গিয়ে আর কোনো অসুবিধে হবে না।"

যোশীজী (আমরা মাভজী দাবেকে যোশীজী ব'লে ডাকতাম) আমার দিকে এমন ক'রে তাকালেন যেন সবই ঠিক হয়ে গেছে, বললেন, "কেমন মোহন, বিলেত, যেতে ইচ্ছে হয়, না এখানেই পড়বে?" আমার কাছে তো এর চেয়ে ভালো কিছু হতেই পারে না। কলেজের শক্ত-শক্ত পড়া নিয়ে আমার মনের মধ্যে খুবই ভয় ছিল। আমি তো পরম উৎসাহে বললাম, "বিলেত যদি পাঠানো স্থির হয় তাহলে যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। কলেজের পরীক্ষা চট্ ক'রে পাশ করতে পারা তো সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু বিলেত গিয়ে তো আমি ডাক্তারি শিখে আসতে পারি।"

দাদা বাধা দিয়ে বললেন, "বাবার পছন্দ ছিল না। তোমার কথা মনে রেখেই তিনি বলতেন, আমাদের বৈষ্ণবদের মড়া কাটাকুটির ব্যাপারটা করতে নেই। বাবার ইচ্ছা ছিল তুমি উকিল হও।"

যোশীদা দাদার কথায় সায় দিয়ে বললেন, "আমার তো ডাক্তারি পেশা গান্ধীজীর মতো অত খারাপ মনে হয় না। শাস্ত্রের বিধানেও কোনো বাধা নেই। কিন্তু ডাক্তার হ'লে তো আর দেওয়ান হওয়া যায় না। আমার ইচ্ছা, হয় তুমি দেওয়ান হও কিংবা তার চেয়েও বড়ো কিছু কাজ করো। তা যদি হয়, তাহলে তুমি তোমাদের বৃহৎ পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণ করতে পারবে। আর দেশে, দিনকাল তো দ্রুত বদলাচ্ছে, জীবনযাত্রার সমস্যাও কঠিন হচ্ছে। আমার তো ধারণা, ব্যারিস্টর হওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে। মায়ের দিকে ফিরে বললেন, "আজ তবে আমি চলি। আমার কথাটা ভালো ক'রে একবার ভেবে দেখো। আবার যখন আসব তখন যেন শুনি যে ছেলেকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। যদি কোনো কাজে লাগতে পারি তো আমায় জানাতে ভুলো না।"

যোশীজী চ'লে গেলেন। আমি মনে-মনে আকাশকুসুম রচনা করতে লাগলাম।

দাদা মহাভাবনায় পড়লে। বিলেত পাঠাবার মতো টাকা কোথা থেকে জোগাড় করবেন? কাঁচাবয়সের যুবক ছেলেকে বিশ্বাস ক'রে কি একা-একা এত দূরের দেশে পাঠানো ঠিক হবে?

মা-ও খুব ফাঁপরে পড়লেন। তাঁকে ছেড়ে আমি দূরদেশে যাই—এ তাঁর একটুও ভালো লাগছিল না। আমায় ঠেকাবার জন্য তিনি বললেন, "দেখো মোহন, বাবার অবর্তমানে এখন তোমাদের কাকাই হলেন পরিবারের কর্তা। গোড়াতে তো তাঁর মতামত জানতে হয়। তিনি যদি রাজি হন, তখন সব কথা একবার ভেবে দেখা যেতে পারে।"

দাদা ভাবছিলেন অন্য কথা। আমায় বললেন, "দেখো, পোরবন্দর রাজ্যের ওপর আমাদের তো একটা দাবি আছে। লেলী সাহেব এখন স্টেট্-এর এডমিনিস্ট্রেটর। আমাদের পরিবার সম্বন্ধে তাঁর বেশ ভালো ধারণা, কাকার প্রতি তাঁর নেকনজর আছে। কাকা যদি তাঁকে ধরেন, তাহলে লেলী সাহেব হয়তো বিলেতে লেখাপড়া করার জন্য স্টেট্ থেকেই কিছু অর্থসাহায্য বরাদ্দ করার সুপারিশ করতে পারেন।"

এসব কথা আমার বেশ লাগল। আমি পোরবন্দর রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

তখন রেলগাড়ি ছিল না। গোরুরগাড়িতে রাজকোট থেকে পোরবন্দর যেতে সময় লাগত পাঁচদিন। গোড়াতেই তো আমি বলেছি ছেলেবেলার আমি বেশ ভিতু ছিলাম। বিলেত যাবার চিন্তা আমায় এমন পেয়ে বসেছিল যে, ভয়ডর আমার যেন কোথায় উবে গেল। ঠোরাজি পর্যন্ত আমি গেলাম গোরুগাড়িতে। একদিন আগে যাতে পৌছুতে পারি, সেজন্য ঠোরাজি থেকে উট ভাড়া করলাম। উটের পিঠে চড়া সেই আমার প্রথম।

শেষপর্যন্ত পোরবন্দর পৌছনো গেল। কাকাকে প্রণাম ক'রে সব কথা তাঁকে বললাম। কাকা সব কথা বিবেচনা ক'রে বললেন : "আমাদের ধর্মের ক্ষতিসাধন না-ক'রে কারও পক্ষে বিলেতে থাকা সম্ভবপর কি-না, সেবিষয়ে আমি ঠিক জানি না। তবে আমি যতটুকু যা শুনেছি তা থেকে খুব বেশি ভরসা হয় না। যেসব বড়ো-বড়ো দিশি ব্যারিস্টরদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ ঘটেছে, তাদের জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ হুবহু সাহেবদের মতো—অন্তত আমি তো খুব বেশি তফাৎ দেখি না। খাদ্যাখাদ্য নিয়ে তাঁদের কোনো বাছবিচার নেই, আর মুখে চুরুট তো লেগেই আছে। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও তারা সাহেবদের মতো বেহায়া। আমরা যেভাবে মানুষ, তাতে এরকম আচার-ব্যবহার আমাদের পরিবারে ঠিক খাপ খাবে ব'লে মনে হয় না। আমার তো দিন প্রায় ফুরিয়ে এল, আমি দু-চার দিনের মধ্যেই তীর্থযাত্রায় বেরুব ঠিক করেছি। মৃত্যুর দিকে তো পা বাড়িয়ে রেখেছি। এ অবস্থায় আমি কী ক'রে বলি যে তুমি দরিয়া পার হয়ে বিলেত যাও। আমি তো আর অনুমতি দেবার মালিক নই। কিন্তু আমি তোমার যাবার পথে বাধা সৃষ্টিও করতে চাই না। তাছাড়া আসলে একমাত্র তোমার মা-ই তোমায় আজ্ঞা দিতে পারেন। তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে বলব, ভগবান যেন তোমার যাত্রাপথে সহায় হন্। তাঁকে ব'লো, আমি তোমার বিঘ্ন ঘটাব না, যদি যাওয়া স্থির করো তাহলে আমার আর্শীবাদও তোমার সঙ্গে যাবে।"

আমি তাঁকে বললাম, "আপনার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি-কিছু আমি আশা করি না। এখন দেখি মাকে রাজি করানো যায় কি-না। তবে লেলী সাহেবের কাছে আমায় সুপারিশ করবেন তো?"

কাকা বললেন, "সে আমি কেমন ক'রে করি? তবে লেলী সাহেব মানুষ ভালো। পরিবারের পরিচয় দিয়ে তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাও ব'লে চিঠি লেখো। তিনি তাহলে অবশ্যই তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হবেন, চাই কি সাহায্যও করতে পারেন।"

জানি না লেলী সাহেবের কাছে কাকা কেন সুপারিশপত্র দিলেন না। তবে আমার মনে হয়, বিলেত যাওয়া অধর্ম হবে মনে ক'রে, সরাসরি আমায় সাহায্যে করতে তিনি ইতস্তত বোধ করেছিলেন।

লেলী সাহেবকে চিঠি লেখার ফলে তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করার জন্য আমায় ডেকে পাঠালেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি বেশি-কিছু কথা বললেন না, কেবল বললেন, "আগে তুমি বি.এ. পাশ করো তারপর আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। এখন তোমার জন্য কিছু করা সম্ভবপর হবে না।" এই কথা-কয়টি ব'লে তিনি তর-তর ক'রে উঠে চ'লে গেলেন। আমি কত তোড়জোড় ক'রে তৈরি হয়ে এসেছিলাম

তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। কয়েকটা কথা বেশ কষ্ট ক'রে মুখস্থ ক'রে এসেছিলাম। বেশ নত হয়ে দুই হাত জোড় ক'রে তাঁকে সেলামও করেছিলাম। কিন্তু সব-কিছু বৃথা হ'ল।

স্ত্রীর গয়না বেচে টাকার ব্যবস্থা করা যায় কি-না আমি ভাবতে লাগলাম। আমার পরম নির্ভরস্থল দাদার কথাও মনে হ'ল। আমার প্রতি তাঁর উদার স্নেহ ছিল আতিশয্যদুষ্ট। তিনি আমায় নিজের ছেলের মতো ক'রে দেখতেন। পোরবন্দর ছেড়ে আমি রাজকোট ফিরে এলাম ও সমস্ত ঘটনার কথা আদ্যোপান্ত বললাম। যোশীজীর পরমর্শ চাইলাম, তিনি তো ব'লে দিলেন ধারকর্জ করতে হ'লেও যেন বিলেত যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ না-করি। আমি স্ত্রীর গয়না বেচে দেবার প্রস্তাব করলাম, তা থেকে হয়তো দু-তিন হাজার টাকার জোগাড় হতে পারে। দাদা কথা দিলেন যে বাকি টাকা তিনি যেমন ক'রেই হোক্-না-কেন, নিশ্চয় জোগাড় করবেন।

এদিকে মা-র কিন্তু আদৌ ইচ্ছা নয় যে আমি বিলেত যাই। তিনি খুঁটিয়ে বিলেতের বিষয়ে নানা খোঁজখবর নিতে লাগলেন। কে যেন তাকে বলেছিল যে বিলেত গিয়ে ছেলেরা উচ্ছন্নে যায়। কেউ-কেউ বলল, সেখানে গিয়ে সবাই মাংস খায়, আর মদ না-খেলে না-কি তাদের চলেই না। মা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কী শুনছি, মোহন।" আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, "আমায় কি তুমি বিশ্বাস করতে পারো না? আমি কি মিথ্যে কথা ব'লে তোমায় ঠকাব। শপথ ক'রে তোমায় বলছি ওসব জিনিস আমি ছোঁবও না। সত্যি যদি এ-রকম ভয়ের কারণ থাকত তাহলে যোশীজী কি আমায় বিলেত যাবার কথা বলতেন।" মা বললেন, "আমার চোখের ওপর যতক্ষণ আছ ততক্ষণ আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করি। কিন্তু দূর দেশে আমার নাগালের বাইরে চ'লে গেলে আমি বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখব কী ক'রে? না বাপু, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এখন আমি কী করি। দেখি, বেচারজী স্বামীকে একবারে জিজ্ঞেস ক'রে দেখা যাক্।"

বেচারজী আগে ছিলেন আমাদেরই মতো মোঢ় বেনিয়া জাতের, সম্প্রতি জৈন সম্প্রদায়ের সাধু হয়েছেন। যোশীজীর মতন ইনিও আমাদের পরিবারের একজন পরামর্শদাতা ছিলেন। বেচারজী আমার সহায় হয়ে মাকে এসে বললেন, "আমি মোহনদাসকে দিয়ে ওই তিন ব্যাপারে ভগবানের দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নেব। তারপর ওকে তুমি ছেড়ে দিতে পারো।" তিনি আমায় দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে মদ, মাংস ও স্ত্রী-সংসর্গ থেকে আমি বিরত থাকব, স্পর্শ পর্যন্ত করব না। অতঃপর মায়ের মত পাওয়া গেল।

হাই ইস্কুলে আমায় বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হ'ল। রাজকোটের ছেলে বিলেত যাচ্ছে এমন ঘটনা তো সচরাচর ঘটে না! অভিনন্দনের জবাবস্বরূপ আমি কয়েকটা ভালো-ভালো কথা লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু জবাব দিতে গিয়ে মুখে যেন কথাই জোগাল না। বেশ মনে পড়ে, যেই-না দাঁড়িয়েছি, মাথা ঘুরতে লাগল, সমস্ত শরীর যেন কাঁপতে লাগল।

গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে বোম্বাইয়ের পথে যাত্রা করা গেল। রাজকোট থেকে বোম্বাই যাওয়া এই আমার প্রথম। দাদা আমার সঙ্গে এলেন। কিন্তু 'হাতে বাটি পেটে খিদে, খাওয়া নয় অত সিধে।' শুভ কাজে বহু বিঘ্ন। বোম্বাই গিয়ে অনেক বাধা-বিপদের সম্মুখীন হওয়া গেল।

১২. একঘরে

মায়ের আজ্ঞা ও আশীর্বাদ লাভ ক'রে আমি তো স্ত্রী ও কয়েকমাসের শিশু পুত্র রেখে মহা-আনন্দে বোম্বাইয়ের পথে রওনা দিলাম। বোম্বাই পৌঁছলে পর দাদার কয়েকজন বন্ধু তাঁকে বললেন যে জুন-জুলাই মাসে ভারত মহাসাগরে ভারি ঝড়-তুফানের ভয়। আমার তো এই প্রথম সমুদ্রযাত্রা, নভেম্বর মাসের আগে আমায় যেন পাড়ি দিতে না-হয়। কে-একজন সদ্য একটা জাহাজডুবির খবরও দিলেন। এসব খবরে দাদা বেশ অস্থির হয়ে উঠলেন এবং পৌঁছনোর অব্যবহিত পরে আমায় সমুদ্রপথে যেতে দিতে তাঁর সাহস হ'ল না। বোম্বাইয়ের এক বন্ধুর বাড়িতে আমায় রেখে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর কর্মস্থল রাজকোটে। একজন আত্মীয়ের হাতে আমার রাস্তা-খরচের সমস্ত টাকা গচ্ছিত রাখলেন ও কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধবকে ব'লে গেলেন যেন তাঁরা সর্বপ্রকারে আমায় সাহায্য করেন।

বোম্বাইয়ে আমার আর দিন কাটে না। আমি সর্বক্ষণ বিলেত যাবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে রইলাম।

এদিকে আমার জাতভায়েরা আমার বিলেত যাবার ব্যাপার নিয়ে অস্থির হয়ে উঠল। এপর্যন্ত কোনো মোঢ় বেনিয়া বিলেত যায়নি। আমার যদি তেমন দুঃসাহস হয়ে থাকে তো আমায় উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। মোঢ় বেনিয়াদের একটি সভা ডাকা হ'ল আর আমার হুকুম এল সেই সভায় হাজির হবার জন্য। আমি হাজির হলাম। কী ক'রে যে হঠাৎ আমি সাহস সঞ্চয় করেছিলাম, সে আমি নিজেই জানি না। সেই সভায় হাজির হতে গিয়ে আমার না-হ'ল ভয়, না-হ'ল সঙ্কোচ। বোম্বায়ের মোঢ় বেনিয়াদের যিনি মাথা, সেই শেঠ ছিলেন দূরসম্পর্কে আমাদের আত্মীয়। বাবার সঙ্গে তাঁর এককালে বেশ হৃদ্যতাও ছিল। শেঠ আমায় বললেন, "দেখো হে বাপু, মোঢ় বেনিয়া সমাজের বিচারে তোমার বিলেত যাবার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত নয়। আমাদের ধর্মে বলে সমুদ্র পার হওয়া নিষিদ্ধ। তাছাড়া শোনা যায় ধর্মীয় আচার-বিচার লঙ্ঘন না-ক'রে বিলেতে বসবাস করা শক্ত। সেখানে সাহেবদের সঙ্গে খানাপিনা করতে হয়।"

আমি জবাবে বললাম, "আমার তো মনে হয় না, বিলেত যাওয়া ধর্ম-বিরুদ্ধ। আমি সেখানে যেতে চাই উচ্চশিক্ষার জন্য। যে তিনটি বিষয়ে আপনাদের সবচেয়ে বেশি ভয়, আমি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, সেগুলি পরিহার ক'রে চলব। আমার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস এই প্রতিজ্ঞা আমায় সদাসর্বদা রক্ষা করবে।

শেঠ বললেন, "সে যা-ই হোক্, আমরা তোমাকে বলতে চাই, সেখানে ধর্ম মেনে চলা একেবারেই অসম্ভব। তুমি তো জানো তোমার বাবার সঙ্গে আমার কেমন সদ্ভাব ছিল। আমার কথা তোমার মান্য করা উচিত।"

আমি বললাম, "বাবার সঙ্গে আপনার কেমন সম্বন্ধ ছিল, সে আমি জানি। আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন। কিন্তু এই ব্যাপারে আমি একেবারে নিরুপায়, বিলেত যাবার সঙ্কল্প আমি বদ্‌লাতে পারব না। আমার বাবার বন্ধু ও উপদেষ্টা একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণই

বলেছেন, আমার বিলেত যাওয়ায় কোনো দোষ তিনি দেখতে পান না। তাছাড়া আমার মা ও দাদাও আমাকে তাঁদের অনুমতি দিয়েছেন।"

"কিন্তু সমাজের বিধান কি তাহলে অমান্য করবে?"

"আমি তো কোনো উপায় দেখছি না। আমার মনে হয়, এরকম ব্যাপারে জাত বা সমাজের হাত দেওয়া ঠিক নয়।"

আমার এই জবাব শুনে শেঠ ভীষণ চ'টে গিয়ে আমায় খুব ভৎর্সনা করলেন। আমি নির্বিকার ব'সে রইলাম। শেঠ বিধান দিলেন, "এই ছোকরা আজ থেকে জাতিচ্যুত হ'ল। মোঢ় বেনিয়াদের মধ্যে কেউ যদি একে সাহায্য করে কিংবা বিলেত যাবার দিন এর সঙ্গে জাহাজঘাটে যায়, তাহলে তাকে পাঁচশিকা জরিমানা দিতে হবে।"

এই রায় শুনে আমার কোনো ভাবান্তর ঘটল না, আমি শেঠের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলাম। কিন্তু দাদা এ ব্যাপারটা কী চোখে দেখবেন, এই নিয়ে আমার ভাবনা হ'ল। সুখের কথা, তিনিও তাঁর সঙ্কল্পে অটল হয়ে রইলেন, আমায় চিঠি লিখে জানালেন শেঠের বিধান যাই হোক্-না-কেন, আমার বিলেত যাওয়া তিনি আটকাবেন না।

এই ঘটনার পর আমি পাড়ি দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। দাদার ওপর চাপ দিলে যদি অন্য-কিছু হয়ে যায়। তাছাড়া অদৃষ্টপূর্ব কোনো বাধাও তো এসে পড়তে পারে। এইরকম দুশ্চিন্তায় আমার যখন দিন কাটছে, খবর পাওয়া গেল, জুনাগড়ের একজন উকিল ব্যারিস্টর হবার জন্য ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিলেতগামী এক জাহাজে পাড়ি দেবেন। দাদার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা ক'রে এই কথা জানালাম। তাঁরা সকলেই স্বীকার করলেন, এমন একজন সহযাত্রীর সঙ্গে একত্র যাবার সুযোগ ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। হাতে তখন একটুও সময় নেই।

দাদার কাছে তাঁর অনুমতি চেয়ে 'তার' করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর অনুমতি এসে গেল। যে আত্মীয়টির কাছে জাহাজভাড়ার টাকা গচ্ছিত ছিল, তাঁর কাছে টাকা চাইলাম। তিনি শেঠের বিধানের কথা তুলে বললেন যে তিনি জাত খোয়াতে পারবেন না। তখন আমি আমাদের পরিবারের জনৈক বন্ধুর কাছে অনুরোধ জানালাম যেন তিনি জাহাজভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচটুকু আপাতত আমায় দিয়ে দেন ও দাদার কাছ থেকে ধার শোধ নিয়ে নেন। তিনি রাজি তো হলেনই উপরন্তু আমায় প্রচুর উৎসাহ দিলেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভ'রে গেল। তাঁর দেওয়া টাকা থেকে আমি সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজের টিকিট কিনে ফেললাম। তারপর প্রশ্ন এল বিলেতযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করা। একজন বন্ধুর এসব বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্য সব-কিছুর ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। পোশাকের মধ্যে কিছু আমার পছন্দ হ'ল, কিছু হ'ল না। পরে যে নেকটাই আমি খুব শখ ক'রে পরতাম, নতুন-নতুন মনে হয়েছিল এ যেন যন্ত্রণাবিশেষ। ছোটো জ্যাকেট কোট প'রে মনে হ'ত অর্ধনগ্ন হয়ে আছি। কিন্তু বিলেতযাত্রার উৎসাহ তখন আমার মনের মধ্যে এমন প্রবল যে এসব পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার যেন নিতান্ত অবান্তর মনে হ'ল। সঙ্গে আহার্যবস্তু নিলাম প্রচুর। জুনাগড়ের সেই উকিল শ্রীযুত ত্র্যম্বকরায় মজমুদারের কেবিনেই বন্ধুরা আমার জন্য একটি বার্থ রিজার্ভ ক'রে দিলেন। তিনি যেন আমার দেখাশুনা করেন,

খোঁজখবর নেন, সেই মর্মে তাঁকে অনুরোধও করা হ'ল। বয়সে ও অভিজ্ঞতায় ইনি বেশ পাকা লোক ছিলেন, জাগতিক ব্যাপারে এঁর জ্ঞানগম্যি ছিল যথেষ্ট, আমি ছিলাম আঠারো বছরের অনভিজ্ঞ যুবক, জাগতিক ব্যাপারে নিতান্তই ছেলেমানুষ। মজুমদার মশায় বন্ধুদের ভরসা দিয়ে বললেন আমার সম্বন্ধে তাঁরা যেন দুশ্চিন্তা না-করেন।

শেষপর্যন্ত ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমি বোম্বাই বন্দর থেকে সমুদ্রপাড়ি দিই।

১৩. অবশেষে লন্ডনে

সমুদ্রযাত্রায় যেরকম মাথাধরা, গা বমি-বমি করা দেখা যায়, আমার সেরকম কিছু হয়নি। তবে মন সারাক্ষণ উস্‌খুস্‌ করত। জাহাজে যে স্টুয়ার্ড আমাদের দেখাশুনা ও পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ছিল, তার সঙ্গেও কথা বলতে আমার কেমন বাধো-বাধো ঠেকত। ইংরেজিতে কথা বলায় আমার আদৌ অভ্যাস ছিল না। এক শ্রীযুক্ত মজমুদার ছাড়া ও দ্বিতীয় সেলুনের অন্যসব যাত্রীই ছিলেন ইংরেজ। তাঁদের সঙ্গে আমি কিছুতেই কথা বলতে পারতাম না। তাঁরা যখন আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য এগিয়ে আসতেন, কদাচিৎ তাঁদের কথা বুঝতে পারতাম। বুঝতে পারলেও জবাব দিতে পারতাম না। একটু-কিছু বলবার আগে সব কথাগুলি মনে-মনে সাজিয়ে নিতে হ'ত। ছুরি-কাঁটা ব্যবহারে সম্পূর্ণ আনাড়ি ছিলাম। ভোজ্য তালিকায় কোন্‌টা নিরামিষ কোন্‌টা আমিষ—সেটুকু পর্যন্ত সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম না। সেইজন্য টেবিলে ব'সে খেতাম না, কেবিনে খাবার আনিয়ে নিতাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার খাবার ছিল আমার নিজের সঙ্গে আনা মেঠাই ও শুক্‌নো ফল। মজমুদার মশায়ের এসব অসুবিধে ছিল না, তিনি বেশ সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন। তিনি যখন ডেক্‌-এর ওপর মনের আনন্দে যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়াতেন, আমি কেবিনের এক কোণায় মুখ গুঁজে থাকতাম। ডেক্‌-এ যখন খুব কম লোক থাকত কেবল তখনই চট্‌ ক'রে একবার ডেক্‌-এ পায়চারি ক'রে আসতাম। মজমুদার বলতেন সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, আলাপ-পরিচয় রাখতে হয়। উকিলের মুখচোরা হওয়া শোভা পায় না—মুখে তাঁর কথা লেগেই থাকা উচিত। তিনি মাঝে-মাঝে তাঁর ওকালতির গল্প বলতেন, আর বলতেন, সুযোগ পেলেই ইংরেজি বলা উচিত ; বিদেশী ভাষা বলতে-কইতে ভুল তো হবেই, কিন্তু সুযোগ ছাড়তে নেই। ইংরেজি বলায় আমার সঙ্কোচ আমি অত সহজে জয় করতে পারিনি।

একজন সহযাত্রী ইংরেজ আমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করলেন। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন। আমি কী খাই, কী করি, কোথায় যাব, কেন আমি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করি না—এইসব নানা কথা তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন। আর বললেন যে খানা-খাওয়ার ঘরে আর-পাঁচজনের সঙ্গে একত্র ব'সে খাওয়াদাওয়া করা ভালো। আমাদের জাহাজ যখন লোহিত সাগরে, আমার মাংসাহার বর্জনের শপথের কথা শুনে তিনি একটু হাসলেন, বন্ধুভাবে বললেন, "এ পর্যন্ত মাংসাহার

না-ক'রে এসেছ ভালোই করেছ। কিন্তু বিস্‌কে উপসাগরে একবার পৌঁছলে তোমার প্রতিজ্ঞা টিকবে কি-না সন্দেহ। ইংল্যান্ডে এত শীত যে সেখানে মাংস ছাড়া চলেই না।"

আমি বললাম, "কেন? আমি তো শুনেছি সেখানে মানুষ মাংস না-খেয়েও থাকতে পারে।"

তিনি বললেন, "ওসব স্রেফ্ বাজে কথা। আমার জানাশোনা এমন একটি লোক দেখিনি যে মাংস না-খায়। দেখছ-না, যদিও আমি মদ খাই, তোমায় মদ খাওয়ার কথা বলছি না? কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার মাংসাহার করা দরকার, তা না-হ'লে বিলেতে টিঁকে থাকতে পারবে না।"

আমি বললাম, "আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু মা-কে আমি কথা দিয়েছি আমি মাংস স্পর্শ করব না, সুতরাং মাংসাহার করার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। যদি এমন হয় যে বিলেতে মাংস না-খেলেই নয়, তাহলে বরঞ্চ আমি দেশে ফিরে যাব। কিন্তু বিলেতে থাকার জন্য মাংস খেতে পারব না।"

বিস্কে উপসাগরে পৌঁছনো গেল, কিন্তু মদ বা মাংস খাওয়া নিতান্তই দরকার ব'লে আমার তো মনেই হ'ল না। দেশে থাকতে আমায় বলা হয়েছিল মাংসাহার থেকে আমি যে বিরত আছি সে সম্বন্ধে যেন সার্টিফিকেট সংগ্রহ ক'রে রাখি। ইংরেজ বন্ধুটিকে বলাতে তিনি বেশ খুশি হয়ে আমায় সার্টিফিকেট দিলেন। সেই কাগজটি আমি কিছুদিন পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করেছিলাম। পরে যখন দেখা গেল মাংসাহারী হয়েও ওইরকম সার্টিফিকেট যোগাড় করা যায়, সার্টিফিকেটের মোহ আমার একেবারে ঘুচে যায়। আমার মুখের কথায় যদি বিশ্বাস না-হয়, তাহলে সার্টিফিকেট জমিয়ে কী লাভ হবে?

সে যা-ই হোক্, যদ্দুর স্মরণ হয়, আমরা যেদিন সাদামটন বন্দরে পৌঁছলাম, সেদিনটা ছিল রবিবার। জাহাজে আমি একটি কালো রঙের সুট্ পরতাম। বন্ধুরা আমার জন্য শাদা ফ্লানেল্-এর একটি সুট্ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি বিলেতের মাটিতে পা দেবার সময় পরব ব'লে সযত্নে তুলে রেখেছিলাম। আমার কেন জানি মনে হয়েছিল, জাহাজ ছেড়ে নামবার সময় শাদা পোশাকেই আমায় ভালো মানাবে। তাই আমি সেই ফ্লানেল্-এর সুট্ প'রে নামলাম। সময়টা ছিল সেপ্টেম্বরের শেষদিক। দেখা গেল যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র আমিই শাদা সুট্ প'রে আছি। সঙ্গে আমাব যেসব মালপত্র ট্রাঙ্ক-বাক্স ছিল, গ্রিনলে কোম্পানির এক এজেন্টের হাতে চাবি-সমেত জিম্মা ক'রে দিলাম। দেখলাম সহযাত্রীদের অনেকেই সেই ব্যবস্থা করল, সুতরাং তাঁদের দেখাদেখি আমিও সেরকম করলাম।

আমার কাছে চারটি পরিচয়পত্র ছিল, ডক্টর পি. জে. মেহ্‌তা, শ্রীযুক্ত দৌলতরাম সুকুল, প্রিন্স্ রণজিৎ সিংজী ও দাদাভাই নওরোজির নামে। সহযাত্রীদের মধ্যে একজন পরামর্শ দিয়েছিলেন লন্ডনে আমি যেন ভিক্টোরিয়া হোটেলে গিয়ে উঠি। তাই মজমুদার মশায় ও আমি সেই হোটেলেই গিয়ে উঠলাম। সারা শহরে আমিই একমাত্র শাদা পোশাক প'রে আছি এ কথা মনে ক'রে আমার লজ্জার অবধি ছিল না। হোটেলে গিয়ে যখন শুনলাম,

পরদিন রবিবার ব'লে গ্রিনলে থেকে আমার জিনিসপত্র ফিরে পেতে আরও দুটো দিন লেগে যাবে, তখন বিরক্তিতে আমি ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলাম।

সাদামটন্‌ থেকে ডক্টর মেহ্‌তাকে তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম। তিনি সেদিনই সকাল সাতটায় হোটেলে এসে আমায় আন্তরিক স্বাগত জানালেন। আমি শাদা ফ্লানেল্‌-এর সুট্‌ প'রে আছি দেখে একটু হাসলেন। আলাপ করতে-করতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে তাঁর রেশমের উঁচু টুপিটা তুলে নিলাম। টুপিটা কেমন মসৃণ দেখার জন্য তার ওপর উল্‌টোভাবে হাত বুলোতে লাগলাম। তাতে টুপির রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠল। তিনি একটু রাগত হয়ে আমায় টুপির ওপর হাত বুলোতে বারণ করলেন। কিন্তু নষ্ট যতটুকু হবার, ততক্ষণে তা হয়ে গেছে। এই ঘটনা থেকে ভবিষ্যতে সাবধান হবার শিক্ষা আমি পেলাম। ইউরোপীয় আদবকায়দায় এইভাবে আমার প্রথম পাঠ শুরু হ'ল। ডক্টর মেহ্‌তা হাস্যপরিহাস ক'রে বললেন, "অন্য লোকের জিনিস ছুঁতে নেই। দেশে আমরা যেমন প্রথম পরিচয়ে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে তা চলবে না। চেঁচিয়ে কথা ব'লো না, আর দোহাই তোমার, দেশে সাহেবমাত্রকে যেমন 'সার' বলা হয়, এখানে সেরকম বলতে যেয়ো না। এখানে কেবল চাকরবাকর কিংবা অধস্তন কর্মচারী মনিবকে 'সার' ব'লে সম্বোধন করে। এইরকম আরও অনেক কথা তিনি আমায় বুঝিয়ে বললেন। তিনি আরও বললেন, বিলতে হোটেলে থাকা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ, তার চেয়ে ভালো কোনো গৃহস্থ পরিবারে খরচখরচা দিয়ে অতিথি হয়ে থাকা। বললেন এ বিষয়ে সোমবারে আরো বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে।

মজমুদার মশায় ও আমি দেখলাম হোটেলে থাকা বিরক্তিকর ব্যাপার। খরচও বিস্তর। মাল্টা থেকে এক সিন্ধি ভদ্রলোক জাহাজে আমাদের সহযাত্রী হয়ে এসেছিলেন। মজমুদার মশায়ের সঙ্গে এঁর বেশ ভাব হয়। লণ্ডন তাঁর পরিচিত শহর। তিনি আমাদের বাসস্থান খুঁজে দেবার ভার নিলেন। আমরা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলাম এবং সোমবারে আমাদের মালপত্র ফেরৎ পাবার পর, হোটেলের বিল্‌ চুকিয়ে দিয়ে, আমরা সেই সিন্ধি ভদ্রলোকের কথামতো অন্যত্র উঠে গেলাম। তিনি আমাদের জন্য বাসস্থান ভাড়া ক'রে রেখেছিলেন। আমার মনে পড়ে, দুটোদিন থাকা-খাওয়ার জন্য আমায় হোটেল বিল্‌ বাবদ তিন পাউন্ড দিতে হয়েছিল। আমি তো বিল্‌-এর অঙ্ক দেখে স্তম্ভিত। অত টাকা দিয়েও আমি দুটো দিন একপ্রকার উপবাসী ছিলাম। হোটেলের খাওয়া আমার একটুও ভালো লাগেনি। একটি ডিস্‌ ভালো লাগল না ব'লে আরেকটা ডিশ্‌ তার বদলে আনিয়ে নিলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত দুটো ডিশ্‌-এরই দাম আমায় দিতে হ'ল। আসলে এই দুটোদিন বোম্বাই থেকে আমি যে খাবারদাবার এনেছিলাম, তাই খেয়ে থাকতাম বলা চলে।

হোটেলের কামরাতে থাকতেও আমার খুব অসোয়াস্তি লাগত। সর্বক্ষণ দেশের কথা, নিজেদের বাড়ির কথা মনে পড়ত। আর মনে পড়ত মায়ের ভালোবাসার কথা। রাত্রে ঘরের স্মৃতি আমায় এমনভাবে পেয়ে বসত যে চোখে আর ঘুম আসত না, অঝোরে চোখের জল ঝরত। আমার এই দুঃখ-বেদনার কথা কাউকে ব'লে যে মনের ভার লাঘব করব, তার পর্যন্ত জো ছিল না। কাকেই-বা বলব, আর ব'লেই-বা কী লাভ? মনকে বোঝাব,

সান্ত্বনা দেব—তার উপায় পর্যন্ত খুঁজে পেতাম না। সব-কিছু অচেনা-অজানা—লোকজন, আচার-ব্যবহার, ঘর-বাড়ি—সবই নতুন। ইংরেজি আদবকায়দায় আমি নিতান্তই কাঁচা। কোথায় কোন্ নিয়মভঙ্গ হয়—তা-ই নিয়ে সর্বক্ষণ আমি ভয়ে-ভয়ে থাকতাম। উপরন্তু ছিল নিরামিষ আহারের অভ্যাস। আমার খাওয়ার মতো যতটুকু পাওয়া যেত, তা মুখে দিতেও রুচি হ'ত না, রান্নাবান্না বিস্বাদ মনে হ'ত। আমি যেন উভয়সঙ্কটের সঙ্গীন অবস্থায় হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। বিলেত আমার ভালো লাগছিল না, কিন্তু তাই ব'লে দেশে ফিরে যাওয়া তো চলতে পারে না। আমার বিবেক বলল যে এ দেশে যখন একবার এসে পড়েইছি, তিনটি বছর পুরো এখানে আমায় কাটিয়ে যেতে হবে।

১৪. আপন রুচি

সোমবারে ডক্টর মেহ্তা আমার খোঁজে ভিক্টোরিয়া হোটেল গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, আমরা হোটেল ছেড়ে চ'লে গেছি। আমার নতুন ঠিকানা জোগাড় ক'রে তিনি দেখা করতে এলেন। নিছক বোকামির দরুণ জাহাজে থাকতে আমার দাদ হয়েছিল। মুখ-হাত-পা ধোয়ার জন্য ও স্নানের জন্য জাহাজে নোনা জল সরবরাহ করা হ'ত। নোনা জলে সাবান রগড়ালে ফেনা হয় না। আমার আবার ধারণা ছিল গায়ে সাবান না-মাখলে ঠিক ভদ্রলোক হওয়া যায় না। কিন্তু নোনা জলে ঘ'ষে গায়ের চামড়া পরিষ্কার হওয়া দূরের কথা, তেলচিটে হয়ে থাকত। এর ফলে দাদ হ'ল। ডক্টর মেহ্তাকে দেখালাম, তিনি এসেটিক্ এসিড লাগাবার পরমর্শ দিলেন। এসিডের জ্বালায় আমার চোখে জল এসেছিল। ডক্টর মেহ্তা আমার কামরা খুঁটিয়ে দেখলেন ও মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "এ জায়গায় তোমার থাকা চলবে না। বিলেতে আমরা আসি কেবল উচ্চশিক্ষার জন্য নয়, বিলেতি আদবকায়দা রপ্ত করার জন্য। তা যদি করতে হয় তো তোমায় কোনো ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে থাকতে হবে। কিন্তু তা করার আগে তোমায় কিছুকালের জন্য অমুকের ওখানে নিয়ে যাব শিক্ষানবিশি করার জন্য।

আমি তাঁর প্রস্তাবে সানন্দে সায় দিলাম এবং তাঁর সেই বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ইনি আমার প্রতি বেশ সদয় ছিলেন ও ভালো ক'রে আমার দেখাশোনা করতেন। আমায় নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো দেখতেন। তিনি আমায় বিলেতি আদবকায়দা শেখালেন, ইংরেজিতে কথা বলায় আমায় বিলক্ষণ তালিম দিলেন। আমার আহারের সমস্যাটা শক্ত হয়ে উঠল। নুন-মশলা ছাড়া সেদ্ধ শাকপাতা খেতে আমার ভালো লাগত না। গৃহকর্ত্রী ভেবেই পান না আমায় কী রেঁধে খাওয়াবেন। প্রাতরাশের সময় ওট্-মিলের পরিজ খেয়ে বেশ পেট ভরত। কিন্তু দুপুরে ও রাতে আমায় একপ্রকার অনাহারে থাকতে হ'ত। সেই বন্ধু ভদ্রলোক সর্বদা আমিষ আহারের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলতেন, আমি যেন মাংস খাওয়া ধরি। আমি আমার প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ ক'রে চুপ ক'রে তাঁর কথা শুনে যেতাম। দুপুরে

ও রাতের খাওয়ার সঙ্গে থাকত পাউরুটি, সেদ্ধ শাক ও ফলের জ্যাম। আমি খেতে পারতাম ভালো, আমার খিদেও ছিল বেশ। কিন্তু রুটি দু-তিন টুক্‌রোর বেশি চাইতে লজ্জা করত। ভাবতাম, বেশি-বেশি চেয়ে খাওয়াটা দস্তুর-মাফিক হয়তো হবে না। তাছাড়া দুপুরে বা রাতে দুধের বরাদ্দ ছিল না। আমার দুরবস্থা দেখে বন্ধুটি একদিন চ'টে গিয়ে বললেন, "তুমি যদি আমার নিজের ভাই হতে, তাহলে এদ্দিনে নির্ঘাৎ তোমায় দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতাম। এ দেশের অবস্থার কথা না-জেনেশুনে নিরক্ষর মায়ের কাছে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছ তাতে হয়েছে কী? ওরকম কথা দেবার কোনো মূল্য নেই—ও প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নয়, আইনে এরকম প্রতিজ্ঞা অসিদ্ধ। আসলে এই প্রতিজ্ঞা আঁকড়ে থাকা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর-কিছু নয়। এইভাবে যদি গোঁ ধ'রে ব'সে থাকো, তাহলে এ-দেশ থেকে কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না। তোমার কাছেই শুনেছি, দেশে থাকতে তুমি মাংস খেয়েছ ও মাংস খেতে তোমার ভালোও লেগেছে। যেখানে মাংস খাওয়ার দরকার ছিল না সেখানে বেশ খেয়েছ, আর এ-দেশে মাংস ছাড়া চলে না ব'লে মাংস খাবে না—এ তো ভারি অদ্ভুত কথা।"

কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে রইলাম।

দিনের পর দিন যতই বন্ধুটি এভাবে আমায় বোঝাতে চাইতেন, ততই যেন আমার জিদ চ'ড়ে যেত। আমি ক্রমাগত মাথা নেড়ে তাঁকে বলতাম, না, না, না! প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম, ঈশ্বর যেন আমায় প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আপরাধ থেকে রক্ষা করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তখন আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তবে মনে হয় তিনি আমায় কৃপা করেছিলেন। আমার দাই রম্ভাবাঈ আমার মনে যে ভগবৎ-বিশ্বাসের বীজ রোপণ করেছিল, সেই বিশ্বাসই আমায় বাঁচিয়েছিল।

আমার সেই বন্ধু একদিন বেন্থামের একটি বই প'ড়ে শোনচ্ছিলেন। বইয়ের নাম ছিল *Theory of Utility* অর্থাৎ প্রয়োজনবাদ। আমি সে বইয়ের বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারলাম না। বইয়ের ভাষা এত জটিল যে তার একটি কথাও আমার বোধগম্য হ'ল না। তিনি তখন বেন্থামের বক্তব্য আমায় বুঝিয়ে দিতে চাইলেন। আমি তাঁকে বললাম, "আমায় মার্জনা করুন। এসব জটিল তর্কের কূটকচাল আমার বুদ্ধির সীমার বাইরে। মাংস খাওয়া উচিত—এ কথা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙতে পারব না। সেটা ঠিক তর্কের বিষয়ও নয়, আর তর্কে আপনার সঙ্গে পেরে উঠব—আমার সে ভরসাও নেই। আমায় নির্বোধ ও জেদী মনে ক'রে আমার আশা না-হয় ছেড়েই দিন। আপনি আমায় স্নেহ করেন, আমার মঙ্গল চান—সে কথা আমি বুঝতে পারি। আমার দুরবস্থা দেখে আপনার দুঃখ হয় ব'লেই আপনি বারবার আমায় বোঝাতে চান, সে কথাও আমি বুঝি। কিন্তু আমি নিরুপায়। প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙতে পারব না।"

বন্ধু আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন, বই বন্ধ ক'রে বললেন, "বেশ, আর আমি তোমার সঙ্গে বিচার-বিতর্ক করতে যাব না। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে আর একটিও কথা তোলেননি। তাই ব'লে আমায় নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার যে নিরসন ঘটল, এমন নয়। তিনি নিজে ধূমপান করতেন, মদ খেতেন—কিন্তু আমায়

কোনোদিন এসব খেতে বলেননি। বরঞ্চ এসব পরিহার করার কথাই বলেছেন। মাংস না-খেয়ে আমি দুর্বল হয়ে পড়ব, বিলেতের জীবনযাপনে অপারগ হয়ে পড়ব, আমার সম্বন্ধে এই ছিল তাঁর একমাত্র দুর্ভাবনা।

এইভাবে একমাসকাল আমার শিক্ষানবিশির পালা চলল। বন্ধুবরের বাসা ছিল রিচমন্ড্-এ। সেখান থেকে শস্তায় দু-একদিনের বেশি লন্ডনে যাওয়া চলত না। সুতরাং ডক্টর মেহ্‌তা ও শ্রীযুক্তা দলপৎরাম শুক্ল স্থির করলেন, এবার আমায় কোনো পরিবারের সঙ্গে বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। শ্রীযুক্ত শুক্ল ওয়েস্ট কেন্‌সিংটন্-এ এক এংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের সন্ধান পেয়ে, সেখানে আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। গৃহকর্ত্রী ছিলেন বিধবা ও বর্ষিয়সী। আমার প্রতিজ্ঞার কথা তাঁকে বলতে তিনি ভালোভাবে আমার দেখাশুনা করবেন ব'লে কথা দিলেন। আমি তাঁর বাড়ির বাসিন্দা হলাম। এখানেও আমার একপ্রকার না-খেয়ে দিন কাটতে লাগল। সব খাবার বিস্বাদ মনে হয়। আমি দেশে লিখে দিয়েছিলাম, আমার জন্য মেঠাই ও অন্যান্য খাবার যেন পাঠানো হয়। তখনো পর্যন্ত সেসব কিছুই এসে পৌঁছয়নি। বৃদ্ধা প্রতিদিনই জিজ্ঞেস করেন, খাবার আমার পছন্দ হচ্ছে কি-না। কিন্তু তিনিই-বা কতটুকু করবেন! আমি তখনো আগের মতোই লাজুক ছিলাম, মুখের কাছে যতটুকু যা ধ'রে দেওয়া হ'ত, তার উপরন্তু কিছু যে চেয়ে নেব, তেমন সাহস আমার ছিল না। বৃদ্ধার দুই মেয়ে খুব আগ্রহ ক'রে আমায় দু-এক টুক্‌রো রুটি বেশি দিত। তারা কী ক'রে আর জানবে একটা আস্ত রুটি না-হ'লে আমার পেট ভরানো মুশকিল।

এখন আমি অনেকটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। নিয়মিত পড়াশুনা তখনো শুরু করিনি। শ্রীযুক্ত শুক্লের কল্যাণে সদ্য খবরকাগজ পড়ার অভ্যাস আয়ত্ত করেছি। দেশে থাকতে আমি কখনো খবরকাগজ পড়িনি। কিন্তু নিয়মিত পড়ার ফলে এ দেশে খবরকাগজ পড়ায় আমার যেন একটা আগ্রহ দেখা দিল। প্রতিদিন *ডেলি নিউজ, ডেলি টেলিগ্রাফ, পলমল গেজেট* প্রভৃতি কাগজের ওপর চোখ বোলাতাম। এতে আমার ঘণ্টাখানেকও লাগত না। সুতরাং আমি লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। নিরামিষ আহারের রেস্তোরাঁ আছে কি-না খোঁজ নিতে লাগলাম। গৃহকর্ত্রীর কাছে জেনেছিলাম, লন্ডনে এরকম শাকাহারী রেস্তোরাঁ কিছু আছে। রোজ আমি দশ-বারো মাইল হাঁটতাম। কোনো-কোনো দিন শস্তা কোনো রেস্তোরাঁয় ঢুকে পেট ভ'রে রুটি খেতাম, কিন্তু তাতে কোনো তৃপ্তি ছিল না। এইভাবে ঘুরতে-ঘুরতে একদিন ফেরিংডন্ স্ট্রিট্-এ একটি নিরামিষ আহারের রেস্তোরাঁ আবিষ্কার করা গেল। মনের মতো খেলা পেলে শিশুদের যেমন আনন্দের অবধি থাকে না, এই রেস্তোরাঁ দেখে আমার তেমনি হ'ল। রেস্তোরাঁয় ঢোকার আগে দেখলাম, দরজার কাছে একটা কাচের জানলায় নিচে কয়েকটি বই বিক্রয়ের জন্য সাজানো রয়েছে। তার মধ্যে ছিল সল্ট-এর লেখা *Plea for Vegetarianism* অর্থাৎ নিরামিষ ভোজনের সপক্ষে যুক্তি। এক শিলিং দিয়ে এই বইটি কিনে আমি সোজা খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম। বিলেতে আসার পর এই আমার প্রথম পেট ভ'রে খাওয়া। মনে হ'ল, এতদিনে ঈশ্বর আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।

সল্ট-এর বইটি আদ্যোপান্ত প'ড়ে আমার খুব ভালো লাগল। যেদিন আমি এ বই

পড়েছি, সেদিন থেকে আমি আপন রুচি অনুসারে ও স্বেচ্ছায় নিরামিষাহারের ভক্ত হয়েছি ব'লে বলা যেতে পারে। মাংস স্পর্শ করব না-ব'লে মা-র কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সেই কথা ভেবে এখন আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এতদিন আমি আমার প্রতিজ্ঞা ও সত্যরক্ষার খাতিরে আমিষ খাওয়া থেকে বিরত থেকেছি—সে কথা সত্য। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে-মনে বলেছি, ভারতীয়দের পক্ষে আমিষ খাওয়া ভালো, আমিষ খাওয়া উচিত। মনে আশা পোষণ করেছি যে কোনোদিন যদি প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তিলাভ করি, তাহলে নিজে খোলাখুলিভাবে আমিষ আহার করব ও অন্যদেরও দলে টানব। সল্ট-এর বই পড়ার পর নিরামিষ ভোজনের ভক্ত হয়ে উঠলাম এবং মনে-মনে ইচ্ছা হ'ল অন্যদেরও নিরামিষ-ভোজীদের দলে টানব।

১৫. সাহেব হবার চেষ্টা

নিরামিষ আহারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা দিন-দিন বাড়তে লাগল। সল্ট-এর বই পড়ার পর থেকে আহার ও আহার্য বিষয়ে আরো জানবার জন্য আগ্রহ হ'ল। নিরামিষ আহার সম্বন্ধে আর যা-কিছু বই পাওয়া গেল, আমি একে-একে প'ড়ে ফেললাম। এর মধ্যে ছিল হাওয়ার্ড উইলিয়ম্স্-এর বই *The Ethics of Diet* অর্থাৎ আহারের নৈতিক দিক। এই বইয়ের আলোচ্য বিষয় ছিল, প্রাচীন যুগ থেকে শুরু ক'রে বর্তমান যুগ পর্যন্ত, জীবনী-সাহিত্যে আহার ও আহার্য বিষয়ে যেসব উল্লেখ আছে, তার সংকলন। উইলিয়ম্স্ প্রমাণ করতে চেয়েছেন পাইথাগোরাস্ ও যীশু থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত জগতে যত দার্শনিক পণ্ডিত কিংবা ধর্মগুরু জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সকলেই নিরামিষাশী। ডক্টর অ্যানা কিংসফোর্ড-এর *The Perfect Woz in Diet* অর্থাৎ উত্তম আহার্য বইটিও ছিল বেশ চিত্তাকর্ষক। শরীরপালন ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে ডক্টর এলিন্সন্-এর লেখাও নানা দিক থেকে আমার কাজে লেগেছিল। শরীর নীরোগ রাখার জন্য তিনি ওষুধের ওপর তত জোর দিতেন না, যতটা দিতেন খাদ্যের ওপর। তিনি স্বয়ং নিরামিষাশী তো ছিলেনই, আমিষ আহারে আজীবন অভ্যস্ত তাঁর রোগীদের জন্যও তিনি নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা দিতেন। এইসব বই পড়ার ফলে, আহার ও আহার্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজকে আমি জীবনে বেশ-একটা বড়ো স্থান দিয়েছি। প্রথমে এইসব পরীক্ষা করতাম কেবল স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ রেখে, পরে ধর্ম ও নীতির দিকটাই অবশ্য বড়ো হয়ে উঠেছিল।

এদিকে আমার সেই বন্ধুর কিন্তু আমার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা দূর হয়নি। আমার প্রতি স্নেহবশত তাঁর আশঙ্কা ছিল যে যদি আমিষভোজনে আমার অনিচ্ছা টিকে থাকে তাহলে দেহে-মনে আমি দুর্বল থেকে যাব এবং বিলেতের সভ্যসমাজে স্বচ্ছন্দভাবে মেলামেশা করতে পারব না। তিনি যখন শুনলেন, আমি নিরামিষ আহার বিষয়ে পুথিপত্র পড়তে শুরু করেছি, তাঁর ভয় হ'ল আমার মাথা হয়তো গুলিয়ে যাবে, আমি হয়তো নিজের লেখাপড়ার কাজ ছেড়ে, আহার নিয়ে পরীক্ষায় এমন মেতে উঠব যে আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে। সুতরাং

আমায় শোধরাবার জন্য তিনি এক শেষ চেষ্টা করলেন। একদিন তিনি আমায় থিয়েটার দেখার নেমন্তন্ন করলেন। ঠিক হ'ল থিয়েটারে যাবার আগে হোবর্ন রেস্তোরাঁয় আমরা দু-জনে ডিনার খেয়ে নেব।

ভিক্টোরিয়া হোটেল ছাড়ার পর এরকম বড়ো ও প্রাসাদের মতন হোটেলে খেতে আসা এই আমার প্রথম। এরকম জায়গায় আমায় এনে ফেলে বন্ধুবর ভেবেছিলেন আমি হক্‌চকিয়ে যাব ও সঙ্কোচবশত কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব না। বহু লোক খেতে বসেছেন, তাদের মধ্যে আমরা দু-জন একটি আলাদা টেবিলে খেতে বসলাম। প্রথমেই ছিল সূপ। কীসের সূপ তা আমার জানা ছিল না, বন্ধুকে যে জিজ্ঞেস করব তেমন সাহস হ'ল না। অগত্যা আমি ওয়েটারকে ইঙ্গিতে ডাকলাম। বন্ধুবর বুঝতে পেরে বেশ রাগত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, কী হয়েছে?" আমি একটু ইতস্তত ক'রে বললাম, "সূপটা সব্‌জির কি-না জিজ্ঞেস করতে চাই।" বন্ধু আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। বললেন, "ভদ্র সমাজে এরকম জংলীপনা করলে চলবে না। যদি সভ্য ব্যবহার করতে না-পারো, তাহলে বরঞ্চ উঠে যাও। অন্য কোনো রেস্তোরাঁয় খেয়ে-দেয়ে বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো।" আমি বেশ খুশি হয়ে উঠে চ'লে গেলাম। পাশেই এক নিরামিষ রেস্তোরাঁ ছিল, কিন্তু ততক্ষণে তা বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং সে রাতটা আর খাওয়া হ'ল না। যথাসময়ে বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেলাম, হোবর্ন রেস্তোরাঁর ঘটনা বিষয়ে তিনি একটি কথাও বললেন না। আমিও কিছু বললাম না।

আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে এটাই ছিল শেষবারকার মতো মনকষাকষি। এতে আমাদের সম্বন্ধ বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি। আমার বন্ধুর সমস্ত কাজে ও আচরণে আমি দেখতাম, তিনি যা-কিছু করেছেন আমার প্রতি স্নেহবশত করেছেন। চিন্তায় ও কর্মে আমাদের দু-জনের মধ্যে যতই ব্যবধান থাক্‌-না-কেন, তাঁর এই স্নেহশীল অন্তরের জন্য তাঁকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম।

স্থির করলাম, আমার সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তা দূর করতে হবে। আমার আচরণে যাতে আর জড়তা না-থাকে সেজন্য সবদিকে নিজেকে মার্জিত ক'রে নেব। ভদ্র সমাজে মেলামেশার উপযোগী এমনসব গুণ আয়ত্ত করব যে তাতে আমার নিরামিষাশী হবার সমস্ত ত্রুটি ঢাকা প'ড়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যসাধন করতে গিয়ে আমি অভিজাত ইংরেজ হবার দুরূহ কাজে উঠে-প'ড়ে লাগলাম।

আমার ধারণা হ'ল, বোম্বাই কাট্‌-এর যেসব সুট্‌ আমি পরতাম, বনেদি ইংরেজ সমাজে তা অচল। সুতরাং আর্মি এন্ড নেভি স্টোর থেকে নতুন পোশাক তৈরি হয়ে এল। উনিশ শিলিং দাম দিয়ে উঁচু কালো চিমনি পট্‌ টুপি মাথায় চড়ালাম। তখনকার দিনেও টুপির জন্য উনিশ শিলিং দাম অত্যধিক মনে করা হ'ত। এততেও সন্তুষ্ট না-হয়ে লন্ডনের ফ্যাশনদুরস্ত ইংরেজের মতো, দশ পাউন্ড খরচ ক'রে আমি এক প্রস্থ সান্ধ্য-পোশাক তৈরি করালাম। স্নেহান্ধ ও সহৃদয় আমার দাদাকে বলতে তিনি ঘড়ির জন্য আমায় সোনার ডবল চেন পাঠিয়ে দিলেন। তৈরি বো-টাই পরাটা ঠিক কেতাদুরস্ত নয় ব'লে নিজেই টাই বাঁধতে শিখলাম।

দেশে থাকতে, যেদিন বাড়ির নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে যেত সেদিনমাত্র আরশিতে মুখ দেখার সুযোগ পেতাম। আজকাল তো নিখুঁত কায়দায় টাই বাঁধতে ও চুল আঁচড়িয়ে সিঁথি কাটতেই আমার দশ মিনিটকাল প্রকাণ্ড একটা আয়নার সামনে কেটে যেত। চুল আমার নরম ছিল না, সুতরাং তাকে শায়েস্তা রাখার জন্য প্রতিদিন ব্রুশ নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হ'ত। পাছে চুলের পাট নষ্ট হয় সেজন্য টুপি পরবার সময় কিংবা খোলবার সময়, চুল ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত হাত উঠত মাথায়। মার্জিত সমাজে ব'সেও চুল ঠিক রাখতে গিয়ে মাঝে-মাঝে চুলের মধ্যে আঙুল চালানো সভ্য রীতি ব'লে বিবেচনা করা হ'ত।

এত-শত চেষ্টাও যেন যথেষ্ট ব'লে মনে হ'ল না। এবার আমি বনেদি ইংরেজ বনবার ইচ্ছায় অন্যান্যসব খুঁটিনাটির দিকে নজর দিলাম। শুনলাম, নাচ, ফ্রেঞ্চ্ ও শুদ্ধ বাচনভঙ্গী আয়ত্ত করার জন্য আমার নিয়মিত পাঠ নেওয়া দরকার। ফ্রেঞ্চ্ তো কেবল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভাষা নয়, সমগ্র ইউরোপের ভাব-বিনিময়ের ভাষা। আমার ইউরোপ ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল। আমি নাচের ক্লাসে যোগ দেওয়া স্থির করলাম এবং তিন মাসের একটা টার্ম্-এর ফি হিসেবে আগাম তিন পাউণ্ড জমাও দিলাম। তিন সপ্তাহে আমি গোটা-ছয়েক পাঠ নিয়েছিলাম। কিন্তু, দেখা গেল তালে-তালে পা ফেলা আমার সাধ্যের অতীত। পিয়ানোর বাজনা আমি ঠিকরকম ধরতে পারতাম না, তাই তাল ঠিক রেখে হাঁটা-চলা আমার অসম্ভব মনে হ'ল। এখন কী করা যায়? আমার আবস্থা হ'ল উপকথার সেই সন্ন্যাসীর মতো। ইঁদুরের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচতে গিয়ে বেড়াল পোষা, বেড়াল পুষতে গোরু, আর গোরুর তদারকি ও দুধ দোয়াবার জন্য রাখাল নিযুক্ত করতে গিয়ে, সন্ন্যাসীকে ঘোরতর সংসারী হতে হয়েছিল। আমি ভাবলাম, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তাল-মান বুঝতে হ'লে আমার বেহালা বাজানো শেখা দরকার। সুতরাং তিন পাউণ্ড খরচ ক'রে একটি বেহালা কিনলাম, শিখতে গিয়েও কিছু ফি দিতে হ'ল। বাচনভঙ্গী শুদ্ধ করার জন্য তৃতীয় এক শিক্ষক খুঁজে বের করলাম। তাঁকে আগাম এক গিনি ফি দিলাম ও তাঁর পরামর্শমতো বেল্-এর *Standard Elocutionist* নামে একটি পাঠ্যকেতাবও খরিদ করলাম। পিট্-এর বক্তৃতা মুখস্থ ক'রে আমার পাঠ আরম্ভ হ'ল।

কিন্তু এই বেল্ সাহেবই আমার কানে ঘন্টা বাজালেন। আমি জেগে উঠলাম। আমি নিজেকে বোঝালাম, আমায় তো আজীবন বিলেতে কাটাতে হবে না। সুতরাং শুদ্ধ বাচনভঙ্গী আয়ত্ত ক'রে আমার কী লাভ? আর, তা্লে-মানে শুদ্ধ পা ফেলে নাচতে পারলেই আমি এ দেশে ভদ্রলোক ব'লে গণ্য হব, এটাই-বা কেমন কথা? বেহালা তো আমি দেশে ব'সেও শিখে নিতে পারি। আমি ছাত্র, শিক্ষার জন্য এসেছি, শিক্ষা আমার লাভ করা দরকার। ব্যারিস্টরি করার জন্য আমায় শিক্ষা অর্জন করতে হবে। চারিত্রশক্তিতে আমি যদি ভদ্র থাকি, তাহলেই তো আমি ভদ্রলোক। তা যদি না-হয়, তা হ'লে ভদ্র হবার বৃথা আশা আমায় ত্যাগ করতে হয়।

এইধরনের চিন্তা আমায় পেয়ে বসল। আমার বাচন-শিক্ষককে আমি চিঠি লিখে এইসব কথা জানলাম এবং অনুরোধ করলাম যে অতঃপর যদি তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে না-যাই, তিনি যেন কিছু মনে না-করেন। মাত্র দু-তিনটি পাঠই তাঁর কাছ থেকে নিয়েছিলাম। যিনি

নাচ শেখাতেন তাঁকেও ওইরকম চিঠি দিলাম। বেহালার শিক্ষয়িত্রীর কাছে নিজেই চ'লে গেলাম এবং বললাম, তিনি যেন যে দামে হয় বেহালাটা বেচে দেন। এঁর সঙ্গে আমার খানিকটা বন্ধুভাব ছিল, সুতরাং তাঁকে খোলাখুলি আমার মোহভঙ্গের কথা বললাম। আমার জীবনে আমি আমূল পরিবর্তনসাধনে কৃতসঙ্কল্প শুনে, তিনি আমায় উৎসাহ দিলেন।

বলেছি, ইংরেজ ভদ্রলোক বনবার মোহ আমার মাস-তিনেক ছিল। কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদে ছিমছাম থাকার অভ্যাস অনেকদিন টিকে ছিল। সে যা-ই হোক্, এরপর থেকে আবার আমার ছাত্রজীবন শুরু হ'ল।

১৬. পরিবর্তন

আমি নাচ ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম ব'লে কেউ যেন না-ভাবেন যে আমার জীবনযাত্রায় এইসময় শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ ক'রে থাকবেন, বুদ্ধি-বিবেচনা আমার পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। মোহাবিষ্ট অবস্থাতেও কিছুটা আত্মপরীক্ষার কাজ চলছিল। আমি পাই-পয়সারও হিসেব রাখতাম, বুঝেসুঝে খরচপত্র করতাম। বাস্-এ যাতায়াত, ডাকটিকেট কিংবা খবরকাগজ কেনা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে যা-কিছু পয়সা খরচ হ'ত, প্রতি রাত্রে শুতে যাবার আগে হিসেবের খাতায় লিখে জমাখরচ মিলিয়ে নিতাম। আমার এই অভ্যাস আজও বজায় আছে। এর ফলে এই হয়েছে যে জনসেবার কাজে যদিও আমার হাত দিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, আমি যথেষ্ট সতর্কভাবে সেইসব খরচপত্র করতে পেরেছি। যেসব আন্দোলনে আমি নেতৃত্ব করেছি, সেগুলি চালাতে গিয়ে আমায় কখনো ধারকর্জ তো করতে হয়ইনি, উল্‌টে বরঞ্চ দেখা গেছে প্রত্যেকবারই তহবিলে কিছু উদ্‌বৃত্ত থেকে গেছে। যাঁদের বয়স অল্প, তাঁরা যেন আমার এই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা লাভ করেন, যেন জমাখরচের হিসেব তাঁরাও যত্ন ক'রে রাখেন। তা থেকে আমার যেমন উপকার হয়েছে, তাঁদেরও তেমন হবে।

প্রতিদিনের জীবনযাত্রার প্রতি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ব'লে আমি যথাসময়ে বুঝেছিলাম আমার খরচ কমানো দরকার। খরচ একেবারে আদ্ধেক ক'রে ফেলব স্থির করলাম। হিসেব দেখে বুঝলাম, যাতায়াতে অত্যধিক খরচ হচ্ছে। আমার পক্ষে একটা পরিবারের অতিথি হয়ে থাকার ফলে প্রতি সপ্তাহে আমায় নিয়মিত একটা থোক টাকা দিতে হ'ত। সৌজন্যের খাতিরে কখনো-কখনো তাদের ডিনারে নিয়ে যেতে হয়, কিংবা তাদের সঙ্গে যদি স্ত্রীলোক থাকতেন, তাহলে বিলেতের রেওয়াজ-মাফিক তাবৎ খরচ তো আমাকেই বহন করতে হ'ত। বাইরে ডিনার খেতে যাওয়াও অতিরিক্ত খরচের ব্যাপার, আর না-খাওয়ার জন্য সাপ্তাহিক বিল্ থেকে কিছু মকুব পাওয়া যেত না। আমার মনে হ'ল, এসব ব্যাপারে যদি খরচ সঙ্ক্ষেপ করা যায়, তাহলে নিছক চক্ষুলজ্জার খাতিরে পকেটে টান পড়ে না।

তাই স্থির করলাম, এখন থেকে পরিবারের মধ্যে না-থেকে ঘর-ভাড়া ক'রে থাকব।

যখন যে জায়গায় কাজ, তার কাছাকাছি যদি ঘর-ভাড়া করি, তাহলে অভিজ্ঞতাও বাড়ে। এমনসব জায়গায় ঘর-ভাড়া নিলাম যেখান থেকে হাঁটা পথে কাজের জায়গায় পৌঁছতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। এতে ক'রে যানবাহনের খরচটাও বাঁচে। ইতিপূর্বে কোথাও যেতে হ'লেই গাড়ি-ভাড়া করতাম, পায়ে হেঁটে বেড়াবার জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ করতে হ'ত। নতুন ব্যবস্থায় বেড়ানো ও টাকা বাঁচানো—এই দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে লাগল। প্রতিদিন বেশ আট-দশ মাইল বেড়ানো হ'ত। প্রত্যহ লম্বা পাল্লায় এইরকম হাঁটাচলার ফলে শরীরও বেশ মজবুত হ'ল। প্রধানত এই কারণেই বিলেত থাকতে আমার একপ্রকার অসুখবিসুখ করেনি বললেই হয়।

প্রথম-প্রথম আমি দু-কামরাওয়ালা ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম—একটি শোওয়ার, অন্যটি বসবার। আমার জীবনযাত্রার এই পর্বকে দ্বিতীয় দফার পরিবর্তন বলা যায়। তৃতীয় দফার কথা যথাস্থানে বলা যাবে।

এইভাবে টাকার খরচ প্রায় অর্ধেক ক'রে ফেললাম। কিন্তু হাতে যে সময় তা খরচ করি কীভাবে? ব্যারিস্টরি পরীক্ষার জন্য খুব যে বেশি পড়তে হয় না, এ আমি জানলাম। সেইজন্য সময়ের টানাটানি আমার বড়ো-একটা ছিল না। ইংরেজিতে আমি কাঁচা ব'লে আমার খুব দুশ্চিন্তা হ'ত। লেলী সাহেব (পরে তিনি স্যর ফ্রেড্‌রিক লেলী হয়েছিলেন) সেই যে আমাকে বলেছিলেন, "আগে বি.এ. পাশ করো, তারপর আমার সঙ্গে দেখা ক'রো", সেই কথাগুলো এখনো আমার কানে যেন বাজত। মনে হ'ত, কেবল ব্যারিস্টরি পাশ নয়, একটা ডিগ্রিও পেতে হবে। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ-এর পাঠক্রম সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলাম। দু-চারজন বন্ধুর সঙ্গে কথাও ব'লে দেখলাম। বোঝা গেল, ওই দুই নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো একটাতে আমি যদি যাই, তাহলে খরচ হয় বেশি, আর বিলেতেও থাকতে হয় তিন বছরেরও বেশি। এক বন্ধু বললেন, "যদি সত্যিই একটা কোনো শক্ত পরীক্ষা পাশ করতে চাও, লন্ডন ম্যাট্রিক দাও। তাহলে খাটতে হবে খুব আর সাধারণ জ্ঞান বেশ বেড়ে যাবে, অথচ বাড়তি খরচা হবে নামমাত্র।" কথাটা আমার বেশ মনে ধরল, কিন্তু পাঠক্রম দেখে চক্ষুস্থির! লাতিন ও একটি ইউরোপীয় ভাষা, যাকে ব'লে 'অবশ্যিক'। লাতিন শিখব কেমন ক'রে? বন্ধু লাতিন শেখার সপক্ষে বেশ জোর একটা যুক্তি দেখালেন, বললেন, "ওকালতিতে লাতিনটা খুব কাজে দেয় হে! লাতিন জানলে আইনের বই বেশ সহজে বুঝতে পারা যায়। রোমান ল-এর পরীক্ষার একটা প্রশ্নপত্র তো থাকে আগাগোড়া লাতিনে লেখা। তাছাড়া লাতিন জানলে ইংরেজি ভাষার ওপর দখল বাড়ে।" ব্যাস্. আর কথা কী, আমি ঠিক ক'রে ফেললাম যত শক্তই হোক্-না-কেন, লাতিন আমি শিখবই। ফরাসিটা আগেই শিখতে শুরু করেছিলাম, ভাবলাম, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা হিসেবে আমি ফ্রেঞ্চই নেব। আমি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে একটি ক্লাসে যোগ দিলাম। প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর পরীক্ষা হ'ত। আমার হাতে তখন মাত্র পাঁচ মাস সময়। এত অল্পসময়ের মধ্যে পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব চেষ্টা। ফলে বিলিতি সাহেব বনবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমি লেখাপাড়ায় মনোযোগী হলাম। প্রত্যেকটি মিনিটের হিসেব রেখে রুটিন তৈরি ক'রে নিলাম।

কিন্তু আমার বুদ্ধিশক্তি বা স্মৃতিশক্তি এমন তীক্ষ্ণ ছিল না যে, অন্য-অন্য বিষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে লাতিন ও ফ্রেঞ্চ বেশ আয়ত্ত করতে পারি। ফলে লাতিন-এ আমি ফেল করলাম। এতে আমার দুঃখ হ'ল কিন্তু হতাশায় হাল ছেড়ে দিলাম না। ইতিমধ্যে লাতিন-এ আমি বেশ রস পেতে শুরু করেছি। মনে হ'ল, আরো কিছুকাল সময় পেলে ফ্রেঞ্চও আরেকটু ভালো শিখে নিতে পারব। বিজ্ঞানে একটা নতুন বিষয় নেব ব'লে ঠিক করলাম। ইতিপূর্বে আমি নিয়েছিলাম কেমিস্ট্রি, কিন্তু হাতেনাতে পরীক্ষা করার কোনো সুযোগ ছিল না ব'লে, রসায়নে যতটা রস পাওয়া উচিত ছিল, ততখানি রস পাইনি। দেশের স্কুলে কেমিস্ট্রি ছিল আবশ্যিক বিষয়, তাই লন্ডন ম্যাট্রিকের জন্যও আমি কেমিস্ট্রি বেছে নিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বারের পরীক্ষার জন্য কেমিস্ট্রি বাদ দিয়ে আমি বেছে নিলাম ফিজিক্স-এর তাপ ও আলো (Heat and Light)। লোকে এ বিষয়টা সহজ বলত, আমারও সহজই মনে হ'ল।

দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতির সঙ্গে-সঙ্গে জীবনযাত্রা আরো সাদাসিধে করা যায় কি-না তার চেষ্টা দেখতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগল, আমাদের পরিবার যেমন গরীব—আমার চালচলন তেমন নয়। আমি যখনই দাদাকে টাকা চেয়ে চিঠি লিখি, দাদা টাকা পাঠিয়ে দেন। দাদার স্নেহ ও মহানুভবতা, আমার জন্য টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে যে কী পরিমাণ বেগ পেতে হ'ত, সেইসব কথা আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল। আমি লক্ষ ক'রে দেখলাম, যেসব ছেলেরা আট থেকে পনেরো পাউন্ড ক'রে মাসিক খরচ করত, তারা বেশিরভাগই স্কলারশিপ-এর টাকা পেত। আবার আমার চেয়েও অনেক বেশি সাদাসিধেভাবে থাকে, এরকম অনেক গরীব ছাত্রের সংস্পর্শে এলাম। এদের মধ্যে একজন একটা বস্তিতে হপ্তায় দু-শিলিং ভাড়ায় একটা ঘর নিয়ে থাকত। লোকার্ট-এর শস্তা কোকোর দোকান থেকে দু-পেনী খরচ ক'রে সে একপাত্র কোকো ও রুটি খেয়ে পেট ভরাত। আমিও তার দেখাদেখি চলি, এমন সাধ্য আমার ছিল না। তবে আমার মনে হ'ল, দুটি কামরার জায়গায় আমি অনায়াসে একটা কামরাতেই থাকতে পারি, এবং দু-একটা রান্না বাড়িতেই ক'রে নিতে পারে। এভাবে থাকতে পারলে আমি মাসে চার-পাঁচ পাউন্ড কম খরচ ক'রেও চালাতে পারব। সরল জীবনযাপন বিষয়ে কিছু বইও হাতে এল। আমি দু-কামরার ঘর ছেড়ে দিয়ে এক কামরাওয়ালা ঘর ভাড়া নিলাম ও একটা স্টোভ কিনে সকালবেলার প্রাতরাশটা নিজেই রান্না ক'রে নিতে লাগলাম। ওট্‌মিল-এর পরিজ ও কোকোর জন্য জল গরম করতে বিশ মিনিটও লাগত না। দুপুরে বাইরে খেয়ে নিতাম। রাতের খাওয়া ছিল কোকো আর রুটি। এমনি ক'রে আমি খাওয়ার খরচ কমিয়ে দৈনিক এক শিলিং তিন পেনীতেই চালাতে লাগলাম। এইসময়টা আমি পড়াশুনো করেছি গভীর অভিনিবেশে। জীবনযাত্রা সরল হবার ফলে লেখাপড়ার জন্য সময়ও পাওয়া যেত যথেষ্ট। দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় আমি পাশ করলাম।

আপনারা যেন মনে না-করেন, এই সরলীকরণের ফলে আমার জীবন নীরস মরুতে পরিণত হয়েছিল। পরন্তু এই পরিবর্তনের দরুণ আমার বাইরের জীবনের সঙ্গে অন্তর্জীবনের একটা সাযুজ্য ঘটল। আমি যেন আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করতে

পারলাম। এতে ক'রে আমার জীবনযাপন যেন অনেকটা সত্য হয়ে উঠল এবং মনে-মনে আমার আর আনন্দের অবধি রইল না।

১৭. আহার্য নিয়ে পরীক্ষা

নিজের অন্তর যতই দেখতে শুরু করলাম, ততই যেন বেশি ক'রে মনে হতে লাগল, ভিতরে-বাইরে নিজেকে নানাভাবে বদ্‌লে নিতে হবে। খরচখরচা ও জীবনযাত্রার ধরনধারণ বদ্‌লাবার সঙ্গে-সঙ্গে, কিংবা তার কিছু আগের থেকেই, আমি আহার্য-ব্যাপারে নানারকম অদলবদল করতে শুরু করলাম। নিরামিষ আহার বিষয়ে বই পড়তে গিয়ে দেখলাম, লেখকেরা এই সমস্যার নানা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছেন—ধর্ম, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনের নানান দিক থেকে। নীতির দিক থেকে বিচার ক'রে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মানুষ যে পশুপাখির ওপর প্রভুত্ব লাভ করেছে, তার মানে এই নয় যে সে তাদের ধ্বংস করবে। বরঞ্চ উচ্চবর্গের প্রাণী হিসেবে মানুষের উচিত নিম্নবর্গের প্রাণীদের রক্ষা করা। মানুষে-মানুষে যেমন, তেমনি মানুষের সঙ্গে পশুপাখির একটা পারস্পরিক সহযোগ থাকা উচিত। লেখকেরা আরেকটি সত্য যে প্রমাণ করেছেন তা হ'ল এই যে মানুষ আহার করে বেঁচে থাকার জন্য, ভোগের জন্য নয়। এই দৃষ্টি থেকে এঁরা কেউ-কেউ মানুষের খাদ্য থেকে কেবল মাংস নয়, ডিম দুধও বাদ দিতে বলেছেন এবং নিজেদের জীবনে সেই বারণ মেনে নিয়েছেন। বিজ্ঞানের দিক থেকে মানুষের শরীরের গঠন দেখে এঁরা কেউ-কেউ অনুমান করেছেন, মানুষের আহার্য রান্না ক'রে খাওয়ার কোনো দরকার আছে ব'লে মনে হয় না। ফলমূলই হ'ল মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য। দুধ কেবল মায়ের স্তন থেকে খাওয়া চলে, দাঁত উঠলেই চিবিয়ে খাওয়ার মতো খাদ্য খাওয়া দরকার। স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে তাঁরা বলেছেন, সবরকম মশলাপাতি বর্জন করা প্রশস্ত। ব্যবহারিক ও আর্থিক বিচারের দিক থেকে তাঁরা দেখিয়েছেন, নিরামিষ ভোজনে খরচ হয় সবচেয়ে কম। এইসব মতামত আমার মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করল। নিরামিষ আহারের রেস্তোরাঁয় এইরকম নানা মতের লোকেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ও হ'ল। লন্ডন শহরে নিরামিষভোজীদের একটি সোসাইটি ছিল, তাঁদের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও ছিল। আমি সেই পত্রিকার গ্রাহক হলাম, সোসাইটির সভ্যও হলাম। অল্পদিন বাদে তাঁরা আমায় তাঁদের কর্মসমিতির সদস্যও ক'রে নিলেন। অন্য যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদের মনে করা হ'ত নিরামিষ-নীতির স্তম্ভস্বরূপ। এখন থেকে আমি খাদ্য নিয়ে নানারকম পরীক্ষায় হাত দিলাম।

দেশ থেকে পাওয়া মেঠাইমণ্ডা মশলাপাতি খাওয়া আমি বন্ধ করলাম। মন অন্যদিকে ফেরার ফলে মশলাপাতিতে আমার রুচিও যেন ক'মে যেতে লাগল। রিচমন্ড্‌-এ থাকতে যে মশলাবিহীন সেদ্ধ শাক আমার বিস্বাদ মনে হ'ত, এখন তাই আমি বেশ তৃপ্তির সঙ্গে

খেতে লাগলাম। এইরকম নানা পরীক্ষার ফলে আমার ধারণা হয়েছে যে স্বাদ জিনিষটা জিভের তলায় থাকে না, থাকে মনের মধ্যে।

খরচ কমানোর প্রশ্নও সারাক্ষণ আমার মনে থাকত। সেকালে একদল লোকের মতে, চা ও কফি খাওয়াকে মনে করা হ'ত শরীরের পক্ষে হানিকর। তাঁরা কোকো খাওয়ার কথা বলতেন। যেহেতু তখন আমার বদ্ধমূল ধারণা যে আহার জিনিষটা নিছক শরীর-রক্ষার জন্য, আমি চা ও কফি পরিহার ক'রে তার বদলে কোকো খাওয়া ধরলাম।

আমি যেসব রেস্তোরাঁয় খেতে যেতাম, সেসব জায়গায় দুই শ্রেণীর লোক খেতে যেত। মোটামুটি অবস্থাপন্ন যাঁরা, তাঁরা রেস্তোরাঁয় যে বিভাগে খেতে বসতেন সেখানে দৈনন্দিন তালিকা অনুসারে নানারকম খাদ্য পরিবেশন করা হ'ল। তালিকা থেকে বেছে নিয়ে লোকে সেখানে যদৃচ্ছা খেতে পারত। তাতে খরচ পড়ত এক থেকে দু-শিলিং। দ্বিতীয় বিভাগে থাকত তিন পদের বাঁধা বরাদ্দ খাওয়া, সঙ্গে এক টুক্‌রো রুটি। এর জন্য মূল্য ধার্য ছিল ছয় পেনী। খরচা কমাবার জন্য আমি যখন উঠে-প'ড়ে লেগেছিলাম, সচরাচর তখন আমি এই দ্বিতীয় বিভাগেই খেতে বসতাম।

আমার এই মুখ্য পরীক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে ছোটোখাটো আরো কয়েকটি পরীক্ষা চালিয়েছিলাম। কিছুদিন শ্বেতসার যুক্ত আহার সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলাম, কিছুদিন রুটি ও ফল ছাড়া আর-কিছু খাইনি, আবার কিছুদিন কেবল পনীর, দুধ ও ডিম খেয়ে থেকেছি। এই শেষোক্ত পরীক্ষা বিষয়ে কিছু বলা দরকার। এই পরীক্ষা চলেছিল দিন পনেরোরও কম। শ্বেতসার বর্জিত আহারের কথা যিনি বলেছিলেন তিনি ডিমের খুব প্রশংসা করতেন এবং ডিম যে আমিষ নয়, এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। বলতেন, ডিম খেলে কোনো জীবিত প্রাণীকে যে কষ্ট দেওয়া হয় না—এ তো স্পষ্টই দেখা যায়। তাঁর এই যুক্তিতে ভুলে আমি আমার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও ডিম খেতে লাগলাম। কিন্তু এই স্খলন বেশিদিন টেকেনি। প্রতিজ্ঞাকে নতুন মানে দেবার আমার কোনো অধিকার ছিল না। মা শপথ করিয়েছিলেন, কিন্তু মা যে-অর্থে শপথ করিয়েছিলেন সে তো আমার অজানা ছিল না। তাঁর কাছে মাংস অর্থে ডিমও যে পড়ে, সে আমি জানতাম। প্রতিজ্ঞার ঠিক মানেটা আমার কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, আমি ডিম খাওয়া ছাড়লাম, সঙ্গে-সঙ্গে সেই পরীক্ষাটাও।

এই যুক্তির সপক্ষে যা বলা হয়, তা ভেবে দেখাব মতো। বিলেতে মাংস কথাটা তিনরকম অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রথমত মাংস অর্থে কেবল পশুপাখির মাংস—যেসব নিরামিষাশী এই ব্যবস্থা মেনে নিতেন, তাঁরা পশুপাখির মাংস খাওয়া থেকে বিরত হতেন, কিন্তু মাছ খেতেন আর ডিম তো বটেই। দ্বিতীয় অর্থে মাংস মানে প্রাণীজগতেরই মাংস। এ ক্ষেত্রে মাছ অচল কিন্তু ডিম চলতে পারে। আর তৃতীয় অর্থে মাংস মানে প্রাণীজগতের মাংস তো বটেই, উপরন্তু তাদের দেহজ সবরকম বস্তু—অর্থাৎ ডিম এবং দুধও। এই তিনরকম অর্থের মধ্যে প্রথমটা যদি আমি স্বীকার ক'রে নিই, তাহলে কেবল ডিম কেন মাছও আমি খেতে পারি। কিন্তু মনে-মনে আমি বুঝেছিলাম, মা মাংস অর্থে যা বুঝেছিলেন, আমি সেই অর্থে মাংস বর্জন করব ব'লে শপথ ক'রে এসেছি। সুতরাং প্রতিজ্ঞা যদি পালন করতে

হয় তাহলে ডিমও আমায় ছাড়তে হয়। আমি তাই করলাম। এর ফলে বেশ কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'ল, কেননা খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে নিরামিষ আহারের রেস্তোরাঁতেও এমন অনেক পদ তৈরি হ'ত যার মধ্যে ডিম থাকে। তার ফল হ'ল এই যে, যেসব আহার্যের পদ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলাম না, তার কোন্‌টা কী জিনিস দিয়ে তৈরি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে আমায় জেনে নিতে হ'ত, কারণ অনেক কেক ও পুডিং-এ ডিম থাকত। রেস্তোরাঁর লোকদের কাছে খোলসা ক'রে বলতে হ'ত ডিম পর্যন্ত খাওয়া আমার বারণ। এতে ঝঞ্ঝাট হ'ত সত্যি, কিন্তু এর ফলে আমার খাওয়াদাওয়া আরো সাদাসিধে হয়ে উঠল। মুখরোচক ব'লে যেসব খাবার আমার ভালো লাগত, সেগুলি ছাড়তে গিয়ে মেজাজ একটু খারাপ হ'ল সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব অসুবিধা ও বিরক্তি বেশিদিন টেকেনি। বরঞ্চ প্রতিজ্ঞাপালনের দৃঢ়তা আমার জীবনের স্বাদটুকুই বদ্‌লে দিল। তা থেকে আমি যে তৃপ্তি পেলাম, তা আমার শরীরে-মনে স্থায়ী আনন্দের সঞ্চার করল।

অন্য একটি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তার অগ্নিপরীক্ষা তখনো ভবিষ্যতের জন্য মুলতবি ছিল। কিন্তু ভগবান যার সহায়, কে তার ক্ষতি করতে পারবে?

এই প্রসঙ্গে ব্রত বা প্রতিজ্ঞার অর্থ ও তাৎপর্য বিষয়ে দু-চার কথা বলা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চুক্তি, কড়ার, অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির অনর্থ বা অপব্যাখ্যা থেকে দুনিয়া জুড়ে ঝগড়া-বিবাদের অন্ত নেই। চুক্তি বা কড়ারের ভাষা যত স্পষ্ট হোক্-না-কেন, মানুষ আপন উদ্দেশ্যসাধন করতে গিয়ে নিজের সুবিধেমতো তাকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে নিতে পারে। সমাজের সকল স্তরে এরকম সুবিধাবাদী লোক দেখা যায়। তাদের মধ্যে ধনী আছে নির্ধন আছে, রাজা আছে আবার চাষীমজুরও আছে। স্বার্থ মানুষকে অন্ধ করে। তখন সে যুক্তির মারপ্যাঁচে নিজের কথা ঘুরিয়ে নিজেকে প্রতারিত তো করেই, আর-পাঁচজনকে এমন-কি ভগবানকে পর্যন্ত প্রতারণা করতে চায়। প্রতিজ্ঞারক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় হ'ল এই যে যিনি প্রতিজ্ঞা করান, তাঁর অর্থকেই চরম ব'লে মেনে নেওয়া। এছাড়া আরেকটা উপায় আছে। যেখানে প্রতিজ্ঞার দুইরকম অর্থ করা যায়, সেখানে দুর্বল পক্ষ যেরকম অর্থ করেন, সেই অর্থই মেনে নেওয়া উচিত। এই দুটি রীতি বর্জন করার ফলে ঝগড়াঝাঁটি অনর্থ ও অন্যায়ের সৃষ্টি হয়। এসবের মূলে আছে মিথ্যাচার। যিনি সত্যের সন্ধানী তাঁর পক্ষে এই রীতি মেনে চলা নিতান্তই সহজ। প্রতিজ্ঞার ঠিক অর্থ বুঝে নেবার জন্য তাঁকে পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হতে হয় না। 'মাংস' অর্থে মা যা বুঝেছিলেন তাই আমার কাছে একমাত্র সত্য অর্থ হওয়া উচিত ছিল। ব্যাপক অভিজ্ঞতার ফলে কিংবা নিছক পাণ্ডিত্যের অভিমানে আমি যে অর্থ করতে চেয়েছিলাম, তা আমার প্রতিজ্ঞার প্রকৃত অর্থ ছিল না।

বিলেতে থাকতে খাদ্য নিয়ে আমি যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি তা নিছক ব্যয়সঙ্কোচ ও স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে। এই সমস্যার ধর্মীয় দিকটা আমার দক্ষিণ আফ্রিকা না-যাওয়া পর্যন্ত আমি ঠিক ধরতে পারিনি। সেখানে যেসব কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেসব কথা পরে বলব। কিন্তু পরে যা-কিছু ঘটেছিল তার সূচনা ঘটেছিল বিলেতে থাকতেই।

মানুষ যখন ধর্মান্তর গ্রহণ করে, নতুন ধর্মে তার সবিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। সেই

ধর্মের মধ্যেই যারা জন্মেছে তাদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। নিরামিষাহার তখন বিলেতে নতুন ধর্ম। আমার কাছেও তখন নতুন বলা যেতে পারে। কারণ আপনারা তো শুনেইছেন, বিলেত যখন যাই তখন মনে-মনে আমি আমিষ আহারের পক্ষপাতী ছিলাম। পরে যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে নিরামিষ আহারের নীতি আমি স্বীকার ক'রে নিই। এই পরিবর্তন একপ্রকার ধর্মান্তর গ্রহণের মতো। নবদীক্ষিত নিরামিষ ভক্ত হওয়ার উৎসাহে আমি আমাদের বেজওয়াটার পাড়ায় একটি নিরামিষাহারীদের ক্লাব গঠন করব ব'লে স্থির করি। স্যর এডুইন আর্নল্ড্ আমাদের পাড়াতেই বসবাস করতেন। তাঁকে আমাদের ক্লাব-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবার জন্য আমন্ত্রণ করি। *দি ভেজেটেরিয়ন* পত্রের সম্পাদক ডক্টর ওল্ডফিল্ড্ সভাপতি হলেন। আমি সম্পাদক হলাম। দিন-কতক ক্লাব বেশ চলেছিল, কিন্তু মাস-কয়েকের মধ্যেই ভেঙে গেল। তার একমাত্র কারণ হ'ল এই যে কিছুদিন পর-পর এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ার বাস উঠিয়ে নিয়ে যাবার যে নিয়ম আমি করেছিলাম, তদনুসারে বেজওয়াটার অঞ্চল ছেড়ে আমি অন্যত্র চ'লে যাই। কিন্তু ক্লাব গঠন করার এই অভিজ্ঞতা নিতান্ত নগণ্য ও স্বল্পকালব্যাপী হ'লেও, এ থেকে প্রতিষ্ঠান গঠন ও প্রতিষ্ঠান চালনায় আমি হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করেছিলাম।

১৮. লজ্জা আমার বর্ম

আমি নিরামিষাহারী সমাজের কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচিত হই। এই সমিতির প্রত্যেকটি অধিবেশনে আমি নিয়মিত হাজির থাকতাম। কিন্তু মুখে আমার কথা সরত না। একদিন ডক্টর ওল্ডফিল্ড্ আমায় বললেন, "আমার সঙ্গে তো তুমি বেশ কথাবার্তা বলো, কিন্তু সমিতির বৈঠকে মুখ খোলো না কেন? আসলে তুমি কুঁড়ের বাদশা!" তাঁর এই পরিহাস আমি বেশ উপভোগ করলাম। আমায় অলস বলতে গিয়ে তিনি মৌচাকের পুরুষসঙ্গীর তুলনা দিলেন। মৌচাকের অন্যসব মহিলা সর্বদা কাজ করে, কেবল পুরুষসঙ্গী আরামে চুপচাপ ব'সে থাকে। সমিতির সবাই আপন-আপন বক্তব্য পেশ করে, আর আমি বোবার মতো ব'সে থাকি—এটা আশ্চর্য ব্যাপার ব'লে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কথা বলতে আমার যে ইচ্ছা হ'ত না, এমন নয়। কিন্তু কেমন ক'রে নিজের কথা ব্যক্ত করব তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। আরসব সদস্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই তো আমার তুলনায় কত বেশি জানেন। আবার অনেকসময় এমন হ'ত যে আমি হয়তো সাহস ক'রে কিছু বলব ব'লে তৈরি হয়েছি, এমনসময় অন্য বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এইভাবে বেশ-কিছুদিন তো গেল।

ইতিমধ্যে একদিন সমিতির সামনে একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থাপিত হ'ল। ব্যাপারটা এমনই গুরুতর যে গরহাজির হওয়া কিংবা বিনা-বাক্যে কেবল ভোট দেওয়া—কাপুরুষোচিত হবে ব'লে মনে হ'ল। নিরামিষাহারী সমাজের প্রেসিডেন্ট ছিলেন টেম্‌স্ আয়রন ওঅর্কস্‌-এর মালিক মিস্টার হিল্‌স্। ইনি ছিলেন একজন শুদ্ধাচারী পিউরিট্যান্। তাঁর আর্থিক সহায়তার

ওপর নির্ভর ক'রে আমাদের সংস্থার অস্তিত্ব বজায় রাখা গিয়েছিল, এমনও বলা চলে। সমিতির সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাঁর আশ্রিত। প্রখ্যাত নিরামিষবাদী ডক্টর এলিন্‌সন্‌ ছিলেন সদস্যদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সদ্য-সংগঠিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণী আন্দোলনের একজন পুরোধা ছিলেন এবং লন্ডনের শ্রমিক সমাজে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের রীতিপদ্ধতি প্রচার করতেন। মিস্টার হিল্‌স্‌-এর মতে এইসব উপায় একবার চালু হ'লে সমাজের নৈতিক ভিত্তিতে ভাঙন ধরবে। তিনি মনে করতেন, নিরামিষাহার সমিতি কেবল আহার্য ব্যাপারে নয়, নৈতিক ব্যাপারেও সংস্কারসাধন করবে, এবং তাই যদি হয়, সমাজে সুনীতিরক্ষার বিরুদ্ধাচারের দরুণ, ডক্টর এলিন্‌সন্‌-এর মতো লোককে সংস্থার মধ্যে থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না। এইভাবে ডক্টর এলিন্‌সন্‌-এর নাম সদস্য-তালিকা থেকে বাতিল করার একটি প্রস্তাব আসে। এই বাদানুবাদের ব্যাপারে আমার বিশেষ আগ্রহ হয়েছিল। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ডক্টর এলিন্‌সন্‌-এর মতামত, আমারও মনে হয়েছিল সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং নীতিবাগীশ পিউরিটান্‌ হিসাবে মিস্টার হিল্‌স্‌ তাঁর বিরুদ্ধতা করবেন, এ তো জানা কথা। তাছাড়া এমনিতেও মিস্টার হিল্‌স্‌কে তাঁর বাদ্যনতার জন্য আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু আমার ধারণা হ'ল, সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্যরূপে পিউরিটান্‌ নীতিকে মেনে না-নেওয়ার দরুণ, কেবলমাত্র সেই কারণে কোনো একজন সদস্যকে সমিতি থেকে বহিষ্কার করাটা ন্যায়সঙ্গত হবে না। ব্যক্তিগতভাবে মিস্টার হিল্‌স্‌ অবশ্য মনে করতে পারেন যে যারা পিউরিটান্‌ নয়, তাদের সমিতিতে নেওয়া যাবে না। তাঁর সেই মতামত সমিতির ওপর চাপানো ঠিক হবে না, কারণ সমিতির উদ্দেশ্য ব'লে যা ছাপার হরফে স্বীকৃত—সে হ'ল এই নিরামিষাহারের গুণাগুণ প্রচার করা—সদাচারের বিশেষ কোনো নীতি প্রচার করা নয়। সুতরাং নৈতিক ব্যাপারে মানুষের মতামত যাই হোক্‌-না-কেন, আমার বিশ্বাস ছিল, নিরামিষাশীমাত্রই আমাদের সংস্থার সদস্য হতে পারেন।

সমিতিতে অন্য কেউ-কেউ সদস্য ছিলেন যাঁরা আমার মতে সায় দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হ'ল আমার নিজস্ব যা মত তা আমাকেই ব্যক্ত করতে হবে। এখন প্রশ্ন হ'ল কীপ্রকারে এইসব প্রকাশ করি। মুখে বলব, ততখানি সাহস আমার ছিল না, তাই আমি স্থির করলাম, আমার বক্তব্য আমি লিখিতভাবে পেশ করব। লেখাটি পকেটে নিয়ে তো সভায় উপস্থিত হলাম। যদ্দুর আমার স্মরণ হয়, সেই লেখা পড়ার মতো সাহসটুকু পর্যন্ত আমার হয়নি। সভাপতি আর-কোনো সদস্যকে দিয়ে সেটি পড়িয়ে নিয়েছিলেন। ডক্টর এলিন্‌সন্‌-এর শেষ পর্যন্ত হার হ'ল। এ থেকে দেখা যাবে, আমার জীবনের এই প্রথম বিতর্ক-যুদ্ধে আমি ছিলাম হারের দলে। কিন্তু আমি যে ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে লড়েছিলাম, তাইতেই আমার সন্তোষ ছিল। আবছাভাবে আমার মনে হয়, এই ঘটনার পর আমি সমিতির সভ্যপদে ইস্তফা দিই।

বিলেতে যতদিন ছিলাম, আমার এই লজ্জা-সঙ্কোচের ভাব আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এমন-কি সামাজিকতা করতে গিয়ে যখন পাঁচ-ছয়জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, আমার যেন বাক্‌রোধ হয়েছে, আমি ভালো ক'রে কথাও বলতে পারিনি।

একবার আমি মজমুদার মশায়ের সঙ্গে ভেন্ট্‌নোর যাই। সেখানে আমরা এক নিরামিষাশী পরিবারের অতিথি হয়ে উঠেছিলাম। *দি এথিক্‌স্ অব ডায়েট্* অর্থাৎ 'খাদ্যের নৈতিক দিক' নামে বইয়ের লেখক মিস্টার হাওয়ার্ড তখন সমুদ্রের ধারের এই শহরেই হাওয়াবদলের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে পর, তিনি নিরামিষাহার প্রচারের একটি সভায় আমাদের দু-জনকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। এই সভায় লিখিত বক্তৃতা পড়ায় কোনো বাধা নেই, এ কথা আমি তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম। সুসম্বদ্ধভাবে অথচ সংক্ষেপে নিজের বক্তব্যটুকু তুলে ধরার জন্য অনেকে লিখিত বক্তৃতা পাঠ ক'রে থাকেন, এ কথাও আমি জানতাম। সুতরাং আমি আমার বক্তব্য লিখে নিয়ে গেলাম, কিন্তু পড়তে উঠেও আমি পড়তে পারলম না। চোখে ঝাপ্‌সা দেখতে লাগলাম, হাত-পা কাঁপতে লাগল—যদিচ লেখা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠার বেশি ছিল না। অগত্যা আমার হয়ে মজমুদার মশায়কে লেখাটা প'ড়ে দিতে হ'ল। তাঁর নিজের বক্তৃতা খুব সুন্দর হয়েছিল, শ্রোতারা ঘন-ঘন করতালি দিয়ে বাহবাও দিয়েছিল। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হ'ল, নিজের অক্ষমতায় দুঃখও হ'ল খুব।

বিলেতে পাঁচজনের সামনে বক্তৃতা দেবার শেষ চেষ্টা করি ঠিক বিলেত ছেড়ে যাবার প্রাক্‌কালে। এ যাত্রাতেও আমি নিজেকে সকলের কাছে উপহাসাস্পদ ব'লে প্রতিপন্ন করি। ইতিপূর্বে আমি যে হোবর্ন রেস্তোরাঁর কথা বলেছি, সেখানে আমার নিরামিষাশী বন্ধুদের একটি ডিনারে আমন্ত্রণ করি। ভাবলাম, নিরামিষ রেস্তোরাঁয় তো নিরামিষ খাদ্য পাওয়া যাবেই। আমিষ রেস্তোরাঁয় কেন নিরামিষ খাদ্য পাওয়া যাবে না? এই ভেবে আমি হোবর্ন-এর ম্যানেজারের সঙ্গে কথা ব'লে, পুরোপুরি ডিনার দেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করি। এই ব্যবস্থায় আমার নিরামিষাহারী বন্ধুরা খুব খুশি হয়েছিলেন। ভোজের ব্যাপারটা পৃথিবীর সর্বত্রই আমোদ-আহ্লাদ করার জন্য। পাশ্চাত্য দেশে ডিনার তো একরকম আর্ট-এর পর্যায়ে পড়ে—কতরকম আয়োজন আড়ম্বর হয়, গানবাজনা বক্তৃতাদির ব্যবস্থা থাকে। আমি যে ছোটোখাটো ভোজ দিয়েছিলাম, তাতেও অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি ছিল না, সুতরাং বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকবে তাতে আর বিচিত্র কী! আমার পালা যখন এল, আমি বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আগের থেকে ভেবেচিন্তে নেহাৎ অল্পকথার একটা বক্তৃতা আমি মনে-মনে তৈরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সূচনায় দু-চার কথা বলার পর আর আমি এগোতে পারলাম না। অ্যাডিসন্-এর বিষয়ে পড়েছিলাম যে বিলেতের লোকসভায় তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি তিন-তিনবার "আমার ধারণা" এই কথা ব'লে আর না-কি এগোতে পারেননি। তখন লোকসভাব এক সুরসিক সদস্য ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন, "ভদ্রলোক তিন-তিনবার ধারণ করলেন কিন্তু কিছুই তো প্রসব করতে পারলেন না।" এই গল্প অবলম্বন ক'রে আমি একটা বেশ মজাদার হাসির বক্তৃতা মনে-মনে খাড়াও করেছিলাম। গল্প দিয়ে শুরু করতে গিয়ে সেইখানেই আট্‌কে গেলাম। যা বলব ব'লে ঠিক ক'রে এসেছিলাম, তার একটিও কথা মনে পড়ল না। হাসির কথা বলতে গিয়ে নিজেই সকলের উপহাসের পাত্র

হয়ে গেলাম। "মশায়েরা আমার নিমন্ত্রণে সবাই এসেছেন, এজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" কোনো প্রকারে এই ক-টি কথা ব'লে আমি ব'সে পড়লাম।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার পর আমার এই লজ্জা-সঙ্কোচের ভাব অনেকখানি ক'মে যায়, তবে একেবারে ঘুচে গেছে সে আমি এখনও বলব না। আগের থেকে তৈরি না-হয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে সদ্য-সদ্য বক্তৃতা আমি দিতে পারতাম না। অপরিচিত লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে বাধো-বাধো ঠেকত। পারতপক্ষে বক্তৃতা দেবার ব্যাপারটা আমি এড়িয়েই চলতাম। এই আজকের দিনেও আমি বন্ধুদের সঙ্গে আসর জমিয়ে আড্ডা দিতে পারব, কিংবা নিতান্ত বাজে কথা বলতে চাইব, এ আমার মনে হয় না।

আমার এই স্বভাবগত লজ্জা-সঙ্কোচের ফলে আমি কখনো-কখনো হাস্যাস্পদ হয়েছি বটে। কিন্তু তাছাড়া আমার খুব বেশি-কিছু ক্ষতি হয়নি। বরঞ্চ আজ দেখতে পাই, এতে আমার লাভই হয়েছে। কথা বলায় আমার সঙ্কোচ এককালে বিরক্তির কারণ ছিল, আজ আমার কাছে তা আনন্দের কারণ। সবচেয়ে বড়ো লাভ হয়েছে এই যে আমি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য বলতে শিখেছি। সেই বাক্‌সংযমের সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তার মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে একটা সংযম এসেছে। আজকাল আমার মুখের কথায় বা লেখায় আমি বিনা-বিচারে সামান্যই কথা ব'লে থাকি—এই মর্মে আমি নিজেকে সার্টিফিকেটও দিতে পারি। আমার কোনো কথা বা লেখার ফলে আমায় লজ্জায় বা অনুতাপে পড়তে হয়েছে ব'লে আমার স্মরণ হয় না। নানা দুর্যোগ, সময়ের নানা অপব্যয় থেকে রক্ষা করেছে আমার বাক্‌সংযম। বহুদর্শন থেকে আমি শিখেছি যিনি সত্যসন্ধ হবার সাধনা করতে চান তাঁকে মাঝ-মাঝে মৌন অবলম্বন করতে হয়। জ্ঞানে হোক্ অজ্ঞানে হোক্, মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে বাড়িয়ে বলার কিংবা সত্য যা তাকে গোপন করার বা ঘুরিয়ে বলার। এই দুর্বলতা দমন করতে হ'লে মানুষকে মিতভাষী হতে হয়। অল্পকথার লোকেরা সচরাচর বিচার না-ক'রে কথা বলেন না, তাঁরা প্রত্যেক কথা ওজন ক'রে বলেন। বহু লোক আছে কথা বলার জন্য যাদের অধীর আগ্রহ। এমন সভা ক্বচিৎ দেখা যায় যেখানে সভাপতি একাধিক এরকম লোকের চিরকুট না-পান, বক্তৃতা দেবার অনুমতি চেয়ে। আর অনুমতি একবার পেলে বক্তা নির্দিষ্ট সময় ছাপিয়েও তাঁর বক্তব্য শেষ করতে না-পেরে, অন্যায়ভাবে বিনা-অনুমিতিতে অতিরিক্ত সময় নেন। এইসব বকবকুনি পৃথিবীর কোনো উপকারে লাগে ব'লে মনে হয় না। বরঞ্চ মনে হয় সময়ের অযথা অপব্যয়। আমার লজ্জা-সঙ্কোচ আমার বর্মচর্ম, আমার ঢাল। এর দৌলতে আমি চিত্তের দিক থেকে মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছি, সত্যকে চিনতে জানতে বুঝতে শিক্ষা পেয়েছি।

১৯. অসত্যের বিস্ফোটক

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখনকার দিনে বিলেতে মুষ্টিমেয় ভারতীয় ছাত্র যেত। একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়েছিল এমন যে, বিবাহিত হ'লেও তারা নিজেদের অবিবাহিত ব'লে চালাবার

চেষ্টা করত। বিলেতে স্কুল-কলেজের সব ছেলেই অবিবাহিত। সেখানে মনে করা হয়, ছাত্রজীবন বিবাহিত জীবনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। প্রাচীন যুগে আমাদের দেশেও অনুরূপ প্রথা ছিল, বিদ্যার্থীকে বলা হ'ত ব্রহ্মচারী। আজকাল আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের চল হয়েছে। বিলেতে এ জিনিসের অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। বিলেত-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা বিবাহিত হ'লেও, সে কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করত। এইভাবে মিথ্যাচরণ করার আরেকটি কারণ এই ছিল যে বিয়ের ব্যাপার জানাজানি হয়ে গেলে পর, এইসব যুবকেরা যেসব পরিবারের সঙ্গে থাকত, সেইসব পরিবারের কুমারী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা বা সখ্য করতে পারত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য এইসব সখ্য হ'ত নির্দোষধরনের। অনেক মা-বাবা এইধরনের মেলামেশা পছন্দ করতেন, তার কারণ ও দেশে এইরকম মেলামেশার মধ্যে দিয়েই তরুণেরা তাদের নিজেদের জীবনসঙ্গিনী বেছে নেয়। অনেকটা সমাজের প্রয়োজনেই বিলেতে তরুণ-তরুণী পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করে। বিলতে পৌঁছেই ভারতীয় যুবকেরা যদি এইরকম মেলামেশা করতে চায়, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিণাম বিপজ্জনক হয়—এরকম দেখা গেছে। তৎসত্ত্বেও অনেকে এই মোহের ফাঁদে পা দেয় ও অসত্য আচরণ করতে দ্বিধা করে না। আমারও এই ছোঁয়াচ লেগেছিল। আমি বিবাহিত ও ছেলের বাপ হয়েও, নিজেকে অবিবাহিত ব'লে পরিচয় দিতে ইতস্তত করিনি। কিন্তু এইরকম ছলনায় আমি কোনো শান্তি পাইনি। সর্বনাশের অতলে আমি যে ডুবে যাইনি তার একমাত্র কারণ আমার স্বভাবগাম্ভীর্য ও সঙ্কোচ। আমি বেশি কথা বলতাম না ব'লে মেয়েরা আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে আসত না, বেড়াতে যেতেও চাইত না।

আমি যে চুপচাপ থাকতাম তার অন্যতম কারণ ছিল আমার ভীরুতা। ভেন্ট্‌নোর-এ আমি যে পরিবারের সঙ্গে থাকতাম, সেরকম পরিবারে গৃহকর্ত্রীর মেয়ের সচরাচর নবাগত অতিথিকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। আমার গৃহকর্ত্রীর মেয়ে আমায় একদিন ভেন্ট্‌নোর-এর আশেপাশে যেসব সুন্দর পাহাড় আছে, সেইসব দেখাবার জন্য সঙ্গে নিয়ে গেল। হাঁটায় আমি এমন-কিছু ধীরগতি ছিলাম না, কিন্তু আমার সঙ্গিনীর গতি ছিল আমার চেয়েও দ্রুত। সে তো আমায় একপ্রকার টেনে নিয়েই চলছিল। সারা রাস্তা তার মুখের কথার বিরাম ছিলাম না। আমি তার জবাবে একটা অস্ফুট 'হাঁ' কিংবা 'না' ব'লে চলেছিলাম। এক-আধবার মুখ দিয়ে বড়োজোর বেরিয়েছে, "হ্যাঁ, সত্যি ভারি সুন্দর।" সে তো একপ্রকার পাখির মতোই উড়ে চলেছিল। চলতে-চলতে আমার কেবল ভাবনা—কখন বাড়ি ফিরে যাওয়া যায়। এইভাবে আমরা তো একটা পাহাড়ের ওপর পৌঁছে গেলাম। এখন কেমন ক'রে নামি, তাই হ'ল সমস্যা। পায়ে উঁচু গোড়ালির বুট প'রে থাকা সত্ত্বেও, পঁচিশ বছর বয়সের এই চট্‌পটে তরুণীটি উৎরাই পথে নেমে গেল একপ্রকার তীর বেগে। আমি যে কীভাবে নামব তাই ভেবে লজ্জায় আঁকুপাকু করছিলাম। মেয়েটি ততক্ষণে পাহাড়তলিতে পৌঁছে গেছে। সে তো হেসে কুটিপাটি। আমায় খুব সাহস দিতে লাগল, আর বলল, "ওপরে উঠে তোমায় টেনে নামাতে হবে না-কি?" এরপরে আর কী ক'রে ভয়ে জবুথবু হয়ে থাকা

যায়। অতি কষ্টে ঘেঁষটে-ঘেঁষটে, কোথাও হামা দিয়ে, আমি তো কোনোপ্রকারে নিচে নেমে এলাম। মেয়েটি আমার রকমসকম দেখে আর হাসি চাপতে পারল না, হো-হো হেসে আমার পিঠ থাব্ড়ে বলল, 'সাবাস', 'সাবাস'। এমনি ক'রে সে আমায় প্রচুর লজ্জা দিল, অবশ্য ব্যাপারটা ঠাট্টা করার মতোই।

কিন্তু সর্বত্র আমি এমন সহজে রেহাই পাইনি। অসত্যের এই বিষফোঁড়া আরো গভীরে প্রবেশ করার আগে ভগবান আমায় রক্ষা করেন। একবার আমি গিয়েছিলাম ব্রাইটন-এ। ভেন্ট্নোর-এর মতো এটিও সমুদ্রতীরে হাওয়াবদলের জায়গা। ঘটনাটা ঘটেছিল ভেন্ট্নোর যাবার আগে। সেখানে হোটেলে খেতে গিয়ে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিধবার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এ আমার বিলেতে প্রথম বছরের কথা। আহার্য-তালিকায় বিভিন্ন পদের নাম লেখা ছিল ফরাসি ভাষায়, তার মানে বুঝে ওঠা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। মহিলা যে টেবিলে বসেছিলেন আমিও সেই টেবিলেই বসেছিলাম। তিনি বুঝলেন, আমি বিদেশী মানুষ এবং একটু মুশকিলে পড়েছি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমায় সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন, বললেন, "আপনি দেখছি এ দেশে নতুন এসেছেন, মনে হচ্ছে, আপনি একটু মুশকিলে পড়েছেন। খাবার জিনিস কিছু আনতে বললেন না যে?" আমি তখন মনে-মনে তালিকাটা প'ড়ে ভাবছি, ওয়েটারকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নেব পদগুলি কী-কী বস্তু দিয়ে তৈরি। এমনসময় মহিলা আমার সহায়তায় এগিয়ে এলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, কোথায় আমার অসুবিধা, ফরাসি জানা না-থাকায় খাবারের পদ বেছে নেওয়া আমার পক্ষে একটু শক্ত হচ্ছে—কারণ আমি নিরামিষাশী।

মহিলা বললেন, "আচ্ছা, দাঁড়ান আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি। আপনি যে-যে পদ খেতে পারেন, তা-ও ব'লে দিচ্ছি", এইভাবে আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হ'ল। এর ফলে আমাদের যে বন্ধুত্ব হ'ল, তা বিলেতে থাকতে এবং বিলেত ছেড়ে চ'লে যাবার বেশ কিছুকাল পরেও টিকে ছিল, তিনি তাঁর লন্ডনের ঠিকানা দিয়ে, প্রতি রবিবার তাঁর ওখানে ডিনারের নিমন্ত্রণ করলেন। অন্যান্য বিশেষ উপলক্ষেও তিনি আমায় ডেকে পাঠাতেন, আমার লজ্জা-সঙ্কোচ ভাঙবার চেষ্টা করতেন, তরুণীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপে আমায় উৎসাহ দিতেন। একটি মেয়ে তো তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়িতেই থাকতেন, কথা বলার সুযোগ ঘটত তাঁর সঙ্গেই বেশি। অনেকসময় আমাদের দু-জনকে একত্র রেখে তিনি বেরিয়ে যেতেন।

প্রথম-প্রথম আমার বেশ বাধো-বাধো ঠেকত। ভালো ক'রে কথাই বলতে পারতাম না, ঠাট্টা-তামাশা করা তো দূরের কথা। তরুণীটি আমায় পন্থা দেখাতে লাগলেন, আমিও বেশ শিখতে লাগলাম। শেষে এমন হ'ল যে রবিবার কখন আসবে আমি সেই আশায় ব'সে থাকতাম। তরুণী বন্ধুটির সঙ্গে কথা বলতে আমার বেশ ভালো লাগত।

প্রবীণা দিনের পর দিন তাঁর জাল বিস্তার ক'রে চললেন। আমাদের এভাবে মেলামেশায় তিনি খুশি হতেন। সম্ভবত আমাদের দু-জনকে নিয়ে তিনি মনে-মনে কিছু ঠিকও ক'রে রেখেছিলেন।

আমি বেশ সঙ্কটের মধ্যে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম, গোড়া থেকেই ভদ্রমহিলাকে জানিয়ে রাখা উচিত ছিল যে আমি বিবাহিত। তাহলে আমাদের দু-জনের মধ্যে সম্বন্ধ করার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। কিন্তু এখনো তো শুধরে নেওয়া যেতে পারে। আমি যদি সত্য কথাটা বলি তাহলে আখেরে অনেক দুঃখদুর্গতি পোয়াতে হয় না। এইসব ভেবেচিন্তে আমি তাঁকে একটি চিঠি লিখলাম। চিঠির মোটামুটি বক্তব্য ছিল এইরকম :

"ব্রাইটন্-এ দেখা হবার পর থেকে আপনার অনুগ্রহ পেয়ে আসছি। মা যেমন ছেলের যত্ন নেন আপনি সেইভাবে আমার দেখাশোনা করেছেন। আপনার ইচ্ছা, আমি বিবাহ করি, তাই আপনি মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ঘটিয়েছেন। যাতে ব্যাপার আর বেশি দূর না-গড়ায়, সেইজন্য গোড়াতেই ব'লে রাখি, আমি আপনার স্নেহের যোগ্য নই। আপনার বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু হবার মুখেই বলা উচিত ছিল, আমি বিবাহিত। আমি জানতাম এ দেশে এসে ভারতীয় ছাত্রেরা তাদের বিবাহের ব্যাপারটা গোপন রাখে। তাদের দেখাদেখি আমিও তাই করেছি। এখন আমি বুঝেছি, এটা আমার পক্ষে উচিত হয়নি। এইসঙ্গে আমার বলা উচিত, বালক বয়সেই আমার বিবাহ হয়ে গেছে এবং আমি একটি পুত্রের পিতা। আপনার কাছ থেকে এই সত্য এতদিন গোপন রেখেছি ব'লে আমার মনে একটা বেদনা আছে। সুখের বিষয়, এখন ভগবান আমায় সত্য কথা বলার সাহস দিয়েছেন। আপনি কি আমায় ক্ষমা করতে পারবেন? আপনাকে আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে মেয়েটির সঙ্গে আমায় অনুগ্রহ ক'রে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন তার প্রতি আমি কোনো প্রকার অশোভন আচরণ করিনি, আপনি যে মেলামেশার সুযোগ দিয়েছেন তার অপব্যবহার করিনি। গোড়ায় যে ছেদ টানতে হয়, সে আমি জানি। আপনি জানতেন না আমি বিবাহিত, সুতরাং কোনো মেয়ের সঙ্গে আমায় সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে—এরকম ইচ্ছা আপনার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। যাতে এ ব্যাপার অধিক দূর না-গড়ায়, আপনাকে সব কথা খুলে বলা আমার কর্তব্য।

"এই চিঠি পাওয়ার পর আপনি যদি মনে করেন আপনার আতিথেয়তার মর্যাদা আমি রক্ষা করতে পারিনি, তাহলে আমি কিছু মনে করব না। আপনার অনুগ্রহ ও মমতার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ আছি জানবেন। এরপরেও আপনি যদি আমায় বর্জন না-করেন, আপনার অতিথি-বাৎসল্য যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে আপনার অনুগ্রহলাভের যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য আমি সর্বদা সচেষ্ট থাকব, তাহলে আমার প্রতি আপনার প্রীতির পরিচয় নূতন ক'রে লাভ করব এবং আমার আনন্দের অবধি থাকবে না।

"আপনারা নিশ্চয় অনুমান করতে পারবেন, এত কথা আমি একনাগাড়ে লিখে উঠতে পারিনি। কতবার কাটাকুটি ক'রে আমায় নতুন খসড়া তৈরি করতে হয়েছে। কিন্তু এ চিঠি লিখে মনে হয়েছিল আমার মন থেকে একটা যেন বোঝা নেমে গেল।"

পত্রপাঠ মহিলার জবাব এসে গেল—প্রায় ফিরতি ডাকেই। জবাবে তিনি যা লিখেছিলেন তার মানে এরকম দাঁড়ায় :

"আপনার চিঠি এল। আপনি সব কথা অকপটে জানিয়েছেন। আপনার চিঠি প'ড়ে আমরা দু-জনেই খুব খুশি হয়েছি ও হেসেছি। আপনি যাকে মিথ্যাচার বলেছেন, তা ক্ষমার

যোগ্য। তবে সব খবর যথাযথ দিয়ে আপনি ভালোই করেছেন। আমার সাপ্তাহিক আমন্ত্রণ বহাল রইল। আগামী রবিবার আপনি নিশ্চিত আসবেন। আপনার কাছ থেকে আপনার বাল্যবিবাহের সব কথা শোনবার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকব। আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবার আনন্দও সেইসঙ্গে পাওয়া যাবে। এই ঘটনার ফলে আমাদের সৌহার্দের কোনো ইতরবিশেষ ঘটবে না–এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।"

আমার মধ্যে অসত্যের যে বিষ প্রবেশ করেছিল, আমি এইভাবে তা থেকে মুক্তি লাভ করলাম। অতঃপর আমি যে বিবাহিত, সেকথা প্রয়োজন হ'লেই স্বীকার করতে দ্বিধা করিনি।

২০. ধর্ম-পরিচয়

বিলেত-প্রবাসের দ্বিতীয় বছরের শেষদিকে দু-জন থিওজফিস্ট্-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এঁরা ছিলেন সহোদর ভাই ও অবিবাহিত। তাঁরা আমায় *গীতা*-র কথা বললেন। তাঁরা তখন স্যর এডুইন আর্নল্ড-এর অনুবাদে *The Song Celestial* পড়ছেন। আমায় বললেন, আমি যেন মূল সংস্কৃত *গীতা* পাঠ ক'রে তাঁদের শোনাই। আমার খুব লজ্জা হ'ল যে, না-সংস্কৃতে না-গুজরাতিতে আমি ইতিপূর্বে *গীতা* পড়েছি। সুতরাং আমায় বলতেই হ'ল *গীতা* আমি আগে কখনো পড়িনি, তবে খুব খুশি হয়েই তাঁদের কাছে মূল *গীতা* পাঠ ক'রে শোনাব, এবং যদিও সংস্কৃতে আমার সামান্যই জ্ঞান, আমার মনে, হয় মূলের সঙ্গে আর্নল্ড-এর অনুবাদে কোথায়-কোথায় তফাৎ হয়েছে, সেটুকু অন্তত বুঝতে পারব। এইভাবে সেই দুই ভায়ের সঙ্গে আমি *গীতা* পড়তে শুরু করলাম। দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক আমার মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে এখনও সেই কথাগুলির অনুরণন যেন শুনতে পাই। শ্লোকের কথাগুলি ছিল এই :

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সংগস্তোষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বিষয়-চিন্তা করতে-করতে পুরুষের সংসার বিষয়ে আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশগ্রস্ত হয়।

আমার মনে হ'ল *গীতা* অমূল্য গ্রন্থ। যত দিন যাচ্ছে আমার সেই ধারণা দৃঢ়তর হচ্ছে। এখন আমি মনে করি, সত্যানুসন্ধানের সহায়ক এমন একটি বই পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। নিরাশা ও সংসারের অন্ধকারে আমি এই গ্রন্থ থেকে আলোকের নির্দেশ পাই। *গীতা*-র ইংরেজি অনুবাদ যা-কিছু আছে তার অনেকগুলিই আমি প'ড়ে ফেলেছি। এর মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হয় স্যর এডুইন আর্নল্ড-এর অনুবাদ। মূল গ্রন্থের অর্থ ও ভাব

তিনি সম্পূর্ণ রেখেছেন অথচ মনে হয় না যে তাঁর বই অনুবাদ। সেই দু-জন বন্ধুর সঙ্গে এই সময় আমি *গীতা* পড়েছি সত্য ; অধ্যয়ন শুরু করেছি পরে। কয়েক-বছর বাদে *গীতা*-পাঠ আমি নিত্যকর্ম হিসাবে গ্রহণ করি।

আমি এতদিন ভেবে এসেছি যে আর্নল্ড কেবল *গীতা*-রই অনুবাদ রচনা করেছেন। এখন এই দুই ভায়ের সুপারিশক্রমে আর্নল্ড্ রচিত *বুদ্ধচরিত*-এর অনুবাদ *The Light of Asia* আমি অধিকতর আগ্রহে প'ড়ে ফেললাম। বই একবার হাতে নিলে যেন ছাড়তে পারতাম না। একদিন এই দুই ভাই আমায় ব্লাভাট্স্কী লজ্-এ নিয়ে গেলেন এবং মাদাম ব্লাভাট্স্কী ও মিসেস্ বেসান্ত্-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিসেস্ বেসান্ত্ তখন সদ্য থিওসফিক্যাল সোসাইটির সদস্য হয়েছেন। তাঁর এই নতুন ধর্মমত অবলম্বন করা নিয়ে সেসময় খবরকাগজে বেশ আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। আমি সেসব আলোচনা সাগ্রহে পড়তাম। বন্ধুরা আমায় থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দেবার কথা বললেন। তাঁদের প্রস্তাব স্বীকার না-করার সমর্থনে, সবিনয়ে তাঁদের বললাম, "আমার নিজের ধর্ম বিষয়ে আমি এতই কম জানি যে অপর-কোনো ধর্মসমাজে যোগদানের কোনো প্রসঙ্গই হতে পারে না। মনে পড়ে, এই ভাইদের কথায় আমি মাদাম ব্লাভাটস্কী রচিত *Key to Theosophy* বইখানি পড়ি। এ বই প'ড়ে হিন্দুধর্ম বিষয়ে অন্যান্য বই পড়ায় আমার খুব আগ্রহ হয়। সেইসঙ্গে এ কথাও আমি বুঝতে পারি যে, দেশে থাকতে মিশনরি পাদ্রিদের কথায় আমার যে ধারণা হয়েছিল হিন্দুধর্ম কুসংস্কারে ভরা, আমার সে ধারণা ভুল।

এইসময় এক নিরামিষ ভোজনালয়ে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আগত একজন নিষ্ঠাবান্ খ্রিষ্টানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি আমায় খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ে বললেন। রাজকোট থাকতে মিশনরি পাদ্রিদের ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে আমার যা মনে ছিল, আমি তাঁকে বললাম। এসব কথা শুনে তিনি দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললেন, "আমি নিরামিষ আহার করি, মদ খাই না। অবশ্য অনেক খ্রিষ্টান আছেন যাঁরা মাংস খান, মদ খান। কিন্তু খ্রিষ্টানদের ধর্মশাস্ত্রে বলে না যে মদ খেতে হবে, মাংস খেতে হবে। আপনি একবার *বাইবেল* প'ড়ে দেখুন।" আমি তাঁর কথায় রাজি হই, তিনিই আমায় এক কপি *বাইবেল* এনে দেন। আবছাভাবে মনে পড়ছে, তিনি নিজেই *বাইবেল* বিক্রয় করতেন এবং ম্যাপ ও গ্রন্থ-পরিচয়ের অন্যান্য উপকরণ-সম্বলিত এক খণ্ড *বাইবেল* আমি তাঁর কাছ থেকেই কিনি। *বাইবেল* তো পড়তে আরম্ভ করলাম, কিন্তু *ওল্ড টেস্টামেন্ট্* অংশ কিছুতেই প'ড়ে উঠতে পারলাম না। Genesis বা সৃষ্টিতত্ত্ব কোনোপ্রকারে প'ড়ে শেষ করলাম। পরবর্তী অধ্যায়গুলি পড়তে আরম্ভ করলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে যেত। কিন্তু *বাইবেল* যে পড়েছি, এই কথা বলতে পারার জন্য অন্য অংশগুলি অতিকষ্টে এবং একপ্রকার না-বুঝেই শেষ করেছিলাম। Numbers অর্থাৎ ইস্রায়েলি বংশতালিকা পড়তে আমার রীতিমতো খারাপ লাগত।

কিন্তু *নিউ টেস্টামেন্ট্* অংশে যখন এসে পৌঁছলাম, আমার ধারণা বদ্‌লে গেল। বিশেষত, পর্বতশিখর থেকে যীশুর উপদেশ Sermon on the Mount তো একেবারে হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করল। *গীতা*-র সঙ্গে তুলনা ক'রে এই উপদেশবাক্যগুলি আমি পড়েছিলাম। সেই-যে

যীশু বলেছিলেন, "কিন্তু আমি তোমাদের বলি, তোমরা শত্রুকেও ভালোবাসবে। যারা তোমাদের হিংসা করে, তাদের মঙ্গল করবে। যারা তোমাদের শাপ দেয় তাদের আশীর্বাদ করবে, যারা তোমাদের নিন্দা করে, তাদের জন্য প্রার্থনা করবে। যে তোমার এক গালে চড় মারে, তারদিকে অন্য গালটিও পেতে দেবে। কেউ যদি তোমাদের জামা কেড়ে নেয়, তাহলে তাকে চাদরখানাও দিয়ে দিতে ইতস্তত কোরো না...।" এইধরনের কথা প'ড়ে আমার খুবই ভালো লাগল। শামল ভাট্-এর সেই নীতিকবিতার কথাগুলি মনে প'ড়ে গেল, সেই যেখানে তিনি বলেছেন,

সকল মানুষে ভাই ব'লে জানে
মহান্ মানুষ যারা,
অপকার যদি কেহ করে তার
উপকার করে তারা।

আমার তরুণ মনে আমি *গীতা*, আর্নল্ড-এর *বুদ্ধচরিত* ও যীশুর উপদেশাবলীর মধ্যে একটি সঙ্গতি খুঁজতে লাগলাম। ত্যাগধর্ম যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এই কথাটা খুব আমার মনে ধরল।

এইসব বই পড়তে গিয়ে অন্যসব ধর্মগুরুদের জীবনকথা জানবার একটা আকাঙ্ক্ষা হ'ল। একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, আমি যেন কার্লাইল-এর বীর ও বীরপূজা *Heroes and Hero-worship* বইখানা পড়ি। এই বইয়ে আমি পয়গম্বর বিষয়ক অধ্যায় প'ড়ে মহম্মদের মহত্ত্ব, বীরত্ব ও তপশ্চর্যা বিষয়ে জানতে পারি।

ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের সঙ্গে এই ভাসা-ভাসা পরিচয়ের বাইরে যে আমি এগিয়ে যাব, সে-সময় আর সুযোগ ছিল না। পরীক্ষার পড়া তৈরি করার পর অন্য বিষয় পড়ব—সেরকম অবকাশও আমার ছিল না। তবে এইসময়েই আমি মনে-মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম যে আমায় আরো ধর্মগ্রন্থ পড়তে হবে এবং পৃথিবীর মুখ্য ধর্ম-মত ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

কিন্তু নিরীশ্বরবাদ সম্বন্ধে কিছু জানব না, তাই-বা কী ক'রে হয়? তখনকার দিনে ভারতে খুব কম লোকই ছিল যার ব্রাডল-এর নাম না-জানত। ব্রাডল তথাকথিত নাস্তিক ব'লে পরিচিত ছিলেন। আমি নিরীশ্বরবাদ বিষয়েও কী-একটা যেন বই পড়েছিলাম—তার নাম এখন আর আমার মনে নেই। এ বইটি আমার মনে কোনো দাগ কাটেনি, তার কারণ ইতিপূর্বেই আমি নাস্তিকতার সাহারা অতিক্রম ক'রে এসেছি। মিসেস্ বেসান্ত্-এর তখন খুব নামডাক। তিনি তো নাস্তিকতা পরিহার ক'রে আস্তিকতার মধ্যে ফিরে এসেছেন। এটিও ছিল আমার নিরীশ্বরবাদের প্রতি জুগুপ্সার অন্যতম কারণ। আমি মিসেস্ বেসান্ত্-এর 'আমি কেমন ক'রে থিওসফিস্ট হলাম' *How I became a Thesophist* বইখানি পড়েছিলাম।

এইসময় ব্রাডল-র মৃত্যু হয়। ওকিং-এর কবরস্থানে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। লন্ডন-প্রবাসী অন্য ভারতীয়দের মতো আমিও এই অন্ত্যেষ্টিতে উপস্থিত ছিলাম। ব্রাডল-র প্রতি শেষ সম্মান দেখাবার জন্য কয়েকজন পাদ্‌রিও উপস্থিত হয়েছিলেন। ফিরতি পথে আমরা

সবাই স্টেশনে গিয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভিড়ের মধ্যে থেকে এক গোঁড়া নাস্তিক পাদ্‌রিদের একজনকে জেরা করতে লাগলেন :

—ও মশাই, আপনি তো বিশ্বাস করেন ঈশ্বর আছেন?

—হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, তিনি আছেন।—পাদ্‌রি শান্তভাবে বললেন। নাস্তিক ভদ্রলোকটি বেশ বিজ্ঞভাবে হেসে বললেন :

—পৃথিবীর পরিধি যে আটাশ হাজার মাইল, তা আপনি মানেন তো?

—মানি বৈ-কি।

—তাহলে বলুন তো, আপনার ঈশ্বরের দেহের মাথা কেমন এবং কোথায় তিনি থাকেন?

—যদি জানতাম, তাহলে বুঝতাম, আমাদের দু-জনের হৃদয়েই তিনি অনুপ্রবিষ্ট।

—না, মশাই, ওসব কথা ব'লে আমায় ছেলেভুলাতে চাইবেন না।

এই ব'লে নাস্তিকপ্রবর জয়ের হাসি হেসে আমাদের দিকে একবার তাকালেন। পাদ্‌রি আর-কোনো কথা না-ব'লে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এই কথোপকথনের ফলে নাস্তিকতার প্রতি আমার বিরূপতা যেন বেড়ে গেল।

২১. নির্বলের বল রাম

হিন্দুধর্ম ও পৃথিবীর অন্য ধর্ম বিষয়ে আমার মোটামুটি একটা পরিচয় তো ঘটল। আমার তখনই বোঝা উচিত ছিল সঙ্কটকালে আমার এই যৎসামান্য ধর্মজ্ঞান আমায় রক্ষা করতে পারবে না। আপৎকালে মানুষকে যা রক্ষা করে, সে বিষয়ে মানুষের সম্যক্ জ্ঞান বলা তো দূরের কথা, আভাস পর্যন্ত থাকে না। মানুষ যদি নাস্তিক হয় সে বলে "বড়ো ভাগ্যে বেঁচে গেছি।" আর ঈশ্বরে বিশ্বাসী হ'লে বলে, "ভগবান আমায় রক্ষা করেছেন।" সে হয়তো খানিকটা সঙ্গতভাবেই মনে করবে, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার ফলে, কিংবা ধর্মাচরণের ফলে, ভগবান তার প্রতি কৃপা ক'রে থাকবেন। কিন্তু উদ্ধারলাভের মুহূর্তে সে যথার্থভাবে বলতে পারে না কী ক'রে সে উদ্ধার পেল—সে কি তার ধর্মাচরণের ফলে না আকস্মিক কোনো কারণে। নিজের অধ্যাত্মশক্তি নিয়ে যারা বড়াই করে, তাদের কে না-দেখেছে কীভাবে সে অভিমান ধূলিসাৎ হয়। ধর্মজ্ঞান যদি নিছক বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়, যদি আন্তরিক অভিজ্ঞতায় তার ভিত্তি না-থাকে, তাহলে জীবনের সঙ্কট-মুহূর্তে তার কোনো মূল্যই থাকে না।

ধর্ম বিষয়ে পুথিপড়া জ্ঞান যে কত নিরর্থক, বিলেতে থাকতে সে কথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বিলেত যাবার আগে কোন্ অবস্থায় কী ক'রে আমি রক্ষা পেয়েছি, সে সম্বন্ধে তলিয়ে দেখতে পারিনি। তখন আমার বয়স ছিল অল্প। কিন্তু এখন আমার বয়স কুড়ি বছর, স্বামী ও পিতা-রূপে আমার অভিজ্ঞতার পরিধিও খানিকটা বেড়েছে।

যদ্দূর মনে পড়ে, বিলেত-প্রবাসের শেষ বছরে অর্থাৎ ১৮৯০ অব্দে আমি ও আমার এক ভারতীয় বন্ধু নিমন্ত্রিত হয়ে, পোর্টস্‌মাথ্ শহরে এক নিরামিষাহারী সম্মেলনে যোগ

দান করি। পোর্টস্‌মাথ্ সামুদ্রিক বন্দর, সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা হ'ল সারেঙ-খালাসি শ্রেণীর। এখানকার অনেক বাড়িতে যেসব মেয়েরা থাকত তাদের স্বভাবচরিত্র সুবিধার নয়। এদের অনেকে পুরোপুরি গণিকা না-হ'লেও, নৈতিক ব্যাপারে এদের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। এইরকম একটি বাড়িতে আমাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, অভ্যর্থনা সমিতি যে ইচ্ছা ক'রেই এরকম ব্যবস্থা করেছিলেন, তা হতে পারে না। পোর্টস্‌মাথ্-এর মতো বড়ো শহরে, আমাদের মতো দু-দিনের অভ্যাগতদের পক্ষে, কোন্ বাড়ি ভালো হবে কোন্‌টা খারাপ—তা বুঝে ওটা শক্ত ছিল নিশ্চয়।

অধিবেশন সেরে আমরা রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। ডিনারের পর আমরা একহাত ব্রিজ খেলতে বসলাম। বিলেতের অন্য-অন্য সম্ভ্রান্ত বাড়িতে যেমন হয়, গৃহকর্ত্রীও তাসখেলায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। খেলার সময় নির্দোষ ঠাট্টা-মশকরা করা খেলারই একটা অঙ্গ। সকলেই এরকম ক'রে থাকেন। কিন্তু আমার সঙ্গীটি গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে মাত্রা ছাড়িয়ে রসিকতা শুরু করলেন। আমার ধারণা ছিল না, হাসি-ঠাট্টার খেলায় ভারতীয় বন্ধুটি এমন নিপুণ হবেন। আমিও তাদের হাস্যকৌতুকে যোগ দিলাম। হাতের দান ফেলে দিয়ে আমি প্রায় যখন ভব্যতার সীমা অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে ভগবান যেন আমার বন্ধুর মুখ দিয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন : "এ তুমি করছ কি হে ছোক্‌রা? কোত্থেকে শয়তানি চাপল তোমার মাথায়? পালাও, পালাও—এক্ষুনি পালাও।"

আমার খুব লজ্জা হ'ল। আমি নিজেকে সামলে নিলাম। মনে-মনে বন্ধুকে শত-সহস্র ধন্যবাদ দিলাম। পরস্ত্রী সংসর্গ থেকে বিরত থাকব ব'লে মা-র কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই কথা স্মরণ ক'রে আমি দ্রুত সেই জায়গা থেকে পালিয়ে গেলাম। নিজের কামরায় যখন গিয়ে পৌঁছলাম, আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে, বুক ধড়ফড় করছে। শিকারীর হাত থেকে পালিয়ে শিকারের যেমন দশা হয়, আমার ঠিক তেমন হ'ল।

আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রীর প্রতি কামলিপ্সা, এই আমার প্রথম ব'লে মনে পড়ে। সে রাতটা বিনিদ্র কাটল। নানারকম ভাবনা-চিন্তা আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। এ বাড়ি কি আমি ছেড়ে চ'লে যাব? এই তল্লাট ছেড়ে পালাব কি? আমি কোথায় আছি, কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি? বুদ্ধি-বিবেচনা যদি হারিয়ে ফেলি, তবে আমার কী দশা হবে? আমি অতঃপর খুব সাবধানে চলব ব'লে মনঃস্থির করলাম। বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাব না, কিন্তু যে ক'রেই হোক্-না-কেন পোর্টস্‌মাথ্ আমায় ত্যাগ করতেই হবে। সম্মেলনের মেয়াদ ছিল দু-দিনের। আমার মনে আছে, পরের রাত্রেই আমি পোর্টস্‌মাথ্ ছেড়ে চ'লে আসি। বন্ধুবর আরো কয়েকটা দিন সেখানে কাটিয়ে ফেরেন।

ধর্মের সারবস্তু যে কী, ঈশ্বর কী, কীভাবে তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে তাঁর কাজ করেন—এসব আমি তখন কিছুই জানতাম না। খুব আব্‌ছাভাবে এইটুকুমাত্র আমি বুঝেছিলাম যে, সে যাত্রা ভগবানই আমায় রক্ষা করেছিলেন। আমার অন্যান্য সঙ্কটে-বিপদে তিনিই হয়েছেন আমার ত্রাণকর্তা। 'শ্রীহরি সহায়' কথাটির তাৎপর্য আজ আমার কাছে গভীরতর হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবৎ-সহায় যে কী বস্তু তা এখনো আমার কাছে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম

হয়েছে ব'লে দাবি করতে পারি না। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমি তার পূর্ণতর পরিচয় পেতে থাকব। কিন্তু ওকালতির ব্যাপারে, সংস্থা-সংগঠনে কিংবা রাজনীতিক কাজে যখনই কোনো পরীক্ষা বা অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছি, নিঃসংশয়ে বলতে পারি, আমায় রক্ষা করেছেন ভগবান। যখন সমস্ত আশা নিঃশেষ হয়ে যায়, সহায় থাকে না, সম্বল থাকে না, তখন কোথা থেকে যেন অগতির গতি আমার সহায় হয়ে আসেন। প্রার্থনা, আরাধনা, উপাসনা—এগুলি কু-সংস্কার নয়। খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসার চেয়েও এসব কাজ সত্য। এগুলিই সত্য আরসব মিথ্যা—এমনও যদি বলি, তাহলে বলা যাবে না যে বিন্দুমাত্র বাড়িয়ে বলছি।

এই আরাধনা, প্রার্থনা বাগাড়ম্বর নয়, কারণ এ তো কেবল মুখের কথা নয়, অন্তরের কথা। যদি আমাদের অন্তর শুদ্ধ করি, নির্মল করি, যদি অন্য সকলরকম ভাব বিসর্জন দিয়ে অন্তরে কেবল প্রেমভাব সঞ্চয় করতে পারি, যদি মনের তার ঠিক সুরে বেঁধে নিতে পারি, তাহলে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত আকুতি সঙ্গীতের মতো স্পন্দিত হতে থাকবে চোখে-দেখা কানে-শোনা জগতের অতীত এক লোকে। হৃদয়ের সে গান কথার ওপর নির্ভরশীল নয়, ইন্দ্রিয়গ্রামের ওপর নির্ভরশীল নয়। পরন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মনের সকলরকম মলিনতা ধুয়ে দেবার একমাত্র উপায় হ'ল এই প্রার্থনা-উপাসনা। ভক্তি হ'ল এই প্রার্থনার প্রধান উপাদান, নম্র নত হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে না-পারলে, সমস্ত পূজা-আরাধনা নিষ্ফল হতে বাধ্য।

২২. নারায়ণ হেমচন্দ্র

এইসময়ে নারায়ণ হেমচন্দ্র বিলেতে এলেন। লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতির কথা আমি জানতাম। ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন্-এর মিস্ ম্যানিং-এর বাসায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। মিস্ ম্যানিং জানতেন, মেলামেশার ব্যাপারে আমি একটু মুখচোরা। তাঁর ওখানে গিয়ে আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকতাম, কেউ কোনো কথা জিজ্ঞেস না-করা পর্যন্ত মুখ খুলতাম না। মিস্ ম্যানিং নারায়ণ হেমচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি ইংরেজি জানতেন না। তাঁর পোশাক ছিল বিচিত্র ; কিম্ভূৎকিমাকার পাৎলুনের ওপর একটা ইস্ত্রি-বিহীন আধময়লা বাদামি রঙের পার্সি কোট। সার্ট নেই, কলার নেই, টাই নেই। মাথায় ছিল ফুৎনা দেওয়া পশমের টুপি, আর লম্বা দাড়ি।

হেমচন্দ্র মানুষটি ছিলেন রোগা ও বেঁটে। গোলপানা মুখভর্তি বসন্তের দাগ। নাকটা না-ছিল বোঁচা, না-টিকলো। নারায়ণ দাড়িতে হাত বুলিয়ে চলেছেন।

সভ্য সমাজে এইরকম একটি পোশাক-পরিহিত লোককে, আর-পাঁচজনের চেয়ে আলাদা ঠেকবে, এতে আর বিচিত্র কী!

নারায়ণ হেমচন্দ্রকে আমি বললাম : "আপনার বিষয়ে অনেক কথা শুনেছি। আপনার কিছু লেখাও পড়েছি। আমাদের ওখানে আপনি একবার এলে খুব খুশি হব।"

তাঁর গলা ছিল ভাঙা-ভাঙা। হাসিমুখে আমায় বললেন : "নিশ্চয়-নিশ্চয়। তুমি থাকো কোথায়?"

"স্টোর স্ট্রিট্-এ।"

"তাহলে তো আমরা প্রতিবেশী হে। আমার খুব ইংরেজি শেখার শখ। তুমি আমায় শেখাবে?"

"আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব আমি যথাসাধ্য করব এবং খুশি হয়েই করব। যদি বলেন তো আমি আপনার বাড়ি গিয়েই পড়াতে পারি।"

"না, না, তার কিছু দরকার নেই। আমিই তোমার ওখানে যাব'খন। আমার কাছে অনুবাদ অনুশীলনের একটি বই আছে, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

দিনক্ষণ স্থির ক'রে তাঁর আসা-যাওয়া শুরু হ'ল। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হ'ল।

নারায়ণ হেমচন্দ্র ব্যাকরণের ধার ধারতেন না। 'Horse' অর্থাৎ ঘোড়াকে তিনি বলতেন ক্রিয়াপদ, এবং 'Run' অর্থাৎ দৌড়নোকে বলতেন বিশেষ্য। ওরকম মজার কথা আমার অনেকগুলো মনে আছে। কিন্তু ব্যাকরণে জ্ঞান ছিল না ব'লে তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। ব্যাকরণে আমারও জ্ঞান ছিল যৎসামান্য, তাঁর মনে দাগ কাটবার মতো যথেষ্ট নয়। ব্যাকরণ না-জানার জন্য তাঁর একটুও লজ্জা ছিল না। কোনো পরোয়া না-ক'রে তিনি আমায় বলতেন :

"আমি তো তোমার মতো স্কুলে পড়িনি। ভাব প্রকাশের জন্য আমার ব্যাকরণের দরকার হয় না। তুমি কি বাংলা জানো? আমি জানি। বাংলা মুলুকে আমি ঘুরেছি। গুজরাতি ভাষাভাষীদের কাছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়েছি আমিই। অন্যসব ভাষার রত্নসম্ভার আমি গুজরাতিতে অনুবাদ ক'রে আমার ভাইদের হাতে দিতে চাই। জানো তো, অনুবাদ করতে গিয়ে আমি কখনো শব্দার্থ দিই না, ভাবার্থ দিয়ে থাকি। আরো বেশি যদি দিতে হয় তাহলে আমার পরে যাঁরা অনেক বেশি জ্ঞান নিয়ে আসবেন, তাঁরা দেবেন। কিন্তু ব্যাকরণ প্রভৃতিতে অল্পজ্ঞান নিয়েও আমি গুজরাটকে নেহাৎ কিছু কম দিইনি। আমি মরাঠি, হিন্দি, বাংলা তো জানিই, এখন ইংরেজিও জানতে শুরু করেছি। আমি যা চাই সে হ'ল বিপুল শব্দসম্ভার। তুমি কি ভেবেছ ইংরেজি শিখেই আমার সব উচ্চাশার শেষ? আরে ছোঃ! আমায় এরপর ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসি ভাষাও শিখতে হবে। শুনেছি, ফরাসি ভাষায় বিরাট সাহিত্য আছে। যদি সম্ভব হয়, আমি জর্মানি গিয়ে জর্মন ভাষাও শিখে আসব।"

এইভাবে অনর্গল তিনি কথা ব'লে চললেন। ভাষা-শেখা ও বিদেশ-ভ্রমণ এই দুটি ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না।

"আপনি কি তাহলে আমেরিকাতেও যাবেন?"

"নিশ্চয়। সে আর বলতে? নতুন দুনিয়া না-দেখে আমি দেশে ফিরব কী ক'রে?"

"কিন্তু টাকা পাবেন কোথা থেকে?"

"আমার পয়সার কী দরকার? আমায় তো আর তোমার মতো বাবুয়ানা করতে হয় না, কাপড়ে-চোপড়ে ফিট্‌ফাট্ থাকতে হয় না। সামান্য আহার আর যৎসামান্য পরিধেয় হ'লেই আমার বেশ চ'লে যায়। বই থেকে অল্প যা-কিছু পাই, বন্ধুরা সামান্য যা-কিছু দেয়, তাইতেই আমার চ'লে যাবে। আমার যত ঘোরাফেরা সব থার্ড ক্লাসে। আমেরিকায় যাব যখন, ডেক্-এর যাত্রী হয়েই যাব।"

নারায়ণ হেমচন্দ্রের এই সাদাসিধে ধরন ছিল একান্তই তাঁর নিজস্ব। তাঁর সরলতা ছিল দিলখোলা। মনে তাঁর লেশমাত্র গর্ব বা অভিমান ছিল না—অবশ্য তিনি যে শক্তিমান্ লেখক এ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন।

রোজই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ স্বভাবে ও চিন্তায় আমাদের দু-জনের বেশ মিল ছিল। দু-জনেই নিরামিষাশী, দুপুরে অনেকসময় আমরা একত্র খাওয়া-দাওয়া করতাম। সে-সময়টাতে আমার সাপ্তাহিক খরচ ছিল সতেরো শিলিং, তখন আমি স্বপাক খেতাম। কখনো আমি তাঁর ওখানে, কখনো তিনি আমার বাসস্থানে আসতেন। আমি ইংরেজি ঢঙে রান্না করতাম। দেশী ঢঙে রান্না না-হ'লে তাঁর খেয়ে তৃপ্তি হ'ত না। ডাল ছাড়া তাঁর চলতই না। আমি গাজর প্রভৃতি দিয়ে সূপ রাঁধতাম, আমার রুচি দেখে তাঁর মায়া হ'ত। কোথা থেকে তিনি একদিন মুগ ডাল জোগাড় ক'রে, রেঁধেবেড়ে আমার ওখানে নিয়ে এসেছিলেন। সেদিনকার খাওয়াটা বেশ জমেছিল। তারপর প্রায়ই আমরা নিজেদের রান্না পরস্পরকে খাওয়াতাম। আমার ধারণায় আমি যে উৎকৃষ্ট খাদ্যটি রাঁধতাম তার খানিকটুকু তাঁকে দিয়ে আসতাম। তিনিও অনুরূপ করতেন।

তখন ক্যার্ডিনাল ম্যানিং-এর নাম মুখে-মুখে। ডক্ মজদুরদের বহুদিনব্যাপী ধর্মঘট যে বন্ধ হয়, তা জন বার্নস্ ও কার্ডিনাল ম্যানিং-এর চেষ্টায়। কার্ডিনাল-এর সাদাসিধে জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ডিসরেলি খুব ভালো-ভালো কথা বলেছিলেন। আমি তা নারায়ণ হেমচন্দ্রকে প'ড়ে শুনিয়েছিলাম। শুনে তিনি বললেন, "তবে তো এরকম ঋষিতুল্য লোকের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।"

"তিনি তো মস্ত লোক। আপনি কেমন ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?"

"কেন? কী ক'রে দেখা পাওয়া যাবে, সে আমি জানি। তুমি আমাব হয়ে তাঁর কাছে একটি চিঠি লিখে দাও। চিঠিতে বলো, আমি লেখক এবং জনহিতকর কাজ করেছেন ব'লে সাক্ষাতে তাঁকে আমি আমার অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছুক। সেইসঙ্গে এটাও লিখে দাও, আমি ইংরেজি জানি না ব'লে তোমায় আমার দোভাষী ক'রে নিয়ে যাব।"

আমি তো সেই মর্মে একটি চিঠি লিখে দিলাম। দু-তিনদিনের মধ্যেই কার্ডিনাল ম্যানিং-এর জবাবস্বরূপ পোস্টকার্ড এল, সাক্ষাতের দিনক্ষণ নির্দিষ্ট ক'রে। আমরা দু-জনেই কার্ডিনাল সন্দর্শনে গেলাম। আমি দস্তুর-মোতাবেক পোশাক প'রে গিয়েছিলাম সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে। নারায়ণ হেমচন্দ্রের পোশাক যেমন ছিল তেমনি—অর্থাৎ সেই কোট আর পাৎলুন। আমি ঠাট্টা করাতে তিনি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন ·

"তোমরা সভ্য মানুষেরা সবাই ভীরু প্রকৃতির। মহৎ লোকেরা কে কী পোশাক পরেছে, সেদিকে নজরও দেন না, বাইরের খোলসে তাঁদের কোনো আগ্রহ নেই। তাঁরা অন্তরের দিকটাই দেখেন।"

আমরা তো কার্ডিনাল-এর বাসস্থানে প্রবেশ করলাম। আমরা বসামাত্র একজন বুড়ো লম্বা রোগাপানা এক ভদ্রলোক উপস্থিত হয়ে আমাদের দু-জনের সঙ্গে করমর্দন করলেন। নারায়ণ হেমচন্দ্র তাঁকে এইভাবে অভিনন্দিত করলেন : "আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। মনে হ'ল, ধর্মঘট মিটিয়ে দেবার জন্য আপনি যা করেছেন, তার জন্য আপনাকে সাক্ষাতে আমায় ধন্যবাদ জানানো উচিত। সকল দেশের সাধুপুরুষ দর্শন করা আমি কৃত্য ব'লে মনে করি। তাই আপনাকে একটু কষ্ট দিতে এলাম।"

তিনি গুজরাতিতে যা বলেছিলেন আমি ইংরেজিতে এইভাবে তর্জমা ক'রে দিয়েছিলাম।

"আপনারা এসেছেন, এতে আমি খুব খুশি। আশা করি লন্ডনে থাকা আপনাদের পক্ষে প্রীতিকর হবে এবং এ দেশের লোকজনের সঙ্গে আপনারা মেলামেশা করতে পারবেন। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।"

এই ক-টি কথা ব'লে কার্ডিনাল উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

একদিন নারায়ণ হেমচন্দ্র আমার ওখানে আসেন ধুতি ও সার্ট প'রে। আমাদের এই বাড়ির গৃহকর্ত্রী ইতিপূর্বে নারায়ণ হেমচন্দ্রকে দেখেননি ; দরজা খুলে দিতে গিয়ে তিনি আতঙ্কে আমার কাছে দৌড়িয়ে এসে বললেন : "একটা পাগল-গোছের লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

আমি দরজার কাছে গিয়ে নারায়ণ হেমচন্দ্রকে দেখে তো স্তম্ভিত। তাঁর মুখে কিন্তু সেই হাসি লেগে আছে, যেন কিছুই হয়নি।

"রাস্তার ছেলেরা আপনাকে ক্ষেপায়নি?"

"হ্যাঁ, কিছুটা রাস্তা আমার পিছু-পিছু ছুটেছিল। কিন্তু আমি গ্রাহ্য না-করায়, বেশি-কিছু বলতে পারেনি।"

লন্ডন-এ কয়েকমাস থেকে নারায়ণ হেমচন্দ্র চ'লে গেলেন প্যারিস্ শহরে। তিনি সেখানে ফরাসি ভাষা শিখে, কিছু ফরাসি বই তর্জমাও করেছিলেন। তাঁর তর্জমা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মতো ফরাসি আমার জানা ছিল ব'লে, তিনি অনুবাদগুলি আমায় পড়তে দেন। আমি দেখলাম আক্ষরিক অনুবাদ সেগুলি নয়, ভাবার্থমাত্র।

শেষপর্যন্ত তাঁর আমেরিকা যাবার সঙ্কল্পও তিনি পূর্ণ করেছিলেন। বহু কষ্টে তিনি একটি ডেক্-টিকিট সংগ্রহ করেন। আমেরিকায় থাকতে ধুতি-সার্ট পরিহিত অবস্থায় পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করে এবং অশিষ্ট পোশাক পরার অপরাধে তাঁকে আদালতে চালানও করে। আমার স্মরণ হয়, সে যাত্রা তিনি খালাস পেয়েছিলেন।

২৩. মহাপ্রদর্শনী

১৮৯০-৩ প্যারিস্-এ একটি বিরাট প্রদর্শনী হয়। খবরকাগজে এই প্রদর্শনীর উদ্‌যোগপর্ব নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ থাকত। তাছাড়া এমনিতেই আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল একবার প্যারিস্ দেখে আসার। আমার মনে হ'ল এই অবসরে যদি আমি প্যারিস্ যাই, তাহলে একসঙ্গে রথ দেখা ও কলা বেচা সেরে আসতে পারি। প্রদর্শনীর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল ঈফেল টাওয়ার। আগাগোড়া লোহায় তৈরি এই মিনারের উচ্চতা হবে প্রায় এক হাজার ফুট। এছাড়াও অন্য আকর্ষণীয় বস্তু যে না-ছিল তা নয়। কিন্তু ঈফেল টাওয়ারই ছিল প্রধান আকর্ষণ, কারণ প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপনে ও প্রচারপত্রে বলা হয়েছিল যে ইতিপূর্বে কেউ না-কি কল্পনাও করতে পারেনি ওরকম উঁচু একটা ব্যাপার নিরাপদে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

প্যারিস্-এ একটি নিরামিষ আহারের রেস্তোরাঁ বিষয়ে আগেই খবর পেয়েছিলাম। সেইখানে একটি কামরা ভাড়া নিয়ে এক সপ্তাহ আমি প্যারিস্-এ কাটিয়ে এসেছিলাম। লন্ডন থেকে প্যারিস্ যাতায়াত, প্যারিস্-এর দ্রষ্টব্য যা-কিছু দেখা—এসমস্তই আমি সেরেছিলাম যথাসম্ভব অল্পখরচে। প্যারিস্ শহরের রাস্তাঘাটের একটি ম্যাপ ও প্রদর্শনী বিষয়ক একটি গাইড বই অবলম্বন ক'রে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়ে হেঁটে ঘুরে-ঘুরে সব দেখতাম। এইসব ম্যাপ ও গাইড বইয়ের কল্যাণে মোটামুটি বড়ো-বড়ো রাস্তাঘাট ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য জায়গা সহজেই দেখা যেতে পারে।

প্রদর্শনী বিষয়ে এখন আমার বিশেষ-কিছু মনে নেই। মনে পড়ে কেবল যে, যেমন বিরাট ছিল এর আয়তন, তেমনি বিচিত্র ছিল এর পণ্যসম্ভার। ঈফেল টাওয়ার-এ বার-দু-তিন চড়েছিলাম ব'লে বেশ মনে পড়ে। টাওয়ার-এর প্রথম তলায় ছিল একটি রেস্তোরাঁ। মাটি থেকে অনেক উঁচু একটা জায়গায় ব'সে লাঞ্চ খেয়েছি, এইটুকু বলবার লোভে আমি সাতটা শিলিং জলে ফেলেছিলাম ব'লে মনে পড়ে।

প্যারিস্ শহরের প্রাচীন গির্জাগুলির কথা আমার এখনো বেশ মনে পড়ে। যেমন তাদের ঐশ্বর্য ও মহিমা, তেমনি তাদের মধ্যে যে গভীর প্রশান্তির ভাব দেখেছি, তা সত্যিই অবিস্মরণীয়। নোৎরদাম গির্জার স্থাপত্যকৌশল, অভ্যন্তরভাগের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও ভাস্করদের রচিত অপূর্ব মূর্তিগুলি, একবার দেখলে ভোলা যায় না। আমার তখন ধারণা হয়েছিল, যাঁরা লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ ক'রে এইরকম দেবমন্দির তৈরি করেছেন তাঁদের হৃদয়ে নিশ্চয় গভীর ভগবৎ-ভক্তি।

প্যারিস্ শহরের ফ্যাশন্-প্রিয়তা ও সেখানকার লঘু, চপল, খামখেয়ালিপনার কথা অনেক পড়েছিলাম। পথে-ঘাটে তার নিদর্শনও দেখেছি, কিন্তু গির্জাগুলি ছিল এইসব-কিছু থেকে স্বতন্ত্র। একবার মন্দিরে প্রবেশ করলে, মানুষ যেন বাইরের কর্মব্যস্ততা ও কোলাহলের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তার ধরন-ধারণ আচরণ বদ্‌লে যায়। কুমারী মাতা মেরীর সামনে নতজানু হয়ে যারা প্রার্থনায় রত, তাদের পাশ কাটিয়ে সে যখন সন্তর্পণে এগিয়ে যায়, তখন তার

ভক্তি-সম্ভ্রমের ভাব লক্ষ করার মতো। এইসব দেখেশুনে আমার মনে হয়েছিল, দেবতার সামনে প্রণিপাত করা, কিংবা প্রার্থনা-উপাসনা করা, কেবলমাত্র কু-সংস্কার ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমার সেই ধারণা এখন দৃঢ়তর হয়েছে। আমি বুঝতে পারি, ভক্তিতে শ্রদ্ধায় নত হয়ে মানুষ যখন মেরীর কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছে, তখন তারা কেবল মর্মর-মূর্তির পূজা করেনি, তারা তখন প্রণাম জানিয়েছে ঈশ্বরের সেই মাতৃভাবকে, যার প্রতিমা হলেন মেরী মাতা। আমার মনে পড়ে, সেইসময় আমার হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তা হ'ল এই যে, এইরকম পূজা-আরাধনার ফলে ভগবানের মহিমা হ্রাস পায় না, বরঞ্চ বৃদ্ধি পায়।

ঈফেল টাওয়ার বিষয়ে এখানে দু-একটা কথা বলা দরকার। এই টাওয়ার এখন কোনো কাজে লাগছে কি-না আমি জানি না। সেইসময় এই বিষয়ে ভালো-মন্দ অনেক কথাই শুনেছি, কেউ-কেউ প্রশংসা করেছেন, কেউ আবার নিন্দাও করেছেন। আমার মনে আছে, নিন্দুকদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন তলস্তয়। তিনি বলেছিলেন, ঈফেল-এর মিনার মানুষের মূর্খতার সমান উঁচু—এই বিরাট স্তম্ভ বানাতে গিয়ে মানুষ তার জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় বিশেষ-কিছু যে দিতে পেরেছে, তা নয়। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে যতরকম নেশা আছে তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট হ'ল তামাকের নেশা। এই নেশায় যারা মজেছে তারা এখন পাপে ও কুকর্মে রত হতে পারে যা থেকে মদের মাতালও দূরে থাকে। মদ পেলে মানুষ মত্ত হয়, সে কথা সত্য। কিন্তু তামাক ধরলে তামাকের ধোঁয়ায় মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, মানুষ মনে-মনে আকাশকুসুম রচনা করতে থাকে। ঈফেল টাওয়ার এইরকম নেশাগ্রস্ত মনের আজব সৃষ্টি; এর মধ্যে শিল্পকুশলতার চিহ্নমাত্র নেই। প্রদর্শনীর সৌষ্ঠব-সাধনে এর দান অকিঞ্চিৎকর। বেয়াড়া বিদ্ঘুঁটে আকারের একটা নতুন বস্তু দেখতে পাবে ব'লেই, লোকে দলে-দলে এই টাওয়ার দেখেছে ও চড়েছে। ঈফেল ছিল প্রদর্শনীর একটি অতিকায় খেলনার মতো। অল্পবয়সে খেলনার প্রতি মানুষের একটা আকর্ষণ থাকে। ঈফেল প্রমাণ করে যে খেলনা নিয়ে ভোলবার মতো একটা মূঢ় ছেলেমানুষি আমাদের সকলের মধ্যেই র'য়ে গেছে—ঈফেল রচনার সার্থকতা বলতে যদি কিছু থাকে, সে হ'ল এইখানে।

২৪. ব্যারিস্টর তো হলাম—অতঃপর?

যে কাজের জন্য আমি বিলেত গিয়েছিলাম অর্থাৎ ব্যারিস্টর হওয়া বিষয়ে আমি অনেকদিন কিছু বলিনি। এখন সংক্ষেপে সে বিষয়ে দু-চারটে কথা বলব।

ব্যারিস্টর হওয়া মানে 'বিচারায়তনে ডাক পড়া'। ডাক পড়ার আগে দুটো শর্ত পালন করা দরকার। প্রথমত, 'টার্ম' রাখা অর্থাৎ নির্দিষ্টকাল কোনো Inn-এর সঙ্গে যুক্ত থাকা। বৎসরে চারটি ক'রে 'টার্ম', সুতরাং তিন বছরে বারোটি টার্ম রাখা দরকার। দ্বিতীয়ত আইনের পরীক্ষায় পাশ করা। টার্ম রাখার অপর অর্থ হ'ল খানা খাওয়া। প্রতি টার্মে প্রায় চব্বিশটি

খানার মধ্যে অন্তত ছটিতে যোগ দেওয়া দরকার। 'খানা খাওয়া' মানে যে ডিনার খেতেই হবে এমন নয়। নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা দিয়ে খানার সময় উপস্থিত থাকলেই হ'ল। সচরাচর সকলেই অবশ্য খানা খেয়ে থাকেন, কারণ এসব ডিনারে ভোজ্য ও পানীয় দুটিই উৎকৃষ্ট খানা। প্রতি ডিনারের দাম পড়ত আড়াই থেকে সাড়ে তিন শিলিং মতন—অর্থাৎ দু-তিন টাকা। দামটা খুবই ন্যায্য, কারণ বাইরের হোটেলে কেবল মদের খরচই ওরকম প'ড়ে থাকে। ভোজ্যর তুলনায় পানীয়ের দাম বেশি লাগতে পারে, এই কথা শুনে আমাদের দেশের তথাকথিত 'সংস্কৃতিমান্' লোকেরা ছাড়া আর সকলে হয়তো খুব অবাক হবেন। প্রথম-প্রথম এরকম ব্যাপার দেখে আমিও অবাক হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, মানুষ কী ক'রে এত টাকা মদের পিছনে ঢালে! পরে এ কথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। প্রথম-প্রথম এসব ডিনারে আমি কিছুই খেতাম না বললেই হয়। আহার্যের মধ্যে আমার খাওয়ার উপযোগী বলতে থাকত কেবল পাউরুটি আলু সেদ্ধ ও কপি সেদ্ধ। এসব তখন আমার বিস্বাদ লাগত ব'লে আমি খেতাম না। পরে যখন এরকম সাদামাটা সেদ্ধ খাওয়ায় আমার রুচি হ'ল, তখন আমি সাহস ক'রে অন্যান্য ডিশ-ও অর্ডার দিতে পারতাম।

যাঁরা 'বেঞ্চার' অর্থাৎ পাশ করা ব্যারিস্টরদের মধ্যে মুরুব্বি ব্যক্তি, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আহার্য শিক্ষার্থীদের আহার্য থেকে ভালো থাকত। আমার মতোই একজন পার্সি শিক্ষার্থী ছিলেন নিরামিষাশী। সেই সুবাদে আমি দু-জনের হয়ে একটি দরখাস্ত পেশ করি যে বেঞ্চারদের আহার্য-তালিকায় নিরামিষ পদগুলি যেন আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়। দরখাস্ত মঞ্জুর হ'লে পর বেঞ্চারদের টেবিল থেকে আমাদের জন্য ফলমূল ও অন্য নিরামিষ খানা পরিবেশিত হতে লাগল।

প্রত্যেক চারজন শিক্ষার্থী-পিছু দু-বোতল ক'রে মদ দেওয়া হ'ত। যেহেতু ওই বস্তুটি আমি স্পর্শ করতাম না, আমায় চারজনের একজন ক'রে পাওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি প'ড়ে যেত। তাহলে আবার তিনজন মিলে দু-বোতল সাবাড় করতে পারত। আবার প্রতি টার্ম-এ একটি ক'রে 'বড়া' খানা বা গ্র্যান্ড নাইট-এর রেওয়াজ ছিল। সেইসব ডিনারের সঙ্গে পোর্ট ও শেরীর উপরন্তু শ্যাম্পেন প্রভৃতি দেওয়া হ'ত। এইসব গ্রান্ড নাইট ডিনারে উপস্থিত থাকবার জন্য সহপাঠীরা আমায় খুব ধরাধরি করতেন, আমার দাম যেন বেড়ে যেত।

ব্যারিস্টর হতে গেলে যেসব গুণ থাকা দরকার, এইসব ডিনার থেকে সেইসব গুণ কী ক'রে যে বর্তাতে পারে, সে আমি তখনো বুঝিনি, আজও বুঝি না। একটা সময় ছিল যখন মুষ্টিমেয় ছাত্র এইসব খানায় হাজির হ'ত। সেসময় বেঞ্চার-দের সঙ্গে ছাত্রদের আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকত। বক্তৃতাদিও হ'ত। এইভাবে বেশ সুরুচি-সম্মত উপায়ে ছাত্রেরা বাইরের জগৎ সম্বন্ধে একটা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে পারত, বাগ্মিতারও বেশ চর্চা হতে পারত। আমাদের সময়ে সে সুযোগ ছিল না বললেই হয়, কারণ সেসময় বেঞ্চার-রা ছাত্রদের সঙ্গে না-ব'সে নিজেদের টেবিলে আলাদা ব'সে খানাপিনা করতেন। কালক্রমে এই প্রাচীন প্রথার তাৎপর্য আর নেই বললেই হয়, তবু রক্ষণশীল ইংরেজ একে যেন তেন প্রকারেণ বাঁচিয়ে রেখেছে।

পাঠক্রম ছিল খুবই সহজ। সেইজন্য ঠাট্টা ক'রে বলা হ'ত খানা খানেওয়ালা ব্যারিস্টর। সবাই জানত পরীক্ষার কোনো মূল্য নেই বললেই চ'লে। আমাদের সময়ে পরীক্ষার যে দুটি বিষয় ছিল তার মধ্যে একটি হ'ল রোমান ল ও অন্যটি Common Law অর্থাৎ ইংলন্ডের আইন। এই দুটি পরীক্ষার জন্যই যথারীতি পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট ছিল। কম্পার্টমেন্টাল অর্থাৎ ভাগে-ভাগে পরীক্ষাও দেওয়া চলত। পাঠ্যকেতাব বড়ো কেউ পড়ত না। আমি দেখেছি, অনেকে রোমান ল-এর ওপর ছোটো-ছোটো নোট বই প'ড়ে, সপ্তাহ-দুয়েক খেটেখুটে, কোনোপ্রকারে ঘেঁষটে-ঘেঁষটে পাশ ক'রে বেরিয়েছেন। Common Law পরীক্ষায় পাশ করতে হ'লে অবশ্য দু-তিন মাসের মতো তোড়জোড় করতে হ'ত। প্রশ্নপত্র হ'ত বেশ সহজ আর পরীক্ষকেরাও নম্বর দিতেন দরাজ হস্তে। রোমান ল-এর পরীক্ষায় পাশ করত গড়পড়তা শতকরা পঁচানব্বই থেকে নিরানব্বই জন এবং ফাইনাল পরীক্ষায় পঁচাত্তর কিংবা তার চেয়েও বেশি। বছরে পরীক্ষা হ'ত একবার নয়—চারবার ক'রে। সুতরাং পরীক্ষা শক্ত ব'লে মনে তো হ'তই না, ফেল করার ভয়ও ছিল খুবই কম।

আমি কিন্তু আমার পরীক্ষার ব্যাপারটা খুব শক্ত ক'রে তুলেছিলাম। আমার মনে হ'ল, নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক সবগুলোই আমায় ভালো ক'রে প'ড়ে ফেলতে হবে, তা না-হ'লে ফাঁকি দেওয়া হবে। বইগুলো আমি একে-একে কিনে ফেললাম। স্থির করলাম, রোমান ল পড়তে হবে মূল লাতিন ভাষায়। লন্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য আমি যতটুকু লাতিন শিখেছিলাম এবার তা আমার কাজে লাগল। পরে যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাই সেখানেও লাতিন আমার কাজে লেগেছিল, কারণ সে দেশের আইনের ভিত্তি ছিল রোমান ল ও হলান্ড-এর ল। সুতরাং জাস্টিনিয়ান পড়া থাকার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার আইন-কানুন বুঝতে আমার বেশ সুবিধা হয়েছিল।

বিলেতের 'কমন ল' আদ্যোপান্ত পড়তে গিয়ে আমায় নয় মাস দস্তুরমতো খাটতে হয়েছিল। ব্রুম্-এর *Common Law* ব'লে বইটি আকারে যেমন বড়ো তেমনি পড়তেও বেশ ভালো লাগে, আবার সময়ও লাগে বেশ। স্নেল্-এর *Equity* পড়তে তো ভালোই লাগত, কিন্তু বুঝে ওঠা একটু শক্ত। হোয়াইট এন্ড্ টিউডর-এর *Leading Cases* বই থেকে কিছু-কিছু প্রধান মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ে পড়তে ভালোই লাগত, অনেক-কিছু জানাও যেত। আরো যে-সমস্ত বই আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে পড়েছি, তার মধ্যে ছিল উইলিয়মস্ ও এডওয়র্ড্-এর স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বই *Real Property* এবং গুডিভ-এর অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক *Personal Property*। উইলিয়মস্-এর বই ছিল প্রায় উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষী। দেশে ফেরার পর আমি আইন বিষয়ক আরোকটি যে বই অক্লান্ত আগ্রহে পড়েছি, সে হ'ল মেইন্-এর হিন্দু আইন সম্পর্কিত বই *Hindu Law*। এখানে অবশ্য ভারতীয় আইনের বইগুলি বিষয়ে বলতে যাওয়া ঠিক প্রাসঙ্গিক হবে না।

পরীক্ষাগুলি তো পাশ করলাম। বিচারায়তনের দরজায় আমার ডাক পড়ল অর্থাৎ আমি ব্যারিস্টর হলাম ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন তারিখে। পরদিন লন্ডনের হাইকোর্টে আমি নাম লেখালাম। ১২ জুন আমি দেশে ফেরার জন্য পাড়ি দিলাম।

এত পড়াশুনো ক'রে ব্যারিস্টরি পাশ ক'রেও, আমার মনে ভয় ও অস্বস্তির অবধি ছিল না। আমার কেবলি মনে হতে লাগল আইনজীবী হওয়ার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আমার মনের সেই অসহায় অবস্থার কথা একটা আলাদা অধ্যায়ে বলা দরকার।

২৫. অসহায় অবস্থা

ব্যারিস্টর হওয়া সহজ কিন্তু ব্যারিস্টরির কাজ করা বেশ কঠিন। আমি আইন পড়েছি কিন্তু ওকালতি কীভাবে করতে হয়—তা তো শিখিনি। আইনের পেছনে যেসব নীতি আছে, সেসব আমি বিশেষ আগ্রহে পড়েছি, কিন্তু আইন-ব্যবসার সেসব নীতি কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা আমি ঠিক বুঝিনি। রোমান ল-এর একটি নীতি হ'ল 'সিক্ উতেরে উত্ আলিয়েনুম্ নন লায়েদাস্' অর্থাৎ নিজ সম্পত্তি এমনভাবে ভোগ করো যাতে অপরের সম্পত্তির লোকসান না-হয়। কিন্তু মামলা-মকদ্দমায় এই নীতি কীভাবে মক্কেলের সুবিধায় প্রয়োগ করতে হবে, সে কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছিল না। যেসব বড়ো-বড়ো মকদ্দমায় এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা হয়েছে তার ভূরি-ভূরি উদাহরণ আমায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু সেসমস্ত প'ড়েও, কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ ওকালতি করতে গিয়ে আমি যে এই নীতি প্রয়োগ করতে পারব, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হতে পারিনি।

উপরন্তু, ভারতীয় আইনের বিন্দুবিসর্গও আমি শিখে উঠতে পারিনি—হিন্দু আইন কিংবা মুসলমান আইন বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। একখানা আর্জি যে কীভাবে লিখতে হয় তা পর্যন্ত শিখিনি। আমি যেন অথৈ জলে পড়লাম। শুনেছিলাম স্যর ফিরোজশা মেহ্তা না-কি তাঁর সিংহগর্জনে কোর্ট কাছারি কাঁপিয়ে দিতে পারতেন। আমি ভাবতাম, এসব বিদ্যা তিনি বিলেতে কীভাবে রপ্ত করেছিলেন? আইনে তাঁর মতন গভীর জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি যে আমি কখনও অর্জন করতে পারব, সে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু এখন দস্তুরমতো ভয় হতে লাগল যে ব্যারিস্টরি ক'রে আমার জীবিকাটুকু অর্জন করতে পারব কি-না।

আমি যখন আইন পড়ছি তখন থেকেই এইসব দুশ্চিন্তা আমার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল। আমার এই সমস্যার কথা মন খুলে কয়েকজন বন্ধুদের বলেছিলাম। একজন পরামর্শ দিলেন আমি যেন দাদাভাই নওরোজীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর উপদেশ ভিক্ষা করি। ইতিপূর্বে বলেছি, আমি যখন বিলেত আসি আমার সঙ্গে দাদাভাই নওরোজীর নামে একটি পরিচয়পত্র ছিল। এটি আমি খুব দেরি ক'রে কাজে লাগিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এত বড়ো একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করার আমার কোনো অধিকার নেই। যখনই তাঁর কোনো বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তি দেখতাম, আমি যথাস্থানে হাজির হয়ে, বক্তৃতা হল্-এর একপ্রান্তে ব'সে ব'সে শুনতাম। চক্ষু-কর্ণের তৃপ্তি সাধিত হ'লে পর চুপচাপ চ'লে যেতাম। ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে নিকট সংযোগের জন্য তিনি একটি সংস্থা পত্তন করেছিলেন। আমি এই সংস্থার সভায় উপস্থিত থাকতাম। ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য তাঁর কেমন আগ্রহ ছিল আর

ছাত্রেরাও তাকে কত শ্রদ্ধা করত—এসব দেখে আমার ভারি আনন্দ হ'ত। শেষে একদিন সাহস ক'রে তাঁর হাতে সেই পরিচয়পত্রটি দিলাম। তিনি বললেন, "আমার উপদেশ যদি তোমার কাজে লাগে, তোমার যখন সুবিধা আমার কাছে আসতে পার।" কিন্তু তাঁর এই ঢালা আমন্ত্রণের সুযোগ আমি কখনও নিইনি। অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া তাঁকে গিয়ে বিরক্ত করা আমার অন্যায় ব'লে মনে হ'ত। সুতরাং সেইসময়ে আমার বন্ধুর পরামর্শমতো দাদাভাইয়ের কাছে আমার সমস্যা নিয়ে হাজির হবার সাহস আমার হয়নি। আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না, হয়তো এই বন্ধুই কিংবা আর-কেউ আমায় বলেছিলেন, আমি যেন মিস্টার ফ্রেডরিক পিন্‌কাট্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বিলেতের রক্ষণশীল কনজারভেটিভ দলের তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য, কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না, স্বার্থও ছিল না। অনেক ছাত্রই তাঁর কাছ থেকে উপদেশ-পরামর্শ চাইতে যেত। আমিও চিঠি লিখে আবেদন জানালাম যেন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য একটু সময় বরাদ্দ করেন। আমার দরখাস্ত তিনি মঞ্জুর করলেন। তাঁর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের কথা আমি কখনও ভুলব না। তিনি একেবারে বন্ধুর মতো আমায় অভ্যর্থনা ক'রে নিলেন। আমার সমস্ত ভয় ও হতাশা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি মনে করো সবাইকে ফিরোজশা মেহ্‌তা হতেই হবে? ফিরোজশা ও বদরুদ্দিনের মতো ব্যারিস্টর এক-দু-জনের বেশি হয় না। নিশ্চিত জেনে রাখো সাধারণ উকিল হতে হ'লে অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলের দরকার হয় না। সে যদি মোটামুটি সৎ ও পরিশ্রমী হয় তাহলে তা-ই জীবিকার জন্য যথেষ্ট। আর, সব মোকদ্দমা জটিল হতে যাবে কেন? আচ্ছা, এমনিতে তুমি কীরকম পড়াশুনো করেছ বলো দেখি।"

আমার অধীত জ্ঞানের স্বল্পতার বিষয়ে শুনে, মনে হ'ল তিনি যেন একটু হতাশ হয়েছেন। অবশ্য পরমুহূর্তেই হতাশাব ভাবটা কেটে গেল, সুন্দর হাসিতে তাঁর মুখ-চোখ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "আমি বুঝতে পারি, তোমার অসুবিধে কোথায়। তোমার লেখাপড়ার পরিধিটা একটু কম। জাগতিক ব্যাপারে তুমি কিছু জানো না। উকিলের আবার ব্যবহারিক জ্ঞান না-থাকলে চলে না। ভারতের ইতিহাসটাও তুমি পড়নি। লোকচরিত্র বিষয়ে উকিলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কেবল মুখ দেখে কোন্ মানুষটা কেমন জেনে ফেলা দরকার। তাছাড়া প্রত্যেক ভারতীয়ের উচিত দেশের ইতিহাস বিষয়ে জানা। ওকালতি করার সঙ্গে ইতিহাস জ্ঞানের প্রত্যক্ষ যোগ অবশ্য নেই, তবু সেই জ্ঞানটা থাকা দরকার। আমি দেখছি যে কেই এবং মেলিসন্-এর লেখা ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিষয়ে বইটাও তুমি পড়নি। ও বইটা চট ক'রে জোগাড় ক'রে প'ড়ে ফেলো। লোকচরিত্র বোঝবার জন্য আর যে দুটি বই তোমার পড়া উচিত, তা হ'ল লাভাটর ও শেমেলপেনিক্-এর লেখা মুখাকৃতি দেখে চরিত্র নির্ণয়ের বই।"

এই শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুটির কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। যতক্ষণ তাঁর কাছে বসেছিলাম, আমার সমস্ত ভয় যেন কেটে গিয়েছিল। কিন্তু বেরিয়ে আসামাত্র দুশ্চিন্তা যেন আমায় পেয়ে বসল। আমার ঘুরে-ফিরে মনে হতে লাগল, "কেবলমাত্র মানুষের মুখ দেখে তার চরিত্র নির্ণয়

করতে হবে।" বাড়ি ফিরে যাবার পথে ওই দুটি বইয়ের কথা ভাবতে লাগলাম। পরের দিনই আমি লাভাটর-এর বই কিনে ফেললাম। শেমেলপেনিক্-এর বই সে দোকানে পাওয়া গেল না। লাভাটর-এর বই পড়তে গিয়ে দেখলাম স্নেল্-এর *Equity*-র চাইতে বোঝা শক্ত, পড়তেও তেমন ভালো নয়। শেক্সপীয়র-এর মুখাকৃতি দেখে তাঁর চরিত্র নির্ণয় বিষয়ে অনেক-কিছু পড়লাম। কিন্তু তা থেকে এমন কোনো শিক্ষা পেলাম না যাতে লন্ডনের পথ-চলতি অগণিত সেক্সপীয়রদের বিষয়ে কিছু বুঝতে পারি।

লাভাটর প'ড়ে আমি নতুন-কিছু জ্ঞান লাভ করিনি। মিস্টার পিন্‌কাট্-এর উপদেশ-পরামর্শ প্রত্যক্ষত আমার কোনো কাজে লাগেনি সত্য, কিন্তু তাঁর সস্নেহ ব্যবহারের ফল ভালোই হয়েছিল। তাঁর সেই খোলা হাসির মুখখানি আমার মনে আঁকা র'য়ে গেল। আর মনে রইল তাঁর সেই আশ্বাস যে ওকালতিতে কৃতকার্য হতে গেলে, ফিরোজশা মেহ্‌তার বুদ্ধি, মেধা ও ক্ষমতা অবশ্যপ্রয়োজনীয় নয়। সৎ লোক ও পরিশ্রমী হ'লেই যথেষ্ট। এই দুটি গুণ আমার খুব কম ছিল না ব'লে আমি মনে-মনে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলাম।

কেই এবং মেলিসন্-এর গ্রন্থাবলী আমি বিলেতে থাকতে প'ড়ে উঠতে পারিনি। ভেবেছিলাম, প্রথম সুযোগেই বইগুলি প'ড়ে নিতে হবে। সে সুযোগ এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়।

এইভাবে বহু সংশয়ের মধ্যে একটু আশা নিয়ে, আমি এস. এস. আসাম স্টীমার যোগে বোম্বাই শহরে পা দিলাম। পোতাশ্রয়ে সমুদ্র অশান্ত থাকায় তীরে এসে ভিড়তে হ'ল লঞ্চে চেপে।

দ্বিতীয় ভাগ

১. রায়চন্দ্‌ভাই

প্রথম ভাগের শেষ পরিচ্ছেদে বলেছি যেদিন আমি দেশে পৌঁছলাম, সেদিন বোম্বাইয়ের পোতাশ্রয়ে সমুদ্র ছিল অশান্ত। জুন-জুলাই মাসে আরব সাগরে সচরাচর এরকম অবস্থাই থাকে। একেবারে এডেন বন্দর থেকেই সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ অবস্থা। জাহাজের প্রায় প্রত্যেকটি যাত্রীই সমুদ্র-পীড়ায় কাতর। একমাত্র আমিই ছিলাম দিব্য বহাল তবিয়তে। অধিকাংশ সময় আমি উত্তাল তরঙ্গমালা দেখবার জন্য ডেক্‌-এ কাটাতাম। মাঝে-মাঝে দু-একটা ঢেউ যখন ডেক্‌-এর ওপর আছড়ে ভেঙে পড়ত, আমার বেশ মজা লাগত। প্রাতরাশের সময় আমি ছাড়া আর দু-একজনমাত্র খানা-কেবিনে হাজির থাকতেন। পরিজ্‌-এর প্লেটটা সন্তর্পণে কোলের ওপর রেখে, কোনোপ্রকারে চামচ মুখে তোলা যেত। টেবিলে প্লেট রাখলে হয়তো ঝাঁকুনির দোলায় গোটা প্লেট-সুদ্ধ পরিজটাই কোলের ওপর পড়তে পারত।

আমার মনে তখন যে নানা চিন্তার ঝড় ব'য়ে চলেছিল, বাইরের তুফান ছিল যেন তারই প্রতীক। কিন্তু সমুদ্রের ঝড়-তুফানে আমি যেমন অবিচল ছিলাম, এই চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও বাইরে কিন্তু আমি শান্তই ছিলাম। জাত ও সমাজ নিয়ে নানা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে তো হবেই। আইন ব্যবসায় নামা নিয়ে আমি কত যে অসহায় বোধ করেছিলাম, সে কথা তো পূর্বেই বলেছি। তাছাড়া আমি তো একজন সংস্কারক, কোথায় কেমন ক'রে যে সংস্কারের কাজ শুরু করা যাবে, তাই নিয়েও আমি খুব মাথা ঘামাচ্ছিলাম। আরো কত-কত সমস্যা যে আমার অদৃষ্টে ছিল। সে আমি তখন বুঝতেও পারিনি।

ডক্‌-এ দাদা এসেছিলেন আমায় নিতে। লন্ডনের সেই ডক্টর মেহ্‌তা ও তাঁর দাদার সঙ্গে আমার দাদার ইতিমধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা ঘ'টে গেছে। ডক্টর মেহ্‌তার আগ্রহাতিশয়ে আমরা দু-জন তাঁর বোম্বাইয়ের বাড়িতে অতিথি হলাম। বিলেতে আমাদের যে পরিচয়ের সূত্রপাত, দেশে ফিরেও তার জের চলল। ফলে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে বেশ একটু ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ গ'ড়ে ওঠে।

মাকে দেখার জন্য আমি আকুল হয়ে উঠেছিলাম। তখনো আমি জানতে পারিনি, আমায় কোলে টেনে নেবার জন্য তিনি আর ইহজগতে নেই। বোম্বাইয়ে পৌঁছবার পর আমায় সেই শোকসংবাদ জানানো হ'ল। আমায় যথারীতি স্নান তর্পণাদি করতে হ'ল। আমি বিলেতে থাকতেই মা যে পরলোকগমন করেছেন, দাদা সে কথা আমায় আর জানতে দেননি। বিদেশে একা-একা থাকতে মাতৃ-বিয়োগের ব্যথা আমি যাতে না-পাই, সেইজন্যই তিনি এরকম

করেছিলেন। কিন্তু দেরি ক'রে খবর পেলেও, আঘাত আমার কম বাজেনি। কিন্তু তা নিয়ে আমি বেশি-কিছু বলতে চাই না, এইটুকু বললেই হয়তো যথেষ্ট হবে যে পিতৃ-বিয়োগে আমি যে শোক পেয়েছিলাম, এ শোক ছিল তার চেয়েও গভীর। আমার সমস্ত আশা-ভরসা যেন এক মুহূর্তে ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আমার কিন্তু মনে পড়ে মায়ের মৃত্যুতে শোকের উচ্ছ্বাস আমি দমন করেছিলাম, চোখের জলটুকুও ফেলিনি। যেন কিছু হয়নি—এইভাবে আমি জীবনকে মেনে নিয়েছিলাম।

ডক্টর মেহ্‌তা তাঁর কতিপয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর দাদা রেবাশংকর জগজীবন। এঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আজীবন টিকে ছিল। অন্য আরেক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের কথা আমার বিশেষভাবে বলা দরকার। তিনি হলেন ডক্টর মেহ্‌তার অন্য এক দাদার জামাই, কবি রায়চন্দ্ বা রাজচন্দ্র। রেবাশঙ্কর জগজীবনের নামে যে অলঙ্কারের কারবার ছিল, রায়চন্দ্‌ভাই ছিলেন তার অংশীদার। তখন তাঁর বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, শিক্ষায়-দীক্ষায় ও চরিত্রশক্তিতে ইনি একজন বিশিষ্ট মানুষ। তাঁকে বলা হ'ত শতাবধানী, অর্থাৎ এমন তাঁর স্মরণশক্তি যে তিনি যুগপৎ একশোটি বিষয় মনে রাখতে পারেন ও তদনুসারে করণীয় কাজ করতে পারেন। রায়চন্দ্-এর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ডক্টর মেহ্‌তা আমায় পরখ ক'রে দেখতে বললেন। আমার বিদেশী ভাষার শব্দসম্ভার যা-কিছু ছিল আমি উজাড় ক'রে দিয়ে কবিকে বললাম তিনি যেন সেইসব কথার পুনরাবৃত্তি করেন। আমি পরপর যে-যে কথা বলেছিলাম রায়চন্দ্ অবিকল সেগুলির পুনরাবৃত্তি করলেন। তাঁর এই কৃতিত্বে আমার হিংসা হয়েছিল, কিন্তু আমি ঠিক অভিভূত হইনি। অভিভূত হয়েছিলাম যে ব্যাপারে, সে বিষয় আমি জানতে পারি আরও পরে। সে হ'ল রায়চন্দ্-এর বহুবিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞান, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও আপনাকে জানার জন্য তীব্র আকুতি। পরে আমি বুঝেছিলাম, এই আত্মোপলব্ধির জন্যই যেন তিনি প্রাণধারণ করেছিলেন। যে মন্ত্র তিনি সর্বদা আবৃত্তি করতেন, হৃদয়ে ধারণ করতেন, সে হ'ল মুক্তানন্দের এই কটি কথা :

আমার প্রতিদিনের সকল কাজে
যখন হেরি তাঁরে,
সকল জীবন ধন্য তখন
মানি আপনারে।
এই জীবনের সকল কাজে
বাঁধা যে তাঁর ডোর
মুক্তানন্দ সেই কথাটি
গাহে জীবন ভোর।

রায়চন্দ্ লক্ষ-লক্ষ টাকার কারবার করতেন। হীরামোতির পাকা জহুরী ছিলেন। ব্যবসার জটিলতম প্রশ্নও তাঁর কাছে নিতান্ত সহজ ছিল। কিন্তু যে বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে তাঁর জীবন আবর্তিত হ'ত, তা ছিল এইসব-কিছু থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর সেই কেন্দ্রগত ইচ্ছা ছিল ঈশ্বরকে

প্রত্যক্ষ দেখার আকুতি—অর্থাৎ ভগবৎ-দর্শন। যে টেবিলে ব'সে তিনি কারবার করতেন তার ওপর অন্য কোনো জিনিস থাক্ বা না-থাক্, কোনো ধর্মগ্রন্থ কিংবা তাঁর দিনলিপি পুস্তক (ডায়েরি) থাকতই। ব্যবসার কাজ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে, তিনি হয় ধর্মগ্রন্থ নতুবা ডায়েরি খুলে বসতেন। তাঁর যেসব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই এইসব ডায়েরি থেকে আহরণ করা। যে লোক বড়ো ব্যবসার কেনা-বেচা লেনদেনের ব্যাপার শেষ ক'রেই, আত্মজ্ঞান সম্পর্কে গূঢ় রহস্যের কথা লিখতে বসে, সে লোক অর্থের ব্যাপারী হতে পারে না, সে নিশ্চয় পরমার্থের অর্থাৎ সত্যের সন্ধানী। একবার দুবার নয়, বহুবার তাঁকে দেখেছি কাজ-কারবারের মধ্যেই তিনি ভগবৎ-চর্চায় ডুবে আছেন। তাঁর এই স্থিতধী শান্ত অবস্থা থেকে তাঁকে কখনো বিচ্যুত হতে দেখিনি। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো কাজ-কারবার বা স্বার্থের সম্বন্ধ ছিল না, তৎসত্ত্বেও আমি তাঁর খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছিলাম। আমি তখন নিতান্তই বেকার ব্যারিস্টর। কিন্তু যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, তিনি আমার সঙ্গে ধর্মের গভীর তত্ত্বকথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। তখন তো আমি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি, ধর্মালোচনায় আমার সত্যকার কোনো আগ্রহ ছিল—এমন কথাও বলা চলে না। তবু রায়চন্দ্-এর কথা আমি গভীর মনোযোগে শুনতাম। পরে অনেক ধর্মনেতা বা ধর্মগুরুর সংস্পর্শে আমি এসেছি, ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের আচার্যদের সঙ্গে মেলামেশা করার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু আমাকে বলতেই হয়, রায়চন্দ্ভাই আমার মনের ওপর যে ছাপ রেখে গেছেন তেমন আর-কেউ রাখতে পারেনি। তিনি যা-কিছু বলতেন তা যেন অতি সহজেই আমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করত। তাঁর মনস্বিতার প্রতি আমার যেমন শ্রদ্ধা ছিল, তেমনি ছিল তাঁর নৈতিক চরিত্রের প্রতি। সেইসঙ্গে আমি নিশ্চিত জানতাম যে তিনি ইচ্ছা ক'রে কখনো আমায় বিপথে চালনা করতেন না। তাঁর অন্তরের নিগূঢ়তম কথাও তিনি আমার কাছে ব্যক্ত করতেন। আমার সংশয়ের মুহূর্তে তিনি ছিলেন আমার আশ্রয়স্থল।

তাঁর প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি রায়চন্দ্কে আমার হৃদয়ে গুরুর আসনে বসাতে পারিনি। আমার সেই হৃদয়াসন আজও শূন্য, আজও আমি সন্ধান ক'রে চলেছি।

আধ্যাত্মিক সাধনায় গুরুর মহিমা বিষয়ে হিন্দুরা যা ব'লে থাকেন, তাতে আমার আস্থা আছে। গুরু-বিনা পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হয় না—এই কথায় অনেকখানি সত্য আছে ব'লে আমার মনে হয়। জাগতিক জ্ঞানের ব্যাপারে শিক্ষক সর্বাংশে যোগ্য না-হ'লেও চলতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ব্যাপারে, শিক্ষককে গুরু অথবা আদর্শ আচার্য হতে হয়। যিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন, একমাত্র তিনিই গুরুর আসন অধিকার করার যোগ্য। চরিত্রের উৎকর্ষলাভ করার জন্য তাই নিরন্তর প্রয়াস করতে হয়, কারণ যেমন শিষ্য তেমনি তার গুরু মেলে। সিদ্ধিলাভের জন্য নিরন্তর সাধনায় আমাদের সকলের অধিকার আছে। কর্মেই মানুষের অধিকার। কর্মই মানুষের পুরস্কার। কর্মফল ভগবানের হাতে।

যদিও রায়চন্দ্ভাইকে আমার অন্তরের সিংহাসনে গুরুরূপে বসাতে পারিনি, তবু জীবনযাপনের নানা ব্যাপারে তিনি আমায় পথ দেখিয়েছিলেন, সাহায্য করেছিলেন। সমসাময়িকদের মধ্যে তিনজন আমার মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছেন ; রায়চন্দ্ভাই

তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শদ্বারা, তলস্তয় তাঁর রচিত পুস্তক *The Kingdom of God is within You* (মানুষের অন্তরে ভগবানের রাজ্য বিরাজ করে) দ্বারা এবং রাস্কিন্ তাঁর লেখা *Unto This Last* পুস্তকের দ্বারা আমার মন অধিকার করেছিলেন। সেইসব কথা আমি যথাস্থানে বলব।

২. সংসার-জীবনের সূচনা

আমায় নিয়ে দাদার উচ্চাশার অন্ত ছিল না। ধনমান ও যশের জন্য জন্য তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁর হৃদয় ছিল যেমনি দরাজ তেমনি তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। এইসব কারণে এবং তাঁর সরল মনের জন্য তাঁর অনেক বন্ধু জুটেছিল। দাদা ভেবেছিলেন, এঁদের সাহায্যেই তিনি আমায় অনেক মক্কেল জোগাড় ক'রে দিতে পারবেন। তিনি তো ধ'রেই নিয়েছিলেন যে আমার প্র্যাক্‌টিস্ জমবে ভালো, রোজগার হবে প্রচুর। সেই আশায় বাড়ির খরচপত্র তিনি অসম্ভব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ব্যারিস্টরিতে আমার যাতে পসার হয়, সেইজন্য প্রচুর পরিশ্রমে তিনি জমি প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন।

আমার সমুদ্রযাত্রা নিয়ে জাতভাইদের মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, আমি ফিরে আসার পরও তার নিরসন হয়নি। এই নিয়ে মোঢ় বেনিয়া সমাজে দুটো ভিন্ন দলের সৃষ্টি হ'ল। একটি দল আমায় কালবিলম্ব না-ক'রে জাতে তুলে নিলেন। অন্য দল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, আমায় একঘরে করতেই হবে। আমার প্রতি যাঁরা অনুকূল ভাবাপন্ন, তাঁদের খুশি করার জন্য রাজকোট যাবার আগেই দাদা আমায় নাসিকে নিয়ে গেলেন তীর্থস্নানের উদ্দেশ্যে। অতঃপর রাজকোট পৌঁছে জাতভাইদের সবাইকে পঙ্‌ক্তিভোজনে নিমন্ত্রণ করা হ'ল। এসব আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু দাদা আমায় যেমন স্নেহ করতেন, আমিও তাঁকে তেমনি শ্রদ্ধা করতাম। তিনি যা বলতেন, আমি বিচার না-ক'রেই যন্ত্রচালিতের মতো ক'রে যেতাম। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমার কাছে অনুজ্ঞার মতো। জাতে ঢোকবার ব্যাপারটা এইভাবে একপ্রকার সুরাহা হয়ে গেল।

সমাজের যে তরফ আমায় জাতে নিতে আপত্তি করেছিল, সে দলে ঢোকবার জন্য আমি কখনো চেষ্টা করিনি। সেই দলের মোড়লদের বিষয়ে আমার মনে কোনো বিদ্বেষভাবও ছিল না। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ আমায় ঠিক পছন্দ করতেন না। তৎসত্ত্বেও আমি চেষ্টা করতাম, যেন আমার ব্যবহারে কিংবা কথাবার্তায় তাঁরা মনে দুঃখ না-পান। জাত থেকে বহিষ্কার করার নিয়মকানুন আমি বেশ শ্রদ্ধা ক'রেই মেনে নিয়েছিলাম। এই তরফের ফতোয়া অনুসারে আমার কোনো আত্মীয়স্বজন, এমন-কি আমার শ্বশুর-শাশুড়ী, বোন বা ভগ্নীপতিও, আমার সঙ্গে আহারাদি করতে পারবেন না—এমন-কি, আমায় এক গেলাস জলটুকুও দিতে পারবেন না। তাঁরা সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে আমার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া

করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে যে কাজ আমি করতে পারি না, লোকচক্ষুর অগোচরে গোপনে সে কাজ করায় আমার কিছুতেই মন সরত না।

আমার এই সতর্ক আচরণের ফলে জাতের ব্যাপার নিয়ে আমায় কখনো ভুগতে হয়নি। এমন-কি যে তরফ এখনো আমায় একঘরে ব'লে মনে করেন, তাঁদের কাছ থেকেও আমি প্রচুর স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ ক'রে আসছি। জাতের জন্য আমি কিছু করব সেরকম কোনো প্রত্যাশা না-রেখেও, তাঁরা আমার অনেক কাজে সহায়তা করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটা সম্ভব হয়েছিল আমার অপ্রতিরোধের ফলে। আমি জাতে ঢোকার জন্য যদি আন্দোলন করতাম, যদি জাতি ও সমাজে দলাদলির সৃষ্টি করতাম, যদি জাতভাইদের উত্যক্ত করতাম, তাহলে নিশ্চয় তাঁরা আমায় পাল্‌টা আক্রমণ করতেন। তাহলে বিলেত থেকে ফেরবার পরে সামাজিক ঝড়-তুফানের আবর্ত থেকে আমি এত সহজে মুক্তি পেতাম না এবং নানারকম মিথ্যাচারে আমায় জড়িয়ে পড়তে হ'ত।

স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তখনো মনোমতোভাবে গ'ড়ে ওঠেনি। বিলেত যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে ঈর্ষা-সন্দেহের ভাব আমার তখনো কাটেনি। নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারেও আমার ছিদ্রান্বেষণ ও সংশয়ের অন্ত ছিল না। সুতরাং স্ত্রীর সম্পর্কে যেসব বাসনা বিলেতে থাকতে পোষণ ক'রে এসেছিলাম, তার একটিও পূর্ণ হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আমার স্ত্রী পড়তে শিখবেন, লিখতে শিখবেন, তাঁর লেখাপড়ায় আমি সাহায্য করব—এইরকম একটা সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আসঙ্গলিপ্সা আমার বাদ সাধল। আমার নিজের দোষে সে বেচারাকে ভুগতে হ'ল। একসময় ব্যাপার এমন চরমে উঠল যে আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। তাঁর দুঃখ-দুর্গতি একেবারে সহ্যের শেষ সীমায় না-পৌঁছনো পর্যন্ত তাঁকে আমি ঘরে ফিরে আসতে দিইনি। এসমস্তই যে আমার নির্জলা আহাম্মুকী—সে কথা আমি পরে বুঝেছিলাম।

শিশুশিক্ষার ব্যাপারে সংস্কারসাধন করব—মনে-মনে এইরকম স্থির ক'রে এসেছিলাম। দাদার একাধিক সন্তান ছিল। আমার যে ছেলেকে রেখে আমি বিলেত গিয়েছিলাম, তখন তার বয়স প্রায় চার বছর। ইচ্ছা হ'ল, রোজ এইসব শিশুদের দিয়ে শরীরচর্চা করাব যাতে তারা শক্তসমর্থ হয়। মনে-মনে ভাবলাম, আমার সংসর্গে এলে এইসব ছেলেদের উপকার হবে। দাদার এ কাজে বেশ সমর্থন ছিল। আমার সে চেষ্টা যে একেবারে সফল হয়নি—এমন নয়, অল্পবিস্তর ফল ফলেছিল। ছোটোদের সঙ্গ ও সাহচর্য আমার খুব ভালো লাগত। সেই যে তাদের সঙ্গে হাসিখেলা করতাম, আমার সে অভ্যাস আজও র'য়ে গেছে। তখন থেকেই আমার মনে হ'ত, ছোটোদের শিক্ষকতার কাজ আমি বেশ ভালোই করতে পারব।

আহার্য বিষয়ে সংস্কার তো অবশ্য প্রয়োজন। ইতিপূর্বেই বাড়িতে চা ও কফির আমদানি হয়েছিল। দাদা ঠিক করেছিলেন আমার বিলেত থেকে ফিরে আসার আগেই, বাড়ির আবহাওয়ায় কিছু বিলিতি ভাব এনে ফেলতে। আগে বাড়িতে যেসব চীনেমাটির বাসন বিশেষ উপলক্ষে কালেভদ্রে বের করা হ'ত, আমি ফিরে এসে দেখি সেগুলি এখন নিত্য-ব্যবহারের বাসন। আমার 'সংস্কার' এল যেন এইসবের পরিপূরক হয়ে। আমি আমদানি

করলাম ওটমিলের পরিজ এবং চা ও কফি খারিজ ক'রে কোকোর প্রচলন করলাম। আসলে কিন্তু কোকো এল চা-কফির উপরন্তু হয়ে। বুট্ জুতো ও এমনি জুতোর চল তো আগের থেকেই ছিল। এখন বিলিতি ভব্যতার বাহন হয়ে এল আমার ইংরেজ পোশাক-আশাক।

এতে খরচপত্র বেড়ে গেল। নিত্যনূতন দ্রব্য-সামগ্রী ঘরে আসতে লাগল। আমরা যেন বাড়ির দরজায় শাদা হাতি খুঁটোয় বেঁধে তার পোষণ-পরিচর্যা করতে লাগলাম। তা তো হ'ল, এখন খরচের টাকাটা আসে কোথা থেকে? রাজকোটে প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করতে যাওয়া মানে সকলের উপহাসের পাত্র হওয়া। পাশ-করা উকিল মোক্তারের তুলনায় আমার আইনের জ্ঞান কত কম, অথচ ফি দাবি করতে হবে তাঁদের দশ গুণ! নিতান্ত আকাট মূর্খ না-হ'লে কোনো মক্কেল আমায় নিযুক্ত করতে যাবে না। না-হয় বোকাসোকা কোনো মক্কেল পাকড়াও করা গেল, কিন্তু কোন্ মুখে আমার অজ্ঞতার সঙ্গে উদ্ধত অহঙ্কার ও প্রতারণা যোগ করব। তাহলে তো জগতের কাছে আমার ঋণের বোঝা বেড়ে যাবে।

বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন কিছুদিনের জন্য বোম্বাই গিয়ে আমি যেন হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে আসি। সেখানে গিয়ে আমি ভারতীয় আইন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করব, দু-চারটে মোকদ্দমা হাতে পাবার চেষ্টাও করতে পারব। আমি তাঁদের পরামর্শমতো বোম্বাই চ'লে গেলাম।

বোম্বাইয়ে বাসা ভাড়া করলাম। একজন রাঁধুনি নিযুক্ত করলাম যে প্রায় আমারই মতন চৌকস। লোকটা জাতে বামুন। আমি তাকে চাকরের মতন না-রেখে, বাড়ির লোকের মতন ক'রেই রেখেছিলাম। স্নানের সময় সে ঘটি-ঘটি জল ঢালত কিন্তু গা পরিষ্কার করত না। তার ধুতি ছিল যেমন ময়লা তেমনি তার পৈতেও। শাস্ত্র বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না।

আমি তাকে ডেকে বলতাম : "আচ্ছা রবিশঙ্কর, রান্নাবান্না তোমার আসে না দেখছি। কিন্তু পুজো-আচ্চা সন্ধ্যা-টন্ধ্যার ব্যাপার, তোমার নিশ্চয় জানা আছে।"

"সন্ধ্যা, দাদাবাবু? আমার সন্ধ্যা হ'ল লাঙল, আর কোদাল হ'ল নিত্যকর্ম। আমি হলাম এইধরনের বামুন। আপনাদের কৃপায় প্রাণধারণ ক'রে আছি, আর তা না-হ'লে চাষবাস ছাড়া অন্য গতি নেই।"

সুতরাং আমায় রবিশঙ্করের শিক্ষক হতে হ'ল। হাতে সময় থাকত যথেষ্ট। অদ্ধেক রান্না তো আমিই করতাম। বিলেত থাকতে নিরামিষ রান্নার যেসব পরীক্ষা করেছিলাম, এখানেও সেসব চলতে লাগল। একটা স্টোভ খরিদ ক'রে, রবিশঙ্করের সঙ্গে আমিও রান্নার কাজ করতে লাগলাম। পঙ্‌ক্তিভোজন নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিছুদিন পরে দেখা গেল, রবিশঙ্করেরও সেরকম কোনো ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই নেই। সুতরাং দুটিতে মিলে রান্নার কাজ বেশ চলতে লাগল। মুশকিল বাধল কেবল একটি জায়গায়—রবিশঙ্কর মনে-মনে যেন পণ করেছিল সে ময়লা থাকবে এবং আহার্য জিনিসও অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন রাখবে।

বোম্বাইয়ে চার-পাঁচ মাসের বেশি আমি থাকতে পারিনি। খরচ যেভাবে বেড়ে চলেছিল, সেই তুলনায় উপার্জন ছিল নিতান্তই কম।

এইভাবে আমার সংসারযাত্রার সূচনা হ'ল। ব্যারিস্টরি পেশাটা আমার একটুও ভালো

লাগছিল না—বাইরে ভড়ং খুব, কিন্তু বিদ্যা নিতান্তই যৎসামান্য। আমার কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞান আমায় খুব পীড়া দিতে লাগল।

৩. আমার প্রথম কেস্

বোম্বাই থাকতে একদিকে চলল ভারতীয় আইন ভালো ক'রে পড়া, অন্যদিকে আহার ও আহার্য নিয়ে আমার নানারকম পরীক্ষা। এই শেষোক্ত ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন আমার এক বন্ধু বীরচাঁদ গান্ধী। দাদা এদিকে প্রচুর চেষ্টা ক'রে চললেন যাতে আমার জন্য কেস্ জোগাড় ক'রে দিতে পারেন। ভারতীয় আইন পড়তে যাওয়া রীতিমতো ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। দেওয়ানি মামলার যেসব আইনকানুন, Civil Procedure Code, আমি কিছুতেই যেন কায়দা করতে পারছিলাম না। সাক্ষ্যের আইন, Evidence Act, আমার কিন্তু ভালোই লাগত। বীরচাঁদ গান্ধী তখন এটর্নি হবার পরীক্ষা দিতে তৈরি হচ্ছিলেন। ব্যারিস্টর ও উকিলদের বিষয়ে তিনি নানারকম গল্প বলতেন। একদিন তিনি বললেন, "স্যর ফিরোজশা-র কৃতিত্ব কোথায় জানো? আইনে তাঁর গভীর জ্ঞানে। Evidence Act তো তাঁর মুখস্থ। বত্রিশ ধারায় যতগুলো কেস্ আছে, তার প্রত্যেকটি তিনি মনে রাখতে পারেন। বদরুদ্দীন তৈয়বজীও যুক্তি-তর্কে এমন পারদর্শী যে হাকিমরা পর্যন্ত তাঁকে ভয় পান।"

আইন-আদালতের এইসব হোমরা-চোমরাদের কথা শুনে ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে যেত।

বীরচাঁদভাই ব'লে যেতেন : "পাঁচ-সাত বছর ধ'রে ব্যারিস্টররা ব্রীফ না-পেয়ে বেকার ব'সে থাকেন—সে তো সর্বদাই দেখা যায়। সেইজন্যই তো আমি সলিসিটার হব ব'লে ঠিক করেছি। তিন বছরের মধ্যেও যদি তুমি নিজের খরচ চালাবার মতো রোজগার ক'রে উঠতে পারো, নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে ক'রো।"

প্রতিমাসেই খরচের অঙ্ক বেড়ে যেতে লাগল। যে বাড়িতে ব্যারিস্টরি পেশায় প্রস্তুত হবার জন্য সাধ্যসাধনা করছি, সেই বাড়িরই দরজায়, নিজেকে ব্যারিস্টর ব'লে পরিচয় দিয়ে নামের বোর্ড টাঙাতে আমার কিছুতেই মন সরছিল না। সেইজন্য লেখাপড়াতেও আমি একাগ্র মনঃসংযোগ করতে পারছিলাম না। সাক্ষ্য আইন বা Evidence Act-এ আমি কিঞ্চিৎ রস পেতে শুরু করলাম, *Mayne*-এর হিন্দু আইন সম্পর্কিত গ্রন্থ *Hindu Law* আমি বেশ আগ্রহে পড়তাম। কিন্তু কেস্ চালাবার মতো সাহস পাচ্ছিলাম না। কতটা যে অসহায় বোধ করছিলাম নিজেকে, সে কথায় প্রকাশ করা যাবে না। আমার অবস্থা ছিল শ্বশুরবাড়িতে প্রথম পদার্পিত নববধূর মতো।

এইসময় মমিবাইয়ের কেস্ আমার হাতে আসে। নিতান্তই ছোটোখাটো মামলা। আমায় বলা হ'ল, "দালালকে কিঞ্চিৎ কমিশন দিতে হবে।" আমি তাতে আমার ঘোরতর আপত্তি জানলাম।

"কিন্তু ফৌজদারি আদালতের অমুক নামজাদা উকিল—মাসে যাঁর তিন-চার হাজার টাকা আয়, তিনিও তো দালালকে কমিশন দেন।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "তাঁর মতো আমাকে হতেই হবে, তার কোনো মানে আছে? আমি মাসে তিন শো রোজগার করতে পারি তো তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। বাবা তো তার চেয়ে বেশি উপার্জন করতেন না।"

"কিন্তু জমানা পাল্‌টে গেছে, সে দিনকাল আর নেই। বোম্বাইয়ে খরচের বহর কীরকম বেড়ে গেছে দেখেছ তো। কাজ-কারবার করতে গেলে সাংসারিক বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করা দরকার।"

আমি কিন্তু অটল রইলাম। দালালকে কোনো কমিশন দিলাম না, তবু মমিবাইয়ের কেস্ আমার হাতে এল। খুবই সোজা কেস্। আমি ফি ধার্য করলাম ত্রিশ টাকা। একদিনের বেশি কেস্ চলার কথা নয়।

স্মল কজ কোর্ট্-এ সেই আমার প্রথম পদক্ষেপ। আমি ছিলাম অপরপক্ষের ব্যারিস্টর, সুতরাং ফরিয়াদি পক্ষের সাক্ষীদের আমায় জেরা করতে হবে। আমি সওয়াল করার জন্য উঠে দাঁড়াতেই হাত-পা যেন ভয়ে সেঁধিয়ে গেল। মাথা ঘুরতে লাগল, মনে হ'ল সমস্ত আদালত যেন আমার চোখের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রশ্ন করার মতো একটা কথাও মুখে এল না। আমার দুরবস্থা দেখে জজ নিশ্চয় হেসে থাকবেন, উকিলেরাও নিশ্চয় প্রচুর কৌতুক অনুভব ক'রে থাকবেন। কিন্তু এসব দিকে তখন কি আমার নজর ছিল—আমি চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। আমি ব'সে পড়লাম, দালালকে বললাম, আমার দ্বারা মামলা চালানো হবে না। সে যেন আমার কাছ থেকে ফি ফেরৎ নেয় ও পাটেলকে নিযুক্ত করে। পাটেলকে সেই দিনের জন্য একান্ন টাকায় নিযুক্ত করা হ'ল। তাঁর কাছে তো এ কেস্ ছেলেখেলার সামিল।

আমি আদালত থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলাম। মক্কেল হারল না জিতল সেটুকু জানার জন্যও তর সয়নি। লজ্জায় যেন মাথা কাটা গেল। ঠিক করলাম, সাহসে নির্ভর ক'রে যতদিন-না দাঁড়াতে পারব ততদিন আর কোনো কেস্ নেব না। দক্ষিণ আফ্রিকায় না-যাওয়া পর্যন্ত আর কোনো কেস্ সত্যিই আমি হাতে নিইনি। এই মনঃস্থির করার ব্যাপারে আমার কোনো কৃতিত্ব ছিল না। এ আমার যেন অনিবার্যকে মেনে নেওয়া। মামলায় হারবার জন্য কে এমন আহাম্মক যে আমায় কেস্ দেবে!

তবে বোম্বাই থাকতে আরো একটা কেস্ আমার কপালে জুটেছিল। এটি ছিল একটি আর্জি লিখে দেবার কাজ। পোরবন্দর-রাজ এক গরীব মুসলমানের জমি খাস ক'রে নেন। সে ভেবেছিল, আমি স্বনামধন্য বাপের সুযোগ্য সন্তান। সেই ভেবেই এসেছিল আমার কাছে। সব দেখে-শুনে মনে হ'ল কেস্‌টা তেমন জোরদার নয়, তবু আমি তার আর্জি লিখে দিতে রাজি হলাম। বললাম, কেবল আর্জি ছাপার খরচটা তাকে দিতে হবে, আর-কিছু দিতে হবে না। দরখাস্তের খসড়া আমি কোনো-কোনো বন্ধুকে শুনিয়েছিলাম। তাঁরা খসড়াটা অনুমোদন

করলেন। তাই দেখে আমার কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। আমি ভাবলাম, আর্জি লিখে দেবার মতো যোগ্যতা আমার হয়তো আছে। সত্যি বলতে কী, সে তো আমার আছেই।

বিনা-পয়সায় আর্জি লেখার ব্যবসা শুরু করলে, আমার কারবার বেশ চলতে পারত। কিন্তু তাতে তো পেট ভরে না। মনে হ'ল, আমি তো মাস্টারির কাজ করতে পারি। ইংরেজি ভাষাটা আমি একপ্রকার ভালোই জানতাম। কোনো স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রদের ইংরেজি পড়াতে আমার ভালোই লাগত নিশ্চয়। তাহলে মাসিক খরচপত্রও অংশত উঠে আসতে পারত। কাগজে একটি বিজ্ঞাপনও দেখলাম : কর্মখালি। দৈনিক এক ঘণ্টা পড়াইতে পারিবেন, এইরূপ একজন ইংরাজি শিক্ষক প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৭৫্ টাকা। বিজ্ঞাপন দিয়েছেন একটি নামজাদা হাই স্কুল। আমি আবেদন করলাম, সাক্ষাৎকারের জন্যও ডাকও এল। আমি বেশ আশা ও উৎসাহ নিয়েই দেখা করতে গেলাম, কিন্তু হেডমাস্টার যখন শুনলেন যে আমি গ্রাজুয়েট নই, দুঃখ প্রকাশ ক'রে আমায় বিদায় দিলেন।

আমি বললাম, "আমি কিন্তু লন্ডনের ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি। আমার দ্বিতীয় ভাষা ছিল লাতিন।"

"তা সত্য, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন গ্রাজুয়েট শিক্ষকের।"

এর আর-কোনো চারা নেই, আমি হতাশায় হাত কচলাতে-কচলাতে ফিরে এলাম। দাদারও খুব ভাবনা হ'ল। দু-জনে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলাম, বোম্বাইয়ে আর বেশি সময় নষ্ট ক'রে কোনো লাভ নেই। রাজকোটেই আমি বসব। সেখানে দাদা নিজে সামান্য একজন উকিল ছিলেন, তিনিই আমায় আর্জি, দরখাস্ত লেখা প্রভৃতি কিছু-কিছু কাজ দিতে পারবেন। তাছাড়া রাজকোটে আমাদের তো বাড়ি ছিলই, সুতরাং বোম্বাইয়ের পাট উঠিয়ে দিলে অনেকখানি সাশ্রয় হয়। এ প্রস্তাব আমার ভালোই মনে হ'ল। মাস-ছয়েক পরে বোম্বাইয়ের বাসা তুলে দিয়ে আমি রাজকোট ফিরে গেলাম।

বোম্বাইয়ে থাকতে আমি রোজই হাইকোর্টে যেতাম। কিন্তু তার ফলে সেখানে কিছু শিখেছিলাম ব'লে মনে হয় না। আসলে শেখবার জন্য যতটুকু সাংসারিক জ্ঞান থাকা দরকার, তা আমার ছিল না। কত সময় কেস্ পূর্বাপর বুঝে ওঠাই আমার পক্ষে শক্ত হ'ত। তখন আমি ব'সে-ব'সে ঝিমোতাম। আরও কেউ-কেউ ছিল আমারই মতো ঢুলত। তাদের দেখে-দেখে আমার লজ্জা-সঙ্কোচের বোঝাটাও কেমন যেন হাল্কা মনে হ'ত। কিছুকাল পর লজ্জার ভাবটুকুও কেটে গেল, নিজের মনকে এই ব'লে বোঝালাম যে হাইকোর্টের মতো জায়গায় ব'সে-ব'সে ঝিমানো বেকার ব্যারিস্টরদের পক্ষে অপমান-বিশেষ।

আজকের দিনেও বোম্বাইয়ে যদি আমার মতো ব্যারিস্টর থেকে থাকেন, তাহলে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার বিষয়ে একটি অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারিক জ্ঞানের কথা তাঁদের কাছে নিবেদন করব। যদিচ আমার বাসা ছিল গিরগাঁওয়ে, আমি পারতপক্ষে ঘোড়াগাড়ি কিংবা ট্রামে যাতায়াত করতাম না। আমি নিয়ম ক'রে প্রতিদিন পায়ে হেঁটে হাইকোর্ট যেতাম। তাতে আমার পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগত। বাড়িতে ফিরতাম পায়ে হেঁটে। রোদের তাপ সহ্য করার ক্ষমতা আমি অল্প-অল্প অর্জন করেছিলাম। হেঁটে কোর্ট যাওয়া ও হেঁটে কোর্ট থেকে

ফেরার ফলে অনেকগুলো পয়সাও বাঁচত। তাছাড়া অধিকাংশ বন্ধু যখন কোনো-না-কোনো অসুখে শয্যা আশ্রয় করতেন, আমি তখন নিত্য বহাল তবিয়তে পায়ের ওপর খাড়া থাকতাম। একটিবারের জন্য অসুখে পড়েছি ব'লে মনে পড়ে না। পরে যখন বিস্তর উপার্জন করেছি, তখনো আমি অফিস থেকে বাড়ি কিংবা বাড়ি থেকে অফিস পায়ে হেঁটেই গেছি। আমার সেই অভ্যাস বজায় রাখার সুফল ও উপকার আজও ভোগ করছি।

৪. প্রথম আঘাত

হতাশ হয়ে আমি বোম্বাই থেকে রাজকোট চ'লে গেলাম ও সেখানেই আমার নিজের অফিস খুলে বসলাম। এখানে আমার মোটামুটি মন্দ চলছিল না। দরখাস্ত ও আর্জি লিখে গড়পড়তা মাসিক তিনশো টাকা মতন আমদানি হচ্ছিল। এরকম কাজ যে আমার জুটছিল, সে নিতান্তই মুরুব্বির জোরে, এতে আমার নিজের কোনো কৃতিত্ব ছিল না। দাদার যিনি অংশীদার—উকিল হিসেবে তাঁর বেশ পসার ছিল। যেসমস্ত আর্জি তাঁর শক্ত ব'লে মনে হ'ত তিনি সেগুলি বড়ো-বড়ো ব্যারিস্টরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অপেক্ষাকৃত গরীব যেসব মক্কেল, তাদের কাজগুলো কেবল পড়ত আমার বরাতে।

বোম্বাইয়ে থাকতে দস্তুরি না-দেবার নীতিতে আমি একেবারে অটল ছিলাম। স্বীকার করতে হয়, রাজকোটে আমি সে সঙ্কল্প পুরোপুরি পালন করতে পারিনি। বলা হ'ল, এ ব্যাপারে দু-জায়গার অবস্থায় কিছু ইতর-বিশেষ আছে। বোম্বাইয়ে কমিশন দিতে হ'ত দালালকে, এখানে দিতে হয় সেইসব উকিলদের যাঁরা ব্যারিস্টরকে কেস্ পাওয়া ও চালনার ব্যাপারে সহায়তা করেন। বোম্বাইয়ের মতো এখানকার প্রত্যেক ব্যারিস্টর ব্রীফ পেলে উকিলকে তাঁদের প্রাপ্য ফি থেকে অংশবিশেষ দিয়ে থাকেন। দাদা যে যুক্তি দিলেন, আমার কাছে তা অকাট্য মনে হ'ল। তিনি বললেন, "বুঝতেই তো পারো, আরেকজন উকিলের সঙ্গে আমি ভাগে ওকালতি ব্যবসা করছি। যেসব মামলা তুমি চালাতে পারবে ব'লে আমার মনে হয়, সেগুলি তোমার হাতে তুলে দেবার জন্য সর্বদাই আমার একটা আগ্রহ থাকবে। এখন যদি অংশীদারের ভাগটুকু তুমি দিতে না চাও, তাহলে আমায় বেশ লজ্জায় পড়তে হয়। যেহেতু তুমি ও আমি একান্নবর্তী, তোমার ফি এসে জমা হয় আমাদের যৌথ তহবিলে—সে তো একপ্রকার আমারই পাওয়া। তাহলে আমার অংশীদার কী পেলেন? ধরো, যদি মামলা তোমায় না-দিয়ে অপর-কোনো ব্যারিস্টরকে দিতেন, তাহলে নিশ্চয় কিছু কমিশন তিনি পেতেন। এই যুক্তির কাছে আমায় হার মানতে হ'ল, বুঝতে পারলাম ব্যারিস্টরি করতে গেলে দস্তুরি না-দেওয়া বিষয়ে আমার নীতি ত্যাগ করতে হবে কিংবা তার অদলবদল করতে হবে। এইভাবে নিজের সঙ্গে একটি বোঝাপড়া করতে হ'ল, মোদ্দা কথায় নিজেকে প্রবঞ্চনা করতে হ'ল। কিন্তু রাজকোটের ওই একটি কেস্ ছাড়া অন্য-কোনো কেস্-এ আমি কমিশন দিয়েছি ব'লে মনে পড়ে না।

এইভাবে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য তো ঘটানো গেল। ঠিক এইরকমসময়ে আমার জীবনে প্রথম একটা ধাক্কা খাই—যার ফলে খুব একটা দাগা লাগে। ব্রিটিশ অফিসার যে কীরকম জীব সে বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে শুনেছি। এবার একজনকে প্রত্যক্ষ করা গেল।

গদিতে বসবার আগে দাদা পোরবন্দর রানাসাহেবের সচিব ও পরামর্শদাতা ছিলেন। সেই পদে থাকাকালে দাদা রানাসাহেবকে ভুল পরামর্শ দিয়ে কুপথে চালাতে চেয়েছিলেন, এইরকম একটা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ঝুলছিল। ঘটনাটা পোলিটিকাল এজেন্ট-এর কানে তোলা হয়—তার ফলে তিনি দাদার প্রতি বিরূপ ছিলেন। বিলেতে থাকতে এই অফিসার-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি আমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এমনও বলা যায়। দাদা ভাবলেন, সেই সুবাদে আমি দাদার পক্ষে দুটো ভালো কথা সাহেবকে বলব এবং তাহলে সাহেবের বিরুদ্ধ ভাবটুকু কেটে যাবে। ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি। বিলেতের সেই সামান্য পরিচয়ের এভাবে সুযোগ নিতে যাওয়া ঠিক হবে না ব'লে মনে হয়েছিল : দাদা সত্যি যদি অন্যায় ক'রে থাকেন, তাহলে আমার সুপারিশে কী হবে? পক্ষান্তরে যদি তিনি নির্দোষী হন, তাহলে তো তিনি যথারীতি আর্জি পেশ করতে পারেন, নিজেকে নির্দোষ জেনে, ফলাফল অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। আমার প্রস্তাব দাদার মনঃপূত হ'ল না, তিনি বললেন, "ভায়া হে, কাথিয়াওয়াড় কেমন জায়গা, সে তুমি জানো না। দুনিয়াটাকেও চিনতে তোমার বাকি আছে। খুঁটোর জোর ও খাতির ছাড়া এখানে এক পা-ও এগুনো যায় না। ভাই হয়ে যদি তুমি চেনা-জানা সাহেবের কাছে তোমার দাদার বিষয়ে দুটো ভালো কথা না-বলতে পারলে, তাহলে তা কি ঠিক হবে?"

দাদার কথা ঠেলতে না-পেরে আমি দস্তুরমতো অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাহেবের কাছে গেলাম। আমি বেশ জানতাম, তাঁর কাছে যাবার কোনো অধিকার আমার ছিল না এবং এভাবে গেলে আমার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তৎসত্ত্বেও আমি সাক্ষাতে ভিক্ষা ক'রে চিঠি লিখলাম, সাহেবও সঙ্গে-সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট ক'রে আমায় জবাব পাঠালেন। পুরাতন পরিচয়ের কথা পাড়তে গিয়েই বুঝতে পারলাম, বিলেতে-কাথিয়াওয়াড়ে তফাৎ বিস্তর। রাজকর্মচারী যখন ছুটিতে দেশে যায় এবং নিজ পদে যখন অধিষ্ঠিত থাকে—তখন এ দুয়ের মধ্যে জমিন-আশমান ফারাক। পোলিটিকাল এজেন্ট পূর্ব পরিচয়ের কথা স্বীকার করলেন, কিন্তু সেই পরিচয়ের জের টানায় তাঁর হাবভাব একটু যেন কঠিন হ'ল। চোখমুখ দেখে মনে হ'ল তিনি যেন বলতে চাইছেন, "আশা করি, তুমি সেই পরিচয়ের সুযোগ নিতে আসনি।" যা হোক্, আমি তো তৎসত্ত্বেও আমার বক্তব্য তাঁর কাছে পেশ করলাম। সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তিনি রাগতভাবে বললেন, "তোমার দাদা একজন কুচক্রী। আর একটিও কথা তোমার কাছ থেকে আমি শুনতে চাই না। তোমার দাদার কিছু যদি বক্তব্য থাকে, তাহলে তিনি যথারীতি আর্জি পাঠাতে পারেন।" তিনি যা বললেন তা যথেষ্টই বলা হ'ল, অযৌক্তিকও তিনি কিছু বলেননি। কিন্তু স্বার্থ মানুষকে অন্ধ করে। আমি আমার বক্তব্য ব'লে চললাম। সাহেব এবার উঠে পড়লেন, বললেন, "ব্যাস্, তুমি এখন যেতে পারো।"

আমি বললাম, "আমার সব কথা শুনুন আগে।" এতে তিনি আরো চ'টে গেলেন।

সাহেব তাঁর চাপরাশীকে ডেকে হুকুম দিলেন, আমায় যেন দরজা দেখিয়ে দেওয়া হয়। আমি তখনো ইতস্তত করছি দেখে চাপরাশী আমার কাঁধে হাত রেখে আমায় ঘর থেকে বের ক'রে দিল।

সাহেব চ'লে গেলেন, তাঁর চাপরাশীও চ'লে গেল। রাগে, ক্ষোভে আগুন হয়ে আমি ফিরে গেলাম। ফিরে এসেই চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলাম : "আপনি আমায় অপমান করেছেন। চাপরাশীকে দিয়ে আমার ওপর জবরদস্তি করেছেন। যদি আপনি এর প্রতিকার না-করেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করব।"

খানিকক্ষণ পরে সাহেবের সওয়ার তাঁর জবাব নিয়ে এল : "আপনি আমার প্রতি অভদ্র আচরণ করেছেন। আপনাকে চ'লে যেতে বলা সত্ত্বেও, আপনি যেতে রাজি হননি। আপনাকে দরজা দেখিয়ে দেবার জন্য চাপরাশীকে হুকুম করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। সে যখন আপনাকে অফিস-ঘর থেকে চ'লে যেতে বলল, আপনি যাননি। সুতরাং আপনাকে বের ক'রে দেবার জন্য যতটুকু জোর খাটানো দরকার ছিল, তার বেশি সে কিছু করেনি। আপনার যদি নালিশ করতে ইচ্ছা হয়—করতে পারেন।"

সাহেবের এই জবাব পকেটে নিয়ে, আমি মাথা হেঁট ক'রে বাড়ি ফিরলাম ও দাদাকে সব কথা বললাম। তিনি দুঃখিত হলেন, কিন্তু বুঝে উঠতে পারলেন না, কীভাবে আমায় সান্ত্বনা দেবেন। উকিল-বন্ধুদের সঙ্গে তিনি কথা ব'লে দেখলেন, কারণ সাহেবের বিরুদ্ধে কীভাবে মামলা রুজু করতে হবে সে আমি জানতাম না। এইসময় কী-একটা মকদ্দমার ব্যাপারে স্যর ফিরোজশা মেহ্‌তা তখন রাজকোটে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমার মতো একজন আনকোরা নতুন ছোকরা ব্যারিস্টর তাঁর মতো লোকের সঙ্গে কীভাবেই-বা দেখা করে? যে উকিলের মামলা লড়তে তিনি রাজকোট এসেছিলেন, তাঁর হাত দিয়ে আমি আদ্যোপান্ত সব ঘটনার কথা লিখে পাঠাই ও তাঁর পরামর্শ ভিক্ষা করি। স্যর ফিরোজশা ব'লে পাঠালেন : "গান্ধীকে বলবে, এরকম ব্যাপার অনেক উকিল ব্যারিস্টরের বেলাতেই ঘ'টে থাকে। সে সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছে, তাই তার রক্ত একটু গরম। ব্রিটিশ রাজপুরুষ যে কী বস্তু, সে এখনো ঠিক বুঝতে শেখেনি। সে যদি সুখে-স্বস্তিতে এখানে বসবাস করতে চায়, দু-চার পয়সা উপার্জন করতে চায়, তাহলে সে যেন সাহেবের চিঠি ছিঁড়ে ফেলে ও লাঞ্ছনা হজম করে। সাহেবের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে তার কোনো লাভই হবে না, উল্‌টে বরঞ্চ তার সর্বনাশ হতে পারে। ওকে ব'লো, জীবনটাকে জানা এখন ওর অনেকখানি বাকি।"

এই উপদেশ আমার কাছে বিষের মতো তিক্ত মনে হ'ল। তবু না-গিলে তো উপায় ছিল না। এই অপমান সহ্য করার ফলে আমার একটা লাভ হ'ল। আমি মনে-মনে পণ করলাম, "এরকম অবস্থায় আর কখনো আমি পড়ব না, এভাবে বন্ধুত্ব কাজে লাগাতে যাব না।" আমি সে সঙ্কল্প আর কখনো ভাঙিনি। এই যে আঘাত পেলাম, এতে আমার জীবনের একটা মোড় ফিরে গেল।

৫. দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রার প্রস্তুতি

পোলিটিকাল এজেন্ট-এর কাছে যাওয়াটা আমার ঠিক হয়নি সত্য। কিন্তু আমার ভুল বা ত্রুটি এমন-কিছু হয়নি, যাতে তিনি ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হতে পারতেন। আর ওভাবে ঘর থেকে বের ক'রে দেওয়ারও কোনো মানে হয় না। বড়োজোর মিনিট-পাঁচেক সময় তাঁর নিতাম। আমার কথা বলাটাই তাঁর দুঃসহ ধৃষ্টতা ব'লে মনে হয়েছিল। তিনি তো ভদ্রভাবে আমায় চ'লে যেতে বলতেও পারতেন। কিন্তু ক্ষমতার নেশায় তিনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলেন। পরে জেনেছিলাম, ওই অফিসারটির ধৈর্য ব'লে কোনো পদার্থ ছিল না। তাঁর কাছে যে কেউ যেত, তাকে লাঞ্ছনা করা তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়েছিল। পান থেকে চুন খসলেই সাহেবের মেজাজ আর ঠিক থাকত না।

আমার অধিকাংশ কাজই তাঁর আদালতে হবার কথা। তাঁকে খুশি করা আমার সাধ্যের বাইরে। তাঁকে খোশামোদ করব এমন আমার প্রবৃত্তি ছিল না। একেবারে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করার হুম্‌কি দিয়ে, হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকাটাও আমার ভালো লাগছিল না।

ইতিমধ্যে, দেশের রাজনৈতিক জীবনে নানারকম ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার বিষয়েও কিছু-কিছু আমি জানতে লাগলাম। কাথিয়াওয়াড় অনেকগুলি দেশীয় রাজ্যের সমষ্টি। পরস্পরের মধ্যে দলাদলি রেষারেষি থাকায়, রাজনৈতিক চক্রান্ত এ অঞ্চলে মজ্জাগত। আমলারা সবাই যে যার ক্ষমতা-বৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত। রাজন্যেরা সকলেই পরমুখাপেক্ষী, খোশামোদে গ'লে যান, চাটুকারদের কথায় কান পাতেন। সাহেবের চাপরাশীকেও এখানে খুশি করতে হয়। আর সেরেস্তাদার তো হলেন সাহেবের চোখ, সাহেবের কান, সাহেবের দোভাষী। সুতরাং সেরেস্তাদার প্রভুর চাইতে যেন এককাঠি বাড়া। তাঁর ইচ্ছা যেন আইনের বিধান। শোনা যেত, অনেক সেরেস্তাদার না-কি সাহেবদের চাইতেও বেশি রোজগার করতেন। এটা হয়তো বাড়িয়ে বলা, তবে দেখা যেত সেরেস্তাদার যতটুকু মাইনে পেতেন, খরচ করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি।

কাথিয়াওয়াড়ের আবহাওয়া আমার কাছে বিষবৎ মনে হতে লাগল। আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন না-ক'রে কী ক'রে এখানে টিকে থাকা যায়, আমার কাছে প্রতিদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

আমি একেবারে মনমরা হয়ে গেলাম। দাদা সেটা বেশ বুঝতে পারলেন। আমরা দু-জনেই বুঝলাম, আমি কোথাও যদি চাকরি পাই, তাহলে এই কুচক্রের জাল থেকে বেরিয়ে পড়তে পারি। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না-হয়ে আমি যে কোনোদিন দেওয়ান কিংবা জজের পদ পাব সে আশা দুরাশা। আপাতত সাহেবের সঙ্গে ঝগড়াই আমার ব্যারিস্টরি করার অন্তরায় হয়ে উঠল। পোরবন্দর-রাজ তখন ছিল এডমিনিস্ট্রেটার-এর অধীনে। রানাসাহেবের হাতে অধিকতর ক্ষমতা যাতে আসে, আমি তখন সেই মামলা হাতে নিয়েছি। এছাড়া পোরবন্দরের মোঢ় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জমির খাজনা বা বিঘোতি অতিরিক্ত আদায় করার ব্যাপারেও এডমিনিস্ট্রেটার-এর সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল। ভারতীয় হ'লে কী হয়, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, এডমিনিস্ট্রেটার-এর মেজাজ রাজকোটের সেই সাহেবের চেয়েও কড়া, অশিষ্টতায় তিনি

সাহেবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কাজে তিনি দক্ষ ছিলেন, কিন্তু তাতে সাধারণ ছাত্রদের কোনো সুবিধা দেখা গেল না। রানাসাহেবের অতিরিক্ত ক্ষমতাদানের ব্যাপারে আমি কিছুটা সুবিধা ক'রে দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু মোড়দের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ-কোনো প্রতিকার করতে পারিনি। মনে হ'ল, তাদের মামলাটি ভালো ক'রে বিবেচনাও করা হ'ল না।

এ কাজেও আমি খানিকটা নিরাশ হলাম। মনে হ'ল, আমার মক্কেলদের প্রতি সুবিচার করা হ'ল না। আর কোন্ উপায়ে সুবিচার পাওয়া যেতে পারত, তা আজও জানি না। বড়োজোর পোলিটিকাল এজেন্ট কিংবা গভর্নর সাহেবের কাছে আপীল হয়তো করা যেত। তাঁরা তো নির্ঘাত আপীল নাকচ ক'রে দিতেন এই ব'লে যে এডমিনিস্ট্রেটার-এর কাজে তাঁরা হস্তক্ষেপ করতে চান না। এ বিষয়ে রায় দেবার ব্যাপারে যদি কোনো আইনকানুন থাকত, তাহলেও কথা ছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাহেবদের মর্জিই হ'ল আইন।

মন আমার তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে পোরবন্দরের এক মেমন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দাদার কাছে এই মর্মে একটা চিঠি এল : "দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের কাজ-কারবার আছে। কারবার বেশ বড়ো। সেখানকার আদালতে আমাদের একটা বড়ো মামলা চলছে। আমাদের তরফ থেকে আমরা চল্লিশ হাজার পাউন্ড-এর একটা দাবি পেশ করেছি। মামলা চলছে বেশ-কিছুদিন ধ'রে। দক্ষিণ আফ্রিকার বড়ো-বড়ো উকিল-ব্যারিস্টরদের আমরা এই মামলায় নিযুক্ত করেছি। এখন আপনার ভাইকে যদি সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তিনি আমাদের কাজে লাগতে পারেন। তাতে তাঁরও কিছুটা সুবিধা হতে পারে। তিনি আমাদের হয়ে কেস্‌টা কৌঁসুলিদের কাছে আমাদের চেয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। তাহলে তিনি একটা নতুন দেশ দেখতে পারেন, নতুন-নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেতে পারেন।"

দাদা আমার সঙ্গে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলেন। চিঠি প'ড়ে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না আমায় কেবল কেস্ বুঝিয়ে দিতে হবে, না কোর্টে কেস্ নিয়ে লড়তে হবে। কিন্তু আমার লোভ হ'ল।

দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানি ছিল সেই কারবারের নাম। কোম্পানির অন্যতম অংশীদার পরলোকগত শেঠ আবদুল করিম ঝাভেরির সঙ্গে দাদা আমায় আলাপ করিয়ে দিলেন। শেঠ আমায় নিশ্চিতি দিয়ে বললেন : "কাজটা এমন-কিছু শক্ত হবে ব'লে মনে হয় না। বড়ো-বড়ো সাহেবসুবোর সঙ্গে আমাদের মিত্রতা আছে। তাঁদের সঙ্গে আপনি আলাপ-পরিচয় করবেন। আমাদের দোকানের কাজেও আপনি সাহায্য করতে পারেন। বেশিরভাগ চিঠিপত্র আমাদের ইংরেজিতে লিখতে হয়, সেই চিঠি লেখার ব্যাপারেও তো আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। আপনি আমাদের অতিথি হয়ে থাকবেন, সুতরাং থাকা-খাওয়ার কোনো খরচ দিতে হবে না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কতকাল আমায় চাকরিতে বহাল রাখবেন? বেতন দেবেন কত?"

"বছরখানেকের বেশি লাগবে না। ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াতের ভাড়া ও থাকা-খাওয়ার খরচখরচা ছাড়া আপনাকে আমরা একশো পাঁচ পাউণ্ড দেব।"

একে ব্যরিস্টরি করতে যাওয়া বলে না। কারবারের চাকুরে হিসাবে যাওয়া-মাত্র। কিন্তু তখন আমি চাইছি কোনোপ্রকারে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে। তাছাড়া নতুন দেশ দেখা, নতুন-নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের লোভটুকুও ছিল। উপরন্তু একশো পাঁচ পাউণ্ড যদি দাদাকে পাঠাই, তাহলে সংসারের খরচ নির্বাহ করতে তাঁর কিছুটা সাশ্রয় হতে পারে। বেতন নিয়ে দর-কষাকষি না-ক'রে আমি তাঁদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

৬. নাটাল-এ পৌঁছলাম

বিলেতে যাবার সময় ঘর ছেড়ে বিদেশ যাবার বিচ্ছেদ-বেদনা আমার প্রাণে গভীরভাবে বেজেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি দেবার সময় মন ততটা ভারাক্রান্ত হয়নি। মা আর ইহলোকে নেই, বিশ্বব্যাপারে আমার জ্ঞান কিছু বেড়েছে, বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাছাড়া, রাজকোট থেকে বোম্বাই যাওয়া তো ইতিমধ্যে পুরনো হয়ে গেছে।

এ যাত্রা স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া আমার পক্ষে বেশ কষ্টের হয়েছিল। বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর আমাদের আরেকটি সন্তানের জন্ম হয়েছে। আমাদের দাম্পত্য প্রেম তখনো ঠিক কামগন্ধ থেকে মুক্ত হয়েছে ব'লে বলা চলে না। তবে ধীরে-ধীরে এই প্রেম মলিনতামুক্ত হতে শুরু করেছিল। বিলেত থেকে ফেরবার পর নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্যজীবন আমরা যাপন করতে পারিনি, সান্নিধ্য কদাচিৎ ঘটত। তবে ওই অল্পসময়টুকুর জন্য আমি ছিলাম তার শিক্ষক। সে-সময় তাঁর স্বভাবে কিছু-কিছু সংস্কার গঠনে আমি সহায়তা করছিলাম। আমাদের দু-জনেরই মনে হয়েছিল এই সংস্কারের কাজ চালিয়ে যেতে হ'লে, আমাদের দু-জনের একত্র থাকা উচিত। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবল আকর্ষণে বিচ্ছেদও সহনীয় হয়ে উঠল। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, বছর ঘুরতেই তো আমরা আবার মিলিত হব। অতঃপর রাজকোট ছেড়ে বোম্বাই যাত্রা করলাম।

বলা ছিল, বোম্বাইয়ে দাদা আবদুল্লা অ্যাণ্ড কোম্পানির একজন এজেন্ট জাহাজভাড়া দিয়ে আমার টিকেট কিনে দেবেন। কিন্তু জাহাজে প্রথম শ্রেণীর কেবিন না-কি একটিও খালি ছিল না। এদিকে তখন যদি আমি পাড়ি না-দিই, তাহলে বোম্বাইয়ে আমায় বেকার ব'সে থাকতে হয়। এজেন্ট বললেন, "আমরা খুবই চেষ্টা করেছি প্রথম শ্রেণীর কেবিনে একটা জায়গা পেতে। কিন্তু কিছুতেই তো কিছু হ'ল না। এখন ডেক্-এর যাত্রী হয়ে যেতে আপনার যদি আপত্তি না-থাকে ; অবশ্য আপনার আহারাদির ব্যবস্থা সেলুনেই করা যেতে পারবে।" সে সময়টাতে আমি প্রথম শ্রেণী ছাড়া চলাফেরা করতাম না। তাছাড়া একজন ব্যারিস্টর কী ক'রে ডেক্-এর যাত্রী হয়ে যাবে? অসম্ভব! সুতরাং এজেন্টের প্রস্তাব আমি

অগৌণে বর্জন করলাম। তাছাড়া তাঁর কথায় আমার বড়ো-একটা বিশ্বাস হ'ল না। প্রথম শ্রেণীর কেবিন একটাও খালি পাওয়া গেল না—এ কথা কী ক'রে বিশ্বাস করি। এজেন্টের অনুমতি নিয়ে আমি ভাবলাম, নিজেই একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। জাহাজে উঠে আমি সোজা চ'লে গেলাম কাপ্তেন সাহেবের কাছে। তিনি বেশ খোলাখুলি বললেন, "সচরাচর এরকম ভিড় তো হয় না। কিন্তু এই জাহাজে এবার মোজাম্বিক্-এর গভর্নর-জেনারেল বাহাদুর যাচ্ছেন ব'লে সব কেবিনগুলো আগেভাগে রিজার্ভ হয়ে গেছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোনোপ্রকারে আমার জন্য সামান্য-একটু জায়গা করা যায় না?"

কাপ্তেন একবার আপাদমস্তক আমায় নিরীক্ষণ ক'রে, মৃদু হাসলেন, বললেন, "হ্যাঁ, উপায় একটা আছে বটে। আমার কেবিনে অতিরিক্ত একটা খাট আছে। সচরাচর সেটি যাত্রীদের জন্য বরাদ্দ হয় না। কিন্তু আপনার জন্য ওই জায়গাটুকু দিতে পারি।"

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। এজেন্টকে ব'লে দিলাম টিকেট কিনে দিতে। ১৮৯৩-এর এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে, প্রচুর উৎসাহ নিয়ে পাড়ি দিলাম।

তেরোদিন একটানা সমুদ্রযাত্রার পর আমাদের জাহাজ প্রথম যে বন্দরে ভিড়ল তার নাম লামু। ততদিনে কাপ্তেন সাহেবের সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা হয়েছে। তাঁর ছিল দাবাখেলার শখ। খেলা তিনি নূতন শিখেছিলেন। তাই তাঁর আগ্রহ ছিল তাঁর চাইতে আনাড়ি কারো সঙ্গে খেলবেন। আমায় তিনি খেলতে ডাকলেন। ইতিপূর্বে দাবাখেলা বিষয়ে আমি অনেক-কিছু শুনেছি, কিন্তু কখনো খেলিনি। দাবা খেলত যারা, তারা বলত এই খেলায় বেশ বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ করতে হয় ব'লে বুদ্ধি বেশ খোলে। কাপ্তেন আমায় খেলা শিখিয়ে দেবেন বললেন। ছাত্র হিসেবে আমার প্রধান গুণ ছিল শিক্ষা ব্যাপারে আমার অসীম ধৈর্য। প্রতিবারই আমার হার হ'ত—তাতে তাঁর শিক্ষা দেবার আগ্রহ যেন বেড়ে যেত। দাবা খেলতে আমার ভালোই লাগত। কিন্তু জাহাজ ছেড়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ভালোলাগা যেন উবে গেল। দাবাখেলায় আমার জ্ঞান পর্যবসিত হ'ল কোন্ গুটির কীরকম চাল—কেবলমাত্র সেইটুকু জানায়।

লামু বন্দরে জাহাজের নোঙর ফেলে থাকার মেয়াদ ঘণ্টা তিন-চার। তৎসত্ত্বেও বন্দর দেখবার জন্য আমি নামলাম। কাপ্তেনও নেমেছিলেন। তিনি আমায় সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন যে বন্দরে জোয়ার-ভাটার সময় জলের অবস্থা ঠিকমতন থাকে না ব'লে, বেশিক্ষণ জাহাজ নোঙর ফেলে রাখা চলবে না সুতরাং আমি যেন যথাসময়ে ফিরে আসি।

বন্দরটি নিতান্তই ছোটো। ডাকঘরে গিয়ে দেখি সেখানকার কোনো-কোনো কেরানী ভারতীয়। দেখে খুব খুশি হয়ে তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব জুড়ে দিলাম। আফ্রিকানদেরও দেখলাম। তারা কীভাবে বসবাস করে, জীবনযাপন করে, খুব জানতে ইচ্ছা হ'ল। এতেও বেশ-একটু সময় লাগল।

কিছু ডেক্-প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। দেখা গেল, তাঁরা নিজেদের

পছন্দমতন রান্নাবান্না ক'রে, নিরিবিলিতে দেশী ভোজের একটা আয়োজন করছেন। ফিরতি পথে দেখলাম খাওয়াদাওয়া সেরে তাঁরা জাহাজে ফেরার উদ্‌যোগ করছেন। তাঁদের সঙ্গে একই ডিঙিতে ওঠা গেল। নৌকায় যত লোক ধরে, সংখ্যায় আমরা তার চেয়ে বেশিই ছিলাম। বন্দরের গায়ে বেশ উঁচু-উঁচু ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল। স্রোতের এমন ধার যে জাহাজে ওঠার জন্য দড়ির যে সিঁড়ি ঝুলছিল তার সঙ্গে নৌকার কাছিটাকে কিছুতেই বাঁধা যাচ্ছিল না। সিঁড়ি ধরবার উপক্রম হতেই, স্রোত যেন আমাদের নৌকাটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। ইতিমধ্যে জাহাজ পাড়ি দেবার প্রথম ভোঁ বেজে উঠল। আমি ভারি দুর্ভাবনায় পড়লাম। কাপ্তেন ওপর থেকে আমাদের দুরবস্থা লক্ষ করছিলেন। তিনি হুকুম দিলেন যে জাহাজ আরো মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষা করবে। জাহাজের কাছাকাছি আরেকটি নৌকা ছিল। আমার একজন বন্ধু দশ টাকা কবুল ক'রে সেই নৌকা আমার জন্য ভাড়া করলেন। এই নৌকাটি যাত্রীবোঝাই অন্য নৌকা থেকে আমায় কোনোপ্রকারে তুলে নিল। দড়ির সিঁড়িটা ইতিমধ্যে তোলা হয়ে গেছে। একটা ফাঁস দেওয়া দড়ি আমার জন্য নামিয়ে দেওয়া হ'ল। আমি সেই দড়ি ধ'রে বসলে পর আমায় টেনে তোলা হ'ল। সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজ ছেড়ে দিল। অন্য যাত্রীরা সব প'ড়ে রইল। কাপ্তেন কেন যে আমাদের সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, এতক্ষণে সে কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম।

লামুর পর এল মোম্বাসা বন্দর, মোম্বাসার পর জাঞ্জিবার। জাঞ্জিবারে আমাদের থাকতে হবে আট-দশ দিন। তারপর পাড়ি দিতে হবে অন্য-এক জাহাজে।

কাপ্তেন আমায় পছন্দ করতেন খুব। কিন্তু তাঁর এই ভালোলাগার ফলে আমায় একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। তাঁর এক ইংরেজ বন্ধুকে ও আমাকে তিনি একদিন বেড়িয়ে আসার নেমন্তন্ন করলেন। আমরা বোটে চেপে ডাঙায় গেলাম। 'বেড়িয়ে আসা'র অর্থ যে কী, সে আমি ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারিনি। কাপ্তেনও বুঝতে পারেননি এসব ব্যাপারে আমি কতখানি আনাড়ি। একটি দলাল এসে আমাদের তিনজনকে কাফ্রি স্ত্রীলোকদের গণিকালয়ে নিয়ে গেল। আমাদের এক-একজনকে এক-একটা কামরায় ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। আমি ঘরে ঢুকে লজ্জায়-গ্লানিতে অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভগবান জানেন, বেচারি স্ত্রীলোকটি যে আমার বিষয়ে কী ভেবে থাকবে। কাপ্তেনের হাঁক শুনে আমি যেমন ঢুকেছিলাম, ঠিক তেমনই বেরিয়ে এলাম। তিনি বুঝলেন, আমি কুকর্মে লিপ্ত হতে পারিনি। প্রথম-প্রথম আমার খুবই লজ্জা হয়েছিল। পরে যখনই এ বিষয়ে ভেবেছি, আতঙ্কে মন ভ'রে গেছে, লজ্জার ভাব কেটে গেছে। স্ত্রীলোকটিকে দেখে আমার মনে যে কোনো বিকার দেখা দেয়নি, এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমি যে চিত্তদৌর্বল্যের বশে ও সৎসাহসের অভাবে সেই ঘরে ঢুকতে আপত্তি করিনি, সেজন্য আমার আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার অবধি ছিল না।

আমার জীবনে এইরকম পরীক্ষা এবার নিয়ে তৃতীয়বার ঘটল। অনেক সরলমতি যুবক মিথ্যা লজ্জার বশে পাপের গহ্বরে প্রবেশ ক'রে থাকে। আমি যে রক্ষা পেয়েছি এতে আমার নিজের কোনো কৃতিত্ব দাবি করতে পারি না। আমি যদি ওই পাপের পুরীতে প্রবেশ করতেই

অস্বীকার করতাম, তাহলে নিজের হয়ে কৃতিত্ব বরং দাবি করতে পারতাম। করুণাময় কৃপা ক'রে আমায় বাঁচিয়েছেন—সমস্তই তাঁর কৃপার ফলে। এই ঘটনার ফলে আমার ভগবৎ-বিশ্বাস বৃদ্ধি পেল এবং আমি কিছু-পরিমাণে মিথ্যা লজ্জা পরিহার করতে শিখলাম।

এই বন্দরে আমাদের সপ্তাহখানেক থাকতে হ'ল ব'লে আমি শহরে কামরা ভাড়া ক'রে ছিলাম। যে অঞ্চলে বসবাস করতাম তার কাছাকাছি জায়গাগুলি ঘুরে-ঘুরে অনেকখানি দেখে নিয়েছিলাম। জাঞ্জিবারের শস্যশ্যামল সমৃদ্ধি একমাত্র মালাবার অঞ্চলে দেখা যায়। এখানকার প্রকাণ্ড সব বনস্পতি ও বৃহৎ আকার ফলমূল দেখে আমি খুবই বিস্মিত বোধ করেছিলাম।

জাঞ্জিবার থেকে আমরা গেলাম মোজাম্বিক বন্দরে এবং সেখান থেকে মে মাসের শেষ দিকে পৌঁছলাম নাটাল।

৭. কয়েকটি অভিজ্ঞতা

নাটাল-এর বন্দরকে বলে ডারবান, পোর্ট নাটাল-ও বলা হয়। আমাকে নেবার জন্য শেঠ আবদুল্লা বন্দরের জেটিতে এসেছিলেন। জাহাজ জেটিতে ভিড়লে দেখলাম, আরো অনেকে এসেছেন তাঁদের বন্ধুদের নিতে। লক্ষ করলাম, সেখানে ভারতবাসীদের বিশেষ সম্মান নেই। আবদুল্লা শেঠ-এর পরিচিত শ্বেতাঙ্গেরা তাঁর সঙ্গে এমন নাক-উঁচু আচরণ করছিলেন যে তা লক্ষ না-ক'রে উপায় ছিল না। এই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে আমার খুবই খারাপ লাগল। এরকম ব্যবহার আবদুল্লা শেঠ-এর অবশ্য গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। আমায় যাঁরা দেখছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশ-একটা কৌতূহলের ভাব ছিল। আমার পোশাক-পরিচ্ছদ অন্য ভারতীয়দের মতো ছিল না। পরনে ছিল ফ্রক্-কোট ও মাথায় বাঙালি ধরনের টুপি।

কারবারের দপ্তর-বাড়িতে আমায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে আবদুল্লা শেঠ-এর নিজের কামরার পাশের কামরায় আমার স্থান হ'ল। শেঠ আমায় যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। আমিও তাঁকে ঠিক বুঝলাম না। আমার মারফৎ তাঁর ভাই যেসব কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেগুলি প'ড়ে তিনি আরো যেন ঠেকায় পড়লেন। ভাবলেন, ভাই কি শেষ-পর্যন্ত একটি শাদা হাতি পাঠালেন। পোশাক-আশাকে আহারে-বিহারে আমার সাহেবি চালচলন দেখে তাঁর ভয় হ'ল জনৈক শ্বেতাঙ্গকে পুষতে গেলে যেমন খরচখরচা পড়বে, আমার বেলাতেও হয়তো পড়বে তেমনই। আমার জন্য তখন যে বিশেষ কাজকর্ম নির্দিষ্ট ক'রে দেবেন, তেমন অবস্থাও ছিল না। তাঁদের মকদ্দমা চলছিল ট্রান্সভাল্-এ। সাততাড়াতাড়ি সেখানে আমায় পাঠিয়েই-বা কী লাভ! তাছাড়া আমি যে কাজের লোক হব, বিশ্বাসযোগ্য হব—তারই-বা নিশ্চয়তা কী? তিনি তো আর আমার ওপর নজর রাখার জন্য প্রিটোরিয়ায় ব'সে থাকতে পারেন না। মামলার অপরপক্ষ থাকেন প্রিটোরিয়ায়, কে জানে সুবিধা পেলে তাঁরা হয়তো অন্যায়ভাবে আমাকে প্রভাবিত করতে পারেন। আর যদি বিশ্বাস ক'রে

মকদ্দমার কাজটা আমার হাতে তুলে দেওয়া না-যায়, তাহলে আমায় অন্য কী কাজেই-বা লাগাবেন। আরসব যে ধরনের কাজ থাকে, সে তো কেরানীরাই আমার চেয়ে ঢের ভালোভাবে করতে পারে। তাছাড়া ভুলচুক হ'লে কেরানীদের বকাঝকা যায়। আমার যদি ভুল হয় তাহলে কি আর শায়েস্তা করা সম্ভব হবে? সুতরাং মামলার কাজটা আমায় যদি দেওয়া না-যায়, তাহলে স্রেফ্ বসিয়ে থাকা-খাওয়ার খরচ ও মাইনে গুণতে হয়।

আবদুল্লা শেঠ-এর অক্ষরজ্ঞান ছিল না বললেই হয়, তবে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। তাঁর বুদ্ধি ছিল প্রখর, আর সে বিষয়ে তাঁর টন্‌টনে জ্ঞান ছিল। অভ্যাসেব ফলে তিনি মোটামুটি কাজ চালাবার মতো ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারতেন। মুখে-মুখে যতটুকু ইংরেজি শিখেছিলেন, ব্যবসা চালাবার পক্ষে সেই তাঁর যথেষ্ট ছিল। ব্যাঙ্ক-এর ম্যানেজার, শ্বেতাঙ্গ ব্যবসাদারদের সঙ্গে তো বটেই, উকিল ব্যারিস্টরদের সঙ্গেও তিনি দিব্যি তাঁর সেই ইংরেজি দিয়েই মামলা বুঝিয়ে দিতে পারতেন। ভারতীয় সমাজে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধাসমীহ ক'রে চলত। ভারতীয় কাজ-কারবারের মধ্যে তাঁর কারবার ছিল সকলের চেয়ে বড়ো, কিংবা বড়ো কারবারগুলির মধ্যে অন্যতম। তাঁর সম্বন্ধে এতসব ভালো কথা বলবার পর একটি ত্রুটির উল্লেখ করতেই হয়। তিনি ছিলেন খুব সন্দিগ্ধ প্রকৃতির মানুষ।

ইস্‌লাম নিয়ে তিনি গৌরব বোধ করতেন ও ইস্‌লামের দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করতে ভালবাসতেন। আরবি জানা না-থাকলেও *কোরান শরিফ* ও ইস্‌লামী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচয় ছিল। দৃষ্টান্ত দেবার মতো আখ্যান তাঁর সর্বদা মনের মধ্যে মজুদ থাকত। তাঁর সংস্পর্শে আসার ফলে ইস্‌লামের রীতিনীতি আচারবিচার বিষয়ে আমার মোটামুটি একটি ব্যবহারিক জ্ঞান রপ্ত হয়েছিল। মনের দিক থেকে আরো কাছাকাছি আসার পর আমরা ধর্মীয় বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় সময় কাটাতাম।

পৌঁছবার দিন-দুই-তিন পরে আবদুল্লা শেঠ আমায় ডারবান্-এর কোর্ট দেখতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর এটর্নির পাশে আমায় বসালেন ও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন এবং শেষপর্যন্ত আমায় পাগড়ি খুলে ফেলতে বললেন। আমি এতে আমার অসম্মতি জানিয়ে কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

দেখা গেল, এখানেও আমায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

ভারতীয়দের কাউকে-কাউকে কেন পাগড়ি খুলতে হয়, আবদুল্লা শেঠ আমায় তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। মুসলমানদের মতো যারা জোব্বাজাব্বা পরে তাদের পাগড়ি খুলতে হয় না, কিন্তু অন্য ভারতীয়েরা কোর্টে ঢোকামাত্র পাগড়ি খুলবেন এইরকমই রেওয়াজ।

এই সূক্ষ্ম বৈষম্যটুকু বুঝতে গেলে দু-চার কথা বিশদভাবে বলা দরকার। গত কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ করেছিলাম, এ দেশে ভারতীয়েরা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। একদল ছিল মুসলমান ব্যবসায়ী—এঁরা নিজেদের 'আরব' ব'লে চালাতেন। আর ছিল কেরানীরা—এঁদের কিছুটা হিন্দু, কিছু পার্সি। 'আরব'দের দলে নাম না-লেখালে হিন্দু কেরানীদের অবস্থা হ'ত

এমন, যেন তারা 'না ঘরকা না ঘাটকা'। পার্সি কেরানীরা নিজেদের ইরানী ব'লে পার পেয়ে যেতেন। এই তিন দলের মধ্যে কিছু-পরিমাণে সামাজিক আদানপ্রদান চলত। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় ছিল চুক্তিবদ্ধ বা চুক্তিমুক্ত শ্রমিক—এরা ছিল তামিল, তেলুগু কিংবা উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানি। এরা নাটাল এসেছিল শ্রমিক হিসেবে পাঁচ বছরের মেয়াদে। এখানে এদের নাম ছিল 'গিরমিটিয়া'—ইংরেজি এগ্রিমেন্ট কথাটার হিন্দুস্থানি অপভ্রংশ ছিল 'গিরমিট্'। অন্য তিন পর্যায়ের সঙ্গে এদের ছিল কেবল কেনাকাটা কিংবা দিনমজুরির সম্বন্ধ। সাহেবরা এদের বলত কুলি। বেশিরভাগ ভারতীয় শ্রমিক-মজদুর শ্রেণীর লোক ছিল ব'লে সাধারণভাবে সকল ভারতবাসীকেই হয় কুলি এবং সামী ব'লে ডাকা হ'ত। 'সামী' কথাটি প্রায় তামিল নামের শেষে যুক্ত থাকে। আসলে কথাটা এসেছে সংস্কৃত স্বামী থেকে—যার মানে হ'ল প্রভু বা মনিব। সামী নামে যদি কোনো ভারতীয়ের আপত্তি থাকত, তার যদি কিঞ্চিৎ রসজ্ঞান থাকত, তো সে এইভাবে পাল্টা জবাব দিতে পারত, "আপনি আমায় সামী ব'লে ডাকছেন ডাকুন, কিন্তু আপনি হয়তো ভুলে যাচ্ছেন সামীর প্রকৃত অর্থ হ'ল প্রভু বা মনিব। আমি তো আপনার মনিব নই।" কোনো-কোনো সাহেব এরকম কথায় একটু লজ্জা পেত, কেউ-কেউ চ'টে যেত এবং সুবিধা পেলে দু-চার ঘা বসিয়ে দিতে কসুর করত না। তার কারণ সামী কথাটা তো তাদের কাছে অবজ্ঞাসূচক সম্ভাষণ। মনিব অর্থ করলে তো সাহেবকে অপমান করার সামিল।

আমাকে নাম দেওয়া হ'ল 'কুলি ব্যারিস্টর'। ব্যবসায়ীদের বলা হ'ত 'কুলি ব্যবসায়ী'। কুলি কথাটার মূল অর্থ ভুলে গিয়ে ভারতীয়মাত্রকেই সাধারণভাবে কুলি ব'লে ডাকা হ'ত। মুসলমান ব্যবসায়ীরা এই নামে ঘোরতর আপত্তি করত, বলত, "আমি তো কুলি নই, আমি আরব" অথবা "আমি ব্যবসাদার"। সাহেবের যদি কিঞ্চিৎ শিষ্টতা বোধ থাকত, তাহলে হয়তো দুঃখ প্রকাশ করত।

এই পরিস্থিতিতে পাগড়ি পরার প্রশ্নটা বেশ গুরুতর হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয়দের পক্ষে বাধ্য হয়ে পাগড়ি খোলাটাকে মনে করা হ'ত অপমান হজম করা। সুতরাং আমার মনে হ'ল, ভারতীয় পাগড়ি পরিহার ক'রে বিলিতি হ্যাট ধারণ করলে হ্যাঙ্গাম পোহাতে হয় না, লাঞ্ছনা থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

আবদুল্লা শেঠ-এর এই প্রস্তাব মনঃপূত হ'ল না। তিনি বললেন, আপনি যদি এটা করেন তাহলে ফল ভালো হবে না। যেসব ভারতীয় পরে, তাহলে তাদের ভারি দুরবস্থা হবে। তাছাড়া পাগড়িটা আপনাকে বেশ ভালো মানায়। আপনি যদি ইংরেজি হ্যাট পারেন, লোকে আপনাকে ওয়েটার ব'লে ভুল করতে পারে।

শেঠ আমায় যে পরামর্শটি দিলেন, তার মধ্যে বৈষয়িক বিজ্ঞতা ও দেশপ্রেমের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ মনোভাবেরও মিশেল ছিল। প্রস্তাবটি যে সাংসারিক বুদ্ধির পরিচায়ক, সে তো স্পষ্টই বোঝা যায়। আর দেশপ্রেম না-থাকলে ভারতীয় পাগড়ির ওপর এতটা জোর তিনি দিতেন না। কিন্তু 'ওয়েটার' কথাটার মধ্যে যে অবজ্ঞার ভাব নিহিত ছিল, তা কিন্তু সঙ্কীর্ণতা-প্রসূত। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান—এই তিন ধর্মেরই লোক

ছিল। শেষোক্তরা ছিল ধর্মান্তরিত গিরমিটিয়াদের সন্তান। ১৮৯৩-এও তারা সংখ্যায় বেশ ভারি ছিল। তারা কোট-প্যান্ট পরত এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক হোটেলে ওয়েটার-এর কাজ ক'রে জীবিকানির্বাহ করত। বিলিতি হ্যাট-এর বিরুদ্ধে আবদুল্লা শেঠ-এর বিরূপতার অন্যতম কারণ ছিল ধর্মান্তরিত এই ওয়েটার শ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা। লোকের ধারণা ছিল, ওয়েটার-এর কাজ খুব হীন কাজ। এখনো অনেকে এইরকম মনে করে।

আবদুল্লা শেঠ-এর কথা আমার তো মোটামুটি ভালোই লাগল। আমি কোর্টে আমার পাগড়ি ধারণ করার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে খবরকাগজে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলাম। এই প্রশ্ন নিয়ে একাধিক কাগজে বেশ আলোচনা হ'ল। কোনো-কোনো কাগজে আমাকে বলা হ'ল 'unwelcome visitor' অথবা 'অবাঞ্ছিত অতিথি'। এই ঘটনার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছবার দু-চারদিনের মধ্যেই আমার নাম বেশ অপ্রত্যাশিতভাবে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। কেউ-কেউ আমার পক্ষ নিলেন, আবার কেউ-কেউ আমার বেচালপনার কঠোর নিন্দা করলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি যতকাল ছিলাম, প্রায় শেষ অবধি পাগড়ি আমি ছাড়িনি। শেষ-পর্যন্ত কবে ও কখন আমি যে মাথায় কিছু পরা ছেড়ে দিলাম, সে বিষয়ে আমি যথাস্থানে বলব।

৮. প্রিটোরিয়ার পথে

ডারবান্-এ যেসব ভারতীয় খ্রিষ্টান বসবাস করছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই আমার আলাপ-পরিচয় হতে লাগল। কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর মিস্টার পাল ছিলেন রোমান ক্যাথলিক, তাঁর সঙ্গে চেনাজানা হ'ল। প্রোটেস্টান্ট মিশন-এর শিক্ষক মিস্টার সুভান গডফ্রে এবং তাঁর ছেলে মিস্টার জেম্‌স্ গডফ্রে-র সঙ্গেও আলাপ হ'ল। এই শেষোক্ত ভদ্রলোক ১৯২৪-এ দক্ষিণ আফ্রিকা ডেপুটেশন-এর সদস্য হয়ে এ দেশে এসেছিলেন। ওইসময়েই পার্সি রুস্তমজী ও আদমজী মিঞা খান-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ইতিপূর্বে এঁদের পরস্পরের মধ্যে দেখাশোনা হ'ত নিতান্তই কাজকর্মের খাতিরে। শেষপর্যন্ত কীভাবে এঁদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়, সে কথা পরে বলব।

এইভাবে আমি যখন আমার আলাপ-পরিচয়ের পরিধি বাড়াবার কাজে নিযুক্ত ছিলাম, কারবারের প্রিটোরিয়া-স্থিত উকিল চিঠি লিখে জানালেন মামলা লড়বার জন্য এবার কাগজপত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করতে হয়। সেজন্য হয় আবদুল্লা শেঠ স্বয়ং যেন প্রিটোরিয়ায় যান কিংবা তিনি নিজে না-যেতে পারলে তাঁর প্রতিনিধি-স্থানীয় কাউকে যেন পাঠান।

আমার হাতে চিঠিটা দিয়ে আবদুল্লা শেঠ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি প্রিটোরিয়া যাবেন?"

আমি বললাম, "আপনার কাছ থেকে কেস্‌টা সম্পূর্ণ বুঝে নিলে বলতে পারব সেখানে গিয়ে আমি কী কাজে লাগব ; সে বিষয়ে এখন আমার কোনো ধারণাই নেই।"

শেঠ তখন তাঁর কেরানীদের ব'লে দিলেন কেস্‌ আমায় বুঝিয়ে দিতে। বেশ ভালো ক'রে বুঝতে গিয়ে মনে হ'ল একেবারে অ আ ক খ থেকে শুরু করা দরকার। জাঞ্জিবার-এ অল্প যে ক-টিদিন ছিলাম, সেখানকার আদালতের কাজ দেখতে গিয়েছিলাম। একজন পার্সি উকিল এক সাক্ষীকে হিসেবের খাতায় জমাখরচ বিষয়ে জেরা করছিলেন। আমার কাছে হিসেবের খুঁটিনাটি দুর্বোধ্য মনে হ'ল। কীভাবে হিসেবপত্রের খাতা রাখতে হয়, সে বিষয়ে আমি আগে কিছুই শিখিনি—না স্কুলে, না বিলেত থাকতে। অথচ যে মামলা নিয়ে আমার দক্ষিণ আফ্রিকায় আসা—তা মূলত এই হিসেবপত্র নিয়ে। একাউন্ট বিষয়ে ভালো জ্ঞান না-থাকলে, এ কেস্‌ বোঝানো যেমন মুশকিল, বুঝতে পারাও তেমনি। কেরানী যতই জমা-খরচ বিষয়ে বলতে লাগলেন, আমার মাথার ভিতরে সমস্তটা ততই যেন গুলিয়ে যেতে লাগল। পি. নোট বলতে কী বোঝায়, সে আমি জানতাম না। অভিধানে সেরকম কোনো শব্দ দেখতে পেলাম না। অগত্যা কেরানীবাবুকে আমার অজ্ঞতার কথা বলার পর তাঁর কাছ থেকে জানলাম, পি. নোট-এর মানে প্রমিসরি নোট। হিসেবশিক্ষার জন্য একটি বই কিনে পড়তে লাগলাম। অতঃপর নিজের ওপর কিঞ্চিৎ আস্থা হ'ল। মামলাটাও বুঝে নিতে পারলাম। দেখা গেল খাতাপত্রে হিসেব লিখতে না-জানলেও, প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি থাকার ফলে, আবদুল্লা শেঠ হিসেবের জটিল সমস্যাও চট্‌ ক'রে সমাধান ক'রে দিতে পারেন। এবার আমি তাঁকে জানালাম, আমি প্রিটোরিয়া যাবার জন্য প্রস্তুত।

শেঠ জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় গিয়ে উঠবেন বলুন তো?"

আমি বললাম, "আপনি যেখানে বলেন, সেইখানে।"

—"তাহলে আমি উকিলকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তিনিই আপনার বসবাসের ব্যবস্থা করবেন। আমার মেমান বন্ধুবান্ধবদের কাছেও লিখব। কিন্তু তাদের ওখানে ওঠাটা ঠিক হবে না। প্রিটোরিয়ায় বিপক্ষ দলের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। তাদের কেউ যদি আমাদের গোপনীয় চিঠিপত্র পড়বার সুযোগ পায়, তাহলে মামলার খুব ক্ষতি হবে। তাদের সঙ্গে আমার যত কম দহরম-মহরম হয় ততই ভালো।"

—"আপনার উকিল যেখানে আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট ক'রে দেবেন, আমি সেখানেই থাকব। তা যদি-না সম্ভব হয়, আমি নিজেই থাকার একটা জায়গা খুঁজে-পেতে নেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার-আমার মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয়েছে, কেউ সেসব জানতে পারবে না। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে জান-পহেচান করায় আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। পারলে তাদের সঙ্গে আমি বন্ধুতা পাতাব। আদালতের বাইরে মামলাটা যদি আপস-রফা হয়ে যায়, সম্ভব হ'লে তারও চেষ্টা দেখব। সত্যি বলতে কী, তৈয়ব শেঠ তো আপনাদেরই রিস্তেদার—আত্মীয়।"

শেঠ তৈয়ব হাজি খান মুহম্মদ সত্যিই আবদুল্লা শেঠ-এর নিকট-আত্মীয় ছিলেন।

আপস মীমাংসার সম্ভাবনার কথা শুনে শেঠ একটু যেন চম্‌কে উঠলেন, লক্ষ করলাম।

কিন্তু, ডারবান্-এ পা দেবার পর ছ-সাতদিন ইতিমধ্যে কেটে গেছে, দু-জনে দু-জনকে জানতে ও বুঝতে শিখেছি। শেঠ-এর মনে সেই যে 'শাদা হাতি' পোষা নিয়ে একটা ভয় ছিল, ততদিনে সেটা কেটে গেছে। তিনি বললেন :

—"হুঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা। বুঝেছি, কী বলতে চাইছেন। আদালতের বাইরেই যদি মামলা চুকে যায়, তাহলে তো তার চেয়ে বেশি ভালো কী আর হতে পারে? আমরা, মেমানরা তো প্রায় সবাই সবার আত্মীয়, সবাই সবাইকে বেশ ভালো চিনি, জানি। তৈয়ব শেঠ সহজে আপস করার মতো মানুষ নন। একটুখানি ফাঁক পেলেই তিনি প্যাঁচ দিয়ে পেটের কথা সব বের ক'রে নিয়ে শেষপর্যন্ত আমাদের ফ্যাসাদে ফেলতে পারেন। সুতরাং সাবধান, যা করবেন বেশ বুঝেসুঝে করবেন।"

আমি বললাম, "আপনি ও নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। তৈয়ব শেঠ শুধু কেন, আর কারও সঙ্গে মামলার খুঁটিনাটি নিয়ে অযথা আলোচনা করার তো আমার কোনো দরকার নেই। আমি শুধু প্রকারান্তরে তাঁকে বুঝিয়ে দেব আপস-রফা বোঝাপড়া একটা হয়ে গেলে, মামলা-মকদ্দমার অযথা হ্যাঙ্গাম পোয়াতে হয় না, অনর্থক টাকা খরচও করতে হয় না।"

ডারবান্ পৌঁছবার সাত-আটদিন পরে আমি প্রিটোরিয়া যাত্রা করলাম। আমার জন্য প্রথম শ্রেণীর একটি টিকিট কিনে দেওয়া হ'ল। রাত্রে শোবার জন্য বিছানা দরকার হ'লে ও দেশে পাঁচ শিলিং অতিরিক্ত দিতে হ'ত। আবদুল্লা শেঠ জোর ক'রে বললেন, আমি যেন অতিরিক্ত পাঁচ শিলিং দিয়ে বিছানায় শোবার জন্য টিকিটও কিনে ফেলি। কিন্তু খানিকটা জেদ ক'রে, খানিকটা বড়াই ক'রে এবং পাঁচ শিলিং বাঁচাবার জন্য, আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। আবদুল্লা শেঠ আমায় সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন : "দেখুন, এ মুলুকটা আলাদা, এ আমাদের ভারতবর্ষ নয়। আল্লার ফজলে টাকা-পয়সার অভাব আমাদের নেই। দরকারমতো খরচ করতে কৃপণতা করবেন না— নিজের অসুবিধা ঘটিয়ে পয়সা বাঁচাবার কোনো প্রয়োজন নেই।"

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আমার জন্য তিনি যেন দুশ্চিন্তা না-করেন।

রাত প্রায় ন-টার সময় ট্রেন পৌঁছল নাটাল-এর রাজধানী মরিৎস্‌বার্গ-এ। এইখানেই বিছানাপত্তরের বিলি-ব্যবস্থা হয়। রেল-এর একটি লোক এসে আমায় জিজ্ঞেস করল, আমার বিছানার দরকার আছে কি-না। আমি বললাম, "না, বিছানা তো আমার সঙ্গেই আছে।" সে চ'লে যাবার পর একজন শ্বেতাঙ্গ প্যাসেঞ্জার এসে হাজির হ'ল। আমায় একবার আপাদমস্তক দেখে, সে যখন বুঝল আমি কালা আদমি, বেশ যেন বিচলিত হ'ল। হট্ ক'রে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সে এবার ফিরে এল স্টেশনের দু-একজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে। কারো মুখে রা নেই। ইতিমধ্যে চ'লে এল আরেকজন কর্মচারী, আমার সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা বলল : "সোজা নেমে এস তো বাছাধন। এ গাড়ি তো তোমাদের জন্য নয়। তোমায় যেতে হবে মালগাড়ির সঙ্গে লাগাও একেবারে শেষের দিকের কামরায়।"

আমি বললাম, "আমার কাছে তো ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট আছে।"

"তা সে যে ক্লাসের টিকিটই থাকুক্‌-না কেন, তোমায় যেতে হবে মালগাড়ির লাগাও কামরায়।"

"শুনুন মশাই, ডারবান্‌-এ আমায় এই কামরাতে চ'ড়ে যাবার অনুমতি দিয়েছে, সুতরাং আমি এই কামরাতেই যাব।"

"কেমন তুমি যাও, দেখে নেব। চুপচাপ ভালোয়-ভালোয় যদি না-যাও তাহলে পুলিশ ডাকতে হবে। সে এসে তোমায় ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দেবে।"

"বেশ তো জোর ক'রে নামাতে চান তো পুলিশ দিয়েই নামান। নিজের ইচ্ছায় আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না।"

কনস্টেবল এল, আমার হাত ধ'রে টেনে তুলল, ধাক্কা মেরে কামরার বাইরে আমায় ঠেলে ফেলে দিল। আমার জিনিসপত্রও সব নামিয়ে দেওয়া হ'ল। আমি অন্য কামরায় যেতে অস্বীকার করলাম। ট্রেনও বেশ ধোঁয়া ছেড়ে চ'লে গেল। আমার হাতে কাগজপত্র সমেত যে পোর্টম্যান্টো ছিল, আমি কেবল তাই নিয়ে ওয়েটিং রুম্‌-এ গিয়ে বসলাম। অন্যসব মালপত্র যেখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেখানেই প'ড়ে রইল। রেল কর্তৃপক্ষ সেসবের জিম্মেদারি নিলেন।

সে সময়টা ছিল শীতের মরসুম। দক্ষিণ আফ্রিকার যেসব অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশ উঁচুতে, সেসব জায়গায় বেজায় শীত। মরিৎস্‌বার্গের অবস্থান বেশ উঁচু ব'লে শীত যেন হাড়ে-হাড়ে জানান দেয়। আমার ওভারকোটটা ছিল অন্যসব মালপত্রের সঙ্গে। পাছে আবার লাঞ্ছিত হতে হয়, তাই ওভারকোট চেয়ে নিতে সাহস হ'ল না। সুতরাং ওয়েটিং রুম্‌-এ ব'সে-ব'সে শীতে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে লাগলাম। ওয়েটিং রুম্‌-এ আবার আলো ছিল না। মাঝরাত্রে একজন প্যাসেঞ্জার এলেন, হয়তো তাঁর ইচ্ছা ছিল আমার সঙ্গে আলাপ জমাবেন। কিন্তু তখন কথা বলার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না।

এখন আমার কী করা উচিত, আমি সেই কথা ভাবতে লাগলাম। আমি কি আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার কায়েম করার জন্য লড়ব, না দেশে ফিরে যাব? না-কি লাঞ্ছনার ব্যাপার গায়ে না-মেখে, প্রিটোরিয়া গিয়ে মামলার একটা নিষ্পত্তি ক'রে তারপরে দেশে ফিরব? আমায় যে লাঞ্ছনা সইতে হ'ল সে তো উপসর্গ-মাত্র—ভিতরে আসল যে রোগের বিষ ছড়িয়ে গেছে, সে হ'ল বর্ণবিদ্বেষ। সম্ভব যদি হয়, তাহলে এই ব্যাধির একেবারে মূলোচ্ছেদ করতে হবে, তার জন্য দুঃখ-অপমান সইতে যদি হয়, তা-ও সইতে হবে। বর্ণবিদ্বেষ দূর করার জন্য যতটুকু অন্যায় প্রতিকার করা উচিত—আমার বিরুদ্ধতা কেবল ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব, তার বাইরে যাব না।

অতঃপর আমি স্থির করলাম, পরের ট্রেনেই আমি প্রিটোরিয়া রওনা হয়ে যাব।

পরদিন সকালবেলা আমি রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে একটা দীর্ঘ তারবার্তা পাঠালাম। আবদুল্লা শেঠকেও সব কথা জানালাম। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। জেনারেল ম্যানেজার রেল কর্তৃপক্ষের আচরণ সমর্থন করলেন, তবে আশ্বাস দিলেন যে নিরাপদে আমি যাতে আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারি, তার জন্য

তিনি স্টেশনমাস্টারকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আবদুল্লা শেঠ মরিৎস্‌বার্গ-এর ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে তার পাঠালেন যাতে তাঁরা আমার সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখেন। প্রিটোরিয়ার পথে অন্য-অন্য স্টেশনেও অনুরূপ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ফলে কোনো-কোনো ব্যবসায়ী স্টেশনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিজেরা কীরকম বিপদ ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, সেইসব গল্প বললেন। আসলে তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন আমার অদৃষ্টে যা ঘটেছে, তা অভূতপূর্ব নয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় এইরকমই ঘ'টে থাকে। তার আগে বললেন যে, যেসব ভারতীয় ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড ক্লাসে যাতায়াত করে তাদের সকলকেই সাহেব সহযাত্রী কিংবা রেল কর্মচারীদের হাতে হেনস্তা হতে হয়। এইসব দুঃখের কাহিনী শুনতে-শুনতে দিনটা কেটে গেল। রাত্রে ট্রেন এল। আমার জন্য একটি বার্থ রিজার্ভ করা ছিল। ডারবান্-এ বড়াই ক'রে যে বিছানার টিকিট কিনতে চাইনি, এবার সেটি কিনতে হ'ল মরিৎস্‌বার্গ-এ।

ট্রেন আমায় নিয়ে চলল চার্লস্ টাউন্।

৯. আরও দুর্গতি

চার্লস্ টাউন্-এ ট্রেন পৌঁছল সকালবেলা। সেকালে চার্লস্ টাউন্ ও জোহানেস্‌বার্গ-এর মধ্যে ট্রেন চলাচল ছিল না। একটি ঘোড়ায় টানা যাত্রীবাহী কোচ্ চলাচল করত। পথে একটা রাত কাটাতে হ'ত স্টেণ্ডারটন্-এ। আমার কাছে এই কোচ্-এর টিকিট ছিল। একটা দিন মরিৎস্‌বার্গ-এ কাটাতে হ'লেও, সে টিকিট রদ হয়ে যায়নি। তাছাড়া কোচ্-এর মালিককে আবদুল্লা শেঠ একটা তারও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মালিক সামান্য একটি ছুতো বের ক'রে আমায় খারিজ ক'রে দিতে চাইল। যেই বুঝল, আমি সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছি, অম্লানবদনে ব'লে দিল, "আপনার টিকিট তো খারিজ হয়ে গেছে।" আমি তার কথার যোগ্য উত্তর দিলাম। কোচ্-এ জায়গা ছিল না এমন নয়, কিন্তু তার পেটের কথা ছিল অন্যরকম। যাত্রীরা সকলেই কোচ্-এর ভিতরে বসে। কিন্তু যেহেতু আমি 'কুলি', আর নব-আগন্তুক, মালিক ভাবল, শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীর সঙ্গে আমায় একত্র বসতে দেওয়া ঠিক হবে না। কোচ্‌বাক্সর দু-পাশে দুটো সিট্—তার একটিতে সচরাচর শ্বেতাঙ্গ কণ্ডাক্টর বসে। আজ সে ভিতরে ব'সে, যেন নেহাৎ দয়া ক'রে কোচ্‌বাক্স-এর পাশের সিট্‌টা আমার জন্য ছেড়ে দিল। আমি বেশ বুঝলাম, এটা নেহাৎ অবিচার শুধু নয়, নিছক অপমান। কিন্তু কেমন যেন মনে হ'ল যে এটা হজম ক'রে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে। আমি তো আর জোরজবরদস্তি ক'রে কোচ্-এর ভিতরে গিয়ে বসতে পারতাম না। আর আমি যদি আপত্তি জানিয়ে তর্কাতর্কি শুরু ক'রে দিতাম, তাহলে কোচ্‌টা হয়তো আমাকে ফেলেই রওনা হয়ে যাবে। আরেকটি দিন বৃথা নষ্ট, পরের দিনই-বা কী হতে পারে কে জানে। সুতরাং ভিতরে যতই গজ্‌রাই-না কেন, সুবুদ্ধির বশে কোচ্‌ম্যান্-এর পাশেই ব'সে পড়লাম।

প্রায় তিনটের সময় কোচ্ গিয়ে পৌঁছল পারডিকোপ নামে একটি জায়গায়। এখানে এসে কণ্ডাক্টর-এর শখ গেল সে বাইরে এসে তার নিজস্ব সিট্-এ খানিকক্ষণ বসবে। খুব-সম্ভব তার ইচ্ছে ছিল, বাইরের খোলা হাওয়ায় একটু ধূমপান করবে। কোচ্ম্যান্-এর কাছ থেকে একটা নোংরা চট্ চেয়ে নিয়ে, সেটা পা-দানের ওপর বিছিয়ে দিয়ে কন্ডাক্টর বলল,

—"সামী, তুমি বাপু এইখানে ব'সো। আমায় এখন কোচ্ম্যান্-এর পাশে বসতে হবে।" এ লাঞ্ছনা আমার সহ্য হ'ল না। তত্রাচ আমি একটু ভয়ে-ভয়েই বললাম :

—"দেখো, তুমিই আমায় এখানে বসিয়েছ। আসলে তো আমায় বসানো উচিত ছিল কোচ্-এর ভিতরে। সে অপমান আমি মেনে নিয়েছি। এখন বাইরে ব'সে তোমার ধূমপানের ইচ্ছা হয়েছে ব'লে তুমি আমায় বলছ, তোমার পায়ের কাছে বসতে। সে আমি বসব না, তবে আমি কোচ্-এর ভিতরে গিয়ে বসতে রাজি আছি।"

আমি কোনোক্রমে এই ক-টি কথা বলতেই লোকটা ক্ষেপে গিয়ে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল, সজোরে আমার কান ধ'রে টানতে লাগল, আমার হাত ধ'রে টেনে আমায় নিচে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কোচ্বাক্সর পেতলের রড আমি প্রাণপণ আঁকড়ে রইলাম। মরীয়া হয়ে ঠিক করলাম কবজির হাড় ভাঙে তো ভাঙুক, আমি কিছুতেই রড ছেড়ে দেব না। সহযাত্রীরা সবাই দেখল যে লোকটা আমায় টানাহেঁচড়া করছে, গালিগালাজ দিচ্ছে, মারধোর করছে। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না—যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা শক্তিমান্, আমি দুর্বল। কোনো-কোনো সহযাত্রীর মনে কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক হয়ে থাকবে, একজন তো বললেন, "ওহে ছেড়ে দাও-না বেচারাকে। আবার মারধোর করা কেন? লোকটার তো কোনো দোষ নেই, আর ও তো ঠিকই বলছে। ওপরে ও যদি বসবার জায়গা না-পায়, দাও-না ওকে ভিতরে এসে আমাদের সঙ্গে বসতে।" কণ্ডাক্টর গর্জন ক'রে উঠল, "না, কখনো না।" কিন্তু বাইরে হম্বিতম্বি করলেও, মনে হ'ল, লোকটা একটু যেন দ'মে গেছে। মারধোর বন্ধ হ'ল, আমার হাতটাও ছেড়ে দিল। গালিগালাজ চলল আবার কিছুক্ষণ। অতঃপর কোচ্বক্স-এর অন্যদিকে যে হোটেন্‌টট্ সহিস ব'সে ছিল, তাকে পা-দানিতে বসিয়ে তার জায়গায় নিজে বসল।

যাত্রীরা ভিতরে গিয়ে বসতেই, সিটি বাজিয়ে কোচ্ ঘড়ঘড় চলতে শুরু করল। তখনো আমার বুক যেন ধড়ফড় হয়েছে। মনে হ'ল, গন্তব্য জায়গায় জীবিত অবস্থায় পৌঁছতে পারব কি-না সন্দেহ। লোকটা মাঝে-মাঝে আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাতে লাগল, আর তর্জনী আস্ফালন ক'রে বারবার শাসাতে লাগল, "খবরদার। স্টেণ্ডারটন্ একবার আসুক, আমি কী করতে পারি বা না-পারি, বাছাধন তখন টের পাবে।" আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম ও মনে-মনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলাম।

আমরা যখন স্টেণ্ডারটন্ পৌঁছলাম তখন রাত হয়ে গেছে। সেখানে কয়েকজন ভারতীয়ের মুখ দেখে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি নামতেই এইসব বন্ধুরা বললেন : "আমরা এসেছি আপনাকে নিতে। চলুন আপনাকে ঈশা শেঠ-এর দোকানে পৌঁছে দিই। দাদা আবদুল্লা আমাদের কাছে তার পাঠিয়েছেন।"

আমি খুব খুশি হয়ে তাদের সঙ্গে শেঠ হাজি ঈশা সুমার-এর দোকানে গেলাম। শেঠ ও তাঁর কর্মচারীরা আমার আশেপাশে বসলেন। আমায় কীরকম নির্যাতন সইতে হয়েছে, আমি সব কথা তাদের বললাম। শুনে তাঁরা খুবই দুঃখিত হলেন ও নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ব'লে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

কোচ্ কোম্পানির এজেন্ট-এর কাছে আমি সব কথা জানাব ব'লে স্থির করলাম। একটা চিঠি লিখে তাঁকে পূর্বাপর সব ঘটনার বিষয় জানালাম এবং তাঁর লোক যে কীভাবে আমায় শাসিয়েছে, তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে একটা নিশ্চিতি চাইলাম, আগামীকাল যখন আমরা রওয়ানা হয়ে যাব, তখন যেন অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে কোচ্-এর ভিতরে বসতে পারি। এজেন্ট সে চিঠির জবাবে লিখলেন, "স্টেণ্ডারটন্ থেকে আমাদের অন্য একটি বড়ো কোচ্ যায়। তার চালক-বাহকেরা সব আলাদা। যে লোকের নামে আপনি নালিশ করেছেন, সে কাল থাকবে না। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে একত্র আপনি কোচ্-এর ভিতরে ব'সেই যেতে পারবেন।" জবাব পেয়ে মনে যেন একটু স্বস্তি পেলাম। আমায় যে লোকটা মারধোর গালিগালাজ করেছিল, তার বিরুদ্ধে মামলা করতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং আশা ছিল যে মার খাওয়ার অধ্যায়টা আপাতত এইখানেই ইতি হয়ে যাবে। বসার জায়গা একটা পাওয়া গিয়েছিল, আমি বিনা-হাঙ্গামায় সেই রাতেই জোহানেস্‌বার্গ-এ পৌঁছলাম।

স্টেণ্ডারটন্ গণ্ডগ্রাম আর জোহানেস্‌বার্গ মস্ত শহর। আবদুল্লা শেঠ জোহানেস্‌বার্গ-এও তার করেছিলেন এবং আমায় সেখানকার মুহম্মদ কাসিম কামরুদ্দিন-এর দোকানের নাম ও ঠিকানা দিয়েছিলেন। কোচ্ এসে পৌঁছুতেই তাদের লোক এসেছিল কোচ্-স্টেশনে আমায় নিতে। কিন্তু আমি তাঁকে দেখতে পাইনি আর তিনি আমায় দেখে থাকলেও চিনতে পারেননি। আমি তাই একটা হোটেলে গিয়ে উঠব ব'লে ঠিক করলাম। অনেকগুলো হোটেলের নাম আমার মনে ছিল। একটা ঘোড়াগাড়ি ভাড়া ক'রে আমি তাকে বললাম, আমায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল হোটেলে নিয়ে যেতে। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা ক'রে একটা কামরা চাইলাম। তিনি একপলক আমার দিকে তাকিয়ে, বেশ ভদ্রভাবে বললেন, "দুঃখের বিষয় আমাদের এখানে স্থানাভাব, একটি কামরাও খালি নেই।" এই ব'লে তিনি আমায় বিদায় দিলেন। অগত্যা আমি ঘোড়াগাড়ির কোচ্‌ম্যান্-কে বললাম, আমায় মুহম্মদ কাসিম কামরুদ্দিন-এর দোকানে নিয়ে যেতে। সেখানে গিয়ে দেখি, আবদুল গণি শেঠ আমার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তিনি আমায় বিশেষ সহৃদয়তার সঙ্গে স্বাগত করলেন। হোটেলের ঘটনা তাঁকে বলাতে তিনি খুব একচোট হাসলেন, তারপর বললেন : "আপনি কি ভেবেছিলেন, আপনাকে হোটেলে উঠতে দেবে?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম : "দেবে না কেন?"

—"এখানে আরো-কিছুদিন বসবাস করার পর আপনি এখানকার হালচাল একটু-একটু বুঝতে পারবেন। এক কেবল আমরাই এ দেশে থাকতে পারি, কারণ পয়সা রোজগারের ধান্দায়, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হজম করতে আমাদের বাধে না।"

এই ব'লে তিনি আমায় ট্রান্সভাল্-এ ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাস শোনালেন।

পরে আবদুল গণি শেঠ-এর বিষয়ে আরো অনেক কথা এসে পড়বে।

তিনি আমায় বললেন : "দেখুন, এ দেশ আপনার মতো লোকের জন্য নয়। এই তো কাল আপনাকে প্রিটোরিয়া যেতে হবে, দেখবেন এবার, আপনাকে থার্ড ক্লাসে যেতে হবে। ট্রান্সভাল্-এর অবস্থা নাটাল থেকে এক কাঠি বাড়া। এখানে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ভারতীয়দের কাটতেই দেয় না।"

"আপনারা হয়তো এই নিয়ে যথেষ্ট চেষ্টাচরিত্র করেন না, লেগে থাকেন না।"

"লেখালেখি আমরা কিছু-কিছু করেছি, কিন্তু বলতে বাধা নেই, আমাদের লোকেরাও প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতে চান না।"

আমি রেলওয়ের আইন কানুনের বই আনিয়ে নিয়ে প'ড়ে দেখলাম। দেখা গেল, যাত্রীদের অধিকার বিষয়ক আইনে একটা ফাঁক আছে। ট্রান্সভাল্ রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত আইনের ভাষাও সর্বত্র পরিষ্কার নয়, রেল রেগুলেশন্-এর ভাষা তো তার চেয়েও ধোঁয়াটে।

শেঠকে আমি বললাম, "আমার ইচ্ছা ফার্স্ট ক্লাসেই যাই। তা যদি না-পারি তাহলে বরঞ্চ আমি ঘোড়ারগাড়িতেই যাব। প্রিটোরিয়া তো এখান থেকে মাত্র সাঁইত্রিশ মাইলের পথ।"

শেঠ আবদুল গণি ঘোড়ারগাড়িতে সময় কতটা নেবে এবং কত টাকা খরচ করতে হবে—সে বিষয়ে বিবেচনা ক'রে দেখতে বললেন। তবে তিনি একটা ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হলেন যে, রেলে চেপে যদি যেতে হয় তাহলে ফার্স্ট ক্লাসেই যেতে হবে। সুতরাং আমি স্টেশনমাস্টারের কাছে এই মর্মে চিঠি পাঠালাম যে আমি একজন ব্যারিস্টর এবং সর্বদা ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াত করা আমার অভ্যাস। এ কথাও জানালাম যে মামলার খাতিরে আমায় অবিলম্বে প্রিটোরিয়া পৌঁছনো দরকার, আর যেহেতু তাঁর জবাবের অপেক্ষায় আমার ব'সে থাকা চলবে না, সরাসরি স্টেশনে গিয়ে সাক্ষাতে তাঁর সঙ্গে কথা বলব এবং একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট হাতে-হাতে কিনে নেব। সাক্ষাতে জবাব চাওয়ার একটা উদ্দেশ্য ছিল। আমি ভেবেছিলাম, স্টেশনমাস্টার যদি লিখিত জবাব পাঠান, তাহলে নিশ্চয় 'না' বলবেন, কারণ কুলি ব্যারিস্টর সম্বন্ধে তাঁর হয়তো একটা ধারণা থাকবে। আমি যদি নিখুঁত সাহেবি পোশাকে তার সামনে দাঁড়িয়ে, দু-চারটে কথা বলতে পারি, তবে হয়তো ব'লে-ক'য়ে একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট আদায়ও করতে পারি। সুতরাং ফ্রক্-কোট, নেক্টাই প্রভৃতি চড়িয়ে আমি স্টেশনে পৌঁছলাম, স্টেশনমাস্টারের সামনে ঝনাৎ ক'রে একটি গিনি ফেলে দিয়ে, একখানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটলাম।

স্টেশনমাস্টার বললেন, "ও, আপনিই বুঝি আমায় সেই চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন?"

"ঠিক ধরেছেন। এখন একটি টিকিট পেলে খুব খুশি হই। আজই আমায় প্রিটোরিয়া পৌঁছতে হবে।"

স্টেশনমাস্টার হাসলেন, বোধকরি আমার প্রতি তাঁর একটু দয়াও হ'ল। তিনি বললেন : "দেখুন, আমি ট্রান্সভালার নই, আমি হলাম গিয়ে হল্যাণ্ডার। আপনার অবস্থা আমি কিছু

বুঝতে পারি, আপনার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ সহানুভূতিও আছে। আপনাকে আমি টিকিট দিতে চাই–কিন্তু একটা শর্ত, গার্ড যদি আপনাকে ফার্স্ট ক্লাস থেকে নামিয়ে থার্ড ক্লাসে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে আপনি কিন্তু আমায় জড়াবেন না, অর্থাৎ কোম্পানির নামে আইন-আদালত করতে যাবেন না। আপনার যাত্রা নিরাপদ হোক্। আপনি যে একজন ভদ্রলোক–সে তো দেখেই বুঝতে পারছি।"

এইসব কথা ব'লে তিনি আমার টিকিট কাটলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম ও তাঁর শর্ত মেনে চলব ব'লে কথা দিলাম।

শেঠ আবদুল গণি আমায় উঠিয়ে দিতে এসেছিলেন। ব্যাপার দেখে তিনি তো অবাক, খুশিও হলেন খুব। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আমায় সাবধান ক'রে ব'লে দিলেন, আপনি যদি মানে-মানে প্রিটোরিয়া পৌঁছতে পারেন, তাহলে বুঝব খোদার কুদরতি। কিন্তু ভয় হয়, গার্ড আপনাকে নির্বিবাদে ফার্স্ট ক্লাসে যেতে দেবে না, আর গার্ড যদি-বা দেয়, সহযাত্রীরা নিশ্চয় বাগড়া দেবে।

আমি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। জর্মিস্টান্-এ গার্ড এল টিকিট চেক্ করতে। আমায় প্রথম শ্রেণীতে ব'সে থাকতে দেখে তো সে চ'টে আগুন। আঙুলের ইশারায় আমায় চ'লে যেতে বলল থার্ড ক্লাসে। আমি তাকে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট দেখালাম। সে বললে : "ওতে কিছু ফল হবে না। বেরিয়ে পড়ো, চ'লে যাও থার্ড ক্লাসে।"

একজনমাত্র সহযাত্রী ছিলেন। তিনি ইংরেজ। তিনি গার্ডকে ধম্‌কে বললেন : "ভদ্রলোককে অনর্থক হেনস্তা করছ কেন? দেখছ-না ওঁর কাছে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট রয়েছে? ওঁর সঙ্গে এক কামরায় যেতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।" আমার দিকে ফিরে ইংরেজ ভদ্রলোকটি বললেন, "আপনি যেমন আছেন তেমনি আরামে চলুন।"

"মশাই যদি কুলির সঙ্গে ব'সে যেতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার তো ভারি ব'য়ে গেল।"–এই ব'লে গার্ড গজগজ করতে-করতে বেরিয়ে গেল।

রাত প্রায় আটটার সময় ট্রেন পৌঁছল প্রিটোরিয়া।

১০. প্রিটোরিয়ায় প্রথম দিন

দাদা আবদুল্লার এটর্নির তরফ থেকে প্রিটোরিয়া স্টেশনে আমায় কেউ নিতে আসবে ব'লে আমি আশা করেছিলাম। ভারতীয় কেউ যে আসবে না, সে আমি জানতাম। কারণ আমি তো পাকাপাকি কথা দিয়েছিলাম কোনো ভারতীয়ের বাড়িতে আমি উঠব না। কিন্তু এটর্নি কাউকে পাঠাননি। পরে বুঝেছিলাম, সেদিন রবিবার ছিল ব'লে তিনি কাউকে পাঠানোর সুবিধা ক'রে উঠতে পারেননি। আমার অবস্থা হ'ল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কোথায় গিয়ে ওঠা যায় ভেবে কূলকিনারা পেলাম না। কোনো হোটেলে আমি হয়তো জায়গা পাব না ব'লে ভয় হতে লাগল।

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রিটোরিয়া স্টেশন দেখে কেউ আন্দাজই করতে পারত না ১৮৯৩-এ তার কী দশা ছিল। স্টেশনে টিম্‌টিম্ কয়েকটি বাতি জ্বলছে, যাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। যাত্রীরা একে-একে সবাই চ'লে যেতে লাগল। আমি ভাবলাম, সবাই চ'লে গেলে টিকিট কালেক্টর-এর যখন একটু সময় হবে তার হাতে টিকিট দিয়ে জিজ্ঞেস করব—একটা কোনো ছোটো হোটেল বা অন্য কোথাও আমি গিয়ে উঠতে পারি কি-না। অন্যথায় তো আমায় স্টেশনে ব'সেই রাত কাটাতে হবে। বলতে বাধা নেই, এতটুকু প্রশ্ন করতেও আমার ঠিক ভরসা হচ্ছিল না, কেননা অপমানিত হবার ভয় ছিল।

স্টেশন ফাঁকা হয়ে গেল। টিকিট কালেক্টর-কে টিকিট দিয়ে আমি সন্তর্পণে আমার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। তিনি বেশ শিষ্টভাবেই জবাব দিলেন, কিন্তু বোঝা গেল তাঁকে দিয়ে বিশেষ-কিছু কাজ হবে না। কাছাকাছি একজন আমেরিকান নিগ্রো দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি এসে আমাদের কথোপকথনে যোগ দিলেন। বললেন : "হুঁ, তাই তো, আপনি দেখছি একেবারেই নবাগত। এখানে কারো সঙ্গেই আপনার পরিচয় নেই। আপনি যদি আমার সঙ্গে আসতে চান, আমি আপনাকে একটি ছোটো হোটেলে নিয়ে যেতে পারি। সেখানকার মালিক একজন আমেরিকান ও আমার সুপরিচিত। আমার মনে হয়, তিনি হয়তো আপনাকে জায়গা দিতে পারবেন।"

আমার অবশ্য খুব ভরসা ছিল না, তবু ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হলাম। তিনি আমায় জন্‌স্টন্-এর ফ্যামিলি হোটেলে নিয়ে গেলেন। মিস্টার জন্‌স্টন্-কে আলাদা নিয়ে গিয়ে প্রথমে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। সেই রাতটা তাঁর হোটেলে রাখতে জন্‌স্টন্ রাজি হয়ে গেলেন এই শর্তে যে ডিনার আমাকে ঘরে ব'সেই খেতে হবে আর পাঁচজনের সঙ্গে, ডাইনিং হল্-এ ব'সে ডিনার খাওয়া চলবে না। তিনি আমায় বললেন : "দেখুন, মানুষের গায়ের চামড়ার কী রঙ এই নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই—এ আপনি নিশ্চয় জানবেন। তবে আমার হোটেলে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই য়ুরোপীয়। আপনাকে যদি তাঁদের সঙ্গে বসাই, তাঁরা বিরক্ত হতে পারেন, চাই-কি আমার হোটেল ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যেতেও পারেন।"

আমি বললাম : "রাতটা কাটাবার আশ্রয় দিয়েছেন, সেইজন্য আমি বাধিত আছি। এ দেশের হালচাল বিষয়ে এখন আমার একটা ধারণা হয়ে গেছে, সুতরাং বুঝতে পারি, কোথায় আপনার মুশকিল। আপনি স্বচ্ছন্দে আমার কামরাতেই ডিনার পাঠিয়ে দিতে পারেন। আশা করি, কালকেই আমি অন্য কোনো বন্দোবস্ত ক'রে নিতে পারব।"

আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ব'সে, আমি ডিনার-এর অপেক্ষা করতে গিয়ে একা-একা নানা কথা ভাবছিলাম। হোটেলে বেশি লোক ছিল না, তাই ভেবেছিলাম অনতিবিলম্বে ওয়েটার খানা নিয়ে হাজির হবে। ওয়েটার-এর বদলে উপস্থিত হলেন মিস্টার জন্‌স্টন্ স্বয়ং। তিনি বললেন : "আপনাকে ঘরে ব'সেই ডিনার সারতে হবে—এ কথা বলবার পর থেকে মনটা ভারি খুঁৎখুঁৎ করছিল। তাই আমি হোটেলের অন্যসব বাসিন্দাদের কাছে আপনার কথা বললাম, আর তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ডাইনিং রুম্-এ ব'সে ডিনার করলে তাঁদের

কোনো আপত্তি আছে কি-না। তাঁরা জানালেন, তাঁদের কোনো আপত্তি নেই, এবং আপনার যতদিন খুশি এখানে যদি আপনি থাকেন, তাতেও তাঁরা কিছু মনে করবেন না। সুতরাং আপনার যদি ইচ্ছা হয় তো চলুন, ডাইনিং রুম্-এ ব'সে খাবেন, আর এ হোটেলে আপনি যদ্দিন খুশি থাকতে পারেন।"

আমি আবার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ডাইনিং রুম্-এ ব'সে তৃপ্তিতে আহার করলাম।

পরদিন সকালবেলা গেলাম এটর্নি মিস্টার এ. ডবলিউ. বেকার-এর সঙ্গে দেখা করতে। ইতিপূর্বে আবদুল্লা শেঠ-এর কাছ থেকে তাঁর বিষয়ে যা শুনেছি তা থেকে বুঝেছিলাম সহৃদয়তা তাঁর প্রকৃতিসিদ্ধ। সুতরাং তাঁর সৌজন্য আমার কাছে নূতন ঠেকল না। খুব সমাদরে তিনি আমায় স্বাগত করলেন ও কুশল প্রশ্নাদি করলেন। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে আমি প্রিটোরিয়ায় আমার আসার উদ্দেশ্য বিষয়ে জানালাম। শুনে তিনি বললেন : "ব্যারিস্টর হিসাবে এখানে যে আমরা আপনাকে খুব বেশি কাজে লাগাতে পারব, তা মনে হয় না। তার কারণ এখানকার বড়ো-বড়ো সব ব্যারিস্টরদের আমরা এই মামলার জন্য নিযুক্ত ক'রে রেখেছি। কেস্‌টা জটিল, মনে হয় বেশ-কিছুকাল ধ'রে চলবে। কেবল দাদা আবদুল্লা শেঠ-এর সঙ্গে নানারকম তথ্য আদানপ্রদানের ব্যাপারে আমরা আপনার সহায়তা নিতে পারব। মক্কেলের সঙ্গে মামলা তত্ত্ব-তদ্‌বিরের কাজে আপনি আমাদের কাজ সহজ করতে পারেন, কারণ এখন আপনিই আমাদের উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাতে পারবেন। এ খুবই সুবিধা হ'ল। এখনো আপনার থাকার জায়গা আমি ঠিক ক'রে উঠতে পারিনি। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর ব্যবস্থা করাটাই ঠিক হবে। এ অঞ্চলে বর্ণবিদ্বেষ খুব বেশি, তাই আপনাদের মতো লোকের বসবাসের ব্যবস্থা করা বেশ কঠিন। তবে আমি একটি অভাবগ্রস্ত স্ত্রীলোকের কথা জানি, তাঁর স্বামী রুটি-বিস্কুট তৈরি করেন। আমার মনে হয়, তাঁদের ওখানে আপনার জায়গা হয়ে যাবে, তাতে স্ত্রীলোকটির কিছু সাশ্রয় হবে। চলুন, সেখানে একবার যাওয়া যাক্।"

এই ব'লে তিনি আমায় সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে মিস্টার বেকার আড়ালে দু-চারটা কথা বললেন। সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ শিলিঙের কড়ারে মহিলা আমায় আবাসিক অতিথি ক'রে নিতে রাজি হলেন।

মিস্টার বেকার পেশায় এটর্নি হ'লে কী হয়, তিনি সংসারী হয়েও ঘোরতর নিষ্ঠাবান্ একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। আজও তিনি জীবিত এবং এখন আইনের ব্যবসা সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে নিযুক্ত আছেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল। এখনো তিনি আমার সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ক'রে থাকেন। তাঁর চিঠিপত্রের বক্তব্য বিষয় হ'ল একই। ভিন্ন-ভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে খ্রিষ্টধর্ম যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম—এই হ'ল তাঁর চিঠির সার কথা। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল এই যে খ্রিষ্টকে একমাত্র ভগবৎ-পুত্র ও ত্রাণকর্তা ব'লে স্বীকার না-করলে মানুষ কখনো পরমা শান্তি লাভ করতে পারে না।

প্রথম সাক্ষাতেই মিস্টার বেকার ধর্ম বিষয়ে আমার মতামত জেনে নিয়েছিলেন। তাঁকে আমি বলেছিলাম : "আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি। কিন্তু হিন্দু ধর্ম বিষয়ে আমি বেশি-কিছু জানি

না। অন্য-অন্য ধর্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আরো অল্প। সত্যি বলতে কী, ধর্মের ব্যাপারে আমি কোথায় আছি, কী আমি মানি, কোন্‌টা আমার মানা উচিত—এসমস্ত আমি কিছুই জানি না। আমার নিজের ধর্ম বিষয়ে ভালো ক'রে আমি পড়তে চাই এবং আমার পক্ষে যতটা সম্ভব অন্য ধর্ম বিষয়েও।"

মিস্টার বেকার আমার কথা শুনে প্রীত হলেন ও বললেন : "দেখুন, আমি দক্ষিণ আফ্রিকা জেনারেল মিশন-এর একজন ডিরেক্টর। নিজের খরচায় আমি একটি গির্জা তৈরি ক'রে দিয়েছি, সেখানে আমি নিয়মিত ধর্মোপদেশ দিয়ে থাকি। বর্ণভেদ আমি মানি না। আমার এ কাজে কয়েকজন সঙ্গী-সাথী আছেন। প্রতিদিন বেলা একটার সময় আমরা একত্র মিলিত হই এবং কয়েক মিনিটের জন্য একযোগে শান্তির জন্য, আলোকের জন্য প্রার্থনা ক'রে থাকি। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেন তো ভারি খুশি হই। তাহলে আমি আর-সকলের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব, আপনাকে দেখে তাঁরা খুশি হবেন, আর আমার মনে হয়, আপনারও তাঁদের সঙ্গ ভালো লাগবে। তাছাড়া আমি আপনাকে কিছু ধর্মপুস্তক পড়তে দেব। অবশ্য, সবার সেরা ধর্মপুস্তক হ'ল *বাইবেল*। বইয়ের মতো বই—ও বই পড়ার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

মিস্টার বেকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, বেলা একটার প্রার্থনাসভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করব না।

"তাহলে কাল আপনি একটার সময় এখানে আসছেন—আশা করব। তখন দু-জনে একসঙ্গে প্রার্থনায় যাওয়া যাবে।"

অতঃপর আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সদ্য এসে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। ধীরভাবে সব কথা বিচার-বিবেচনার অবসর তখনো হয়নি।

মিস্টার জন্‌স্টন্‌-এর হোটেলে গিয়ে বিল পরিশোধ ক'রে, নূতন জায়গায় চ'লে এলাম এবং সেখানেই লাঞ্চ খেলাম। গৃহকর্ত্রী মানুষটি ভালো, আমার জন্য নিরামিষ আহার্য রেঁধে রেখেছিলেন। অল্পকয়েকদিনের মধ্যেই আমি তাঁদের ঘরের মানুষ হয়ে গেলাম।

লাঞ্চ সেরে দাদা আবদুল্লা তাঁর যে আত্মীয়ের নামে চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুর্দশা বিষয়ে আরো অনেক-কিছু জানা গেল। তাঁর ওখানে ওঠার জন্য তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, থাকা-খাওয়ার অন্য ব্যবস্থা আমি ইতিপূর্বেই ক'রে ফেলেছি। তিনি বিশেষ ক'রে বললেন, যে দরকার পড়লে তাঁকে বলতে আমি যেন ইতস্তত না-করি।

কথায়-কথায় সন্ধে গড়িয়ে এল। বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে, নিজের ঘরে চ'লে গেলাম এবং বিছানায় শুয়ে-শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। হাতে জরুরি কাজ কিছু নেই—সে কথা আবদুল্লা শেঠকে জানিয়ে দিলাম। মিস্টার বেকার যে আমার সম্বন্ধে এমন আগ্রহশীল হলেন, তার মানে কী? তাঁর সমধর্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে আমার কী লাভ? খ্রিষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র পাঠে কদ্দূর এগুতে পারব? হিন্দু ধর্মের ওপর লেখা বইপত্র

আমি এখন কোথা থেকে জোগাড় করি? নিজের ধর্ম ভালো ক'রে না-বোঝা পর্যন্ত সত্যকার পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিষ্টধর্মের স্বরূপ আমি কী ক'রে বুঝব? মনে হ'ল, আমার কাছে একটিমাত্র রাস্তা খোলা—বই যা-কিছু হাতে আসে, বিনা-পক্ষপাতে প'ড়ে ফেলব। ঈশ্বর আমায় যেমন চালাবেন বেকার সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমি সেইভাবে চলব। নিজের ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ না-জানা পর্যন্ত অন্য ধর্মগ্রহণ করার কথা মনেও স্থান দেব না।

এইসব নানা কথা ভাবতে-ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

১১. খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ

পরের দিন দুপুরবেলা একটার সময় আমি মিস্টার বেকার-এর প্রার্থনাসভায় গেলাম। সেখানে মিস্ হ্যারিশ, মিস্ গ্যাব্, মিস্টার কোট্স্ প্রভৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। সবাই নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসলেন, দেখাদেখি আমিও তাই করলাম। আপন-আপন ঈপ্সিত বস্তুর জন্য তাঁরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন। বেশিরভাগ প্রার্থনার বিষয় হ'ল দিন যেন শান্তিতে কাটে, যেন ভগবান হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেন।

অতঃপর আমার জন্য বিশেষ একটি প্রার্থনা যোগ ক'রে দেওয়া হ'ল : "প্রভু, আমাদের মধ্যে যে নূতন ভাই এসেছেন, তাঁকে তুমি পথ দেখাও। যে শান্তি তুমি আমাদের দান করেছ, তা তুমি একেও দাও। ভগবান যীশু আমাদের যেমন ত্রাণ করেছেন, একেও তেমনিভাবে তিনি যেন ত্রাণ করেন। তোমার কাছে যা-কিছু প্রার্থনা করেছি, সবই সেই যীশুর নামে।" এই প্রার্থনাসভায় ভজন-কীর্তন কিছু ছিল না। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ-কিছু চাইবার পর, আমরা যে যার লাঞ্চ-এর জন্য বেরিয়ে পড়তাম। সে সময়টা ছিল লাঞ্চ-এর সময়। প্রার্থনার সময় লাগত মিনিট-পাঁচেকের বেশি নয়।

মিস্ হ্যারিস্ ও মিস্ গ্যাব্ ছিলেন প্রাপ্তবয়স্কা আইবুড়ো মহিলা। মিস্টার কোট্স্ ছিলেন একজন কোয়েকার। মহিলা দু-জন একত্র থাকতেন, প্রতি রবিবার চারটের সময় তাঁরা আমায় তাঁদের ওখানে চা-পানের নিমন্ত্রণ করলেন।

রবিবারে যখন আমরা একত্র হতাম, আমি মিস্টার কোট্স্‌কে ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে আমার ডায়েরি বা দিনলিপি-পুস্তক পড়তে দিতাম। সপ্তাহকাল ধ'রে আমি যেমন বই পড়েছি এবং কীভাবে সেসব বই আমায় প্রভাবিত করেছে—এসব বিষয়েও তাঁর সঙ্গে আলোচনা হ'ত। মহিলারা তাঁদের প্রতিদিনের মধুর অভিজ্ঞতা ও তা থেকে তাঁরা কত শান্তি লাভ করেছেন, সেইসব কথা শোনাতেন।

মিস্টার কোট্স্ ছিলেন প্রাণখোলা নিষ্ঠাবান্ কোয়েকার যুবক। আমরা একত্র বেড়াতে যেতাম। তিনি আমায় তাঁর অন্য ধর্মবন্ধুদের কাছে নিয়ে যেতেন।

আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যত বৃদ্ধি পেতে লাগল, ততই কোট্স্ তাঁর নিজের যেসব বই পছন্দ, আমায় পড়তে দিতে লাগলেন। তাঁর দেওয়া বইয়ে আমার তাক একেবারে ঠাসা

হয়ে গেল। তিনি যেন আমার ওপর বইয়ের একটা পাহাড় চাপিয়ে দিলেন। তাঁর সুপারিশে আমার আস্থা ছিল ব'লে, আমি সব বই পড়ব ব'লে মেনে নিতাম। যেমন-যেমন পড়তাম, তেমন-তেমন ওইসব বই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হ'ত।

১৮৯৩-এ আমি খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ে বই বহু পড়েছি। সব বইয়ের নাম এখন আর মনে নেই, তবে তার মধ্যে ছিল ডক্টর পার্কার-এর *Commentory*, পিয়ার্সন্-এর *Many Infallible Proofs* এবং বাট্‌লার-এর *Analogy*। কিছু-কিছু বই আমার ভালো লাগত, কিছু ভালো লাগত না। *Many Infallifble Proofs* অর্থাৎ 'নানাবিধ অভ্রান্ত প্রমাণ' নামধেয় বইয়ে *বাইবেল*-ভিত্তিক ধর্মের সমর্থনে পিয়ার্সন্ তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি-মাফিক অনেক যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন। এ বই প'ড়ে আমার বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটেনি। পার্কার-এর *Commentory* নীতিচিন্তার অনেক খোরাক জুগিয়েছে, কিন্তু প্রচলিত খ্রিষ্টীয় মতে যার আস্থা নেই, তার খুব বেশি কাজে লাগে না। বরঞ্চ বাট্‌লার-এর *Analogy* প'ড়ে আমার মনে হ'ল যদিও বইটি দুরূহ এবং চার-পাঁচবার না-পড়লে ঠিক বোধগম্য হয় না, এই বইয়ে অনেক গভীর তত্ত্বকথা আছে। মনে হয়েছিল, নাস্তিকতাবাদীদের ভগবৎ-বিশ্বাসে প্রণোদিত করার জন্যই এই বই লেখা। ঈশ্বর যে আছেন ও তার সপক্ষে যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, সেগুলি আমার কাছে অনাবশ্যক ব'লে মনে হ'ল। আমি তো ইতিপূর্বেই অবিশ্বাসের পর্ব অতিক্রম ক'রে এসেছি। কিন্তু যীশুকে ভগবানের একমাত্র অবতার কিংবা ভগবান ও মানুষের মধ্যে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম ব'লে প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তি দেখানো হয়েছিল, সেগুলি আমার মনের ওপর কোনো ছাপ রাখতে পারেনি।

কিন্তু কোট্‌স্ সহজে হার মানবার পাত্র নন। আমার প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি ছিল। তিনি একদিন লক্ষ করলেন, আমার গলায় বৈষ্ণবদের তুলসীর মালা রয়েছে। তিনি ভাবলেন, এটা আমার কু-সংস্কার, খুব দুঃখও পেলেন, বললেন, "এটা আপনাকে শোভা পায় না। আসুন মালাটা আমরা ছিঁড়ে ফেলি।"

"না তা হয় না। এ মালা আমার কাছে পবিত্র, কারণ আমার মা আমায় এটি দিয়েছিলেন।"

"কিন্তু আপনি তো এসব মানেন না?"

"এর কোনো গূঢ় তাৎপর্য আছে কি-না আমি জানি না। এটি ধারণ করলে আমার কোনো ক্ষতি হবে ব'লে আমার মনে হয় না। কিন্তু যে মালা আমার মা আদর ক'রে আমার মঙ্গল হবে এই দৃঢ় বিশ্বাসে আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছেন, যথেষ্ট কারণ না-থাকলে তা আমি পরিহার করতে পারি না। কালক্রমে ক্ষ'য়ে গিয়ে এ মালা যখন আপনা থেকে খ'সে যাবে, তখন নূতন ক'রে মালা পরায় আমার আদৌ কোনো আগ্রহ হবে না। কিন্তু এ মালা ছিঁড়ে ফেলা চলে না।"

কোট্‌স্ আমার যুক্তির ঠিক মর্ম বুঝতে পারলেন না, কারণ আমার ধর্মের প্রতি তাঁর কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি অপেক্ষা ক'রে আছেন কীভাবে আমায় অজ্ঞানতার অতল অন্ধকার থেকে তুলে আনতে পারেন। অন্য ধর্মে কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু পরম সত্য নিহিত আছে একমাত্র খ্রিষ্টধর্মে—এই ছিল তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস। তাছাড়া তিনি আমায়

বোঝাতে চেয়েছিলেন যে খ্রিষ্টধর্ম যদি আমি অবলম্বন না-করি, তাহলে খ্রিষ্টের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আমার পাপক্ষালনের কোনো আশা নেই, আমার পুণ্য কর্মেরও কোনো মূল্য নেই। আমাকে দিয়ে তিনি অনেকগুলি বই যেমন পড়ালেন, তেমনি একাধিক এমন বন্ধুর সঙ্গে আমায় পরিচিত করিয়ে দিলেন যাঁরা নাকি তার ধারণায় গোঁড়া খ্রিষ্টান। এইসব লোকেদের মধ্যে একটি পরিবার ছিল যাঁরা প্লিমাথ ব্রিদরেন সম্প্রদায়ভুক্ত।

মিস্টার কোট্‌স্‌-এর মধ্যস্থতায় যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল, তাঁদের অনেকেই ছিলেন সৎ লোক। সকলকেই মনে হ'ত বেশ ধর্মভীরু। কিন্তু এই যে পরিবারের কথা এইমাত্র বললাম, এঁদের মধ্যে একজন আমার সামনে এমন একটি যুক্তি তুলে ধরলেন যার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁর বক্তব্য ছিল এইরকম : "আমাদের ধর্মের মহত্ত্ব আপনি ঠিক ধরতে পারছেন না। আপনার কাছ থেকে যতটুকু শুনেছি তা থেকে মনে হয় জীবনের প্রতিটি ক্ষণ আপনি আপনার পাপ ও বিচ্যুতির বিষয়ে চিন্তা করেন এবং কীভাবে নিজেকে শুধরে নেবেন, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবেন—তাই নিয়ে দুর্ভাবনা করেন। অনবরত কর্মের এই আবর্তে প'ড়ে থাকলে কী ক'রে আপনি মুক্তি পাবেন। এভাবে চললে আপনি কখনো শান্তি পাবেন না। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করেন, আমরা সকলেই পাপী। এবার আমাদের ধর্মবিশ্বাসের সার্থকতার দিকে একটু নজর দিন। এখানে কোথাও খুঁৎ নেই। নিজেদের চেষ্টায় আমরা উন্নতি লাভ করব, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব—সে আশা দুরাশা। কিন্তু পাপের হাত থেকে অব্যাহতি তো আমাদের পেতেই হবে। পাপের বোঝা কী ক'রে আমরা আজীবন ব'য়ে চলব? আমরা সে বোঝা যীশুর ওপর চাপিয়ে দিই। তিনি ঈশ্বরের একমাত্র নিষ্পাপ পুত্র। যারা তাঁকে মানে তারা অবিনশ্বর—এ হ'ল তাঁরই বাণী। এই বাণীর মধ্যেই নিহিত আছে ভগবানের অসীম করুণা। যেহেতু আমরা মেনে নিয়েছি, যীশু আমাদের পাপ নিজের ওপর তুলে নিয়েছেন ও আমাদের হয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন, সেজন্য পাপ আমাদের পক্ষে বন্ধন নয়। পাপী আমরা, পাপ তো আমাদের হবেই, এ জগতে কে আছে যে নিষ্পাপ জীবনযাপন করতে পারে। এইজন্যই যীশু সকলের হয়ে দুঃখবরণ করেছেন, প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তাঁর এই প্রায়শ্চিত্তের মহাযজ্ঞ যাঁরা সত্য ব'লে মেনে নিয়েছেন, একমাত্র তাঁরাই অনন্ত শান্তি অর্জন করতে পারেন। ভেবে দেখুন, আপনার কত অশান্তি, অস্থিরতা, আর সে তুলনায় আমাদের জীবনে কতখানি শান্তির আশ্বাস।"

তাঁর এই যুক্তি আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না। বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলাম : "তাবৎ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী যদি একেই তাঁদের ধর্ম ব'লে প্রচার করেন, তাহলে তা আমার পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারে না। পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি আমার কাম্য নয়। একেবারে কর্মে ও চিন্তায় আমি পাপ থেকে মুক্ত হতে চাই। যতদিন আমার এই লক্ষ্য সাধিত না-হচ্ছে, ততদিন যদি আমি স্থির থাকতে না-পারি—তাহ'লে তাই আমার ভালো। সেরকম শান্তি আমি চাই না।"

প্লিমাথ ব্রাদার জবাবে বললেন, "আমি জোর ক'রে বলতে পারি, আপনার এসব চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। আমি যা বললাম, সে কথা আবার বিবেচনা ক'রে দেখবেন।" এই

ব্রাদারটির যেমন কথা তেমনি কাজ। তিনি স্বেচ্ছায় নীতিবিগর্হিত কাজ ক'রে আমার কাছে প্রমাণ করতে চাইলেন যে তার জন্য তাঁর মনে কোনো বিকার উপস্থিত হয়নি।

এঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবার আগে থেকেই আমি জানতাম, সব খ্রিষ্টান মুক্তির এই সহজ পন্থাকে অভ্রান্ত ব'লে মেনে নিতে পারেননি। মিস্টার কোট্স্ নিজে তো পাপকে খুব ভয় ক'রে চলতেন। তাঁর অন্তর ছিল পবিত্র এবং তিনি আত্মশুদ্ধির সম্ভাবনা স্বীকার করতেন। সেই দুই মহিলাও এ কথা সমর্থন করতেন। যে কয়েকটি বই আমার হাতে এসেছিল সেগুলি ছিল ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। আমার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা শুনে যদিও মিস্টার কোট্স্ খুবই আশঙ্কিত হয়েছিলেন, তাঁকে আমি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলাম যে প্লিমাথ ব্রাদার-এর বিকৃত বিশ্বাসের ফলে আমার মনে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি কোনো বিরাগ জন্মায়নি।

আমার সংশয় ছিল অন্যরকম—সে ছিল বাইবেল ও তার প্রচলিত ব্যাখ্যা নিয়ে।

১২. ভারতীয়দের সংস্পর্শ

খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে আরও বেশি-কিছু বলার আগে, এইসময়ে আমার অন্যান্য অভিজ্ঞতার কথা ব'লে রাখা ভালো।

নাটাল অঞ্চলে দাদা আবদুল্লার যেমন প্রতিপত্তি, প্রিটোরিয়ায় শেঠ তৈয়ব হাজি খান মুহম্মদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল সেইরকম। তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতীয় জনসাধারণকে নিয়ে কোনো সভা-সমিতি কিংবা অন্য কোনো কাজ করা সম্ভবপর ছিল না। পৌঁছবার পর সাতদিন যেতে-না-যেতে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে নিয়েছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তাকে বলেছিলাম যে প্রিটোরিয়ার প্রত্যেক ভারতীয়দের সংস্পর্শে আমি আসতে চাই। সে অঞ্চলে ভারতীয়দের অবস্থা যে আমি ভালো ক'রে জেনে নিতে চাই সে কথাও তাঁকে বলেছিলাম ও এ কাজে তাঁর সহায়তা চেয়েছিলাম। তিনিও বেশ খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেলেন আমায় সাহায্য করতে।

আমার প্রথম কাজ হ'ল প্রিটোরিয়ার সমস্ত ভারতীয়দের একটি সভায় একত্র করা ও ট্রান্সভাল্-এ ভারতীয়দের অবস্থার একটি ছবি তাদের সামনে তুলে ধরা। শেঠ হাজি মুহম্মদ হাজি জুসব-এর নামে আমার কাছে একটি পরিচয়পত্র ছিল। তাঁর বাড়িতেই সভা ডাকা হ'ল। সভায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই মেমান ব্যবসায়ী, দু-চারজন হিন্দুও উপস্থিত ছিলেন। আসলে প্রিটোরিয়াতে হিন্দুর সংখ্যাও ছিল অল্প।

এই সভায় আমি যে বক্তৃতা দিই, জনসাধারণের সামনে সেই আমার প্রথম বক্তৃতা বলা চলে। আমি ঠিক করেছিলাম, ব্যবসায় সততা বিষয়ে বলব আর সেজন্য বেশ তৈরি হয়েও গিয়েছিলাম। ব্যবসার মধ্যে সততার স্থান নেই—ব্যবসায়ীদের মুখে এইরকম কথাই বরাবর শুনে এসেছি। এ কথা আমি তখনো মানিনি, এখনো মানি না। ব্যবসার সঙ্গে সততা ঠিক খাপ খায় না—এরকম কথা এখনো কোনো-কোনো ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছ থেকে শুনতে পাই।

তাঁরা ব'লেন, ব্যবসাটা হ'ল নিতান্তই বাস্তব ব্যাপার আর সত্য হ'ল ধর্মীয় ব্যাপার। তাঁরা যুক্তি দেন যে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্র একরকম আর ধর্মাচরণের ক্ষেত্র অন্যরকম। ব্যবসাতে যেধরনের লোকব্যবহার প্রচলিত, সেখানে খাঁটি সত্য বলার কোনো প্রশ্নই হ'তে পারে না। যতখানি রয়-সয়, অবস্থা বুঝে কেবল ততটুকু সত্যাচরণ করা চলে মাত্র। আমার বক্তৃতায় আমি এইধরনের মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেছিলাম ও দুটি বিষয়ে তাদের কর্তব্যবুদ্ধি জাগাবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, বিদেশে আগত ভারতীয়দের সত্য আচরণের দায়িত্ব ঢের বেশি, কারণ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতীয়ের আচার-আচরণ দেখে এখানকার লোক কোটি-কোটি ভারতীয়ের স্বভাবচরিত্র পরিমাপ করবে।

চারপাশে যেসব ইংরেজ রয়েছে, তাদের তুলনায় আমাদের দেশের লোকেদের অভ্যাস অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন—এ আমি লক্ষ করেছিলাম। সেদিকে সভায় উপস্থিত লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আরেকটি কথার ওপর বেশ জোর দিয়ে বললাম যে বিদেশে এসে, পরস্পরের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, খ্রিষ্টান, গুজরাতি, মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, কচ্ছি, সুরাটি প্রভৃতি ভেদাভেদজ্ঞান, সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন।

উপসংহারে প্রস্তাব করলাম, ভারতীয়রা যেন একজোট হয়ে এ দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দুর্দশা ও অসুবিধার কথা উল্লেখ ক'রে তার প্রতিকারের জন্য আবেদন জানায়। এরকম সঙ্ঘ যদি গঠিত হয় তাহলে তার কাজে যতটা সেবা ও সময় দেওয়া দরকার, সে আমি দিতে প্রস্তুত এ কথাও জানিয়ে রাখলাম।

আমার এই বক্তৃতা সভার ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করল—এ আমি লক্ষ করলাম।

আমার বক্তৃতার পর আলোচনা হ'ল। কেউ-কেউ উপযাচক হয়ে বললেন যে ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা তথ্যাদি সরবরাহ করবেন। এতে আমি খুব উৎসাহিত বোধ করলাম। লক্ষ করলাম, সভায় উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগ ইংরেজি জানেন না। এ দেশে ইংরেজির জ্ঞান কাজে লাগতে পারে ব'লে, যাঁদের একটু অবসর আছে তাঁদের ইংরেজি শিখে নিতে বললাম। পরিণত বয়সেও যে ভাষা শেখ সম্বল, তার দু-একটা দৃষ্টান্তও দিলাম। তাঁদের কয়েকজন যদি একটা ক্লাস চালু করেন কিংবা একা-একা ইংরেজি শিখতে চান, তাহলে আমি তাঁদের পড়াতে রাজি আছি ব'লে জানালাম।

ক্লাস চালু করা গেল না। তবে তিনজন তরুণ বললেন যে তাঁদের সময় ও সুবিধামতন যদি আমি তাঁদের বাড়ি গিয়ে পড়াতে রাজি থাকি, তাহলে তাঁরাও ইংরেজি শিখতে রাজি। এঁদের মধ্যে দু-জন ছিলেন মুসলমান, একজন নাপিত ও অন্যজন কেরানী। তৃতীয় ব্যক্তিটি ছিলেন একটি ছোটো দোকানের হিন্দু মালিক। আমি তাঁদের সুবিধেমতো তাঁদের বাড়ি গিয়ে ইংরেজি পড়াতে রাজি হয়ে গেলাম। পড়াতে আমি যে পারব, সে বিষয়ে আমার আদৌ সন্দেহ ছিল না। পড়তে গিয়ে ছাত্রেরা ক্লান্ত হ'লেও আমার কোনো ক্লান্তি ছিল না। কখনো-কখনো এমন হয়েছে যে আমি যথাসময়ে হাজির হয়েছি, কিন্তু তাঁরা তখন নিজ-নিজ কাজে ব্যস্ত। আমি তাতে ধৈর্য হারাইনি। ইংরেজি ভালো ক'রে শেখায় এঁদের তিনজনের কারোরই তেমন আগ্রহ ছিল না। তবু দু-জন মাস-আষ্টেকের মধ্যে কিছু মন্দ শেখেননি।

হিসেব রাখা ও কাজকারবার চালাবার মতো চিঠিপত্র লেখার জ্ঞান তাঁদের হয়েছিল। নাপিতভায়া বলেছিলেন যে খদ্দেরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে যতটুকু ইংরেজি জানা দরকার, সেই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। ইংরেজি শেখার ফলে আমার দুটি ছাত্রের রোজগারপাতি মোটামুটি বেশে বেড়ে গিয়েছিল।

এই সভার ফলাফল দেখে আমি বেশ খুশি হয়েছিলাম। যদ্দূর মনে পড়ে, এই সভাতেই স্থির হ'ল যে এরকম সভা সপ্তাহে একবার কিংবা মাসে একবার বসবে। মোটামুটি নিয়মিতই সভা বসত, এবং এসব অধিবেশনে বেশ খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা হ'ত। ফলে এমন হ'ল যে প্রিটোরিয়ায় এমন কোনো ভারতীয় ছিল না যে আমায় চিনত না অথবা যার অবস্থা বিষয়ে আমি কিছু জানতাম না। ফলে আমার ইচ্ছা হ'ল, প্রিটোরিয়া-স্থিত-ব্রিটিশ এজেন্ট মিস্টার জেকোবুস্ দ্য ভেট্-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার। ভারতীয়দের প্রতি তাঁর সহানুভতির অভাব ছিল না, কিন্তু স্থানীয় সরকারের কাছে তাঁর বিশেষ কোনো খাতির ছিল না। সে যা-ই হোক্, তিনি আমাদের জন্য যথাসাধ্য করবেন ব'লে কথা দিলেন, আর বললেন আমার যখনই ইচ্ছা হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেন ইতস্তত না-করি।

অতঃপর আমি রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করতে শুরু করলাম। তাঁদের জানালাম রেলযোগে যাতায়াতে ভারতীয়দের যেসব অসুবিধা সহ্য করতে হয়, তাঁদের নিজেদের আইনকানুনেও তা সঙ্গত বলা যায় না। যেসব ভারতীয় সভ্য বেশ প'রে রেলযোগে ভ্রমণ করতে চান, তাঁদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনতে দেওয়া হবে—এই মর্মে রেল কর্তৃপক্ষের জবাব এল। এতে অবশ্য পুরো প্রতিকার পাওয়া গেল না, কারণ স্টেশনমাস্টারের ওপর দায়িত্ব রইল সভ্য বেশভূষা কাকে বলা হবে—তা ঠিক করার।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা বিষয়ে, সেই ব্রিটিশ এজেন্ট ভদ্রলোক আমায় তাঁর কিছু নথিপত্র পড়তে দিয়েছিলেন। তৈয়ব শেঠও সেইরকম কিছু কাগজপত্র আমায় দিয়েছিলেন। এসব নথিপত্র থেকে আমি জানলাম, কীরকম নিষ্ঠুরভাবে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট অঞ্চল থেকে ভারতীয়দের বহিষ্কার করা হয়েছে।

মোট কথা, প্রিটোরিয়ায় থাকার ফলে, ট্রান্সভাল্ ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট্ অঞ্চলে ভারতীয়দের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনীতিক দুরবস্থা সম্বন্ধে আমি অনেক-কিছু জানতে পারলাম। তখন আমি ভাবতে পারিনি, এসব জ্ঞান আখেরে আমার কত কাজ দেবে। তখন আমি ভেবেছিলাম, বছরের শেষে কিংবা বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই, মামলা যদি মিটে যায়, আমি দেশে ফিরে যাব।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক ঈশ্বর বিধান করেন আর।

১৩. কুলির জীবন

ট্রান্সভাল্ ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট্-এর ভারতীয়দের অবস্থা কেমন ছিল, সে বিষয়ে এখানে বিশদভাবে বলা ঠিক হবে না। যাঁরা এ বিষয়ে সব কথা জানতে চান তাঁরা আমার লেখা *History of Satyagraha in South Africa* অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস বইখানি পড়তে পারেন। তবে এখানে সঙ্ক্ষেপে দু-চার কথা ব'লে রাখা ভালো।

অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট্-এ ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কিংবা তার কিছু আগেই একটি বিশেষ সংবিধান চালু করা হয়। এই আইনের বলে ভারতীয়দের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ইচ্ছা করলে হোটেলের ওয়েটার কিংবা চাকরবাকরের কাজ নিয়ে তারা সেখানে থাকতে পেত। ব্যবসায়ীদের নামমাত্র খেসারত দিয়ে ওই অঞ্চল থেকে বিতাড়ন করা হয়েছিল। তারা এই ব্যবস্থার বিষয়ে আবেদন-নিবেদন যথেষ্ট করেছিল, কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

১৮৮৫-এ ট্রান্সভাল্-এ একটি কড়া আইন পাশ করা হয়। পরের বছর এই আইনের সামান্য পরিবর্তন ক'রে বলা হয়, ট্রান্সভাল্-এ প্রবেশ করতে হ'লে প্রত্যেক ভারতীয়কে মাথা-পিছু তিন পাউন্ড ক'রে ফি বা দর্শনী দিতে হবে। তাদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছাড়া তারা জমি কিনে বসবাস করতে পাবে না। সে জমিও মালিকী স্বত্বে তাদের দেওয়া হবে না। ভোটের অধিকার তো তাদের ছিল না। এসব বিশেষ আইন খাটানো হ'ত এশিয়ান নির্বিশেষে ; কিন্তু এর ওপরেও প্রযোজ্য হ'ত কালা আদমি সংক্রান্ত অন্য নানা বিধিনিষেধ। এই নিয়ম অনুসারে ফুটপাথ্-এ তাদের চলাফেরার অধিকার ছিল না এবং পুলিশের ছাড়পত্র না-থাকলে, রাত ন-টার পর ঘর ছেড়ে বেরবারও হুকুম ছিল না। এই শেষোক্ত নিয়মটি পুলিশ ইচ্ছা করলে ভারতীয়দের বেলা কিছু ইতর-বিশেষ করতে পারত। যারা নিজেদের 'আরব' ব'লে পরিচয় দিত, খানিকটা অনুগ্রহ ক'রেই যেন তাদের এই নিয়ম থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল, আসলে প্রয়োগের বেলা আইন শক্ত কিংবা আল্‌গা করা ছিল সম্পূর্ণ পুলিশের খেয়ালখুশির অধীন।

এই দুটি আইনেরই ফল আমায় অল্পবিস্তর ভোগ করতে হয়েছিল। অনেকসময় মিস্টার কোট্‌স্ ও আমি রাত্রে বেড়াতে বেরুতাম, বাড়ি ফিরতে প্রায়ই রাত দশটার বেশি হয়ে যেত। পুলিশ যদি আমায় গ্রেফতার করে, তাহ্‌লে কী হবে? আমার চেয়ে যেন মিস্টার কোট্‌স্-এরই এ বিষয়ে মাথাব্যথা ছিল বেশি। রাত্রে বেরুতে হ'লে তিনি তাঁর নিগ্রো চাকরদের 'পাশ' দিতেন। কিন্তু আমায় 'পাশ' দেন কী ক'রে? একমাত্র মনিবই 'পাশ' দিতে পারেন চাকরকে। আমি যদি চাইতাম ও মিস্টার কোট্‌স্ যদি দিতেও চাইতেন, সেরকম করা তো ঠিক হ'ত না, মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনা হ'ত।

সেজন্য মিস্টার কোট্‌স্ কিংবা তাঁর কোনো বন্ধু আমায় সরকারি এটর্নি ডক্টর ক্রাউজ-এর কাছে নিয়ে যান। আলাপ-পরিচয় হতে জানা গেল আমরা দু-জন একই 'ইন্'-এর ব্যারিস্টর। রাত ন-টার পর বাইরে থাকতে হ'লে আমার 'পাশ' দরকার হবে, এ কথা ভাবতেও তাঁর খারাপ লাগল। আমার প্রতি তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। আমাকে পাশ দেওয়া

হোক্‌—সেই মর্মে অর্ডার না-দিয়ে ডক্টর ক্রাউজ আমায় একটি পরোয়ানাপত্র দিলেন যার বলে আমি যখন খুশি বাইরে বেরুতে পারব এবং পুলিশ আমায় বাধা দিতে পারবে না। বাড়ির বাইরে বেরুলেই আমি সযত্নে এ চিঠি আমার পকেটে রাখতাম। এ চিঠি যে কখনো কাজে লাগাতে হয়নি, সেটা নিতান্তই আকস্মিক বলতে হবে।

ডক্টর ক্রাউজ তাঁর বাড়িতে আমায় নিমন্ত্রণ করলেন। আমাদের মধ্যে খানিকটা ঘনিষ্টতাও হ'ল বলা চলে। কখনো-কখনো আমি তাঁর ওখানে যেতাম, আর তাঁরই মধ্যস্থতায় তাঁর বিখ্যাত ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি তখন জোহানেস্‌বার্গ-এর সরকার-পক্ষের বড়ো উকিল—পাবলিক প্রসিকিউটার। বুয়র যুদ্ধের সময় একজন ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন, এই অভিযোগে জঙ্গী আদালতে তাঁর বিচার হয় এবং সাত বছরের মেয়াদে তাঁর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ব্যারিস্টরও তাঁকে একঘরে ক'রে দেয়, ফলে তাঁর প্র্যাক্‌টিস্‌ বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধবিরতির পর তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। তাঁকে ট্রান্সভাল্‌-এর ব্যারিস্টররা সসম্মানে নিজেদের দলে ফিরিয়ে নেয় এবং তিনি পুনরায় ওকালতি ব্যবসা করতে থাকেন।

এইসব যোগাযোগ আমার বেশ কাজে এসেছিল। পরে যখন আমি জনসেবার কাজে নামি, এঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে কাজ আমার অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল।

ফুটপাথ্‌-এ চলাফেরার আইনটা আমার পক্ষে বেশ মারাত্মক হয়েছিল। রোজই আমি প্রেসিডেন্ট স্ট্রিট্‌ দিয়ে হেঁটে গিয়ে, একটা খোলা মাঠে বেড়াতাম। এই স্ট্রিটেই ছিল প্রেসিডেন্ট ক্রুগার-এর বাড়ি। সাদাসিধে অনাড়ম্বর একটা বাড়ি, সামনে একটা বাগান পর্যন্ত নেই। প্রতিবেশী বাড়িগুলোর সঙ্গে এ বাড়ির বিশেষ কোনো পার্থক্য নজরে পড়ত না। অথচ এই প্রিটোরিয়াতেই বেশ কয়েকজন লক্ষপতির চারিদিকে বাগান-ঘেরা বেশ জমকালো অট্টালিকার অভাব ছিল না। তাঁর সহজ চালচলনের জন্য প্রেসিডেন্ট ক্রুগার প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাড়ির সামনে একদল টহলদারি শান্ত্রী থাকায় বোঝা যেত যে বাড়িটি কোনো সরকারি কর্মচারীর বাসস্থান। শান্ত্রীদের পাশ কাটিয়ে নিত্য আমি এই বাড়ির সামনের ফুটপাথ্‌ দিয়ে যেতাম আসতাম। এ নিয়ে কোনোদিন গোলযোগ বা বাধার সৃষ্টি হয়নি।

ডিউটিতে যে শান্ত্রী থাকে, মাঝে-মাঝে তাদের বদল হয়। একদিন এক শান্ত্রী আমায় বিন্দুমাত্র সাবধান না-ক'রেই, ফুটপাথ্‌ থেকে নেমে যাবার কথা না-ব'লেই, আমায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ও লাথি মেরে আমায় রাস্তায় নামিয়ে দিল। কোট্‌স্‌ তখন সেই রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিলেন; আমি তখন খুব ভয় পেয়ে থাকলেও ভাবলাম শান্ত্রীকে জিজ্ঞেস করব, তার ওইরকম আচরণের কারণ কী। তার আগেই মিস্টার কোট্‌স্‌ আমায় ডেকে বললেন :

"গান্ধী, আমি সমস্ত ঘটনা দেখেছি। যদি লোকটার বিরুদ্ধে আপনি নালিশ রুজু করেন, আমি আপনার সাক্ষী হব। আপনি এইভাবে আক্রান্ত হলেন ব'লে আমি খুবই দুঃখিত।"

আমি বললাম, "আপনি দুঃখিত হতে যাবেন কেন? শান্ত্রী বেচারা কী জানে? তার কাছে সব কালা আদমি, কালা আদমি বৈ আর-কিছু নয়। নিগ্রোদের সঙ্গে সে যেমন আচরণ

করে আমার সঙ্গেও নিশ্চয় তেমনি করেছে। আমি ঠিক করেছি, আমার নিজের প্রতি যদি কোনো অন্যায় হয়, আমি তার প্রতিকারের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হব না। সুতরাং এর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করায় আমার আদৌ ইচ্ছা নেই।"

মিস্টার কোট্স্ বললেন, "আপনি যা বললেন তা আপনারই উপযুক্ত। তবু আরেকবার আপনাকে ভেবে দেখতে বলি। লোকটাকে উচিতমতো শিক্ষা দেওয়া দরকার।" এই ব'লে তিনি শান্ত্রীটির সঙ্গে কথা বললেন ও তাকে বকাঝকা করলেন। শান্ত্রীটি ছিল বুয়র। তাদের দু-জনের মধ্যে ডাচ ভাষায় কী কথাবার্তা হ'ল তা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু শান্ত্রীটি এগিয়ে এসে আমার কাছে মাপ চাইল—যদিও তার কোনো দরকার ছিল না। আমি মনে-মনে তাকে ইতিপূর্বেই ক্ষমা করেছি।

সেদিন থেকে সেই রাস্তায় যাওয়া-আসা আমি ছেড়ে দিলাম। এই শান্ত্রীর বদ্‌লি হিসেবে অন্য যে শান্ত্রী আসবে, সে তো এই ঘটনার কথা জানবে না। সে-ও তো এইরকমই ব্যবহার করতে পারে। আবার সেধে কেন লাথি খাই! বেড়াতে যাবার জন্য আমি তাই অন্য রাস্তা বেছে নিলাম।

এই ঘটনার ফলে প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য আমার সহানুভূতি গভীরতর হ'ল। আইনের এই ধারা সম্বন্ধে ব্রিটিশ এজেন্ট-এর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, এ বিষয়ে পরীক্ষামূলক একটা মামলা আনা উচিত হবে কি-না—সেই বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম।

কেবল পড়াশোনা ক'রে কিংবা লোকমুখে শুনে, ভারতীয়দের দুরবস্থা বিষয়ে যতটা-না জানতে পেতাম, এইরকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে তার চেয়ে অনেক ভালো ক'রে জানলাম। বুঝলাম, যেসব ভারতীয়ের কিছুমাত্র আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁদের বসবাসের যোগ্য দেশ নয়। কীভাবে এ অবস্থার উন্নতি হতে পারে, সেই চিন্তা আমায় যেন আরো বেশি ক'রে পেয়ে বসল।

কিন্তু এখন তো আমার মুখ্য কর্তব্য হ'ল দাদা আবদুল্লার মামলার তদারকি করা।

১৪. মামলার প্রস্তুতি

প্রিটোরিয়ায় এক বছর থাকার ফলে আমি যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম তা আমার খুবই কাজে লেগেছিল। জনসেবার কাজে আমার হাতেখড়ি এখানেই। এ কাজে আমার কতটা ক্ষমতা, তারও খানিকটা আন্দাজ এখানে পেলাম। এই প্রিটোরিয়া থাকতেই ধর্মভাবনা আমার জীবনযাপনের নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করতে শুরু করে এবং এখানেই আইনের ব্যবসায় আমি সত্যকারের তালিম পেলাম। শিক্ষানবিশ ব্যারিস্টর অভিজ্ঞ ব্যারিস্টর-এর কাছ থেকে এই পেশার খুঁটিনাটি যেভাবে শিক্ষা করে, এখানে থাকতে আমি সেই শিক্ষা পেয়েছিলাম। ওকালতির কাজে আমি যে নেহাৎ অপটু হব না, সে আস্থা আমি এখানেই লাভ করলাম। কৃতী উকিল হবার কায়দা-কৌশলও এখানেই আমি আয়ত্ত করলাম।

দাদা আবদুল্লার মামলাটি বড়ো সহজ ছিল না, দাবিদাওয়ার পরিমাণ ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। ব্যবসার লেনদেন থেকে মামলার উদ্ভব হবার ফলে, হিসাবপত্রের জটিল সব সমস্যা এর মধ্যে নিহিত ছিল। এই দাবির ভিত্তি ছিল এক অংশে কতকগুলি প্রমিসরি নোট ও অপর অংশে কতকগুলি প্রমিসরি নোট সম্পাদন করার প্রতিশ্রুতি। প্রতিপক্ষের দিক থেকে বলা হয়েছিল, প্রমিসরি নোটগুলি ফাঁকি দিয়ে আদায় করা হয়েছে এবং তার বিনিময়ে যথোচিত অর্থমূল্য পাওয়া যায়নি। ঘটনার সত্যাসত্য ও আইনের জটিলতার ফলে মামলাটা ছিল বেশ ঘোরালোরকমের।

দুই পক্ষই বড়ো-বড়ো সলিসিটার ব্যারিস্টর নিযুক্ত করেছিলেন। এর ফলে এদের কাজকর্ম ভালো ক'রে দেখার আমি একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। বাদীর পক্ষ থেকে সলিসিটার-এর জন্য কেস্ তৈরি করা ও মামলার সপক্ষে যুক্তি-তর্ক সরবরাহ করার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমি যেসব কাগজপত্র তৈরি ক'রে দিতাম, তার কিছুটা নিয়ে কিছুটা বর্জন ক'রে সলিসিটার তাঁর ব্রীফ্ তৈরি করতেন। এই ব্রীফ্-এর কতটুকু ব্যারিস্টর তাঁর কাজে লাগাতেন, কতটুকু লাগাতেন না—এইসমস্ত লক্ষ করতে গিয়ে আইন ব্যবসায় আমার শিক্ষা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, এভাবে মামলা প্রস্তুত করতে গিয়ে ঠিক মামলাটা বুঝিয়ে দেওয়া ও তদনুসারে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করার ক্ষমতা আমার কতখানি, আমি এবার তা বেশ ভালো বুঝতে পারব।

এই কেস্ নিয়ে আমার আগ্রহের সীমা ছিল না। আমি একপ্রকার এর মধ্যেই ডুবে ছিলাম। লেনদেনের ব্যাপারে যা-কিছু নথিপত্র ছিল, আদ্যোপান্ত সব প'ড়ে ফেললাম। মক্কেল নিজেই ছিলেন বুদ্ধিতে তৎপর। আমার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল পুরোমাত্রায়। এতে আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়েছিল। হিসেব রাখার কাজ আমি বেশ-কিছুটা শিখে নিয়েছিলাম। মামলার কাগজপত্র বেশিরভাগই ছিল গুজরাতিতে লেখা। চিঠিপত্র তর্জমা করতে গিয়ে আমার তর্জমার ক্ষমতাও বেশ বৃদ্ধি পায়।

আগেই বলেছি, ধর্মালোচনায় ও জনসেবার কাজে আমার খুব আগ্রহ ছিল। এ কাজে কিছুটা সময় দিলেও, সে কাজ ছিল গৌণ। মামলা তৈরি করার ব্যাপারটাই তখন ছিল আমার প্রধান কাজ। আইনের গ্রন্থ পড়া এবং দরকার হ'লে অনুরূপ মামলার ইতিহাস অনুধাবন করার কাজকে আমি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলাম। ফলে মামলার পূর্বাপর ঘটনা আমি যেন নখদর্পণে আয়ত্ত ক'রে নিলাম। মামলা সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানতাম বাদী-প্রতিবাদীও ততটা জানত কি-না সন্দেহ, তার কারণ ততদিনে উভয়পক্ষের নথিপত্র আমি সব-কিছু প'ড়ে নিয়েছি।

মিস্টার পিন্‌কাট্ যে বলতেন, মামলার বারো-আনা সাফল্য নির্ভর করে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনার সত্যাসত্য জানার ওপর—সে কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ত। পরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত ব্যারিস্টর মিস্টার লেনার্ড-এর কাছেও অনুরূপ কথা শুনেছিলাম। একবার আমার একটি কেস্ করতে গিয়ে দেখি যে নীতিবিচার যদিও আমার মক্কেলের সপক্ষে, আইন যেন তার বিরুদ্ধে যায়। হতাশ হয়ে আমি মিস্টার লেনার্ড-এর সাহায্য চাই। তিনিও বুঝলেন,

ঘটনার সত্যাসত্য দেখলে, আমার মক্কেলের কেস্ কিছু কমজোর নয়। তিনি ব'লে উঠলেন, "দেখো গান্ধী, অনেকদিন মোকদ্দমা ক'রে আমি একটি জিনিস শিখেছি—পূর্বাপর সমস্ত ঘটনার ওপর যদি উকিলের দখল থাকে, তাহলে আইনের দখল আপনা হতে তার হাতে এসে যায়। এসো, কেস্‌টা আরো-একটু তলিয়ে দেখা যাক্।" মামলার সমস্ত ঘটনা ভালো ক'রে অনুধাবন ক'রে আমি যেন আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি, মিস্টার লেনার্ড আমায় বললেন। নতুন ক'রে সমস্ত ঘটনা পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি যেন নূতন আলোয় সব-কিছু দেখতে পেলাম। অনুরূপ একটি মামলায় দক্ষিণ আফ্রিকার আদালত থেকে কীরকম রায় দেওয়া হয়েছিল, তা-ও আমার নজরে প'ড়ে গেল। আমি খুব খুশি হয়ে মিস্টার লেনার্ড-এর কাছে গিয়ে সব কথা তাঁকে জানালাম। উনি বললেন, "বহুৎ আচ্ছা, এ মামলা আমরা জিতবই, তবে কোন্ জজসাহেবের এজলাসে মামলার শুনানি হয়, সেদিকে একটু লক্ষ রাখতে হবে।"

দাদা আবদুল্লার মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র যখন আমি প্রস্তুত করছিলাম, তখনো পূর্বাপর ঘটনাবলির গুরুত্ব আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। যা ঘটে তাই হ'ল সত্য। আমরা যদি সত্যকে সমস্ত শক্তিতে অবলম্বন ক'রে থাকি তাহলে আইন আপনা হতে আমাদের সহায় হয়। পূর্বাপর ঘটনার দিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে দাদা আবদুল্লার কেস্ যে বেশ জোরালো, সে আমি বুঝেছিলাম। আইন যে তার সপক্ষে, তা-ও আমি জানতাম। কিন্তু এ-ও আমি বুঝেছিলাম, নিছক জিদ-এর বশে মামলা যদি চলতে দেওয়া হয়, বাদী-প্রতিবাদী উভয়পক্ষের সর্বনাশা হতে বাধ্য—অথচ তারা কেবল যে এক শহরের বাসিন্দা তা নয়, আত্মীয়কুটুম্বও বটে। মামলা যে কবে মিটবে কেউ জানে না। কোর্টে যদি মামলা চলতে থাকে, তাহলে অনির্দিষ্টকালের জন্য চলবে এবং তাতে এপক্ষ-ওপক্ষ কোনো পক্ষেরই লাভ নেই। দুই পক্ষেরই সেজন্য আগ্রহ ছিল সম্ভব হ'লে শীঘ্র যেন মামলার নিষ্পত্তি হয়।

তৈয়ব শেঠ-এর কাছে গিয়ে আমি তাঁকে অনুরোধ জানালাম ; পরামর্শ দিলাম, তিনি যেন আপসে মামলা মিটিয়ে ফেলেন এবং সেইভাবে তাঁর উকিল ব্যারিস্টর-এর সঙ্গে কথা ব'লে দেখেন। আর বললাম, দুই পক্ষেরই আস্থাভাজন কাউকে যদি সালিশ মানা যায় তাহলে মামলা মিটতে আর কতক্ষণ। উকিল ব্যারিস্টরকে দেয় দক্ষিণার অঙ্ক এমন হু-হু ক'রে বেড়ে চলেছিল যে দু-পক্ষ যত বড়ো ব্যবসায়ীই হোন্-না-কেন, কিছুকাল বাদে তাঁরা সর্বস্বান্ত হতে বাধ্য। মামলা নিয়ে তাঁরা এমনি মেতে উঠেছিলেন যে আর-কোনোদিকে নজর দেবার ফুরসৎও তাঁদের ছিল না। মাঝখান থেকে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। ওকালতি ব্যবসায় আমার ঘেন্না ধ'রে গেল। উভয়পক্ষের উকিলই নিজ-নিজ মক্কেলের সপক্ষে নানারকম আইনের যুক্তি ও মারপ্যাঁচ খুঁজতে তৎপর হলেন। এই মামলা চালাতে গিয়েই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম যে মামলায় জয়লাভ করলেই খরচ-খরচা সবটুকু তুলে নেওয়া যায়—এমনটা হয় না। কোর্ট ফি নিয়ম-মাফিক মামলা লড়বার জন্য দু-পক্ষের কে কী হারে খরচ করতে পারবে—তা গোড়া থেকে বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু এটর্নি ও মক্কেলে যেভাবে বোঝাপড়া হয়, তাতে নির্দিষ্ট হারের চেয়ে খরচ হয় অনেক বেশি। এটা আমার ঠিক বরদাস্ত হ'ল না। আমার মনে হ'ল, আমার কর্তব্য হবে দুই পক্ষের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন

হয়ে দু-জনের মধ্যে মিটমাট ক'রে দেওয়া। এজন্য আমি প্রাণপণ পরিশ্রম করতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত তৈয়ব শেঠ আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন। একজন সালিশ নিযুক্ত হলেন। তাঁর কাছে দুইপক্ষ নিজ-নিজ যুক্তি-তর্ক পেশ করলেন। শেষপর্যন্ত দাদা আবদুল্লাই জয়ী হলেন।

এই রায় শুনে আমি যে খুব খুশি হলাম তা নয়। আমার মক্কেল যদি তদন্তে সালিশের ডিক্রি জারি করতে চাইতেন, তৈয়ব শেঠের এমন সঙ্গতি ছিল না যে তিনি সব টাকা দিয়ে দিতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় পোরবন্দরের যেসব মেমান ব্যবসার খাতিরে বসবাস করতেন, তাঁদের মধ্যে একটা অলিখিত নিয়ম ছিল যে দেউলিয়া প্রতিপন্ন হবার চেয়ে মৃত্যুবরণও শ্রেয়। তৈয়ব শেঠ যে একসঙ্গে প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার পাউন্ড মায় মামলার সব খরচখরচা দিয়ে দেবেন—এটা সম্ভবপর ছিল না। সালিশ যা সাব্যস্ত ক'রে দিয়েছেন, তা থেকে একটি পাইও তিনি মকুব চাইতে যাবেন না, নিজেকে দেউলিয়া ব'লে ঘোষণাও করবেন না। সুতরাং একটিমাত্র রাস্তা খোলা ছিল। দাদা আবদুল্লার উচিত হবে তৈয়ব শেঠের কাছ থেকে তাঁর পাওনা কিস্তিবন্দী ক'রে দেওয়া—যাতে তিনি অল্পে-অল্পে সব টাকাটা পরিশোধ ক'রে দিতে পারেন। দাদা আবদুল্লা এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন ও তৈয়ব শেঠের ধার শোধ দেবার মেয়াদ অনেকখানি বাড়িয়ে দিলেন। সালিশির প্রস্তাবে রাজি করাতে গিয়ে আমার যতটা-না বেগ পেতে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেগ পেতে হ'ল আদায়ের মেয়াদ বাড়াতে গিয়ে। আখেরে কিন্তু মামলার এইরকম নিষ্পত্তিতে উভয়পক্ষই বেশ খুশি হলেন, জনসমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠাও বৃদ্ধি পেল। আমার তো আনন্দের অবধি ছিল না। আইন ব্যবসার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় যদি ন্যায়বিচার, তাহলে আমি সত্যকার আইন কাকে বলে বুঝতে শিখলাম। মানুষের স্বভাবে যে দিকটা ভালো তার সন্ধান পেলাম, মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে শিখলাম। বুঝতে পারলাম, উকিলের প্রকৃত কাজ হ'ল বিবদমান দলের মধ্যে মিলন-সাধন করা। এই শিক্ষা আমার মনে এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হ'ল যে, যে বিশ বছরকাল আমি ওকালতির ব্যবসা করেছি, তার অধিকাংশ সময় দিয়েছি শত-শত মামলার সালিশি-মীমাংসা করতে। সেজন্য আমি যে কিছু হারিয়েছি তা নয় ; বিবেকের দিক থেকে তো নয়ই, এমন-কি টাকার দিক থেকেও আমার কোনো ক্ষতি তাতে ঘটেনি।

১৫. ধর্মভাবের আলোড়ন

খ্রিষ্টীয় বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক্। আমার অদৃষ্টে যে কী আছে তা নিয়ে মিস্টার বেকার-এর চিন্তার অন্ত ছিল না। ওয়েলিংটন্-এ খ্রিষ্টীয়দের ধর্ম সম্মেলনে তিনি আমায় সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কয়েক বছর বাদে-বাদে ধর্মচেতনা উদ্দীপিত করার জন্য কিংবা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের খ্রিষ্টধর্মের নবজাগরণ, নব-প্রতিষ্ঠা। ওয়েলিংটন সম্মেলনের লক্ষ্যও ছিল তাই। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ওয়েলিংটন-এর খ্যাতনামা ধর্মযাজক এন্ড্রু মারে। মিস্টার বেকার-এর আশা ছিল, এই

সম্মেলনে উপস্থিত তাঁর খ্রিষ্টান ভাইদের ধর্ম-উন্মাদনা, নিষ্ঠা ও উৎসাহ দেখে, একেবারে অনিবার্যভাবে আমি তাঁদের ধর্মের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করব।

তবে আমায় ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে তাঁর পরম ভরসা ছিল প্রার্থনার শক্তির ওপর। প্রার্থনায় তাঁর বিশ্বাস ছিল গভীর। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, অন্তর থেকে ভগবানকে ডাকলে তিনি সে ডাকে সাড়া না-দিয়ে পারেন না। ব্রিস্টলের জর্জ মুলার-এর মতো ভক্ত খ্রিষ্টানদের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলতেন যে দিনগত জীবনযাপনের ব্যাপারেও তাঁরা প্রার্থনার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। আমি অপক্ষপাত আগ্রহে প্রার্থনার শক্তি ও উপযোগিতা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য মন দিয়ে শুনতাম। তাঁকে নিশ্চিতি দিয়ে বলেছিলাম, যদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য অন্তর থেকে ডাক আসে তাহলে আমি কোনো বাধা মানব না। তাঁকে এইরকম ভরসা দিতে আমার একটুও বাধেনি, তার কারণ এর বহু আগে থেকেই বিবেকের বাণী অনুসরণ ক'রে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করার শিক্ষা গ্রহণ করেছি—বস্তুত এরকম মেনে চলায় আমি গভীর আনন্দ পেতাম। বিবেকের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা কেবল যে শক্ত ছিল এমন নয়, আমার পক্ষে তা ছিল খুবই বেদনাদায়ক।

সুতরাং আমরা ওয়েলিংটন যাত্রা করলাম। আমার মতো একজন কালা আদমি সঙ্গে থাকায় মিস্টার বেকার-কে বেশ মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। আমার জন্য অনেকসময় তাঁকে নানা অসুবিধা সইতে হয়েছিল। মিস্টার বেকার ও তাঁর সম্প্রদায় রবিবারটাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবার দিনরূপে পালন করতেন। পথে একটা দিন রবিবার পড়ায় রেলযাত্রায় আমাদের বিরতি পড়ল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর যদি-বা স্টেশন-হোটেলের ম্যানেজার আমায় হোটেলে ঢুকতে দিলেন, ডাইনিং রুম্-এ তো কিছুতেই আমায় ঢুকতে দিতে চান না। মিস্টার বেকারও সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। হোটলে আগত অতিথির ন্যায্য অধিকার তিনি দাবি করলেন। আমায় নিয়ে তাঁর কত যে অসুবিধা, তা আমার চোখে পড়েছিল। ওয়েলিংটনেও তিনি আমায় তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই রেখেছিলেন। সেখানেও তাঁকে ছোটোখাটো নানা অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। যদিও সেগুলি আমার কাছ থেকে গোপন রাখার বিধিমতো চেষ্টা করেছিলেন, আমার নজর এড়ায়নি।

ওয়েলিংটনের সম্মেলন ছিল ভক্ত খ্রিষ্টানদের সমাবেশ। ধর্মে তাঁদের গভীর আস্থা দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছিল। রেভারেন্ড মারে-র সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। লক্ষ করলাম, সম্মেলনে উপস্থিত অনেকে আমার পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করলেন। কয়েকটি ধর্মসঙ্গীত আমার কানে খুব মধুর লেগেছিল।

সম্মেলন ছিল তিনদিনব্যাপী। যোগদান যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের ধর্মানুরাগ যে খাঁটি, সে আমি বুঝেছিলাম এবং সে আমার বেশ ভালোও লেগেছিল। কিন্তু নিজস্ব ধর্মমত ত্যাগ ক'রে ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না। একমাত্র খ্রিষ্টান হ'লেই আমি স্বর্গে যেতে পারব কিংবা মোক্ষলাভ করব—এ আমার কাছে অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হ'ল। কথাটা যখন অকপটে আমার কয়েকজন ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানদের বললাম, তাঁরা খুবই আহত বোধ করলেন। কিন্তু আমি তো নাচার।

আমার যে সমস্যা, তার মূল ছিল আরো গভীর। একমাত্র যীশু খ্রিষ্টই ভগবানের পুত্ররূপে দেহ ধারণ করেছিলেন, এই কথা যাঁরা মানেন, তাঁরাই কেবল অনন্ত জীবনের অধিকারী—এ কথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। ভগবানের পুত্র বলতে যদি কেউ থাকে, তবে তো আমরা সকলেই তাঁর সন্তান। যীশু যদি ভগবানের মতো হন কিংবা স্বয়ং ভগবান হন, তবে তো আমরা সকলেই ভগবানের মতো কিংবা স্বয়ং ভগবান হতে পারি। ক্রুশকাষ্ঠে তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, যীশু তাঁর রক্তধারায় পৃথিবীর সমস্ত পাপ ধুয়ে দিয়েছেন—এ কথা যে অক্ষরে-অক্ষরে সত্য—এমনটাও আমার কাছে যুক্তিসিদ্ধ ব'লে মনে হ'ল না। রূপক হিসেবে এর মধ্যে সত্যের আভাস থাকলেও থাকতে পারে। তাছাড়া খ্রিষ্টীয় ধর্মমতে বলা হয় কেবল মানুষ জাতিরই আত্মা আছে, অন্য প্রাণীদের নেই, মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তারা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই বিশ্বাসের সঙ্গে আমার মতে মেলে না। যীশু শহীদ ছিলেন, আত্মোৎসর্গের প্রতীক ছিলেন, মহাগুরু ছিলেন—এসব কথা মেনে নিলেও, আমি মেনে নিতে পারিনি যে মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ। ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু জগতের কাছে একটি মহান্ আদর্শ তুলে ধরেছে, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি অন্তর থেকে মেনে নিতে পারিনি যে তাঁর মৃত্যুর কোনো অভূতপূর্ব বা অলৌকিক তাৎপর্য আছে। খ্রিষ্টানদের ধর্মজীবনে আমি এমন-কিছু দেখতে পাইনি যা অন্য ধর্মীয়দের জীবনে পাওয়া যায় না। ধর্মের প্রভাবে কোনো-কোনো খ্রিষ্টানের জীবনে যেমন আমূল পরিবর্তনের কথা শোনা যায়, তেমন তো অন্য ধর্মীয়দের জীবনেও ঘ'টে থাকে। দার্শনিক দিক থেকে খ্রিষ্টানদের ধর্মশাস্ত্রে আমি কোনো অসাধারণত্ব দেখতে পাইনি। আর ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের দিক থেকে আমার ধারণা হয়েছিল খ্রিষ্টানদের তুলনায় হিন্দুরা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। মোট কথা, খ্রিষ্টধর্মকে সর্বগুণসম্পন্ন বা জগতের সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ব'লে মনে হয়েছিল।

সুযোগ-সুবিধা পেলেই আমার খ্রিষ্টীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমার মনের এইসব সন্দেহ-সংশয়ের কথা আলোচনা করতাম। কিন্তু জবাবে তাঁরা আমায় যা বলতেন তা থেকে আমি যেন তৃপ্তি পেতাম না।

খ্রিষ্টধর্মকে আমি যেমন নিখুঁত সর্বাঙ্গসুন্দর বা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে পারিনি, তেমনি তখন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার ক'রে নিতে পারিনি। হিন্দুধর্মের ত্রুটিগুলি আমার চোখের কাছে যেমন স্পষ্ট ছিল, তেমনি পীড়াদায়ক। অস্পৃশ্যতা যদি হিন্দুধর্মের অঙ্গবিশেষ হয়, তাহলে নিশ্চয় তা পচিত গলিত অথবা সর্বথা বর্জনীয় অঙ্গ হবে। অতগুলি সম্প্রদায় ও জাতি কেন যে থাকবে সে আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না। বেদ যে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট—এরকম কথার কোনো অর্থ হয়? তা যদি হয় তাহলে *বাইবেল* বা *কোরান*-ই বা ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট হবে না কেন?

খ্রিষ্টান বন্ধুরা যেমন, আমার মুসলমান বন্ধুরাও তেমনি আমার ধর্মান্তর গ্রহণ নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। আবদুল্লা শেঠ সর্বদা বলতেন, আমি যেন অভিনিবেশ সহকারে ইস্‌লামী

ধর্মশাস্ত্রাদি পাঠ করি ; সদাসর্বদা এইসব গ্রন্থের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য বিষয়ে আমায় অবহিত করতে চাইতেন।

আমার সমস্যার বিষয়ে আমি রায়চন্দ্‌ভাইকে একটি চিঠি লিখি। ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত দেশের কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে এইসময় আমি পত্রব্যবহার করি, তাঁদের কাছ থেকে জবাবও পাই। রায়চন্দ্‌ভাইয়ের চিঠি থেকে আমি খানিকটা শান্তি পাই। তিনি লিখলেন, আমি যেন অধীর না-হই, যেন হিন্দুধর্ম গভীরভাবে অনুশীলন করি। তাঁর চিঠিতে একটি যে কথা তিনি লিখেছিলেন, তা হ'ল এই : "অপক্ষপাত বিচারের ফলে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে হিন্দুশাস্ত্রে যেরকম গূঢ় ও গভীর বিচার আছে, আত্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা আছে, দয়া, মায়া, করুণা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি বিকাশের অবকাশ আছে, তেমন আর অন্য-কোনো ধর্মে নেই।"

আমি সেল্‌-কৃত *কোরান*-এর অনুবাদ এক কপি কিনে পড়তে শুরু করলাম। ইস্‌লাম বিষয়ে অন্যান্য বইও সংগ্রহ করলাম। বিলেতে আমার খ্রিষ্টান বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে লাগলাম। এঁদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে এডওয়ার্ড মেট্‌ল্যান্ড-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হতে লাগল। অ্যানা কিংসফোর্ড-এর সহযোগে তিনি *The Perfect Way* অথবা উত্তম পন্থা নাম দিয়ে যে বই লিখেছিলেন তার এক কপি পাঠিয়ে দিলেন। প্রচলিত অর্থে যা খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস এ বইয়ে তাকে কুসংস্কার ব'লে পরিবর্জন করা হয়েছে। তিনি আরো-একটি বই পাঠালেন যার নাম হ'ল *The New Interpretation of The Bible* অথবা *বাইবেল* গ্রন্থের নূতন ব্যাখ্যান। দুটি বই-ই আমার বেশ ভালো লাগল। মনে হ'ল, দুটি বইয়েই যেন হিন্দুধর্মের সমর্থন পেলাম। যে বইটি আমায় একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলল সে হচ্ছে টলস্টয়ের *The Kingdom of God is within You* অর্থাৎ ভগবানের রাজত্ব হ'ল মানুষেরই অন্তরে স্থিত। এ বইয়ের প্রভাব আমার মনে চিরস্থায়ী হয়ে রইল। এই বইয়ের স্বাধীন চিন্তাধারা, গভীর নীতিজ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠার কাছে মিস্টার কোট্‌স্‌-এর দেওয়া বইগুলি যেন একেবারেই নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

খ্রিষ্টান বন্ধুরা নিশ্চয় ভাবতেও পারেননি যে ধর্ম বিষয়ে আমার অধ্যয়ন ও অনুসন্ধিৎসা আমায় এরকম বিচিত্র পথে নিয়ে যাবে। এডওয়ার্ড মেট্‌ল্যান্ড-এর সঙ্গে আমার বেশ-কিছুদিন চিঠিপত্র চলেছিল। আর রায়চন্দ্‌ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ তো অক্ষুণ্ণ ছিল তাঁর মৃত্যু অবধি। তাঁর পাঠানো কিছু-কিছু বই সেসময় আমি পড়েছিলাম। তার মধ্যে ছিল *পঞ্চীকরণ*, *মণিরত্নমালা*, *যোগবাশিষ্ট*-এর 'মুমুক্ষু প্রকরণ', হরিভদ্র সূরীর *ষড়দর্শন সমুচ্চয়* ইত্যাদি।

খ্রিষ্টীয় বন্ধুদের ইঙ্গিত পথে যদিও আমি চলতে পারিনি, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই, কারণ তাঁরা আমার মধ্যে ধর্মজিজ্ঞাসা উদ্দীপ্ত করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সেই যোগাযোগের স্মৃতি আমার মনে কখনো ম্লান হবে না। আমার সৌভাগ্যের ফলে পরবর্তীকালে খ্রিষ্টীয় বন্ধুসমাগম বেড়েছে বৈ কমেনি। এইসব ধর্মবন্ধুদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য আমার জীবনকে সমৃদ্ধতর, মধুরতর করেছে।

১৬. মানুষ ভাবে এক

মামলা শেষ হয়ে গেল। আর আমার প্রিটোরিয়ায় ব'সে থাকার কোনো কারণ ছিল না। ডারবান্-এ ফিরে গিয়ে আমি স্বদেশে পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। এবার ঘরে ফেরার দিন এল। কিন্তু বিনা-সম্বর্ধনায় আমায় বিদায় দেবেন আবদুল্লা শেঠ তেমন পাত্রই নন। আমার সম্মানে তিনি সিডেনহাম্ শহরে একটি বিদায়-সভার আয়োজন করলেন।

কথা ছিল, সেখানে সারাদিন থাকা হবে। সেখানে কয়েকটা খবরকাগজ প'ড়ে ছিল ; তার একটির পাতা ওল্টাতে গিয়ে আমার নজরে পড়ল এক কোণায় একটি ছোটো প্যারাগ্রাফ, তার শিরোনাম ছিল 'ইন্ডিয়ান ফ্রেঞ্চাইজ' অর্থাৎ ভারতীয়দের ভোটে অধিকার। খবরটা ছিল আইনসভার কাছে উপস্থিত একটি বিল্ নিয়ে। এই প্রস্তাবিত আইনের লক্ষ্য ছিল আইনসভার সদস্য নির্বাচনে ভারতীয়দের ভোট দেবার যে অধিকারটুকু ছিল, তা কেড়ে নেওয়া। আমি এই বিল্-এর বিষয় কিছু জানতাম না। উপস্থিত আমন্ত্রিতেরা সে বিষয়ে কোনো খবর রাখেন না দেখলাম।

আবদুল্লা শেঠকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখলাম। তিনি বললেন : "ওসবের আমরা কী-ই-বা জানি, আর কতটুকুই-বা বুঝি? ব্যবসা-বাণিজ্যে বাগড়া পড়ে তো তবু কিছু বোঝবার চেষ্টা করতে পারি। আপনি তো জানেনই, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট্-এ আমাদের যেসব কাজকারবার ছিল, সব ঝেঁটিয়ে বিদায় ক'রে দিয়েছে। তাই নিয়ে আমরা আন্দোলন করিনি যে এমন নয়, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। নিরক্ষরতা আমাদের খোঁড়া ক'রে রেখেছে। খবরকাগজ আমরা রাখি কেবল বাজারদর প্রভৃতি দেখবার জন্য। বিধানসভায় যেসব আইনকানুন তৈরি হয়, তার বিষয়ে আমরা কতটুকুটই-বা জানি। এ দেশের শ্বেতাঙ্গ উকিল-ব্যারিস্টররাই আমাদের চোখ, আমাদের কান।"

"কিন্তু এ দেশে জন্মেছে, এখানেই লেখাপড়া হয়েছে, এরকম অনেক তরুণবয়স্ক ভারতীয় তো এখানেই আছে। তারা কি আপনাদের সহায়তা করতে পারেন না?"—আমি শেঠকে জিজ্ঞাসা করলাম।

হতাশের ভঙ্গিতে আবদুল্লা শেঠ বললেন, "ওদের কথা আর বলবেন না। ওরা কি কখনো আমাদের ধারেকাছে মাড়ায় না-কি? আর সত্যি বলতে কী, আমরাও ওদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই। ওরা তো সবাই খ্রিষ্টান। ওরা আছে ওদের পাদ্রির মুঠোর মধ্যে আর পাদ্রিরা সবাই তো শ্বেতাঙ্গ সরকারের হাতে।"

এই কথা শুনে আমার চোখ খুলে গেল। আমি মনে-মনে বুঝলাম, এভাবে যারা দূরে স'রে আছে কিংবা যাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, তাদেরকে আপন ক'রে ফিরে পেতে হবে। খ্রিষ্টধর্মের এই কি অর্থ যে ঘরের ছেলে পর হয়ে যাবেন! তারা খ্রিষ্টান হয়েছে ব'লে কি আর ভারতীয় নয়—বিদেশী হয়ে গেছে?

কিন্তু আমি তো এখন দেশে ফেরাব মুখে, সুতরাং ভারতীয় খ্রিষ্টানদের বিষয়ে আমার এসব ভাবনা মুখে প্রকাশ করতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকল। আবদুল্লা শেঠকে শুধু

বললাম, "দেখুন এই বিল্ যদি পাস হয়, তাহলে আমাদের ভারি দুরবস্থা হবে। ভারতীয়দের অস্তিত্ব লোপ করার এই হবে ওদের পয়লা কোপ। এই আঘাতটা লাগবে আমাদের আত্মসম্মান বোধের একেবারে গোড়া ঘেঁষে।"

আবদুল্লা শেঠ বললেন, তা হয়তো লাগবে। তাহলে আপনাকে এই ভোটাধিকার ব্যাপারটার গোড়াকার ইতিহাসটা বলি। আমরা এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরে কিছু জানতাম না। আমাদের সবচেয়ে বড়ো এটর্নি এস্‌কম্ব সাহেবকে তো আপনি চেনেন—তিনিই প্রথম ব্যাপারটা আমাদের মাথায় ঢোকান। সেটা কেমন ক'রে ঘটল জানেন। এস্‌কম্ব সাহেব একজন লড়িয়ে মানুষ। বিধানসভায় নির্বাচিত হবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এখানকার জেটি ইঞ্জিনীয়র। সাহেব ভাবলেন, ভোটযুদ্ধে ইঞ্জিনীয়রের সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত হবে। তিনি তখন আমাদের কাছে এসে আমাদের ভোট দেবার অধিকারের কথা বলেন। তাঁর কথায় আমরা সবাই ভোটার তালিকায় আমাদের নিজ-নিজ নাম রেজিস্ট্রি ক'রে ফেললাম ও তাঁকেই ভোট দিলাম। এ থেকে তো আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন, আপনি ভোটাধিকারকে যতখানি গুরুত্ব দেন আমরা তা দিই না। কিন্তু আপনি যা বলতে চাইছেন তা আমরা বুঝতে পারি। বেশ তো বলুন-না এ ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি?"

অন্যসব আমন্ত্রিতেরা আমাদের দু-জনের আলাপ-আলোচনা বেশ মন দিয়ে শুনছিলেন। তাঁদের একজন বললেন, "কী করা যেতে পারে বলব? আসছে স্টিমারে আপনার দেশে পাড়ি দেওয়াটা রদ ক'রে দিন, আরো মাসখানেক এখানে থাকুন আর ব'লে দিন কীভাবে আমাদের লড়তে হবে।"

আর সবাই তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, "জরুর! বেশক! আবদুল্লা ভাই আপনি গান্ধীভাইকে আটকে রাখুন।"

শেঠ তো সেয়ানা লোক, বললেন, "এঁকে আটকাব তেমন আমার সাধ্য নেই, দাবিও নেই। অথবা বলতে পারেন, আমার যতটা দাবি আপনাদেরও ততটাই। তবে আপনারা খুব ঠিক কথা বলেছেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে এখানে থেকে যাবার জন্য ওঁকে অনুরোধ-উপরোধ করি। কিন্তু মনে রাখবেন, ব্যারিস্টরি হ'ল ওঁর জীবিকা। ওঁর ফি-র কী হবে?"

ফি-র প্রসঙ্গ এসে পড়ায় আমি মনে দুঃখ পেলাম, শেঠ আবদুল্লার কথার মাঝখানেই বললাম, "আবদুল্লা শেঠ, এরকম ব্যাপারে ফি-র কোনো কথাই উঠতে পারে না। জনসেবার কাজে আবার ফি কিসের? আমি যদি থেকে যাই, তাহলে আপনাদের সেবকরূপেই থেকে যাব। আর আপনি তো জানেন আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের আমি ঠিক চিনিও না, জানিও না। সে যা-ই হোক্, আপনি যদি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে আমার কাজে এঁরা সহযোগ করবেন, তাহলে আমি আরো মাসখানেক এখানে থেকে যেতে রাজি আছি। তবে একটা কথা ব'লে রাখা ভালো। আপনাদের অবশ্য আমায় কিছু দিতে হবে না। কিন্তু হাতে একটিও পয়সা না-নিয়ে এ ধরনের কাজে নামা ঠিক হবে না। আমাদের তারবার্তা পাঠাতে হতে পারে, কিছু প্রচারপত্র ছাপাতে হতে পারে, এখানে-ওখানে যাতায়াত করতে হতে পারে, স্থানীয় এটর্নিদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে হতে পারে। তাছাড়া, আমি তো

এ দেশের আইনকানুন সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু জানি না, সুতরাং হাতের কাছে কিছু আইনের বইও রাখা দরকার। এসব তো বিনা-পয়সায় হতে পারে না। তাছাড়া একাহাতে এইসমস্ত কাজ করা সম্ভবপর হবে না। অনেক লোককে এগিয়ে এসে এই কাজে মদত দিতে হবে।"

সমবেত কণ্ঠে জবাব এল, "আল্লা হো আকবর, আল্লা মেহেরবান। তাঁর ফজলে পয়সা এসে যাবে—সেদিকে আটকাবে না। আর লোকের কথা বলছেন, বলুন-না কত লোক চান, কত লোক আপনার দরকার। আপনি শুধু থেকে যেতে রাজি হয়ে যান, তাহলে সব কাজ ভালোমতন হয়ে যাবে।"

এইভাবে বিদায়সভা যেন পরিণত হ'ল কার্যসমিতিতে। আমি প্রস্তাব করলাম, ঝট্‌পট্ খানাপিনা সেরে সবাই যেন বাড়ি ফিরে যাই। কীভাবে আন্দোলন গ'ড়ে তোলা যায়—মনে-মনে তার একটা খসড়া ছবি যেন এঁকে নিলাম। জেনে নিলাম, অভ্যাগতদের মধ্যে কার-কার নাম আছে ভোটদাতার তালিকায়। একমাসকাল থেকে যাব, তা-ও ঠিক ক'রে ফেললাম।

এইভাবে ভগবান দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে আমার জীবনযাত্রার ভিত্তি রচনা করলেন এবং সেইসঙ্গে আমার মনের মধ্যে বপন করলেন জাতির আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সংগ্রামের বীজ।

১৭. নাটাল-এ স্থিতি

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে নাটাল-এর ভারতীয় সমাজের নেতা ছিলেন শেঠ হাজি মুহম্মদ হাজি দাদা। ধনদৌলতের দিক থেকে যদিচ শেঠ আবদুল্লা হাজি আদম-এর স্থান ছিল সবার ওপর, তিনি স্বয়ং এবং আর-সকলে দশজনকে নিয়ে কাজকর্মের ব্যাপারে শেঠ হাজি মুহম্মদকে অগ্রণী হিসেবে স্বীকার করতেন। সুতরাং তাঁর সভাপতিত্বে আবদুল্লা শেঠ-এর বাড়িতে একটি সভায় একত্র হয়ে ঠিক করা হ'ল যে ফ্রেঞ্চাইজ বিল্-এর বিরোধিতা করা হবে।

স্বেচ্ছাসেবক তালিকায় অনেকের নাম নেওয়া হ'ল। নাটাল-এ উপজাত ভারতীয়দেরও (এঁদের অধিকাংশ ছিলেন তরুণবয়স্ক ভারতীয় খ্রীষ্টান) এই সভায় যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ডারবান্ কোর্ট-এর দোভাষী মিস্টার পল্ এবং মিশন স্কুলের হেডমাস্টার মিস্টার সুভান গডফ্রে এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের দু-জনের মিলিত চেষ্টার ফলে সভায় বেশকয়েকজন খ্রীষ্টান যুবক যোগ দিয়েছিলেন। এঁরা সকলে স্বেচ্ছাসেবক-তালিকায় নিজেদের নাম লেখালেন।

বলাবাহুল্য, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অনেকেই স্বেচ্ছাসেবক হলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন শেঠ দায়ুদ মুহম্মদ, শেঠ মুহম্মদ কাসম কমরুদ্দীন, শেঠ আদমজী মিঞাখান, এ. কোলান্দাবেল্লু পিল্লাই, সি. লচ্ছীরাম, রঙ্গসামী পড়িয়াচি এবং শেঠ আমদ জীবা। আর পার্শি রুস্তমজী তো ছিলেনই। দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানি ও অন্যান্য

বড়ো-বড়ো কারবারের কেরানীদের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসেছিলেন মানেকজী, জোশী, নরসিংরাম প্রভৃতি। দশজনের সেবার কাজে যোগ দেবার জন্য এঁরা স্বেচ্ছায় নিজেদের নাম লিখিয়েছেন দেখে, এঁরা নিজেরাই যেমন অবাক তেমনি খুশি। এরকম কাজে কেউ যে তাঁদের ডেকে নেবে—এ ঘটনা তাঁদের জীবনে অভূতপূর্ব। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের এই সঙ্কটকালে সবাই যেন উচ্চ-নীচ, ছোটো-বড়ো, মনিব-চাকর, হিন্দু-মুসলমান-পার্সি-খ্রিষ্টান, গুজরাতি-মাদ্রাজি-সিন্ধি প্রভৃতি ভেদাভেদের ভাব ভুলে গিয়েছিল। তাঁরা সকলেই তখন ভারতের সন্তান, মাতৃভূমির সেবক।

ফ্রেঞ্চাইজ বিল্-এর দ্বিতীয় দফা শুনানী তখন শেষ হয়ে গেছে বা শেষ হবার মতন। এইসময় প্রস্তাবের সমর্থনে বিধানসভায় যেসব বক্তৃতা হয়েছিল, তাতে কেউ-কেউ বলেছিলেন যে এরকম একটা কড়া আইন পাশ হতে চলেছে অথচ ভারতীয়দের তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই, প্রতিবাদ নেই—তা থেকেই তো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে তারা ভোটের অধিকার লাভের অযোগ্য।

সেদিনকার অধিবেশনে আমি পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বললাম। গোড়াতেই বিধানসভার স্পীকার-এর কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে আমরা অনুরোধ জানালাম যেন বিল্-এর আলোচনা মুলতবি রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রী স্যর জন রবিন্‌সন্ ও দাদা আবদুল্লার বন্ধু বিধানসভার সদস্য মিস্টার এস্‌কোম্ব-এর কাছেও একইরকম তার পাঠানো হ'ল। স্পীকার সঙ্গে-সঙ্গে জবাব পাঠালেন যে দু-দিনের জন্য বিল্-সংক্রান্ত আলোচনা স্থগিত রাখা হবে। এতে আমরা সবাই খুব খুশি হলাম।

বিধানসভার কাছে যে আবেদন পেশ করা হবে, তার মুসাবিদা তৈরি করা হ'ল। আবেদনপত্রের নকল চাই তিন প্রস্থ, তাছাড়া বাড়তি একটি কপি দরকার হবে সংবাদপত্রে দেবার জন্য। প্রস্তাব হ'ল, যত অধিক সংখ্যায় পারা যায় এই আবেদনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। এদিকে হাতে মাত্র একটি রাত। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ইংরেজিনবিশ যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো বটেই, আরো অনেকে সারা রাত জেগে কাজ করেছিলেন। মিস্টার আর্থার নামে একজন বয়স্ক ভারতীয় খ্রীষ্টান ছিলেন। তাঁর হাতের লেখার ছাঁদ ছিল খুব সুন্দর। তিনিই আবেদনের মূল প্রতিলিপিটি লিখে দেন। অন্য কপিগুলি অন্যেরা লিখে দেন। একজন আর্জির কথাগুলি প'ড়ে যান, আর সবাই শ্রুতলিপির মতো লেখেন। এইভাবে পাঁচ-পাঁচ কপি একইসঙ্গে তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে যেসব ব্যবসায়ীর নিজেদের গাড়ি ছিল, তাঁরা তো সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন আবেদনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করার জন্য। যাঁদের গাড়ি ছিল না তারা গাড়ি ভাড়া ক'রে দিকে-দিকে ছুটলেন। এইভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাজটা সমাধা হয়ে গেল এবং আবেদনপত্রগুলি যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়াও হ'ল। সংবাদপত্রে অনুকূল মন্তব্যসহ আর্জ ছাপা হয়ে বেরুল। বিধানসভার ওপরেও তার প্রভাব গিয়ে পড়ল ও তাই নিয়ে আলোচনাও হ'ল। বিল্-এর সমর্থক যাঁরা ছিলেন তাঁরা আবেদনের যুক্তিগুলি খণ্ডন করার জন্য আজেবাজে বিতর্ক করলেন। কিন্তু তাহলে কী হয়, ভোটাধিক্যে বিল্ পাশ হয়ে গেল।

বিল্ যে পাশ হয়ে যাবে তা আমরা জানতাম। কিন্তু এর ফলে ভারতীয়দের মধ্যে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হ'ল। [illegible] বুঝতে পারল, সম্প্রদায় হিসেবে আমরা এক ও অবিভাজ্য এবং কেবল ব্যবসায়ের স্বার্থে নয়, পরন্তু রাজনীতিক অধিকারের জন্যও আমাদের লড়াই করা কর্তব্য।

সেকালে লর্ড রিপন ছিলেন ইংলন্ডের উপনিবেশ-মন্ত্রী। ঠিক হ'ল হাজার-হাজার লোকের স্বাক্ষরে একটি বিরাট আবেদনপত্র তাঁর কাছে পাঠানো হবে। কাজটা সহজ নয় আর এমন কাজ একদিনেও হবার নয়। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হ'ল। তাঁরা সকলে আপন-আপন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করলেন।

এই আবেদনের খসড়া তৈরি করতে গিয়ে আমায় প্রচুর খাটতে হয়েছিল। এই বিষয়ে যা কিছু পঠনীয় ছিল, সব আমি পড়েছিলাম। আবেদনের মূল যুক্তিটাকে দাঁড় করিয়েছিলাম দুটি ভিত্তির ওপর। এর একটি ছিল সর্বকালীন নীতি, অন্যটি ছিল অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আমি বলেছিলাম, যেহেতু ভারতে আমরা একপ্রকার ভোটের অধিকার পেয়ে থাকি, সুতরাং নাটাল-এও আমাদের সেইপ্রকার অধিকার কায়েম রাখা উচিত। আমার অন্য যুক্তিটা ছিল এই যে যেহেতু নাটাল-এ ভোট দেবার মতো ভারতীয়ের সংখ্যা অতি অল্প, সুতরাং অধিকারটা বহাল রাখলে কোনো ক্ষতি নেই।

এক পক্ষকালের মধ্যে দশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হ'ল। গোটা নাটাল দেশ ঘুরে এতগুলো স্বাক্ষর সংগ্রহ করা চারটিখানি কথা নয়। আপনারা যেন এটাকে খুব সহজ কাজ ব'লে মনে না-করেন। বিশেষ ক'রে মনে রাখবেন, এ কাজ যারা করেছিল, এরকম কাজে সেই তাদের প্রথম হাতেখড়ি। স্থির হয়েছিল, আবেদনের বিষয় পুরোপুরি না-বোঝা পর্যন্ত একটিও যেন স্বাক্ষর সংগ্রহ করা না-হয়। সুতরাং স্বেচ্ছাসেবক বাছা হয়েছিল বেশ ভেবেচিন্তে। গ্রামগুলো ছিল দূরে-দূরে ছড়ানো। অনেকগুলি কর্মী যদি সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে এ কাজে নামে, তবেই কাজটা সত্বর সম্পন্ন করা যায়। কাজ যারা করেছিল তারা নিবেদিতচিত্ত হয়েই করেছিল। যাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছিল, তিনি সে কাজ পরম উৎসাহে করেছিলেন। এইসব কথা বলতে গিয়ে যাদের চেহারা এখনো আমার চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে ওঠে তাঁরা হলেন শেঠ দায়ুদ মুহম্মদ, রুস্তমজী, আদমজী মিঞাখান আর আমদ জীবা। এঁরাই সবচেয়ে বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন। দায়ুদ শেঠ তো সারাদিন গাড়ি চেপে বাড়ি-বাড়ি ঘুরতেন। এঁরা সবাই যেন কাজ করেছিলেন তাঁদের প্রাণের তাগিদে, একটা পয়সাও খরচখরচা ব'লে চাইতে আসেননি। দাদা আবদুল্লার বাড়ি একাধারে সরাইখানা ও সরকারি দফতরে পরিণত হয়েছিল। যেসব লেখাপড়া-জানা বন্ধুরা আমার কাজে সহায়তা করতেন, তাঁরা ওই বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া সেরে নিতেন। তাই এ কাজে যাঁরা মদত দিতে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের সকলকেই মোটা টাকা খরচ করতে হয়েছিল।

শেষপর্যন্ত আবেদনপত্র তো পেশ করা হ'ল। প্রচারের জন্য ও হাতে-হাতে বিতরণের জন্য এক হাজার কপি ছাপিয়ে নেওয়া হ'ল। ভারতের জনসমাজে এই আবেদনের সূত্রে নাটাল-এর অবস্থা বিষয়ে প্রথম ওয়াকিফহাল হলেন। ভারতের যেসব খবরকাগজ বা

সাংবাদিকদের নাম আমার জানা ছিল, তাদের সকলের কাছেই এই আর্জির ছাপা কপি পাঠানো হয়।

দি টাইমস্ অব ইন্ডিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে ভারতীয়দের দাবি জোরালো ভাষায় সমর্থন করেন। আবেদনের নকল বিলেতি কাগজে ও বিলেতের বিভিন্ন পার্টি নেতাদের কাছেও পাঠানো হয়। লন্ডনের *টাইমস্* কাগজও আমাদের দাবি সমর্থন করেন। এ থেকে আমাদের মনে খুব আশা হয় যে বিল্ নাকচ হয়ে যাবে।

এই অবস্থায় আমার নাটাল ছাড়ার উপায় ছিল না। চারিদিক থেকে ভারতীয় বন্ধুরা আমায় ছেঁকে ধরলেন, আমি যেন স্থায়ীভাবে নাটাল-এই থেকে যাই। আমার নানা অসুবিধার কথা আমি তাঁদের বললাম। আমি মনে-মনে স্থির ক'রে রেখেছিলাম, নিজের জীবিকার জন্য দশজনের কাছে হাত পাতব না। নিজের থাকার জন্য আলাদা বাসস্থান পত্তন করা উচিত হবে ব'লে মনে হ'ল। ভাবলাম, ভালো পল্লিতে ভালো বাড়ি নিতে হবে। তাছাড়া মনে হ'ল, ব্যারিস্টর হয়ে যদি ব্যারিস্টরি চালে না-থাকি তাহলে নাটাল-এ ভারতীয়দের মানমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ভেবে দেখলাম, বছরে তিনশো পাউন্ড-এর কমে ওইরকম ঠাট বজায় রাখা সম্ভবপর হবে না। সুতরাং আমি স্থির করলাম, নাটাল-এর ভারতীয় সম্প্রদায় যদি ওই পরিমাণ টাকার ওকালতি কাজ আমায় দেবে ব'লে নিশ্চিতি দেয়, তাহলেই আমি থেকে যেতে পারি। আমার এই সিদ্ধান্ত তাদের সবাইকে জানালাম।

তাঁরা বললেন, "সে কী কথা! আমাদের তো ইচ্ছা যে এ টাকা আপনি জনসেবার কাজে নিযুক্ত আছেন ব'লে নেবেন। আর এই ক-টি টাকা আমরা অনায়াসেই তুলে দিতে পারব। ওকালতির জন্য ফি বাবদ আপনি যে টাকা পাবেন তার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই, সে টাকা তো আপনার নিজস্ব।"

আমি বললাম, "না, দশের জন্য আমি যে কাজ করব তার দরুণ আপনাদের কাছ থেকে পয়সা নিতে পারব না। এ কাজে তো আমায় খুব বেশি ব্যারিস্টরি বুদ্ধি খাটাতে হবে না। আমার মোদ্দা কাজটা হবে আপনাদের সকলের কাছ থেকে কাজ আদায় করা। তার বদলে পয়সা নেব কী ক'রে? তাছাড়া, জনসেবার কাজে অনেকসময় এমনিতেই তো আপনাদের কাছে হাত পাততে হবে। নিজের জীবিকার টাকা যদি আপনাদের কাছ থেকে নিই তাহলে দশের কাজে আপনাদের কাছে মোটা টাকা চাইতে আমার সঙ্কোচ হবে। তাহলে শেষ পর্যন্ত কাজটাই থেমে যাবে। তাছাড়া দশের কাজের জন্য আমি এখানকার ভারতীয়দের কাছ থেকে বছরে তিনশো পাউন্ডের বেশিই হয়তো চাইব।"

"কিন্তু এখন তো বেশ কিছুকাল ধ'রে আপনাকে চিনেছি, জেনেছি। আমরা নিশ্চিত জানি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা আপনি কিছুতেই নেবেন না। আপনাকে যদি আমরা এখানে রেখে দিতে চাই, তাহলে আপনার খরচের ভারটাও আমাদের নেওয়া উচিত নয় কি?

"আপনারা আমাকে স্নেহ করেন। সেই স্নেহের টানে এবং সাময়িক উৎসাহের বশে আজ আপনারা এরকম কথা বলছেন। এই প্রীতি ও আবেগ যে চিরস্থায়ী হবে, সে কি নিশ্চয় ক'রে বলা যায়? আপনাদের সুহৃদ্ ও সেবকরূপে হয়তো মাঝে-মাঝে আপনাদের আমায়

কড়া কথাও শোনাতে হতে পারে। তখনো আমার প্রতি আপনাদের এই টান অটুট থাকবে কি-না ভগবানই জানেন। আসল কথা, জনহিতকর কাজের জন্য বেতন নিতে আমার আদৌ ইচ্ছে নেই। আপনারা আপনাদের ওকালতির কাজ আমার হাতে ন্যস্ত করেন তো তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তাও হয়তো আপনাদের পক্ষে শক্ত হবে। আমি তো সাহেব ব্যারিস্টর নই—কোর্ট আমার কথায় কান দেবে কি-না কী ক'রে বলব? তাছাড়া আমি নিশ্চয় ক'রে বলতেও পারি না ওকালতিতে আমি কতখানি কৃতকার্য হব। সুতরাং আপনাদের উকিল হিসেবে বহাল রাখার জন্য আমায় যদি একটা ফি আগাম দেন, তাহলে আপনাদের টাকা জলে পড়বে কি-না কে বলবে। যদি এরকম ফি দেনই তাহলে বুঝব এ আমার জনহিতকর কাজে যোগ দেবার পুরস্কার।

এই আলোচনার ফলে জনাবিশেক ব্যবসায়ী আমায় একবছর ধ'রে তাঁদের ওকালতি করার জন্য বায়না দিলেন। এছাড়া দাদা আবদুল্লা বিদায় দক্ষিণা হিসেবে আমায় যে টাকা দেবেন ভেবেছিলেন, তাই দিয়ে আমার বাড়ির জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

এইভাবে আমি নাটাল-এ থেকে যাই।

১৮. বর্ণের বাধা

আদালতের প্রতীক চিহ্ন হ'ল তুলাদণ্ড—একজন নিরপেক্ষ চক্ষুহীনা জ্ঞানবৃদ্ধা নারী দৃঢ় হাতে নিক্তি ধ'রে ব'সে আছেন। তিনি যেন বাইরের আকৃতি দেখে বিচার না-করেন পরন্তু গুণাগুণ ওজন ক'রে বিচার করেন, এইজন্যই যেন বিধাতা ইচ্ছা ক'রে এই প্রতীকের চক্ষু হরণ করেছেন। কিন্তু নাটাল-এর ব্যবহারজীবীরা তাঁদের সঙ্ঘ থেকে কোমর বেঁধে চেষ্টা করেছিলেন যাতে সেখানকার সুপ্রীম কোর্টকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ন্যায়বিচারের এই মূলনীতি লঙ্ঘন ক'রে প্রতীক চিহ্নটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্ট-এ এডভোকেটরূপে প্রবেশলাভের জন্য আমি দরখাস্ত পেশ করেছিলাম। আমার কাছে বোম্বাই হাইকোর্ট-এর অভিজ্ঞানপত্র ছিল। সেখানে আমার নাম এডভোকেট তালিকাভুক্ত করার জন্য বিলেতের অভিজ্ঞানপত্র জমা দিতে হয়েছিল। প্রবেশলাভের দরখাস্তের সঙ্গে চরিত্র বিষয়ে দুখানি সুপারিশপত্র সংলগ্ন করার প্রয়োজন ছিল। আমার ধারণা হয়েছিল, এই দুটি যদি ইউরোপীয়দের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে দিতে পারি, তাহলে তার মূল্য বেশি হবে। আবদুল্লা শেঠ-এর সূত্রে পরিচয় হয়েছিল এমন দু-জন নামজাদা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নিয়ে দুটি সুপারিশপত্র দাখিল করি। দরখাস্ত পেশ করতে হ'ত কোনো এডভোকেট মারফৎ এবং সচরাচর এটর্নি জেনারেল এ কাজটা করতেন কোনো ফি না-নিয়েই। মিস্টার এস্‌কোম্ব ছিলেন এটর্নি জেনারেল। ইতিপূর্বেই তো বলেছি, তিনি ছিলেন

দাদা আবদুল্লা কোম্পানির আইন উপদেষ্টা। তাঁর সঙ্গে আমি দেখা ক'রে সব কথা বললাম, তিনি বেশ খুশি হয়েই আমার দরখাস্ত দাখিল করবেন ব'লে জানালেন।

আগের থেকে কোনো কিছু না-ব'লে, আমায় হতচকিত ক'রে দেবার জন্যই যেন ব্যবহারজীবীসঙ্ঘ আমার দরখাস্তের বিরোধিতা ক'রে আমার নামে এক নোটিস জারি করলেন। তাঁদের আপত্তির অন্যতম কারণ ছিল এই যে আমার দরখাস্তের সঙ্গে বিলেতের মূল অভিজ্ঞানপত্রটি সংলগ্ন করা হয়নি। কিন্তু আসলে তাঁদের আপত্তি ছিল অন্যরকম। আদালতে এডভোকেটরূপে প্রবেশ করার জন্য যখন নিয়মাবলি রচিত হয়, তখন ভেবে দেখা হয়নি যে কস্মিনকালে শ্বেতাঙ্গ ছাড়া আর কেউ দরখাস্ত পেশ করতে পারে। সাহেবদের উদ্যমেই নাটাল দেশ গ'ড়ে উঠেছে ও সমৃদ্ধ হয়েছে। সুতরাং আদালতে তাঁদের প্রাধান্য রক্ষিত হওয়া একান্ত দরকার। কালো আদমিরা একবার যদি প্রবেশাধিকার পায় তাহলে কালে তারাই শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় মাথা গুণতিতে বেশি হয়ে যেতে পারে। পার্থক্যের দেওয়াল তুলে এতদিন তাঁরা তাঁদের প্রাধান্য রক্ষা ক'রে এসেছেন। সেই প্রাচীর এখন যদি ভেঙে যায়!

ব্যবহারজীবীসংঘ তাঁদের বিরোধিতা যে আইনসঙ্গত সেই কথা প্রমাণের জন্য একজন বিশিষ্ট উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। দাদা আবদুল্লা কোম্পানির সঙ্গে এই ভদ্রলোকেরও সম্পর্ক ছিল। দাদা আবদুল্লা মারফৎ তিনি খবর পাঠান যেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বেশ খোলাখুলিভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করেন ও আমার পূর্ববৃত্তান্ত সব-কিছু জানতে চাইলেন। আমার কাছ থেকে সব কথা শুনে তিনি বললেন :

"দেখুন, আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নেই। আমার কেবল এই আশঙ্কা হয়েছিল যে দরখাস্তকারী হয়তো উপনিবেশে জন্মেছে, এমন কোনো জাঁহাবাজ লোক হবেন। আপনার দরখাস্তের সঙ্গে বিলেতের মূল সার্টিফিকেট না-থাকায় আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হয়েছিল। এমনও লোক দেখেছি যারা অন্য লোকের ডিপ্লোমা নিজের ব'লে চালিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আপনার চরিত্র বিষয়ে যে সুপারিশপত্র পেশ করেছেন আমার কাছে তার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। তাঁরা আপনার বিষয়ে কী জানেন, কতটুকু জানেন? আর তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ই-বা কতদিনের ও কতখানি?"

আমি বললাম, "এখানে তো সকলেই আমার অচেনা, অজানা। এমন-কি শেঠ আবদুল্লার সঙ্গে পরিচয়ও আমার এখানেই ঘটেছে।"

"কিন্তু আপনি তো বললেন, আপনারা একই মুলুকের লোক। আপনার বাবা যদি সে দেশের দেওয়ান থেকে থাকেন তাহলে শেঠ আবদুল্লা নিশ্চয়ই আপনাদের পরিবার পরিজনকে জানবেন। আপনি যদি তাঁর কাছ থেকে সেইধরনের একটি এফিডেভিট জোগাড় করতে পারেন, তাহলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। আমি তাহলে খুশি হয়ে ব্যবহারজীবীসঙ্ঘকে জানিয়ে দেব যে আমার দ্বারা আপনার আবেদনপত্রের বিরোধিতা করা সম্ভবপর হবে না।"

এইসব কথা শুনে আমি রাগে জ্ব'লে উঠলাম। কিন্তু রাগ দমন ক'রে মনে-মনে বললাম,

"দাদা আবদুল্লার সুপারিশ যুক্ত ক'রে দিতাম যদি, তাঁরা তখন বলতেন, শ্বেতাঙ্গের সুপারিশ না-হ'লে চলবে না। আমার জন্ম ও পূর্ববৃত্তান্তের সঙ্গে আমার এডভোকেট হয়ে প্রবেশাধিকারের কী সম্বন্ধ? আমার মা-বাবার সম্বন্ধে আপত্তিকর কিছু যদি থাকত, তাঁরা যদি অর্থে কিংবা বংশগৌরবে খাটো হতেন, তাহলেই-বা কেমন ক'রে তা আপত্তিকর হ'ত?" আমি নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরভাবে জবাব দিলাম : "এইসমস্ত কথা জানতে চাওয়ার অধিকার আইনজীবীসঙ্ঘের আছে ব'লে আমি যদিচ মানি না, তবে আপনার কথামতো এফিডেবিট পেশ করতে আমি প্রস্তুত।"

শেঠ আবদুল্লার এফিডেবিট তৈরি হ'ল। সঙ্ঘের উকিলের হাতে সেটি দেওয়া হ'ল। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলে কী হয়, আইনজীবীসঙ্ঘ খুশি হলেন না। উল্‌টে তাঁরা সুপ্রীম কোর্টের কাছে আমার আবেদনের বিরোধিতা করলেন। মিস্টার এস্‌কোম্ব-কে জবাব দিতে না-ডেকেই কোর্ট সঙ্ঘের আপত্তি অগ্রাহ্য করলেন। প্রধান বিচারপতি এই মর্মে রায় দিলেন : "মূল অভিজ্ঞানপত্র আবেদনের সঙ্গে পেশ করা হয়নি—এই আপত্তির পিছনে কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। ইনি যদি মিথ্যা এফিডেবিট দিয়ে থাকেন তাহলে তো এঁর নামে মোকদ্দমা আনা যেতে পারে। আর দোষী সাব্যস্ত হ'লে এডভোকেট-তালিকা থেকে এঁর নাম কেটে দেওয়া যায়। আইনের চোখে শাদা-কালোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং মিস্টার গান্ধীকে এই আদালতের এডভোকেট-তালিকায় ঢুকতে না-দেবার কোনো অধিকার এই আদালতের নেই। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হ'ল। মিস্টার গান্ধী আপনি এবার শপথ গ্রহণ করতে পারেন।"

আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম ও কোর্ট-এর রেজিস্ট্রার-এর কাছে শপথ গ্রহণ করলাম। শপথ গ্রহণ শেষ হতেই প্রধান বিচারপতি আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন : "আপনাকে এবার আপনার পাগড়িটা খুলে রাখতে হয়। এই আদালতে অন্য যেসব ব্যারিস্টর প্র্যাক্‌টিস্ করেন, তাঁরা যেমন পরিচ্ছদ ধারণ করেন, আপনাকেও তাই করতে হবে।"

কোথায় যে সীমারেখা টানতে হয়, সেকথা আমি বুঝলাম। ডারবান্-এর ম্যাজিস্ট্রেট্-এর কাছারিতে আমি যে পাগড়ি খুলিনি, সুপ্রীম কোর্ট-এর প্রধান বিচারপতির আদেশে তা খুলতে হ'ল। আমি এই আদেশের যদি বিরুদ্ধতা করতাম, আমার আপত্তি যে অযৌক্তিক হ'ত এমন নয়। কিন্তু আমি ভাবলাম, এর চেয়ে বৃহত্তর সংগ্রাম যখন আসবে, তার জন্য শক্তি সঞ্চয় ক'রে রাখা ভালো। যুদ্ধবিদ্যায় আমার সমস্ত কৌশল মাথার পাগড়িটুকুর খাতিরে নিঃশেষ করতে চাইনি। আরো বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ করা ভালো।

আদালতের হুকুম এভাবে মেনে নেওয়ায় শেঠ আবদুল্লা ও অন্য বন্ধুরা খুব খুশি হননি। তাঁরা ভাবলেন, এ হয়তো আমার দুর্বলতা কিংবা নিছক নতিস্বীকার। তাঁরা ভেবেছিলেন, ব্যারিস্টাররূপে প্র্যাক্‌টিস্ করতে গিয়েই আমার পাগড়ি পড়ার দাবি আঁকড়িয়ে থাকা উচিত ছিল। আমি তাঁদের বুঝিয়ে বলার খুব চেষ্টা করলাম, বললাম, "প্রবচনে একটি কথা আছে 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ', ইংরেজিতেও বলে রোম-এ গেলে রোমান্-এর মতো আচরণ করো।" আরো বললাম, "কোনো ইংরেজ অফিসার বা জজ যদি ভারতে ব'সে বলেন

ভারতীয়কে পাগড়ি খুলতে, তাহলে সে হুকুম অমান্য করা যায়। কিন্তু নাটাল আদালতের এডভোকেট হয়েও যদি আমি নাটাল আদালতের রেওয়াজ লঙ্ঘন করি, তাহলে সেরকম আচরণ আমার শোভা পায় না।"

এইসব যুক্তি ও অন্যান্য অনুরূপ যুক্তি দিয়ে আমি এসব বন্ধুদের কিছুপরিমাণে শান্ত করেছিলাম ঠিকই। কিন্তু একই জিনিস ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় বিশেষ-বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে দেখা দরকার—এই নীতিটা তাঁদের কাছে পরিষ্কার করতে পেরেছিলাম কি-না জানি না। সে যা-ই হোক্, নিছক সত্যের ওপর জোর দিতে গিয়ে আমি জীবনের প্রতিপদে শিখেছি যে আপসের মধ্যেও একটা সৌন্দর্য আছে। পরবর্তী জীবনে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, এই আপসের মনোবৃত্তি হ'ল সত্যাগ্রহেরই একটা সার অংশ। এই আপস করতে গিয়ে আমি বন্ধুদের বিরাগভাজন হয়েছি, কখনো-বা আমার জীবনও বিপন্ন হয়েছে। কিন্তু সত্য হ'ল 'বজ্রাদপি কাঠোরানি মৃদুনি কসুমাদপি'!

আইনজীবীসঙ্ঘের এই বিরোধিতার ফলে, আরেক দফা দক্ষিণ আফ্রিকাময় আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক কাগজ এই বিরোধিতার নিন্দা করেছিলেন ও বলেছিলেন, যে সঙ্ঘ হিংসা-প্রণোদিত হয়ে এই কাজ করেছিল। এই দেশময় প্রচারকাজের ফলে আমার নিজের কাজ অনেক অংশে সহজ হয়েছিল।

১৯. নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস

আইনের ব্যবসা কোনোকালে আমার পক্ষে মুখ্য কাজ হয়ে ওঠেনি, চিরকালই গৌণ থেকে গেছে। যে কাজের জন্য আমি নাটালে থেকে গেলাম, সে হ'ল জনসেবার কাজ। মনে-প্রাণে এ কাজে লেগে যাবার জন্য একটা তাগিদ এসেছিল। ভোটের অধিকার থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করার সেই বিল্-এর বিরুদ্ধে শুধু দরখাস্ত পাঠানোই তো যথেষ্ট নয়। বিলেতের উপনিবেশ-মন্ত্রীর মনে যাতে বেশ-একটু দাগ কাটে—সেইরকম আন্দোলন অব্যাহত চালিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। মনে হ'ল, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হ'লে একটি স্থায়ী সংস্থা গ'ড়ে তোলা অবশ্যকর্তব্য। শেঠ আবদুল্লা ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আমরা সবাই মিলে স্থির করলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকা-স্থিত ভারতীয়দের জন্য একটি স্থায়ী গণ-প্রতিষ্ঠান পত্তন করতে হবে।

এই প্রতিষ্ঠানের কী নাম দেওয়া যায় তাই নিয়ে আমায় খুব মাথা ঘামাতে হয়। সংস্থাটি যে পার্টি অথবা দল-নিরপেক্ষ হবে সে বিষয়ে আমরা সবাই একমত ছিলাম। আমি জানতাম, বিলেতের রক্ষণশীল অর্থাৎ কন্‌জারভেটিভ দলের কানে 'কংগ্রেস' নামটা কটু শোনাত, অথচ কংগ্রেসই ছিল ভারতের প্রাণ। নাটাল-এ যাতে ওই নামটি জনপ্রিয় হয়, সেজন্য আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ওই নাম গ্রহণে ইতস্তত করাটা ভীরুজনোচিত হবে। সুতরাং আমার

প্রস্তাবের সপক্ষে সবরকম যুক্তি পেশ ক'রে আমি বললাম, আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হোক্ 'নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস'। বাইশে মে তারিখে নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস-এর জন্ম হ'ল।

সেদিন দাদা আবদুল্লার বিরাট ঘরে তিলধারণের জায়গা ছিল না। উপস্থিত সকলে পরম উৎসাহে কংগ্রেস নামটি অনুমোদন করল। কংগ্রেস-এর সংবিধান ছিল সাদাসিধে, কিন্তু চাঁদা ধার্য হয়েছিল মোটা অঙ্কের। প্রতিমাসে পাঁচ শিলিং চাঁদা যাঁরা দেবেন, কেবল তাঁরাই হবেন এই সংস্থার সদস্য। অপেক্ষাকৃত ধনী যাঁরা, তাঁদের অনুরোধ করা হয়েছিল নির্দিষ্ট হারের বেশি চাঁদা দিতে যেন কার্পণ্য না-করেন, যাঁর যথাসাধ্য যেন দেন। আবদুল্লা শেঠ প্রতিমাসে দু-পাউন্ড চাঁদা দেবেন ব'লে সবার প্রথম তালিকায় তাঁর নাম সই করলেন। দেখাদেখি আরো দু-জন বন্ধু ওই হারে চাঁদা দেবেন ব'লে রাজি হলেন। আমি দেখলাম, চাঁদার ব্যাপারে আমারও কৃপণতা করা সাজে না—তাই আমি নিজের নামে লিখলাম প্রতিমাসে এক পাউন্ড। আমার পক্ষে এক পাউন্ড ছিল অনেকগুলি টাকা। তবে আমার মনে হ'ল, যদি আমার সংসার-খরচ আমি নির্বাহ ক'রে যেতে পারি, তবে মাসে এক পাউন্ড চাঁদা দেওয়া হয়তো আমার সাধ্যের অতিরিক্ত হবে না। ভগবান আমার সহায় হয়েছিলেন। আমার দৃষ্টান্তে বেশ কয়েকজন সদস্য মাসিক এক পাউন্ড চাঁদা দেবেন ব'লে নাম সই ক'রে দিলেন। মাসিক দশ শিলিং দেবার মতো সভ্য হয়েছিল আরো অধিকসংখ্যায়। চাঁদা ছাড়াও দানস্বরূপ যা-কিছু পাওয়া গেল ধন্যবাদ-সহ গৃহীত হ'ল।

কার্যক্ষেত্রে নামতে গিয়ে দেখা গেল, নিছক চাইলেই প্রতিশ্রুত চাঁদা লোকে দিত না। যেসব সদস্য ডারবান্-এর বাইরে বসবাস করতেন, তাঁদের দরজায় তো ঘন-ঘন হানা দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। দপ্ ক'রে যে উৎসাহ জ্ব'লে উঠেছিল, মনে হ'ল তা যেন দপ্ ক'রেই নিবে যাবে। এমন-কি ডারবান্-স্থিত সদস্যদের কাছ থেকেও একাধিকবার গতায়াত করার পর চাঁদা আদায় হতে লাগল।

চাঁদা আদায়ের ভার ছিল আমার ওপর, কারণ আমি ছিলাম নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস-এর সেক্রেটারি। একটা সময় এল যখন আমার অফিসের মুহুরিকে সারাদিন এই চাঁদা আদায়ের কাজে লেগে থাকতে হ'ত। বেচারা হাঁপিয়ে উঠল কিছুদিন পর। আমি তখন বুঝলাম যে এই দুরবস্থা যদি ঘোচাতে হয় তাহলে একমাত্র উপায় হ'ল মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা তুলে দিয়ে বার্ষিক চাঁদার ব্যবস্থা করা। উপরন্তু এই বার্ষিক চাঁদা আগাম দিতে হবে। কংগ্রেস-এর একটি সভা ডাকলাম। প্রস্তাব হ'ল, মাসিক চাঁদার পরিবর্তে বার্ষিক চাঁদার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং ন্যূনতম বার্ষিক চাঁদার হার হবে তিন পাউন্ড। এই প্রস্তাব সকলেই খুশি হয়ে মেনে নিলেন, চাঁদা আদায়ের কাজটাও অনেকখানি সহজ হ'ল।

গোড়া থেকেই আমি বুঝেছিলাম, ধার-করা টাকায় জনসেবার কাজ হয় না। এক টাকা-পয়সার ব্যাপারে ছাড়া অন্য অনেক ব্যাপারে লোকের কথায় বিশ্বাস করা যায়। প্রতিশ্রুত চাঁদা লোকে চট্‌পট্ বের ক'রে দেয়—এমনটা আমি কখনও দেখিনি। নাটাল-এর ভারতীয়দের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে এমনটা আশা করাই ভুল। এসমস্ত দেখেশুনে আমি

স্থির করি, হাতে টাকা না-আসা পর্যন্ত কোনো কাজ নেওয়া হবে না। এর ফলে নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস-কে কখনো দেনার দায়ে পড়তে হয়নি।

আমার সহকর্মীরা সবাই সদস্য সংগ্রহের কাজে উঠে-প'ড়ে লাগলেন। এ কাজে তাঁদের আগ্রহ ছিল নিশ্চয় ; এ-কাজ ক'রে তাঁরা মহামূল্য অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছিলেন ঢের। অনেকে এগিয়ে এসে নগদ চাঁদা জমা দিয়ে সদস্য হয়েছিলেন, তাঁদের কিছু বলতেও হয়নি। প্রত্যন্ত গ্রামে, দূরে-দূরে যেসব ভারতীয় ছিল, তাদের মধ্যে কাজ করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া দশজনের সেবার কাজে অনেকেরই পক্ষে ছিল এই প্রথম হাতেখড়ি। তবু দূর-দূর অঞ্চল থেকে আমাদের ডাক আসত। সেইসব জায়গার বড়ো-বড়ো বেপারীরা আমাদের থাকা খাওয়ার সবরকম ব্যবস্থা ক'রে দিতেন।

এইভাবে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে একটা শক্ত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। যাঁর বাড়িতে আমরা অতিথি হয়েছিলাম, সেই বেপারী ব'লে বসলেন, তিনি তিন পাউন্ডের বেশি একটি পয়সাও চাঁদা দেবে না। অথচ আমরা আশা করেছিলাম, তাঁর কাছ থেকে ছ-পাউন্ড আদায় হবে। তাঁর কাছ থেকে যদি কম আদায় হয়, তাহলে অন্যেরাও বেঁকে বসবেন, ফলে আমাদের চাঁদা আদায় আশানুরূপ হবে না। তখন বেশ রাত, আমাদের খিদেও পেয়েছিল বেশ। কিন্তু যত টাকা সংগ্রহের জন্য আমরা সবাই কোমর বেঁধে এসেছিলাম, সে টাকা হাতে না-পেলে ভোজনে রুচি হবে কেমন ক'রে? সব অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হ'ল, ভদ্রলোক অনড় অটল হয়ে রইলেন। সে অঞ্চলের অন্য-অন্য বেপারীরা তাঁকে অনেক বোঝালেন। সারারাত ধ'রে তর্ক-বিতর্ক চলল। তিনিও নড়বেন না, আমরাও নাছোড়বান্দা। আমার বেশিরভাগ সহকর্মী রাগে ও খিদেতে জ্বলছিলেন। অনেক কষ্টে তাঁরা নিজেদের মেজাজ সামলে রাখলেন। শেষে যখন ভোর হয়-হয়, তিনি হার মানলেন। ছ-পাউন্ড চাঁদা কবুল ক'রে তখন আমাদের ভূরিভোজে আপ্যায়ন করলেন। ব্যাপারটা ঘটেছিল টৌঙ্গাট অঞ্চলে, কিন্তু এর জের গিয়ে পৌঁছেছিল উত্তর উপকূলের স্টেঙ্গর ও প্রত্যন্তবর্তী চার্লস্ টাউন্ অবধি। এর ফলে চাঁদা সংগ্রহের কাজ সহজতর হয়।

কিন্তু টাকা সংগ্রহ তো আমাদের একমাত্র কাজ নয়। তাছাড়া, আমি ইতিপূর্বেই একটি নীতি মেনে নিয়েছি যে কাজ যদি করতে হয় তাহলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা হাতে রাখতে নেই।

মাসে একবার তো বটেই, দরকার হ'লে সপ্তাহেও একবার সভা ডাকা হ'ত। সভায় পূর্ব-অধিবেশনের প্রতিবেদন পড়া হ'ত, নানা প্রশ্নের আলোচনাও হ'ত। পূর্ব-অভিজ্ঞতা না-থাকায় সদস্যেরা সভায় ব'সে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতে পারত না, অল্পকথায় সাজিয়ে-গুছিয়ে নিজেদের বক্তব্যও বলতে পারত না। উঠে দাঁড়িয়ে যে কিছু বলবে তাতে সকলেরই সঙ্কোচ ছিল। সভার কাজ কীরকম নিয়ম-পদ্ধতি অনুসারে চলবে, তা আমি বিশদভাবে বলেছিলাম। তারা সেসব মেনে চলত। তারা বুঝেছিল, এটা তাদের পক্ষে শিক্ষা-বিশেষ। যারা আর-পাঁচজনের সামনে কখনোই মুখ খুলে কিছু বলেনি, তাদের মধ্যে

অনেকে অল্পদিনের মধ্যে প্রকাশ্য সভায় পাঁচজনের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে এমন-কি বক্তৃতা দিতেও বেশ পটু হয়ে গেলেন।

দশজনের কাজে ছোটোখাটো খরচ-খরচার ব্যাপারে অনেকসময় বেশ মোটা টাকা বেরিয়ে যায়—এ আমার জানা ছিল। তাই গোড়ায় তো আমি রশিদ বই পর্যন্ত ছাপিয়ে নিতে চাইনি। আমার অফিসে সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিল। তাতে আমি রশিদ ছাপিয়ে নিতাম। বিভিন্ন সভার প্রতিবেদনও এইভাবে ছাপাতাম। কংগ্রেস-এর তহবিলে যখন বেশ পয়সা জমল, সদস্যসংখ্যা অনেক বাড়ল এবং কাজকর্মও বাড়ল—কেবল তখনই এইরকমসব কাগজপত্র আমি ছাপাখানায় ছাপিয়ে নিতে শুরু করি। জনসাধারণের সংস্থামাত্রেরই উচিত মিতব্যয়ী হওয়া, কিন্তু সবাই খরচের ব্যাপারে তেমন সতর্ক থাকে না, দেখতে পাই। তাই আমার মনে হ'ল, একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো কিন্তু ক্রমবর্ধমান সংস্থার সূচনা কীভাবে হ'ল, তার খুঁটিনাটি বিবরণ লোকসমক্ষে গোচর করা ভালো।

লোকে যে টাকা দিত তার রশিদ চাইত না, কিন্তু আমরা প্রায় জোর ক'রেই রশিদ দেওয়াতাম। এইভাবে প্রত্যেকটি পাই-পয়সার পর্যন্ত হিসেব ঠিকঠাক রাখা হ'ত। তাই আমি বেশ সাহস ক'রে বলতে পারি যে যদি নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস-এর নথিপত্র আজ অবধি ঠিকঠাক থেকে থাকে, তাহলে যে কেউ আজও যাচাই ক'রে নিতে পারেন ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের জমাখরচের হিসেব কেমন নিখুঁতভাবে রাখা হয়েছিল। সযত্ন-রক্ষিত হিসাবপত্র হ'ল যে-কোনো সংস্থার অপরিহার্য কৃত্য-বিশেষ। এই কৃত্যে অবহেলা ঘটলে সেই সংস্থার সুনাম নষ্ট হয়। শুদ্ধ হিসাব যদি রাখা না-হয় তাহলে সত্যের শুদ্ধতা রক্ষা করা যায় না।

কংগ্রেস-এর অন্যতম কাজ ছিল আফ্রিকায় উপজাত লেখাপড়া-জানা ভারতীয়দের সেবা। সেইজন্য কংগ্রেস-এর আওতায় 'দি কলোনিয়াল-বর্ণ ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল এসোসিয়েশন' নামে একটি সংস্থার পত্তন করা হয়। এই সংস্থার অধিকাংশ সভ্য ছিলেন সেইসব লেখাপড়া-জানা তরুণ। নামমাত্র চাঁদা দিয়ে এঁরা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হতে পারতেন। এসোসিয়েশন-এর কাজ ছিল সভ্যদের অভাব-অভিযোগ দশজনের কাছে তুলে ধরা, সভ্যদের বিচার-বিবেচনার বৃদ্ধিসাধন করা, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া, ও নিজ সম্প্রদায়ের সেবাকর্মে তাদের সুযোগ দান করা। এই এসোসিয়েশন ছিল অনেকটা ছাত্রদের বিতর্কসভার মতন। সভ্যেরা নিয়মিত মিলিত হতেন ও বিভিন্ন বিষয়ে হয় বক্তৃতা দিতেন কিংবা লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করতেন। এসোসিয়েশন-এর কাজের সুবিধার জন্য একটি ছোটোখাটো গ্রন্থাগার পত্তন করা হয়।

কংগ্রেস-এর তৃতীয় দফা কাজ ছিল প্রচারকার্য। নাটাল-এ ভারতীয়দের প্রকৃত অবস্থা যে কী—সে কথা দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ ও বিলেতের ইংরেজ এবং ভারতের জনসাধারণকে জানানো ছিল এই প্রচারের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে আমি দুটি পুস্তিকা প্রস্তুত করেছিলাম। একটির নাম ছিল 'An Appeal to Every Briton in South Africa', 'দক্ষিণ আফ্রিকা-নিবাসী ইংরেজদের কাছে নিবেদন'। এই পুস্তিকায় নানারকম সাক্ষ্যপ্রমাণ-সহ নাটাল-এ ভারতীয় সাধারণের প্রকৃত অবস্থা যে কী—তার একটি বর্ণনা দিয়েছিলাম। অন্য

পুস্তিকাটির নাম ছিল 'The Indian Franchise – An Appeal' অর্থাৎ 'ভারতীয়দের ভোটাধিকার বিষয়ে নিবেদন।' এ বইটি ছিল নাটাল ভারতীয়দের ভোটাধিকার বিষয়ে, সাক্ষ্যপ্রমাণাদি-সহ একটি সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস। বহু পরিশ্রম ও বিস্তর পড়াশুনা ক'রে এই পুস্তিকাদুটি প্রস্তুত করেছিলাম। যেমন খেটেছিলাম, তেমনি ফলও পাওয়া গিয়েছিল হাতে-হাতে। দুটি বইয়েরই বহুল প্রচার হয়েছিল।

এইসমস্ত কাজের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা অনেক বন্ধু লাভ করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দল থেকে আমাদের আন্দোলনের সপক্ষে সক্রিয় সহযোগ পাওয়া গিয়েছিল। তাছাড়া এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সামনে একটি সুনির্দিষ্ট কাজের পথ খুলে যায়।

২০. বালাসুন্দরম্

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আকাঙ্ক্ষা যদি গভীর হয়, পবিত্র হয়, তাহলে তা পূর্ণ হতে বাধ্য। আমার আপন অভিজ্ঞতায় দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে এই নীতি সত্য হয়েছে। দরিদ্রের সেবায় আমার গভীর আগ্রহ ছিল ব'লে বার-বার আমি তাদের সান্নিধ্য পেয়েছি, তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছি।

যদিচ উপনিবেশে জাত ভারতীয়েরা, কেরানী শ্রেণীর লোকেরা, নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস-এর সদস্য হয়েছিলেন, দিনমজুর ও গিরমিটিয়া কুলিরা তখনো তার আওতায় ঢুকতে পারেনি, বাইরেই থেকে গিয়েছিল। কংগ্রেস তখনো তাদের সংস্থা হয়ে উঠতে পারেনি। চাঁদা দিয়ে সদস্যশ্রেণীভুক্ত হয়ে তারা যে কংগ্রেসকে আপন ক'রে নেবে—এমন সঙ্গতি তাদের ছিল না। একমাত্র সেবার মধ্য দিয়েই কংগ্রেস তাদের মন জয় ক'রে নিতে পারত। এরকম একটা সুযোগ এসে গেল এমন-একটা সময়ে, যখন না-কংগ্রেস না-আমি এর জন্য তৈরি ছিলাম। সবে তিন-চারমাস আমি প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করেছি, কংগ্রেস তখন নিতান্তই শিশু, এমন-এক সময়ে একদিন একজন তামিল আমার কাছে এসে দাঁড়াল। শরীর তার তখনো কাঁপছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, পরনে ছেঁড়া কাপড়, হাতে তার পাগড়ি, সামনের দুটি দাঁত ভাঙা, কষ দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। বেচারি তার মনিবের কাছে বেদম প্রহার ভোগ করেছে। আমার মুহুরি ছিলেন তামিল, তার কাছ থেকে লোকটির বিষয়ে সব কথা শুনলাম। আগন্তুকের নাম বালাসুন্দরম্। ডারবান্-এর এক নামজাদা সাহেবের কাছে সে গিরমিটিয়া ছিল। তার ওপর চ'টে গিয়ে, রাগে বেহুঁশ হয়ে সাহেব তাকে এমন মার মেরেছে যে সামনের দুটো দাঁতই ভেঙে গেছে।

আমি তাকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তখনকারদিনে ডাক্তারেরা সকলেই ছিলেন সাহেব। বালাসুন্দরম্ কীধরনের আঘাত পেয়েছে তার যথাযথ বিবরণ-সহ ডাক্তারের কাছ থেকে একটি সার্টিফিকেট চেয়ে পাঠালাম। ডাক্তারের সার্টিফিকেট হাতে ক'রে, আহত

লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি সোজা চ'লে গেলাম ম্যাজিস্ট্রেট্-এর কাছে ও সেখানে তার জবানবন্দী পেশ করলাম। তা প'ড়ে ম্যাজিস্ট্রেট্ খুব রাগত হয়ে তদ্দণ্ডেই মালিকের নামে সমন জারি করলেন।

মালিক সাজা পায় এমন ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। আমি শুধু চেয়েছিলাম বালাসুন্দরম্ যেন তার কবল থেকে মুক্তি পায়। গিরমিটিয়া কুলিদের বিষয়ে যে আইন ছিল, আমি তা প'ড়ে দেখলাম। নোটিস না-দিয়ে সাধারণ চাকর যদি চাকরি ছাড়ে, তাহলে দেওয়ানি আদালতে মালিক তার নামে মামলা রুজু করতে পারেন। গিরমিটিয়া কুলিদের বেলা সম্পূর্ণ অন্যরকম ব্যবস্থা। সে যদি ওভাবে চাকরি ছাড়ে তাহলে ফৌজদারিতে সোপর্দ হয়ে অপরাধ প্রমাণ হ'লে জেলে যায়। সেইজন্যই তো স্যর উইলিয়ম্ হান্টার বলতেন গিরমিটিয়া প্রথা দাসত্বের সামিল। ক্রীতদাসের মতো গিরমিটিয়া কুলিও ছিল যেন মালিকের সম্পত্তি।

বালাসুন্দরম্-কে ছাড়িয়ে আনার দুটিমাত্র রাস্তা খোলা ছিল : এক হ'ল গিরমিটিয়া কুলিদের রক্ষক-অফিসারকে ধ'রে-ক'রে তার চুক্তি বাতিল করা, অথবা তাকে আর-কারও কাছে বদ্‌লি করা, অন্যথায় বালাসুন্দরম্-এর মালিককে ব'লে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া। আমি মালিকের কাছেই গেলাম। বললাম, "দেখুন, মামলা-মকদ্দমা ক'রে আপনাকে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করি, এমন আমার ইচ্ছা নয়। লোকটাকে আপনি যে প্রচুর প্রহার করেছেন—সে তো আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন। আপনি যদি এর গিরমিট আর-কারও নামে বদল ক'রে দিতে রাজি থাকেন তাহলেই আমি খুশি থাকব।" তিনি চট্ ক'রে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। তারপর আমি গেলাম গিরমিটিয়াদের অফিসারের কাছে। নতুন মালিক আমি খুঁজে দেব—এই শর্তে তিনিও রাজি হলেন।

নতুন মালিক খুঁজতে বেরুলাম। ভারতীয়েরা গিরমিটিয়া রাখতে পারে না, সুতরাং মালিককে য়ুরোপীয় হতে হয়। সেসময় মুষ্টিমেয় য়ুরোপীয়দের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাঁদের একজনকে বলাতে তিনি অনুগ্রহ ক'রে বালাসুন্দরম্-কে রাখতে রাজি হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। ম্যাজিস্ট্রেট বালাসুন্দরম্-এর মালিককে দোষী সাব্যস্ত ক'রে রায় দিতে গিয়ে লিখলেন যে মালিক গিরমিট হস্তান্তর করতে স্বীকার পেয়েছেন।

নাটাল-এর তাবৎ গিরিমিটিয়ার কানে বালাসুন্দরম্ মামলার কথা গিয়ে পৌঁছল। আমি তাদের সকলের হিতৈষী বন্ধু ব'লে পরিগণিত হলাম। তাদের সঙ্গে এইভাবে সৌহার্দ-সম্পর্কে যুক্ত হয়ে আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করলাম। আমার দফতরে গিরমিটিয়াদের নিত্যসমাগম হতে লাগল, জনস্রোতের মতো। এইভাবে তাদের সুখদুঃখের কথা জানবার একটি প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি পেলাম।

বালাসুন্দরম্-মামলার প্রতিধ্বনি গিয়ে পৌঁছল সুদূর মাদ্রাজ অবধি। এই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব মজুর গিরমিটিয়া হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসত, তারা অন্য-অন্য গিরমিটিয়াদের কাছ থেকে এই ঘটনার কথা শুনতে পেত।

এই মামলার মধ্যে এমন-কিছু অসাধারণত্ব ছিল না। কিন্তু নাটাল-এ এমন কেউ যে আছেন যিনি তাদের হয়ে লড়তে পারেন ও প্রকাশ্যভাবে তাদের কাজ করার জন্য এগিয়ে

আসতে পারেন—এতেই তারা যেন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং এর ফলে তাদের মনে প্রচুর আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল।

ইতিপূর্বে আমি বলেছি, বালাসুন্দরম্ যখন আমার অফিসে ঢোকে তখন সে খালি-মাথায় এসেছিল, পাগড়ি ছিল তার হাতে। ব্যাপারটা যতখানি করুণ তার চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয়দের পক্ষে লজ্জাকর। কীরকম পরিস্থিতিতে আমায় পাগড়ি খুলে রাখতে বলা হয়েছিল, সে কথা তো আগেই বলেছি। গিরমিটিয়া কুলি থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেক ভারতীয়কে বাধ্য করা হ'ত কোনো য়ুরোপীয়ের সঙ্গে দেখা করতে হ'লে, আগে মাথার আবরণ খুলে ফেলতে—তা সে টুপি হোক্, পাগড়ি হোক্ কিংবা সাধারণ গামছাই হোক্। দু-হাত মাথায় ঠেকিয়ে সেলাম করাটাও তাদের সম্মান দেখানোর জন্য যথেষ্ট ব'লে মনে করা হ'ত না। বালাসুন্দরম্ ভেবেছিল, আমার কাছেও তার এইরকম সন্ত্রস্ত সম্ভ্রমে আসা উচিত। আমার অভিজ্ঞতায় এরকমটি আগে কখনো ঘটেনি। এতে আমার খুব সঙ্কোচ বোধ হয় এবং আমি বালাসুন্দরম্-কে বলি গামছাটা আবার তার মাথায় বেঁধে নিতে। সে আমার কথামতো কাজ করল বটে—কিন্তু সসঙ্কোচে। কিন্তু তাতে যে তার আনন্দও হয়েছিল, সে আমি লক্ষ করেছিলাম।

অপরকে ছোটো ক'রে মানুষ যে কীভাবে নিজেকে সম্মানিত মনে করতে পারে—সে রহস্য আমি কখনো বুঝে উঠতে পারিনি।

২১. মাথা-পিছু তিন পাউন্ড কর

বালাসুন্দরম্-এর কেস্ থেকে আমি গিরমিটিয়া ভারতীয় কুলিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসি। তাদের বিষয়ে তলিয়ে দেখার জন্য আমার প্রবর্তনা আসে অন্য-একটি ঘটনা থেকে। সেসময় গিরমিটিয়াদের কাঁধে একটা মোটারকম ট্যাক্স্-এর বোঝা চাপিয়ে দেবার একটা প্রসঙ্গ চলছিল, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে।

ঠিক সেইসময়েই, অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে, নাটাল সরকার গিরমিটিয়া ভারতীয়দের ওপর সালিয়ানা ২৫ পাউন্ড কর ধার্য করার সঙ্কল্প করে। প্রস্তাব শুনে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। আলোচনার জন্য আমি প্রশ্নটা কংগ্রেস-এর কাছে উপস্থাপিত করি। তদ্দণ্ডেই স্থির হয়, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা ক'রে একটা আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে হবে।

এই কর বসানোর প্রস্তাবটার কীভাবে সূচনা হ'ল, সে বিষয়ে গোড়ায় একটু ব'লে রাখা দরকার।

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি নাটাল-বাসী শ্বেতাঙ্গেরা বুঝতে পারে, ও দেশে আখের ভালো আবাদ হতে পারে, কিন্তু তার জন্য দরকার প্রচুরসংখ্যায় মজুর। নাটাল-বাসী জুলুদের দিয়ে চাষ-আবাদের কাজ কিংবা চিনি তৈরির কাজ করানো চলবে না, কারণ তাদের সেই পটুতা নেই। সুতরাং বাইরে থেকে মজুর আমদানি করতে হয়। সুতরাং নাটাল সরকার

এ বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে লেখালেখি করে ও নাটাল-এ নিয়ে যাবার জন্য ভারতীয় মজুর সংগ্রহ করার অনুমতি পায়। এইসব মজুরদের বলা হয়েছিল যে পাঁচ বছর সে দেশে মজুরি করার জন্য চুক্তি লিখে দিতে হবে। পাঁচ বছর বাদে তারা যদি নাটাল-এই বসবাস করতে চায় তো থেকে যেতে পারবে, জমিজমার দখলস্বত্বও লাভ করতে পারবে। এসমস্ত নিতান্তই লোভ-দেখানো। আসলে শ্বেতাঙ্গেরা ভেবেছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগেই ভারতীয় মজুরদের পরিশ্রমে চাষবাসের যথেষ্ট উন্নতি ঘ'টে যাবে।

কিন্তু ভারতীয় মজুরেরা যা দিল তা ছিল শ্বেতাঙ্গদের আশার অতিরিক্ত। তারা প্রচুর পরিমাণে শাক-সব্জি উৎপন্ন করতে লাগল। দেশ থেকে নানা শাক-সব্জির বীজ আনিয়ে তারা নাটাল-এ ফলাতে আরম্ভ করল। ও দেশে যেসব শাক-সব্জি জন্মাত শস্তায় সেগুলির ফলন বাড়িয়ে দিল। ভারত থেকে তারা ও দেশে আম আমদানি করে। কেবল চাষবাস করতেই তাদের উদ্যম ফুরিয়ে গেল না। তাদের কেউ-কেউ ব্যবসায় নামল। বাড়ি-ঘর তুলে বসবাস করার জন্য তারা জমি কিনল। কেউ-কেউ মজুরির কাজ ছেড়ে দিয়ে জমি ও বাড়ির মালিক হয়ে ব'সে গেল। তাদের পিছু-পিছু কিছু ভারতীয় ব্যবসাদার গিয়ে নাটাল-এ ব্যবসা-বাণিজ্য পত্তন করল। স্বর্গত শেঠ আবুবকর আমদ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সর্বপ্রথম যেসব ভারতীয় ব্যবসায়ী নাটাল-এ আসেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে। তিনি এক বিরাট ব্যবসা পত্তন করেছিলেন।

শেঠ আমদ-এর সাফল্যে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হলেন। প্রথম যখন তাঁরা ভারতীয় কুলি-মজুরদের ডেকে এনেছিলেন, ব্যবসা-বুদ্ধিতে ভারতীয়দের পটুতা তাঁদের হিসেবের মধ্যে ছিল না। গিরমিটিয়ারা যদি কেবল চাষবাসের জন্য ও দেশে থেকে যেত তাহলে তত অসহ্য হ'ত না, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে তারা প্রতিযোগিতা করবে—এ তো কোনোপ্রকারেই সহ্য করা যায় না।

ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বৈরিভাবের বীজ এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার জমিতে উপ্ত হ'ল। অন্য নানা কার্যকারণের সংযোগে এই বৈরিভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদের ধরনধারণ, চাল-চলন আলাদা, আমাদের জীবনযাত্রা সাদাসিধে, অল্পলাভেই আমরা তুষ্ট থাকি, স্বাস্থ্যের নিয়ম-পালনে আমাদের ঘোরতর অবহেলা, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখায় আমাদের আলস্য, চুনকাম, মেরামতি প্রভৃতি ব্যাপারে আমাদের কৃপণতা—এছাড়া ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পার্থক্য এইসমস্ত কিছু মিলে যেন ক্রমাগত বৈরিতার আগুন উস্‌কে দিয়েছিল। আইন ক'রে ভারতীয়দের ভোটাধিকার হরণ করা ও গিরমিটিয়াদের ওপর ট্যাক্স-এর বোঝা চাপানো—এসমস্তই ছিল এই মনোগত বিরোধের বহিঃপ্রকাশ। আইনের কথা বাদ দিলেও শ্বেতাঙ্গেরা তো পদে-পদে ভারতীয়দের খোঁটা দিতে, খোঁচা দিতে শুরু করেছিল।

প্রথমে প্রস্তাব হয়, ভারতীয় মজুরদের জোরজবরদস্তি ক'রে ভারতে ফেরৎ পাঠানো হবে। গিরমিটিয়া চুক্তির মেয়াদ ভারতেই যদি অবসিত হয়, তাহলে হ্যাঙ্গাম থাকে না। কিন্তু ভারত সরকার এরকম প্রস্তাব মেনে নেবেন, তার সম্ভাবনা ছিল সুদূর। সেইজন্য বিকল্পে তিন দফা প্রস্তাব করা হয় :

প্রথম প্রস্তাব : মজুরির চুক্তি শেষ ক'রেই গিরমিটিয়ারা তাদের দেশে ফিরে যাক্।
দ্বিতীয় প্রস্তাব : চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, প্রতি দুই বছর অন্তর নতুন চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং সেসময় বেতন কিছু-কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হবে।
তৃতীয় প্রস্তাব : চুক্তির মেয়াদ শেষ ক'রে গিরমিটিয়ারা যদি তাদের দেশে ফিরে না-যেতে চায় কিংবা নতুন চুক্তি সম্পাদন না-করে, তাহলে প্রতিবছর তাদের পঁচিশ পাউন্ড ট্যাক্স দিতে হবে।

এই তিনদফা প্রস্তাবে ভারত সরকারের স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভের জন্য নাটাল সরকার স্যর হেনরি বিন্‌স্ ও মিস্টার মেগন্‌কে ভারতে ডেপুটেশনে পাঠান। তখন ভারতের ভাইস্‌রয় ছিলেন লর্ড এল্‌গিন। সালিয়ানা পঁচিশ পাউন্ড কর তিনি না-মঞ্জুর করলেও, মাথা-পিছু ভারতীয়দের ওপর বছরে তিন পাউন্ড ট্যাক্স বসানো তিনি সমর্থন করেন। তখন আমার মনে হয়েছিল, এবং এখনো আমার স্থির বিশ্বাস, এভাবে রাজি হওয়াটা বড়োলাটের পক্ষে মস্ত একটা ভুল হয়েছিল। ভারতীয়দের কীসে ভালো হয়, কীসে মন্দ হয়—সে কথা তিনি একেবারেই চিন্তা ক'রে দেখেননি। নাটাল-এর শ্বেতাঙ্গদের এভাবে সুবিধা ক'রে দেওয়া তাঁর কর্তব্যের অঙ্গ ছিল না। চুক্তির মেয়াদ পুরো হবার তিন-চার বছরের মধ্যেই, গিরমিটিয়া কুলি, তার পরিবার, ষোলো বছরের অধিকবয়স্ক তার ছেলে এবং তেরো বছরের অধিকবয়স্ক তার মেয়ে—এই চারজনই এই নিয়ম অনুসারে মাথা-পিছু তিন পাউন্ড বাৎসরিক ট্যাক্স দিতে বাধ্য। পরিবারের কর্তার যেক্ষেত্রে মাসিক আয় চোদ্দ শিলিং-এর বেশি নয়, সেক্ষেত্রে একই পরিবারের চারজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের জন্য যদি বছরে বারো পাউন্ড ট্যাক্স দিতে হয়, তাহলে এমন আইনকে নৃশংস ব'লে নিন্দা না-ক'রে উপায় নেই। পৃথিবীর আর-কোথাও এরকম অমানুষিকতার নজির মিলবে না।

এই ট্যাক্স-এর বিরুদ্ধে আমরা জোর আন্দোলন চালাই। নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস এ বিষয়ে যদি মুখ না-খুলত তাহলে বড়োলাট হয়তো সালিয়ানা সেই পঁচিশ পাউন্ড ট্যাক্স-ই মঞ্জুর ক'রে বসতেন। পঁচিশ পাউন্ড থেকে ক'মে গিয়ে যে তিন পাউন্ডে দাঁড়িয়েছিল—সম্ভবত তা ঘ'টে থাকবে একমাত্র কংগ্রেস-এর সেই আন্দোলনের ফলে। অবশ্য আমার এ অনুমান ভুল হ'লেও হতে পারে। হয়তো ভারত সরকার গোড়া থেকেই পঁচিশ পাউন্ড ট্যাক্স-এর বিরোধিতা ক'রে, কংগ্রেস আন্দোলনের অপেক্ষা না-রেখেই ট্যাক্স-এর হার তিন পাউন্ডে নামিয়ে থাকবেন। সে যা-ই হোক্, এই তিন পাউন্ড ট্যাক্স মেনে নিতে গিয়েও, ভারত সরকার ভারতের স্বার্থবিরোধী কাজ ক'রে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ করেছিলেন। ভারতের হিতাহিত যাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল, সেই বড়োলাটের পক্ষে এই অমানুষিক জুলুম মেনে নেওয়া একেবারেই ন্যায়সঙ্গত হয়নি।

পঁচিশ পাউন্ড থেকে ট্যাক্স-এর হার তিন পাউন্ড-এ নামাতে গিয়ে কংগ্রেস যে মস্ত-একটা-কিছু কাজ করেছিল, এমন নয়। কংগ্রেস যে গিরমিটিয়াদের স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষণ করতে পারেনি, এই পরিতাপ আমাদের মনে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। একদিন-না-একদিন এই ট্যাক্স রদ করাতে হবে, এই ছিল কংগ্রেস-এর স্থির সঙ্কল্প। সেই সঙ্কল্প সত্য হতে সময়

লেগেছিল বিশ বছর। এটা ঘটেছিল কেবল নাটাল-বাসী ভারতীয়দের চেষ্টায় নয়, পরন্তু সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মিলিত চেষ্টায়। গোখলে-র কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ফলে এই চরম সংগ্রাম শুরু হয়। এই আন্দোলনে তাবৎ ভারতীয় গিরিমিটিয়া পুরোপুরি যোগদান করেছিল, কেউ-কেউ গুলিতে প্রাণও দিয়েছিল, দশ হাজারেরও বেশি ভারতীয় কারাবরণ করেছিল।

কিন্তু শেষপর্যন্ত সত্যের জয় হয় অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয়দের দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে সেই সত্য প্রকাশিত হয়েছিল। তত্রাচ এ কথা বলতেই হবে, অটল বিশ্বাস, অসীম ধৈর্য ও নিরন্তর প্রয়াস ব্যতীত এই সত্যবিজয় সম্ভবপর হ'ত না। ভারতীয়েরা যদি এই সংগ্রামে বিরত হ'ত, কংগ্রেস যদি আন্দোলন পরিহার ক'রে এই মাথা-পিছু ট্যাক্স-এর আইন অনিবার্য ব'লে মেনে নিত, তাহলে এই ঘৃণ্য জুলুম আজও অব্যাহত থাকত, আজও গিরমিটিয়াদের কাছ থেকে এই কর আদায় করা হ'ত এবং তাহলে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসী ভারতীয়দের নয়, সমগ্র ভারতবাসীর মাথা লজ্জায়-গ্লানিতে চিরকালের জন্য হেঁট হয়ে থাকত।

২২. ধর্মের তুলনামূলক বিচার

আমি যে এভাবে সমাজের সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম, তার কারণ ছিল আত্ম-উপলব্ধির জন্য একটা আকুতি। কেবল সেবার মধ্যে দিয়ে ভগবৎ-উপলব্ধি হতে পারে। এই বিশ্বাসে সেবাধর্মকে আমি আমার ধর্ম ব'লে মেনে নিয়েছিলাম। আমার কাছে এই সেবার মানে ছিল দেশের সেবা, ভারতের সেবা। দেশ-সেবার কাজ আমার কাছে আপনা-আপনি এসেছিল, আমায় খুঁজে-পেতে নিতে হয়নি। তাছাড়া এ কাজে আমার একটা সহজপ্রবণতাও ছিল। দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা ছিল ব'লে কাথিয়াওয়াড়-এর কূটচক্র থেকে একপ্রকার পালিয়ে এসেছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকায়। ভেবেছিলাম, এ দেশেই আমার জীবিকা অর্জন করব। কিন্তু ওই তো বললাম, ও দেশে গিয়ে আমার মনে হ'ল, আমায় ভগবানকে খুঁজে পেতে হবে, নিজেকে জানতে হবে।

খ্রিষ্টান বন্ধুরা আমার এই ধর্ম-পিপাসা এমন ক'রে উদ্দীপ্ত করেছিলেন যে মনে হয়েছিল কিছুতেই সে তৃষ্ণা মিটবে না। আমি ধর্মে মন দিতে না-চাইলেও তাঁরা আমায় চুপ ক'রে ব'সে থাকতে দিতেন না। ডারবান্-এ মিস্টার স্পেন্সর ওআল্টন্ ছিলেন জেনারেল মিশন-এর প্রধান। তিনি আমায় খুঁজে বের করলেন। আমি প্রায় তাঁর ঘরের লোক হয়ে গেলাম। প্রিটোরিয়ার খ্রিষ্টানদের সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত। মিস্টার ওআল্টন্-এর নিজস্ব একটা ধরন ছিল। তিনি যে কোনোদিন সরাসরি আমায় ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন ব'লে আমার মনে পড়ে না। তিনি যেন তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ আমার সামনে ধ'রে দিলেন পাতা-খোলা বইয়ের মতন। মিসেস্ ওআল্টন্ ছিলেন নানা গুণের অধিকারী, তাঁর স্বভাব ছিল মৃদু। এই দম্পতির ব্যবহার আমার

খুব ভালো লাগত। ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আমরা মেনে নিয়েছিলাম। আমরা বুঝেছিলাম, বিস্তর আলাপ-আলোচনা করলেও এ ব্যবধান ঘোচবার নয়। তবু এ কথা মানতেই হয় যেখানে পরমত-সহিষ্ণুতা, হৃদয়ের ঔদার্য ও সত্যনিষ্ঠা থাকে, সেখানে মতভেদে কিছু আসে-যায় না, বরঞ্চ তা সৌহার্দ্যের সহায়ক হয়। মিস্টার ও মিসেস্ ওআল্টন্-এর বিনয়ী স্বভাব, অধ্যবসায় ও কর্মনিষ্ঠা আমার খুব ভালো লাগত। প্রায়ই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হ'ত।

এঁদের সংস্পর্শে এসে আমার ধর্ম-জিজ্ঞাসা জাগ্রত ছিল। প্রিটোরিয়ায় থাকতে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার যে অবকাশ পেতাম, এখন আর তা সম্ভবপর ছিল না। তবু যেটুকু সময় আমি হাতে পেতাম, কাজে লাগাতাম। ধর্মীয় বিষয়ে আমার সেই চিঠিপত্র লেখালেখি সমানে চলেছিল। এ বিষয়ে আমায় পথ দেখাতেন রায়চন্দ্ভাই। আমার এক বন্ধু আমায় নর্মদাশঙ্করের *ধর্মবিচার* বইখানি পাঠিয়েছিলেন। এ বইয়ের ভূমিকাটি আমার খুব কাজে লেগেছিল। তরুণবয়সে কবি উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেছেন ব'লে আমি জানতাম। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে কীভাবে তাঁর জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে, ভূমিকায় তার বিবরণ প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। বইটি আমার এত ভালো লেগেছিল যে আদ্যোপান্ত আমি সাগ্রহে প'ড়ে ফেলি। আর-যেসব বই প'ড়ে আমার ভালো লাগে, তার মধ্যে ছিল ম্যাক্সমূলর-এর *India–What Can it Teach Us* অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি, এবং থিয়োসোফিকাল সোসাইটি প্রকাশিত উপনিষদের অনুবাদ। এইসব বই পড়ার ফলে হিন্দুধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় এবং এর অন্তরের সৌন্দর্য আমার কাছে প্রতিভাত হতে থাকে। এর ফলে যে আমার মন অন্যধর্মের প্রতি বিরূপ হয়েছিল এমন নয়। ওয়াশিংটন আরভিং-এর *Life of Mahomet and His Successors* বা মুহম্মদ ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের জীবনকথা ও কার্লাইল-এর পয়গম্বর-প্রশস্তি আমি পড়েছিলাম। এইসব বই পড়ার ফলে মুহম্মদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীরতর হয়। এসব বই ছাড়া আরেকটি যে বই আমি পড়েছিলাম, তার নাম ছিল *The Sayings of Zarathustra* অর্থাৎ জরথুস্ত্র-কথামৃত।

এইভাবে নানা ধর্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। অধ্যয়নের ফলে আমার আত্মদর্শনের স্পৃহা প্রখরতর হ'ল, প'ড়ে যা-কিছু আমার ভালো লাগত নিজের জীবনযাপনে তা প্রয়োগ করার অভ্যাস উপজাত হ'ল। এইভাবে হিন্দুধর্মের কিছু বই প'ড়ে আমার জ্ঞান ও সাধ্যমতো কয়েকটি যৌগিক প্রক্রিয়া আমি শুরু করি। কিন্তু এ ব্যাপারে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারিনি ব'লে মনে-মনে স্থির করেছিলাম যে দেশে ফেরার পর কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় যোগের প্রক্রিয়া আয়ত্ত করব। আমার সে আশা পূর্ণ হয়নি।

টলস্টয়-এর বইগুলিও এসময় আমি গভীর মনোযোগে অনুধাবন করি। *The Gospels in Brief* অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সু-সমাচার, *What to do?* বা *কিংকর্তব্যম্* প্রভৃতি বই আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। বিশ্বপ্রেমের সম্ভাবনা যে সুদূরপ্রসারী—সে আমি যেন দিনে-দিনে আরো বেশি ক'রে বুঝতে শিখলাম।

এইরকমসময়েই আমি অন্য-একটি খ্রিষ্টান পরিবারের সংস্পর্শে আসি। তাঁদের

পরামর্শক্রমে আমি প্রতি রবিবার ওয়েসলীয় সম্প্রদায়ের গির্জায় উপাসনায় যোগ দিতে শুরু করি। রবিবারে-রবিবারে নৈশভোজনে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করি, এরকম একটা ঢালা নিমন্ত্রণ ছিল। ওয়েসলীয় গির্জার ধর্মোপদেশ আমায় কোনো প্রেরণা জোগাতে পারেনি। শ্রোতাদের ধর্মানুরাগ খুব যে গভীর ব'লে আমার মনে হ'ত না। মনে হ'ত, তারা ভক্তিভরে একত্র মিলিত হয়নি ; মনে হ'ত, যেন কতকগুলি সাংসারিক লোক, খানিকটা বিনোদনের জন্য খানিকটা-বা রীতিরক্ষার খাতিরে সপ্তাহান্তে গির্জায় উপস্থিত হয়েছে। উপাসনার সময় কখনো-কখনো অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার তন্দ্রা আসত। এতে আমার খুবই লজ্জা হ'ত, কিন্তু যখন দেখতাম, আমার আশেপাশে কেউ-কেউ ঝিমোচ্ছে, লজ্জার ভাবটা কিছু-পরিমাণে হাল্‌কা হয়ে যেত। এভাবে বেশিদিন চলা আমার ধাতে সইত না, তাই অল্পদিনের মধ্যেই গির্জায় যাওয়া ছেড়ে দিলাম।

রবিবারে-রবিবারে যে পরিবারের সঙ্গে নৈশভোজনে যোগ দিতে যেতাম, তাঁদের সঙ্গেও সম্পর্কটা হঠাৎ ঘুচে যায়। সত্যি বলতে গেলে বলা যায় যে তাঁরাই তাঁদের বাড়ি যেতে আমায় একরকম নিষেধ করেন। ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছিল বলি। গৃহকর্ত্রী ছিলেন সাদাসিধে ভালো মানুষ, কিন্তু তাঁর মনের তেমন প্রসার ছিল না। তাঁদের সঙ্গে সর্বদাই আমার ধর্মালোচনা হ'ত। তখন আমি আর্নল্ড-এর *Light of Asia* অর্থাৎ এশিয়ার আলো বইখানি দ্বিতীয়বার পড়ছি। একদিন যীশু ও বুদ্ধের জীবন নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছিল। আমি বললাম, "গৌতমের করুণার কথা একবার ভেবে দেখুন। তাঁর এই করুণা কেবল মনুষ্যজাতির ওপর নিবদ্ধ ছিল না, মনুষ্যেতর জাতির প্রতিও প্রসারিত ছিল। একটি ছাগলছানাকে তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এবং সে সেখানে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ব'সে আছে—এই ছবিটুকু কল্পনা করলে কি মানুষের হৃদয় প্রেমে উদ্বলিত না-হয়ে পারে? যীশুর জীবনে কিন্তু এরকম সর্বজীবে দয়ার আদর্শ দেখতে পাওয়া যায় না।" তুলনাটি মহিলার ভালো লাগেনি—আমি সে কথা বুঝতে পেরে সেখানেই প্রসঙ্গের ছেদ টানলাম ও সবাই মিলে খাওয়ার-ঘরে গেলাম। তাঁর পাঁচ বছরের ছেলেটি ছিল দেবশিশুর মতো। সে-ও আমাদের সঙ্গে খেতে বসল। শিশুদের কাছে পেলে আমি মহানন্দে থাকি। তাছাড়া এই ছেলেটির সঙ্গে আমার অনেকদিনের ভাব। তার থালার মাংসের টুক্‌রোকে তুচ্ছ ক'রে আমার থালার আপেলের আমি ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলাম। নিষ্পাপ বালক আমার কথায় সায় দিয়ে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আপেলের গুণগান করতে শুরু করল। কিন্তু মা বেচারি এতে দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেলেন। আমি সাবধান হয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে অন্য কথা পাড়লাম। পরের সপ্তাহেও রেওয়াজমতো তাঁদের বাড়ি গেলাম বটে, কিন্তু মনে-মনে আমার একটু ভয় ছিল। সেখানে যাওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়াই ঠিক হবে ব'লে আমার মনে হয়নি, বরঞ্চ মনে হয়েছিল না-যাওয়া ঠিক হবে না। মহিলাটিই আমার সমস্যা নিরসন ক'রে দিলেন।

তিনি বললেন, "আপনি আশা করি আমায় ভুল বুঝবেন না, মিস্টার গান্ধী। কিন্তু আপনাকে না-ব'লে পারছি না যে আমার ছেলের পক্ষে আপনার সংসর্গ ভালো ব'লে মনে হচ্ছে না। প্রতিদিন দেখছি মাংস খেতে সে ইতস্তত করে এবং তার বদলে আপনার যুক্তির

কথা তুলে ফল খেতে চায়। এরকম বাড়াবাড়ি তো বরদাস্ত করা যায় না। ছেলে যদি মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়, তাহলে দুর্বল তো হবেই—সম্ভবত অসুখেও পড়তে পারে। মা হয়ে সে আমি সহ্য করতে পারব না। এরপর থেকে আপনার আলাপ-আলোচনা আমাদের মতো বয়স্ক লোকের সঙ্গেই করবেন। ছেলেমানুষের ওপর ওসব কথার প্রভাব মন্দ হতে বাধ্য।"

আমি বললাম, "মিসেস্‌, আমি দুঃখিত। মায়ের মনোভাব আমি বুঝতে পারি, কারণ আমারও তো সন্তান আছে। এই বিরক্তিকর পরিস্থিতি আমরা সহজেই ঘুচিয়ে দিতে পারি। আমি কী বলি বা না-বলি তার যতটা-না প্রভাব পড়বে বালকের মনে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব পড়বে আমি কী খেলাম কী না-খেলাম—তার থেকে। সুতরাং সবচেয়ে ভালো হয়, যদি আপনাদের বাড়ি আসা আমি বন্ধ করি। তাতে নিশ্চয় আমাদের বন্ধুতা ক্ষুণ্ণ হবে না।"

মহিলাটির মাথা থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। তিনি বললেন, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

২৩. গৃহস্থালি

ঘর-সংসার পত্তন করা আমার পক্ষে একপ্রকার গা-সহা হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। কিন্তু লন্ডন কিংবা বোম্বাইয়ে গৃহস্থালি করা, আর নাটাল-এ সংসার পাতার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ। এ যাত্রা নিছক ঠাট বজায় রাখার জন্য একটা আলাদা খরচ বরাদ্দ করতে হ'ল। মনে হ'ল, নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস-এর প্রতিনিধি ও নাটাল-এর প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টর-রূপে, আমার সংসারজীবন গ'ড়ে তোলা দরকার। আমার পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে। সুতরাং সম্ভ্রান্ত পল্লীতে সুন্দর একটি ছোটোখাটো বাড়ি ভাড়া করা হ'ল। আসবাবপত্রে সে বাড়ি সুসজ্জিত করা হ'ল। খাবারদাবার সাদাসিধে-রকমের হ'লে কী হয়, গৃহস্থালির খরচ-খরচা খুব কম হ'ত না, কারণ আমার ইংরেজ বন্ধুবান্ধব ও ভারতীয় সহকর্মীদের সদাসর্বদা আমি আহারে নিমন্ত্রণ করতাম।

ঘর-সংসার করতে হ'লে ভালো চাকরবাকর রাখা দরকার। কিন্তু কাউকে চাকর ক'রে রাখা আদৌ আমার অভ্যাসের মধ্যে ছিল না।

আমার ঘর করার সঙ্গী ও সহায় হয়ে এলেন এক বন্ধু, রান্নার লোক তো দু-দিনেই বাড়ির লোক হয়ে উঠল। আমার অফিসের কেরানী মুহুরিদেরও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল আমার বাড়িতেই।

গৃহস্থালী ব্যাপারে আমার এই পরীক্ষা কিছু-পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল বলা চলে। তবে এ থেকে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছিলাম।

সঙ্গী-মানুষটি ছিলেন বেশ সুচতুর লোক। তাঁকে বিশ্বাসভাজন মনে ক'রে আমি কিন্তু

ঠকেছিলাম। আমার সংসারে বাসিন্দা এক কেরানির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে এমন একটি জটিল জাল তিনি রচনা করেছিলেন যে আমি কেরানি ভদ্রলোককে একটু সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করি। কেরানির মেজাজ ছিল উগ্র। আমি তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখছি, বুঝতে পারামাত্র, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন, অফিসের কাজেও ইস্তফা দিলেন। এতে আমার খুব দুঃখ হয়। মনে হয়েছিল, হয়তো আমি তাঁর প্রতি অবিচার করেছি। আমার বিবেক ক্রমাগত আমায় দংশন করতে থাকে।

ইতিমধ্যে রান্নার লোক কিছুদিনের জন্য ছুটি নিল, অথবা অন্য-কোনো কারণে কাজে হাজির হ'ল না। তার অনুপস্থিতির ফলে আরেকটি লোক জোগাড় করার দরকার হ'ল। পরে জানতে পেরেছিলাম, নতুন লোকটি ছিল নেহাৎই বাজে লোক। তবে আমার বরাতজোর বলতে হবে যে ঠিক সেই মুহূর্তে এই নতুন লোকটির আগমন ঘটেছিল। কাজে যোগ দেবার দিন-দু-তিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারে যে আমার বাড়িতে আমার অজ্ঞাতসারে এমনসব কাণ্ড ঘটছে, যার বিষয়ে আমায় সাবধান ক'রে দেওয়া উচিত হবে। সে মনঃস্থির করল, আমায় সব কথা জানাবে। অতি সহজেই আমি মানুষকে বিশ্বাস ক'রে বসতাম ব'লে আমার একটা দুর্নাম ছিল। কিন্তু লোকে এটাও জানত যে আমি সোজা মানুষ, কোনো ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে আমি নেই। বোধ করি এই কারণেই, নতুন রাঁধিয়ের কাছে আমার বন্ধুর আচরণ এত অদ্ভুত মনে হয়েছিল। প্রতিদিন বেলা একটার সময় আমি অফিস থেকে বাড়ি যেতাম লাঞ্চ্ খাবার জন্য। একদিন বেলা বারোটার সময় রাঁধিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে আমার অফিসে এসে হাজির। বলল, "এখুনি একবার বাড়ি চলুন তো। গিয়ে যা দেখবেন তাতে আপনার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "কী ব্যাপার বলো তো? বলতেই হবে তোমাকে। এ কী বলছ তুমি— এসময় আমি কী ক'রে অফিস ছেড়ে বাড়ি যাই, বলো তো?"

"যদি না-যান আপনাকে আফশোস করতে হবে। এ আপনাকে ব'লে রাখলাম। এর চেয়ে বেশি-কিছু আমি বলতে পারব না।"

তার অগ্রহাতিশয়ের মধ্যে একটা মিনতির সুর আমি লক্ষ করলাম। একজন কেরানিকে সঙ্গে নিয়ে আমি বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলাম। রান্নার লোকটি আমাদের আগে-আগে চলতে লাগল। সোজা দোতলায় আমায় নিয়ে বন্ধুর ঘরের দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "দরজা খুলে নিজের চোখে একবার দেখুন।"

সব-কিছু আমায় দেখতে হ'ল। দরজায় আমি টোকা দিলাম। সাড়া-শব্দ পেলাম না। তখন সারা বাড়ি কাঁপিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম। দরজা খুলে যেতে দেখলাম ঘরের ভিতর আমার বন্ধুর সঙ্গে একটি গণিকা। তাকে সেই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললাম। বললাম, আর যেন কখনও এ বাড়িতে মুখ না-দেখায়।

বন্ধুকে বললাম, "আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেল। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, এমন ঠকা আমি কখনও ঠকিনি, তুমি আমায় আচ্ছা বোকা বানিয়েছ। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর বিশ্বাসের ভালো প্রতিদান তুমি দিলে।"

কোথায় তার চৈতন্যের উদয় হবে, উল্‌টে সে আমায় শাসাল যে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে।

আমি বললাম, "আমার তো কিছুই লুকোবার নেই, রাখবার ঢাকবার নেই। আমার বিষয়ে যা-কিছু বলতে চাও, বলতে পারো। কিন্তু এতদ্দণ্ডে এই জায়গা তোমায় ছেড়ে যেতে হবে।"

এতে সে আরও বেশি চ'টে গেল। উপায়ন্তর না-দেখে একতলায় আমার কেরানিকে ডেকে আমি বললাম, "এখুনি একবার চ'লে যান তো, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেকে আমার সেলাম জানিয়ে বলুন গিয়ে যে আমার বাড়িতে একটি লোক অসৎ আচরণ করেছে। আমি তাকে আমার বাড়িতে আর রাখতে চাই না, কিন্তু সে কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইছে না। তিনি যদি পুলিশের সাহায্য পাঠাতে পারেন, তাহলে আমি বিশেষ বাধিত হব।"

লোকটা বুঝতে পারল, আমি মিথ্যে শাসাচ্ছি না, আমার সঙ্কল্পের নড়চড় হবে না। অন্যায় করার ফলে তার মনে ভয়ও ঢুকেছিল। আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে, সে অনুনয় ক'রে বলল, পুলিশকে যেন আমি খবর না-দিই। অবিলম্বে সে ঘর ছেড়ে চ'লে গেলও।

এই ঘটনা ঘটেছিল যেন সময়ে আমায় সাবধান করবার জন্য। এতদিনে আমি বুঝতে পারলাম, পাপাসক্ত এই বন্ধুটি কতভাবে আমায় প্রতারিত করেছিল। তাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে আমি একটি সদুদ্দেশ্যসাধন করার জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করেছিলাম। আমি ভুল ক'রে ভেবেছিলাম, আমার চেষ্টার ফলে হয়তো বিষবৃক্ষ অমৃত ফল প্রসব করবে। সঙ্গীটি যে দুশ্চরিত্র সে কথা জেনে-শুনেও আমি ভুল ক'রে ভেবেছিলাম, আমার প্রতি ব্যবহারে সে আমার বিশ্বাসের অপলাপ করবে না। তার চরিত্র সংশোধন করতে গিয়ে আমি নিজে প্রায় ভরাডুবি হবার দাখিল হয়েছিলাম। সহৃদয় বন্ধুদের সাবধানবাণী আমি অস্বীকার করেছিলাম। বন্ধুর প্রতি আসক্তির ফলে আমি যেন একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

নতুন এই রান্নার লোকটির সাহায্য-ব্যতিরেকে আমি হয়তো সত্যাসত্য জানতেও পারতাম না। বন্ধুর প্রভাবে যদি মোহগ্রস্ত হয়ে থাকতাম, তাহলে অতঃপর আমার যে নিরাসক্ত জীবনের সূত্রপাত হ'ল, তা হয়তো ঘটত না। অনর্থক তার পিছনে কালক্ষেপ করতে হ'ত। আমায় অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে সে আমার বিভ্রান্তির কারণ হ'ত।

কিন্তু আগেকার মতো ভগবান আমার সহায় হলেন। আমার ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল না, তাই সম্ভবত ভুল করা সত্ত্বেও আমি রক্ষা পেলাম। সংসার-জীবনের প্রারম্ভে আমার এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আমার সহায়ক হয়েছিল এবং লোকব্যবহারে আমায় অবহিত হতে শিক্ষা দিয়েছিল।

নতুন রান্নার লোকটিকে ভগবান যেন তাঁর দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন। সে রান্নাবান্নার কাজ জানত না, সুতরাং রাঁধিয়ে হিসেবে আমার বাড়িতে বেশিদিন সে থাকতেও পারত না। কিন্তু সে ছাড়া আর-কেউ তখন আমার চোখ খুলতে পারত না। পরে আমি জেনেছিলাম, আমার বাড়িতে সেই গণিকাটির সমাগম সেদিনই প্রথম নয়। আগেও একাধিকবার সে এসেছে, অথবা তাকে আনিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু রান্নার লোকটি যেমন সাহসে ভর

দিয়ে আমায় এসে খবর দিয়েছিল, তেমন আর কারও সাহস হয়নি। সকলেই তো জানত, আমার সঙ্গীটিকে আমি কেমন অন্ধভাবে বিশ্বাস করতাম। কেবল আমার এই উপকারটুকু করবার জন্যই যেন নতুন লোকটি এসেছিল। ঘটনার অব্যবহিত পরেই সে আমার কাজে ইস্তফা দিতে চায়।

সে বলেছিল, "আপনার বাড়িতে চাকরি করা আমার পোষাবে না। লোকের কথায় আপনি কান দেন ব'লে সহজেই আপনি ভুল পথে চলতে পারেন। এ জায়গায় আমি থাকতে পারব না।"

আমি তাকে ধ'রে রাখলাম না, চ'লে যেতে দিলাম।

এখন আমি বুঝতে পারলাম, আমার পূর্বতন কেরানির বিরুদ্ধে কান-মন্ত্রণা দিয়েছিল, আর-কেউ না—আমার সেই সঙ্গীটি। তাঁর প্রতি আমি যে অবিচার করেছি, তার প্রতিকারের জন্য আমি প্রচুর চেষ্টা করেছিলাম। আমার মনে আজও দুঃখ র'য়ে গেছে যে তিনি এখনো পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি যে, আমি যা করেছিলাম তা ভুলবশতঃই করেছিলাম। মেরামতির জন্য যতই-না আমরা চেষ্টা করি, সম্পর্ক একবার ভেঙে গেলে জোড়া দেওয়া শক্ত।

২৪. ঘরে ফেরা

এতদিনে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার তিন বছর কেটে গেছে। সেখানকার লোকদের আমি চিনতে পেরেছি, তারাও আমায় চিনে নিয়েছে। বুঝতে পেরেছিলাম, সে দেশে আমায় দীর্ঘকাল কাটাতে হবে। সে কথা ভেবে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আমি মাস-ছয়েকের জন্য দেশে ফিরে আসার অনুমতি চেয়ে নিলাম। প্র্যাক্‌টিস্ আমার ভালোই জমেছিল। এটাও দেখলাম যে লোকে বুঝতে পেরেছিল, ও দেশে আমার থাকা দরকার। এইসব দেখে-শুনে মনঃস্থির করলাম দেশে ফিরব এবং স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে এনে ও দেশেই বসবাস করব। তাছাড়া মনে হ'ল দেশে যদি যাই, তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকা-স্থিত ভারতীয়দের বিষয়ে দেশের লোকের মধ্যে কিছু আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারব, জনমত তৈরি করতে পারব। তাহলে দেশে ফিরে গিয়েও হয়তো আমার জনসেবার কাজ অব্যাহত থাকবে। সেই মাথা-পিছু তিন পাউন্ড ট্যাক্স-এর ব্যাপারটা দুষ্ট ক্ষতের মতো সারাক্ষণ আমার মনকে নাড়া দিচ্ছিল। মনে হয়েছিল, এটা রদ না-হওয়া পর্যন্ত আমার আর শান্তি নেই।

কিন্তু কথা হ'ল আমার অনুপস্থিতিতে কংগ্রেস-এর কাজ কিংবা এডুকেশন এসোসিয়েশন-এর কাজ কে চালাবেন? এই প্রসঙ্গে দু-জন লোকের কথা আমার মনে হ'ল—আদমজী মিঞাখান ও পার্সি রুস্তমজী। ইতিমধ্যে ব্যবসায়ী মহল থেকে বেশ-কিছু কাজের লোক আমাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়মিতভাবে সেক্রেটারির কর্তব্য করার জন্য, জনসাধারণের আস্থাভাজন লোকেদের মধ্যে এই দু-জনই ছিলেন

অন্যতম। তাছাড়া দরকার ছিল যে সেক্রেটারি যিনি হবেন, তাঁর চলনসইরকম ইংরেজির জ্ঞান থাকবে। আমার প্রস্তাবমতো, কংগ্রেস সম্পাদক-পদের জন্য আদমজী মিঞাখান-এর নাম অনুমোদন করলেন। পরবর্তী ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়েছিল, তাঁকে নির্বাচন ক'রে কংগ্রেস ভালো কাজই করেছিলেন। অধ্যবসায়, সদাশয়তা, সহৃদয়তা ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি সকলের মন জয় করেছিলেন। সকলের কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে ব্যারিস্টর না-হয়েও এবং ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা না-থাকলেও সৎ লোক কিংবা পরিশ্রমী লোক যোগ্যতার সঙ্গে সেক্রেটারির কাজ করতে পারেন।

১৮৯৬-এর মাঝামাঝি, কলকাতাগামী 'পঙ্গোলা' স্টীমার-যোগে আমি দেশে ফেরার পথে পাড়ি দিই।

জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তাঁদের মধ্যে দু-জন ইংরেজ রাজকর্মচারীর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়েছিল। তাঁদের একজনের সঙ্গে দৈনিক এক ঘণ্টা দাবা খেলতাম। জাহাজের ডাক্তার আমায় তাঁর *Tamil Self-Teacher* ব'লে তামিল ভাষা শেখার একটি বই পড়তে দিয়েছিলেন। আমি তামিল শিখতে আরম্ভ করলাম। নাটাল-এর অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝেছিলাম, মুসলমানদের মনের নাগাল পেতে হ'লে আমার যেমন উর্দু জানা দরকার, তেমনি মাদ্রাজিদের সঙ্গে মিশতে হ'লে তামিল জানা উচিত।

যে ইংরেজ বন্ধুটি আমার সঙ্গে উর্দু পড়তে শুরু করেছিলেন, তাঁর অনুরোধে আমি ডেক্-যাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন ভালো উর্দু-জানা মুন্সী খুঁজেপেতে বের করি। তাঁর সহায়তায় আমাদের উর্দু শেখা বেশ ভালো এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই রাজকর্মচারীটির স্মরণশক্তি ছিল আমার চেয়ে প্রখর। উর্দু অক্ষর মনে রাখতে গিয়ে আমার প্রায়ই বেগ পেতে হ'ত, তিনি কিন্তু একবার দেখেই উর্দু শব্দ বেশ মনে গেঁথে রাখতে পারতেন। আমি যতই-না পরিশ্রম করি কিছুতেই তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারিনি।

তামিল শেখায় আমি কিন্তু বেশ এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমায় সাহায্য করার জন্য কোনো শিক্ষক ছিলেন না। কিন্তু *Tamil Self-Teacher* বইটি এমন সুন্দরভাবে লেখা যে বাইরে থেকে সাহায্য নেবার কোনো দরকারও ছিল না।

মনে-মনে আশা ছিল যে দেশে ফেরার পরেও এই ভাষা-শিক্ষার কাজটা আমি চালিয়ে যাব। কিন্তু তা আর সম্ভবপর হ'ল না। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে লেখাপড়ার কাজ আমি যতটুকু করতে পেরেছি, তা জেলে থাকতে। তামিল ও উর্দু, এই দুটি ভাষা শেখাতেই আমি কিছুটা এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু তা-ও জেলে থাকতে—দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে থাকতে তামিল শিখেছি, উর্দু শিখেছি য়ার্বেদা জেলে। কিন্তু তামিল ভাষায় কথা বলাটা আমি কখনো রপ্ত করতে পারিনি, আর পড়তে যতটুকু-বা পারতাম, চর্চার অভাবে তা-ও ভুলে যাবার দাখিল হয়েছে।

তামিল ও তেলুগু না-জানাটা যে কত বড়ো অসুবিধা, তা এখনো আমার মনকে পীড়া দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্রাবিড় সম্প্রদায় অজস্র ধারায় আমার প্রতি তাঁদের স্নেহ-ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন। সে স্মৃতি আমার চিরস্থায়ী সম্পদ। আজও যখন আমি কোনো তামিল

বা তেলুগু বন্ধু দেখি, আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাদের সেইসব দেশ-ভাইদের ছবি, যাদের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও স্বার্থলেশহীন ত্যাগের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষ তাদের অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা যে সংগ্রাম করেছিলাম, তা এইসব নিরক্ষরদেরই জন্য। সেইজন্য এই সংগ্রামের সৈনিকেরাও ছিলেন অধিকাংশই নিরক্ষর। গরীবদের জন্য লড়াইয়ে গরীবেরাই এসেছিল দলে-দলে এই সংগ্রামের শরিক হতে। তাদের ভাষা জানতাম না সত্যি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এইসব সহজ সরল ভালোমানুষদের হৃদয়-হরণ করতে গিয়ে আমায় বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। তারা ভাঙা-ভাঙা হিন্দি কিংবা ইংরেজিতে কথা বলত, কিন্তু তাতে আমাদের কাজে কখনো বিঘ্ন ঘটত না। তত্রাচ আমি যে তামিল তেলুগু শেখার প্রযত্ন করেছিলাম, সে কেবল তাদের প্রেমের সামান্য প্রতিদান হিসাবে। ইতিপূর্বেই তো বলেছি তামিল শিক্ষা আমার কিছুদূর অবধি এগিয়েছিল। তেলুগু শেখার চেষ্টা করেছিলাম দেশে ফিরে আসবার পর। কিন্তু তাতে আমি বর্ণপরিচয়ের বেশি এগোতে পারিনি। এই দুই ভাষা আমি যে কখনো শিখে উঠতে পারব, সেরকম ভরসা আমি আর রাখি না। মনে-মনে তাই আমি আশা পোষণ করি যে দ্রাবিড়ভাষীরা একদিন হিন্দুস্তানি শিখে নিতে পারবে। দক্ষিণ আফ্রিকার যেসব দ্রাবিড় ইংরেজি জানে না, তারা একধরনের হিন্দি বা হিন্দুস্তানি বলতে পারে। মুশকিল হয়েছে ইংরেজি-জানাদের নিয়ে। তারা শিখতে চায় না দেখে মনে হয় যে হয়তো-বা ইংরেজি জানাটাই আমাদের অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শেখার অন্তরায়।

আমি কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়েছি। সমুদ্রযাত্রার কথায় ফিরে যাওয়া যাক্। 'পঙ্গোলা' জাহাজের ক্যাপ্টেন-এর কথা এখনো আপনাদের বলা হয়নি। আমাদের দুটিতে বেশ ভাব হয়েছিল। ক্যাপ্টেন মানুষটি ছিলেন ভালো। তিনি ছিলেন সেই প্লিমাথ ব্রাদার সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনার বিষয় ছিল নৌবিদ্যা সম্বন্ধে ততটা নয়, যতটা অধ্যাত্মবিদ্যা-বিষয়ে। তিনি বলতেন, নীতি ও ধর্ম-বিশ্বাস দুই আলাদা জিনিস। *বাইবেল*-এর শিক্ষা ছিল তাঁর কাছে ছেলেখেলার মতো। তিনি বলতেন, *বাইবেল*-এর সৌন্দর্য সেখানে যেখানে মানুষ বিশ্বাসে সরল। তিনি বলতেন, আবালবৃদ্ধবণিতা যদি যীশুতে আস্থা রাখে, যদি তাঁর আত্মবলিদানে শ্রদ্ধাশীল হয়, তাহলে সমস্ত পাপ থেকে পরিত্রাণ অবশ্যম্ভাবী। এই ক্যাপ্টেনকে দেখে আমার সেই প্রিটোরিয়ার প্লিমাথ ব্রাদার্-এর কথা মনে পড়ে যেত। তিনি বলতেন যে ধর্মে নৈতিক বিধিনিষেধ থাকে, সে ধর্ম ভুয়ো। ক্যাপ্টেন-এর সঙ্গে এইসব আলোচনার মূলে ছিল আমার নিরামিষ আহার। আমি কেন মাংস খাই না, গোমাংসেই-বা আপত্তি কিসের? মানুষের উপভোগের জন্য তিনি যেমন উদ্ভিদ-জগতের সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তো সৃষ্টি করেছেন পশু ও পাখির মতো নিম্নস্তরের প্রাণীজগৎ? এইসব প্রশ্ন থেকে ধর্মীয় আলোচনা আপনা থেকে এসে পড়ত।

যুক্তি-তর্কে আমরা কেউ কাউকে হারাতে পারিনি। ধর্ম ও নীতি যে একই বস্তু এই ছিল আমার স্থির সিদ্ধান্ত। বিপরীত সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত এ বিষয়ে ক্যাপ্টেন-এর লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

চব্বিশদিন পরে আমাদের আনন্দ-যাত্রা শেষ হ'ল। হুগলি নদীর দুইপাশের শোভা দেখতে-দেখতে আমি কলকাতা বন্দরে পা দিলাম। সেইদিনই আমি বোম্বাই যাবার ট্রেন ধরি।

২৫. ভারতে

বোম্বাই যাবার পথে ট্রেন এলাহাবাদে দাঁড়াবে পয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য। ভাবলাম, সেই সময়টুকু ঘোড়াগাড়িতে চ'ড়ে শহর ঘুরে দেখা যাবে। তাছাড়া ওষুধের দোকানে কিছু ওষুধবিষুধ কেনবারও দরকার ছিল। কম্পাউন্ডার লোকটি তখনো আধো ঘুমে আচ্ছন্ন। ওষুধ তৈরি করতে তিনি অসম্ভব দেরি করলেন। ফলে, আমি যখন স্টেশন-এ গিয়ে পৌঁছলাম, দেখি কী, ট্রেন সদ্য রওনা হয়ে গেছে। স্টেশনমাস্টার আমার প্রতি অনুগ্রহ ক'রে মিনিটখানেক ট্রেন আট্‌কে রেখেছিলেন। আমার কোনো চিহ্ন দেখতে না-পেয়ে তিনি সযত্নে আমার সব মালপত্তর নামিয়ে রেখেছিলেন।

কেলনার হোটেলে আমি একটি কামরা নিয়ে স্থির করলাম, কালবিলম্ব না-ক'রে কাজ শুরু ক'রে দিতে হবে। এলাহাবাদ থেকে *The Pioneer* নামে যে দৈনিক কাগজ বেরুত, তার বিষয়ে আমি অনেক-কিছু শুনেছিলাম। জানা ছিল যে এই কাগজ ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। যদ্দূর মনে পড়ে, তখন এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন মিস্টার চেস্‌নি, জুনিয়র। আমার তো লক্ষ্য ছিল নির্বিশেষে সকল লোকেরই সহায়তা ভিক্ষা করা। সুতরাং আমি মিস্টার চেস্‌নিকে চিঠি লিখে জানালাম, কীভাবে আমি ট্রেন মিস্ করেছি। আর লিখলাম, পরের দিন ট্রেন ধরার আগে তিনি যদি তাঁকে সাক্ষাৎকারের জন্য আমায় একটু সময় দেন তাহলে আমি খুব বাধিত হই। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি মোলাকাতের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে আমার খুব ভালো লাগল, বিশেষত যখন দেখলাম, তিনি আমার বক্তব্য বেশ মন দিয়ে ধৈর্য ধ'রে শুনলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়ে আমি যদি কিছু লিখি, তিনি তাঁর কাগজে তার সমালোচনা লিখে ছাপাবেন ব'লে কথা দিলেন। অবশ্য সেইসঙ্গে তিনি এ-ও বললেন ভারতীয়দের সমস্ত দাবি তিনি যে মেনে নেবেন এমন কোনো কথা তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি আমাদের কথা যেমন বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখবেন, তেমনি উপনিবেশ-শাসকদের কথাও তাঁকে নিরপেক্ষভাবে বিচার ক'রে নিতে হবে।

আমি তাঁকে বললাম, "আপনি-যে প্রশ্নটি বিচার করবেন ও তাই নিয়ে আপনার কাগজে আলোচনা বের করবেন, সেইটুকুই যথেষ্ট। নিছক যেটুকু ন্যায়বিচার, তার বেশি-কিছু আমরা চাই না, দাবিও করি না।"

দিনের বাকি সময়টা শহরের দ্রষ্টব্য জায়গা দেখে কাটানো গেল। তিনটি নদীর সঙ্গম অর্থাৎ ত্রিবেণীর শোভা দেখে আমার খুব ভালো লাগল। নদীর ধারে ব'সে-ব'সে, দেশে

থাকতে আমি কী কাজ করতে পারি, তার একটা প্ল্যান মনে-মনে ছ'কে নেওয়ার চেষ্টা করলাম।

Pioneer কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারের ফল হয়েছিল সদূরপ্রসারী। এরই ফলে পর-পর এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যার পরিণামে আমায় নাটাল-এ প্রায় ফাঁসিকাঠে লট্‌কাবার উপক্রম হ'য়েছিল।

বোম্বাই শহরে কালক্ষেপ না-ক'রে আমি সোজা চ'লে গেলাম রাজকোট। সেখানে ব'সে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি বিষয়ে একটি প্রচারপত্র রচনার উদ্‌যোগ করতে থাকি। এই পুস্তিকা লিখতে ও ছাপিয়ে বের করতে আমার প্রায় মাসখানেক সময় লেগেছিল। এর মলাটটা ছিল সবুজ রঙের। ফলে পুস্তিকাটির নাম হয় 'The Green Pamphlet'। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের যে ছবি আমি এই পুস্তিকায় দিয়েছিলাম, তাতে আমি ইচ্ছা ক'রেই কোনো কড়া রঙ চড়াইনি। ভাষা ছিল দস্তুরমতো সংযত। ইতিপূর্বে নাটাল-এ থাকতে আমি যে দুটি পুস্তিকা লিখে প্রচার করেছিলাম, তুলনায় এই 'The Green Pamphlet'-এর ভাষা ছিল অনেক নরম। আমি জানতাম, দূর থেকে যেসব ঘটনার কথা শোনা যায়, তা অনেক-সময় বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

পুস্তিকা ছাপা হয়েছিল দশ হাজার। কপি পাঠানো হয়েছিল দেশের প্রত্যেক কাগজে, প্রত্যেকে রাজনীতিক দলের নেতাদের কাছে। পুস্তিকা-বিষয়ে প্রথম যে সম্পাদকীয় মন্তব্য বের হয়, সে সেই *Pioneer* কাগজে। রয়টার এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্তসার টেলিগ্রাফ-যোগে বিলেতে পাঠান। এই সংক্ষিপ্তসারের একটি অতিক্ষুদ্র সংস্করণ রয়টারের লন্ডন অফিস থেকে টেলিগ্রাফে পাঠানো হয় নাটাল। বহরে সেটি ছিল ছাপা হরফে তিন লাইনের বেশি নয়। নাটাল-এ ভারতীয়দের প্রতি আচরণের যে ছবি আমি এঁকেছিলাম, এটি ছিল তার মিনিয়েচার। এর ভাষা ছিল অতিশয্যদুষ্ট—আমার ভাষা নয়। এর ফলে নাটাল-এ কীরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সে কথা পরে বলব। ইতিমধ্যে কিন্তু দেশের সব নামজাদা কাগজেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্ন নিয়ে সুদীর্ঘ মন্তব্য বেরিয়েছিল।

পুস্তিকাগুলি ডাকযোগে পাঠানো খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। মোড়ক তৈরি করা, আঠা দিয়ে আঁটা, প্রভৃতি কাজের জন্য পয়সা দিতে হ'লে কিছু পয়সা খরচ হ'ত। আমি একটি সহজ পথ বের করেছিলাম। সকালবেলা পাড়ার ছেলেদের স্কুলে যেতে হ'ত না। আমি তাদের সবাইকে জড়ো ক'রে বললাম, সকালবেলা ঘণ্টা-দু-তিন তারা স্বেচ্ছাসেবকের মতো এ কাজ ক'রে দিতে পারে কি-না। তারা খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেল। এ কাজটা ক'রে দিলে আমি তাদের সাধুবাদ দেব, আশীর্বাদ দেব, আর দেব আমার সংগ্রহ করা নানারকম ডাকটিকিটের পুরস্কার। তারা অতি অল্পসময়ের মধ্যে কাজটা শেষ ক'রে দিল। ছোট্ট ছেলেদের দিয়ে স্বেচ্ছাসবকের কাজ করিয়ে নেওয়া সেই আমার প্রথম। সেই ছেলেদের মধ্যে দু-জন এখনো আমার সহকর্মীরূপে কাজ করছে।

এইসময়েই বোম্বাই শহরে মহামারীরূপে দেখা দিল প্লেগ। চারিদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। রাজকোটেও প্লেগ ছড়াতে পারে ব'লে লোকের মনে ভয় জাগল। মনে হ'ল,

জনস্বাস্থ্য-বিভাগের কাজে আমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি। রাজকোট-রাজকে অনুরোধ জানালাম, তাঁরা যেন আমায় কাজে লাগান। জনস্বাস্থ্য-ব্যবস্থার কাজ তদারকি করার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হ'ল, তাঁরা আমায় সেই কমিটির সদস্য ক'রে নিলেন। পায়খানা সাফাইয়ের কাজের ওপর আমি বিশেষ গুরুত্ব দিই। কমিটি স্থির করেন, প্রতি রাস্তায় প্রতিটি পায়খানা সরেজমিনে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। নগরবাসীর মধ্যে যারা গরীব, তারা এই তদারকির ব্যাপারে কোনো ওজর-আপত্তি তোলেনি, বরঞ্চ পায়খানা সংস্কারের বিষয়ে তারা আমাদের নির্দেশ-মাফিক কাজও করেছিল। কিন্তু বড়ো লোক, মানী লোকদের ব্যবহার ছিল অন্যরকম। আমাদের পরামর্শে কান দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের অনেকে আমাদের ঘরে ঢুকতে পর্যন্ত দিতে চায়নি। আমরা অবশ্য লক্ষ করেছিলাম যে বড়োলোকের বাড়ির পায়খানা বেশি নোংরা। অন্ধকার, দুর্গন্ধ, ময়লায় পোকাতে কৃমিতে সমস্ত পায়খানা যেন কিলবিল করছে। আমরা যেসব সংস্কারের কথা বলেছিলাম, সেগুলি ছিল নিতান্তই সাদাসিধে। মল মাটিতে পড়তে না-দিয়ে বাল্‌তি ব্যবহার করা, মূত্র মেঝেতে শুষতে না-দিয়ে বাল্‌তিতে জমতে দেওয়া, পায়খানায় যাতে আলো-হাওয়া প্রবেশ করতে পারে ও মেথর পায়খানা ঠিকমতো সাফ্ করতে পারে, সেজন্য বাইরের পাঁচিল ও পায়খানার দেওয়ালের মধ্যে কোনো তফাৎ না-রাখা—এই ছিল মোটামুটি আমাদের প্রস্তাব। দেওয়াল ভেঙে ফেলার প্রস্তাবটা অধিকাংশ বড়োলোক মেনে নিতে চাইলেন না, নানারকম ওজর-আপত্তি তুললেন ও অনেক ক্ষেত্রে সে কাজটা এড়িয়েও গেলেন।

কমিটির সদস্যদের অচ্ছুৎদের মহল্লাতেও যাবার কথা হয়েছিল। কমিটির একজনমাত্র সদস্য এই তদারকির কাজে আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। আর-সবাই তো ছি-ছি ক'রে উঠলেন। অচ্ছুৎদের বস্তিতে পা দেবেন, তা-ও আবার তাদের পায়খানা দেখার জন্য—এ তো এক অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু অচ্ছুৎদের পাড়া দেখে আমি আনন্দে অবাক হলাম। এরকম অঞ্চলে সেই প্রথম আমার পা দেওয়া। পাড়ার সব পুরুষ ও নারী আমাদের দুটিকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর আমরা যখন তাদের পায়খানা দেখতে চাইলাম, তাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না।

"পায়খানা! আমাদের আবার পায়খানা আছে না-কি? আমরা তো খোলা আকাশের তলায়—মাঠে-ঘাটে ঝোপে-ঝাড়ে বনে-জঙ্গলে যাই। পায়খানা হ'ল আপনাদের মতো বড়ো লোকদের জন্য।"

"আচ্ছা, তাহলে তোমাদের ঘর-বাড়ি কি আমাদের একটু দেখতে দেবে?"

"সে আর বলতে মশাই। আসুন, আসুন। আমাদের ঘর-বাড়ির আনাচে-কানাচে যেখানে খুশি আপনারা ঘুরে-ঘুরে দেখতে পারেন। আমাদের আবার ঘর-বাড়ি, নিতান্ত মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই।"

ঘর-বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখি, বাইরে যেমন ভিতরেও তেমনি সব-কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়ির আঙিনা ঝাড়ু দিয়ে তক্‌তকে পরিষ্কার, সুন্দর লেপাপোঁছা মেঝে, সামান্য

দু-চারটে বাসনকোসন মেজে-ঘ'সে ঝক্‌ঝকে। বুঝতে পারলাম, এ অঞ্চলে মড়ক লাগার কোনো আশঙ্কা নেই।

সম্ভ্রান্ত পাড়ার একটা পায়খানার দুরবস্থার কথা বিশদভাবে বলা দরকার। এ বাড়ির প্রত্যেকটি কামরায় একটি ক'রে ড্রেন ছিল। সেইসব নালি দিয়ে যেমন জল নিষ্কাশন হ'ত তেমনি প্রস্রাবও। ফলে সমস্ত ঘরেই উৎকট দুর্গন্ধ। আরেকটি বাড়ির দোতলায় শোবার ঘরে এইরকম একটি নালি দেখতে পেয়েছিলাম। এই নালিটি ব্যবহৃত হ'ত কেবল প্রস্রাবের জন্য নয়, মলত্যাগেরও জন্য। নালির মুখে একটি পাইপ লাগানো ছিল। সেই রাস্তায় মলমূত্র গিয়ে জমা হ'ত একতলায়। দুর্গন্ধে এই কামরায় একদণ্ড তিষ্ঠানো ভার, অথচ এই ঘরের বাসিন্দারা কী ক'রে এইরকম শোবার ঘরে নিদ্রা যেত, সে কথা আপনারা একবার কল্পনা ক'রে দেখুন।

রাজকোটে বৈষ্ণবদের যে মন্দির ছিল, কমিটি সেটিও সন্দর্শন করতে গিয়েছিলেন। হাবেলির ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতের সঙ্গে গান্ধী-পরিবারের বেশ সৌহার্দ ছিল। তিনি খুব খুশি হয়ে আমাদের সব-কিছু ঘুরে-ঘুরে দেখতে বললেন, আর বললেন কোথায় কীভাবে সংস্কারসাধন করা যায়, সে বিষয়ে আমরা যেন তাঁকে পরামর্শ দিই। হাবেলির একটি অংশ ছিল যা তিনিও না-কি দেখেননি। ভোগ খাবার পর, যে পাতায় খাওয়া হ'ত ভুক্তাবশিষ্ট-সমেত সেইসব পাতা মন্দির-চত্বরের একটি দেওয়ালের ওপর দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হ'ত। সেই জায়গাটা ছিল কাক ও চিলেদের রাজ্য। হাবেলির পায়খানাগুলিও ছিল খুবই নোংরা। রাজকোটে আমি দীর্ঘকাল থাকতে পারিনি ব'লে, হাবেলির প্রধান পুরোহিত আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কার কতটা সাধন করেছিলেন, সে আমি নিজের চোখে দেখে আসতে পারিনি।

পূজার মন্দির যে এতটা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন হতে পারে—এ আমার ধারণার অতীত ছিল। দেখে-শুনে আমি মনে গভীর বেদনা অনুভব করি। আমি ভাবতাম, দেবস্থানকে লোকে যেহেতু পবিত্র ব'লে থাকে, মন্দির হাবেলিতে অন্তত স্বাস্থ্যের নিয়ম যথোচিত যত্নের সঙ্গে প্রতিপালিত হবে, আমাদের দেশের স্মৃতিকাররা যে অন্তরে-বাইরে শুচিতা রক্ষা করার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরাপ করতেন, সেইসময়েও সে কথা আমার জানা ছিল।

২৬. দুটি আবেগ

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রতি আমার যেমন গভীর আনুগত্য ছিল, তেমনটা বড়ো-একটা দেখা যায় না। এখন আমি বুঝতে পারি, আমার এই রাজভক্তির মূলে ছিল আমার সত্যনিষ্ঠা। রাজভক্তি বা অন্য-কোনো ভাবাবেগের ভান করা আমার পক্ষে অসম্ভব ব'লে মনে হ'ত। নাটাল-এ থাকতে যেসব সভায় আমি যোগ দিতাম, সেসব সভার শেষে ব্রিটিশ জাতীয় সঙ্গীত 'গড সেভ দি কিং' গাওয়া হ'ত। সেই সমবেত সঙ্গীতে যোগদান করা আমি

অবশ্যকর্তব্য ব'লে মনে করতাম। ব্রিটিশ শাসনের দোষ-ত্রুটি আমার নজরে না-পড়ত এমন নয়। তবু আমার মনে হ'ত, মোটামুটি এই শাসনতন্ত্র মেনে নেওয়া ভালো। তখন আমার মনে হ'ত যে হরেদরে পারে ব্রিটিশ-শাসনের লক্ষ্য ছিল প্রজাসাধারণের মঙ্গলবিধান।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি যে তীব্র বর্ণবিদ্বেষ দেখেছিলাম, আমার মনে হ'ত তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য-বিরোধী একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার—যা না-কি নিতান্তই স্থান ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাই রাজভক্তিতে আমি ইংরেজদেরও এককাঠি বাড়া হবার জন্য প্রযত্ন করতাম। বহু অধ্যবসায়ে আমি তাই ইংরেজের জাতীয় সংগীত 'গড সেভ দ্য কিং'-এর সুরটুকু আয়ত্ত করেছিলাম। সুযোগ পেলেই আমি আর-সকলের সঙ্গে এই সমবেত সঙ্গীত গাইতাম। লোক-দেখানো আড়ম্বরের প্রসঙ্গ যেখানে থাকত না, সেখানে রাজার প্রতি আমার আনুগত্য প্রদর্শনে যত্নবান্ হতাম।

নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিংবা ব্যক্তিগত লাভালাভের খাতিরে আমি আমার এই রাজভক্তিকে কখনো খাটাইনি। কোনো ইনাম বা পুরস্কারের লোভ না-রেখে আমি আমার রাজ-ঋণ পরিশোধ ক'রে যাওয়া উচিত ব'লে মনে করতাম।

আমি যখন ভারতবর্ষে, সে সময়ে মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জয়ন্তী উৎসব-পালনের উদ্‌যোগ চলছিল। এই প্রস্তুতিপর্বের জন্য রাজকোটে যে কমিটি গঠিত হয় তাতে সদস্য হিসেবে যোগ দেবার জন্য আমি আমন্ত্রিত হই। যদিচ রাজার সন্দেহ হয়েছিল যে সত্যিকার রাজভক্তির চেয়ে লোক-দেখানো আড়ম্বরের প্রতিই উদ্‌যোক্তাদের আকর্ষণ বেশি, তবু এই সদস্যপদ আমি গ্রহণ করেছিলাম। যখন সত্যি-সত্যি দেখা গেল যে আবেগের চেয়ে ভড়ং বেশি, মনে খুব দুঃখ হ'ল, কমিটিতে থাকা আমার উচিত হবে কি অনুচিত হবে, তা নিয়েও মনে প্রশ্ন জাগল। শেষপর্যন্ত স্থির করলাম আমার ওপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে আমি কেবল সেই কর্তব্যটুকু ক'রে যাব, আর-কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করব না।

প্রস্তাব হয়েছিল, উৎসবের অঙ্গরূপে বৃক্ষরোপণ করা হবে। অনেকে এ কাজে হাত লাগিয়েছিলেন কেবল লোক-দেখানোর খাতিরে কিংবা কর্তৃপক্ষীয়কে খুশি করার জন্য। আমি লোকেদের বোঝাতে চেষ্টা করতাম যেন তাঁরা মনে না-করেন যে বৃক্ষরোপণ করা তাঁদের অবশ্যকর্তব্য। উৎসব-পালনের অন্যান্য অঙ্গের মতো বৃক্ষরোপণও প্রস্তাবমাত্র। মন চায় তো যথোচিত মনোযোগ দিয়ে বৃক্ষরোপণ করুন, নতুবা আদৌ করতে যাবেন না। আমার যেন মনে হয়, লোকে আমার এসব কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আমার মনে আছে, আমায় যে গাছটি রোপণ করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, আমি তা যথোচিত যত্নে লাগিয়েছিলাম। গাছের গোড়ায় নিয়মিত জল দিতাম ও তার লালন-পালন-বর্ধনের জন্য বিধিমতো চেষ্টা করতাম।

এছাড়া আমি আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের 'গড সেভ দ্য কিং' গানটি গাইতে শেখাতাম। স্থানীয় ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদেরও আমি এই গান শিখিয়েছি ব'লে মনে পড়ে, তবে সেটা মহারানীর জয়ন্তীর সময়, কি সপ্তম এডওয়ার্ড-এর ভারতসম্রাট ব'লে অভিষেকের সময়—তা আমার ঠিক মনে পড়ে না। পরে এই গানের কয়েকটি চরণ নিয়ে আমার কেমন

খট্‌কা লাগত। অহিংসা সম্বন্ধে আমার ধারণা যত স্পষ্ট হতে লাগল, বাক্যে ও চিন্তায় আমি ততই সতর্ক হতে লাগলাম। ব্রিটিশ রাষ্ট্রগীতের দুটি চরণে বলা হয়েছে :

বৈরী হউক ছত্রভঙ্গ, হোক তারা পরাহত
ধ্বংস হউক বুদ্ধি তাদের দুরভিসন্ধি যত।

এইসব কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে আমার অহিংসায় কেমন যেন বাধত। আমার এই সংশয়ের কথা আমি ডক্টর বুথকে বলেছিলাম। তিনি আমার কথায় সায় দিয়ে বলেছিলেন, অহিংসায় আস্থাবান্ কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই চরণগুলি গাইবার সময় যোগ দেওয়া শক্ত। 'বৈরী' হ'লেই মানুষের 'দুরভিসন্ধি' থাকবে কেন? আর শত্রু হ'লেই লোক কেন খারাপ হবে? ঈশ্বরের কাছ থেকে একমাত্র যে জিনিস মানুষ চাইতে পারে, তা হ'ল ন্যায়বিচার। ডক্টর বুথ আমার এই কথার সত্যতা স্বীকার ক'রে নিলেন। তাঁর গির্জায় উপাসকমণ্ডলীর জন্য তিনি একটি নতুন জাতীয়সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ডক্টর বুথ-এর প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

রাজভক্তির মতন আমার আরেকটি যে স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, তা হ'ল রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করা। আপন-পর নির্বিশেষে রোগীর শুশ্রূষায় আমার প্রবল অনুরাগ ছিল।

রাজকোটে থাকতে যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ক পুস্তিকা রচনায় ব্যস্ত, সেসময় একবার ঝট্ ক'রে বোম্বাই ঘুরে আসি। আমার অভিপ্রায় ছিল, বড়ো-বড়ো শহরে সভা সংগঠন ক'রে জনমত গঠন করা। এর জন্য সর্বপ্রথম আমি বোম্বাই শহর বেছে নিই। গোড়াতে আমি জাস্টিস্ রানাডে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন এবং পরামর্শ দিলেন যেন আমি স্যর ফিরোজশা মেহ্‌তার সঙ্গে দেখা করি। তারপর আমি জাস্টিস্ বদরুদ্দিন তৈয়বজীর সঙ্গে দেখা করি, তিনিও আমায় একই উপদেশ দিলেন। বললেন, "জাস্টিস্ রানাডে কিংবা আমি এ ব্যাপারে আপনাকে সামান্যই সহায়তা করতে পারি। জজ-পদে আমরা প্রতিষ্ঠিত আছি ব'লে প্রকাশ্যভাবে কোনো জন-আন্দোলনে আমরা যোগ দিতে পারি না, কিন্তু আপনার কাজে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। সত্যি-সত্যি আপনাদের পথ দেখাতে পারবেন স্যর ফিরোজশা মেহ্‌তা।"

স্যর ফিরোজশার সঙ্গে দেখা আমি করব—এ আমি ঠিকই ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু গুরুস্থানীয় এই দুই জ্ঞানবৃদ্ধ যখন আমায় বললেন যে আমি যেন তাঁর পরামর্শমতো কাজ করি, তখন ঠিক বুঝতে পারলাম জনসাধারণের উপর স্যর ফিরোজশা মেহ্‌তার কী সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম যথাসময়ে। তাঁকে দেখে আমি অভিভূত হয়ে যেতে পারি—এইভাবে প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। জনসাধারণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য তাঁকে নানা নামে বিভূষিত করেছিল—এ কথা আমি জানতাম। আমি মনে-মনে তৈরি হয়েই গিয়েছিলাম, 'বোম্বাইয়ের পুরুষসিংহ' 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মুকুটবিহীন রাজা'র, সন্দর্শন লাভের জন্য। রাজা কিন্তু আমার মনে কোনো ভয়ের সঞ্চার করেননি। সাবালক পুত্রকে স্নেহশীল পিতা যেভাবে স্বাগত করেন, তিনি সেইরকম সমাদরে আমায় গ্রহণ করলেন। সাক্ষাৎকার হ'ল তাঁর চেম্বারে। তিনি তখন তাঁর বন্ধুবান্ধব ও অনুচরদের দ্বারা

পরিবৃত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওয়াচা ও কামা। তাঁদের দু-জনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল। ওয়াচার কথা আমি ইতিপূর্বেই শুনেছিলাম, তাঁকে বলা হ'ত স্যর ফিরোজশার ডান হাত। বীরচন্দ্ গান্ধীর কাছ থেকে শুনেছিলাম পরিসংখ্যানশাস্ত্রে ওযাচা একজন সুপণ্ডিত। ওয়াচা আমায় বললেন, "গান্ধী, আমাদের নিশ্চয় আবার দেখা হবে।"

এসব আলাপ-পরিচয়ের ব্যাপার মিনিট দুয়েকের মধ্যে সমাধা হয়ে গেল। স্যর ফিরোজশা আমার সমস্ত বক্তব্য বেশ মন দিয়ে শুনলেন। জাস্টিস্ রানাডে ও জাস্টিস্ তৈয়বজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের কথা আমি তাঁকে বলি। স্যর ফিরোজশা বললেন, "গান্ধী, দেখতে পাচ্ছি তোমায় আমার সাহায্য করতেই হবে। তোমার জন্য আমায় একটি জনসভা ডাকতে হয়।" এই ব'লে তিনি তাঁর সেক্রেটারি মুন্সীর দিকে ফিরে বললেন, সভার জন্য একটি দিন স্থির করতে। একটা তারিখ নির্দিষ্ট ক'রে তিনি আমায় বিদায়-সম্ভাষণ করলেন এবং ব'লে দিলেন যেন অধিবেশনের আগের দিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। এই সাক্ষাৎকারের ফলে আমার ভয়-ভাবনা দূর হ'ল এবং আমি খুশি মনে ঘরে ফিরে গেলাম।

এ যাত্রা বোম্বাই থাকাকালে আমার ভগ্নীপতির সঙ্গে দেখা করি। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। আমার ভগ্নীও একাহাতে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার ঠিকমতো ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারছিলেন না। রোগ কঠিন ছিল। আমি তাই তাঁদের রাজকোটে নিয়ে যেতে চাইলাম। আমার ভগ্নীপতি রাজি হলেন। আমি ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে নিয়ে রাজকোট ফিরে এলাম। রোগী যতদিন রোগে ভুগবেন ব'লে মনে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশিদিন ভুগলেন। ভগ্নীপতির জন্য আমি আমার ঘরখানা ছেড়ে দিয়েছিলাম। রাত্রিদিন আমার কাটত তাঁর রোগশয্যার পাশে। প্রতিদিন আমায় খানিকটা সময় রাত জাগতে হ'ত। ভগ্নীপতিকে সেবা-শুশ্রূষা করার ফাঁকে-ফাঁকে, আমায় সেই দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ক পুস্তিকা রচনার কাজ সারতে হ'ত। শেষপর্যন্ত রোগীকে আর বাঁচানো গেল না। সেই মৃত্যুশোকের মধ্যে আমার এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে রোগীর শেষ অবস্থায় আমি তাঁকে সেবা-শুশ্রূষার সুযোগ লাভ করেছিলাম।

সেবা-শুশ্রূষাব কাজে আমার এই ঐকান্তিক আগ্রহ ক্রমে-ক্রমে একপ্রকার ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল। একটা সময় ছিল যখন সেবা-শুশ্রূষার কাজে আগ্রহাতিশয়ের ফলে, আমার অন্যান্য কাজ আমি অবহেলা করেছি। কখনো-কখনো এমন হয়েছে যে কেবল আমার স্ত্রীকে নয়, বাড়ির প্রত্যেকটি লোককে এই শুশ্রূষার কাজে লাগিয়েছি।

সেবা-শুশ্রূষার কাজে তৃপ্তি লাভ না-করলে এ কাজের কোনো তাৎপর্য থাকে না। লোক-দেখাবার জন্য বা লোক-লজ্জার ভয়ে এ কাজ করলে মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব হয় ও তার হৃদয়বৃত্তি শুকিয়ে যায়। আনন্দ-লেশহীন সেবায় না-হয় রোগীর লাভ, না সেবকের। আনন্দের সঙ্গে যখন সেবার কাজ করা হয়, তার কাছে শরীরের আরাম বা ঐশ্বর্যের গর্ব—সব-কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়।

২৭. বোম্বাইয়ের সভা

আমার ভগ্নীপতি যেদিন শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন, ঠিক তার পরের দিন আমায় সেই জনসভায় যোগ দেবার জন্য বোম্বাই যেতে হ'ল। আমি কী যে বলব না-বলব সে বিষয়ে চিন্তামাত্র করবারও অবসর আমি পাইনি। দীর্ঘকাল রাতদিন ধ'রে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করেছি, শরীর ও মন আমার অবসন্ন, গলা একেবারে ব'সে গেছে। একমাত্র ভগবানের প্রতি ভরসা রেখে তো আমি বোম্বাই যাত্রা করলাম। আমার বক্তৃতা পূর্ব থেকে লিখে তৈরি ক'রে নিয়ে যাওয়া দরকার, সে কথা আমার ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি।

স্যর ফিরোজশা-র নির্দেশমতো জনসভার আগের দিন বিকেল পাঁচটায় তাঁর অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে গান্ধী, তোমার বক্তৃতা লিখে এনেছ তো?

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে আমি বললাম, "না স্যর। ভেবেছি, আমার যা বলার আমি মুখে-মুখে বলব।"

"বোম্বাই শহরে তা চলবে না। এ শহরে খবরকাগজের রিপোর্টিং তেমন সুবিধের নয়। জনসভা থেকে যদি কোনো ফ্যায়দা ওঠাতে হয় তাহলে তোমার বক্তৃতা লিখে ফেলতে হয় ও কাল সকালের আগেই ছাপিয়ে ফেলতে হয়। আশা করি তুমি, সে ব্যবস্থাটুকু ক'রে ফেলতে পারবে?"

আমি একটু আমতা-আমতা ক'রে বললাম যে চেষ্টা ক'রে দেখব।

"তাহলে ব'লে দাও মুন্সী কখন তোমার লেখাটা নিয়ে আসতে যাবে?"

আমি বললাম, "আজ রাত এগারোটায়।"

পরদিন সভায় গিয়ে বুঝতে পারলাম স্যর ফিরোজশা যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার পিছনে কতটা সুযুক্তি ছিল। সভা বসেছিল স্যর কোয়াসজি জাহাঙ্গীর ইনস্টিট্যুট-এর হল্-এ। শুনেছিলাম স্যর ফিরোজশা মেহ্তা যখন বক্তৃতা দিতে ওঠেন, তখন সভায় তিলধারণের জায়গা থাকে না। তাঁর মুখের কথা শোনার জন্য বিশেষ ক'রে ছাত্রদল একেবারে ভেঙে পড়ে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই-ধরনের জনসভা এই প্রথম। বুঝতে পারলাম, আমার ভাঙা গলা বেশিদূর পৌঁছুবে না। বক্তৃতা পড়তে যখন উঠলাম, সমস্ত শরীর আমার কাঁপছিল। স্যর ফিরোজশা ক্রমাগত আমায় উৎসাহ দিয়ে বলতে লাগলেন, "জোরে, আরেকটু জোরে।" যত তিনি উৎসাহ দিতে লাগলেন ততই যেন আমার গলা নিচু পর্দায় নেমে আসতে লাগল।

আমার বহুকালের বন্ধু কেশবরাও দেশপাণ্ডে আমায় মদত দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। আমার ছাপা বক্তৃতাব কপিটা আমি তাঁর হাতে দিয়ে দিলাম। তাঁর বেশ জোরদার গলা ছিল। কিন্তু জনতা তাঁর মুখে আমার বক্তৃতা শুনতে কিছুতেই রাজি হ'ল না। হল্-সুদ্ধ সমস্ত লোক চেঁচিয়ে উঠল, 'ওয়াচা', 'ওয়াচা'। সুতরাং ওয়াচাকেই এগিয়ে আসতে হ'ল। তিনি আমার বক্তৃতা প'ড়ে দিলেন, তার ফল হ'ল অভূতপূর্ব। সভার লোক একমুহূর্তে যেন নিস্তব্ধ

হয়ে গেল, শান্ত হয়ে আমার বক্তৃতা প্রথম থেকে শেষ অবধি বেশ মন দিয়ে শুনল। যথাস্থানে তারা ধিক্কারসূচক ধ্বনি দিয়ে বলল 'Shame', 'Shame'! এতে আমি খুবই খুশি হলাম।

স্যর ফিরোজশা আমার বক্তৃতার তারিফ করলেন। আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম।

এই জনসভার ফলে আমার দু-জন বন্ধুলাভ হ'ল, তাঁরা আমার কাজে সক্রিয় সহযোগ করবেন ব'লে কথা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন দেশপাণ্ডে অন্যজন ছিলেন এক পার্সি। তাঁর নামটা প্রকাশ করতে আমার একটা দ্বিধাবোধ হচ্ছে, কারণ আজ তিনি সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁরা দু-জনেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবেন। সেসময় বোম্বাই-এর ছোটো আদালতের জজ ছিলেন করসেট্জী। তিনি বিবাহের একটা ঘটকালি করতে গিয়ে আমার সেই পার্সি বন্ধুটিকে নিবৃত্ত করলেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে হয় বিবাহ, নয় আফ্রিকা—এই দুই বিকল্পের মধ্যে যে কোনো একটি তাঁকে বেছে নিতে বলা হ'ল। বন্ধুটি বিবাহের দিকেই ঝুঁকলেন। এই পার্সি বন্ধুটির প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন পার্সি রুস্তমজী। একটি পার্সি মহিলার পাণিগ্রহণের জন্য বন্ধু তাঁর কর্তব্য থেকে বিরত হয়েছিলেন। আজ সেই একটি পার্সি-ভগ্নীর জায়গায় একাধিক পার্সি-ভগ্নী খাদি উন্নয়নের কাজে আত্মনিবেদন ক'রে সেই ত্রুটি শোধন ক'রে চলেছেন। সুতরাং সেই পার্সি-দম্পতিকে আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে মার্জনা করেছি। আর দেশপাণ্ডের কথা আর-কী বলব। তাঁর অবশ্য বিবাহের লোভ ছিল না, তৎসত্ত্বেও তিনি আফ্রিকার কাজে যোগ দিতে পারেননি। কথা দিয়ে কথা না-রাখার জন্য আজও তিনি স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত ক'রে চলেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরবার পথে জাঞ্জিবারে তৈয়বজী-পরিবারের একজনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। তিনিও কথা দিয়েছিলেন, আমার পিছু-পিছু তিনিও দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে জুটবেন ও আমার কাজে সহায়তা করবেন। তাঁর কিন্তু আসা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাতে কী হয়, আজ তাঁর অকৃত কর্মের দরুণ দণ্ড দিচ্ছেন আব্বাস তৈয়বজী। অনুরোধ-উপরোধ ক'রে ভারতীয় কোনো ব্যারিস্টরকে ও দেশে নিয়ে যাবার চেষ্টা তিন-তিন ক্ষেত্রেই বিফল হ'ল।

এই সূত্রে আমার পেস্তনজী বাদশাহ্-র কথা মনে পড়ছে। বিলেতে থাকতেই আমরা পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় লন্ডন শহরের এক নিরামিষাহার রেস্তোরাঁয়। আমি জানতাম, তাঁর ভাই বারজোরজীর 'ছিটগ্রস্ত' ব'লে একটা বদনাম ছিল। তাঁকে আমি স্বচক্ষে দেখিনি, কিন্তু বন্ধুদের মুখে শুনতাম তিনি না-কি খামখেয়ালি-ধরনের মানুষ ছিলেন। সে যুগের ঘোড়ায় টানা ট্রাম্-এ চাপতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল, পাছে ঘোড়াদের কষ্ট হয়। তাঁর মেধা ও স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ, কিন্তু ডিগ্রিলাভে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল ব'লে, কোনোকালে ডিগ্রি নেননি। স্বাধীনচেতা মানুষ ব'লে তাঁর খ্যাতি ছিল। পার্সি সম্প্রদায়ের হ'লে কী হয়, আহারে তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। পেস্তনজীর এতটা নাম-যশ ছিল না, কিন্তু গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য লন্ডনেও তাঁকে সকলে সমীহ ক'রে চলত। আমাদের পারস্পরিক যোগের সূত্র ছিল এই যে আমরা দু-জনেই ছিলাম

নিরামিষাহারের সপক্ষে। নতুবা বিদ্যাবত্তায় তাঁর ধারেকাছে আসি—এমন আমার সাধ্য ছিল না।

বোম্বাই শহরে আমি পেস্তনজীকে খুঁজেপেতে বের করি। তিনি তখন বোম্বাই হাইকোর্ট-এর 'প্রোমোনোটারি' পদে অধিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হ'ল, তখন তিনি বৃহত্তর গুজরাতি ভাষাকোষ সঙ্কলনে ব্যস্ত। আমার এমন একজনও পরিচিত বন্ধুবান্ধব ছিলেন না যাঁদের কাছে আমার দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে সহযোগ প্রার্থনা করার জন্য দ্বারস্থ হইনি। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই পেস্তনজী বাদশাহ্‌র কাছে আমার যাওয়া। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে তো রাজি হলেনই না, বরঞ্চ আমায় চারবার বললেন আমি যেন ওদেশে ফিরে না-যাই।

তিনি বললেন, "অসম্ভব। তোমার কাজে আমি কিছুমাত্র সহায়তা করতে পারব না। সত্যি বলতে কী, আমি একেবারেই চাই না যে তুমি নিজেও সে দেশে ফিরে যাও। আমাদের নিজেদের দেশে কাজের কী কোনো কম্‌তি আছে? এই ধরো-না, গুজরাতি ভাষা নিয়ে এখনো কত কাজ বাকি আছে। শব্দকোষের জন্য আমায় এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংগ্রহ করতে হবে। এ তো গেল একধরনের কাজ। তাছাড়া ভেবে দেখো, এ দেশে কী নিদারুণ দারিদ্র। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অনেক কষ্ট, অনেক বাধাবিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়—সে না-হয় আমি মেনে নিলাম। কিন্তু তোমার মতো একটা লোক কেবল এই কাজে নিজেকে আহুতি দেবে—তেমনটা আমি চাই না। এসো-না, আমরা সবাই একজোট হয়ে ভারতে স্বায়ত্তশাসন লাভ করার চেষ্টা করি। দেশ যদি স্বাধীন হয়, তাহলে বিদেশে-স্থিত ভারতীয়দের সহায়তা, আমরা এমনিই করতে পারব। আমি জানি, তোমায় বোঝাতে যাওয়া আমার পণ্ডশ্রম-মাত্র। কিন্তু, আমি তোমায় ব'লে রাখছি—তোমার এই কাজে তোমার মতো আর-কেউ যদি দেশ ছেড়ে যেতে চায়, আমি তাদের বাধা দেব।"

পেস্তনজী বাদশাহ্‌-র নির্দেশ আমার মনঃপূত হয়নি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়েছে বৈ কমেনি। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর সুগভীর প্রেম দেখে আমি বিস্ময় বোধ করেছি। এই ঘটনার ফলে আমি তাঁর আরো নিকট-সান্নিধ্যে আসি, কারণ তাঁর বক্তব্য আমি ঠিকমতো বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ পরিহার করা দূরে থাক্‌, তাঁর সঙ্গে এই আলাপের ফলে আমার সঙ্কল্প বরঞ্চ দৃঢ়তর হ'ল। দেশভক্ত যিনি হবেন, মাতৃভূমির সেবার জন্য তাঁকে যে কোনোরকম কাজ বরণ ক'রে নিতে হবে। কোনো কাজ তাঁর উপেক্ষা করা সাজে না।

আমার পক্ষে পথনির্দেশের কাজ করেছে *গীতা*-র সেই অমোঘ বাণী :

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥

স্বধর্মের অনুষ্ঠান ত্রুটিযুক্ত হ'লেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম-সাধনে নিধনও শ্রেয়, যেহেতু অপরের ধর্ম ভয়ের কারণ।

২৮. পুণায় ও মাদ্রাজে

স্যর ফিরোজশা আমার পথ সহজ ক'রে দিয়েছিলেন। বোম্বাই থেকে আমি পুণা রওনা হয়ে গেলাম। দেখা গেল, শহরে দুটি সভা বা আলাদা দল। মত-নির্বিশেষ আমি সকল দলেরই সহযোগিতা লাভের জন্য আগ্রহী ছিলাম। গোড়াতে আমি গেলাম লোকমান্য তিলক-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি বললেন :

"দেখুন, আপনি যে দল-নির্বিশেষে সকল লোকের সহৃদয়তা চাইছেন, এ খুবই ভালো কথা। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা নিয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু সভাপতিত্ব করার জন্য এমন একজন লোক নির্বাচন করা দরকার, যিনি কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নন। প্রফেসর ভাণ্ডারকর-এর সঙ্গে আপনি দেখা করুন। সম্প্রতি তিনি সবরকম জন-আন্দোলন থেকে দূরে স'রে রয়েছেন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যাটি এমন গুরুতর যে তিনি হয়তো এ ব্যাপারে একান্তে থাকবেন না, বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করুন ও কী ফলাফল হয় আমায় জানাবেন। আমি নিজে তো আপনার এই কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত। যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন, আমার কাছে চ'লে আসবেন। এ ব্যাপারে মনে রাখবেন, আমি সম্পূর্ণ আপনার হাতে।"

লোকমান্যের সঙ্গে এই আমার সর্বপ্রথম চাক্ষুষ আলাপ। এই পরিচয়ের ফলে যেন বুঝতে পারলাম, লোকচিত্তজয়ে তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতার অন্তর্নিহিত কারণ কী।

অতঃপর আমি গোখলে-র সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন ফার্গুসন কলেজের বাগানে পায়চারি করছিলেন। সস্নেহ অভ্যর্থনায় তিনি আমায় আপন ক'রে নিলেন। একমুহূর্তে আমার হৃদয় যেন জয় ক'রে নিলেন। তাঁরও সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা। তবু কেমন যেন মনে হ'ল, তাঁর সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল ; আবার যেন তাঁর সঙ্গে নূতন ক'রে দেখা হ'ল। স্যর ফিরোজশা-কে দেখে আমার যেমন মনে হয়েছিল, হিমালয়ের মতো তিনি দুর্গম, তেমনি লোকমান্যকে দেখে মনে হয়েছিল সমুদ্রের মতো তিনি অপার। কিন্তু গোখলে যেন আমাদের সেই চিরপরিচিত গঙ্গা। তার পুণ্যতোয়া ধারায় অবগাহন ক'রে যেন শরীর-মন শান্ত হয়, শীতল হয়। হিমালয় সহজে মানুষের অধিগম্য নয়। আবার সমুদ্রে পাড়ি দেওয়াও সহজসাধ্য নয়। কিন্তু গঙ্গা যেন মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। নৌকা ভাসিয়ে দাঁড় বেয়ে মানুষ তার বুকে কত সহজে আনন্দে বিহার করতে পারে। স্কুলে প্রবেশার্থী কোনো ছাত্রকে মাস্টারমশাই যেমন তীক্ষ্ণ নজরে যাচাই ক'রে নেন, গোখলে তেমনি আমায় নিরীক্ষণ ক'রে নিলেন। সভার জন্য কাকে ধরতে হবে, কেমন ক'রে ধরতে হবে—সব কথা তিনি আমায় ব'লে দিলেন। আমার বক্তৃতাটা প'ড়ে দেখার জন্য চেয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি আমায় কলেজ ঘুরিয়ে দেখালেন, আর ব'লে দিলেন ডক্টর ভান্ডারকর-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ফলাফল আমি যেন তাঁকে অগৌণে জানাই। প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে তাঁর কাছ থেকে ফিরে এলাম। রাজনীতির দিক থেকে, গোখলে তাঁর জীবনকালেও যেমন, তাঁর মৃত্যুর পরেও তেমনি, আমার হৃদয়ে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সেখানে তিনি অনন্য।

ডক্টর ভাণ্ডারকর তো আমায় পিতার মতো স্নেহে টেনে নিলেন। তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করতে যাই, তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুর। একমাথা রোদ্দুর নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে আমি দেখা করতে গিয়েছি, তাইতেই এই অক্লান্তকর্মা পণ্ডিতপ্রবর খুশি হয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁকে যখন আমি কোনো নির্দলীয় নেতাকে সভাপতি-রূপে পাবার জন্য আমার নির্বন্ধাতিশয়ের কথা জানালাম, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সমর্থন পাওয়া গেল। তিনি ঘন-ঘন মাথা নাড়িয়ে সোৎসাহে বললেন, "ঠিক বলেছ, এই তো চাই!"

আমার কাছ থেকে সব কথা শোনবার পর তিনি বললেন, "যার কাছেই যাও, জানতে পাবে, আমি রাজনীতি নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাই না। কিন্তু তোমায় শুধু-হাতে ফিরিয়ে দিতে আমার মন সরছে না। তোমার কেস্ যেমন জোরালো, তেমনি প্রশংসার যোগ্য তোমার উদ্যম। তাই তোমার সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ আমি এড়িয়ে যেতে পারব না। তিলক ও গোখলে-র সঙ্গে দেখা করেছ, ভালোই করেছ। তাঁদের বোলো, তাঁদের দুইপক্ষ সমবেতভাবে যে সভা ডাকবেন, আমি সানন্দে তার সভাপতিত্ব করব। দিনক্ষণ সম্বন্ধে আমায় আর জিজ্ঞেস করতে হবে না, যেদিন যখন তাঁদের সুবিধা, তাতেই আমি রাজি।"

এই ব'লে প্রচুর অভিনন্দন ও আশীর্বাদ-সহ তিনি আমায় বিদায় দিলেন।

হৈ-চৈ আড়ম্বর না-ক'রে, পুণার এইসব জ্ঞানব্রতী নিঃস্বার্থ কর্মীর দল একটি ছোটোখাটো সাদাসিধে জায়গায় সভা ডাকলেন। আমার ঈপ্সিত লক্ষ্যে দৃঢ়প্রত্যয় হয়ে, আমি মহানন্দে পুণা ছেড়ে মাদ্রাজের দিকে যাত্রা করলাম।

পুণা থেকে মাদ্রাজ। মাদ্রাজে গিয়ে দেখি অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা : বালাসুন্দরম্-সম্পর্কিত ঘটনা সেখানকার সভায় সকলের মনে গভীর রেখাপাত করে। আমার ভাষণটা ছাপিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আমার ধারণা, লেখাটি একটু যেন দীর্ঘই হয়েছিল। কিন্তু তাহলে কী হয়, সভায় উপস্থিতবর্গ টু শব্দ না-ক'রে, গভীর মনোযোগে আমার সেই দীর্ঘ ভাষণের প্রত্যেকটি কথা শুনেছিলেন। সভা ভাঙবার পর আমার সেই সবুজ মলাটের *Green Pamphlet* নিয়ে কাড়াকাড়ি প'ড়ে গিয়েছিল। মাদ্রাজে ওই পুস্তিকার একটি সংশোধিত ও বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়--দশ হাজার কপি। লোকে তা পরম আগ্রহে কেনে। তবু দেখা গেল, অত অধিক সংখ্যায় না-ছাপালেও চলত। অত্যধিক উৎসাহের বশে আমি চাহিদার অঙ্কটা একটু যেন বাড়িয়ে ধরেছিলাম। আমার পুস্তিকা লেখা হয়েছিল ইংরেজি-জানা লোকেদের উদ্দেশ ক'রে। মাদ্রাজে কেবল এই শ্রেণীর লোক পুরো দশ হাজার কিনে ফেলবেন-- এরকম আশা করাই ঠিক হয়নি।

এখানে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন *Madras Standard*-এর-সম্পাদক পরমেশ্বরণ পিল্লাই। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং প্রায়ই তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে আমায় উপদেশ-নির্দেশ দিতেন। *হিন্দু* পত্রিকার জি. সুব্রহ্মণ্যম্ এবং ডক্টর সুব্রহ্মণ্যম্ও আমার কাজে খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু পরমেশ্বরণ পিল্লাই তাঁর সমস্ত কাগজটাই যেন আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আমি

তার পুরোপুরি সুযোগ নিতে ইতস্তত করিনি। যদ্দূর মনে পড়ে, সভা বসেছিল পচাইয়াপ্পা হল্-এ, সভাপতি হয়েছিলেন ডক্টর সুব্রহ্মণ্যম্।

মাদ্রাজে যাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, অজস্র স্নেহে তাঁরা আমায় আপ্যায়িত করেছিলেন। লক্ষ্যসাধনে তাঁদের উৎসাহ ও তৎপরতা আমায় অভিভূত করেছিল। ইংরেজিতে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হ'লেও, মনে হয়েছিল তাঁরা আমার আপনার লোক। প্রেমের কাছে কোনো ব্যবধানই দুর্লঙ্ঘ্য নয়।

২৯. সত্বর ফিরে আসুন

মাদ্রাজ থেকে আমি গেলাম কলকাতা। সেখানে কিন্তু নানা বাধায় আমায় বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল। কলকাতায় কারও সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল না। তাই আমি উঠেছিলাম গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল-এ। হোটেলে থাকতে *ডেলি টেলিগ্রাফ* কাগজের প্রতিনিধি মিস্টার এলারথর্প্-এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি থাকতেন বেঙ্গল ক্লাব-এ, সেখানে আমায় নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি তখন জানতেন না যে ওই ক্লাব-এর ড্রয়িং রুম্-এ কোনো ভারতীয়কে নিয়ে বসানো চলত না। বিধিনিষেধর কথা জানতে পেরে, তিনি আমাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে যান। স্থানীয় ইংরেজদের ভারতীয়-বিদ্বেষ নিয়ে তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন। আমাকে ড্রয়িং রুম্-এ বসাতে পারেননি ব'লে আমার মার্জনা ভিক্ষা করেন।

বাংলার জনপ্রিয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে আমায় প্রথমেই দেখা করতে হবে—এ আমি মনে-মনে ঠিক ক'রেই এসেছিলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা যখন হ'ল, বেশ-কয়েকজন লোক তাঁকে ঘিরে ব'সে ছিলেন। তিনি বললেন :

"লোকে আপনার কাজে আগ্রহী হবে ব'লে তো মনে হয় না। জানেনই তো, আমাদের এখানে ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই। তবে ওরই মধ্যে যতটুকু যা চেষ্টা আপনাকে করতেই হবে। এ কাজে রাজামহারাজার সাহায্য দরকার। মনে রাখবেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপনার অতি অবশ্য যোগাযোগ করা দরকার। রাজা স্যর প্যারীমোহন মুখার্জি ও মহারাজা টেগোর-এর সঙ্গে দেখা করুন। দু-জনেই তাঁরা উদারপ্রকৃতির মানুষ আর দেশের কাজে বেশ যোগদান করেন।"

এঁদের সঙ্গে দেখা তো করলাম, কিন্তু তাতে কোনো কাজ দিল না। নিতান্ত দেখা করতে হয় ব'লে যেন বেজারভাবে দেখা করলেন, ও বললেন যে কলকাতায় জনসভা আয়োজন করা সহজ ব্যাপার হবে না—নিদেনপক্ষে ব্যবস্থা যদি করাও যায়, প্রায় সমস্তটাই নির্ভর করবে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ওপর।

দেখা গেল, কলকাতায় আমার মুশকিল বেড়েই চলেছে। *অমৃতবাজার পত্রিকা*'-র অফিসে যাওয়া গেল। সেখানে যাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হ'ল, তিনি হয়তো ভাবলেন, আমি একজন ভবঘুরে বাউণ্ডুলে লোক। *বঙ্গবাসী* তো আর-এককাঠি বাড়া। সম্পাদক-মশায়

আমায় গোড়াতে বসিয়েই রাখলেন ঘণ্টাখানেক। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনেক লোক এসেছিল, সে তো দেখতেই পেলাম। কিন্তু একটিবারের জন্যও তিনি মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন না, এমন-কি সব লোক চ'লে যাওয়ার পরেও না। তখন বাধ্য হয়ে ভয়ে-ভয়ে আমার কথাটা আমি পাড়লাম। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ব'লে উঠলেন, "দেখছেন-না মশাই, আমাদের হাতে কত কাজ। আপনার মতো ঢের-ঢের লোক আমাদের কাছে আসে। আপনি বরঞ্চ আসুন, আপনার কথা আমি শুনতে চাই না।"

একলহমার জন্য আহত বোধ করেছিলাম। পরক্ষণেই অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম, সম্পাদকের অবস্থাটা কেমন। *বঙ্গবাসী*-র নামডাকের কথা আগেই শুনেছিলাম। দেখতেই পেলাম, কাতারে-কাতারে কত লোক এলেন-গেলেন। এঁরা সকলেই সম্পাদক-মশায়ের পরিচিত লোক। তাছাড়া *বঙ্গবাসী*-র মতো কাগজের পক্ষে আলোচ্য বিষয়ের কোনো অভাব ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার কথা তখন ক-জন লোকই-বা জানত।

অন্যায় কিংবা অবিচারের ফলে মানুষ যখন ক্লেশ পায়, তখন ভাবে তার প্রতি যেরকম অন্যায় কিংবা অবিচার করা হয়েছে, তেমনটি আর-কারও প্রতি করা হয়নি। সে বুঝতে পারে না, তার মতো আরো অনেক দুর্ভাগা নিজের-নিজের অভিযোগ নিয়ে সম্পাদকের দ্বারস্থ হয়। এইসমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার সম্পাদক একাহাতে কেমন ক'রে করবেন? লাঞ্ছিত লোকেরা মনে করে, সম্পাদকের হাতে অশেষ ক্ষমতা। বেচারা সম্পাদক-মশাই নিজে তো জানেন, তাঁর ক্ষমতার দৌড় বড়োজোর তাঁর সম্পাদকীয় কামরার দেউড়ি পর্যন্ত। আমি কিন্তু হতাশায় হাল ছেড়ে দিলাম না। অন্য-অন্য কাগজের সম্পাদিকদের সঙ্গে আমি সমানে দেখা ক'রে যেতে লাগলাম। আগে-আগে যেমন করেছি, এবারেও এংলো-ইন্ডিয়ান কাগজের সম্পাদকদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলাম। *Statesman* ও *Englishman*—এই দুটি কাগজই দক্ষিণ আফ্রিকা-সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎক্রমে তাঁদের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়, তাঁরা তার বিস্তৃত বিবরণ তাঁদের কাগজে প্রকাশ করেছিলেন।

Englishman কাগজের সম্পাদক মিস্টার সন্‌ডার্স আমায় একপ্রকার আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁর অফিসের দরজা তিনি আমার জন্য উন্মুক্ত ক'রে দিলেন, বললেন যে তাঁর কাগজ আমি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারি। দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি বিষয়ে তিনি যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার প্রুফ আগাম আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে আমি তাঁর লেখার ইচ্ছামতো অদলবদল করতে পারি। যদি বলি, তাঁর সঙ্গে আমার একটা প্রীতির বন্ধন গ'ড়ে উঠেছিল, সে কথা একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। তাঁর সাধ্যমতো তিনি সর্বপ্রকারে আমায় সাহায্য করবেন ব'লে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সন্‌ডার্স তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিলেন। গুরুতরভাবে পীড়িত হবার আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার পত্রব্যবহার অব্যাহত ছিল।

অপ্রত্যাশিতভাবে এইরকম সৌহার্দ-সৌভাগ্য আমার জীবনে বারবার ঘটেছে। মিস্টার সন্‌ডার্স আমার মধ্যে যা পছন্দ করতেন, সে হ'ল কথায় কিংবা নেশায় আমার সংযম ও অতিশয়োক্তির অভাব, এবং সত্যে আমার নিষ্ঠা। তিনি তন্ন-তন্ন জেরা ক'রে, আমায় যাচাই

করবার পর তবেই আমার কাজে সহযোগ করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি বিষয়ে একটি পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টি তুলে ধরার জন্য আমার আগ্রহ বা চেষ্টার অভাব ছিল না—এমন-কি সেখানকার শ্বেতাঙ্গদের সপক্ষে যা কিছু বলার ছিল তা-ও আমি তাঁকে স্পষ্ট বলেছিলাম।

আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, সত্বর সুবিচার পেতে হ'লে প্রতিপক্ষের প্রতি সুবিচার করতে হয়।

মিস্টার সন্‌ডার্স-এর কাছ থেকে এরকম অপ্রত্যাশিত সহায়তা পেয়ে আমার মনে হ'ল কলকাতাতেও শেষপর্যন্ত একটি জনসভার আয়োজন করা হয়তো যাবে। এমনসময় ডারবান্ থেকে তারবার্তা এল : "Parliament opens January. Return soon"। জানুয়ারিতে পার্লামেন্ট বসছে। সত্বর ফিরে আসুন।"

সুতরাং আমায় কেন হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চ'লে যেতে হচ্ছে, বিশদভাবে তার কারণ ব্যাখ্যা ক'রে, আমি কলকাতা ছেড়ে বোম্বাই রওনা হয়ে যাই। রওনা হবার আগে দাদা আবদুল্লা কোম্পানির বোম্বাই-স্থিত এজেন্টকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বলি, প্রথম যে জাহাজ বোম্বাই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পাড়ি দেবে, সেই জাহাজে যেন আমার ফেরবার ব্যবস্থা হয়। তার কিছুদিন আগে দাদা আবদুল্লা নিজেই 'কুরল্যান্ড' নামে একটি জাহাজ খরিদ করেছেন। বিনা-অর্থব্যয় পরিবারবর্গ-সহ আমি যেন সেই জাহাজে ডারবান্ যাই—এই মর্মে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর এই প্রস্তাবে রাজি হই। ডিসেম্বরের গোড়ায় দ্বিতীয়বারের জন্য আমি দক্ষিণ আফ্রিকার পথে পাড়ি দিই। এ যাত্রা আমার সঙ্গে ছিলেন আমার স্ত্রী, আমার দুই ছেলে এবং আমার বিধবা ভগ্নীর একমাত্র ছেলে। 'কুরল্যান্ড'-এর সঙ্গে-সঙ্গে 'নাদেরী' ব'লে আরেকটি জাহাজ একইসময়ে ডারবান্ যাত্রা করে। এই জাহাজের এজেন্ট ছিলেন দাদা আবদুল্লা কোম্পানি। দুই স্টীমার মিলে যাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় আটশো—এদের অর্ধেক যাত্রীর গন্তব্য ছিল ট্রান্সভাল্।

তৃতীয় ভাগ

১. আসন্ন ঝড়

স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে এই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। এই কাহিনী বলতে গিয়ে একাধিক জায়গায় বলেছি যে মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রথা থাকার ফলে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে স্বামী শিক্ষিত হ'লেও স্ত্রী একপ্রকার নিরক্ষর থেকে যায়। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান হয় বিরাট এবং স্বামীকে স্ত্রীর শিক্ষা-দীক্ষার ভার নিতে হয়। নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হ'লে আমার স্ত্রী ও ছেলেদের পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন কেমন হওয়া উচিত, তার সমস্ত খুঁটিনাটি আমাকেই ভেবে-ভেবে ঠিক করতে হ'ল। সেসব দিনের কিছু-কিছু কথা মনে পড়লে আজও বেশ মজা লাগে।

হিন্দু স্ত্রীর কাছে ধর্মের পরাকাষ্ঠা হ'ল পতিকে পরম গুরু মনে ক'রে তার সমস্ত কথা মেনে চলা। হিন্দু পতিও মনে করে যে সে তার স্ত্রীর স্বামী অর্থাৎ প্রভু এবং সারাক্ষণ পতিসেবা করা হ'ল স্ত্রীর কর্তব্যবিশেষ।

যে সময়ের কথা বলছি, সেসময় আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে সাজে-পোশাকে ও চাল-চলনে সুসভ্য ব'লে পরিগণিত হতে হ'লে, যতটা সম্ভব ইউরোপীয় ধরন-ধারণ আয়ত্ত করা দরকার। সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হ'লে এই হ'ল একমাত্র উপায়। আর বিনা-প্রতিষ্ঠায় সমাজের সেবা করাও সম্ভবপর হবে না।

সুতরাং আমার স্ত্রী ও ছেলেদের সাজপোশাক কেমন হবে তা আমিই স্থির ক'রে নিয়েছিলাম। কাপড়-চোপড় দেখে লোকে তাদের কাথিয়াওয়াড়ী বানিয়া ব'লে চিনবে—সে আমি কেমন ক'রে বরদাস্ত করি? তখন ভারতীয়দের মধ্যে পার্সিদেরই সকলের চেয়ে সভ্যভব্য ব'লে মনে করা হ'ত। যেহেতু পুরোপুরি আদবকায়দা মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না ব'লে মনে হ'ল, আমরা পার্সি ধরনধারণ গ্রহণ করব ব'লে স্থির হ'ল। স্ত্রীকে পরতে হ'ল পার্সি শাড়ি, ছেলেদের গায়ে উঠল পার্সি কোট ও পাৎলুন। জুতো-মোজা ছাড়া কেউ হাঁটবে-চলবে—সে তো ভাবাও যায় না। আমার স্ত্রী ও ছেলেদের জুতো-মোজা প'রে হাঁটা-চলা অভ্যাস করতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল। জুতো পরলে পা টাটায়, ঘামে ভিজে মোজায় জমে দুর্গন্ধ। পায়ের আঙুলে কেবলই ফোস্‌কা পড়ে। এসব নিয়ে ওজর-আপত্তি হ'লে আমার জবাব থাকত তৈরি। কিন্তু আমার ধারণা, আমার জবাবে যতটা-না যুক্তি থাকত তার চেয়ে অনেক বেশি থাকত হুকুমবাজি। অনুপায় হয়ে তারা কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করতে বাধ্য হ'ত। পোশাকে-আশাকে এইসব অদল-বদল মেনে নেওয়া ছাড়া

তাদের গত্যন্তর ছিল না। এইরকম বাধ্য হয়ে এবং ততোধিক অনিচ্ছায় তাদের ছুরি-কাটা ধরাও শিখতে হয়েছিল। সভ্যতার এইসব বহিরঙ্গ বিষয়ে আমার যখন মোহভঙ্গ হ'ল, ছুরি-কাটা তারা পরিহার করে। আমার কেমন যেন মনে হয়, নতুন কায়দা দীর্ঘদিন ধ'রে অভ্যাস করার পর, সেসব বর্জন ক'রে পুরনো কায়দায় ফিরে যাওয়াটাও তাদের পক্ষে কম কষ্টকর হয়নি। কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারি, সভ্যতার এইসব মেকি জিনিসের বোঝা ফেলে দিয়ে আজ আমরা অনেকখানি হাল্‌কা ও ঝাড়াঝাপ্‌টা হয়েছি।

একই জাহাজে আমাদের কয়েকজন আত্মীয় ও চেনাজানা লোকও যাচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ও অন্যান্য ডেক্-যাত্রীদের সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হ'ত। জাহাজের মালিক হলেন আমার মক্কেল ও বন্ধুস্থানীয় লোক। সুতরাং জাহাজের এখানে-সেখানে যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়াতে আমার কোনো বাধা ছিল না।

জাহাজের গন্তব্য ছিল অন্য-কোনো বন্দরে না-থেমে সোজা নাটাল। সুতরাং মাত্র আঠারোদিনে আমাদের সমুদ্রযাত্রা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু নাটাল থেকে আমাদের জাহাজ যখন চারদিনের পথ দূরে, আমরা ভীষণ এক ঝড়-তুফানের মুখে পড়ি। নাটাল-এর মাটিতে পা দেবার পর আমি যে ঝড়ের মুখে পড়ি, এ তুফান ছিল যেন তারই সাবধানী সঙ্কেত। দক্ষিণ গোলার্ধে ডিসেম্বর মাসটা হ'ল গ্রীষ্ম ও বর্ষার মাঝামাঝি একটা সময়। এ সময় দক্ষিণ সমুদ্রে ছোটো-বড়ো ঝড়-তুফান লেগেই থাকে। যে ঝড়-তুফানের মুখে আমরা পড়েছিলাম, তার জোর ছিল সাঙ্ঘাতিক, আর চলেওছিল অনেকক্ষণ ধ'রে। যাত্রীরা সবাই ভয় পেয়েছিল ভীষণ। এর ফলে যা ঘটল সে কী অভূতপূর্ব ব্যাপার—সেরকম দৃশ্য বড়ো-একটা দেখা যায় না। বিপদের মুখে সকলেই যেন ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে গেল। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান-নির্বিশেষে প্রতিটি লোক জাতি-বর্ণ-ধর্মের পার্থক্য ভুলে গিয়ে ভগবানের নাম করতে লাগল—এক এবং অদ্বিতীয়ের উদ্দেশে প্রণাম করতে লাগল। কেউ-কেউ নানারকম মানত করতে লাগল। জাহাজের ক্যাপ্টেনও এই প্রার্থনায় যোগ দেন। সকলকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন যে ঝড়-তুফান বিপজ্জনক হতে পারে নিশ্চয়, কিন্তু তিনি এর আগে এর চেয়েও ভীষণ ঝড়-তুফানের মুখে পড়েছেন। সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, জাহাজের গড়ন যদি শক্ত হয়, মজবুত হয়, তাহলে জলে-ঝড়ে তাকে কাবু করতে পারে না। কিন্তু যাত্রীদের প্রাণে ভরসা ছিল না। প্রতিমুহূর্তে এমনসব বিকট আওয়াজ আসছিল যে মনে হচ্ছিল এই বুঝি সব ভেঙে গেল, জাহাজ বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। এপাশে-ওপাশে সামনে-পিছনে জাহাজ এমন ভয়ানক দুলছিল যে মনে হচ্ছিল পর মুহূর্তেই সব-কিছু ডুবে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! ডেক্-এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকে এমন কারও সাধ্য ছিল না। সবার মুখে ওই একই কথা, "তিনি যদি বাঁচান তো বাঁচি, যদি মারেন তো মরি।" তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল। কারো মুখে এছাড়া অন্য কথা ছিল না। যদ্দুর মনে পড়ে, এই সঙ্কট অবস্থায় আমাদের চব্বিশ ঘণ্টাকাল কেটেছিল। অবেশেষে মেঘ কেটে গেল, সূর্যের মুখ দেখা গেল। ক্যাপ্টেন এসে খবর দিলেন ঝড়-তুফানের পালা শেষ হয়েছে। আনন্দে সকলের মুখ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। বিপদ কেটে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের মুখে ভগবানের নাম আর শোনা গেল না।

আবার শুরু হ'ল খানা-পিনা গান-বাজনা হৈ-হুল্লোড়। মৃত্যুভয় দূর হবার সঙ্গে-সঙ্গে সেই ভগবৎ-চরণে আশ্রয় নেবার আকুতি যেমন অল্পক্ষণের জন্য এসেছিল, তেমনি অল্পক্ষণের মধ্যেই মায়ার আবরণে ঢাকা প'ড়ে গেল। পূজা-নমাজ অবশ্য চলতে লাগল অভ্যস্ত আচারের মতো, কিন্তু ঝড়-তুফানের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে পূজায়-নমাজে যে আন্তরিকতা দেখা গিয়েছিল, তার আর-কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

এই ঝড়-তুফানের সুবাদে আমি যাত্রীদের সঙ্গে যেন একাত্ম হতে পেরেছিলাম। ঝড়-তুফানে আমার তেমন ভয়ডর ছিল না, কারণ এমন ঝড়-তুফান আমি আগেও দেখেছি। জাহাজের দোলায় লোকের যেমন মাথা ঘোরে কিংবা গা বমি-বমি করে, আমার তেমনটা হ'ত না। সুতরাং আমি নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে জাহাজের সর্বত্র ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে পারতাম, যাত্রীদের সকলকে ভরসা দিতে পারতাম ও ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ক্যাপ্টেনের রিপোর্ট তাদের শোনাতে পারতাম। পরে শুনতে পাবেন, যাত্রীদের সঙ্গে আমার এই বন্ধুত্ববন্ধন আখেরে খুব কাজে দিয়েছিল।

আমাদের জাহাজ ১৮ কিংবা ১৯ ডিসেম্বর তারিখে ডারবান্ বন্দরে নোঙর ফেলে। 'নাদেরী' ব'লে জাহাজটিও একইদিনে পৌঁছয়।

আসল ঝড়-তুফান এল জাহাজ বন্দরে ভিড়বার পর।

২. ঝড়

ইতিপূর্বে বলেছি, আমাদের দুটি জাহাজই ডারবান্ বন্দরে নোঙর ফেলে ১৮ই ডিসেম্বর নাগাদ। কারো কোনো সংক্রামক ব্যাধি আছে কি-না দেখবার জন্য পুরোপুরি ডাক্তারি পরীক্ষা শেষ না-ক'রে, কোনো যাত্রীকে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো বন্দরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। জাহাজে যদি কোনো সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত যাত্রী থাকে, তাহলে সে জাহাজকে নির্দিষ্টকালের জন্য কোয়ারেন্টাইন্-এ আটক রাখা হয়। বোম্বাই থেকে পাড়ি দেবার সময় শহরে প্লেগ-এর প্রাদুর্ভাব ছিল ব'লে, আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে কিছুদিন হয়তো আমাদের কোয়ারেন্টাইন্-এ আটক থাকতে হবে। ডাক্তারি পরীক্ষা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক জাহাজে হলুদরঙা নিশান তুলতে হয়। পরীক্ষায় পাশ করলে নিশান নামাবার হুকুম হয়, তখন যাত্রীদের আত্মীয়পরিজন ও বন্ধুবান্ধব জাহাজে ঢুকতে পারে।

সুতরাং বন্দরে ভিড়বার পর আমাদের দুটি জাহাজেই হলুদ পাতাকা ওড়াতে হ'ল। ডাক্তার এসে আমাদের পরীক্ষা করলেন ও বিধান দিলেন পাঁচদিনের মেয়াদে আমাদের জাহাজ কোয়ারেন্টাইন্-এ আটক রাখা হবে। তাঁর মতে, প্লেগ-এর জীবাণু পুরোপুরি বৃদ্ধি লাভ করতে তেইশদিন সময় নেয়। সুতরাং বোম্বাই ছাড়ার পর তেইশদিন পর্যন্ত জাহাজ কোয়ারেন্টাইন্-এ আটক রাখা হুকুম হ'ল। কিন্তু নিছক স্বাস্থ্যের নিয়মরক্ষার খাতিরে এ হুকুম জারি হয়নি, এর পিছনে অন্য কারণও ছিল।

আমাদের ভারতে ফেরৎ পাঠাবার জন্য ডারবান্-এর শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দারা জোর আন্দোলন করেছিলেন। এই হুকুমের পিছনে এটাও ছিল অন্যতম কারণ। শহরে এ নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটছিল, তার দৈনিক রিপোর্ট দাদা আবদুল্লা কোম্পানির লোক-মারফৎ আমরা নিয়মিত পাচ্ছিলাম। দিনের পর দিন শ্বেতাঙ্গেরা বিরাট জনসভায় সমবেত হয়ে কোনোদিন-বা দাদা আবদুল্লা কোম্পানিকে শাসাচ্ছিল, কোনোদিন আবার লোভ দেখাচ্ছিল। জাহাজদুটি যদি অগৌণে ফেরৎ পাঠানো হয়, তাহলে তারা কোম্পানিকে খেসারৎ দিতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু দাদা আবদুল্লা কোম্পানি হুমকিতে ভয় পাওয়ার পাত্র ছিলেন না। সেসময় অংশীদার হিসেবে কোম্পানির তদারকি করছিলেন শেঠ আবদুল করিম হাজি আদম। তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে যত টাকাই খরচ করতে হোক্-না-কেন, জাহাজ তিনি জেটিতে ভেড়াবেন ও যাত্রীদের নামিয়ে নেবেন। কেউ তাঁকে রুখতে পারবে না। প্রতিদিন তিনি বিস্তারিত বিবরণী-সহ আমায় চিঠি পাঠাতেন। ভাগ্যক্রমে সেইসময় মনসুখলাল নাজর আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ডারবান্ এসেছিলেন। তিনি একজন নির্ভীক ও করিতকর্মা মানুষ ছিলেন। ভারতীয় সম্প্রদায়কে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে তিনিই পরিচালনা করছিলেন। আইন বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছিলেন মিস্টার লাটন্। নাজর-এর মতো তিনিও ছিলেন নির্ভীক পুরুষ। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের গর্হিত আচরণের তিনি তীব্র নিন্দা করলেন এবং নিছক বেতনভোগী আইনজ্ঞরূপে নয়, পরন্তু অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ীর মতো ভারতীয়দের সু-পরামর্শ দিতে লাগলেন।

এইভাবে ডারবান্ দুই অসম পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। একদিকে আঙুলে গোনা যায় এরকম স্বল্পসংখ্যক গরীব ভারতবাসী আর তাদের সামান্য কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু। অন্যদিকে বাহুবলে, জনবলে, বিদ্যা ও বিত্তবলে বলীয়ান্ ডারবান্-এর শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়। এদের পিছনে সরকারেরও সমর্থন ছিল, কারণ নাটাল সরকার খোলাখুলিভাবেই শ্বেতাঙ্গদের সহায়তা করেছিলেন। মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী সদস্য মিস্টার হ্যারি এস্‌কোম্ব প্রকাশ্যে এদের সভায় ও আন্দোলনে যোগ দিতেন।

কোয়ারেন্টাইন্ আসল উদ্দেশ্য ছিল জাহাজের যাত্রীদের কিংবা এজেন্ট কোম্পানিকে তা দেখিয়ে, জোরজবরদস্তি ক'রে আমাদের ভারতে ফেরৎ পাঠানো। এজেন্টকে তো হুম্‌কি দেওয়া সমানে চলছিল, এবার আমাদেরও শাসিয়ে হাঁক্ দিয়ে শোনানো হ'ল,

ঘর দিয়ে যা মানে-মানে
মরবি কেন জানে-প্রাণে
নইলে দেব চুবিয়ে
ঘাড়টা ধ'রে ডুবিয়ে
ফিরিস যদি নিজের বাড়ি
ফেরৎ পাবি টাকা-কড়ি।

আমি সদাসর্বদা সহযাত্রীদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতাম ও তাদের সাহস দিতাম। 'নাদেরী' জাহাজের যাত্রীদের কাছেও খবর পাঠালাম, তারা যেন কিছুতে দ'মে না-যায়। সকলে সাহসে ভর দিয়ে শান্ত হয়ে রইল।

যাত্রীদের আমোদ-আহ্লাদের জন্য জাহাজে অনেকরকম খেলাধুলার আয়োজন আমরা করেছিলাম। বড়োদিনের রাতে ক্যাপ্টেন সেলুন-যাত্রীদের ডিনারে আমন্ত্রণ করলেন। অতিথিদের মধ্যে সুখ্যাত ছিলাম আমি ও আমার পরিবারবর্গ। ডিনারের পর বক্তৃতাদি হ'ল। আমি পশ্চিমী সভ্যতার বিষয়ে কিছু বলেছিলাম। জানতাম অবশ্য গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দেবার আসর সেটা ছিল না। কিন্তু হাল্‌কা সুরে কিছু বলার মতো মেজাজ আমার ছিল না। যদিও যাত্রীদের আমোদ-আহ্লাদে আমি যোগ দিতাম, আমার মন প'ড়ে থাকত ডারবান্‌-এ, যেখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছিল—সেইখানে। কারণ আমি জানতাম, এ লড়াইয়ের লক্ষ্য ছিলাম আমি নিজেই। আমার বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ ছিল :

প্রথম, ভারতবর্ষে থাকতে আমি নাটাল-এর শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অযথা কটুকাটব্য করেছি।

দ্বিতীয়, ভারতবাসী দিয়ে নাটাল অধ্যুষিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে, আমি দুটো জাহাজ বোঝাই ক'রে, আমার দেশবাসীদের নিয়ে এসেছি নাটাল-এ বসাবার জন্য।

আমার দায়িত্ব বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলাম। আমার খাতিরে দাদা আবদুল্লা কোম্পানি বহু বিপদ ও লোকসানের ঝুঁকি নিয়েছেন, সে আমি জানতাম। আমার জন্য সহযাত্রীদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আমার সঙ্গে আনার দরুণ তাদেরকেও সঙ্কটের মধ্যে ফেলেছি।

কিন্তু আমার তো এসব ব্যাপারে কোনো হাত ছিল না। আমি কাউকে নাটাল আসার জন্য প্ররোচিত করিনি। জাহাজ যখন ছাড়ে, সহযাত্রীদের আমি চিনতামই না। দু-একজন আত্মীয়-বন্ধু ছাড়া জাহাজের শত-শত যাত্রীর একজনেরও নামধাম-বিবরণ আমার জানা ছিল না। ভারতে থাকতে নাটাল-এর শ্বেতাঙ্গদের বিষয়ে আমি এমন একটিও কথা বলিনি, যা ইতিপূর্বে নাটাল-এ থাকতে বলিনি। আর আমি যা বলেছিলাম, তার সপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আমার কাছে মজুদ ছিল।

সুতরাং নাটাল-এর শ্বেতাঙ্গেরা যে সভ্যতা থেকে উদ্ভূত, যে সভ্যতার তারা ধারক ও বাহক, তার বিষয়ে আমার মনে গ্লানি জন্মেছিল। সেই সভ্যতা আমার মনের ওপর ভারস্বরূপ হয়ে চেপে ছিল। সেজন্য এ বিষয়ে আমার মনোভাব আমি সেই ছোট্ট সভায় উপস্থিত করেছিলাম। ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য বন্ধুরা আমার বক্তব্য ধীরভাবে শুনেছিলেন ও আমার মনোগত ভাব বুঝতে পেরে সেইভাবেই আমার বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন। এতে তাঁদের জীবনের গতি অন্য-কোনো মোড় নিয়েছিল কি-না, তা আমি জানি না। তবে আমার মনে আছে, বক্তৃতার পরেও ক্যাপ্টেন ও জাহাজের অন্য অফিসারদের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিষয়ে আমার সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। বক্তৃতায় আমি বলতে চেয়েছিলাম, পাশ্চাত্য সভ্যতা যেমন মুখ্যত বাহুবলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, প্রাচ্য সভ্যতা তেমন নয়। প্রশ্নকর্তাদের একজন, যতদূর মনে পড়ে ক্যাপ্টেনই, আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

"আচ্ছা শ্বেতাঙ্গেরা যেমন শাসাচ্ছে, কাজে যদি তেমনটা করে, তাহলে আপনি আপনার অহিংসা-নীতি নিয়ে কীভাবে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন?"

জবাবে আমি বললাম : "ভরসা করি, ভগবান আমায় সেই সৎ সাহস ও শুভবুদ্ধি দেবেন, যার শক্তিতে আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনের সহায়তা না-নিয়ে, তাদের ক্ষমা করতে পারব। তাদের বিরুদ্ধে আমার তো কোনো রাগ নেই, বরঞ্চ তাদের অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি দেখে আমার মায়া হয়। আমি নিশ্চিত জানি, তারা আজ যা-কিছু করছে, সেসবই ন্যায়সঙ্গত—এই বিশ্বাসে করছে। সেজন্য তাদের ওপর আমার রাগ হবার কোনো কারণই নেই।"

প্রশ্নকর্তা আমার জবাব শুনে মৃদ হেসেছিলেন, খুব সম্ভব অবিশ্বাসে। এইভাবে একটির পর একটি ক্লান্তিতে দীর্ঘদিন কেটে যেতে লাগল।

কোয়ারেন্টাইন্ পর্ব কবে যে সমাধান হবে তার কোনো নিশ্চয়তা তখনো পর্যন্ত পাওয়া গেল না। সংশ্লিষ্ট অফিসারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে ব্যাপারটা আর তাঁর হাতে নেই। সরকারের হুকুম পেলেই তিনি আমাদের নামবার অনুমতি দেবেন।

অবশেষে আমার নামে ও যাত্রীদের নামে চরমপত্র এসে হাজির হ'ল। তাতে সেই একই কথা বলা ছিল—প্রাণে যদি বাঁচতে চাও, তাহলে মানে-মানে স'রে পড়ো। জবাবে যাত্রীর দল ও আমি, আমরা সকলে, ব'লে দিই যে নাটাল বন্দরে নামবার অধিকার আমাদের আছে। অদৃষ্টে যা-ই থাক্-না-কেন নাটাল শহরে প্রবেশ করার জন্য আমরা কৃতসঙ্কল্প।

তেইশদিন পরে আমাদের দুটি জাহাজকে জেটিতে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে যাত্রীদেরও নামতে দেবার হুকুম পাশ হয়।

৩. পরীক্ষা

অতঃপর জাহাজদুটি জেটিতে এসে ভিড়ল। যাত্রীরা সবাই একে-একে বন্দরে নামতে লাগলেন। এদিকে ক্যাপ্টেনের কাছে মিস্টার এস্‌কোম্ব খবর পাঠালেন যে শ্বেতাঙ্গেরা আমার ওপর রেগে টং হয়ে আছে এবং তাদের হাতে আমার প্রাণহানির আশঙ্কা আছে, সুতরাং ক্যাপ্টেন যেন আমায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমায় ও আমার পরিবারবর্গকে সন্ধ্যার অন্ধকারে নামবার ব্যবস্থা করেন। সেসময় জেটির সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিস্টার টাটুম্ স্বয়ং আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। ক্যাপ্টেন এই খবরটা আমায় দিতে আমি মিস্টার এস্‌কোম্ব-এর পরামর্শ-মাফিক কাজ করতে রাজি হই। এরপর আধঘণ্টা যেতে-না-যেতে মিস্টার লাটন্ এসে উপস্থিত হলেন ক্যাপ্টেনের কাছে। তিনি বললেন : "মিস্টার গান্ধীর যদি আপত্তি না-থাকে তাহলে আমি তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। জাহাজের এজেন্ট কোম্পানির আইন উপদেষ্টা হিসেবে আমি আপনাকে স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি, মিস্টার এস্‌কোম্ব-এর কথামতো কাজ করতে আপনি বাধ্য নন।" অতঃপর তিনি আমার কাছে এসে যা বললেন, তার মর্ম ছিল এইরকম : "দেখুন, আপনি যদি ভয় না-পান, তাহলে বলি কী, মিসেস্ গান্ধী ছেলেদের নিয়ে ঘোড়াগাড়িতে ক'রে মিস্টার রুস্তমজীর বাড়ি চ'লে যান। আর আমি আর আপনি তাঁদের পিছু-পিছু পায়ে হেঁটে যাই। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চোরের মতো আপনি

শহরে ঢুকবেন, এ কথা ভাবতেও আমার খারাপ লাগছে। আপনাকে কেউ আঘাত করবে ব'লে আমার মনে হয় না। এখন তো অবস্থা শান্ত হয়ে এসেছে—সব চুপচাপ। শ্বেতাঙ্গেরা সব যে যার বাড়ি চ'লে গেছে। সে যেমনই হোক্, চোরের মতো শহরে ঢোকা আপনার পক্ষে উচিত হবে না এই আমার স্থির বিশ্বাস। আমি সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কথায় সায় দিলাম। আমার স্ত্রী ও ছেলেরা নির্বিঘ্নে ঘোড়ারগাড়ি চেপে রুস্তমজীর বাড়ি পৌঁছে গেলেন। ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে জাহাজ ছেড়ে আমি মিস্টার লাটন্-এর সঙ্গে মাটিতে পা দিলাম। জেটি থেকে রুস্তমজীর বাড়ি ছিল মাইলদুয়েক দূরে।

মাটিতে পা দিতেই কয়েকটি ছেলেছোকরা আমায় চিনতে পেরে চেঁচাতে লাগল, "গান্ধী, গান্ধী।" সঙ্গে-সঙ্গে জনাছয়েক লোক এসে জুটল ও আমার নাম ধ'রে চেঁচাতে শুরু করল। মিস্টার লাটন্-এর ভয় হ'ল, হয়তো ভিড় জমতে পারে, তাই তিনি একটি রিক্‌শা ডাকলেন। মানুষে-টানা রিক্‌শায় চাপতে আমার বরাবরই অপছন্দ ছিল। সেই আমার প্রথম রিক্‌শা চাপতে যাওয়া। কিন্তু ছোকরার দল আমায় চাপতেই দিল না। রিক্‌শাওয়ালাকে তারা এমন ভয় দেখাল যে সে বেচারি প্রাণভয়ে চম্পট দিল। আমরা এগিয়ে যেতে চারদিক থেকে ভিড় যেন ছেঁকে এল, ভিড় ঠেলে এক-পা এগোই আমাদের সাধ্য কী। প্রথমে তারা মিস্টার লাটন্-কে ধ'রে আমাদের দু-জনকে আলাদা ক'রে দিল। তারপর শুরু হ'ল আমার ওপর ইট-পাটকেল ও পচা ডিমের বর্ষণ। কে-একজন আমার পাগড়ি ছিনিয়ে নিল। তারপর শুরু হ'ল কিল, চড়, লাথি। আমার মূর্ছার উপক্রম হ'ল। সামনের একটি বেড়ার ওপর ভর দিয়ে আমি কোনোপ্রকারে নিশ্বাস নিতে লাগলাম। কিন্তু দম নেব তার জো কী। কিল, চড়, লাথি পড়তে লাগল অনবরত। ঠিক সেইসময় সেই পথে যাচ্ছিলেন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর স্ত্রী। তিনি আমায় চিনতেন। এই বীরাঙ্গনা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। যদিও তখন রোদ্দুর ছিল না, মাথার ওপর ছাতা খুলে ধরলেন এবং জনতা ও আমার মাঝখানে খাড়া দাঁড়িয়ে রইলেন। উন্মত্ত জনতা দ'মে গেল, কারণ মিসেস্ আলেকজান্ডারকে বাঁচিয়ে আমায় মারধোর করা সহজ ছিল না।

একটি ভারতীয় যুবক এইসব ঘটনা দেখে ছুটে গেল থানায় খবর দিতে। পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট মিস্টার আলেকজান্ডার পুলিশবাহিনী পাঠিয়ে ব'লে দিলেন তারা যেন আমায় ঘিরে নিরাপদে আমার গন্তব্য জায়গায় পৌঁছিয়ে দেয়। তারা ঠিকসময়ে এসে পড়ে। পুলিশের থানা ছিল আমাদের রাস্তার ওপরেই। সেখানে গিয়ে পৌঁছতে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমায় থানার মধ্যে আশ্রয় নিতে বললেন। আমি ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে বলি : "নিজেদের ভুল বুঝতে পারলে, এরা আপনা থেকেই শান্ত হবে। অনর্থক অন্যায় এরা করবে না, সে বিশ্বাস আমার আছে।" পুলিশের পাহারায় আমি বিনা-উৎপাতে রুস্তমজীর বাড়ি গিয়ে পৌঁছুলাম। সারা গায়ে আমার লেগেছিল, কিন্তু ছ'ড়ে গিয়েছিল কেবল একটি জায়গা। জাহাজের ডাক্তার দাদীবরজোর তখন রুস্তমজীর বাড়িতেই ছিলেন, তিনি যতটুকু যা করবার ক'রে দিলেন।

বাড়ির ভেতরে তো সব চুপচাপ শান্ত। কিন্তু বাড়ির চারদিকে শ্বেতাঙ্গ জনতার ভিড়

বাড়তে লাগল। রাত হবার সঙ্গে-সঙ্গে বিকট চিৎকারে জনতা বলতে লাগল, "গান্ধীকে চাই। গান্ধীকে দাও।" পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট উপস্থিত-বুদ্ধি খাটিয়ে জনতাকে বশে রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন। হুম্‌কিতে কোনো কাজ হবে না জেনে তিনি ঠাট্টা-তামাশা ক'রে তাদের ভুলিয়ে রাখলেন। কিন্তু মনে-মনে তিনিও তখন একটু ভয় পেয়েছেন, লোক মারফৎ আমায় খবর পাঠালেন, "যদি বন্ধুর ধনপ্রাণ রক্ষা করতে চান, স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাতে চান, তাহলে আমি যেমন-যেমন বলি তেমনি ছদ্মবেশে আপনাকে এ বাড়ি থেকে স'রে পড়তে হবে।"

এইভাবে একইদিনে দুটি পরস্পর-বিরোধী পরিস্থিতির মুখোমুখি আমায় মোকাবিলা করতে হয়। প্রাণভয় যখন নিতান্তই কল্পিত বিষয় ছিল, তখন মিস্টার লাটন্‌ আমায় সকল লোকের সমক্ষে, প্রকাশ্যে হেঁটে যেতে বলেছিলেন। আমি তাঁর পরামর্শমতো কাজও করেছিলাম। সাক্ষাৎ প্রাণসঙ্কট যখন দেখা দিল, মিস্টার আলেকজাণ্ডার একেবারে উল্‌টোরকমের পরামর্শ দিলেন। তাঁর কথাও আমি রাখলাম। আমি যে এরকম করলাম, সে কি কেবল আমার প্রাণের ভয়ে, না বন্ধুর ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য, না স্ত্রী-পুত্রের নিরাপত্তার খাতিরে? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? প্রথম যখন সাহসে ভর দিয়ে আমি ভিড়ের মুখে এগিয়ে গিয়েছিলাম কিংবা পরে যখন ভিড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়েছিলাম—এই উভয় ক্ষেত্রেই আমি ঠিক কাজ করেছিলাম কি-না, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত জবাব কি কেউ দিতে পারবে?

ঘটনা একবার যখন সঙ্ঘটিত হয়ে যায়, তখন তার কার্যকারণ কিংবা ভালো-মন্দ নিয়ে বিচার করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যা ঘ'টে গেছে তাকে বুঝতে চেষ্টা করা, অথবা সম্ভবপর হ'লে তা থেকে ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশ সন্ধান করা, সেইটুকুই হ'ল কাজের কথা। বিশেষ-বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তি কেমন আচরণ করবে, সে কথা বলা শক্ত। তেমনই দেখা যায়, বাহ্যিক আচরণ থেকে কোনো ব্যক্তিকে বিচার করতে যাওয়া, নিতান্তই অনুমান-সাপেক্ষ বিচার। তার আচরণের পিছনে কী-কী কারণ থাকতে পরে, সেসব কথা তো সবসময় বিশদভাবে আমাদের জানা থাকে না।

সে যা-ই হোক্‌, উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার তোড়জোড় করতে গিয়ে, আমার আঘাতের কথা আমি একপ্রকার ভুলে গেলাম। সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর পরামর্শ-মতো আমি ভারতীয় পুলিশের উর্দি পরলাম, মাথা বাঁচাবার জন্য মাথায় চড়ালাম একটি পিতলের বাটি, সেই বাটি ঘিরে মাদ্রাজি-ধরনের পাগড়ি জড়িয়ে নিলাম। দু-জন ডিটেক্‌টিভ ছদ্মবেশে আমার সঙ্গ নিলেন। তাদের একজন মুখে রঙ মেখে ভারতীয় বেপারী সাজলেন। আরেকজন কী সেজেছিলেন, আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না। পাশের গলিতে গা ঢাকা দিয়ে, আমরা রুস্তমজীর বাড়ির কাছাকাছি একটি দোকানের গুদামে ঢুকে পড়লাম। সেখানে গাদা-করা বস্তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা ক'রে, দোকানের দরজা দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। রাস্তার মাথায় আমাদের জন্য একটি গাড়ি রাখা ছিল। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে আমরা তো সেই গাড়িতে চ'ড়ে বসলাম। গাড়ি আমাদের নিয়ে চলল সেই থানার মধ্যে, যেখানে কিছুক্ষণ

আগেই মিস্টার আলেকজান্ডার আমায় আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। থানায় পৌঁছে আমি ডিটেক্টিভ দু-জনকে ধন্যবাদ জানালাম ও মিস্টার আলেকজান্ডারকে আমার ধন্যবাদ জানাতে অনুরোধ করলাম।

আমরা যখন ভিড় ঠেলে পালাবার পথ খুঁজতে ব্যস্ত, সেইসময় মিস্টার আলেকজান্ডার জনতার সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা ক'রে তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইছেন :

গান্ধী চাই, গান্ধী দাও,
গাছের ডালে লট্‌কাও!

আমি ভালোয়-ভালোয় থানায় পৌঁছে গেছি জানতে পেরে সুপারিন্টেন্ডেন্ট জনতাকে বললেন, "তোমাদের শিকার তো কাছাকাছি কোন্-একটা জানি দোকানের ভিতর দিয়ে কেটে পড়েছে। সুতরাং মিথ্য আর কেন হামলা করা? ঘরের ছেলে সব যে যার ঘরে ফিরে যাও।" খবরটা পেয়ে কেউ-কেউ খুব চ'টে গেল, কেউ একচোট হাসল, কেউ-কেউ কথাটা কিছুতে বিশ্বাস করতে চাইল না।

সপুরিন্টেন্ডেন্ট বললেন, "বেশ তো, যদি আমার কথা বিশ্বাস না-হয় তাহলে তোমাদের দলেরা মধ্যে থেকে দু-একজনকে দাও। আমি তাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে সরেজমিনে দেখিয়ে দিচ্ছি। যদি খুঁজেপেতে তারা গান্ধীকে পায়, তাহলে খুব খুশি হয়ে তাকে তোমাদের হাতে সমর্পণ ক'রে দেব। কিন্তু যদি তার দেখা না-পাও, তাহলে এরকম ভিড় জমানো চলবে না। তোমরা তো রুস্তমজীর বাড়ি ভেঙে-চুরে ফেলতে আসনি। আর গান্ধীর স্ত্রী-পুত্রকে হেনস্তা করতে যে তোমরা চাও না, সে আমি নিশ্চিত জানি।"

জনতা দু-একজনকে বেছে বাড়ি-ঘর খানাতল্লাসি করার জন্য পাঠিয়ে দিল। তারা কিছুক্ষণ পরে খালি হাতে নিরাশ হয়ে ফিরে এল। ভিড় এবার ভেঙে যেতে শুরু করল। চ'লে যেতে-যেতে কেউ-কেউ সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর বুদ্ধিকৌশলের খুব তারিফ করল, কেউ-কেউ আবার রাগে গজগজ করতে লাগল।

তখন ব্রিটিশ সরকারের উপনিবেশ-সচিব ছিলেন মিস্টার চেম্বারলেন্। এই ঘটনার খবর পেয়ে তিনি নাটাল সরকারকে তারবার্তা পাঠিয়ে বলেন, আমার ওপর যারা মারধোর ও হামলা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে যেন মামলা রুজু করা হয়। মিস্টার এস্‌কোম্ব আমায় ডেকে পাঠিয়ে, আমার আঘাত পাওয়ায় খেদ প্রকাশ করলেন ও বললেন, "আপনি তো বুঝতেই পারেন, আপনার দেহে সামান্যতম আঘাতও যদি লাগে, তা আমার পক্ষে প্রীতিপ্রদ হতে পারে না, মিস্টার লাটন্-এর পরামর্শক্রমে আপনি আগেভাগে জাহাজ ত্যাগ ক'রে জনতার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর পরামর্শমতো কাজ করতে অধিকার অবশ্যই আপনার ছিল। কিন্তু আমি যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তা যদি অনুগ্রহ ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখতেন তাহলে এসব শোচনীয় ঘটনা হয়তো আদৌ ঘটত না। আপনি আততায়ীদের যদি সনাক্ত ক'রে দিতে পারেন, তাহলে আমি তাদের গ্রেপ্তার করিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারি। মিস্টার চেম্বারলেন্-এরও তাই ইচ্ছা।"

উত্তরে তাঁকে আমি বলি : "কারও বিরুদ্ধে মামলা করা আমার ইচ্ছা নয়। মারধোর

যারা করেছিল, তাদের দু-একজনকে আমি চিনলেও চিনতে পারি। কিন্তু তাদের সাজা দেবার ব্যবস্থা করতে পারলেই-বা কী লাভ? তাছাড়া এইসব আততীয়ারা প্রকৃতপক্ষে দোষী ব'লে আমি মনে করি না। তাদের বোঝানো হয়েছিল যে ভারতে থাকতে আমি নানারকম রঙ ফলিয়ে নাটাল-এর শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের কুৎসা ক'রে এসেছি। এসব অভিযোগ যদি তারা সত্য ব'লে মনে ক'রে থাকে এবং সত্য মনে ক'রে রাগ ক'রে থাকে—তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? দোষ তো নেতৃস্থানীয় লোকেদের—এবং কিছু যদি মনে না-করেন, দোষ আপনাদেরও। আপনারা তো লোকেদের ঠিক পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছিল কোথায় জানেন? আপনারা পর্যন্ত রয়টারের রিপোর্ট সত্য মনে ক'রে ধ'রে নিয়েছিলেন যে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে সত্য-সত্য অতিশয়োক্তি করেছি। সুতরাং কারও নামে আমার নালিশ নেই। লোকে সত্য কথা যখন জানবে, তখন তাদের কৃতকর্ম নিয়ে নিশ্চয় অনুতাপ করবে।"

মিস্টার এস্‌কোম্ব বললেন, "আপনি যেসব কথা বললেন, তা কি লিখিতভাবে আমায় দেবেন? তাহলে আমি সেই মর্মে মিস্টার চেম্বারলেন্‌-কে তারবার্তা পাঠাতে পারব। অবশ্য আমি বলছি না যে এ তদন্তেই আপনার বক্তব্য আপনি আমায় লিখে দেবেন। এ বিষয়ে মনঃস্থির করার আগে আপনি মিস্টার লাটন্‌ ও আপনার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। তবে এ কথা স্বীকার করতে আমার বাধা নেই যে যদি আক্রমণকারীদের ওপর মামলা রুজু করার অধিকার আপনি স্বেচ্ছায় পরিহার করেন, তাহলে শান্তি ফিরিয়ে আনার দিক থেকে আমার প্রভূত সহয়তা হয়। তাছাড়া এতে আপনার সুনামও যথেষ্ট বাড়ে।"

আমি মিস্টার এস্‌কোম্ব-কে বললাম, "ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আমি কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই না। আপনার কাছে আসবার আগেই এ বিষয়ে আমি আমার মনঃস্থির ক'রেই এসেছি। আততায়ীদের বিরুদ্ধে আমি নালিশ রুজু করব না—এই আমার স্থির সঙ্কল্প। সে কথা আমি লিখিতভাবে আপনার হাতে দেবার জন্য প্রস্তুত আছি।"

এই কথা ব'লে আমি যথাপ্রয়োজন আমার লিখিত বক্তব্য তাঁর হাতে তুলে দিই।

৪. ঝড়ের পর প্রশান্তি

আমি তখনো থানায় আছি। সেখানে থাকার দ্বিতীয় দিন মিস্টার এস্‌কোম্ব-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমায় নিয়ে যাওয়া হয়। পথে আমার রক্ষণাবেক্ষণের দু-জন পুলিশ-পাহারা সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু তখন এরকম সবাধান হবার কোনো কারণ ছিল ব'লে আমার মনে হয়নি।

জাহাজ যেদিন জেটিতে ভিড়ল, হলুদরঙা পতাকা নামিয়ে দেওয়ামাত্র, *নাটাল এডভার্টাইজার* কাগজের জনৈক প্রতিনিধি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আসেন। তিনি

আমায় কতকগুলি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তার জবাবে আমার প্রতি আরোপিত প্রত্যেকটি অভিযোগ আমি যুক্তি-তর্ক-সহযোগে খতম করেছিলাম। স্যর ফিরোজশা মেহ্‌তার কল্যাণে ভারতে থাকতে আমি যেসব বক্তৃতা দিই, তার প্রত্যেকটি ছিল লিখিত বক্তৃতা। এগুলির ও দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ে আমার অন্যান্য সব লেখার কপি আমার কাছেই ছিল। একপ্রস্থ প্রতিলিপি সংবাদদাতার হাতে দিয়ে আমি তাকে বুঝিয়ে দিই যে ভারতে থাকতে আমি এমন কিছু বলিনি যা নাকি আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ততোধিক শক্ত ভাষায় তৎপূর্বেও বলিনি। তাকে এটাও আমি দেখিয়ে দিলাম যে 'কুরল্যান্ড' ও 'নাদেরী' জাহাজ বোঝাই ক'রে ভারতীয় যাত্রী দক্ষিণ আফ্রিকায় এনে ফেলা বিষয়ে অভিযোগটা ছিল নিতান্তই ভিত্তিহীন। তাতে আমার কোনো হাত ছিল না। যাত্রীদের অনেকেই ছিল নাটাল-এর লোক, সে দেশের পুরনো বাসিন্দা। আর নতুন অভ্যাগতদের মধ্যে বেশিরভাগের গন্তব্য ছিল নাটাল নয়—ট্রান্সভাল্। তখন পয়সার ধান্দায় যারা দক্ষিণ আফ্রিকা যেত, তাদের কাছে নাটাল-এর চেয়ে ট্রান্সভাল্-এর আকর্ষণ ছিল বেশি—কারণ সেখানে রোজগারপাতির সুযোগ-সুবিধা ভালো ছিল। অধিকসংখ্যক ভারতীয় তাই ট্রান্সভাল্-এ বসবাসই পছন্দ করত।

কাগজে এই সাক্ষাৎকারের খবর বেরবার পর, লোকে যখন জানতে পেল যে আমি আমার আততায়ীদের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করতে অস্বীকার করেছি, তখন তার প্রভাব এমন গভীর হয় যে ডারবান্-এর শ্বেতাঙ্গেরা তাদের আচরণের জন্য প্রভূত লজ্জা অনুভব করে। সংবাদসেবীরা আমায় নির্দোষ ব'লে রায় দেন ও উচ্ছৃঙ্খল জনতার নিন্দা করেন। সুতরাং ফাঁসিকাঠে লটকাবার ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত আমার পক্ষে যেন শাপে বর হয়। আমার পক্ষে না-ব'লে বরঞ্চ বলা উচিত আমার কাজের পক্ষে। এতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও আমার কাজ সর্বাপেক্ষা সহজ হয়।

তিন-চারদিন পর আমি নিজের বাড়ি চ'লে যাই এবং কিছুদিনের মধ্যেই সব-কিছু গুছিয়ে বসি। এই ঘটনার ফলে ব্যারিস্টরি কাজেও আমার পসার বৃদ্ধি পেল।

ভারতীয়দের মর্যাদা যেমন বাড়ল, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুনও তেমনি যেন ধিকিধিকি জ্ব'লে উঠল। যে মুহূর্তে বোঝা গেল যে ভারতীয়রা মানুষের মতো লড়াই করতে পশ্চাৎপদ নয়, তাদের শক্তি আছে, সাহস আছে, শ্বেতাঙ্গেরা বুঝল একদিন এদের হাতে বিপদ ঘটতে পারে। নাটাল বিধানসভায় দুটি বিল উপস্থাপিত হ'ল। এর একটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধতা করা, অন্যটির উদ্দেশ্য ছিল কড়া বিধিনিষেধ প্রয়োগ ক'রে নাটাল-এর ভারতীয়দের অনুপ্রবেশে বাধার সৃষ্টি করা। সৌভাগ্যক্রমে, সেই ভোটাধিকার নিয়ে সংগ্রামের ফলে স্থির হয়েছিল যে ভারতীয় ব'লে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কোনো আইন পাস করা চলবে না অর্থাৎ আইনের দৃষ্টি বর্ণভেদ বা জাতিভেদ নিয়ে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করা হবে না। সুতরাং এই দুটি বিলের ভাষা ছিল এমন যেন তা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—যদিও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এদের আসল লক্ষ্য ছিল নাটাল-স্থিত ভারতীয়দের নানারকম নতুন-নতুন বিধিনিষেধের নাগপাশে নাজেহাল ক'রে রাখা।

এই দুটি বিল্-এর দরুণ জনসাধারণের কাজে আমায় প্রচুর শ্রম ও সময় দিতে হয়।

ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধিকার বিষয়ে কর্তব্যবুদ্ধিও বহুল পরিমাণে জাগ্রত হ'ল। বিল্‌দুটি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হ'ল, সেইসঙ্গে তাদের অন্তর্নিহিত তৎপর্যও ভারতীয় সম্প্রদায়ের বোধগম্য ক'রে ব্যাখ্যা করা হ'ল। বিলেতের উপনিবেশ-মন্ত্রীর কাছে আমরা আপিল করলাম। তিনি নাটাল সরকারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে চাইলেন না, ফলে বিল্‌দুটি আইনরূপে স্বীকৃত হ'ল।

এমন একটা অবস্থা হ'ল যে তখন দেশের কাজেই আমায় বেশিরভাগ সময় দিতে হয়। আগেই তো বলেছি, সেসময় মনসুখলাল নাজর ডারবান্-এই ছিলেন। তিনি আমার বাসাতেই র'য়ে গেলেন ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে লোককৃত্য করতে লাগলেন। তাতে আমার কাজের বোঝা কিছু-পরিমাণে হাল্‌কা হ'ল।

আমার অনুপস্থিতিতে শেঠ আদমজী মিঞাখান বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সেক্রেটারির কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। সভ্যসংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস-এর তহবিলে অতিরিক্ত এক হাজার পাউন্ড জমেছিল। জাহাজের যাত্রীদের ওপর হামলা হবার ফলে এবং ওই দুটি বিল্-এর দরুণ ভারতীয়দের মধ্যে যে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, আমি তা কাজে লাগাবার জন্য বিধিমতো চেষ্টা করেছিলাম। ভারতীয়দের বলেছিলাম, যেন অধিক সংখ্যায় তাঁরা কংগ্রেস-এর সভ্য হয় ও কংগ্রেস ফান্ড-এ চাঁদা দেয়। এইভাবে কংগ্রেস তহবিলে অল্পকালের মধ্যে পাঁচ হাজার পাউন্ড জমা হয়। আমার ইচ্ছা ছিল কংগ্রেস-এর জন্য একটি স্থায়ী ফান্ড গ'ড়ে তোলা এবং সেই ফান্ড-এর টাকা দিয়ে গৃহ-সম্পত্তি পত্তন ক'রে তার ভাড়া ও খাজনায় কংগ্রেস-এর দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানো। দশজনের হয়ে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সেই ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমার সহকর্মীদের কাছে এই প্রস্তাব উপস্থিত করতেই তারা এটি সাগ্রহে মেনে নিলেন। গৃহ-সম্পত্তি কিনে লীজ দিয়ে দেওয়া হ'ল। ভাড়া ও খাজনায় যা পাওয়া যেত তা কংগ্রেস-এর চালু খরচপত্র মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত। সম্পত্তির মালিকিস্বত্ত্ব সমর্পণ করা হ'ল পাকাপোক্ত একটি ন্যাসিক সমিতি অর্থাৎ ট্রাস্টিদের হাতে। সেই সম্পত্তি আজও বর্তমান আছে, কিন্তু তাই নিয়ে আজ ন্যাসিকদের মধ্যে এমন আত্মকলহ যে সম্পত্তির আয় এখন আদালতের হাতে জমছে।

আমি দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে আসার পর এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এরকম বাদ্‌বিসম্বাদ ঘটবার অনেক আগেই মজুত তহবিলের ভিত্তিতে সার্বজনিক সংস্থা পরিচালনা করার পর, আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে এই সিদ্ধান্তে আমি আজ স্থির হয়ে আছি যে স্থায়ী ফান্ড-এর সাহায্যে কোনো সার্বজনিক সংস্থা চালাতে যাওয়া ঠিক নয়। মজুত টাকার মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠানের নৈতিক অধঃপতনের বীজ সুপ্ত হয়ে থাকে। জনগণের প্রতিষ্ঠান এমন হবে যে তার পিছনে থাকবে দশজনের সমর্থন ও স্বেচ্ছায় প্রদত্ত তাদের অর্থসাহায্য। এরকম প্রতিষ্ঠান যখন দশজনের সমর্থন হারায়, তখন তার অস্তিত্বের অধিকারও লোপ পায়। মজুত তহবিলের ভিত্তিতে যেসব সংস্থা চলে. অনেকসময় দেখা যায় যে জনমত উপেক্ষা করে এবং অনেকসময় এমন অনেক কাজকর্ম করে, যা না-কি জনমতের পরিপন্থী। আমাদের দেশে এরকম প্রতিষ্ঠান আক্‌ছার দেখা যায়। কয়েকটি তথাকথিত ধর্মীয় সংস্থা আছে যারা

হিসাবনিকাশ করার ধার পর্যন্ত ধারে না। ন্যাসিক অর্থাৎ ট্রাস্টিরাই এইসব প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে বসেন এবং এমন ব্যবহার করেন যেন কারো কাছে তাঁদের জবাবদিহির দায় নেই। আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না-ক'রে বলতে পারি, প্রকৃতির অতি কাছের জীবজন্তু পশুপাখি প্রতিদিন ও দিনের পর দিন আহার আহরণ ক'রে বেঁচে থাকে, জন-প্রতিষ্ঠানেরও উচিত সেইরকম আদর্শ রক্ষা ক'রে চলা। যে সংস্থা জনগণের সমর্থন হারায়, জনসংস্থারূপে তার টিকে থাকার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। বিশেষ কোনো সংস্থা জনপ্রিয় কি-না, তার পরিচালকেরা বিশ্বাসভাজন কি-না, তার পরীক্ষা হতে পারে বার্ষিক চাঁদার অঙ্ক যোগ ক'রে। আমার মনে হয়, প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠানের উচিত এই পরীক্ষায় নিজেকে যাচাই ক'রে নেওয়া। কিন্তু, কেউ যেন আমায় ভুল না-বোঝেন। স্থায়ী ঘরবাড়ি জমিজমা না-থাকলে যেসব প্রতিষ্ঠান আদৌ চলতে পারে না, সেইসব সংস্থার বেলা আমার এসব মতামত প্রযোজ্য নয়। আমি যা বলতে চাই তা হ'ল এই যে, যে কোনো জনসংস্থার চল্‌তি খরচ স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বার্ষিক চাঁদার সাহায্যে চালানো উচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাবার সময় আমার এই ধারণা দৃঢ়তর হয়। ছয় বৎসরব্যাপী এই মহাসংগ্রাম মজুত তহবিল ছাড়াই চালানো গিয়েছিল—যদিও এ কাজের জন্য লক্ষ-লক্ষ টাকার দরকার হয়েছিল। মনে আছে এমনদিনও তখন গেছে, যখন চাঁদা যদি হাতে এসে না-পড়ে পরের দিন কী ক'রে চলবে—তা পর্যন্ত আমার জানা ছিল না। পরে যা ঘটেছিল সে কথা আগেভাগে ব'লে ফেলা ঠিক হবে না। সেসব ঘটনার কথা শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখন, যে মত ব্যক্ত করলাম তা কতখানি সত্য।

৫. ছেলেদের শিক্ষা

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আমি যখন ডারবান্-এ পা দিলাম, আমার সঙ্গে ছিল তিন-তিনটে ছেলে—আমার সেই দশবছর বয়সের ভাগ্‌নে আর আমার নিজের দুই ছেলে। তাদের বয়সক্রম ছিল ন-বছর ও পাঁচ বছর। প্রশ্ন উঠল, এদের লেখাপড়ার জন্য কোন্ স্কুলে পাঠাব।

ইউরোপীয়রা যদি দয়াপরবশ হয়ে নিয়মের ব্যতিক্রম করতেন, তাহলে হয়তো এই বালকদের ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারতাম। এসব স্কুলে ইতিপূর্বে কোনো ভারতীয় ছেলেমেয়েকে নেওয়া হয়নি। তাদের জন্য খ্রিষ্টান মিশনরিদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্কুল ছিল। এসব স্কুলের পড়ানো-শোনানো আমার ভালো লাগত না, তাই মিশনরি স্কুলে ছেলেদের আমি ভর্তি করতে চাইনি। আমার আপত্তির অন্যতম কারণ ছিল এই যে, এসব স্কুলের শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজি। বেশ-একটু তত্ত্ব-তদ্‌বির করলে ভুলভাল তামিল বা হিন্দির মাধ্যমেও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা যে না-যেত তা নয়। এইরকমসব নানা অসুবিধা বরদাস্ত করা আমার পক্ষে শক্ত ছিল। আপাতত তো ওদের পড়াবার জন্য আমি নিজেই

চেষ্টাচরিত্র করতে লাগলাম। কিন্তু নিয়মিত যে পড়াব তেমন সময় ও অবসর আমার ছিল না। মনোমতো কোনো গুজরাটি শিক্ষকও খুঁজে পাওয়া গেল না।

কী যে করা যায় ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি যেমন-যেমন ব'লে দেব তেমনভাবে ছেলেদের পড়াবেন—এরকম একজন ইংরেজ-শিক্ষকের জন্য আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। নিয়মিত রুটিন বেঁধে গৃহশিক্ষক যদি ছেলেদের পড়ান, তাহলে অনিয়মিতভাবে আমি যতটুকু সময়, দিতে পারি, নিজেও পড়াব। মাসিক সাত পাউন্ড বেতনে একটি ইংরেজ মহিলাকে এই কাজে বহাল করা হ'ল। কিছুদিন তো চলল এইভাবে—কিন্তু ব্যবস্থাটা ঠিক আমার ভালো লাগল না। ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে, কিংবা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়, আমি আমাদের মাতৃভাষা গুজরাতি ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করতাম না। এর ফলে তারা কিছু-কিছু গুজরাতি শিখতে পেরেছিল। তাদের দেশে ফেরৎ পাঠাবার কথা ভাবতেও আমার খারাপ লাগত। তখনো আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা যে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের মা-বাপের সঙ্গচ্যুত করাটা অনুচিত। শৃঙ্খলাবদ্ধ গৃহ-পরিবারের মধ্যে ছেলেমেয়েরা আপনা থেকে যে শিক্ষা লাভ করে, বোর্ডিং-এ, হস্টেল্-এ তা অসম্ভব। সেইজন্য ছেলেদের নিজের কাছে রাখাটাই আমি সাব্যস্ত করেছিলাম। কয়েকমাসের জন্য আমার ভাগ্নে ও বড়ো ছেলেকে দেশের একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে রেখেছিলাম সত্য, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাদের ফিরিয়ে আনতে হয়। সাবালক হওয়ার বেশকিছুকাল পরে আমার বড়ো ছেলে অবশ্য আমার আশ্রয় ছেড়ে, নিজের ইচ্ছায় দেশে ফিরে গিয়ে আমেদাবাদে একটি হাই স্কুলে ভর্তি হয়। আমার ধারণা, আমার ভাগ্নে, আমি তাকে যতটুকু শিক্ষা দিতে পারতাম, তাই নিয়েই খুশি ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রথম যৌবনে অল্পকিছুদিন রোগভোগের পর তার মৃত্যু হয়। আমার আর-তিনটি ছেলের কেউ কোনোদিন বারোয়ারি স্কুলে যায়নি। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আমি জোড়াতাড়া দিয়ে একটি যে স্কুল পত্তন করেছিলাম, সেখানে তারা কিছুদিন নিয়মিত শিক্ষা কিছুটা লাভ করেছিল।

শিক্ষা নিয়ে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমার ত্রুটি ছিল বিস্তর। ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষায় যতটা সময় আমি দিতে চাইতাম, তা আমি দিতে পারতাম না। তাদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারিনি, এবং অন্য অনিবার্য বাধার ফলে আমার ইচ্ছার অনুরূপ পুথিগত বিদ্যা তারা আয়ত্ত করতে পারেনি ব'লে, আমার সকল ছেলের মনেই আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে। এম.এ. পাশ, বি.এ. পাশ এমনকি ম্যাট্রিক পাশ, লোকেদের সংস্পর্শে তারা যখন আসে, আর-পাঁচজনের মতো তারা যে কলেজে পড়তে যায়নি, সেই চিন্তা তাদের মনে খচ্ ক'রে ওঠে ব'লে মনে হয়।

সে যা-ই হোক্, আমার কিন্তু মনে হয়, আমি তাদের যদি বারোয়ারি স্কুলে পাঠিয়ে সেখানকার যেমন-তেমন শিক্ষার ওপর ঝোঁক দিতাম, তাহলে মা-বাবার নিত্য সংস্পর্শ ও দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ঠেকে শেখার যে সুবিধা তারা পেয়েছিল, তা থেকে তারা বঞ্চিত হ'ত। আজ যে আমি তাদের বিষয়ে নিশ্চিন্ত. এটা হয়তো সম্ভবপর হ'ত না, যদি তারা আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, বিলেতে কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকায় স্কুলের কৃত্রিম

শিক্ষায় অভ্যস্ত হ'ত। তাদের কৃত্রিম জীবনযাত্রা তাহলে আমার জনসেবার কাজে প্রভূত বাধা সৃষ্টি করত। আজ যে তাদের জীবন সাদাসিধে হয়েছে, তাদের চিত্তে সেবার ব্রত জেগেছে, সে শিক্ষা তারা অন্য উপায়ে পেতে পারত না। সুতরাং, যদিও তাদের ও আমার ইচ্ছার অনুরূপ কেতাবি বিদ্যা তাদের আমি দিতে পারিনি, পিছন ফিরে তাকিয়ে যখন দেখি, মনে হয়, তাদের প্রতি যথাসাধ্য কর্তব্যপালনে আমি হয়তো অবহেলা করিনি। সত্যি বলতে কী, বারোয়ারি স্কুলে তাদের পাঠাইনি ব'লে আমার মনে কোনো আপশোসও নেই। আমার বড়োছেলের স্বভাবচরিত্রে আজ যেসব দোষ-ক্রটি আমার নজরে পড়ে, আমি সেগুলির মধ্যে আমার প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলা ও অপরিণত-বুদ্ধির ছায়া দেখতে পাই। আমার সেই অর্বাচীন বয়সের মূঢ়তা ও অসংযম, তার তখনকার শিশু-মনে এমন গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে থাকবে, যে সে ভাবতেই পারে না যে তখন আমি ছিলাম অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, ইন্দ্রিয়াসক্ত। সে বরঞ্চ মনে করে, আমার জীবনের সেই অধ্যায়ই ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল, এবং পরে আমার জীবনে যে পরিবর্তন আসে তার মূলে ছিল বাস্তবিকপক্ষে মোহের অন্ধকার। সে যদি তা মনে ক'রে থাকে, তাহলে তার দিক থেকে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। যদি সে ভাবে যে প্রথমদিকের সংসার-জীবনে আমি সভ্য ও আলোকপ্রাপ্ত ছিলাম এবং পরবর্তী জীবনে মোহ ও আত্মাভিমানের ফলে আমার জীবনকে ঢেলে সাজাতে গিয়ে আমি ভুল করেছি, তাহলে তাকে কী আর বলা যায়? বন্ধুরাও আমাকে এরকম সংশয়সূচক নানা প্রশ্ন করেছেন : ছেলেদের স্কুল-কলেজে পড়ালে কী আর ক্ষতি হ'ত? ডানা কেটে তাদের পঙ্গু করায় আমার কী অধিকার ছিল? তারা যদি ডিগ্রিধারী হয়ে নিজ-নিজ পথ নিজেরাই বেছে নিতে চাইত, তাহলে কেন আমি তাদের পথে বাধা হলাম?

এসব প্রশ্নের পিছনে খুব যে বেশি যুক্তি আছে ব'লে আমার মনে হয় না। অনেক ছাত্রের সংস্পর্শে আমি এসেছি। আমি নিজেই কিংবা অন্য লোকের সহায়তায় আরো-সব ছেলেমেয়েদের ওপর শিক্ষা-বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োগ করেছি, ও তার ফলাফল লক্ষ করেছি। আমার জানাশোনার মধ্যেই এরকম কয়েকটি ছেলে আছে যাঁরা এখন তরুণ এবং আমার ছেলেদেরই সমবয়সী। মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে তাদের মধ্যে কেউ যে ছেলেদের তুলনায় উন্নত, অথবা তাদের কাছ থেকে আমার ছেলেদের বিশেষ-কিছু শেখবার আছে ব'লে আমি মনে করি না।

কিন্তু আমার এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ পরিণাম এখনও রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে। এখানে এই বিষয় আলোচনা করার আমার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে সুনিয়ন্ত্রিত গৃহশিক্ষা ও বারোয়ারি স্কুলশিক্ষার তফাৎ কী ও কোথায়, এবং মা-বাবার জীবনধারার পরিবর্তন ছেলেমেয়েদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তার একটা হদিস সভ্যতার প্রগতি নিয়ে যেসব ইতিহাসের গবেষক অনুশীলন ক'রে থাকেন, তাঁরা হয়তো এর থেকে পাবেন। সত্যের সন্ধান সত্যান্বেষীকে যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়, কঠিনহৃদয় স্বাধীনতার দেবী যে স্বাধীনতার উপাসকের কাছ থেকে কতরকম উৎসর্গ দাবি করেন, এইসব প্রসঙ্গও এই সূত্রে উপস্থিত করার ইচ্ছা আমার ছিল। আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে আমি যদি আমার

ছেলেদের তেমন কোনো শিক্ষা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম যা না-কি অন্য ভারতীয় ছেলেমেয়েদের আয়ত্তের বাইরে, তাহলে কেতাবী বিদ্যা তারা হয়তো অর্জন করত। কিন্তু তাহলে স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার যে শিক্ষা তারা পুথিগত বিদ্যার বিনিময়ে হাতেকলমে পেয়েছিল, তা থেকে তারা বঞ্চিত হ'ত। স্বাধীনতা অর্জন ও বিদ্যা অর্জন—এদুয়ের যে কোনো একটিকে যদি বেছে নিতে হয়, কে না-বলবে পুথিগত বিদ্যার চেয়ে স্বাধীনতা সহস্রগুণে শ্রেয়।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে দেশের তরুণদের আমি স্কুল-কলেজের গোলামখানা ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য ডাক দিয়েছিলাম ; বলেছিলাম, গোলামির শিকল প'রে কেতাবী বিদ্যা আয়ত্ত করার চেয়ে, নিরক্ষর থেকে স্বাধীনতার সদর রাস্তার জন্য পাথর ভাঙা ঢের-ঢের ভালো। কেন যে এমন কথা বলেছিলাম, আমার এই উপদেশের উৎসটা কোথায়—সে কথা এখন হয়তো তাঁরা বুঝতে পারবেন।

৬. সেবাভাব

পেশায় আমার পসার সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু তাতে আমি ঠিক যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। কীভাবে আমার জীবনযাত্রা আরো সহজ সরল করা যায়, হাতেনাতে কীভাবে জনসেবার কাজে নামতে পারি—এইসব চিন্তা সর্বক্ষণ আমার মনকে দোলা দিচ্ছিল। আমার আর স্বস্তি ছিল না। এইরকম সময়ে একটি গলিত কুষ্ঠরোগী আমার বাড়ির দরজায় পা দেয়। তাকে কেবলমাত্র কিছু খেতে দিয়ে বিদায় দিতে মন সরল না। তাকে আমি আশ্রয় দিলাম, তার গা ধুয়ে সাফ্ ক'রে দিতে লাগলাম ও অন্যভাবে তার দেখাশোনা করতে লাগলাম। কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য এইভাবে তো চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। আমার সেরকম সঙ্গতিও ছিল না। তাছাড়া চিরকাল তাকে আমার কাছে রাখি, সেরকম আগ্রহেরও অভাব ছিল। অগত্যা গিরমিটিয়াদের জন্য যে সরকারি হাসপাতাল ছিল, সেইখানে তাকে পাঠিয়ে দিই।

কিন্তু আমার মনের উস্‌খুসানি বেড়েই চলল। স্থায়ীভাবে কোনো জনহিতকর কাজে নিজেকে দেবার জন্য মন ভারি আকুল হ'ল। ডক্টর বুথ ছিলেন সেই মিশন-এর প্রধান। তাঁর হৃদয় ছিল দয়ালু এবং তিনি বিনা-দক্ষিণায় রোগীদের চিকিৎসা করতেন। পার্সি রুস্তমজীর দানে ও ডক্টর বুথ-এর তত্ত্বাবধানে একটি ছোটো দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা গেল। এই হাসপাতালে নার্সরূপে কাজ করার জন্য আমার মনে একটা প্রবল আগ্রহ হ'ল। বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করতে হ'লে সেখানে দৈনিক কোনো কম্পাউন্ডারকে দু-এক ঘণ্টা কাজ করতে হয়। আমি মনে-মনে সঙ্কল্প করলাম যে হাসপাতালে ডিস্‌পেন্‌সারিতে আমিই সে কম্পাউন্ডার-এর কাজ করব। দু-একঘণ্টা সময় যা লাগবে তা আমার অফিস-টাইম থেকে দেওয়া যাবে। আমার চেম্বারে মুখ্য যে কাজ হ'ত সে হচ্ছে আইনের ব্যাপারে মক্কেলকে

পরামর্শ দেওয়া, দলিল-দস্তাবেজ মুসাবিদা করা কিংবা দুইপক্ষের মধ্যে সালিশি-মীমাংসা করা। ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে আমায় কিছু-কিছু কেস্ যে করতে হ'ত-না তা নয়, কিন্তু এসব কেস্-এর বেশিরভাগে কোনো বাদ্‌বিতণ্ডা বা হ্যাঙ্গাম-হুজ্জৎ-এর বালাই ছিল না। এ যাত্রা যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরি, তার কিছু পরে আসেন মিস্টার খান। তিনি আমার চেম্বার-এর কাজে যোগ দিয়েছিলেন ও তখন আমার ওখানেই থাকতেন। যে-যে দিন ম্যাজিস্ট্রেট-এর ঘরে কেস্ থাকত, আমি গরহাজির থাকলে তিনিই তার তদারকি করতেন। সুতরাং আমি নিয়মিত সেই ছোটো হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পেতাম। যাওয়া-আসা নিয়ে সকালে আমায় এজন্য দৈনিক দু-ঘণ্টা সময় দিতে হ'ত। এই কাজ হাতে নেওয়ার পর আমি মনে যেন কতকটা শান্তি পেলাম। আমার কাজ ছিল রোগীদের ব্যারাম কী জেনে নিয়ে ডাক্তারকে তা জানানো এবং ডাক্তারের ব্যবস্থামতে ওষুধ তৈরি ক'রে দেওয়া। এই কাজের সূত্রে আমি দুঃস্থ ও রোগগ্রস্ত ভারতীয়দের নিকট-সম্পর্কে আসি। এদের অধিকাংশ ছিল তামিল, তেলুগু অথবা উত্তর ভারতের গিরমিটিয়া লোক।

বুয়র যুদ্ধের সময় আমি যখন আহত ও রুগ্ন সৈনিকদের সেবার কাজে স্বেচ্ছাসেবী হই, তখন এই হাসপাতালের অভিজ্ঞতা আমার খুব কাজে লেগেছিল।

এর উপরন্তু আমার নিজের ছেলেদের লালন-পালন করার ব্যাপারটা তো ছিলই। আমার দুই ছেলের জন্ম হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। হাসপাতালের অভিজ্ঞতার ফলে তাদের লালন-পালনের সমস্যা সমাধান করা আমার পক্ষে সহজতর হয়। আমার স্বাবলম্বী স্বভাবের ফলে অনেকসময় আমায় সঙ্কটে পড়তে হ'ত। আমার স্ত্রী ও আমি স্থির ক'রে রেখেছিলাম যে প্রসবের সময় সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা যা করা যায়, তা-ই আমরা করব। কিন্তু ঠিকসময়ে সাহেব ডাক্তার-নার্স যদি না-মেলে, তখন আমি কী করতে পারি? তাহলে তো ভারতীয় কোনো দাই ডাকতে হবে। ভারতেই শিক্ষিতা দাই পাওয়া কত শক্ত, সে তো আপনাদের জানা আছে। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় শিক্ষিতা ভারতীয় দাই পাওয়া কত কঠিন হতে পারে, সে আপনারা অনুমান করতে পারেন। নিরাপদে প্রসব করানো বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যসমেত যেসব বই জোগাড় করতে পারলাম, সে সবই আমি প'ড়ে ফেললাম। ডাক্তার ত্রিভুবনদাসের রচিত *মা-নে শিখামন* অর্থাৎ মায়ের প্রতি উপদেশ বইটি আমি আদ্যোপান্ত প'ড়ে ফেললাম। এই বইয়ে যেমন-যেমন নির্দেশ দেওয়া ছিল তার সঙ্গে এদিক-ওদিক থেকে কিছু যোগ-বিয়োগ ক'রে, তদনুসারে আমি আমার দুই ছেলেকে মানুষ করেছিলাম। দু-বারই দাইয়ের সহায়তা নিতে হয়েছিল, কিন্তু কোনোবারই দু-মাসের অধিকসময়ের জন্য নয়, এবং তা-ও মুখ্যত প্রসূতিকে সাহায্য করার জন্য। শিশুদের দেখাশোনা আমি নিজেই করতাম।

কনিষ্ঠটির জন্মের সময় আমায় চরম সঙ্কটের মুখে পড়তে হয়। হঠাৎ প্রসব বেদনা শুরু হ'ল। সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তার পাওয়া গেল না। দাই জোগাড় করতেও খানিকটা সময় কেটে গেল। আর দাই যদি যথাসময়ে অকুস্থলে হাজিরও থাকত, তাকে দিয়ে প্রসব করানোর কাজ চলত না। শিশুকে নির্বিঘ্নে নিরাপদে প্রসব করানোর সমস্ত কাজটা আমায় নিজের

হাতেই করতে হয়েছিল। ডাক্তার ত্রিভুবনদাসের বইখানি আমি যত্ন নিয়ে পড়েছিলাম। সেই জ্ঞান আমার খুব কাজে এসেছিল। আমি নির্ভয়ে আমার কাজ সম্পন্ন করেছিলাম।

আমার স্থির বিশ্বাস, ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে মানুষ ক'রে তুলতে হ'লে বাপ-মা দু-জনেরই শিশু-পালন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার। এই বিষয়টি সযত্নে অনুশীলন করার সুফল ও সুবিধা আমি পদে-পদে পেয়েছি। আমার ছেলেরা আজ যে সাধারণভাবে ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী, তা হয়তো সম্ভবপর হ'ত না, যদি-না আমি প্রসূতি-পরিচর্যা ও শিশু-পালন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ সহকারে না-পড়তাম ও আমার অধীত বিদ্যা কাজে না-লাগাতাম। জন্মাবার পর থেকে প্রথম পাঁচ বছর শিশুকে কেবল সযত্নে পালন করতে হয়, সেসময় তাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা উচিত নয়, এইরকম একটা কুসংস্কার ও ভুল ধারণা আমাদের অনেকেরই আছে। পক্ষান্তরে, আসল কথাটা কিন্তু এই যে প্রথম পাঁচ বছরে শিশু যে পরিমাণ শেখে, বাকি জীবনে ততটা শিক্ষা আর পেতে পারে না। গর্ভাধানের সঙ্গে-সঙ্গে শিশুর শিক্ষার সূচনা হয়। গর্ভাধানের সময় পিতা-মাতার শরীর ও মনের যে অবস্থা থাকে সেটিই সঞ্চারিত হয় ভ্রূণস্থ সন্তানের মধ্যে। সন্তানবতী অবস্থায় মায়ের চাল-চলন ধরন-ধারণ মন-মেজাজ ইচ্ছা-অনিচ্ছা দিয়ে গর্ভস্থ সন্তান প্রভাবিত হতে থাকে। ভূমিষ্ঠ হবার পরেও শিশু মাতা-পিতার অনুকরণ করে, এবং বেশ-কয়েকবছর ধ'রে লালন-পালন ও বর্ধনের জন্য তাঁদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ক'রে থাকে।

যে দম্পতি এইসব কথা বুঝতে শিখেছেন, তাঁরা কখনো ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য সহবাস করতে চাইবেন না, কেবল সন্তান-কামনায় পরস্পরের মধ্যে উপগত হবেন। আমার ধারণা, শয়ন-ভোজনের মতন যাঁরা রতিকর্মকে জৈবিক জীবনের স্বতন্ত্র ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ ব'লে মনে করেন, তাঁরা খুবই ভুল করেন। প্রজনন-ক্রিয়ার ওপর বিশ্ব-সংসারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এই বিশ্ব-সংসার হ'ল সেই ঈশ্বরের লীলাভূমি, যিনি হলেন প্রজাপতি। এই সৃষ্টজগৎ হ'ল তাঁরই অপার মহিমার ছায়া। জগৎ-সংসারের সুব্যবস্থিত বৃদ্ধির সৌকর্যসাধন করতে হ'লে, প্রজনন-ক্রিয়াও সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা দরকার। যাঁরা এ কথা বুঝবেন তাঁরা সর্বপ্রযত্নে কামলিপ্সা দমন করবেন, সন্তানের শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণের জন্য যে জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার, সেই জ্ঞান আহরণ করবেন ও তার সুফল রেখে যাবেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে।

৭. ব্রহ্মচর্য : ১

আমার জীবনকথার যে পর্বে আমি এখন এসে পৌঁছেছি, সেই পর্বে ব্রহ্মচর্য ব্রতগ্রহণের সঙ্কল্প আমার চিত্তকে গভীরভাবে অধিকার করে। বিবাহের পর থেকেই একব্রতে স্থির থাকার আদর্শ আমি মেনে নিয়েছিলাম। পত্নীর প্রতি সততা রক্ষা করা আমার সত্যনিষ্ঠার অঙ্গ ছিল। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধের ব্যাপারেও ব্রহ্মচর্য-পালনের গুরুত্ব আমি সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে স্পষ্ট বুঝতে পারি। কীপ্রকার ঘটনা-পরম্পরায় অথবা কোন্ গ্রন্থ প'ড়ে আমার চিন্তাধারা এই নতুন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে, সে কথা আজ আমার ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু স্মরণ আছে, আমার নতুন চিন্তার মূলে যাঁর প্রভাব প্রধানত কাজ করেছে, তিনি হলেন রায়চন্দ্‌ভাই। তাঁর বিষয়ে তো ইতিপূর্বে অনেক কথা আপনাদের বলেছি। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একটি আলাপ-আলোচনার কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। একবার আমি তাঁকে মিসেস্ গ্লাডস্টোন্-এর পতিভক্তি সম্বন্ধে প্রশংসা ক'রে কিছু বলেছিলাম। কোথায় যেন পড়েছিলাম, পার্লামেন্ট সভাতেও মিসেস্ গ্লাডস্টোন্ নিজের হাতে চা তৈরি ক'রে স্বামীকে খাওয়াতেন। এই চা তৈরির ব্যাপারটা নিয়মনিষ্ঠ এই প্রখ্যাত দম্পতির নিত্যকর্মে পরিণত হয়েছিল। এইসব কাহিনী কবিকে শোনাই এবং প্রসঙ্গত একনিষ্ঠ দাম্পত্যপ্রেমের স্তুতিগান করি।

রায়চন্দ্‌ভাই আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "নারীরূপে মিসেস্ গ্লাডস্টোন্-এর পতিভক্তি, অথবা পতি-পত্নী সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ তাঁর সেবাভাব—এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি আপনি বেশি পছন্দ করবেন? মিসেস্ গ্লাডস্টোন্ তাঁর স্ত্রী না-হয়ে যদি ভগ্নী হতেন কিংবা প্রভু-ভক্ত পরিচারিকা হতেন, এবং একইরকম সেবার ভাব নিয়ে গ্লাডস্টোন্-এর দেখাশোনা তত্ত্ব-তদারক করতেন, তাহলে আপনি কী বলতেন? এরকম সেবাপরায়ণা ভগ্নী কিংবা পরিচারিকার নিদর্শন তো আজও দেখতে পাওয়া যায়। মিসেস্ গ্লাডস্টোন্-এর পবিত্র ভাবের প্রশংসা করতে গিয়ে আপনি যতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, তেমনটা কি করতেন যদি কোনো পুরুষ চাকরের মধ্যে ঠিক সেই একইধরনের সেবাপরায়ণতা দেখতেন? আমি যা বলতে চাইছি, তা ভালো ক'রে বিচার ক'রে দেখবেন।"

রায়চন্দ্‌ভাই নিজে ছিলেন বিবাহিত মানুষ। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর মতো বিবাহিত লোকের মুখে এইরকম কথা রূঢ় শুনিয়েছিল ব'লে আমার মনে আছে। তবে কথাটা গভীরভাবে আমার মনকে নাড়াও দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, চাকরের প্রভু-ভক্তি, সাধ্বী স্ত্রীর প্রভু-ভক্তির তুলনায় হাজারগুণে শ্লাঘার যোগ্য। বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য গাঁটছড়া বাঁধা পড়ে, সুতরাং পতি-ভক্তির মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বরঞ্চ সেটাই স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু প্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধের বেলা সেই একইপ্রকারের ভক্তিভাব আনা তো সহজ নয়, সেজন্য পরিচারককে বিশেষভাবে প্রযত্ন করতে হয়। কবি এই যে একটি কথা বললেন, আমার মনে দিনে-দিনে তার অনুরণন হতে লাগল।

স্ত্রীর সঙ্গে আমার তাহলে সম্বন্ধ কীরকম হওয়া উচিত? আমার পত্নী-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা

কি তাহলে তাঁকে কেবল যৌন-সম্ভোগের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা? যতদিন আমি কামলিপ্সার দাস হয়ে থাকব, আমার একব্রত হয়ে থাকার কোনো মূল্য থাকবে না। আমার স্ত্রীর বিষয়ে যদি সত্য কথা বলতে হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে সে কোনোদিন লাস্যবিলাসের পথে আমায় প্ররোচিত করতে চায়নি। অতএব আমার দিক থেকে আগ্রহ যদি থাকত, তাহলে অতি সহজেই আমি ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করতে পারতাম। আমার ইচ্ছাশক্তির অভাব অথবা যৌন-সম্ভোগের আসক্তিই ছিল সত্যকার প্রতিবন্ধক।

এ বিষয়ে আমার বিবেক জাগ্রত হবার পরেও, দু-দুইবার আমি বিফলকাম হয়েছিলাম। আমার বিফলতার হেতু ছিল এই যে আমার প্রযত্নের মূলে কোনো উচ্চ আদর্শ ছিল না। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, অধিক সন্তান উৎপাদনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করা। বিলেতে থাকতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সন্তান-নিরোধ বিষয়ে আমি কিছু-কিছু বই পড়েছিলাম। নিরামিষ আহারের কথা বলতে গিয়ে আমি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ডক্টর এলিন্‌সন্‌-এর প্রচারকার্যের কথা উল্লেখ করেছি। তাঁর এই প্রচার সাময়িকভাবে আমায় প্রভাবিত ক'রে থাকবে। কিন্তু জন্ম-নিয়ন্ত্রণের যান্ত্রিক পদ্ধতির বিরুদ্ধতা ক'রে মিস্টার হিল্‌ যে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংযমের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন, তার প্রভাব তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও স্থায়ী হয়। অতএব যখন দেখলাম, আমার আর সন্তানের বাসনা নেই, আমি আত্মসংযমের অভ্যাস করতে লাগলাম। এ কাজে বাধা-বিপত্তির অন্ত ছিল না। আমরা আলাদা বিছানায় শুতে লাগলাম। সারাদিনের পরিশ্রমে একেবারে অবসন্ন না-হওয়া পর্যন্ত আমি শুতে যেতাম না। এত-শত চেষ্টাতেও বেশি-কিছু ফল পাইনি ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু আজকাল যখন পিছন ফিরে তাকাই, বুঝতে পারি, এইসমস্ত খণ্ডিত চেষ্টার যোগেই শেষপর্যন্ত আমি চরম সিদ্ধান্তে দৃঢ় হতে পেরেছি।

চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলাম বেশকিছুকাল পরে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে। তখনো সত্যাগ্রহ শুরু হয়নি। এমন-কি, সত্যাগ্রহের সম্ভাবনার কথাটাও আমার মনে উদয় হয়নি। নাটাল-এ যখন জুলু 'বিদ্রোহে'র সূচনা হয়, সেসময় আমি জোহানেস্‌বার্গ্‌-এ প্র্যাক্‌টিস্‌ করেছি। তাঁর অল্পদিন আগেই বুয়র যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে। আমার মনে হ'ল, 'বিদ্রোহে'র সময় নাটাল সরকারের সহায়তায় কোনোপ্রকার সেবার কাজ করার জন্য আমার এগিয়ে আসা কর্তব্য। নাটাল সরকার আমার এই স্বেচ্ছসেবার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। সে কথা পরে বলব। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসেবার কাজ গ্রহণ করার ফলে, আত্মসংযমের চিন্তা যেন আমার সমস্ত মনকে অধিকার ক'রে বসল। আমার স্বভাব অনুযায়ী এইসব চিন্তার কথা আমি আমার সহকর্মীদের গোচরে আনলাম। আমি দৃঢ়নিশ্চিত হলাম যে সন্তান-উৎপাদন ও সন্তান-পালন জনসেবার কাজের সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না। 'বিদ্রোহে'র সময় নিরঙ্কুশভাবে সেবার কাজ করতে গিয়ে, জোহানেস্‌বার্গ-এ আমার সংসারের পাট তুলে দিতে হয়। স্বেচ্ছা-সেবার প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মাসখানেকের মধ্যে, সযত্নবিন্যস্ত আসবাবপত্রে সুসজ্জিত বাড়ি আমায় ছেড়ে দিতে হয়। স্ত্রী-পুত্রদের ফিনিক্স্‌-এ রেখে, নাটাল বাহিনীর ভারতীয় এম্বুলেন্স-এর অধিনায়ক হয়ে আমায় চ'লে আসতে হয়। সৈন্যদলের সঙ্গে বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ পথে মার্চ ক'রে চলতে গিয়ে, আমার হঠাৎ যেন মনে হ'ল যে জনসেবার দুরূহ পথে যদি আমি এভাবে চলতে চাই,

তাহলে পুত্রের ইচ্ছা, বিত্তের ইচ্ছা পরিহার ক'রে, গার্হস্থধর্মের চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে, আমায় বাণপ্রস্থের জীবন বেছে নিতে হবে।

এই 'বিদ্রোহে'র ব্যাপারে আমায় ছয় সপ্তাহের বেশি সময় দিতে হয়নি। কিন্তু এই ছয় সপ্তাহ আমার জীবনের একটি মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এইসময়ে আমি ব্রতের মাহাত্ম্য যে কতখানি তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি। ব্রত যে মুক্তির পথে বাধাস্বরূপ নয়, ব্রত যে মুক্তিপথের তোরণদ্বার, সেই সত্য এবার আমি উপলব্ধি করতে শিখলাম। এতদিন যে আমার কোনো প্রচেষ্টা সফল হয়নি, তার কারণ আমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ছিল না, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল, ভগবৎ-কৃপায় আস্থা ছিল না। সেইজন্য সংশয়ের উত্তাল সমুদ্রে আমার জীবনতরী ক্রমাগত আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়েছে। আমি বুঝলাম, ব্রতগ্রহণে অনিচ্ছার ফলে মানুষ লোভ ও মোহের বন্ধনে পড়ে। ব্রতের বন্ধন স্বীকার করলে, ব্যাভিচারী বৃত্তি থেকে উদ্ধার লাভ ক'রে মানুষ একব্রতে স্থির হতে পারে। "আমি ক্রমাগত প্রয়াস করতে চাই, প্রতিজ্ঞা দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাই না"—এমন কথা যারা বলে তারা দুর্বলচিত্ত। এ থেকে বরঞ্চ বর্জনীয় বস্তুর প্রতি তাদের আসক্তিই পরোক্ষে প্রকাশ পায়। তা না-হ'লে ত্যাজ্যবস্তু ত্যাগ করার চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অসুবিধা কী? যে সাপ আমাকে কামড়াবে ব'লে জানি, তার কবল থেকে পালাবার জন্য আমরা কৃতসঙ্কল্প থাকি, পালাবার চেষ্টা না-ক'রে সন্তুষ্ট থাকি না। শুধুমাত্র প্রযত্ন করা মানে সর্পাঘাতে নিশ্চিত মৃত্যুর বিষয়ে বোধের অভাব। সুতরাং ত্যাজ্যবস্তু ত্যাগ করার চেষ্টামাত্রে আমরা যদি সন্তুষ্ট থাকি, তাহলে বুঝতে হবে, সে বস্তু যে সর্বদা ত্যাজ্য সে বিষয়ে আমাদের বোধ এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পরে যদি আমার মত বদ্‌লায়, তাহলে এখনি কেন ব্রতগ্রহণ 'করি'—এরকম সংশয়ের ফলে আমরা অনেকসময় ব্রতগ্রহণে ইতস্তত করি। বিশেষ কোনো বস্তু যে বস্তুতপক্ষে বর্জনীয় সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা না-থাকার ফলে এরকম সংশয় আমরা প্রকাশ ক'রে থাকি। সেইজন্যই নিষ্কুলানন্দ গেয়েছেন :

'বিরাগ বিনে তিয়াগ না টিকে'।

কোনো বস্তুতে সত্যিকার বিরাগ যখন মানুষের মনে উপজাত হয়, তখন তাকে ত্যাগ করার সঙ্কল্পগ্রহণ স্বাভাবিক ও অনিবার্য।

৮. ব্রহ্মচর্য : ২

অনেক আলোচনার পর সবদিক ভালোরকম বিবেচনা ক'রে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে আমি ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করি। ব্রতগ্রহণের আগে পর্যন্ত স্ত্রীকে এ বিষয়ে আমার চিন্তা-ভাবনার শরিক করিনি। একেবারে যেদিন ব্রত গ্রহণ করি সেদিনই তাঁর কাছে কথাটা উত্থাপন করি। তাঁর দিক থেকে কোনো আপত্তি ওঠেনি। কিন্তু স্থির সঙ্কল্পে পৌঁছতে গিয়ে আমায় দস্তুরমতো বেগ পেতে হয়েছিল। যতটা দরকার ততটা মনের জোর ছিল না। কামলিপ্সা দমন ক'রে

রাখব কেমন ক'রে? মনে হয়েছিল, স্ত্রীর সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক ত্যাগ করা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার হবে। ঈশ্বর আমার সঙ্কল্পসাধনে সহায় হবেন—এই বিশ্বাসে আমার যাত্রা শুরু হ'ল।

আজ বিশ বছর পরে যখন সেই ব্রতগ্রহণের কথা স্মরণ হয়, বিস্ময়ে আনন্দে আমার অন্তর ভ'রে ওঠে। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার ব্যাপারে আত্মসংযমের অভ্যাস আমার শুরু হয়েছিল ১৯০১ থেকে। মোটামুটি সে পরীক্ষায় আমি সফলকামও হয়েছিলাম। কিন্তু ব্রতগ্রহণের পর থেকে যে মুক্তির আনন্দ আমার আয়ত্তে আসে, তেমনটি ১৯০৬-এর আগে কখনো আসেনি। সঙ্কল্পগ্রহণের আগে পর্যন্ত যে কোনো মুহূর্তে আমি বাসনার বশবর্তী হতে পারতাম। এবার থেকে আমার ব্রতই হ'ল আমার প্রতিরক্ষার কবচ। ব্রহ্মচর্যের মহিমা প্রতিদিন আমার কাছে প্রকট হতে লাগল। ব্রত আমি নিয়েছিলাম ফিনিক্স্-এ থাকতে। আহতদের সেবা-শুশ্রূষার কাজ থেকে ছুটি পেয়েই আমি চ'লে যাই ফিনিক্স্—সেখান থেকে আবার ফিরতে হয় জোহানেস্‌বার্গ-এ। ফিরে যাবার মাসখানেকের মধ্যেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভূমিকা তৈরি হয়। আমার অজ্ঞান্তেই যেন ব্রহ্মচর্যব্রত আমায় এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন পূর্ব থেকে পরিকল্পিত ছিল না—এ যেন আমার ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা না-রেখে আপনা থেকেই এসেছিল। জোহানেস্‌বার্গ-এ ঘর-সংসারের খরচপত্র কাটছাঁট করা, ফিনিক্স্ যাওয়া, ব্রহ্মচর্যের ব্রতগ্রহণ করা—এইসব ঘটনার দিকে যখন পিছন ফিরে তাকাই, বুঝতে পারি, এসমস্তই যেন সত্যাগ্রহের লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে আমার পর-পর পদক্ষেপ।

সুবিহিতভাবে ব্রহ্মচর্য-পালনের ফল যে ব্রহ্মের উপলব্ধি—এই তত্ত্ব আমি কোনো শাস্ত্র থেকে আহরণ করিনি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধীরে-ধীরে এই বোধ আমার মনে জাগ্রত হয়েছিল। এ বিষয়ে শাস্ত্রে যেসব কথা লিখিত আছে, আমি তা অনেক পরে পড়েছি। দৈনন্দিন জীবনে ব্রতপালন করতে গিয়ে আমি ক্রমে-ক্রমে বুঝেছি একমাত্র ব্রহ্মচর্যই শরীর, মন ও আত্মাকে রক্ষা করতে পারে। ধীরে-ধীরে বুঝতে পারলাম, ব্রহ্মচর্য কঠোর তপশ্চরণের প্রক্রিয়া নয় ; ব্রহ্মচর্য শান্তি ও আনন্দের আধার, নিত্য নতুন রসের উৎস।

প্রতিদিন নিত্যবর্ধমান আনন্দের রসে আমার মন অভিসিঞ্চিত হচ্ছিল ব'লে, কেউ যেন মনে না-করেন এই ব্রতপালন আমার পক্ষে অনায়াসসাধ্য ছিল। এ সাধনা যে কত কঠিন, আজ আমার ছাপান্ন বছর পার হবার পরেও আমি বেশ বুঝতে পারি। ব্রহ্মচর্য যে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' এবং সে দুর্গম পথে চলা যে কত কঠিন, সে আমি প্রতিদিনই যেন বেশি ক'রে বুঝতে পারি, প্রতিদিন বুঝতে পারি সদাসতর্ক থাকার প্রয়োজন কতখানি।

ব্রহ্মচর্য যদি পালন করতে হয় তাহলে সবার আগে দরকার রসনার সংযম। জিভকে যদি পুরোপুরি বাগ-মানানো যায়, তাহলে অপেক্ষাকৃত সহজে ব্রতপালন করা যাবে—এই ধারণায় আমি আহার্য নিয়ে আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলাম। কেবল নিরামিষাহার করলে চলবে না, এমন আহার করতে হবে যা না-কি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক হতে পারে। এসব পরীক্ষার ফলে আমার মনে হ'ল ব্রহ্মচারীর আহার হবে পরিমিত, মসলা-রহিত ও নিতান্ত সাদাসিধে এবং সম্ভব হ'লে রান্নাপাক-বিবর্জিত।

ছয় বছর ধ'রে ক্রমাগত এরকম পরীক্ষা চালিয়ে আমি বুঝেছি, ব্রহ্মচারীর আদর্শ আহার

হ'ল টাটকা ফলমূল ও বাদামজাতীয় খাদ্য। যতকাল এরকম খাদ্যে নির্ভরশীল ছিলাম, কামনার প্রকোপ ছিল না। আহার্য বদল করার পর ততটা নির্বিকার থাকতে পারিনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন ফলমূল বাদামই আমার প্রধান আহার ছিল, ব্রহ্মচর্যপালনে আমায় ততটা সাধ্যসাধনা করতে হয়নি, যেমনটা করতে হয়েছিল দেশে ফিরে এসে দুধ ধরবার পর। ফলাহার ছেড়ে কেন যে আমায় দুধ ধরতে হয়েছিল, সে কথা যথাস্থানে বলব। এখানে কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে আহার্যে যদি দুধ কিংবা দুগ্ধজ পদার্থ থাকে তাহলে ব্রহ্মচর্যপালন কঠিন হয়— এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এ থেকে কেউ যেন মনে না-করেন যে ব্রহ্মচারীমাত্রই দুধ খাওয়া ছেড়ে দেবেন। ব্যক্তিবিশেষে, খাদ্যবিশেষের পরিণাম ও প্রভাব ব্রহ্মচর্যের ওপর যে কতখানি হতে পারে, অনেক পরীক্ষা-গবেষণার পর তা নির্ণয় করা সম্ভব। খাদ্য হিসেবে দুধের মতো সহজপাচ্য ও পেশী-সংগঠনকারক কোনো ফলমূল আছে কি-না, সে বিষয়ে ডাক্তার-বৈদ্য-হেকিমরা আমায় স্পষ্ট ক'রে কিছু বলতে পারেননি। সেজন্য দুধ যে উত্তেজক, সে কথা জেনেও, আমি আপাতত কাউকে দুধ ছেড়ে দেবার জন্য পরামর্শ দিতে পারি না।

বাহ্যিক উপায় হিসেবে কী আহার করব, কতখানি আহার করব, তার বাছবিচার যেমন ব্রহ্মচর্যের সহায়ক তেমনি আবশ্যক উপবাসেরও। ইন্দ্রিয়গ্রাস এমনই বলবান্ যে ওপর থেকে, নিচে থেকে, সবদিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে না-ফেললে তাদের বশীভূত রাখা যায় না। খোরাক না-পেলে ইন্দ্রিয়ের তাড়না দুর্বল হতে বাধ্য এ কথা সকলেই জানে। সুতরাং উপবাস যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে কার্যকর হতে পারে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কোনো-কোনো উপবাসও নিরর্থক হয়। উপবাসে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়, এই ধারণায় কেউ-কেউ যান্ত্রিকভাবে অনশন করেন, শরীরকে উপবাসী রেখে তাঁরা মনের বাঁধন আল্‌গা ক'রে দেন। মনে-মনে তাঁরা ভাবতে থাকেন, উপবাসের পর্ব শেষ হয়ে গেলে পর, কতরকম চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় উপভোগ করবেন। এরকম উপবাসের ফলে না-হয় রসনার সংযম, না-হয় বাসনা-কামনার। উপবাসের যথার্থ উপযোগিতা দেখা যায়, যখন মন দেহের সঙ্গে সহযোগিতা করে অর্থাৎ দেহসম্ভোগের বিষয় থেকে শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে মনও যখন বিরত হয়। ইন্দ্রিয়বাসনার মূলে রয়েছে মন। দেহ উপবাসী থাকলেও মনের আসক্তি যেখানে দূর হয় না, সেখানে উপবাসের উপযোগিতা সীমিত হতে বাধ্য। কিন্তু বিনা-উপবাসে কামলিপ্সা সমূলে উচ্ছেদ করা একপ্রকার অসম্ভব ব'লে, এ কথা না-মেনে উপায়- নেই যে উপবাস ব্রহ্মচর্যপালনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ। ব্রহ্মচর্য-প্রয়াসী কেউ-কেউ মনে করেন, একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়কে বশে রাখতে পারলে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার তাঁরা অব্রহ্মচারীদের মতন যদৃচ্ছা করতে পারবেন। তাঁদের এরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য—এ যেন প্রখর গরমে বরফ-ঢাকা শীতের আকাঙ্ক্ষার মতো অলীক ও অর্থহীন। ব্রহ্মচারীর জীবন অব্রহ্মচারীর জীবন থেকে পৃথক্ হতে বাধ্য। সাদৃশ্য যদি কিছু থাকে তাহলে সে নিতান্তই ওপরে-ওপরে। আসলে উভয়ের মধ্যে দিন-রাতের তফাৎ এবং সেই যে পার্থক্য তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হওয়া উচিত। দু-জনেই তো চোখ দিয়ে দেখে। কিন্তু যেখানে ব্রহ্মচারী জগতের সর্বত্র ভগবানের মহিমা দেখতে পায়, সেখানে অন্যজনের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে। দু-জনই তো কান দিয়ে শোনে।

কিন্তু একজনের কান মগ্ন থাকে ভগবানের ভজনে-কীর্তনে, অন্যজন শোনে তুচ্ছ পরনিন্দা পরচর্চা। দু-জনই রাত্রে প্রায় জেগে থাকে। কিন্তু একজন রাত জেগে ভগবানের ধ্যান করে, অন্যজন ঠাট্টা-তামাশায় রাতকাবার করে। দু-জনই আহার করে। কিন্তু একজন দেহকে ভগবানের মন্দির ক'রে গ'ড়ে তুলতে চায় আর অন্যজন ঠেসে-ঠুসে গোগ্রাসে গিলে দেহের মন্দিরকে পূতিগন্ধ নরকে পরিণত করে। এইভাবে উভয়ের মধ্যে জমিন-আসমান ফারাক থাকে এবং কালক্রমে এই ব্যবধান বাড়ে বৈ কমে না।

ব্রহ্মচর্যের অর্থ হ'ল সংযম—এ সংযমসাধন করতে হবে কায়েন, মনসা, বাচা— চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে। এতক্ষণ যেসব বিধিনিষেধর কথা বললাম, সেগুলি যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়—এ কথা প্রতিদিন আমার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ত্যাগধর্মের সাধনক্ষেত্র যেমন সীমাহীন, ব্রহ্মচর্যের সাধনক্ষেত্রও তেমনই। অল্পচেষ্টায় ব্রহ্মচর্যের মহিমা আয়ত্ত করা যায় না। অসংখ্য মানুষের কাছে ব্রহ্মচর্য ধরা-ছোঁওয়ার অতীত একটা আদর্শরূপেই থেকে যাবে। ব্রহ্মচর্যের যিনি সাধক হবেন, নিজের দোষ-ক্রুটির প্রতি তিনি সর্বদা সজাগ থাকবেন। অন্তরের আনাচে-কানাচে যেসব বাসনা-কামনা লুকিয়ে থাকে সেগুলি সর্বদা সন্ধান করবেন ও সমূলে উৎপাটন করবেন। যতদিন চিন্তা-ভাবনা ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ স্ববশে না-থাকে, ততদিন বুঝতে হবে ব্রহ্মচর্যের সাধনা অপূর্ণ র'য়ে গেছে। অবাঞ্ছিত চিন্তামাত্রই মনের বিকার, সুতরাং চিন্তাকে স্ববশে আনা মানে মনকে বশীভূত করা। মনকে বাগে আনা বাতাসকে বাগ মানানোর চাইতেও কঠিন। কাজটা যতই শক্ত হোক্-না-কেন, অন্তরাত্মার কাছে এই বায়ুবেগে ধাবমান মনও বশ মানে। কাজটা কঠিন ব'লেই যে একেবারে অসাধ্য, এমন কথা কেউ যেন মনে না-করেন। এই হ'ল মানবজীবনের চরম লক্ষ্য এবং এই পরমার্থ লাভ করতে হ'লে পরম প্রযত্ন করতে হবে—এতে আর আশ্চর্য কী।

কিন্তু কেবল মানুষের প্রযত্নে যে ব্রহ্মচর্য লাভ করা সম্ভবপর নয়, এ উপলব্ধি আমার এল স্বদেশে ফেরবার পর। তার আগে পর্যন্ত আমার বুদ্ধি ছিল মোহাচ্ছন্ন। আমি ভুল ক'রে ভেবেছিলাম, কেবল ফলাহারের ফলে আমার সমস্ত বাসনা-কামনা আমি উন্মূল করতে পারব। আত্মাভিমানে মনে করেছিলাম, তার অতিরিক্ত কিছু আমার করণীয় নেই।

কিন্তু পরে যে অন্তরের মধ্যে আমায় সংগ্রাম করতে হয়, সে কথা আগে-ভাগে না-বলাই ভালো। তবে এখানেই আমি স্পষ্টত বলতে পারি যে যাঁরা ভগবৎ-উপলব্ধির জন্য ব্রহ্মচর্যের সাধনা করতে চান, তাঁদের পুরুষকার ও আত্মনির্ভরতা যদি তাঁদের ভগবৎ-ভক্তির তুল্যমূল্য হয়, তাহলে তাঁদের নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই।

"বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।" বিষয়ভোগে যিনি অসমর্থ কিংবা পরাঙ্মুখ, ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে তিনি নিবৃত্ত হ'লেও তাঁর বিষয়াসক্তি দূর হয় না। কিন্তু পরমাত্মার দর্শন লাভ করলে বিষয় ও বাসনা উভয় থেকেই তিনি নিবৃত্ত হন।

সেইজন্য ভগবানের নাম ও ভগবৎ-কৃপাই হ'ল মোক্ষার্থীর পরম ও চরম আশ্রয়। ভারতে ফিরে আসার পর আমি এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলাম।

৯. সরল জীবনযাপন

শুরুতে আরামে-আয়েশে জীবনযাপন করছিলাম, কিন্তু সে পরীক্ষা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আসবাবপত্রে বাড়িখানা পরিপাটি ক'রে সাজিয়েছিলাম, কিন্তু তা আমাকে বেশিদিন ধ'রে রাখতে পারেনি। এভাবে সংসারযাত্রা শুরু করবার পর থেকেই খরচপত্র কমাতে আরম্ভ করলাম। ধোপার খরচটা হচ্ছিল বেশ মোটারকম। তাছাড়া কাচা কাপড়ের যোগানও দিত অনিয়মিতভাবে। ফলে দু-তিন ডজন শার্ট ও কলারেও আমার ঠিক যেন চলত না। কলার তো রোজই বদ্‌লাতে হয়, আর রোজ না-হ'লেও শার্ট একদিন অন্তর না-বদ্‌লালে চলে না। তাই খরচ হ'ত দ্বিগুণ। মনে হ'ত এ খরচটার কোনো দরকার ছিল না। তাই কাপড় কাচার সরঞ্জাম কিনে ভাবলাম, ধোপার বাড়তি খরচটা বাঁচাতে পারব। কাপড় কাচার বিষয়ে বই কিনলাম। কাপড় কাচার কলাকৌশল নিজে তো শিখে নিলামই, স্ত্রীকেও শেখালাম। কাজ আমার বাড়ল বটে, কিন্তু নতুনত্বের একটা আনন্দও ছিল।

আমার হাতের কাচা সেই প্রথম কলারটার কথা কখনো ভুলব না। কলারে কলপ দিয়েছিলাম অতিরিক্ত। ইস্ত্রি চালিয়েছিলাম লোহাটা পুরো গরম হবার আগেই। পাছে কলারটা পুড়ে যায়, তাই যতটা দরকার ততখানি ইস্ত্রির চাপ দিতে পারিনি। ফলে কলার-এর ইস্ত্রি মোটামুটি কড়া হ'ল বটে, কিন্তু তা থেকে কলপ ঝ'রে পড়তে লাগল। ওই কলার প'রে আদালতে যখন গেলাম অন্য ব্যারিস্টররা আমায় নিয়ে হাসি-মশকরা করতে লাগলেন। তাতে আমার কী-ই-বা এসে গেল—তখনকার দিনেও হাসিঠাট্টা আমি বড়ো একটা গায়ে মাখতাম না।

তাদের বুঝিয়ে বলেছিলাম, "দেখুন নিজের হাতে নিজের কলার ধুতে যাওয়া—এই আমার প্রথম। তাই কলপটা ঝুর-ঝুর ক'রে ঝ'রে পড়ছে। এতে তো আমার কোনো অসোয়াস্তি হচ্ছে না, বরঞ্চ আপনাদের বেশ-খানিকটা হাসির খোরাক জোগাতে পারলাম ব'লে আমার তো ভালোই লাগছে।"

একজন ব্যারিস্টর বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা এ শহরে কি লন্ড্রীর কোনো অভাব আছে?"

আমি বললাম, "লন্ড্রী এখানে অসম্ভব বেশি দাম চায়। একটা কলার কাচতে যা খরচ, তা দিয়ে প্রায় একটা নতুন কলার কেনা যায়। তাছাড়া সেখানেও তো সদাসর্বদা ধোপার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়—তাঁর মর্জি, কবে তিনি জোগান দেবেন। তার চেয়ে নিজের কাপড়চোপড় নিজের হাতে কেচে নেওয়া ঢের-ঢের ভালো।"

কিন্তু আত্মনির্ভরতার আনন্দ যে কেমন, সে আমি আমার ব্যারিস্টর বন্ধুদের ঠিকমতো বোঝাতে পারিনি। কালক্রমে আমি আমার নিজের কাজটুকু চালাবার মতো ধোপার কাজে কুশলী হয়েছিলাম। লন্ড্রীর ধোলাইয়ের তুলনায় আমার নিজের হাতের কাপড় কাচা মোটেই খারাপ ছিল না। আমার নিজের হাতে ধোয়া ও ইস্ত্রি করা কলার, ধোপার বাড়ির কলারের মতো ধবধবে পরিষ্কার হ'ত ও কলপে কড়া হ'ত।

গোখলে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় আসেন, সঙ্গে এনেছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে-র

উপহার-দেওয়া একটি অঙ্গবস্ত্র। রানাডে-র এই স্মৃতিচিহ্নটুকু গোখলে সবিশেষ যত্নে রাখতেন ও বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষ না-ঘটলে ব্যবহার করতেন না। জোহানেস্‌বার্গ-এর ভারতীয় সম্প্রদায় তাঁর সম্মানে যে ভোজসভার আয়োজন করেছিল, সেটি ছিল সেরকম একটি বিশেষ উপলক্ষ। স্থির ছিল, অঙ্গবস্ত্র ধারণ ক'রে ভোজসভায় যাবেন। কিন্তু বের ক'রে দেখা গেল যে তার ভাজ নষ্ট হয়ে গেছে, ইস্ত্রি করা দরকার। লন্ড্রীতে পাঠালে তাড়াতাড়ি ইস্ত্রি হয়ে যথাসময়ে জিনিসটি ফিরবে কি-না সন্দেহ। তাঁর অনুমতি পেলে আমি নিজেই ধোপার কাজটা ক'রে দিতে পারি ব'লে আমি গোখলেকে জানালাম।

"বাপু হে, তোমার ব্যারিস্টরিতে আমার আস্থা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু ধোপা তুমি কেমন হবে সে কী ক'রে বলব। যদি দাগ লেগে যায়, যদি নোংরা ক'রে ফেল? ওই স্মৃতিচিহ্নের মূল্য যে আমার কাছে কতখানি সে কি তুমি জানো?"—এই ব'লে তিনি মহানন্দে ব'লে গেলেন যে কেমন ক'রে কী সূত্রে রানাডে-র হাত থেকে তিনি এই অঙ্গবস্ত্র উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন।

আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা, গোখলেকে নিশ্চিতি দিয়ে বললাম, কাজ আমি ভালোই করব। তখন ইস্ত্রি করার জন্য তিনি আমায় অনুমতি দিলেন ও কাজ দেখে আমায় সার্টিফিকেটও দিলেন। অতঃপর জগৎ আমায় সার্টিফিকেট দিক বা না-দিক, তাতে কিছু আসে যায় না।

ধোপার দাসত্ব থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেল। তেমনি ক'রে নাপিতের ওপর নির্ভর করাটাও ত্যাগ করলাম। বিলেতে যারা যায়, তারা সকলেই অন্ততপক্ষে নিজের হাতে দাড়ি কামাবার ব্যাপারটা শিখে আসে। কিন্তু তাদের কেউ যে নিজের হাতে চুলকাটার বিদ্যা শিখে এসেছে—এমনটা আমার নজরে অন্তত পড়েনি। আমায় কিন্তু সেটাও দায়ে প'ড়ে শিখতে হয়। প্রিটোরিয়ায় থাকতে একবার আমি এক ইংরেজ নাপিতের সেলুনে যাই চুল কাটাতে। সে ঘৃণাভরে আমার চুল কাটতে অস্বীকার করে। আমার এতে খুব খারাপ লেগেছিল সন্দেহ নেই। আমি কিন্তু কালবিলম্ব না-ক'রে একজোড়া চুল ছাঁটার ক্লিপ কিনে এনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুল নিজেই ছাঁটতে শুরু ক'রে দিই। সামনের চুল তো একপ্রকার ছাঁটা হ'ল, কিন্তু পিছনটা একেবারে যা-তা হয়ে থাকবে। কোর্টে যেতে ব্যারিস্টর বন্ধুরা তো হেসে গড়াগড়ি দেবার জোগাড়।

"আরে গান্ধী, কী ব্যাপার! চুলের এমন দশা কেন, ইঁদুরে কেটেছে বুঝি?"

আমি জবাবে বললাম "আরে না-না। তোমাদের ঠলা নাপিত যে আমার মাথার কালা চুল ছুঁতেই চাইল না। অগত্যা নিজের চুল আমি নিজের হাতেই যেমন-তেমন ক'রে ছাঁটলাম।"

জবাবটা শুনে কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বন্ধুরা একটুও আশ্চর্য হলেন না।

আমার চুল কাটতে অস্বীকার করায় সেই ইংরেজ নাপিতের কোনো দোষ ছিল না। কালা আদমির হাজামত করতে গেলে তো তার ধলা খদ্দেররা ছুটে যেত। অন্যে তো ছার, আমরাই তো উচ্চবর্ণের জন্য বাধাবরাদ্দ নাপিতকে অচ্ছুৎদের কাজ করতে দিই না। এই স্বাজাত্য-অভিমানের প্রতিদান আফ্রিকায় আমি এই একটিবার নয়, অনেকবারই পেয়েছি।

বেশ বুঝতে পেরেছি, এ আমাদেরই পাপের শাস্তি, অন্যায়ের পরিণাম। সেজন্য এরকম ঘটলেও, আমি রাগ বা ক্ষোভের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি।

আত্মনির্ভরশীলতা ও সাদাসিধে জীবনযাপনে আমার আগ্রহের আতিশয্য শেষপর্যন্ত কেমন আকার ধারণ করেছিল—সে আমি যথাসময়ে বলব। আসলে এই বীজ আমার স্বভাবের মধ্যে পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল। অঙ্কুর উদ্‌ভিন্ন হয়ে মূলে, কাণ্ডে, ফুলে, ফলে পরিণত হবার জন্য কেবল ছিল জল ঢালার অপেক্ষায়। যথাসময়ে এসেছিল সেই জলসিঞ্চনের পালা।

১০. বুয়র যুদ্ধ

১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত আমায় নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে চলতে হয়। সেসব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সোজা চ'লে আসা যাক্ বুয়র যুদ্ধের কথায়।

বুয়রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত যখন ঘোষণা করা হয়, ব্যক্তিগতভাবে আমার সমস্ত সহানুভূতি ছিল বুয়রদের প্রতি। তবে আমার ধারণা হয়েছিল, এরকম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিবিশেষের মতামত অন্যের ঘাড়ে চালাতে যাওয়া ঠিক হবে না। এ বিষয়ে আমার মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল, সে কথা আমার লেখা *দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস* বইটিতে, বেশ খুঁটিয়ে বলেছি। সেসব বিতর্ক আবার এখানে উপস্থিত করতে চাই না। যাঁরা এ বিষয়ে আরো কিছু জানতে চান, তাঁরা যেন আমার সে বইটি প'ড়ে দেখেন। এখানে কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে ব্রিটিশ-শাসনে আমার গভীর আস্থাই এ যুদ্ধে আমায় ব্রিটিশ-এর সপক্ষে টেনে নিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ব্রিটিশ প্রজা হিসেবে, প্রজার যাবতীয় অধিকার আমি যদি দাবি করি, তাহলে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার যুদ্ধে যোগদান করা আমার অবশ্যকর্তব্য। তখন আমার স্থির বিশ্বাস ছিল এই যে, একমাত্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে, তারই দৌলতে, ভারত তার সম্পূর্ণ মুক্তির সন্ধান পেতে পারে। সুতরাং ভারতীয়দের মধ্য থেকে যে কয়জন সঙ্গীসাথী সংগ্রহ করা গেল, তাদের নিয়ে একটি দল গঠন করলাম। কর্তৃপক্ষকে অনেক ক'রে বলা-কওয়ার ফলে, যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবার জন্য, আমরা এম্বুলেন্স দলরূপে যুদ্ধে যোগ দিতে পেরেছিলাম।

বেশিরভাগ ইংরেজের ধারণা ছিল, ভারতীয়েরা ভীরু, বিপদ্‌জনক কাজের ঝুঁকি নেবে—এমন তাদের সাধ্য নেই, উপস্থিতমতো যাতে তাদের স্বার্থসিদ্ধি হয় তার বাইরে বড়ো-একটা তারা তাকাতেই চায় না। সুতরাং এই দলগঠনের কাজে আমার কোনো-কোনো ইংরেজ বন্ধু, আমায় উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক্, বরঞ্চ আমায় নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। একমাত্র ডক্টর বুথ-এর কাছ থেকে পূর্ণমাত্রায় উৎসাহ পেয়েছিলাম। তিনিই এম্বুলেন্স-কাজে আমাদের তালিম দিলেন। শরীর-স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমরা যে রণক্ষেত্রে যাবার যোগ্য—সেরকম ডাক্তারি সার্টিফিকেটও আমরা পেলাম। মিস্টার লাটন্ ও মিস্টার এস্‌কোম্ব দু-জনেই পরম উৎসাহে আমাদের প্রস্তাবে সায় দিলেন। আগুয়ান সৈন্যদলের সঙ্গে থেকে আমরা সেবাকার্য

করতে চাই ব'লে আবেদন পাঠানো হ'ল। সরকার আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার করলেন, ধন্যবাদ দিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে এ-ও ব'লে দিলেন আপাতত তাঁদের কোনো সেবাদলের প্রয়োজন নেই।

তাঁদের এই না-বলাটা আমার কেমন যেন বরদাস্ত হ'ল না। ডক্টর বুথ-এর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে নাটাল-এর বিশপের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমাদের দলে বেশ-কয়েকজন ভারতীয় খ্রিষ্টান ছিলেন। বিশপ আমার প্রস্তাব শুনে খুশি হলেন ও বললেন, এ প্রস্তাব যাতে গ্রহণ করা হয় সেজন্য চেষ্টা করবেন।

ওদিকে সময়টাও আমাদের পক্ষে অনুকূল হ'ল। যেমনটা মনে করা গিয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সাহসে, সঙ্কল্পের দৃঢ়তার ও বীরত্বে, বুয়রেরা কারও চেয়ে কম যায় না। ফলে, শেষপর্যন্ত আমাদের সেবাকার্যের প্রয়োজন হ'ল।

আমদের দলে ছিল ১১০০ লোক ও প্রায় চল্লিশজন অধিনায়ক। তার মধ্যে তিনশোজন ছাড়া বাদবাকি ছিল গিরমিটিয়া। ডক্টর বুথও ছিলেন আমাদের দলে। আমাদের দল কাজ বেশ ভালো করেছিল। গুলিগোলার আওতা থেকে আমরা বাইরে ছিলাম, তাছাড়া রেড্ ক্রস্ চিহ্ন ছিল আমাদের রক্ষাকবচ। কিন্তু সঙ্কটকালে গুলিগোলার মধ্যেও আমাদের কাজ করতে হয়। নিরাপদ দূরত্বে থেকে আমরা কাজ ক'রে যাব—এটা আমাদের অভিপ্রেত ছিল না, কর্তৃপক্ষই এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যেন আমরা গুলিগোলার মুখে না-পড়ি। স্পিয়ন্কোপ্-এর রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্য হ'টে যাবার পর পরিস্থিতি বদ্‌লে যায়। জেনারেল বুলার খবর পাঠালেন যে বিপজ্জনক এলাকায় যদিচ আমরা কাজ করতে বাধ্য নই, রণক্ষেত্রে আহতদের যদি আমরা নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনতে পারি, সরকার বিশেষ বাধিত হবেন। বিপদবরণে আমাদের দিক থেকে তো কোনো দ্বিধা ছিল না। সুতরাং স্পিয়ন্কোপ্-এর এই ঘটনার পর থেকে, মাথার ওপর গোলাগুলি চলছে এমন অবস্থাতেও নির্বিকারভাবে এম্বুলেন্স-এর কাজ চালাতে আমরা ইতস্তত করিনি। এইরকম সময়ে আহতদের স্ট্রেচার-এ তুলে নিয়ে, দৈনিক আমাদের বিশ-পঁচিশ মাইল মার্চ্ ক'রে যাওয়া তো নিত্যকর্ম ছিল। এইরকম আহতদের মধ্যে জেনারেল উড্গেট্-এর মতো যোদ্ধাকেও বহন ক'রে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটেছিল।

ছয় সপ্তাহ কাজ করবার পর আমাদের দলের ছুটি হয়ে যায়। স্পিয়ান্কোপ্ ও ভালক্রাঞ্জ্-এর বিপর্যয় ঘ'টে যাবার পর, ব্রিটিশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কমান্ডার-ইন্-চিফ্ স্থির করেন যে হুটোপাটি ক'রে লেডিস্মিথ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বুয়রদের হটানোর চেষ্টায় ক্ষান্ত দিতে হবে, এবং বিলেত ও ভারত থেকে বাড়তি সৈন্য এসে শক্তিবৃদ্ধি না-করা পর্যন্ত, ঢিমে তালে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

আমরা যে সামান্য কাজ করেছিলাম, সেসময় তার খুবই সুখ্যাতি হয়েছিল। ফলে ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠাও বেড়েছিল। কাগজে-কাগজে প্রশস্তিসূচক কয়েকটি গানও প্রকাশিত হয়। এসব গানের ধুয়া ছিল : একই মহারাজ্যপুত্র আমরা সকলে।

জেনারেল বুলার তাঁর প্রতিবেদনে আমাদের দলের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, ফলে আমাদের অধিনায়কেরা সকলে সমর-পদক লাভ করেছিলেন।

এই সুবাদে ভারতীয়দের মধ্যে সংগঠনের কাজ আরো ভালোভাবে এগোতে থাকে। গিরমিটিয়াদের সঙ্গে আমি আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হলাম। তাদের মধ্যে একটা নবজাগরণের সাড়া দেখা গেল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, তামিল, গুজরাতি, সিন্ধি নির্বিশেষে—তারা সকলেই যে ভারতীয় এবং একই ভারতমাতার সন্তান এই বোধ গভীরভাবে দৃঢ়বদ্ধ হ'ল। সকলের মনেই আশার সঞ্চার হ'ল যে এবার তাদের অভাব-অভিযোগের একটা সন্তোষজনক নিষ্পত্তি হবে, তাদের দুর্দশা দূর হবে। সেইসময়ে শ্বেতাঙ্গদের আচারে-আচরণেও একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। যুদ্ধের সময় শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেমন মধুর হয়েছিল, তেমন আর-কখনো ঘটেনি। হাজার-হাজার টমির সংস্পর্শে আমরা তখন এসেছিলাম। তাদের সকলেই আমাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করত এবং আমরা যে তাদের সেবা করতে এসেছি—সে কথা মনে ক'রে বাধিত ও উপকৃত বোধ করত।

সঙ্কটকালে মানুষের স্বভাবের বড়ো দিকটা কীভাবে প্রকট হয়, সে বিষয়ে আমার একটি মধুর স্মৃতির কথা এখানে উল্লেখ না-ক'রে পারছি না। আমরা তখন মার্চ ক'রে চলেছিলাম চিয়েভেলি ক্যাম্প্-এর দিকে। এখানকার রণক্ষেত্রে লর্ড রবার্টস্-এর ছেলে লেফ্‌টেন্যান্ট রবার্টস্ গুরুতরভাবে আহত হন। আমাদের ভাগ্য বলতে হবে, তাঁর মৃতদেহ বহন ক'রে আনার গৌরব পেয়েছিল আমাদেরই দল। আমরা মার্চ্ ক'রে চলেছি, মাথার ওপর প্রখর রৌদ্র, কোথাও একটু হাওয়া নেই, চারিদিকে গুমোট ভাব। সকলেরই তেষ্টা পেয়েছে সাঙ্ঘাতিক। পথে পড়ল ছোট্ট একটি ঝর্নার ধারা। এখানে তৃষ্ণা তো নিবারণ করা যাবে, কিন্তু কথা হ'ল আগে জল খাবে কে? আমরা বললাম, আগে টমিরা তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করুক, তারপর আমরা খাব। তারা আগেভাগে জল খেতে তো কিছুতেই রাজি হয় না, প্রথমে আমরা যেন খাই ব'লে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ফলে বেশকিছুক্ষণ ধ'রে, 'পহেলা আপ্' 'নহী জী আপ্ পহেলা'—এইভাবে দু-দলের মধ্যে মধুর রেষারেষি-সাধাসাধি চলতে থাকল।

১১. স্বাস্থ্য-উন্নয়ন ও দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ

সমাজ-দেহের একটি কোনো অঙ্গ পঙ্গু বা অকেজো হয়ে থাকবে—এটা আমার কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের দুর্বলতা বা অযোগ্যতা সন্তর্পণে রেখে-ঢেকে, কিংবা তাদের দোষ-ত্রুটি শোধরানো না-পর্যন্ত, তাদের জন্য অধিকার দাবি করতে, আমার মনে সর্বদাই একটা জুগুপ্সা ছিল। সুতরাং নাটাল-এ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর থেকে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য, আমি ক্রমাগত চেষ্টা ক'রে চলেছিলাম। অভিযোগটি কিছু-পরিমাণে সত্য ছিল। ভারতীয়রা সর্বদা নোংরা থাকে, ঘরবাড়ি ও আশেপাশের জায়গা-জমি তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে

না—এরকম একটি নালিশ প্রায়ই শুনতে হ'ত। সমাজের শীর্ষস্থানীয় যাঁরা তাঁরা এই কারণে নিজ-নিজ বাড়িতে সংস্কারের কাজ শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু ডারবান্-এ প্লেগ্ লাগার আশু সম্ভাবনার কথা যখন বলা হ'ল, একমাত্র তখনই ভারতীয়দের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তত্ত্বাবধানের কাজ শুরু হয়। মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষ আমাদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন, তাই তাঁদের পরামর্শমতো, তাঁদের সম্মতি নিয়েই আমরা এই খানাতল্লাসির কাজে হাত দিতে পেরেছিলাম। আমরা হাত লাগিয়েছিলাম ব'লে যেমন মিউনিসিপালিটির কাজ সহজ হয়েছিল, তেমনি আবার ভারতীয়দের হয়রানিও হ্রাস পেয়েছিল, কেন-না মারী বা মড়ক দেখা দিলে মিউনিসিপালিটি-কর্তৃপক্ষের ধৈর্যচ্যুতি হয়—এরকম প্রায়ই দেখা যায়, তার ফলে যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি নিয়ম, নিষেধের কড়াক্কড়ি তাঁরা করেন ও যারা তাঁদের বিরাগভাজন, তাদের হেনস্তা ক'রে থাকেন। নিজেরা উদ্‌যোগী হয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেবার ফলে, ভারতীয়েরা এরকম অত্যাচার ও নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল।

এই কাজ করতে গিয়ে আমার কিছু-কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করতে হয়। দেখতে পেলাম, স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে অধিকার দাবি করতে গিয়ে যতটা সহজে ভারতীয়দের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছিলাম, ভারতীয়দের নিজ-নিজ কর্তব্যপালন বিষয়ে যখন বলতে গেলাম, ততটা সহজে তাদের সহযোগ পাওয়া গেল না। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অপমানিত হলাম, কেউ-কেউ অবহেলাভরে আমাদের উপেক্ষা করলেন। ঘরবাড়ির কথা বাদ দিলেও, আশেপাশের জমি-জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বললেই তারা বিরক্ত হ'ত। এ কাজের জন্য তারা যে পকেট থেকে পয়সা খরচ করবে, সে তো দুরাশামাত্র। এইসব তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে আমি আরো যেন বেশি ক'রে বুঝতে পারলাম যে অসীম ধৈর্য যদি না-থাকে তাহলে লোকের কাছ থেকে কাজে আদায় করা অসম্ভব। সংস্কারের গরজ সংস্কারকের নিজের—এ যেন তারই মাথাব্যথা এবং এতে যেন সমাজের কোনো দায় নেই। সমাজ যদি তাকে বাধা দেয়, ঘৃণা করে, তাকে ধনে-প্রাণে মারার জন্য উৎপীড়ন করে—তাহলে সেটুকু সংস্কারকের ন্যায্য পাওনা, তার চেয়ে বেশি-কিছু আশা করা তার পক্ষে অন্যায়। সংস্কারকের কাছে যে কাজ প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সমাজের চোখে যদি তা হেয় বা দূষণীয় মনে হয়, সমাজ যদি মনে করে তার ফলে উন্নতি না-হয়ে বরঞ্চ অবনতিই হবে—তাহলে কি সবসময় সমাজকে তিরস্কার করা যায়?

সে যা-ই হোক্, এই আন্দোলনের একটা সুফল ফলেছিল। ঘরদোর আশেপাশের জায়গা-জমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যে দরকার—এ কথাটা ভারতীয় সমাজ মোটামুটি মেনে নিয়েছিল। কর্তাব্যক্তিদের কাছে এতে আমার মর্যাদাও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ ক'রে থাকবেন অভাব-অভিযোগ নিয়ে নালিশ করা কিংবা পাওনা-গণ্ডা আদায় করাই আমার একমাত্র কাজ ছিল না। সেদিকে আমি যেমন উৎসাহী ছিলাম তেমনি দৃঢ় ও তৎপর ছিলাম ভারতীয়দের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে।

আরো-একটি কাজ করতে তখনো বাকি ছিল—সে হ'ল বহির্ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশের

প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করা। ভারতবর্ষ গরীব দেশ। দেশ ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা যেত অর্থ উপার্জনের ধান্দায়। স্বদেশবাসীর বিপদ-আপদে তাদের অর্জিত সম্পদের অনেকটা দেশে পাঠাতে কখনো তাদের ভুল হয়নি।

১২. দেশে ফেরা

যুদ্ধকালীন কর্তব্য থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মনে হ'ল আমার কর্মক্ষেত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় আর নয়, ভারতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কোনো কাজ যে ছিল না তেমন নয়। কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় হ'ল শেষপর্যন্ত টাকা রোজগার করাটাই ও দেশে আমার প্রধান ধান্দা হয়ে দাঁড়াবে।

দেশের বন্ধুবান্ধবেরাও দেশে ফেরার জন্য আমায় পীড়াপীড়ি করছিলেন। আমারও কেমন মনে হ'ল, দেশে গেলে হয়তো আমি সেবার কাজ বেশি ক'রে করতে পারব। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজের জন্য মিস্টার খান ও মনসুখলাল নাজর তো ছিলেনই। তাই আমি সহকর্মীদের কাছ থেকে ছুটি চাইলাম। অনেক কষ্টে তো তাঁদের সম্মতি পাওয়া গেল একটি বিশেষ শর্তে। শর্ত ছিল এই যে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমাজ যদি এক বছরের মধ্যে আমায় ফিরে পেতে চান তাহলে আমায় ফিরে যাবার জন্য তৈরি থাকতে হবে। শর্তটা আমার কাছে কঠিন ব'লে মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি না-বলি কী ক'রে? আমি যে এঁদের প্রেমের ডোরে বাঁধা প'ড়ে গেছি। মীরাবাঈ গেয়েছেন :

> বাঁধা প'ড়ে গেছি প্রভু
> তব প্রেমডোরে,
> প্রণয়ের টানে যাই
> যেথা ডাকো মোরে।

মীরাবাঈ-এর পক্ষে যেমন গিরিধর নাগরের প্রেমডোর ছিঁড়ে ফেলার উপায় ছিল না, আমার পক্ষেও প্রায় তেমনি। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমাজের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেই প্রেমপাশ খুলে বেরিয়ে আসা ছিল আমার পক্ষে দস্তুরমতো শক্ত। জনগণের মুখ দিয়েই ভগবান কথা বলেন। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় বন্ধুদের বক্তব্য ছিল এমনই স্পষ্ট যে আমার 'না' বলার উপায় ছিল না। তাঁদের শর্ত মেনে নিয়ে আমি তাঁদের কাছ থেকে ছুটি পেলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল অঞ্চলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশি। নাটাল-স্থিত ভারতীয়েরা আমায় একপ্রকার প্রেমসুধারসে অভিসিঞ্চিত ক'রে দিয়েছিল। এখানে-ওখানে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্য সভা ডাকা হয়, আর সেইসব সভায় আমায় বহুমূল্য সব উপহার দেওয়া হয়।

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরি, সেবারও

আমি নানা উপহার পেয়েছিলাম। কিন্তু এবারকার বিদায়-সভায় যে দৃশ্য আমি দেখলাম, তাতে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে পড়ল। উপহৃত জিনিসের মধ্যে সোনা-রুপোর জিনিস তো ছিলই, বহুমূল্য হীরার অলঙ্কারও ছিল।

এসব উপহার গ্রহণ করি, এমন অধিকার কি আমার আছে? আর গ্রহণ যদি করি, কেমন ক'রে মনকে বোঝাব যে পয়সা না-নিয়ে আমি ভারতীয় সমাজের সেবা করেছি? আমার মক্কেলদের কাছ থেকে পাওয়া গুটিকতক উপহার ছাড়া, বাকি সবই ছিল যেন আমার জনসেবার পুরস্কার। তাছাড়া মক্কেলে-সহকর্মীতে আমার পক্ষে কোনো তফাৎ রাখার তো উপায় ছিল না। আদালতে আজ যে আমার মক্কেল, কাল হয়তো জনসেবার কাজে সে আমার সহকর্মী।

উপহারের মধ্যে ছিল আমার স্ত্রীর জন্য পঞ্চাশ গিনি মূল্যের একটি সোনার হার। কিন্তু সেটিও তো একপ্রকার আমারই জনসেবার ইনাম। অন্য উপহার থেকে সেটিকে তো পৃথক্ করা যায় না।

যেদিন এসব ভূরিপরিমাণ উপহার উপঢৌকন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম, সে রাতটা আমার বিনিদ্র কাটল। অস্থির হয়ে শোবারঘরে ক্রমাগত পায়চারি করতে লাগলাম। মনে-মনে ভাবতে লাগলাম, কী ক'রে এই সমস্যার মীমাংসা করি। বহুমূল্যের এসব উপহার নিজের কাছে রেখে দিতেও ইচ্ছা করে না, আবার ফেরৎ দিতেও মন চায় না।

এসব বস্তুসম্ভার যদি আত্মসাৎ করি, তাহলে ছেলেদের মনে অথবা আমার স্ত্রীর মনে কীরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেসব কথা ক্রমাগত ভাবতে লাগলাম। এতদিন ধ'রে তো আমি জনসেবার কাজে এদের তালিম দিয়েছি, বলেছি কর্ম ক'রে যাওয়াটাই কর্মের পুরস্কার, কর্মফলের প্রত্যাশা করা কিছু নয়।

বাড়িতে আমাদের বহুমূল্য অলঙ্কারপত্র কিছু ছিল না। আমাদের নিরন্তর চেষ্টা, কীভাবে জীবনযাত্রা সহজ সরল সাদাসিধে করতে পারি। তাহলে সোনার ঘড়িতে আমাদের কী দরকার। হীরের আঙটি কিংবা সোনার হার কি আমাদের সাজে? তখনকার দিনেও আমি ক্রমাগত লোকেদের বোঝাতাম অলঙ্কারের মোহ জয় করা উচিত। এখন আমার নিজের হাতে এই যে সম্ভার এসে পড়েছে—এ নিয়ে আমি কী করব?

আমি মনে-মনে স্থির করলাম, এসব জিনিস আমি নিজের কাছে রেখে দিতে পারি না। আমি ভারতীয় সমাজের কল্যাণে এই সম্পত্তি লেখাপড়া ক'রে দিতে চাই—এই মর্মে একটি চিঠির খসড়া তৈরি করলাম, বললাম একটি ট্রাস্ট্-ডীড সম্পাদন ক'রে পার্সি রুস্তমজী ও অন্য অছিদের হাতে এইসব রত্ন-অলঙ্কার তুলে দিতে চাই। পরদিন সকালবেলা স্ত্রী ও ছেলেদের ডেকে আমার এই সঙ্কল্পের কথা জানালাম এবং শেষপর্যন্ত এই বোঝাটুকু ঘাড় থেকে নামিয়েও ফেললাম।

আমি বুঝেছিলাম, ছেলেরা আমার প্রস্তাব বেশ সহজে মেনে নিলেও, আমার স্ত্রীকে রাজি করানো হয়তো একটু শক্তই হবে। তাই প্রথম-প্রথম ছেলেদেরই ধরলাম, যেন তারা আমার হয়ে তাদের মা-র কাছে ওকালতি করে।

তারা তো আমার কথায় সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গেল, বলল, "এসব দামি-দামি উপহারে তো আমাদের কিছু দরকার নেই। ভারতীয় সমাজের কাজে আমরা এগুলি দিয়ে দেব। তাছাড়া, কোনো জিনিসের যদি দরকার হয়, তাহলে আমরা তো নিজেদের পয়সা দিয়েও কিনে নিতে পারি।"

তাদের এই কথা শুনে আমি খুব খুশি হয়ে বললাম, "তাহলে তোমাদের মা-কে এই কথাটা ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারবে তো?"

"নিশ্চয়, তা আর বলতে? মা-কে ঠিক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমাদের দলে টেনে নেব। মায়ের তো আর গয়নাপত্তর পরার কোনো শখ নেই, দরকারও নেই। মা হয়তো এসব আমাদের জন্য রাখতে চাইতে পারেন। তা আমরা যদি তাঁকে বলি এসবে আমাদেরও কোনো দরকার নেই, আমরা এসব চাই না, তাহলে মা নিশ্চয় ছেড়ে দিতে গররাজি হবেন না।"

কিন্তু মুখে বলা যতটা সহজ, কাজে ঠিক ততটা সহজ হ'ল না।

আমার স্ত্রী বললেন, "এসবে তোমার কিছু দরকার না-থাকতে পারে। তোমার ছেলেরাও বলবে হয়তো যে এসবে তাদের কোনো দরকার নেই। তুমি যেমন তাদের বোঝাবে তেমনি বুঝবে, যেমন নাচাবে তেমনি নাচবে। আমায় তুমি বারণ করতে পারো গয়না পরতে—সে অধিকার তোমার আছে। কিন্তু আমার ছেলেদের বৌ হয়ে যারা ঘরে আসবে, তাদের তো গয়নাপত্তরের দরকার হতে পারে, তাদের তো তুমি বারণ করতে পারো না। তাছাড়া কেউ কি বলতে পারে আজ বাদে কাল কী ঘটবে? না, না, না, আমায় ওসব কথা ব'লো না ; লোকে ভালোবেসে আমাদের যেসব জিনিস উপহার দিয়েছে, সে আমি কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারব না।"

এইরকম তর্ক-বিতর্ক বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে চলল। কথায় পেরে ওঠা যখন দায় হ'ল, চোখের জলের বন্যা নামল। কিন্তু ছেলেরা তাতে টলল না, আর আমিও আড় হয়ে রইলাম।

যথাসম্ভব মোলায়েম সুরে আমি বুঝিয়ে বললাম, "দেখো, ছেলেদের বিয়ে-থা হতে তো এখনো অনেক দেরি আছে। বালকবয়সে আমরা তো তাদের বিয়ে দিতে চাই না। বড়ো হয়ে তারা নিজেদের পথ নিজেরাই বেছে নেবে। তাছাড়া, আমরাই যদি দেখেশুনে বৌ ঘরে আনি, তাহলে নিশ্চয় এমন বৌ আনতে যাব না—যারা নাকি গয়না-কাপড় ছাড়া আর-কিছু জানে না। আর তৎসত্ত্বেও যদি তাদের গয়না দিতেই হয়, তাহলে আমিই তো রয়েছি। আমায় তখন ব'লো।"

"তোমায় বলব? তোমায় বলাও যা পাথরকে বলাও তা। এদ্দিন তোমার ঘর করছি, তোমায় আমি চিনি না ভেবেছ? আমার গায়ের গয়না তো একে-একে সবই খসিয়েছ। যদ্দিন গায়ে ছিল, কম টিক্‌টিক্ করেছ আমার সঙ্গে? হ্যাঁ, তুমি না-কি ছেলের বৌদের জন্য গয়না গড়িয়ে দেবে? এখন থেকেই তো ছেলেদের বৈরাগী বানাবার ফিকির খুঁজছ। না, এসব গয়নাপত্তর কিছুতেই ফেরৎ দেওয়া যাবে না। তাছাড়া আমার ওই নেক্‌লেস্ নিয়ে আপনি মশাই বলবার কে? কোন্ অধিকারে বলতে চাও?"

"কিন্তু কস্তুরবাঈ, বুঝে দেখো। ও, নেক্‌লেস্‌টা ওরা দিল কেন? তুমি ওদের হয়ে সেবার কাজ করেছ ব'লে, না আমি সেবা করেছি ব'লে?"

"সে না-হয় মানলাম। কিন্তু তোমার সেবা করা তো একপ্রকার আমারই সেবা করা। যাতে তুমি এসব কাজ করতে পারো, সেজন্য রাত্রিদিন হাড়-মাস কালি ক'রে আমি কি কম খেটেছি? সে খাটুনি সেবা নয়? যাকে ইচ্ছা তাকে রাস্তা থেকে ধ'রে এনে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে, নাকের জল চোখের জল এক ক'রে আমি তাদের দাসীবৃত্তি করেছি। তবু কি বলবে আমি সেবা করিনি?"

চোখা-চোখা কথাগুলো তীরের ফলার মতো যথাস্থানে বিঁধলেও, আমি আমার সঙ্কল্পে অটল হয়ে রইলাম, উপহার-সামগ্রী আর গয়নাপত্র যা-কিছু পাওয়া গিয়েছিল, সব ফেরৎ দিয়ে দিতেই হবে। যেন তেন প্রকারেণ আমার স্ত্রীর সম্মতি আদায় ক'রে ১৮৯৬ ও ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে এ জাতীয় উপহার যা-কিছু পেয়েছিলাম, সব ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল। একটি ট্রাস্ট্-ডিড সম্পাদিত হবার পর ওইসব জিনিসের মুদ্রামূল্য ব্যাঙ্ক-এ জমা রাখা হয়, স্থির হয় যে আমার কিংবা অছিদের নির্দেশমতো গচ্ছিত টাকার আয় দশের সেবায় খরচ করা হবে।

দশজনের হয়ে কাজ করতে গিয়ে, যখনই আমার পয়সার দরকার হয়েছে অনেকবার আমি ট্রাস্ট্-এর এই গচ্ছিত টাকা তুলে নেবার কথা ভেবেছি। কিন্তু প্রতিবারই সে ইচ্ছা দমন ক'রে, চাঁদা তুলে কাজ চালিয়ে দিয়েছি, এই ট্রাস্ট্-এর টাকায় হাত দিইনি। সেই তহবিলটা এখনও আছে। বিপদ-আপদে তা থেকে টাকা তোলা হয়। সুদে-আসলে এই ফন্ড বৃদ্ধিও লাভ করেছে।

গয়নাগাটি একপ্রকার ছিনিয়ে নিয়ে এই তহবিল পত্তন করার জন্য আমার কোনোদিন আপশোস হয়নি। পরে আমার স্ত্রী-ও বুঝেছিলেন কাজটা ঠিকই হয়েছিল। এর ফলে বহু প্রলোভনের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এখন আমি এ কথা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, কোনো জনসেবকের পক্ষে নিজের জন্য বহুমূল্য উপহার গ্রহণ করা ঠিক নয়।

১৩. আবার ভারতে

আবার পাড়ি জমালাম স্বদেশের পথে। পথে পড়ল মরিশাস্ বন্দর। সেখানে জাহাজ ভিড়ল বেশ-কিছুটা সময়ের জন্য। বন্দরে নেমে মরিশাস্-এর অবস্থা ও পরিস্থিতি বিষয়ে বেশ-কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। উপনিবেশের গভর্নর স্যার চার্লস্ ড্রুস্-এর আমন্ত্রণক্রমে একটা রাত তাঁর অতিথি হয়ে কাটিয়েছিলাম।

ভারতে পৌঁছে আমি কিছুটাকাল কাটালাম এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে। সে বছরটা ছিল ১৯০১। সে বছর দীনশা ওয়াচার (পরে ইনি স্যার হয়েছিলেন) সভাপতিত্বে কলকাতায়

কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। বলাবাহুল্য, আমি এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলাম। এই প্রথম আমার কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা।

বোম্বাই থেকে কলকাতা-গামী যে ট্রেনে স্যর ফিরোজশা মেহ্‌তা যাত্রা করলেন, আমিও সেই ট্রেনের টিকিট কাটলাম। কথা ছিল যেতে-যেতে পথেই আমি তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি বিষয়ে ওয়াকিফহাল করব। স্যর ফিরোজশা কীরকম রাজকীয় আড়ম্বরে জীবনযাপন করতেন—সে কথা আমার পূর্ব থেকেই জানা ছিল। এ যাত্রায় দেখলাম, তিনি একটি সেলুন রিজার্ভ ক'রে চলেছেন। ট্রেনযাত্রার একটা কোনো পর্বে, আঁটঘাট বুঝে-সুঝে, আমি যেন তাঁর সেলুনে এসে আমার যা-কিছু বক্তব্য ব'লে যাই—এইরকম ছিল তাঁর নির্দেশ। যথানির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছে আমি তাঁর সেলুনের দরজায় হাজিরা দিলাম। ওঁর সঙ্গে তখন ছিলেন ওয়াচা ও চিমনলাল শীতলবাদ (পরে ইনিও স্যর হয়েছিলেন)। তিনজনে মিলে রাজনীতি নিয়ে চর্চা করছিলেন। আমাকে দেখেই স্যর ফিরোজশা ব'লে উঠলেন, "দেখো হে গান্ধী, তোমার ওই ব্যাপার নিয়ে কিন্তু কিছু করা সম্ভবপর হবে না। তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাও—সেটা অবশ্য আমরা পাশ করিয়ে দেব। কিন্তু বুঝে দেখো, স্বদেশেই আমাদের কিছু কি অধিকার আছে? নিজেদের দেশে যতক্ষণ-না নিজেদের হাতে আমরা ক্ষমতা পাচ্ছি, ততদিন দেশের বাইরে যেসব ভারতীয় আছেন, তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে না।"

আমি তো এ কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। শীতলবাদও স্যর ফিরোজশার কথায় সায় দিলেন। ওয়াচা করুণদৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকালেন।

স্যর ফিরোজশার কাছে আমার বক্তব্যের অনুকূলে যুক্তি-তর্ক পেশ করার একটু চেষ্টা ক'রে দেখলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, বোম্বাইয়ের মুকুটবিহীন রাজাকে বলতে পারব, এমন আমার সাধ্য কী! কংগ্রেস অধিবেশনে আমি যে প্রস্তাবটা পেশ করতে পারব—এইটুকুই আমার যথেষ্ট মনে হ'ল।

আমায় উৎসাহ দেবার জন্য ওয়াচা বললেন, "প্রস্তাব পেশ করার আগে অবশ্য সেটি আমায় দেখিয়ে নেবেন।" তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানালাম। পরবর্তী স্টেশনে গাড়ি থামতেই আমি সেলুন ছেড়ে নিজের কামরায় ফিরে গেলাম।

কলকাতায় তো পৌঁছনো গেল। অভ্যর্থনা সমিতি মহা-আড়ম্বরে শোভাযাত্রা সহকারে সভাপতি ও বিশিষ্ট অতিথিদের নিয়ে গেলেন। ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম্-এ আমি একপ্রকার একা পড়লাম। একজন স্বেচ্ছাসেবককে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায় গিয়ে উঠতে পারি। সে আমাকে রিপন কলেজে নিয়ে গেল। আরো-কিছু ডেলিগেটদের জন্য সেখানে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে লোকমান্য তিলকের জন্য কলেজের যে অংশে জায়গা রাখা হয়েছিল, আমিও সেই অংশে জায়গা পেয়েছিলাম। যদ্দূর মনে পড়ে, লোকমান্য আমার একদিন পরে এসে পৌঁছেছিলেন।

যেখানে লোকমান্য সেখানে তো দরবার বসবে—এতে আর আশ্চর্য কী! তাঁর সেই দরবারের দৃশ্যটা এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমি যদি ছবি আঁকিয়ে হতাম, তাহলে

হুবহু হয়তো আঁকতে পারতাম কেমন রাজকীয় গরিমায়, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তিনি তখন তাঁর তক্তপোষে আসীন হতেন। সেসময় কত যে লোক তাঁর কাছে হাজির হ'ত। তাদের কথা আমার বড়ো-একটা মনে পড়ে না—এক *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র বাবু মতিলাল ঘোষ ছাড়া। তিনি ও লোকমান্য একত্র হ'লে তাঁদের প্রাণখোলা হাসিতে দরবার সরগরম হয়ে উঠত। ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়ের অন্যায় আচরণের প্রসঙ্গ হ'লেই তাঁদের আলোচনা এমন মুখর হয়ে উঠত যে সে কথা ভুলবার নয়।

কিন্তু এই ক্যাম্প্-এর ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশদভাবে দু-চার কথা বলা দরকার। স্বেচ্ছাসেবকদের পরস্পরের মধ্যে হরদম ঠোকাঠুকি, মন কষাকষি। কাউকে ডেকে হয়তো কিছু-একটা করতে বললেন, সে নিজে সেটা না-ক'রে হুকুম করত আরেকজনকে। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব না-নিয়ে চাপিয়ে দিত আরেকজনের কাঁধে—এইরকম আর-কী! ফলে ডেলিগেটদের অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়—তাঁরা না-ঘরের, না-ঘাটের।

কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে আমার বেশ খাতির জমেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের স্বেচ্ছাসেবার কিছু-কিছু বিবরণ তাদের আমি শুনিয়েছিলাম, তাতে তারা একটু লজ্জা পায়। সেবাধর্মের তাৎপর্যের কথা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। মনে হ'ল, তারা কথাটা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সেবাবৃত্তি তো ব্যাঙের ছাতা নয় যে আপনা থেকে গজাবে। তার জন্য প্রবৃত্তি থাকা গোড়াতেই দরকার, অতঃপর দরকার হাতে-কলমে সেবা করার অভিজ্ঞতা। এইসব সরলহৃদয় সৎস্বভাব যুবকদের মধ্যে সেবাপ্রবৃত্তির কোনো অভাব ছিল না—অভাব ছিল বাস্তব জ্ঞানের অথবা অভ্যাসের। তখনকার কালে কংগ্রেসের আয়ুর মেয়াদ ছিল বছরে তিনদিনমাত্র, বছরের বাকি সময়টা কংগ্রেস একপ্রকার ঘুমিয়েই কাটাত। এই দু-তিনদিনের হাসি-খেলা ও প্রমোদের মেলা থেকে কতটুকুই-বা লোকে শিখতে পারে? প্রতিনিধি হিসেবে যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের সামান্যই তফাৎ—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। সেবার ব্যাপারে তাঁদেরও কোনো শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না। তাঁরা জানতেন কেবল হুকুম করতে, নিজের হাতে তাঁরা কুটোটিও নাড়াতে চাইতেন না। স্বেচ্ছাসেবকদের ডেকে কেবল ফরমায়েস, 'এটা করো, ওটা করো'—তার বেশি-কিছু নয়।

এখানেও দেখি সেই একইরকম ছোঁয়াছুঁয়ি ও শুচিবায়ুর ব্যাপার। তামিল ডেলিগেটদের রান্নাঘর অন্যসব রান্নাঘর থেকে কেবল যে পৃথক্ ছিল এমন নয়, ছিল একেবারে একান্তে। অন্যলোকের চোখের সামনে আহারাদি করতেও তাঁদের যেন আপত্তি, পাছে দৃষ্টিদোষ লেগে আহার্য অশুচি হয়ে যায়। সুতরাং কলেজের হাতার মধ্যে, ছিটেবেড়া দিয়ে তাঁদের জন্য একটি আলাদা রান্নাঘরের ব্যবস্থা করা হয়। সে ঘরটা প্রায় সর্বক্ষণ থাকত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ভিতরে ঢুকলে প্রায় দম বন্ধ হবার যোগাড়। রান্না-খাওয়া স্নান-আচমন সব কাজ তাঁরা ওই ঘরটিতেই সারতেন। ঘর তো নয়, যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ-করা একটা লোহার সিন্দুক। আমার তো মনে হ'ল এ যেন বর্ণাশ্রমধর্মের আতিশয্য নয়, অনাচার। যদি কংগ্রেস প্রতিনিধিদের

মধ্যে এরকম উৎকট ছুঁৎমার্গীরা সব থেকে থাকেন, তাহলে কংগ্রেসী জনসাধারণের মধ্যে সেটা যে কতো বীভৎস হতে পারে, সেই কথা ভেবে আমি শিউরে উঠলাম।

এরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ক্বচিৎ লক্ষ করা যায়। যেখানে-সেখানে নোংরা জল জ'মে থৈ-থৈ করছে। পায়খানা ছিল মাত্র গুটিকয়েক, প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। স্তূপাকার মলমূত্রের সেই পূতিগন্ধের কথা মনে করলে, আজও আমার গা ঘিন-ঘিন করে। স্বেচ্ছাসেবকদের ডেকে সব অবস্থা দেখালাম। তারা সোজাসুজি জবাব দিল, "ও তো আমাদের কাজ নয়, মেথরের কাজ।" আমি তাদের কাছ থেকে একটি ঝাঁটা চাইলাম। যার কাছে চাইলাম, সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল। তখন একটি ঝাড়ু জোগাড় ক'রে আমি নিজের হাতেই পায়খানা সাফ্ করলাম। এটা করতে হ'ল নিজের ব্যবহারের সুবিধা হবে ব'লে। সংখ্যায় কম ছিল ব'লে পায়খানার সামনে ভিড় লেগেই থাকত। অথচ পায়খানার যেমন অবস্থা, তাতে প্রত্যেকবার ব্যবহারের পরেই সাফ্-সুতরো করাটা ছিল নিতান্তই দরকার। কিন্তু সব পায়খানাগুলো সাফ্ করি, এমন আমার সাধ্য বা সময় ছিল না। অগত্যা নিজের ব্যবহারের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু ব্যবস্থা ক'রেই আমায় ক্ষান্ত দিতে হ'ল। আর-যাঁরা সব ছিলেন দেখলাম, দুর্গন্ধে ও নোংরায় তাঁদের যেন বেশি-কিছু আসে-যায় না, বেশ নির্বিকার থাকতে পারেন।

কিন্তু এখানেই যদি শেষ হ'ত, তাহলেও না-হয় কথা ছিল। রাত্রে যদি বেগ পেত, কোনো-কোনো এমনও অবিবেচক ডেলিগেট ছিলেন যে তাঁরা শোবার ঘরের বারান্দায় অন্ধকারে চুপিসারে কাজ সারতে দ্বিধা করতেন না। সকাল হ'লে স্বেচ্ছাসেবক ডেকে আমি সেইসব জায়গা দেখালাম। দেখলাম, সাফাইয়ের কাজে কেউ এগিয়ে এল না। অংশীদার কাউকে যখন পাওয়া গেল না, সাফাই করার গৌরবটা একাহাতে আমাকেই বহন করতে হ'ল। পরবর্তীকালে অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটেছে বটে, তবু আজকের দিনেও এমন-কিছু অবিবেচক ডেলিগেট থাকেন যাঁরা কংগ্রেস-ক্যাম্প্-এর যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ ক'রে জায়গাটাকে কদর্য করতে ইতস্তত করে না। স্বেচ্ছাসেবকেরাও সব এমন নয় যে তারা ঝাড়ুহাতে সেইসব নোংরামি সাফ্ করতে সর্বদা প্রস্তুত।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে কংগ্রেস অধিবেশন যদি বেশিদিন ধ'রে চলে তাহলে মারী-মড়ক অসুখ-বিসুখ লাগাটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

১৪. একাধারে কেরানী ও বেয়ারা

কংগ্রেস-এর অধিবেশন বসতে তখনো দিন-দুই বাকি। ভাবলাম এই দুটো দিন কংগ্রেস দপ্তরে যদি কাজ ক'রে দিই, তাহলে এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু-কিছু জানতেও পারব। কলকাতা পৌঁছেই স্নানাদি সেরে আমি সোজা চ'লে গেলাম কংগ্রেস দপ্তরে।

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত [জানকীনাথ] ঘোষাল ছিলেন কলকাতা কংগ্রেস-এর যুগ্ম-সম্পাদক। ভূপেনবাবুর কাছে হাজির হয়ে জানালাম, আমি দপ্তরের কিছু কাজ ক'রে দিতে চাই। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আমার এখানে তো কোনো কাজ দেখছি না। ঘোষালবাবু হয়তো কোনো কাজ দিতে পারবেন। আপনি বরঞ্চ তাঁর কাছে যান।" সুতরাং ঘোষালবাবুর কাছেই গেলাম। তিনি আমায় বেশ নিরীক্ষণ ক'রে একবার দেখার পর, হেসে বললেন : "এক কেরানীর কাজ আপনাকে দিতে পারি। করবেন?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়। আমার সাধ্যে যতটা কুলোয়, সেরকম কাজ করবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছি।"

"এ মশাই খুব খাঁটি কথা বলেছেন। এইরকমটাই তো হওয়া দরকার।"

তাঁর আশেপাশে যেসব স্বেচ্ছাসেবক দাঁড়িয়েছিল, তাদের দিকে ফিরে শ্রীযুক্ত ঘোষাল বললেন, "শুনলে তো ইনি যা বললেন?"

পরে আমার দিকে ঘুরে ব'লে চললেন, "তাহলে এই দেখুন, জবাবের অপেক্ষায় একগাদা চিঠি এখানে জমেছে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে চলুন, কাজ শুরু হয়ে যাক্। দেখছেনই তো হরদম আমার কাছে লোক আনাগোনা করছে। তাদের সঙ্গে কথা কইব, না, এইসব আজে-বাজে চিঠির জবাব দেব? একটিও কেরানী নেই যার হাতে কাজটা তুলে দিতে পারি। এসব চিঠিতে পদার্থ বলতে বিশেষ-কিছু নেই, তবু একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেওয়া দরকার। যেসব চিঠির প্রাপ্তিসংবাদ দেওয়া দরকার মনে করেন, সেগুলোর জবাব লিখে ফেলুন। আর যেখানে-যেখানে আমায় জিজ্ঞেস ক'রে নেওয়া দরকার মনে করেন, জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নেবেন কেমন জবাব দিতে হবে।"

আমার প্রতি তাঁর এই আস্থা দেখে আমি বেশ খুশি হলাম।

আমায় যখন কাজটা করতে দিলেন আমার পরিচয় তিনি জানতেন না। পরে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলেন, আমি লোকটা কে।

সেই গাদাখানেক চিঠির বিলিব্যবস্থা করা আদৌ কঠিন ছিল না। খুব অল্পসময়ের মধ্যে আমি কাজটা সেরে ফেললাম। তাই দেখে শ্রীযুক্ত ঘোষাল বেশ খুশি হলেন। তিনি ছিলেন বাক্যবাগীশ মজলিসিধরনের মানুষ। ঘন্টার পর ঘন্টা অনর্গল কথা ব'লে যেতেন। আমার কাছ থেকে আমার নামধাম পরিচয় জানবার পর, কেরানীর কাজে আমায় লাগিয়েছিলেন ব'লে তিনি খুব আপশোস করতে থাকেন। আমি তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে বলি, "আছা, তাতে কী হয়েছে? কেন আপনি এরকম মনে করছেন? কংগ্রেস-এর সেবায় আপনি তো চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। আপনি আমার গুরুজনের তুল্য। আপনার কাছে তো আমি অনভিজ্ঞ

অপরিণত ছেলেমানুষ। এই কাজে আমায় লাগিয়ে আপনি আমায় বাধিত ও অনুগৃহীত করেছেন। আমি কংগ্রেস-এর কাজ করতে চাই। আপনি সুযোগ না-দিলে এ কাজের খুঁটিনাটি বুঝতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না।"

শ্রীযুক্ত ঘোষাল বললেন, "এই তো চাই। সত্যি বলতে কী, এইরকম মনোভাবই দরকার। কিন্তু আজকালকার ছেলেছোকরারা এসব কথা বোঝে না। সত্যিই তো, কংগ্রেস-এর জন্ম থেকেই আমি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। কংগ্রেস-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মিস্টার হিউম্-এর সঙ্গে-সঙ্গে আমারও কিছুটা হাত নিশ্চয়ই ছিল।"

এইভাবে আমাদের দু-জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হ'ল। তিনি একপ্রকার জোর ক'রেই দুপুরবেলা আমাকে পাশে নিয়ে খেতে বসলেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষালের শার্ট-এর বোতাম লাগিয়ে দিত তাঁর বেয়ারা। আমি ইচ্ছা ক'রেই বেয়ারার এই কাজটা চেয়ে নিলাম। এসব কাজ করতে আমার বেশ ভালোই লাগত কারণ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল আমার সহজাত। আমার স্বভাবের এই দিকটার পরিচয় পাওয়ার পর থেকে, তাঁর ব্যক্তিগত ফাইফরমায়েশের ছোটোখাটো কাজ আমার হাতে তুলে দিতে তাঁর আর বাধত না। বরঞ্চ তিনি এতে খুশিই হতেন। শার্ট ও কলারের বোতাম পরিয়ে দিতে ব'লে, তিনি বলতেন, "একবার বুঝে দেখো ব্যাপারখানা। তোমাদের এই কংগ্রেস সেক্রেটারির সর্বক্ষণ কাজ লেগেই আছে ব'লে, নিজের হাতে বোতামটুকু পর্যন্ত লাগাবার তাঁর সময় নেই।" তাঁর এইরকম ছেলেমানুষী সরলতা দেখে আমার বেশ মজা লাগত, কিন্তু তাই ব'লে এইরকম ছোটোখাটো সেবার কাজে আমার কোনো গ্লানি ছিল না। এসব কাজ থেকে আমার কতো যে লাভ আখেরে হয়েছে, তা ঠিক হিসেব ক'রে বলা যাবে না।

অল্পকয়েকদিনের মধ্যেই কংগ্রেস-এর পরিচালন বিষয়ে আমার সব কথাই একপ্রকার জানা হয়ে গেল। নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলের সঙ্গেই আমার দেখাসাক্ষাৎ হ'ল। গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথের মতো বিরাট পুরুষদের মতিগতি কাছের থেকে লক্ষ করার কিছুটা সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। আর লক্ষ করেছিলাম, এইসব অধিবেশনে সময়ের কী বিরাট অপচয় ঘ'টে থাকে। এবারে যেমন পরেও তেমনি, গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেছি কংগ্রেস-এর কাজকর্ম আলাপ-আলোচনায় ইংরেজি ভাষাকে কীরকম প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। সময়, বাক্য কিংবা শক্তির যে নিদারুণ অপচয় ঘটত—সে দিকে কেউ বড়ো দৃষ্টিই দিত না। যে কাজ একাহাতে করা উচিত, সে কাজ করতে পাঁচজন লোক মিথ্যে ভিড় জমাত। অপরপক্ষে দেখা গেল, এমন অনেক জরুরি কাজ প'ড়ে থাকত, যা করার জন্য কারো যেন মাথাব্যথা নেই।

এসব ব্যাপার দেখে-শুনে আমার সমালোচনা-প্রবৃত্তি যে মাথাচাড়া দিয়ে না-উঠত, এমন নয়। তবে স্বভাবত আমি তো অনুদার নই, তাই সর্বদা মনকে প্রবোধ দিতাম যে ওইরকম অবস্থায় ওর চাইতে ভালো ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। কাজ যেমনই হোক্-না-কেন, সে কাজের মূল্যকে খাটো করতে আমার মন সরত না।

১৫. কংগ্রেস অধিবেশনে

এতকালের মনোবাঞ্ছা আমার পূর্ণ হ'ল, আমি কংগ্রেস অধিবেশনে সশরীরে হাজির, এ কথা ভাবতেও আমার অদ্ভুত লাগছিল। বিরাট মণ্ডপ। জমকালো পোশাকে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে স্বেচ্ছাসেবকের দল। মঞ্চের ওপর ব'সে আছেন নেতৃস্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা। এসব দেখে-শুনে আমি যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম। এই মহতী সভায় আমার মতো লোকের কোথায় যে স্থান হবে—সেই কথা ভাবতে লাগলাম।

সভাপতির অভিভাষণ ছাপা হয়ে বিলি হ'ল। সে এক গ্রন্থবিশেষ। আগাগোড়া ভাষণটা প'ড়ে দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। বাছা-বাছা কিছু-কিছু অংশমাত্র পড়া হ'ল। সভাপতির অভিভাষণের পর এল বিষয়-নির্বাচনী সমিতির সদস্য নির্বাচন। গোখলে আমায় সেইসব বৈঠকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন।

স্যর ফিরোজশা আমায় অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আমার প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। বিষয়-নির্বাচনী সমিতির কাছে কে যে এই প্রসঙ্গ তুলবেন, কখন তুলবেন—এইসব সাত-পাঁচ কথা আমি ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলাম। দেখলাম, প্রত্যেকটি প্রস্তাবের সমর্থনে লম্বা-লম্বা বক্তৃতা দেওয়া হ'ল। সব বক্তৃতাই ইংরেজিতে। বক্তারা সকলেই নামজাদা নেতা। এইসব বক্তৃতার ঢাকঢোল ডামাডোলের মধ্যে, আমার বাঁশের বাঁশির মৃদু সুরটুকু কারো কি কানে পৌঁছুবে? রাত যত বাড়তে লাগল ততই আমার বুকের ধুক্‌পুকুনি বাড়তে লাগল। যদ্দূর স্মরণ হয়, শেষের দিকে যেসব প্রস্তাব এসেছিল তার ভালো-মন্দ বিচার হয়ে যাচ্ছিল বিদ্যুৎগতিতে। সকলেই তখন তাড়াহুড়ো করতে লেগেছেন। রাত তখন এগারোটা। আমি যে কিছু বলব, সে আমার সাহসে কুলোচ্ছিল না। গোখলের সঙ্গে তো ইতিপূর্বেই দেখাসাক্ষাৎ ক'রে আমার প্রস্তাবের বিষয় বলেছিলাম। তিনি তা দেখেওছিলেন। আমি তাঁর চেয়ারের কাছে গিয়ে তাঁর কানে-কানে বললাম, "আমার প্রস্তাবের কিছু বিহিত ব্যবস্থা করুন।" তিনি বললেন, "তোমার প্রস্তারের কথা আমার ঠিকই মনে আছে। এঁরা কেমন তাড়াহুড়ো লাগিয়েছেন দেখেছো তো। তবে তোমার প্রস্তাব যাতে মাঠে না-মারা যায়, তার একটা উপায় আমি ঠিকই করব।"

স্যর ফিরোজশা বললেন, "কেমন, সব কাজ খতম হয়েছে তো?"

গোখলে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "না, কাজ এখনো শেষ হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ে একটা প্রস্তাব এখনো বিবেচনার অপেক্ষায় বাকি আছে। মিস্টার গান্ধী অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন সেই বিষয়ে কিছু বলবার জন্য।"

স্যর ফিরোজশা জিজ্ঞেস করলেন, "প্রস্তাবটা আপনি দেখেছেন?"

"দেখেছি বৈ-কি।"

"পছন্দ হয়েছে?"

"প্রস্তাবটা খুবই ভালো ব'লে মনে হয়েছে।"

"তা বেশ তো। আচ্ছা, গান্ধী প্রস্তাবটা প'ড়ে শোনাও।"

আমি কাঁপতে-কাঁপতে প্রস্তাবটা প'ড়ে শোনালাম।

গোখলে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।"

মিস্টার ওয়াচা বললেন, "প্রকাশ্য অধিবেশনে এই প্রস্তাবের সপক্ষে বলবার জন্য গান্ধীকে পাঁচ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হ'ল।"

নির্বাচনী সমিতির এরকম কাজের ধরন আমার একটুও ভালো লাগেনি। প্রস্তাবটা যে কী, সে বিষয়ে কারও যেন একটুও মাথাব্যথা নেই। রাত বেশি হয়ে গেছে ব'লে যে যার বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। গোখলে প্রস্তাবটা ফেলেছেন, সুতরাং আর-কারও দেখবার দরকার নেই, বোঝবার দরকার নেই।

পরদিন সকালবেলা আমার সেই পাঁচ মিনিটের বক্তৃতা নিয়ে কী উদ্‌বেগ। পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে সব কথা আমি কী ক'রে গুছিয়ে বলব? আমার মনের মধ্যে যুক্তি-তর্ক সমস্ত বেশ সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। কিন্তু মুশকিলটা এই যে মনে যদি-বা কথা জোগায়, মুখে কথা জোগায় না। আমি স্থির করেছিলাম, লিখিত বক্তৃতা আমি পড়ব না, যা বলবার তা মুখে-মুখে বলব। কিন্তু কেমন যেন মনে হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে, দশজনের সামনে আমি যেমন অবাধ বক্তৃতা করতে পারতাম, এখানে এসে সেই ক্ষমতা আমার যেন লোপ পেয়েছে।

আমার প্রস্তাব পেশ করার সময় এলে পর মিস্টার ওয়াচা আমার নাম ডাকলেন। উঠে দাঁড়াতেই আমার মাথা যেন ঘুরতে শুরু করল। কোনোরকমে প্রস্তাবটা তো প'ড়ে দিলাম। দরিয়াপার হয়ে বিদেশযাত্রার গুণকীর্তন ক'রে কে যেন একটি কবিতা লিখে এবং তা ছাপিয়ে প্রতিনিধি-মণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। আমি সেই কবিতা পাঠ ক'রে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলেছি—এমনসময় মিস্টার ওয়াচা ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম, তখনো পাঁচ মিনিট মেয়াদ খতম হয়নি। আমার জানা ছিল না, বক্তৃতার জন্য বরাদ্দ সময়ের দু-মিনিট বাকি থাকতে, বক্তাকে সাবধান করার জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে সঙ্কেত জানানো হয়। ইতিপূর্বে অনেকে আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত বক্তৃতা দিয়ে গেছেন, অথচ তাঁদের বেলা একটিবারও ঘণ্টা বাজেনি। ঘণ্টা বাজতেই আমি ক্ষুব্ধ হয়ে ব'সে পড়লাম। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কেমন যেন মনে হয়েছিল সেই যে ট্রেনে আসতে স্যর ফিরোজশা আপত্তি তুলেছিলেন, তার একটা জবাব প্রচ্ছন্ন ছিল আমি যে কবিতা পাঠ ক'রে শুনিয়েছিলাম, তার মধ্যে। প্রস্তাব পাশ করানো নিয়ে তখনকার দিনে কোনো প্রশ্নই ছিল না। নির্বাচনী সমিতি যেসব প্রস্তাব পেশ করতেন, সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ত। তখনকার দিনে প্রতিনিধি ও দর্শক-সাধারণের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ ছিল না। ফলে সকলে একসঙ্গে হাত তুলে প্রতিটি প্রস্তাবের সমর্থন জানাত। আমার প্রস্তাবটাও এইভাবে বিনা-তর্কে বিনা-আলোচনায় পাশ হয়ে যাবার দরুণ প্রস্তাবের গুরুত্বটুকু যেন আমার কাছে অনেকখানি ক'মে গেল। তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস যে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, স্বীকার করেছে—এটাতেই আমি যথেষ্ট আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম।

তখনকার দিনে কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করার মানে ছিল সারা দেশের সমর্থন লাভ করা। সারা ভারতের সায় যদি পাওয়া যায়, কে-না খুশি হয়।

১৬. লর্ড কার্জন-এর দরবার

কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হয়ে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত কাজে, কলকাতার বণিক সংস্থা (চেম্বার অব কমার্স) ও অন্য-কিছু লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার দরকার ছিল ব'লে, আমি মাসখানেক কলকাতাতেই থেকে গেলাম। এতদিনের জন্য হোটেলে থাকার আমার ইচ্ছা ছিল না। একটি পরিচয়পত্র সংগ্রহ ক'রে, তার জোরে ইণ্ডিয়া ক্লাব্-এ একখানা ঘর পাওয়া গেল। কয়েকজন নাম-করা প্রতিষ্ঠাবান্ ভারতীয় ছিলেন এই ক্লাব্-এর সদস্য-শ্রেণীভুক্ত। তাঁদের সঙ্গে অল্পপরিচয়ক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে তাদের আগ্রহী ক'রে তুলতে পারব—এরকম একটা আশা মনে ছিল। গোখলে প্রায়ই এই ক্লাব্-এ যেতেন বিলিয়ার্ড খেলতে। আমায় কিছুকাল কলকাতায় থেকে যেতে হবে জানতে পেরে, তিনি আমায় তাঁর ওখানে গিয়ে থাকতে বললেন। তাঁর আমন্ত্রণ আমি ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলাম। কিন্তু আমি নিজে উপযাচক হয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠব—এ আমার খুব সঙ্গত হবে ব'লে মনে হ'ল না। দু-একদিন আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে, গোখলে নিজেই আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। আমার সঙ্কোচের ভাব দেখে তিনি বললেন, "দেখো গান্ধী, তুমি হ'লে এ দেশের লোক, এ দেশেই তোমায় থাকতে হবে। সুতরাং এরকম লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই না-রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সব লোকজনের সঙ্গে তোমার দেখাশোনা হয়, আলাপ-পরিচয় হয়—ততই ভালো, তার কারণ আমার খুব ইচ্ছা যে তুমি কংগ্রেস-এর কাজে যোগদান করো।"

গোখলের ওখানে উঠে যাবার আগে, ইণ্ডিয়া ক্লাব্-এর একটি ঘটনার কথা বলা দরকার।

এইসময় লর্ড কার্জন তাঁর দরবার বসিয়েছিলেন। দরবারে হাজির হবার জন্য আহূত কয়েকজন রাজামহারাজা ছিলেন এই ক্লাব্-এর সদস্য। ক্লাব্-এর ভিতরে যখন তাঁরা থাকতেন, তাঁরা বাঙালি-ধরনের মিহি ধুতি পাঞ্জাবি ও চাদর ছাড়া অন্য-কিছু বড়ো-একটা পরতেন না। যেদিন দরবার বসল, সেদিন তাঁরা ধুতি-চাদর ছেড়ে, খানসামাদের মতো চুড়িদার পাজামা, জরিদার জোব্বা, জমকালো পাগড়ি ও চক্‌চকে বুট-জুতোয় সুসজ্জিত হয়ে বেরুলেন। ব্যাপারটা দেখে আমার ভারি খারাপ লাগল। আমি তাঁদের একজনকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "এভাবে ভোল বদ্‌লানো কেন?"

"আমাদের কী দুঃখ তা কেবল আমরাই জানি। ধন-দৌলত, মান-ইজ্জৎ, পদবি-খেতাব রাখতে গিয়ে আমাদের যে প্রাণান্ত করতে হয়, লাঞ্ছনা-অপমান সইতে হয়, সে আপনারা কেমন ক'রে বুঝবেন?"

"কিন্তু ওই খানসামা-ধরনের পাগড়ি আর বুট-জুতোর কী দরকার?"

"খানসামাতে-আমাতে কি কোনো তফাৎ দেখতে পান? এরা যেমন আমাদের খানাসামা, আমরা তেমনি লর্ড কার্জন-এর খানসামা। আর দরবারে যদি হাজিরা না-দিতে পারি, তাহলে সে গাফিলতির জন্য জরিমানা-হয়রানি কিছু কম হবে না। সচরাচর আমি আমার জাতীয় পোশাক প'রে থাকি, তাই প'রে যদি দরবারে যাই তাহলে সেটা দস্তুরমতো অপরাধ ব'লে গণ্য হবে। তাও যদি লর্ড কার্জন-এর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দু-চারটে কথা বলার সুযোগ পেতাম!—কিন্তু সে গুড়েও বালি।"

এই বন্ধুপ্রবর তাঁর মনের কথা বেশ খোলসা ক'রেই বলেছিলেন। কথা শুনে এঁদের প্রতি আমার কেমন একটা অনুকম্পা হ'ল।

এই প্রসঙ্গে আরো-একটি দরবারের কথা আমার মনে পড়ছে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ্ যেবার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখনো একটি দরবার বসেছিল। অনেক রাজামহারাজা সেই দরবারে হাজির হয়েছিলেন—সে কথা তো বলাই বাহুল্য। আমি যে কথা বলতে চাই সে হ'ল এই যে, পণ্ডিত মালব্য এই দরবারে উপস্থিত থাকার জন্য আমায় বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলাম।

এই দরবারে মহা-রাজরাজড়াদের সাজপোশাকের ঘটা দেখে আমি মনে ভারি বেদনা অনুভব করি। প্রত্যেকে যেন মেয়েদের মতো সেজেগুজে এসেছেন— সিল্ক-এর চুড়িদার পাজামা, সিল্ক আচকান, লহরে-লহরে মুক্তোর মালা ঝুলছে গলায়, হাতে মণিমাণিক্য-খচিত বাজুবন্ধ, হীরা-মুক্তোর ঝলক থাকায় পাগড়ি হয়েছে যেন শিরোভূষণ। উপরন্তু জমকালো কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে সোনার তৈরি হাতল লাগানো শখের তলোয়ার।

বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না, এসব তাঁদের রাজ-গৌরবের প্রতীক-চিহ্ন নয়, পরন্তু তাঁদের দাসত্বের পরিচয়। প্রথম-প্রথম মনে হয়েছিল, তাঁদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্য তাঁরা স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে এইসব বহুমূল্য বস্ত্রে অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে এসে থাকবেন। পরে জানতে পেলাম যে এইরকম অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সময় রাজন্যবর্গকে আবশ্যিকভাবে মণিমুক্তায়, বস্ত্রে, অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে আসতে হয়। আরো জানতে পেলাম, তাঁদের কারো-কারো না-কি অলঙ্কার-ধারণে ঘোরতর আপত্তি এবং এইরকম দরবারের মতো বিশেষ অনুষ্ঠানে ছাড়া অলঙ্কার তাঁরা কখনো ধারণ করতে চান না।

এসব শোনা কথা কতটা সত্য বা বিশ্বাসযোগ্য, সে আমি জানি না। তবে দরবার ছাড়া অন্য-কোনো উপলক্ষে তাঁরা এসব ধারণ করুন আর না-ই করুন, মুষ্টিমেয় স্ত্রীলোক যেমন গা-ভরা গয়নায় নিজেদের সাজায়, সেইরকম সেজেগুজে রাজারাজড়াদেরও যদি বড়োলাটের দরবারে হাজির হতে হয়—তাহলে তা নিঃসন্দেহে শোচনীয়।

পাপ ও দুষ্কৃতির ফলে মানুষ যখন ধনৈশ্বর্য কিংবা পদমর্যাদা লাভ করে, তখন এইভাবেই তাকে খেসারৎ দিতে হয়।

১৭. গোখলের সঙ্গে একমাস : ১

প্রথম দিন থেকেই গোখলে আমার সঙ্গে এমন আচরণ করতে লাগলেন যেন আমি তাঁর ঘরের লোক, যেন আমি তাঁর নিজের ছোটো ভাই। আমার কী-কী দরকার সব কথা জেনে নিয়ে সকলরকম বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। সুখের বিষয়, আমার চাহিদা ছিল যৎসামান্য। তাছাড়া নিজের কাজ নিজের হাতে করা আমার একপ্রকার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল ব'লে, চাকর, দাসীর সেবার আমার বিশেষ কোনো প্রয়োজন হ'ত না। আমার আত্মনির্ভরতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস, একাগ্রতা ও নিয়মানুবর্তিতা তাঁর খুবই ভালো লাগত এবং অনেকসময় আমার মুখের সামনেই তিনি আমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন।

আমার কাছ থেকে তিনি কোনো কথা গোপন রাখতে চাইতেন না। যেসব বিশিষ্ট লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাঁদের প্রায় সকলের সঙ্গে তিনি আমার পরিচয়-সাধন করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁর বিষয়ে আমার সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি হলেন ডক্টর পি. সি. রায় (পরে ইনি স্যর হয়েছিলেন)। ইনি কেবল যে প্রতিবেশী ছিলেন তা নয়, একপ্রকার আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকতেন এবং যখন-তখন এসে পড়তেন।

গোখলে ডক্টর রায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে আমায় বলেছিলেন, "ইনি প্রফেসর রায়। এঁর মাসিক মাইনে ৮০০ টাকা থেকে মাত্র চল্লিশটি টাকা নিজের খরচখরচার জন্য রাখেন, বাকি টাকা ব্যয় করেন দেশ ও দশের মঙ্গলে। ইনি অবিবাহিত। বিবাহ করতেও ইনি চান না।"

আজকের ডক্টর রায়ের সঙ্গে তখনকার ডক্টর রায়ের সামান্যই তফাৎ। তখনো তাঁর সাজপোশাক সাদাসিধে ছিল—তখন অবশ্য তিনি দেশী মিল্-এ তৈরি কাপড়চোপড় পরতেন, এখন পরেন খাদি। গোখলে ও ডক্টর রায়ের মধ্যে যেসব আলাপ-আলোচনা হ'ত সেগুলির বিষয় ছিল কীসে পাঁচজনের হিত হয়, কেমন ক'রে শিক্ষার বিস্তার হয়। এসব কথাবার্তা শুনতে আমার কোনো বিরাম ছিল না, খুব নিবিষ্ট হয়ে মন দিয়ে শুনতাম। মাঝে-মাঝে তাদের কথায় মনে বেদনা অনুভব করতাম ; জন-নেতাদের দোষ-ত্রুটি তাঁরা তীব্রভাবে নিন্দা করতেন। তার ফলে, যাঁদের এককালে আমি স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিক ব'লে মনে করতাম, তাঁদের কাউকে-কাউকে মানুষ হিসাবে ভাবি ক্ষুদ্র ব'লে মনে হতে লাগল।

গোখলের কার্যপদ্ধতি দেখে আমার যেমন আনন্দ হ'ত, তেমনি শিক্ষালাভও হ'ত। তিনি মুহূর্তকাল হেলায় হারাতে দিতেন না। তিনি লোকের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতেন কিংবা তাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করতেন—কেবল দেশসেবার খাতিরে। কথা যা-কিছু বলতেন সেসমস্তই দেশহিতের কথা। এমন একটি কথাও বলতেন না যার মধ্যে সত্য বা সততার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল। ভারতের দারিদ্র ও পরাধীনতা কীভাবে ঘোচানো যায়—এই ছিল তাঁর প্রতিদিনের চিন্তা ও ভাবনা। নানা লোক নানারকম কাজে-কর্মে তাঁকে টানতে চাইত। সবাইকে তিনি ওই একই জবাব দিতেন : "আপনারা আপনাদের কাজ ক'রে যান। আমাকেও আমার কাজটুকু করতে দিন। আমার একমাত্র কাম্য হ'ল দেশের স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীন হ'লে পর

অন্যসব বিষয় চিন্তা করা যাবে। আজকের দিনে আমার ওই একটিমাত্র লক্ষ্যসাধনে যদি আমার সবটুকু সময় ও শ্রম দিতে পারি তাহলেই যথেষ্ট।

যখনই তিনি সুযোগ পেতেন, রানাডের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। প্রতিটি বিষয়ে রানাডের সিদ্ধান্ত যে চরম ও অভ্রান্ত—এইভাবে তিনি রানাডের মতামত সুযোগ পেলেই পেশ করতেন। আমি যখন গোখলের অতিথি, তিনি একটা বিশেষ দিন রানাডে-স্মরণ দিবসরূপে উদ্‌যাপন করেন। সে দিনটা রানাডের জন্মবার্ষিকী ছিল না মৃত্যুবার্ষিকী ছিল, সে কথা এখন আমার ঠিক মনে পড়ে না। তবে ওই দুটি দিনই তিনি পবিত্র তিথির মতো নিয়মিত পালন করতেন। তখন আমি ছাড়া তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই বন্ধু, প্রফেসর কথাওয়াতে ও একজন সাব-জজ। সেই স্মরণোৎসবে যোগ দেবার জন্য তিনি আমাদের সবাইকেই আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষে রানাডে বিষয়ে তাঁর স্মৃতিকথা নিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি রানাডে, তেলাং ও মাণ্ডলিক-এর বিষয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন। ভাষা ও সাহিত্যে তেলাং-এর কৃতিত্ব ও সমাজসংস্কারে মাণ্ডলিক-এর শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তিনি সপ্রশংস মন্তব্য করেন। মক্কেলের প্রতি মাণ্ডলিক-এর কর্তব্যবুদ্ধি কীরকম সদাজাগ্রত ছিল সেই বিষয়ে তিনি একটি ঘটনার কথা বলেন। একবার কোর্ট-এ যাবার পথে মাণ্ডলিক ট্রেন ফেল করেন। যথাসময়ে মক্কেলের হয়ে আদালতে হাজিরা দেবার জন্য তিনি একটি স্পেশাল ট্রেন ভাড়া ক'রে গিয়েছিলেন। কিন্তু সর্বগুণসম্পন্ন প্রতিভাধর ব্যক্তিরূপে রানাডে ছিলেন এঁদের তুলনায় অনেক-অনেক বড়ো—এইরকম কথা গোখলে বললেন। তিনি কেবল জজ হিসেবে যে কৃতী ছিলেন এমন নয়, ঐতিহাসিকরূপে, অর্থনীতিকরূপে, সংস্কারকরূপেও তিনি কিছু কম ছিলেন না। জজ হ'লে কী হয়, তিনি অকুতোভয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতেন। প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে তিনি সকলের এমন আস্থাভাজন ছিলেন যে তাঁর বিচার ও মতামত লোকে বিনা-দ্বিধায় মেনে নিত। গুরুর গভীর জ্ঞান ও হৃদয়বত্তা ও তাঁর মধ্যে অশেষ গুণের সমাবেশের কথা বলতে গিয়ে গোখলের যেন আনন্দের অবধি ছিল না।

সেকালে গোখলে একটি ঘোড়াগাড়িতে যাতায়াত করতেন। কী কারণে ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করা তাঁর পক্ষে দরকার ছিল, সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা না-ক'রেই আমি একদিন আমার আপত্তি জানিয়ে বললাম, "কী দরকার আপনার ঘোড়ারগাড়িতে যাতায়াত করার? আপনি তো আর-পাঁচজনের মতো ট্রামে চেপেও এখান-ওখান যেতে পারেন। ট্রাম-এ যাতায়াত করলে বুঝি আপনার মতো জন-নেতার সম্ভ্রমহানি হয়?"

আমার কথা শুনে তিনি একটু দুঃখিত হয়ে বললেন, "তুমিও দেখছি আমায় ভুল বুঝেছ! কৌন্সিল-এর সদস্য হিসেবে আমি যে দক্ষিণা পাই, সে আমি তো নিজের আরাম কিংবা সুখ-সুবিধার জন্য ব্যয় করি না। তুমি যে দিব্যি ট্রামে চেপে এদিক-ওদিক যেতে-আসতে পার এতে আমায় দস্তুরমতো হিংসে হয়। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, আমার পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। আমার মতো তোমার নামও যখন বহুল প্রচারের জন্য সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, দেখবে ট্রাম-এ চেপে যাতায়াত করাটা কেবল যে শক্ত তাই নয়—একপ্রকার

অসম্ভব। জন-নেতারা সবসময় যে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য সব-কিছু ক'রে থাকেন এ ধারণা একেবারে ঠিক নয়। তোমার মতো আমারও সাদাসিধে জীবনযাপন করাটা খুবই ভালো লাগে। আমি যতটা সম্ভব বিলাসিতা বর্জন ক'রে চলবার চেষ্টা করি, কিন্তু আমার মতো লোকের পক্ষে কতকগুলো খরচপত্র না-করলেই নয়।"

এইভাবে আমার একটি অনুযোগের তো সন্তোষজনকভাবে তিনি কাটান দিয়ে দিলেন, কিন্তু আমার আরেকটি নালিশের তিনি সেরকম কোনো সুরাহা করতে পারেননি। আমি গোখলেকে বললাম : "কিন্তু পায়ে হেঁটে আপনি তো একটু বেড়িয়ে এলেও পারেন। আপনার যে অসুখবিসুখ লেগেই থাকে তাতে আর আশ্চর্য কী? দশের কাজ করেন ব'লে কি শরীরটাকে একটু নড়াতে-চড়াতেও বাধে?"

তিনি জবাব দিলেন, "হেঁটে যে বেড়াতে বেরুব, তার ফুরসৎ কোথায় বলো?"

গোখলের প্রতি আমার এমন গভীর শ্রদ্ধা ছিল যে তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে আমার মন সরত না। তাঁর এ জবাবে আমি খুব খুশি হতে পারিনি, তবু আমি চুপ ক'রে যাওয়াই সমীচীন মনে করলাম। আজকাল যেমন তখনকার দিনেও তেমনি আমার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে যত কাজই থাকুক-না কেন, প্রত্যেক মানুষের উচিত শরীরচর্চার জন্য খানিকটা সময় বরাদ্দ রাখা। শরীরের পুষ্টির জন্য মানুষ যদি নিয়মিত খাওয়াদাওয়া করতে পারে, তাহলে শরীর-স্বাস্থ্য ভালো রাখবার জন্যই-বা কেন মানুষ কিছুটা সময় দিতে পারবে না? আমি সবিনয়ে নিবেদন করতে পারি যে নিয়মিত অঙ্গ-চালনার ফলে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় না, বরঞ্চ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৮. গোখলের সঙ্গে একমাস : ২

গোখলের অতিথি হয়ে যখন ছিলাম ঘরে ব'সে আমি দিন কাটাতাম না। দক্ষিণ আফ্রিকায় খ্রিষ্টান বন্ধুদের বলেছিলাম, দেশে গিয়ে ভারতীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে তাদের অবস্থা বিষয়ে সব কথা জানবার চেষ্টা করব। বন্ধু কালীচরণ ব্যানার্জির সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, তাতে তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছিল। কংগ্রেস-এর কাজে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। বেশিরভাগ ভারতীয় খ্রিষ্টান কংগ্রেস থেকে দূরে-দরে থাকতেন। হিন্দু-মুসলমানের সংস্রব এড়িয়ে চলতেন। সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে আমার মনে একটা সংশয়ের ভাব ছিল যা না-কি কালীচরণবাবুর সম্বন্ধে ছিল না। তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছার কথা গোখলকে বলায়, তিনি বললেন, "কালীচরণবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে তোমার কী লাভ? তিনি মানুষ খুবই ভালো, তবে তিনি যে তোমার সব প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা ক'রে দিতে পারবেন, তা আমার মনে হয় না। তাঁকে তো আমি ভালো ক'রেই জানি। তবে হ্যাঁ, দেখা করার ইচ্ছা যদি থাকে তো তাঁর কাছে অবশ্যই যেতে পারো।"

আমি দেখা করতে চাইতেই কালীচরণবাবু সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। তাঁর বাড়ি

গিয়ে দেখি তাঁর স্ত্রী তখন মৃত্যুশয্যায়। কংগ্রেস অধিবেশনের সময় তিনি কোট-পাৎলুন প'রে এসেছিলেন। বাড়িতে তাঁকে বাঙালি-ধরনে ধুতি-কামিজ পরা দেখে বেশ খুশি হয়েছিলাম। যদিও আমি নিজে তখন পার্সি-ধরনে গলাবন্ধ কোট ও পাৎলুন ছাড়া কিছু পরতাম না, তাঁর সেই সাদাসিধে পোশাক দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। অযথা গৌরচন্দ্রিকা না-ক'রে, আমি সোজসুজি তাঁকে খ্রিষ্টীয় ধর্ম বিষয়ে আমার কতকগুলি সমস্যার কথা বললাম। উত্তরে তিনিই একটি প্রশ্ন তুললেন :

"খ্রিষ্টীয় ধর্মে বলে, মানুষ জগতে আসে সেই এক আদি ও পুরতন পাপের ফলে। সে কথা আপনি মানেন তো?"

"হ্যাঁ। মানি বৈ-কি।"

এই আদি পাপ থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি পেতে হয়, হিন্দুধর্মে তার কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু খ্রিষ্টীয় ধর্মে তার ব্যবস্থা আছে। পাপের পরিণাম হ'ল মৃত্যু এবং সেই শেষ পরিণাম থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হ'ল যীশুর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা।"

আমি *ভগবদগীতা*-য় ভক্তিমার্গের যে প্রসঙ্গ আছে, সেই কথা তাঁকে বললাম। কিন্তু তাতে কোনো ফল হ'ল না। আমার প্রতি তিনি যে সৌজন্য দেখিয়েছেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চ'লে এলাম। আমার প্রশ্নের সদুত্তর তাঁর কাছ থেকে না-পেলেও, এই সাক্ষাৎকারের ফলে আমি লাভবান্ হয়েছিলাম।

এই সময়টাতে আমি কলকাতার রাস্তাঘাটে অলিতে-গলিতে কত যে ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন। বেশিরভাগ জায়গাতেই আমি যেতাম পায়ে হেঁটে। এইসময়েই আমি দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে সহাযতা লাভের জন্য বিচারপতি মিত্র ও স্যর গুরুদাস ব্যানার্জির সঙ্গেও দেখা করি। রাজা প্যারীমোহন মুখার্জির সঙ্গে এবারই আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়।

কালীচরণ ব্যানার্জি আমায় কালিঘাটের কালীমন্দিরের কথা বলেছিলেন। ইতিপূর্বে কোনো-কোনো বইয়েও এই মন্দিরের বিষয় পড়েছিলাম। তাই ওই মন্দির দেখায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিচারপতি মিত্র কালিঘাট অঞ্চলেই থাকতেন। যেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করি, সেদিন কালীমন্দিরেও গিয়েছিলাম। রাস্তায় চলতে-চলতে দেখলাম সারি-সারি বলির পাঁঠা চলেছে হাঁড়িকাঠে গলা দেবার জন্য। মন্দিরে ঢোকবার গলির দু-পাশে ভিক্ষুকের দল কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাধুবাবাজীও কিছু ছিলেন। তখনকার দিনেও খেটে খেতে পারে এরকম শক্তসমর্থ ভিখারীদের আমি ভিক্ষা দিতাম না। তাহলে কী হয়, একদল ভিখারি নাছোড়বান্দার মতো আমার পিছু-পিছু ঘুরছিল। একজন বাবাজী ছিল রক্-এর ওপর ব'সে। আমায় থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আরে বেটা, যাচ্ছিস কোথায়?"

আমি জবাব দিলে বাবাজী আমার সঙ্গীকে ও আমাকে সেই রক্-এ একটু বসতে বললেন। আমরাও বসলাম।

আমি বাবাজীকে জিজ্ঞেস করলাম : "এই-যে মন্দিরে ছাগলবলি দেওয়া হয়, এটাকে কি আপনি ধর্ম ব'লে মনে করেন?"

"জীবহত্যা যে ধর্ম, কে বলবে তেমন কথা?"

"তাহলে লোক ডেকে, বুঝিয়ে, জীবহত্যার বিরুদ্ধে বলেন না কেন?"

"আমার সে কাজ নয়। আমাদের কাজ ভগবানকে পুজো করা।"

"পুজো করার উপযুক্ত আর-কোনো জায়গা খুঁজে পেলেন না—এই এক কালিঘাট ছাড়া?"

"দেখো বাপু, আমাদের কাছে সব জায়গাই তীর্থক্ষেত্র। এই-যে মানুষগুলো দেখছ—আসলে এরাই ভেড়ার পাল। সামনে যেটা যাচ্ছে তার পিছু-পিছু সব ছুটছে। ওদের ব্যাপারে আমরা সাধুসন্ন্যেসিরা নাক গলাতে যাব কেন?"

আমরা বৃথা বাক্যব্যয় না-ক'রে, মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি রক্তের নদী ব'য়ে চলেছে। সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। সেই বীভৎস ব্যাপার আমি আজও ভুলতে পারিনি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন বাঙালি বন্ধুর এক মজলিসে আমার খেতে যাবার নেমন্তন্ন ছিল। সেখানে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পূজার নামে এই নৃশংস জীবহত্যার বিষয়ে দু-চারটে কথাবার্তা হয়। ভদ্রলোক আমায় বলেছিলেন, "বলির পাঁঠাকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। ঢাকঢোল হট্টগোলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে বেদনার অনুভূতিটাও ম'রে যায়।"

কথাটা আমি মেনে নিতে পারলাম না। ভদ্রলোককে বললাম, "পাঁঠারা যদি কথা বলতে পারত, তাহলে নিশ্চয় অন্যরকম কথা বলত। ধর্মের নামে এইরকম নিষ্ঠুর জীবহিংসার প্রথা অগৌণে বন্ধ করা উচিত। এ বিষয়ে বুদ্ধের বাণী আমার মনে পড়ল। কিন্তু এটাও আমি বুঝতে পারলাম, এ কথা আমার পক্ষে একরকম জীবহত্যা। নিবারণ করা সাধ্যের অতীত।

তখন জীব-বলির বিষয়ে আমার যে মতামত ছিল, আজও তার অদলবদল হয়নি। আমার কাছে সকল প্রাণীর প্রাণের মূল্য সমান—তা সে বলির পাঁঠাই হোক্ বা মানুষই হোক্। মানুষের দেহের রক্ষণ-পোষণের জন্য পাঁঠার প্রাণ নিতে আমি প্রস্তুত নই। আমার ধারণা, যে জীব যত বেশি অসহায় মানুষের নিষ্ঠুরতা থেকে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব মানুষের তত বেশি। কিন্তু যে লোক জীবের সেবা করতে শেখেনি, সে কী ক'রে জীবকে রক্ষা করবে? এজন্য যতখানি ত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন, ততটা যতদিন-না অর্জন করতে পারব, ততদিন অধর্মের এই বলি থেকে বলির পশুকে উদ্ধার করতে পারব ব'লে মনে হয় না। স্বার্থবুদ্ধিকে বলি দিয়ে কবে যে আমি নিজেকে শুদ্ধ ও পবিত্র ক'রে তুলতে পারব, সেই চিন্তায় ব্যাকুল হয়েই হয়তো আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। আমার অন্তরের গভীর থেকে যে প্রার্থনা নিরন্তর উদ্‌গত হয় তা হ'ল এই : আমাদের এই পৃথিবীতে এমন-কোনো মহাপুরুষ বা মহিয়সী নারী জন্মগ্রহণ করুন, যিনি দৈবী করুণার জ্যোতিতে এই মহাপাতক ধ্বংস ক'রে আমাদের উদ্ধার করবেন, নির্দোষ প্রাণীদের রক্ষা করবেন ও সর্বপ্রকার কলুষ থেকে দেবতার মন্দিরকে মুক্ত করবেন।

ভাবপ্রধান বাঙালি, যাদের এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত ত্যাগ, তারা যে কী ক'রে এই প্রাণীহত্যার অনাচার সহ্য করে, সে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না।

১৯. গোখলের সঙ্গে একমাস : ৩

ধর্মের নাম ক'রে মা কালীর সমানে এই পশুবলির তাণ্ডব দেখবার পর বাঙালিদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানবার জন্য আমার অধিকতর আগ্রহ হয়। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে আমি অনেক-কিছু পড়েছি ও শুনেওছি। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জীবনকথা আমি কিছু-কিছু জানতাম। কয়েকটি সভায় তাঁর বক্তৃতাও আমি শুনেছিলাম। তাঁর লেখা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী সংগ্রহ ক'র আমি গভীর আগ্রহে প'ড়ে ফেলি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোথায় ও কীসে তফাৎ সে আমি বুঝতে পেরেছিলাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। প্রফেসর কথাওয়াতে-র সঙ্গে আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্দর্শনে গিয়েছিলাম। সেসময় তিনি কারও সঙ্গে দেখা করতেন না ব'লে তাঁর দর্শনলাভ হয়নি। কিন্তু তাঁর বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের যে উৎসব হয়, সেই উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছিলাম। সেই উপলক্ষে কয়েকটি সুন্দর বাঙলা গান শোনবার সৌভাগ্য আমায় ঘটেছিল। তখন থেকে বাঙলা গানের আমি অনুরাগী।

ব্রাহ্মসমাজের বিষয় এতখানি পরিচয়লাভের পর মনে হ'ল, স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন লাভ না-ক'রে আমি যদি চ'লে যাই, তাহলে মনে একটি অতৃপ্তি থেকে যাবে। মহা-উৎসাহে আমি প্রায় সমস্ত রাস্তাটা পায়ে হেঁটে বেলুড় মঠ গিয়েছিলাম। মঠের নির্জন নিরিবিলি পরিবেশ আমার খুব ভালো লেগেছিল। সেখানে পৌঁছে শুনলাম, স্বামিজী অসুস্থ ও শয্যাগত হয়ে তাঁর কলকাতার বাড়িতে আছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো সম্ভাবনা নেই। খবরটা শুনে ভারি দুঃখিত ও হতাশ হয়ে ফিরে এলাম।

অগত্যা সিস্টার নিবেদিতার ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে, চৌরঙ্গীর এক বিরাট বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। অতখানি ঐশ্বর্যের সমারোহের মধ্যে তাঁকে দেখে আমি একটু হতচকিত হয়ে যাই। পরস্পরের মধ্যে তেমন-কোনো যোগসূত্র না-থাকায়, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও তেমন যেন জমল না। গোখলেকে এ কথা বলায় তিনি বললেন, এতে তিনি আশ্চর্য হননি, কারণ নিবেদিতার মতো উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যক্তির সঙ্গে আমার স্বভাবের অনৈক্য তাঁর কাছে অতি স্পষ্ট।

সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে আরেকবার আমার দেখা হয়েছিল পেস্তনজী পাদ্‌শাহের বাড়িতে। আমি সে বাড়িতে যখন গিয়ে পৌঁছলাম ঠিক সেইসময় তিনি পেস্তনজীর বর্ষিয়সী মায়ের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছেন। সুতরাং দু-জনের মধ্যে আমায় দোভাষীর কাজ করতে হয়েছিল। আমাদের দু-জনের মধ্যে মতামতের মিল ছিল না, কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ ক'রে আমার ভালো লেগেছিল, সে হ'ল হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। অন্তরের কানায়-কানায় ভরা এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রায় যেন উপ্‌চে পড়ত। তাঁর লেখা বই পড়েছিলাম আমি পরে।

কলকাতায় আমার দিন কাটত প্রধানত দু-রকমের কাজে। প্রথম দফার কাজ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কাজের সম্পর্কে কলকাতার নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। দ্বিতীয়

দফায় আমি ঘুরে-ঘুরে কলকাতার ধর্মীয় ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি দেখে বেড়াতাম ও তাদের কাজকর্ম বিষয়ে ওয়াকিফহাল হবার চেষ্টা করতাম। ডক্টর মল্লিকের সভাপতিত্বে একদিন আমি এক সভায় বুয়র যুদ্ধে ভারতীয় এম্বুলেন্স দলের কার্যকলাপ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। *ইংলিশম্যান* কাগজের সঙ্গে পূর্বপরিচয় থাকায়, এ ব্যাপারে আমি যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছিলাম। এইসময় মিস্টার সনডার্স অসুস্থ ছিলেন। তৎসত্ত্বেও ১৮৯৬ সনে আমায় তিনি যেরকম সাহায্য করেছিলেন, এবারও তাই করলেন। খবরকাগজে আমার বক্তৃতার রিপোর্ট প'ড়ে গোখলে খুব খুশি হয়েছিলেন। তাঁর খুশি হবার আরেকটি কারণ ছিল এই যে ডক্টর রায় আমার বক্তৃতার খুব সুখ্যাতি করেছিলেন।

গোখলের বাসায় আশ্রয়লাভের ফলে কলকাতায় আমায় কাজের ভারি সুবিধা হয়েছিল। উপরন্তু এর ফলে আমি কলকাতায় কতিপয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংস্পর্শে আসি ও এইভাবে বাঙলাদেশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কের সূত্রপাত হতে থাকে।

এই স্মরণীয় একটি মাসের বহুতর ঘটনার কথা আমায় বাদ দিতে হচ্ছে। এইসময়ে আমি অল্পকিছুদিনের জন্য ব্রহ্মদেশ ঘুরে আসি। সে দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু ফুঙ্গীদের আলস্যবিলাসে দিনযাপন করা দেখে আমার খারাপ লেগেছিল। রেঙ্গুনের সোনার চুড়োওয়ালা প্যাগোডা, হাজার-হাজার ছোটো-ছোটো মোমবাতির আলো দেখেও আমার ভালো লাগেনি। প্যাগোডার যেখানে গর্ভগৃহ, সেখানে ইঁদুরদের স্বচ্ছন্দ বিহার দেখে স্বামী দয়ানন্দের মোরভীর অভিজ্ঞতার কথা মনে প'ড়ে যায়। চলাফেরায় কাজেকর্মে ব্রহ্মদেশের মেয়েদের আত্মনির্ভরতার শক্তি দেখে যতটা মুগ্ধ হয়েছিলাম, ঠিক ততখানি খারাপ লেগেছিল বর্মী পুরুষদের নিছক কুঁড়েমি দেখে। ওই কয়েকটি দিনের অবস্থানেই বুঝতে পেরেছিলাম বোম্বাই যেমন ভারতবর্ষ নয়, রেঙ্গুনও তেমনি ব্রহ্মদেশ নয়। আর বুঝেছিলাম, ভারতে আমরা যেমন ইংরেজ-বণিকের দালালি করি, ব্রহ্মে তেমনি আমরা ইংরেজ-বণিকের ভাগীদার হয়ে কিছু-সংখ্যক বর্মীকে আমাদের দালাল বানিয়ে রেখেছি।

ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে এসে আমি গোখলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তাঁকে ছেড়ে চ'লে যাওয়া যেন আমার পক্ষে একপ্রকার বিচ্ছেদ-বেদনা। কিন্তু বাঙলাদেশের (অর্থাৎ কলকাতায়) আমার যা করণীয় ছিল তা একপ্রকার শেষ হয়ে যাবার ফলে, আরো-কিছুকাল ওখানে প'ড়ে থাকার কোনো মানে হ'ত না।

ব্যারিস্টরির কাজে কায়েম হয়ে বসবার আগে আমার মনে হয়েছিল যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হয়ে আমার একবার সমস্ত দেশটা পরিক্রমা করা দরকার। তাহলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কীরকম দুর্ভোগ ভুগতে হয়, আমি বুঝতে পারব। গোখলকে আমি আমার এই সঙ্কল্পের কথা বলায় প্রথমে তো তিনি হেসেই উড়িয়ে দেন। কিন্তু আমি কী-কী দেখতে চাই বা না-চাই, সেইসব কথা খুলে বলার পর তিনি বেশ খুশি হয়েই আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। আমি ঠিক ক'রে রেখেছিলাম যে সর্বপ্রথম বারাণসী যাব এবং সেখানে মিসেস্ বেসান্ত-এর সঙ্গে দেখা করব। তিনি তখন কাশীতে অসুস্থ ও শয্যাগত।

তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করার জন্য আমায় কিছু নতুন সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র জোগাড়

করতে হ'ল। গোখলে আমায় একটি পিতলের টিফিনবাক্স কিনে, সেটি পুরী ও লাড্ডুতে ভ'রে দিলেন। বারো আনা দামে আমি একটি ক্যাম্বিস ব্যাগ কিনে নিলাম। পোরবন্দরের কাছাকাছি ছায়া অঞ্চল থেকে কেনা একটা মোটা পশমের থান আমার কাছে ছিল। তা থেকে একটি লম্বা কোট তৈরি হ'ল। ঠিক করা হ'ল যে ক্যাম্বিস ব্যাগটার মধ্যে থাকবে এই লম্বা কোট, একটা ধুতি, একটা তোয়ালে ও একটা সার্ট। গায়ে জড়াবার জন্য একটা কম্বল নিলাম, আর একটা পানীয় জলের কুঁজো। এইরকম সরঞ্জাম সম্বল ক'রে আমি তো যাত্রা শুরু করলাম। গোখলে ও ডক্টর রায় স্টেশনে এলেন আমায় গাড়িতে তুলে দিতে। তাঁদের দু-জনকেই আমি বারবার বারণ করেছিলাম স্টেশন অবধি আসার কষ্ট না-করতে। কিন্তু তাঁরা নাছোড়বান্দা ; সাফাই দিতে গিয়ে গোখলে বললেন, "তুমি প্রথম শ্রেণীতে গেলে, যাবার কোনো দরকারই হ'ত না। কিন্তু এখন না-গিয়ে উপায় নেই।"

প্ল্যাটফর্ম্-এ ঢুকতে গোখলকে কেউ আটকায়নি। তাঁর মাথায় ছিল রেশমের পাগড়ি, পরনে কোট ও ধুতি। ডক্টর রায় এসেছিলেন তাঁর বাঙালি পোশাকে। গেট-এ টিকিট কালেক্টর, ডক্টর রায়কে আটকায়, শেষে গোখলে যখন 'ইনি আমার বন্ধু' ব'লে পরিচয় দিলেন, তখন তাঁকে ভিতরে আসতে দিল।

এইভাবে তাঁদের দু-জনের শুভেচ্ছা নিয়ে আমি আমার যাত্রা শুরু করলাম।

২০. বারাণসী

আমার রেল টিকিট ছিল কলকাতা থেকে রাজকোট। পথে বারাণসী, আগ্রা, জয়পুর ও পালনপুরে হয়ে যাব ব'লে ঠিক করেছিলাম। রাস্তায় থেমে-থেমে এর চেয়ে বেশি জায়গা দেখার সময় ছিল না। এক পালনপুর ছাড়া আর-সব জায়গাতেই অন্য সাধারণ যাত্রীদের মতো, হয় ধর্মশালায় নয়তো পাণ্ডাদের আশ্রয়ে একটি ক'রে রাত কাটিয়েছি। যদ্দূর মনে পড়ে, এই যাত্রায় সর্বসমেত (মায় রেল ভাড়াসুদ্ধ) ৩১্ টাকার বেশি খরচ করিনি।

তৃতীয় শ্রেণীতে এইভাবে ভ্রমণ করতে গিয়ে আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেল ট্রেন্-এ না-চ'ড়ে সাধারণ প্যাসেঞ্জার ট্রেন্-ই চড়তাম, কারণ আমি জানতাম, মেল ট্রেন্-এ ভিড় বেশি, ভাড়াও বেশি।

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি আগেকার দিনে যেমন নোংরা ছিল এবং সে গাড়ির পায়খানার যেমন দুরবস্থা ছিল, আজকের দিনেও প্রায় সেইরকমই আছে। সামান্য কিছু-কিছু উন্নতি হয়ে থাকলেও, প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর রেল-ভাড়ার তুলনায় এই দুই শ্রেণীতে সুখ-সুবিধার তারতম্য অনেক-অনেক বেশি। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদল যেন মানুষ নয়, ভেড়ার পাল, আর তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি তো গাড়ি নয়—ভেড়ার খাটাল। বিলেতে থাকতে আমি তৃতীয় শ্রেণীতেই যাতায়াত করতাম। কেবল একবার, দুই শ্রেণীতে কীরকম তফাৎ দেখবার জন্য, প্রথম শ্রেণীতে চড়েছিলাম। সেখানে এ দেশের মতো আকাশ-পাতাল ব্যবধান দেখিনি। দক্ষিণ আফ্রিকায়

তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রী নিগ্রো—তৎসত্ত্বেও সে দেশে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধা এ দেশের তুলনায় বেশি। দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো-কোনো অঞ্চলে তৃতীয় শ্রেণীতে শোবার ব্যবস্থা ও বসার জন্য গদি-আঁটা চেয়ারের ব্যবস্থাও থাকে। ভিড় যাতে না-হয়, সেজন্য যতটা জায়গা আছে তার বেশি টিকিট বিক্রি করা হয় না। এখানে দেখেছি, কামরায় যত লোক আঁটে তার অনেক বেশি লোককে টিকিট দেওয়া হয়।

রেল কর্তৃপক্ষ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখসুবিধা-বিধানে উদাসীন। উপরন্তু আছে যাত্রীদের নোংরা অভ্যাস ও সহযাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে বিবেচনার অভাব। এই দুটি কারণে যেসব যাত্রীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অভ্যাস, তাঁদের পক্ষে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করা শাস্তি-বিশেষ। কামরার মেঝেতে জঞ্জাল ছড়ানো, যত্রতত্র যখন-তখন ধূমপান, পান-দোক্তা চিবানো, কামরাময় থুতু-পিক্ ফেলা, হট্টগোল, চীৎকার ও অকথ্য সব গালাগাল দেওয়া, সহযাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না-করা হ'ল এইসব বদ্ অভ্যাসের অন্যতম। এই ১৯০২ সনে আমি একদফা লম্বা পাড়িতে রেলভ্রমণ করেছি। আবার ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত তো একপ্রকার নিরবচ্ছিন্নভাবে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হয়ে সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছি। এই দু-দুইবারের অভিজ্ঞতায় বেশি-কিছু তারতম্য লক্ষ করিনি।

এই নিদারুণ দুর্দশার একটিমাত্র প্রতিকার আছে ব'লে আমার মনে হয়। শিক্ষিত লোকেরা যদি নিয়ম ক'রে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন ও সহযাত্রীদের বদ্ অভ্যাস শোধরাবার চেষ্টা করেন, গাফিলতি দেখলেই রেল কর্তৃপক্ষকে যদি নালিশে-অভিযোগে অতিষ্ঠ করতে পারেন, নিছক নিজের সুখসুবিধার জন্য যদি ঘুষ বা অন্যায়ের আশ্রয় না-নেন, যে কেউ বে-আইনী কাজ করলে যদি তা কিছুতেই বরদাস্ত না-করেন—তাহলে এই দুরবস্থার অনেকটা প্রতিকার হতে পারে ব'লে আমার বিশ্বাস।

১৯১৮-১৯ সনে আমার সেই কঠিন রোগভোগের পর, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত আমায় একপ্রকার বর্জন করতে হয়েছে। আমার এই অক্ষমতার জন্য আমি নিরন্তর দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করি। বিশেষত এই কারণে যে, সেইসময়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধা লাঘব করার আন্দোলন অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিল। রেল ও স্টীমারে গরীব যাত্রীদের নানারকম কষ্ট ও অসুবিধা, তাদের নিজেদের অভ্যাসদোষে সেইসব অসুবিধার বৃদ্ধি, বিদেশী বণিকদের পণ্যবহনে অন্যায়ভাবে সুযোগ-সুবিধা ক'রে দেওয়া সরকারের পক্ষপাতিত্ব—এইরকম অন্য-অন্যসব গুরুতর সমস্যা নিয়ে তখন দস্তুরমতো মাথা ঘামাবার দরকার ছিল। দুয়েকজন উৎসাহী কর্মী যদি দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে এ কাজে তাঁদের সমস্ত সময় দিতে পারতেন, খুবই ভালো হ'ত।

আপাতত তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুর্দশার প্রসঙ্গে ছেদ টেনে, বারাণসীতে কী-কী ঘটেছিল সেই কথায় আসা যাক্। সকালবেলা বারাণসী পৌঁছলাম। ঠিক করেছিলাম, কোনো পাণ্ডার বাড়ি উঠব। ট্রেন থেকে মাটিতে পা দেওয়ামাত্র একদল ব্রাহ্মণ আমায় ঘিরে ধরল। তাঁদের মধ্যে থেকে যাকে অন্যদের তুলনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সজ্জন ব'লে মনে হ'ল তাঁকেই আমার পাণ্ডা ব'লে বেছে নিলাম। পরে বোঝা গেল, আমি ঠিক লোকটিকেই বেছেছিলাম।

পাণ্ডার বাড়ির উঠোনে একটি গোরু বাঁধা ছিল। দোতলার একটি ঘরে আমায় থাকতে দেওয়া হ'ল। গোঁড়া হিন্দুদের মতো ঠিক করেছিলাম, যথারীতি গঙ্গাস্নান না-ক'রে আমি আহারাদি করব না। পাণ্ডা তার আয়োজন করতে লেগে গেলেন। গোড়াতেই তাঁকে ব'লে রেখেছিলাম পাঁচ সিকের বেশি দক্ষিণা আমি কিছুতেই দিতে পারব না এবং সেই কথা মনে রেখে তিনি যেন ব্যবস্থাদি করেন।

বিনা-ওজরে পাণ্ডা আমার কথা মেনে নিয়ে বললেন, "ধনী হোন্, গরীব হোন্, সকল যাত্রীর জন্য আমরা একইরকম আয়োজন ক'রে থাকি। দক্ষিণা যতটুকু পাই তা নির্ভর করে যাত্রীর ইচ্ছা ও সাধ্যের ওপর। আমার ক্রিয়াকর্মের বেলা পাণ্ডা কোনো-কিছু বাদ দিয়েছিলেন ব'লে আমার মনে হয়নি। প্রায় দুপুর বারোটায় পুজো শেষ হয়ে গেলে আমি কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে দর্শনের জন্য গেলাম। সেখানে যা দেখি তাতে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। ১৮৯১ সনে আমি যখন বোম্বাই শহরে ব্যারিস্টরি করি, সেসময় প্রার্থনা-সমাজ ভবনে 'কাশীতে তীর্থযাত্রা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা শুনেছিলাম। কিছুটা নিরাশ হয়তো হতে হবে, এইভাবে মনকে তৈরি ক'রেই এসেছিলাম। তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে এতটা যে হতাশ হতে হবে, সে আমি ভাবতেও পারিনি।

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে যাবার গলি যেমন সরু তেমনি পিছল। শান্তভাব বিন্দুমাত্র নেই। মাছির ভন্‌ভনানি ও দোকানপাটে বেপারীদের সঙ্গে যাত্রীদের বচসার কোলাহলে কান পাতা দায়। একেবারে অসহ্য!

ধ্যান-ধারণার উপযোগী একটি পরিবেশ দেখব ব'লে আশা ক'রে এসেছিলাম। যা দেখলাম তা ঠিক তার উল্‌টো। বুঝলাম, পরিবেশটুকু নিজের অন্তরের মধ্যেই প্রস্তুত ক'রে নিতে হবে। ভক্তিমতী কতিপয় ভগ্নীকে দেখলাম, তাঁরা যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে আছেন, তাঁদের চারপাশে কী ঘটছে না-ঘটছে—সেদিকে তাঁদের ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। কিন্তু এ নিয়ে মন্দিরেব পুরোহিত-পাণ্ডাদের করার কিছু নেই। অন্তরে-বাইরে একটি শুচি-স্নিগ্ধ শান্ত-নির্মল পরিবেশ রচনা করা, এবং সেই পবিবেশ রক্ষা করাই হ'ল মন্দির পরিচালকদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। তার বদলে সেখানে দেখলাম, একদল ধূর্ত দোকানদার মেঠাইমণ্ডা ও হালফ্যাশনের খেলনার পসরা সাজিয়ে তীর্থযাত্রীদের প্রতারণা করছে।

মন্দিরের দরজায় পৌঁছতেই চোখে পড়ল পচা ফুলের স্তূপ—দুর্গন্ধে বাতাস ভারি। মন্দিরের মেঝে এককালে সুন্দর মার্বেল পাথরে মোড়া ছিল। সৌন্দর্যরুচিবিহীন কোনো ভক্ত সেই মার্বেল পাথর খুঁড়ে ফেলে, সেই মেঝে টাকা দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন। এখন টাকায় মোড়া মেঝে ক্রমাগত ময়লা টেনে মলিন আকার ধারণ করেছে।

জ্ঞানপাপীর কাছে গেলে ভগবানকে খুঁজে পাওয়া যায় শুনেছিলাম। কোথায় ভগবান তাঁকে তো খুঁজে পেলাম না! বরঞ্চ বিরক্ত হয়ে লক্ষ করলাম, জ্ঞানপাপীর আশেপাশেও আবর্জনা। দক্ষিণা দিতে প্রবৃত্তি হ'ল না ব'লে একটি পাই দিলাম। পূজারী পাণ্ডা আমার কাণ্ড দেখে তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠলেন। পাইটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমায় গালমন্দ ক'রে বললেন, "দেবস্থানের অপমান? এজন্য তোর কপালে নির্ঘাত নরকে গমন।"

এই অভিশাপে বিন্দুমাত্র বিচলিত না-হয়ে আমি বললাম, "আমার কপালে যে কী আছে না-আছে, সে আমি জানি না। কিন্তু মহারাজ, আপনার মতো লোকের মুখে এরকম গালমন্দ শোভা পায় না। পাই নিতে হয় নিন, তা না-হ'লে পাইটুকুও হারাবেন।"

"নিকলো, বাহর যাও! তোর ওই পাই-পয়সায় আমার কাজ নেই।" এই ব'লে সেই পুরোহিত আবার কিছু গালমন্দ করলেন।

আমি পাই-পয়সাটা তুলে নিয়ে যেতে-যেতে নিজের মনেই বললাম, "মহারাজ যে পাই-পয়সাটা হারালেন, সেটা আমার পকেটেই ফিরে গেল।" কিন্তু মহারাজ তেমন পাত্রই নন যে পাই-পয়সাটুকুও খোয়াবেন। পিছু ডেকে আমায় ফেরালেন আর বললেন, "আচ্ছা, তবে পাই-পয়সাটাই চড়া। তোর মতো আমি করতে চাই না। যদি তোর পাই-পয়সা না-নিই তোর অমঙ্গল হবে।"

কোনো কথা না-ব'লে আমি পাইটাই চড়ালাম, আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চ'লে গেলাম।

তারপর দু-বার আমি কাশী বিশ্বনাথ গেছি। ততদিনে আমার নামের সঙ্গে 'মহাত্মা' বিশেষণ যুক্ত হবার ফলে, আমি বিব্রত ও বাধাগ্রস্ত। এইমাত্র আমার যে অভিজ্ঞতার কথা বললাম, সেরকমটা আবার যে ঘটবে তার আর জো ছিল না। আমায় দর্শন করার জন্য কাতারে-কাতারে যারা এল, তারা কি আর আমায় কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করতে দেয়? 'মহাত্মা' হওয়ার দুঃখ-দুর্গতি মহাত্মারাই জানে। তবে সেই দু-বারও লক্ষ করেছি বারাণসীতে যেমন জঞ্জাল তেমনি হট্টগোল।

ভগবানের অনন্ত করুণা সম্বন্ধে কারও যদি সংশয় থাকে, তাকে এইসব তীর্থক্ষেত্র ঘুরে-ঘুরে দেখতে বলি। তাঁর নামে কত যে কপটতা, ভণ্ডামি ও অধর্ম পার পেয়ে যায়, তা সে মহাযোগীই জানেন ও মুখ বুজে সহ্যও করেন। কারণ তিনিই তো বলেছেন :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

যার যেমন কর্ম, তার তেমন ফল। কর্মফলের অমোঘবিধান এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। তবে ভগবান মিছে কেন কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে দাঁড়াতে যাবেন? বিধাতা বিধান রচনা করেছেন, সব-কিছু সেই বিধানের হাতে সঁপে দিয়ে তিনি স্বয়ং যেন ছুটি নিয়ে দূরে-দূরে রয়েছেন।

মন্দির থেকে আমি মিসেস্ বেশান্ত-সন্দর্শনে যাই। জানতাম, তিনি সবে অসুখে ভুগে উঠেছেন। আমার নাম লিখে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে এলেন। আমি তো নেহাৎই তাঁর সঙ্গে দর্শনক্রমে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলাম। তাই আমি তাঁকে বললাম, "আমি জানি আপনার শরীর খারাপ। আমি এসেছিলাম কেবল আপনাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। অসুস্থ শরীরেও আপনি যে আমায় দেখা দিয়েছেন, সেজন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আর আপনাকে ধ'রে রাখব না।"

এই ব'লে আমি তাঁর কছে থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলাম।

২১. বোম্বাইয়ের বাসিন্দা?

গোখলের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, আমি যেন বোম্বাইয়ে বসবাস করি ও ব্যারিস্টরি পেশা অবলম্বন ক'রে অবসরসময়ে দেশের কাজে তাঁর সহযোগিতা করি। তখনকার দিনে দেশের কাজ মানে এমন এক প্রতিষ্ঠানের কাজ যা গ'ড়ে তোলায় গোখলের অনেকখানি হাত ছিল, অর্থাৎ কংগ্রেসের কাজ। আর তখন এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কাজ ছিল এর নিয়মতন্ত্র সুবিহিতভাবে পরিচালনা করা।

গোখলের পরামর্শ আমার ভালোই লেগেছিল—যদিও ব্যারিস্টরিতে সফল হব কি-না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় ছিল। ইতিপূর্বে যে কৃতকার্য হতে পারিনি সে কথা মনে ক'রে খুবই অস্বস্তি বোধ করতাম। আর তোষামোদ ক'রে ব্রীফ্ আদায় করা আমার কাছে তখনো বিষবৎ পরিত্যাজ্য ব'লে মনে হ'ত।

আমি তাই ঠিক করলাম, প্রথম-প্রথম রাজকোটে ব'সেই প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করব। সেখানে আমার পুরাতন হিতৈষীদের মধ্যে ছিলেন কেবলরাম মাভজী দাবে। আমার বিলেত যাবার মূলে ছিল এঁরই প্রেরণা। রাজকোটে বসার সঙ্গে-সঙ্গে ইনি আমার হাতে তিন-তিনটি কেস্ তুলে দিলেন। এর মধ্যে দুটি ছিল কাথিয়াওয়াড়ের পোলিটিক্যাল এজেন্ট-এর জুডিসিয়াল এসিস্টেন্ট-এর আদালতে আপিল, আর তৃতীয়টি ছিল জামনগর আদালতে একটি নতুন মামলা। এই শেষোক্ত মামলাটা ছিল গুরুতর। কেস্‌টা আমি ঠিকমতো চালাতে পারব কি-না বলায় কেবলরাম দাবে ব'লে উঠলেন : "হার-জিৎ নিয়ে তোমার মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই। তোমার যথাসাধ্য তুমি করবে। তারপর আমি তো রয়েইছি তোমার পেছনে।"

অপরপক্ষের উকিল ছিলেন শ্রীযুক্ত সমর্থ। কেস্ আমি বেশ ভালো ক'রেই তৈরি করেছিলাম। ভারতীয় আইনে আমার যথেষ্ট জ্ঞান না-থাকলেও সেদিনটা কেবলরাম দাবে আমায় বেশ শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় চ'লে যাবার আগে বন্ধুদের মুখে শুনতাম, এভিডেন্স আইন না-কি স্যর ফিরোজশা মেহ্‌তার নখাগ্রে, আর সেইটাই না-কি তাঁর সাফল্যের কারণ। কথাটা আমার মনে ছিল। তাই এবার সমুদ্রপথে থাকতে আমি ভারতীয় এভিডেন্স আইন টীকাভাষ্য-সমেত ভালো ক'রে প'ড়ে ফেলেছিলাম। উপরন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনজীবীর অভিজ্ঞতা তো ছিলই।

এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করায় কিছুটা আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে এল। আর সেই দুটি আপিলের মামলা যে জিতব সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না। জিতেওছিলাম। সব-কিছু দেখেশুনে মনে আশা হ'ল যে বোম্বাইয়ে গিয়ে বসলেও বিফল হব না।

কীরকম ঘটনাচক্রে বোম্বাই যাবার বিষয়ে আমি মনঃস্থির করেছিলাম সেই কথা বলবার আগে, অন্য লোকের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে ইংরেজ অফিসারদের উদাসীনতা ও এ দেশের জীবনযাত্রা বিষয়ে তাদের অসীম অজ্ঞতার যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তার সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব। জুডিসিয়াল এসিস্টান্টের আদালত ছিল ভ্রাম্যমান। আজ এখানে কাল সেখানে তিনি টুর ক'রে বেড়াতেন। যেখানে-যেখানে তাঁর ছাউনি পড়ত, তার পিছু-পিছু উকিল

ও মক্কেলদের ছুটতে হ'ত। সদর ছেড়ে বেরুতে হ'লেই উকিলেরা বেশি ফি দাবি করতেন, তাই মক্কেলদের খরচ হ'ত দ্বিগুণ। মক্কেলদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে জজসাহেবের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না।

আপিল মামলার শুনানী হবার কথা ছিল বেরাবল শহরে। সেসময় শহরে প্লেগের মড়ক। বেরাবলের জনসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার পাঁচশো। যদ্দুর মনে পড়ে দৈনিক তখন পঞ্চাশজন লোক রোগে আক্রান্ত হচ্ছিল। শহর তখন একপ্রকার জনশূন্য। শহর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত একটি জনমানবহীন ধর্মশালায় আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু মক্কেল বেচারারা কোথায় গিয়ে উঠবে? তাদের মধ্যে যারা ছিল গরীব, তাদের একমাত্র ভরসাস্থল ছিলেন স্বয়ং ভগবান।

রাজকোটে আমার এক উকিল বন্ধুরও কথা ছিল এই জুডিসিয়াল এসিস্টেন্ট-এর আদালতে হাজিরা দেবার। তিনি আমায় এক তারবার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ জানালেন যেন সাহেবের কাছে আবেদন পেশ ক'রে আমি বলি যে যেহেতু বেরাবলে প্লেগ্ চলছে সাহেব যেন অন্যত্র কোথাও তাঁর ছাউনি তুলে নিয়ে যান। দরখাস্ত পেয়ে সাহেব জিজ্ঞেস করলেন : "কেন, আপনি ভয় পাচ্ছেন না-কি?"

"আমি ভয় পেয়েছি কি না-পেয়েছি তা তো প্রশ্ন নয়। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি সামলাতে পারব। কিন্তু মক্কেলদের কী হবে?"

"প্লেগ্ তো সারা ভারত জুড়ে কায়েম হয়ে বসেছে। সুতরাং ভয় পেলে চলবে কেন? তাছাড়া বেরাবলের আবহাওয়া চমৎকার। আমি যেমন খোলামেলার মধ্যে ছাউনি ফেলেছি, এ দেশের লোকেদেরও শেখা উচিত কীভাবে এমন খোলামেলার মধ্যে বাস করা যায়।"

সাহেব তাঁর ছাউনি ফেলেছিলেন জনপদ থেকে অনেক দূরে, একেবারে সমুদ্রের ধারে। আর ছাউনি তো নয়, রাজপ্রাসাদ বিশেষ। সুতরাং সাহেবের এই খোলা হাওয়ার তত্ত্ব নিয়ে তর্ক করতে যাওয়া বৃথা। সাহেব তার সেরেস্তাদারকে ব'লে দিলেন : "মিস্টার গান্ধী যা বললেন, তা নোট ক'রে রাখুন। আর উকিল-মক্কেলদের খুব বেশি যদি অসুবিধা ঘটে, আমায় জানাতে ভুলবেন না।"

যা তাঁর কাছে ভালো ব'লে মনে হয়েছিল সাহেব তো তাই খোলাখুলিভাবে ব'লে দিলেন। কিন্তু হতভাগ্য ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্গতি-অসুবিধার কথা তিনি কেমন ক'রে বুঝবেন? ভারতীয়রা কী চায় না-চায়, তাদের অভ্যাস বা প্রবণতা, তাদের রীতি বা রেওয়াজই-বা কেমন—সাহেব কী ক'রে সেসব কথা জানবেন? মোহর নিয়ে যার কাজ-কারবার পাই-এর হিসাব সে হঠাৎ বুঝতে পারবেই-বা কেন? হাতির মনে শত সদিচ্ছা থাকলেও গোদা-গোদা পা ফেলে সে যখন চলে তখন কি ভাবতে পারে পিঁপড়েগুলো মরল কি বাঁচল? ইংরেজ তেমনি ভারতের দিক থেকে ভারতবাসীকে দেখতে-শুনতে-জানতে বুঝতে পারে না, এবং সেইজন্য তাদের উপযোগী আইনকানুন প্রণয়নেও অক্ষম।

থাক্, এবার মূল ঘটনাসূত্রে ফিরে যাওয়া যাক্। মামলাতে জয়লাভ করার পরও ভেবেছিলাম, রাজকোটে এখন কিছুকাল থেকে গেলেই হয়। ইতিমধ্যে একদিন কেবলরাম

দাবে এসে বললেন, "রাজকোটে ব'সে-ব'সে তুমি পচবে, তা আমারা হতে দেব না। তোমায় বোম্বাই গিয়েই বসতে হবে।"

"সেখানে আমায় কাজ দেবে কে? আর সেখানে খরচপত্র সব কি আপনি চালাবেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা যদি চালাতে হয়, আমিই চালাব। তাছাড়া বোম্বাইয়ের বড়ো ব্যারিস্টর হিসাবে কখনো-কখনো তোমায় আমরা রাজকোটে ডেকে নিয়ে আসব। আর আর্জি-দরখাস্ত-মুসাবিদা করার কাজগুলো তো তোমার ওখানেই পাঠিয়ে দিতে পারি। ব্যারিস্টরদের তুলে ধরা কিংবা ছোটো করা—সবই তো আমাদের মতো উকিলদেরই হাতে, আমরাই রাখি আবার আমরাই মারি। জামনগরে ও বেরাবলে তোমার কৃতিত্বের যে পরিচয় দিয়েছ, তারপর তোমার ভবিষ্যৎ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত। কপালে তোমার লেখা আছে যে তুমি জনসেবার কাজ করবে। কাথিয়াওয়াড়ে তুমি মাথামুণ্ড গুঁজে প'ড়ে থাকবে, সে আমরা হতে দেব না। বলো এখন, কবে বোম্বাই যাবে?"

"নাটাল থেকে আমার কিছু টাকা আসবার কথা। সেটা হাতে এলেই চ'লে যাব।"

হপ্তা-দুই পরে টাকাটা হাতে এল আর আমিও বোম্বাই রওনা হয়ে গেলাম। সেখানে পেইন, গিলবার্ড অ্যাণ্ড সায়ানি-দের অফিসে চেম্বার ভাড়া নিলাম। মনে হ'ল, এবার যেন আমি বোম্বাইয়ে কায়েম হয়েই বসলাম।

২২. ধর্মবিশ্বাসের পরীক্ষা

চেম্বার ভাড়া নিলাম বোম্বাইয়ের ফোর্ট অঞ্চলে, বাসা ভাড়া করলাম গিরগাঁও অঞ্চলে। কিন্তু ভগবান আমায় স্থির হয়ে বসতে দিলে তো! সবে নতুন বাসায় এসে উঠেছি, আমার মেজো ছেলে মণিলালকে কঠিন টাইফয়েড রোগে ধরল। সেই সঙ্গে তার নিউমোনিয়া ও রাতে বিকারও দেখা দিল। বেচারা দু-চার বছর আগে বসন্তরোগের একটা শক্ত আক্রমণ কাটিয়ে উঠেছে।

ডাক্তার ডেকে আনা হ'ল। তিনি বললেন, ওষুধে বিশেষ-কিছু কাজ দেবে না, তবে ডিম ও মুরগীর সুরুয়া দিলে উপকার হতে পারে!

তখন মণিলালের বয়স দশ, সুতরাং এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসবাদ করতে যাওয়া বৃথা। অভিভাবক হিসেবে আমাকেই মনঃস্থির করতে হবে। ডাক্তার ছিলেন জাতে পার্সি, ভারি সজ্জন মানুষ। তাঁকে বললাম : "আমরা সবাই নিরামিষাশী, সুতরাং ওই দুটি পথ্যের একটিরও ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আপনি অন্য-কোনো পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা কি দিতে পারেন না?"

"প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা থেকে তো দেহের পুষ্টি পুরো হবে না। আপনি তো জানেন, আমি অনেক হিন্দু পরিবারেও চিকিৎসা ক'রে থাকি। আমি যেরকম পথ্যের বিধান দিই, তাঁরা তো মেনে নিতে কোনো

ওজর-আপত্তি করেন না। আমার মনে হয়, আপনার ছেলের বেলা অতটা কঠিন না-হলেই ভালো।”

“আপনি যা বলেছেন তা ঠিকই বলেছেন। ডাক্তার হিসেবে আপনি অন্যরকম কথা বলতেই-বা যাবেন কেন? কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার দায়িত্বটা খুবই গুরু। ছেলে যদি সাবালক হ'ত তাহলে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা জেনে নিয়ে তদনুসারে ব্যবস্থা করা দরকার হ'ত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার হয়ে সব কথা বিচার-বিবেচনা ক'রে, আমি কী করব না-করব স্থির করতে হবে। আমার ধারণা, এরকম পরিস্থিতিতে মানুষের ধর্মবুদ্ধির অগ্নিপরীক্ষা হয়। সঙ্গত কারণেই কিংবা অসঙ্গত কারণেই হোক্, আমার ধর্মবিশ্বাস আমায় বলে যে মানুষের পক্ষে ডিম, মাংস প্রভৃতি খাওয়া উচিত নয়। প্রাণধারণের উপাদান হিসাবেও, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ক'রে কোথাও একটা সীমারেখা টানা দরকার। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যও আমরা এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যা করতে পারি না। ধর্ম বলতে আমি যা বুঝি তা এইরকম অবস্থাতেও ডিম, মাংস প্রভৃতি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে আমায় ও আমার পরিজনদের নিষেধ করে। সুতরাং আপনি যে সঙ্কটের সম্ভাবনার কথা বললেন, সে ঝুঁকি আমার পক্ষে না-নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। আপনার ব্যবস্থা অনুসারে চিকিৎসা আমি যখন করতে পারছি না, দেহকে রোগমুক্ত করার জন্য আমি জল-চিকিৎসার যেসব প্রক্রিয়া জানি, সেগুলি প্রয়োগ ক'রে দেখতে চাই। কিন্তু ছেলের নাড়ি বা বুক প্রভৃতি পরীক্ষা করতে পারি, সেরকম তো আমার জ্ঞান নেই। আপনি যদি মাঝে-মাঝে এসে এইসব পরীক্ষা ক'রে, তার শরীরের অবস্থা বিষয়ে সব কথা আমায় বলেন, আমি খুবই উপকৃত হই।”

ডাক্তার মানুষ তো খুব ভালো, তিনি আমার কোথায় অসুবিধা বুঝে আমার কথামতো মণিলালকে দেখে যাবেন ব'লে কথা দিলেন। মণিলালের পক্ষে ভালো-মন্দ বিচার ক'রে একটা-কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভবপর ছিল না। তৎসত্ত্বেও ডাক্তারের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল, সেসব কথা তাকে ব'লে তার নিজের মতামত জানতে চাইলাম। সে বলল : “বাপু, তুমি তোমার জল-চিকিৎসাই শুরু ক'রে দাও। আমি ডিম কিংবা মুরগীর সুরুয়া খাব না।”

তার এই কথায় আমি খুশি হলাম, যদিও আমি জানতাম যে এই দুটি পথ্যের যে কোনো একটি যদি আমি তাকে খাওয়াতে চাইতাম, সে খেয়ে নিতে দ্বিধা করত না।

কুহ্ন-এর জল-চিকিৎসার পদ্ধতি আমি জানতাম, দু-চারবার প্রয়োগও করেছি। অসুখের সময় উপবাস করলে অনেকসময় উপকার হয় তা-ও আমার জানা ছিল। কুহ্ন-এর পদ্ধতি অনুসারে টবের মধ্যে, কোমর অবধি জলে মণিলালকে তুলে বসিয়ে দিতে লাগলাম। এক-একবারে তিন মিনিটের বেশি তাকে টবে রাখতাম। প্রথম তিনদিন খাদ্য হ'ল কেবল জল-মেশানো কমলালেবুর রস।

কিন্তু শরীরে তাপ কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, মাঝে-মাঝে জ্বর উঠছিল ১০৪ ডিগ্রি অবধি। রাতে প্রলাপ বকত। আমি ভয় পেয়ে ভাবতে লাগলাম : “ছেলে যদি

না-সারে তাহলে লোকে আমায় কী বলবে? দাদাই-বা কী ভাববেন? অন্য-কোনো ডাক্তার ডাকলে হয় না? কোনো কবিরাজকে দেখালেও তো হয়? অসুখে-বিসুখে ছেলেপিলেদের ওপর দিয়ে নিজের খেয়ালখুশি-মাফিক পরীক্ষা চালাবার কী অধিকার আছে বাপ-মায়ের?"

কখনো-কখনো এইরকম ভাবনা মনকে একেবারে পেয়ে বসে। আবার কখনো অন্যরকম চিন্তাও মনে জাগে : "আমার নিজের যদি অসুখ হ'ত তাহলে তো ঠিক এইরকম চিকিৎসার ব্যবস্থাই করতাম। তাহলে ভগবান কেন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন? জল-চিকিৎসায় আমার যে বিশ্বাস আছে এলোপ্যাথিতে তো সেরকম বিশ্বাস নেই। আর এলোপ্যাথরা তো নিশ্চয় ক'রে বলতে পারলেন না যে নিরাময় হবে। বড়োজোর তাঁরা পরীক্ষা-গবেষণা চালাতে পারেন। জীবনের সূত্রটুকু থাকে ভগবানের হাতে। সুতরাং ভগবানের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে, তাঁর নাম নিয়ে, আমি যে চিকিৎসার পদ্ধতি ঠিক ব'লে মেনে নিয়েছি—সেই পথেই আমায় চলতে হবে।"

এই দু-রকম পরস্পর-বিরোধী ভাবের টানাপোড়নে প'ড়ে আমার মনের অবস্থা তখন শোচনীয়। রাত হয়েছে, মণিলালের পাশেই আমি শুয়ে আছি, জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। মনে-মনে ঠিক করলাম, ভিজে চাদরে তার সমস্ত শরীর মুড়ে দেব। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। একটি বিছানার চাদর জলে ডুবিয়ে নিঙড়িয়ে নিলাম। তারপর সেই চাদর মণিলালের গায়ে জড়িয়ে দিলাম—একেবারে পা থেকে গলা অবধি। কেবল মাথটুকু বেরিয়ে রইল। এবার সেই ভিজে চাদরের ওপর দু-দুটো কম্বল চাপা দিলাম। তোয়ালে ভিজিয়ে মাথার ওপর জলপটির মতো রাখলাম। আগুনে-পোড়া তাওয়ার মতো মণিলালের গা গরম, একবিন্দু ঘাম নেই, শরীর একেবারে শুক্‌নো।

এই প্রক্রিয়া করতে গিয়ে আমি একেবারে ক্লান্ত অবসন্ন। মণিলালকে তার মায়ের হেফাজতে রেখে, আধঘণ্টার জন্য একবার চৌপাটিতে মাথায় একটু হাওয়া লাগাতে বেরুলাম। তখন রাত প্রায় দশটা। চৌপাটিতে তখন লোকচলাচল নেই বললেই হয়। তাছাড়া মন তখন আমার এমনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন যে লোকের যাতায়াত থাকলেও সেদিকে আমার কোনো খেয়াল ছিল না। আপন মনে কেবলই ব'লে চলছিলাম, "এই সঙ্কটে তুমিই একমাত্র আমার মান রাখতে পারো, হে ভগবান। তোমার শরণ নিলাম।" আর মুখে বলছিলাম রামনাম। খানিকক্ষণ পরেই দুরু-দুরু বুকে বাড়ি ফিরলাম। ঘরে ঢুকতেই মণিলাল ক্ষীণস্বরে বলল :

"বাপু, তুমি ফিরে এসেছ?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"আমায় বের ক'রে দাও, তোমার পায়ে পড়ি। আমার সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে।"

"আহা বাছারে, ঘাম বেরিয়েছে কি?"

"ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে। আর আমায় কম্বল চাপা দিয়ে রেখো না। সব সরিয়ে দাও।"

কপালে হাত দিয়ে দেখলাম সমস্ত মাথাটা বিন্দু-বিন্দু ঘামে ভিজে গেছে। শরীরের তাপ নামতে শুরু করেছে। মনে-মনে ভগবানের পায়ে প্রণাম জানালাম।

"মণিলাল, একটুক্ষণ পরেই তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে। আরেকটু ঘাম হোক্, তারপর সব সরিয়ে দেব।"

"না বাপু, এই অগ্নিকুণ্ড থেকে আমায় রক্ষা করো। আবার কখনো যদি কম্বল চাপাতে হয়, চাপিয়ো।"

গল্প ক'রে ভুলিয়ে আরো-খানিকটা সময় মণিলালকে ওইভাবেই রাখা গেল। কপাল থেকে ঘাম দর-দর ধারায় গড়িয়ে পড়ল। তখন চাদর কম্বল সব সরিয়ে দিয়ে ওর গা-হাত-পা মুছে দিলাম। তারপর সেই একই বিছানায় বাপ আর বেটা ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমে অচেতন হয়ে বাকি রাতটা কেটে গেল। পরদিন সকালে উঠে দেখি, মণিলালের জ্বর অনেকখানি নেমে গেছে। অতঃপর প্রায় চল্লিশ দিন ধ'রে চলল জল-মেশানো দুধ ও ফলের রসের খাদ্য। ভয় আমার কেটে গিয়েছিল। যদিও জ্বরটা ছেড়েও ছাড়ছিল না, বুঝে নিয়েছিলাম, এবার জ্বরটা আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে।

আমার ছেলেদের মধ্যে এখন মণিলালের স্বাস্থ্যই সবচাইতে ভালো। কে বলবে কেমন ক'রে সে আরোগ্য লাভ করেছিল? সে কি ভগবানের কৃপায়, কিংবা জল-চিকিৎসার গুণে, কিংবা পথ্য ও সেবা-শুশ্রূষার জোরে? যাঁর যেমন বিশ্বাস, তিনি সেইভাবে এই আরোগ্যের কারণ বিচার করবেন। আমার নিজের দিক থেকে আমি বলতে পারি, সে যাত্রা ঈশ্বর আমার মুখরক্ষা করেছিলেন। আমার সে বিশ্বাস আজ পর্যন্ত আটুট।

২৩. আবার দক্ষিণ আফ্রিকা

মণিলাল সেরে উঠল। এদিকে দেখা গেল গিরগাঁও-এর বাড়িটা ঠিক বাসের উপযোগী নয়। কেমন যেন অন্ধকার আর স্যাঁতসেতে। সেইজন্য বেরাশঙ্কর জগজীবনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলাম, বোম্বাইয়ের শহরতলী অঞ্চলে একটা খোলামেলা বাংলোবাড়ি ভাড়া নেওয়া যাবে। বান্দ্রা ও সান্তাক্রুজ ঘুরে-ঘুরে দেখলাম। বান্দ্রাতে কশাইখানা ছিল ব'লে ও জায়গাটা আমাদের ঠিক পছন্দ হ'ল না। ঘাটকোপর ও তার কাছাকাছি জায়গাগুলো আবার সমুদ্র থেকে অনেকখানি দূরে। শেষপর্যন্ত সান্তাক্রুজ-এ একটি বেশ ভালো বাংলো পাওয়া গেল। শরীর-স্বাস্থ্যের দিক থেকে বেশ ভালো হবে মনে ক'রে ওই বাড়িটিই ভাড়া নেওয়া হ'ল।

সান্তাক্রুজ থেকে চার্চগেট স্টেশন অবধি একটি ফার্স্ট ক্লাস-এর সীজন্ টিকিট কিনে নিলাম। মনে পড়ে, অধিকাংশ দিন আমার কামরায় আমিই থাকতাম একক প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। তাই নিয়ে মনে একধরনের অহমিকাও হ'ত। তবে প্রায়ই আমার সান্তাক্রুজ-এর বাংলো থেকে বান্দ্রা স্টেশন অবধি হেঁটে গিয়ে আমি চার্চগেট-এর দ্রুতগামী থ্রু ট্রেনটা ধরতাম।

আমার ব্যারিস্টরির কাজ যেমন চলবে ভেবেছিলাম তার চেয়ে ভালোই চলতে লাগল। আমার দক্ষিণ আফ্রিকার মক্কেলরা প্রায়ই তাদের কাজ আমার হাত তুলে দিত। ফলে যে আয় হ'ত তা সংসার চালানোর পক্ষে যথেষ্ট।

তখনো পর্যন্ত হাইকোর্টের কোনো কাজ আমার হাতে আসেনি। কিন্তু সেকালে বিচার-বিতর্কের জন্য যে 'মূট্' কোর্ট বসত, সেখানে আমি নিয়মিত উপস্থিত থাকতাম। অবশ্য এসব বিতর্কে যোগদান করা আমার সাহসে কুলোত না। যোগ যাঁরা দিতেন, মনে আছে তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন জামিয়তরাম নানাভাই। তাছাড়া, অন্য নতুন ব্যারিস্টরদের মতো আমি নিয়মিত হাইকোর্টে মামলার শুনানীর সময় হাজিরা দিতাম। নতুন-কিছু শিখতে পারব সেই আগ্রহে যে যেতাম তা ঠিক বলা চলে না। হাইকোর্টে ব'সে থাকতে বেশ আরাম লাগত, সমুদ্রের ফুরফুরে হাওয়ায় বেশ-একটা তন্দ্রার মৌজ ছিল। লক্ষ করতাম, আমি একাই যে এ আরাম উপভোগ করতাম, তা নয়, তরুণ ব্যারিস্টরদের মধ্যে এইরকম ঝিমনো ছিল ফ্যাশনবিশেষ, সুতরাং এ নিয়ে কারও লজ্জা-সঙ্কোচ ছিল না।

তবে সেইসঙ্গে আমি হাইকোর্টের লাইব্রেরিতে পড়াশুনো শুরু ক'রে দিলাম ও লোকজনদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও করতে লাগলাম। মনে হ'ল, হাইকোর্টে কাজ পেতে আমায় খুব বেশিকাল অপেক্ষা করতে হবে না।

এইভাবে একদিকে আমি যখন আমার ব্যারিস্টরি ব্যবসা নিয়ে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করছি, অন্যদিকে গোখলে আমার ওপর নজর রেখেছেন ও সারাক্ষণ ভাবছেন আমায় দিয়ে কী কাজ করানো যায়। সপ্তাহে দু-তিনবার অন্তত তিনি আমার চেম্বারে টুঁ মেরে যেতেন। প্রায়ই বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমি যেন তাঁদের সঙ্গে ও তাঁর কার্যপদ্ধতির সঙ্গে ভালো ক'রে পরিচিত হতে পারি।

কিন্তু ভগবান কি কখনো আমায় আমার পরিকল্পিত পথে চলতে দিয়েছেন? আমি ভেবেছি এক, তিনি করেছেন আর।

আমার অভিপ্রেত-অনুসারে সবে আমি স্থির হয়ে বসতে আরম্ভ করেছি, এমনসময় অপ্রত্যাশিতভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তারবার্তা এল : "চেম্বারলেন্-এর এখানে আসার সম্ভাবনা। অবিলম্বে ফিরে আসুন।"

দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুদের আমি কথা দিয়েছিলাম, সেই কথা স্মরণ ক'রে আমি তারে জবাব পাঠালাম যে খরচপত্রের ব্যবস্থা করলে আমি সঙ্গে-সঙ্গে রওনা দেব। পত্রপাঠ টাকা এসে গেল। আমিও আমার চেম্বার ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হলাম।

মনে-মনে ধ'রে নিয়েছিলাম, নিদেনপক্ষে আমার একবছরটাক সময় দিতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে। সুতরাং সান্তাক্রুজ-এর বাড়িটা হাতছাড়া করলাম না, স্ত্রী ও ছেলেদের সে বাড়িতে রেখে গেলাম।

তখন আমার মনে হ'ত যে উৎসাহী ও করিৎকর্মা যুবকেরা স্বদেশে যদি রোজগারের সুযোগ-সুবিধা না-পায়, তাহলে তাদের উচিত বিদেশে গিয়ে বসবাস পত্তন করা। এ যাত্রা

তাই চার-পাঁচজন এইধরনের যুবককে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলাম—মগনলাল গান্ধী ছিল এদেরই একজন।

এখনকার দিনে যেমন, তখনকার দিনেও গান্ধী-পরিবার ছিল বেশ বড়ো। এই পরিবারের কে-কে বাঁধা সড়ক ছেড়ে, সাহসে ভর দিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতে চায়—আমি সর্বদা খোঁজ নিতাম। বাবা এরকম অনেক আত্মীয়স্বজনকে কাথিয়াওয়াডের কোনো-কোনো দেশীয় রাজ্যের চাকরিতে বহাল ক'রে দিতেন। আমি এই চাকরির মোহ থেকে তাদের মুক্ত করতে চাইতাম। এদের চাকরি জোগাড় ক'রে দিই আমার সে ক্ষমতাও ছিল না, আগ্রহও ছিল না। আমি চাইতাম, এরা সবাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক।

পরে যখন নিজের জীবনে স্বাবলম্বনের আদর্শ উন্নততর হতে থাকে, এদের কাউকে-কাউকে টানবার চেষ্টা করেছি, আমার আদর্শের সঙ্গে তাদের আদর্শ মেলাবার চেষ্টা করেছি। এইভাবে পরিচালিত করতে গিয়ে সবচেয়ে সফলকাম হয়েছিলাম মগনলাল গান্ধীর বেলা। সেসব কথা পরে বলব।

স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, পাতানো সংসার ভেঙে ফেলা, ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের অভিমুখে যাত্রা এইসবই তখনকার মতো আমায় ব্যথিত করেছিল। কিন্তু এরকম ছন্নছাড়া জীবনের অনিশ্চয়তা—এ তো আমার কাছে আর নতুন নয়। যে জগতে এক ব্রহ্মই সত্য এবং আর সবই অনিশ্চিত, সেখানে অচল অটল অবস্থার আশা করাটাই ভুল। দৃশ্যমান জগতে যা-কিছু দেখি, যা-কিছু ঘটে সমস্তই ক্ষণিক, সমস্তই অনিশ্চিত। কিন্তু এইসমস্ত অনিশ্চয়তার পিছনে একজন রয়েছেন, যিনি সত্যস্বরূপ। পলকের জন্য যদি তাঁর দেখা মেলে, যদি তাঁকে অবলম্বন করতে পারি, তাহলে এ জীবন ধন্য হয়। সেই সত্যের সন্ধান পাওয়াটাই মানবজীবনের পরমার্থ।

ডারবান্-এ আমি পৌঁছলাম একেবারে যথাসময়ে। একটা দিন পরে হ'লেও কাজের খুব ক্ষতি হ'ত। কাজ যেন আমার অপেক্ষায় ব'সে ছিল। মিস্টার চেম্বারলেন্-এর কাছে ডেপুটেশন পাঠাবার দিনক্ষণ সব নির্ধারিত হয়ে ছিল। পৌঁছবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার কাজ হ'ল তাঁর কাছে পেশ করার জন্য আবেদনপত্র মুসাবিদা করা ও যথানির্দিষ্ট দিনের ডেপুটেশনের দলভুক্ত হয়ে তাঁর সামনে হাজির হওয়া।

চতুর্থ ভাগ

১. লাভ-লোকসান

মিস্টার চেম্বারলেন্-এর দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার মুখ্য কারণ ছিল সে দেশ থেকে তিনশো পঞ্চাশ লাখ পাউন্ড-এর একটি টাকার তোড়া নেওয়া এবং সে দেশের ইংরেজ ও বুয়রদের চিত্ত জয় করা। সুতরাং ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রতি তিনি যদি যথেষ্ট হৃদ্যতা প্রকাশ না-ক'রে থাকেন তাতে আর আশ্চর্য কী! তিনি বললেন: "আপনারা তো জানেন স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশগুলির ওপর সম্রাটের শাসন খুব বেশি জোরদার নয়। আপনাদের অভিযোগগুলি তো ভিত্তিহীন মনে হয় না। দেখব, আমি কী করতে পারি। তবে ইউরোপীয়দের মধ্যে বসবাস যদি করতে চান, তবে তো তাদের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য বিধিমতো চেষ্টা করা দরকার।"

জবাব শুনে প্রতিনিধিদল তো স্তম্ভিত। আমিও হতাশ হলাম। আমাদের সকলের চোখ খুলল। আমি বুঝলাম, আবার নতুন ক'রে কাজ শুরু করতে হবে। পরিস্থিতির বিষয়ে আমার সহকর্মীদের সব কথা বুঝিয়ে বললাম।

সত্যি বলতে কী, মিস্টার চেম্বারলেন্ তো কিছু ভুল বলেননি। রেখে-ঢেকে যে তিনি বলতে যাননি—সে বরঞ্চ একহিসেবে ভালো। বেশ মোলায়েম ক'রে তিনি আমাদের সমঝিয়ে দিলেন জোর যার মুলুক তার। হাতে যার তলোয়ার, সে তলোয়ার ঘুরিয়ে শাসন করবে—এতে আর বিচিত্র কী!

কিন্তু আমাদের হাতে তো আর তলোয়ার ছিল না। আর দু-একটা তলোয়ারের ঘা খেয়ে বরদাস্ত করব, তেমন শরীরের জোর ছিল না, মনের সাহসও ছিল না।

মিস্টার চেম্বারলেন্-এর দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবার মেয়াদ ছিল মাত্র দিনকয়েক। দেশটা তো ছোটোখাটো জায়গা নয়—উপমহাদেশ বিশেষ। শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারী যদি ১৯০০ মাইল হয়, ডারবান্ থেকে কেপ টাউন্ও ১১০০ মাইলের কম নয়। এই দীর্ঘ পথ মিস্টার চেম্বারলেন্-কে অতিক্রম করতে হ'ল প্রায় ঝড়ের বেগে।

নাটাল থেকে তিনি তুরন্ত চ'লে গেলেন ট্রান্সভাল্। সেখানকার ভারতীয়দের দুরবস্থা ও তাদের প্রতি অবিচারের বিষয়ে নথিপত্র তৈরি ক'রে মিস্টার চেম্বারলেন্-এর হাতে সেটি পেশ করাও ছিল আমার কাজ। কিন্তু প্রিটোরিয়ায় যাই কী উপায়ে? সেখানকার ভারতীয় ভাইদের সাধ্যও ছিল না যে আইনের সাহায্য নিয়ে তাঁরা সরকারের কাছ থেকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ ক'রে আমায় পাঠাবেন, যাতে আমি যথাসময়ে তাঁদের কাছে গিয়ে পড়তে পারি। যুদ্ধের ফলে সমস্ত দেশটা পরিণত হয়েছিল বিরাট এক জঙ্গলে। যা-কিছু সম্পদ ছিল সব

উজাড় হয়ে গেছে—না-আছে ক্ষুধার অন্ন, না পরিধানের বস্ত্র। দোকানপাট হয় শূন্য, নয়তো দরজা দেওয়া। কবে-যে মালপত্তর আসবে, কবে আবার বন্ধ দোকান খুলবে—তার যেন কিছু স্থিরতা নেই। হাটে-বাজারে জিনিসপত্তর মজুদ না-হওয়া পর্যন্ত, বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালানো উদ্বাস্তুদের পর্যন্ত ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না। পারমিট্ ছাড়া তখন ট্রান্সভাল্-এ কোনো লোকের প্রবেশের অধিকার ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে পারমিট্ পাওয়া শক্ত ছিল না, কিন্তু ভারতীয়দের প্রচুর নাকানিচুবানি খেতে হ'ত।

যুদ্ধের সময় ভারত ও সিংহল থেকে বেশ-কিছু সিভিল ও মিলিটারি অফিসার দক্ষিণ আফ্রিকায় আমদানি করা হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে হ'ল, এইসব আগন্তুকদের মধ্যে যারা-যারা সে দেশে থেকে যেতে চায়, তাদের জন্য বসবাসের সুযোগ-সুবিধা ক'রে দেওয়া উচিত। এমনিতেই নতুন-নতুন অফিসার নিয়োগ করার দরকার ছিল। এইসব অভিজ্ঞ লোকদের পেয়ে তাদের বেশ সুবিধাই হ'ল। তাদের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত-বুদ্ধি লোক তো একটি নতুন বিভাগই ফেঁদে বসল। এ থেকে বোঝা যায়, উপায়-সন্ধানে তারা কেমন তৎপর। নিগ্রো অধিবাসীদের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ আগের থেকেই ছিল। সুতরাং এশিয়াটিকদের জন্য আরেকটা বিশেষ বিভাগ খুলতে দোষ কী? কর্তৃপক্ষের মনে হ'ল, প্রস্তাবটা বেশ যুক্তিসঙ্গত। আমার ট্রান্সভাল্ পৌঁছবার আগেই এই নতুন এশিয়াটিক বিভাগ চালু হয়ে ধীরে-ধীরে চারিদিকে তার জাল ছড়াতে শুরু করেছে। যেসব অফিসার উদ্বাস্তুদের ঘরে ফিরে আসবার জন্য পারমিট্ দিচ্ছিলেন, তাঁরা তো নির্বিচারে সবাইকেই পারমিট্ দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এখন এই নতুন বিভাগের সুপারিশ ব্যতিরেকে এশিয়াটিকদের কী ক'রে পারমিট্ দেওয়া যায়? আর নতুন বিভাগের সুপারিশমতো পারমিট্ দিতে হ'লে পারমিট্-অফিসারদেরও দায়িত্ব ও ঝুঁকি খানিকটা কমে। এইভাবে তাঁরা নিজেরা নিজেদের বোঝাচ্ছিলেন। আসলে এই নতুন বিভাগ চাইছিল কাজের একটা অছিলামাত্র এবং সেই সূত্রে কিছু-কিছু টাকা উপার্জন করতে। কাজ যদি না-থাকে তাহলে নতুন বিভাগ অদরকারি বিধায় উঠিয়েও তো দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং তারা নিজেরাই কাজ সৃষ্টি ক'রে নিতে লাগল।

পারমিট্ পেতে হ'লে ভারতীয়দের এই বিভাগে দরখাস্ত করতে হ'ত। উত্তর মিলত খুব দেরি ক'রে। ট্রান্সভাল্-এ ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ছিল অনেকে। মক্কেল থাকলে দালালের অভাব হয় না। একদল দালালের আবির্ভাব হ'ল। এইসব দালাল ও সেই নতুন বিভাগের কর্মচারীরা পরস্পরের সঙ্গে সাঁট ক'রে বেচারা গরীব ভারতীয়দের কাছ থেকে দস্তুরীস্বরূপ হাজার-হাজার টাকা লুটে নিতে লাগল। শুনলাম, মুরুব্বির জোর না-থাকলে পারমিট্ পাওয়া দুষ্কর, এমন-কি প্রভাবশালী মুরুব্বির সুপারিশ সত্ত্বেও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একশো পাউন্ড অবধি ঘুষ দিতে হয়েছে। সুতরাং মনে হ'ল কোনো পথই খোলা নেই আমার কাছে। আমি তখন আমার সেই পুরনো বন্ধু ডারবান্-এর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর কাছে গিয়ে বললাম, "আপনি তো জানেন, এককালে আমি ট্রান্সভাল্-এর বাসিন্দা ছিলাম। পারমিট্ অফিসার-এর সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিন ও যাতে আমি পারমিট্ পাই, তার ব্যবস্থা

করুন।" তিনি তখুনি মাথায় টুপিখানা চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন ও আমার জন্য পারমিট্ নিয়ে এলেন। ট্রেন ছাড়তে তখন পুরো এক ঘণ্টাও নেই। আমার জিনিসপত্র আগের থেকে বাঁধাছাঁদা হয়ে তৈরি ছিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট আলেকজান্ডার-কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি প্রিটোরিয়ার পথে যাত্রা করলাম।

সেখানে পৌঁছে কীরকম অসুবিধা ও বিপদে আমায় পড়তে হতে পারে, আমি এখন অনেকটা স্পষ্টভাবে আন্দাজ করতে পারলাম।

প্রিটোরিয়া পৌঁছেই আমি আবেদনের খসড়া লিখে ফেললাম। ডারবান্-এ প্রতিনিধি-দলে কে-কে থাকবেন, তাঁদের নাম আগের থেকে চাওয়া হয়েছিল ব'লে আমার মনে পড়ে না। কিন্তু প্রিটোরিয়ার কথা আলাদা—এখানকার সেই নতুন বিভাগ নামের তালিকা অগ্রিম চেয়ে পাঠাল। প্রিটোরিয়ার ভারতীয়রা ইতিপূর্বেই জানতে পেরেছে যে এখানকার অফিসারেরা আমার নামটা বাদ দিতে চায়।

সে ঘটনাটা শোচনীয় হ'লেও বেশ কৌতুককর ঘটনা। সে কথা বারান্তরে আপনাদের বলব।

২. এশিয়া বিভাগের যথেচ্ছাচার

বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি ট্রান্সভাল্-এ কীভাবে আমার অনুপ্রবেশ ঘটল। যেসব ভারতীয়দের তাদের কাছে যাতায়াত ছিল, তাদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে ঠিকানার কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। কর্তাব্যক্তিরা আন্দাজে ধ'রে নিলেন পূর্ব-পরিচয়ের জোরে আমি হয়তো বিনা-পারমিট্-এ প্রবেশ ক'রে থাকব। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে তো আমায় গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।

বড়ো-বড়ো যুদ্ধের পর, যে সরকারের হাতে শাসনক্ষমতা থাকে তাঁরা সচরাচর অতিরিক্ত বিশেষ ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বেলা তা-ই হয়েছিল। শান্তিরক্ষার জন্য একটি জরুরি আইন জারি করা হয়েছিল। এই অর্ডিন্যান্স্-এর বলে বিনা-পারমিট্-এ কেউ যদি ট্রান্সভাল্-এ প্রবেশ করত তাকে গ্রেপ্তার ও কয়েদ করা চলত। এই অর্ডিন্যান্স্-এর বলে আমায় গ্রেপ্তার করা যায় কি-না, সে প্রসঙ্গ উত্থাপনও করা হয়েছিল। কিন্তু কারো তেমন সাহস ছিল না যে আমায় পারমিট্ দেখাতে বলে।

অগত্যা কর্তাব্যক্তিরা ডারবান্-এ তারবার্তা পাঠিয়ে খোঁজ নিলেন। যখন জানা গেল, আমি রীতিমতো পারমিট্ নিয়ে ট্রান্সভাল্-এ প্রবেশ করেছি, তাঁরা মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু এত অল্পে হ'টে যাবেন, তাঁরা তেমন পাত্রই নন। না-হয় আমি আইনসঙ্গত উপায়েই ট্রান্সভাল্-এ এসে গেছি, তাই ব'লে মিস্টার চেম্বারলেন্-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঠেকানো যাবে না—এ-ও না-কি একটা কথা!

সেইজন্য তো ট্রান্সভাল্-স্থিত ভারতীয়দের বলা হ'ল ডেপুটেশনে তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে

যাঁদের পাঠাবার কথা, আগাম তাঁদের নামের তালিকা পেশ করতে হবে। সারা দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে বর্ণবিদ্বেষ তো যত্রতত্র দেখা যেত। কিন্তু ভারতে ইংরেজ অফিসারদের মধ্যে যে ইতর মনোভাব ও তঞ্চকতা দেখেছি, এখানেও তা দেখতে হবে ব'লে তৈরি ছিলাম না। দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি সরকারি বিভাগের কাজই ছিল লোকসাধারণের সুবিধা ও হিতসাধন করা, সুতরাং জনমতের ধার না-ধারলে তাদের চলত না। পাঁচজনের সঙ্গে কাজ-কারবার করতে হ'ত ব'লে এইসব বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের ব্যবহারে একটা সৌজন্য ও বিজয়ের ভাব দেখা যেত। কালা আদমিরাও কম-বেশি পরিমাণ তাদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ করত। এশিয়া থেকে যেসব অফিসার আমদানি হয়ে এলেন, তাঁরা সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁদের কলোনিয়াল মেজাজ ও যথেচ্ছাচারী স্বভাব। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ছিল গণমতের ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক। এখন এশিয়া থেকে যে বস্তুটি আমদানি হয়ে এল, তা নিছক অটোক্রাটিক স্বেচ্ছাচার। তার কারণ এই যে, এশিয়ায় তো শাসনব্যবস্থায় প্রজাদের কোনো হাত ছিল না। জনসাধারণ ছিল কলোনিয়াল শাসকদের মুঠোর মধ্যে। বহিরাগত হ'লেও ইউরোপীয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘরদোর বেঁধে বসবাস করতেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁরা ছিলেন ওই দেশেরই নাগরিক। কাজে-কাজেই বিভিন্ন সরকারি বিভাগের অফিসারদের ওপর তাদের এক্তিয়ার ছিল। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে এশিয়া থেকে আগত এইসব স্বেচ্ছাচারীদের উদয় হবার ফলে ভারতীয়দের অবস্থা হ'ল এমন যেন ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমীর!

এইসব ক্ষুদে নবাবদের হাতে আমাকেও যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। সূচনায় এশিয়াটিক বিভাগের বড়োসাহেব আমায় এত্তেলা পাঠালেন। ইনি ছিলেন সিংহল-প্রত্যাগত এক ব্রিটিশ অফিসার। পাছে কেউ মনে করেন যে হুকুম কথাটা অত্যুক্তি, সমস্ত ঘটনাটা একটু খোলসা ক'রে বলতে হয়। কোনো লিখিত আদেশ আমার ওপর জারি করা হয়নি। ভারতীয় সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা প্রায়ই কাজে-কর্মে এশিয়াটিক বিভাগের সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। শেঠ তৈয়ব হাজি খান মহম্মদ ছিলেন এঁদের অন্যতম। বড়োসাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন :

"আচ্ছা, গান্ধী লোকটা কে। কীজন্য এখানে এসেছে বলুন তো?"

"উনি আমাদের উপদেষ্টা। আমাদের অনুরোধক্রমে উনি এখানে এসেছেন।"

"উনি আপনাদের উপদেশ দেবেন? তাহলে আমরা এখানে রয়েছি কেন? আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই তো আমাদের চাকরিবাকরি করা। এখানকার অবস্থা-ব্যবস্থা বিষয়ে গান্ধী কী জানবে?"

তৈয়ব শেঠ একটু আমতা-আমতা ক'রে বললেন : "তা তো বটে, আপনারা তো রয়েইছেন। তবে কি জানেন, গান্ধী হলেন গিয়ে ওই যাকে বলে আমাদের আপনার লোক। আমরা এক ভাষায় কথা বলি ব'লে তিনি আমাদের কথা বোঝেন। হাজার হোক্ আপনারা তো অফিসার মানুষ, সরকারের লোক।"

বড়োসাহেব তৈয়ব শেঠকে হুকুম করলেন, আমাকে হুজুরে হাজির করতে। আমি তৈয়ব

শেঠ ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে সাহেবের মোলাকাতে গেলাম। তিনি আমাদের বসতে পর্যন্ত বললেন না, সকলে ঠায় দাড়িয়েই রইলাম।

সাহেব আমায় উদ্দেশ ক'রে বললেন : "এখানে আপনার আসা কী মতলবে?"

"আমার দেশবাসীদের অনুরোধে, তাঁদের পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতে, আমি এখানে এসেছি।"

"কিন্তু আপনি কি জানেন না, আপনার এখানে আসার কোনো অধিকার নেই। আপনি যে পারমিট্ পেয়েছেন, সে ভুলবশত। আপনাকে এখানকার অধিবাসী ভারতীয় ব'লে গণ্য করা চলে না। এখান থেকে আপনাকে পাত্তাড়ি গোটাতে হবে। মিস্টার চেম্বারলেন্-এর কাছে আপনার হাজির হওয়া চলবে না। এখানকার ভারতীয়দের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই তো বিশেষ ক'রে এই এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্টের পত্তন করা হয়েছে। আচ্ছা, এবার আপনি আসতে পারেন।" এই ব'লে সাহেব আমায় জবাব দেবার কোনো সুযোগ না-দিয়েই বিদায় দিলেন।

আমার সাথীদের কিন্তু তিনি ধ'রে রাখলেন। বেশ-কিছুটা ধমক ও দাবড়ানি দিয়ে সাহেব তাঁদের বললেন, আমায় পত্রপাঠ ট্রান্সভাল্ থেকে বিদায় দিতে।

তাঁরা যৎপরোনাস্তি মর্মাহত হয়ে ফিরে এলেন। এইভাবে আমরা একটা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

৩. অপমান হজম

এই অপমানে আমার সমস্ত শরীর যেন রী-রী ক'রে উঠল। কিন্তু এরকম লাঞ্ছনা হজম করা তো আমার আর নতুন নয়, তাই মান-অপমান নিয়ে আমার মনে কোনো বালাই ছিল না। সুতরাং এই নবতম ঘটনাটা মনে না-রেখে, আমি মনে-মনে স্থির করলাম যে নিঃসংসক্ত দৃষ্টিতে যা উচিত বিবেচনা করব, তদনুসারে আমার কাজ ক'রে যাব।

এশিয়াটিক বিভাগের বড়োসাহেবের কাছ থেকে চিঠি এল যে যেহেতু ডারবান্-এ মিস্টার চেম্বারলেন্-এর সঙ্গে আমি একদফা সাক্ষাৎকার ক'রে এসেছি, ট্রান্সভাল্-এর যে ভারতীয় ডেপুটেশন হাজিরা দিতে চান, তাঁদের নামের তালিকা থেকে আমার নামটা কেটে দেওয়া দরকার হয়েছে।

এই চিঠি আমার সহকর্মীদের কাছে অসহ্য ঠেকল। তাঁরা প্রস্তাব করলেন, ডেপুটেশন পাঠিয়ে কাজ নেই। ভারতীয় সমাজের বিসদৃশ অবস্থার কথা তুলে আমি তাঁদের বুঝিয়ে বললাম

"দেখুন, মিস্টার চেম্বারলেন্-এর সামনে যদি আপনাদের মামলাটা না-রাখেন, তাহলে ধ'রে নেওয়া হবে যে আপনাদের কোনো নালিশই নেই। তাছাড়া, আর্জি তো পেশ করতে হয় লিখিতভাবে এবং তা লিখে ফেলাও হয়েছে। এ আর্জি আমি পড়ি কিংবা আর কেউ

পড়ে তাতে কিছু আসে যায় না। মিস্টার চেম্বারলেন্ তো এ নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোনো তর্ক বা আলোচনা করতে আসবেন না। আমার তো মনে হয়, এ আপমানের কাঁটা আমাদের না-গিলে উপায় নেই।"

আমার কথা শেষ হতে না-হতেই তৈয়ব শেঠ ব'লে উঠলেন, "কিন্তু আপনাকে অপমানিত করা মানে তো সমস্ত সম্প্রদায়কে অপমান। আপনি যে আমাদের প্রতিনিধি, সে কথা আমরা ভুলি কী ক'রে?"

"আপনি খুব ঠিক কথা বলেছেন। কিন্তু সমস্ত সমাজকেও এরকম লাঞ্ছনা হজম করতে হবে। উপায়ান্তর কিছু আছে কি?"

তৈয়ব শেঠ বললেন : "যা হবার হোক্। কিন্তু নতুন ক'রে লাঞ্ছনা হজম করতে যাব কেন? খারাপ যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এর চেয়ে বেশি খারাপ আর কী হতে পারে? তাছাড়া আমাদের কী-আর এমন অধিকার আছে যা আমাদের খোয়াতে হতে পারে?

তৈয়ব শেঠের কথায় ঝাঁজ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তা থেকে তো কোনো ফ্যায়দা ওঠানো যেত না। কার্যকালে হয়তো দেখা যেত, কথা ও কাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, কারণ ভারতীয় সম্প্রদায়ের কতটা দৌড় তা আমার বেশ জানা ছিল। তাই সমবেত বন্ধুদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত ক'রে বলি যেন আমার জায়গায় তাঁরা ভারতীয় খ্রিষ্টান ব্যারিস্টার, মিস্টার জর্জ গড্‌ফ্রে-কে ডেপুটেশন-এর নেতৃত্ব করতে বলেন।

শেষ পর্যন্ত মিস্টার গড্‌ফ্রে-ই ভারতীয়দের মুখপাত্র হয়ে মিস্টার চেম্বারলেন্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন। ভারতীয়দের ক্ষতস্থানে মলমপট্টি লাগাবার ছলে, মিস্টার চেম্বারলেন্ আমায় ডেপুটেশন থেকে বাদ দেবার প্রসঙ্গে বলেন, "একই প্রতিনিধির মুখ থেকে বারবার অভাব-অভিযোগ শোনার চেয়ে, নতুন কারো মুখ থেকে দু-চার কথা শোনা ভালো।"

কিন্তু এ থেকে সমস্ত সমস্যার সুরাহা হওয়া তো দূরে থাক্, উল্‌টে ভারতীয় সম্প্রদায়ের ও সেই সঙ্গে আমার নিজেরও কথা যেন প্রচুর বেড়ে গেল। আবার যেন গোড়া থেকে কাজ শুরু করতে হ'ল।

কেউ-কেউ টিটকিরি-টিপ্পনি কেটে বলল, "মহায়ের শলা-পরামর্শেই তো যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতীয়েরা নানাভাবে মদৎ দিয়েছিল। এখন তার ফল কীরম দাঁড়াল তা মশায়ই বুঝে দেখুন।" এসব খোঁটা গায়ে না-মেখে আমি তাদের বলেছিলাম. "শলা-পরামর্শ দিয়েছিলাম ব'লে আমার বিন্দুমাত্র আপশোষ নেই। যুদ্ধে যোগদান ক'রে আমরা ঠিক কাজই করেছিলাম—ওটা ছিল আমাদের পক্ষে নিছক কর্তব্য পালন। কর্তব্য কাজ করার জন্য কোনো ইনাম প্রত্যাশা করাটা ঠিক নয়। তবু আমি বলব, ভালো কাজ করলে আখেরে সুফল লাভ করা অবশ্যম্ভাবী—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এখন আসুন, অতীতে কী হয়েছে না-হয়েছে সে বিষয়ে মাথা না-ঘামিয়ে, আমাদের সামনে কী কর্তব্য প'ড়ে রয়েছে, সেই কথা আমরা বিবেচনা করি।" আমার কথায় আর-পাঁচজন যাঁরা ছিলেন, সকলেই সায় দিলেন। আমি তখন ব'লে চললাম :

"সত্যি বলতে কী, আপনারা যে কাজের জন্য আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তো

একপ্রকার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে বাড়ি ফেরার ছুটি পেয়ে গেলেও, পারতপক্ষে আমার ট্রান্সভাল্ ছেড়ে চ'লে যাওয়া ঠিক হবে না। আগের মতো নাটাল-এ থেকে আর চলবে না, এখন ট্রান্সভাল্-কেই আমার কর্মক্ষেত্র ক'রে তুলতে হবে। একবছরের মধ্যে দেশে ফিরে যাবার চিন্তা আমি ত্যাগ করছি। আমায় এখন অনতিবিলম্বে এখানকার সুপ্রীম কোর্ট-এ প্র্যাক্টিস্ করার পরোয়ানা নিতে হবে। এই নতুন এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্টকে আমি যে কায়দা করতে পারব, সেটুকু আত্মবিশ্বাস আমার আছে। আমরা যদি এই বিভাগকে শায়েস্তা করতে না-পারি, তাহলে সর্বস্ব খুইয়ে এ দেশ থেকে ভারতীয়দের উৎখাত হতে হবে। লাঞ্ছনা ও অপমানের বোঝা প্রতিদিন বাড়তে থাকবে। মিস্টার চেম্বারলেন্ যে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাননি, ওই বিভাগের বড়োসাহেব যে আমার প্রতি অশিষ্ট আচরণ করেছেন—আমার এই ব্যক্তিগত আপমান তো সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায়ের লাঞ্ছনার কাছে তুচ্ছ। এর যদি প্রতিকার আমরা না-করতে পারি, তাহলে কুকুরের মতো ঘৃন্য জীবন আমাদের যাপন করতে হবে।"

এইভাবে চিন্তার মোড় আমি ঘুরিয়ে দিলাম। প্রিটোরিয়া ও জোহানেস্‌বার্গ-এর ভারতীয়দের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করলাম এবং শেষ পর্যন্ত জোহানেস্‌বার্গ-এ আমার আইনের কাজের অফিস খোলা স্থির করলাম।

ট্রান্সভাল্ সুপ্রীম কোর্ট-এ প্র্যাক্টিস্ করার পরোয়ানা পেতে পারব কি-না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ ছিল। কিন্তু সেখানকার আইন সমিতি আমার দরখাস্তের বিরোধিতা করেনি, ফলে কোর্ট দরখাস্ত মঞ্জুর করে। কোনো ভারতীয়ের পক্ষে অফিসপাড়ায় ঘর ভাড়া পাওয়া খুবই শক্ত ছিল। কিন্তু স্থানীয় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম মিস্টার রীজ্-এর সঙ্গে নিকট-সান্নিধ্যে আসার ফলে, তাঁর পরিচিত একজন ভাড়া-বাড়ির দালালের সহায়তায় আইন-পাড়ায় আমি মনের মতন অফিসঘর পেয়ে যাই ও ট্রান্সভাল্-এ ব্যারিস্টরি ব্যবসা শুরু করি।

৪. স্বার্থবুদ্ধি থেকে মুক্তির প্রয়াস

টান্সভাল্-এ ভারতীয়দের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ করতে গিয়ে কীপ্রকার আন্দোলন করতে হয়েছিল, এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্ট-এর সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে আসার আগে আমার ব্যক্তিজীবনের দু-একটি দিকের কথা অবতারণা করতে হয়।

এ যাবৎ আমার সাধনার মধ্যে দুই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব ছিল। স্বার্থ বিসর্জন দেবার আকুতির সঙ্গে-সঙ্গে, ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করার বাসনাও বলবৎ ছিল।

বোম্বাই শহরে যখন আমি চেম্বার খুলে বসি, আমার অফিসে একজন সুদর্শন ও মিষ্টভাষী আমেরিকান জীবনবীমা-দালালের আগমন হয়। আমরা যেন বহুকালের পুরনো বন্ধু—এইভাবে তিনি আমার ভবিষ্যতের সংস্থান করার কথা তোলেন :

"আমাদের আমেরিকায় আপনার মতো পদস্থ লোকেরা সকলেই জীবনবীমা ক'রে থাকেন। আপনারও তো ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংস্থান ক'রে রাখা দরকার। জীবনের কথা কি কেউ নিশ্চিত বলতে পারে? আজ আছে, কাল না-থাকতেও পারে। আমরা আমেরিকানরা বীমা করাটাকে প্রায় ধর্মাচরণের তুল্য ব'লে মনে করি। আপনি কি আমার কাছ থেকে ছোটোখাটো একটা পলিসি নেবেন না?"

এর আগে-আগে যেসব বীমার দালালের সঙ্গে দেশে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদেরকে সহজেই এড়িয়ে গেছি। আমার তখন ধারণা ছিল, মানুষ বীমা করে প্রাণের ভয়ে অথবা ভগবানের প্রতি আস্থার অভাববশত! কিন্তু এ যাত্রা এই আমেরিকান দালালের ফাঁদে পা দিয়ে ফেললাম। সে যখন বীমা করার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে যাচ্ছিল, আমি যেন চোখের সামনে দেখছিলাম আমার অবর্তমানে আমার স্ত্রী-পুত্রের দুরবস্থার ছবি। নিজেই নিজেকে যেন বোঝাচ্ছিলাম : "বাপু হে, স্ত্রীর গয়নাপত্তর তো সব বেচে শেষ করেছ। আজ যদি তোমার ভালোমন্দ কিছু-একটা ঘ'টে যায়, তাহলে তো তোমার নিরাভরণ স্ত্রী ও ছেলেপুলের সমস্ত বোঝাটুকু চাপবে তোমার ওই পিতৃ-তুল্য দাদা বেচারার ওপর। সেরকম করাটা কি তোমার পক্ষে ঠিক হবে?" এসব ও অন্য নানা কথা ভেবে আমি ১০ হাজার টাকার একটি পলিসি নিয়ে নিলাম।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার জীবনযাত্রার ধারা বদ্‌লে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে মনের গতিও ঘুরে যায়। আমি বলতে পারি, আত্মপরীক্ষার সেই কঠিন সময়ে আমি যা-কিছু করেছি সবই ভগবানের নামে ও তাঁরই সেবার জন্য। আমার যে কতদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটাতে হবে, সে আমি তখন জানতাম না। মনে-মনে একটা আশঙ্কা হয়েছিল, হয়তো ভারতে আর আমার ফিরে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। তাই আমার স্ত্রী-পুত্রকে নিজের কাছে রেখে, তাদের ভরণপোষণের মতো অর্থ উপার্জন ক'রে নেব ব'লে মনস্থ করলাম। এইভাবে মনঃস্থির করার পর জীবনবীমার ব্যাপার নিয়ে আমার মনে একটা গ্লানি উপস্থিত হয়। সেই বীমা-দালালের ফাঁদে পা দিয়েছি ব'লে মনে-মনে লজ্জাও অনুভব করি। মনে-মনে বলি, "দাদাকে যদি সত্যিই আমার পিতৃ-স্থানীয় ব'লে মনে করি, তাহলে তেমন যদি হয়, ছোটোভায়ের বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণ করার কর্তব্যকে কেন তিনি বিরাট বোঝাস্বরূপ মনে করতে যাবেন? আমি যে অন্যসকলের আগে মারা যাব, তারই-বা স্থিরতা কি? আর সত্যি বলতে কী, রক্ষণপালনের দায়িত্ব তো না-আমার, না-আমার দাদার। সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সে দায়িত্ব তাঁর আপন হাতে নিয়ে রেখেছেন। জীবনবীমা ক'রে আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিকে দুর্বল করেছি। কেন তারা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না? পৃথিবীময় লক্ষ-লক্ষ দীন-দরিদ্র লোকের পরিবারবর্গের বেলা কী হয়? কেন আমি নিজেকে তাদেরই একজন ব'লে মনে করব না?"

এইধরনের নানা ভাবনা-চিন্তা আমার মনকে আলোড়িত করতে লাগল। কিন্তু তখন-তখনই এরকম চিন্তার ভিত্তিতে কাজ করতে পারিনি। মনে পড়ে, বীমার এক কিস্তি প্রিমিয়াম আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেও দিয়েছিলাম।

বাইরের কয়েকটি ঘটনা-প্রবাহের ফলে আমার এই চিন্তাধারা পুষ্ট হতে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার প্রথম প্রবাসের সময় খ্রিষ্টান প্রভাবের ফলে আমার ধর্মচেতনা জাগ্রত হয়। এবার সে ধর্মচেতনায় শক্তি সঞ্চার করল থিয়োসফিকাল প্রভাব। মিস্টার রীচ্ নিজে ছিলেন থিয়োসফিস্ট, তিনি আমায় জোহানেস্‌বার্গ-এর থিয়োসফিস্ট সোসাইটির সঙ্গে পরিচয় করান। মতের অনৈক্য থাকায় আমি কখনো সেই সোসাইটির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইনি, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি সদস্যের নিকট সংস্পর্শে এসেছিলাম। তাঁদের সঙ্গে প্রতিদিনই আমার ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হ'ত। থিয়োসফির গ্রন্থাবলী থেকে প্রায়ই পাঠ হ'ত। কয়েকবার আমি সোসাইটির অধিবেশনে বক্তৃতাও দিয়েছি। মৈত্রীভাবের চর্চা ও প্রচারই হ'ল থিয়োসফির মুখ্য বিষয়। এই বিষয়ে সদস্যদের সঙ্গে আমার প্রভূত আলোচনা হ'ত, কথায় ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতি ঘটলে তাঁদের আমি কখনো ছেড়ে কথা বলতাম না। এইভাবে আদর্শের সঙ্গে আচরণের বিভেদ সমালোচনা করতে গিয়ে আমার নিজেরও বেশ উপকার হয়েছিল। আমি আত্মসমীক্ষা করতে শিখেছিলাম।

৫. আত্মসমীক্ষার ফল

১৮৯৩ সনে খ্রিষ্টান বন্ধুদের সান্নিধ্যে যখন আমি এসেছিলাম, তখন ধর্মীয় ব্যাপারে আমি নিতান্ত অযোগ্য ছিলাম। খ্রিষ্টান বন্ধুরা আমায় যীশুখ্রিষ্টের বাণী ব্যাখ্যা ক'রে শোনাতেন আর চেষ্টা করতেন যাতে আমি খ্রিষ্টকে আমার ধর্মগুরুরূপে স্বীকার করি। খোলা মন নিয়ে যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা আমি শুনতাম। সেইসময় আমি হিন্দুধর্ম বিষয়ে যথাসাধ্য পড়াশুনো করতাম ও চেষ্টা করতাম অন্যান্য ধর্মের সার সত্য বুঝতে।

১৯০৩ সনে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল অন্যরকম। থিয়োসফিস্ট বন্ধুরা খুবই চাইতেন আমায় তাঁদের সোসাইটিতে টানতে। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য ছিল আমার মতো একজন হিন্দুর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় কি-না। থিয়োসফির ধর্মীয় সাহিত্যের ওপর হিন্দুধর্মের ওতপ্রোত প্রভাব থাকায়. আমার এই বন্ধুরা মনে করেছিলেন এই সাহিত্য ভালো ক'রে বুঝতে গিয়ে তাঁরা হয়তো আমার কাছ থেকে কিছু সহায়তা পাবেন। তাঁদের অবশ্য আমি বলেছিলাম, আমার সংস্কৃতের জ্ঞান যৎসামান্য, হিন্দু শাস্ত্রাদি আমি মূল সংস্কৃতে পড়িনি, এমন-কি অনুবাদেও যতটুকু পড়েছি তা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা যায় না। কিন্তু পুনর্জন্মে ও পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারে বিশ্বাস থাকার ফলে, তাঁরা অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন যে আমার কাছ থেকে নিশ্চয় কিছু-কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। আমার অবস্থা হ'ল অনেকটা এরণ্ডহপি দ্রুমায়তে মতন। কয়েকজন থিয়োসফিস্ট বন্ধুর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ এবং অন্য কয়েকজনের সঙ্গে এম. এন. দ্বিবেদীর রাজযোগ ব্যাখ্যান আমি পড়তে শুরু ক'রে দিলাম। একজনের সঙ্গে পতঞ্জলির *যোগসূত্র* পড়তে হ'ত। আর *ভগবদ্‌গীতা* তো পড়তাম

একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে। আমরা একটি সাধনা-সমিতির পত্তন করেছিলাম, সেইখানে নিয়মিত পাঠ ও অধ্যয়ন চলত। *গীতা*-র প্রতি আমার তো আগের থেকেই অনুরাগ ও আস্থা ছিল। এখন মনে হ'ল *গীতা*-র গভীরে প্রবেশ করা উচিত। আমার নিজের কাছে যে দু-একটি অনুবাদ ছিল, সেগুলি অবলম্বন ক'রে মূল সংস্কৃত বোঝবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। সেইসঙ্গে স্থির করলাম, প্রতিদিন *গীতা*-র দু-একটি শ্লোক মুখস্থ করব। সকালবেলা স্নানাদি সারবার সময় আমি শ্লোক মুখস্থ করতাম। দাঁত মাজতে আমার সময় লাগত পনরো মিনিট এবং স্নানে কুড়ি—এই পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় ছিল *গীতা*-র-শ্লোক মুখস্থ করার জন্য বরাদ্দ। আমি দাঁত মাজতাম সাহেবদের মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। চিরকুট কাগজে *গীতা*-র শ্লোক লিখে আমি সামনের দেওয়ালে সেঁটে রাখতাম ও মনে রাখার জন্য মাঝে-মাঝে একনজরে চিরকুটটা দেখে নিতাম। ওই পঁয়ত্রিশ মিনিটকাল সময়ে প্রতিদিনের বরাদ্দ শ্লোক মুখস্থ করা ও আগের মুখস্থ অংশ ঝালিয়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট ব'লে মনে হ'ত। মনে আছে, এইভাবে আমি *গীতা*-র তেরোটি অধ্যায় মুখস্থ ক'রে নিয়েছিলাম। পরে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবার ফলে এবং সত্যাগ্রহের জন্ম নেবার পর তার পরিচর্যায় সমস্ত ভাবনা-চিন্তা নিয়োগ করার ফলে, অন্য-কোনোদিকে আমার মন দেবার অবকাশ তখনো পাইনি, আজও পাই না। *গীতা* মুখস্থ করার কাজ আমি এইভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।

আমার সেই বন্ধুদের ওপর এই *গীতা* পাঠের প্রভাব কতটা কার্যকর হয়েছিল, সে তাঁরাই বলতে পারবেন। আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি, জীবনের পথে চলতে গিয়ে *গীতা* সবসময় আমায় ঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। ইংরেজি কথার অর্থ অজানা হ'লে যেমন অভিধান দেখে অর্থ নির্ণয় করি, তেমনি সঙ্কটে-বিবাদে-সংশয়ে আমি *গীতা*-র শরণ নিয়ে আমার কর্তব্য নির্ণয় করি। আমার দৈনন্দিন ব্যবহার-জীবনের অভিধান হ'ল *গীতা*। *গীতা*-র 'অপরিগ্রহ' ও 'সমভাব' প্রভৃতি কথার ব্যঞ্জনা আমার সমস্ত মনকে যেন অধিকার ক'রে থাকত। সমভাবের চর্চা করা যায় কী উপায়ে, কেমন ক'রে ভাবের সমতা সংরক্ষণ করা যায়—এইসব প্রশ্ন আমায় পেয়ে বসত। যেসব রাজকর্মচারী লাঞ্ছনা অপমান করে, যাদের আচরণ রূঢ় ও অশিষ্ট, যারা অন্যায়পরায়ণ, যেসব প্রাক্তন সহকর্মী অনর্থক বিরুদ্ধতা ক'রে দূরে স'রে গেছে আর যারা সর্বদা উপকার করেছে—এদের সকলের সঙ্গে কেমন ক'রে সমভাবে আচরণ করা যায়? নিজের বলতে যা-কিছু আছে তা পরিহার করা যায় কী উপায়ে? আমাদের দেহ-ই তো পরিগ্রহবিশেষ। আর স্ত্রী-পুত্র পরিবার একপ্রকার পরিগ্রহ নয় কি? আল্‌মারি-ভর্তি আমার যে বইগুলি আছে, সেগুলি কি তাহলে নিঃশেষে নষ্ট ক'রে দেব? আমার বলতে যা-কিছু আছে সব পরিত্যাগ ক'রে কি তাঁর অনুগামী হব? এসব নানা প্রশ্নের সোজা জবাব যা পেলাম তা হ'ল এই যে তাঁকে পেতে হ'লে সব-কিছু ছাড়তে হবে। ইংরেজি আইন আমার সংশয়ে সহায় হ'ল। আইনে সমতা-নীতি অথবা 'একুইটি' বিষয়ে স্নেল্‌ যেসব আলোচনা করেছেন, সেগুলি মনে প'ড়ে গেল। *গীতা*-র আলোকে আমি যেন 'ট্রাস্টি' বা ন্যাসিক কথাটার তাৎপর্য আরো ভালো ক'রে বুঝতে শিখলাম। আইনশাস্ত্রের ওপরই আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল, তার মধ্যে আমি ধর্ম দেখতে পেলাম। *গীতা*-র অপরিগ্রহ অর্থে আমি

এই বুঝলাম যে মুমুক্ষু যিনি হবেন তাঁকে আচরণ করতে হবে ন্যাসিক অথবা ট্রাস্টির মতন। ট্রাস্টির হাতে প্রচুর বিত্তসম্পদ থাকতে পারে, কিন্তু তার একটি পাই-পয়সাও তিনি নিজের ব'লে মনে করেন না। হৃদয়ের পরিবর্তন ও স্বভাবের পরিবর্তন ব্যতিরেকে মানুষ যে অপরিগ্রহ ও সমভাবের চর্চা করতে পারে না—এটা আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। যে ভগবান আমাকে ও আমার স্ত্রী-পুত্রকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাদের দেখাশোনা করবেন—এই বিশ্বাস আমার মনে সুদৃঢ় হবার ফলে আমি অতঃপর রেবাশংকর ভাইকে লিখি তিনি যেন আমার সেই জীবনবীমার পলিসিটা বাতিল হয়ে যেতে দেন। কিছু উদ্ধার করা যায় তো ভালো, নয়তো যেন মনে করেন যে টাকাটা জলে ফেলা হয়েছে। আমার পিতৃ-প্রতিম দাদাকে চিঠি লিখে জানাই যে এতদিন ধরে যা-কিছু সঞ্চয় করেছি, সব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি। এবার থেকে তিনি যেন আমার আশা ছাড়েন, কারণ এরপর যদি কিছু উদ্‌বৃত্ত হয়, সেসমস্ত এখানকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা হবে।

দাদাকে এ কথাটা বোঝাতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শক্ত ভাষায় তিনি আমায় তাঁর প্রতি আমার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন ; আর বলেন, আমি যেন আমাদের বাবার চেয়ে বুদ্ধিমান্ হতে না-চাই অর্থাৎ তিনি যেমন ঘর-সংসার প্রতিপালন করতেন, আমি যেন তাই করি। উত্তরে আমি বলি যে আমি তো ঠিক বাবার মতোই কাজ করতে চাই। গৃহ-পরিবারের অর্থ একটু যদি বিস্তৃত ক'রে দেখা যায়, তাহলে আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা তিনি আরো ভালো ক'রে বুঝতে পারবেন।

দাদা আমার আশা ছেড়ে দেন, চিঠিপত্র লেখাও একপ্রকার বন্ধ করেন। এতে আমি গভীর দুঃখ পাই। কিন্তু কর্তব্যের পথ ছেড়ে দিতে হ'লে আমার দুঃখ গভীরতর হ'ত। তাই এই দুটি বিকল্পের মধ্যে গৌণটিকেই আমায় বেছে নিতে হ'ল। এতে অবশ্য দাদার প্রতি ভক্তি বা অনুরাগ আমার বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তিনি যে আমার আচরণে ব্যথিত হয়েছিলেন, তার কারণ এই যে তিনি আমায় আন্তরিক স্নেহ করতেন। আমার পয়সা তিনি যতটা-না চাইতেন তার চেয়ে অনেক বেশি চাইতেন যে আমি আমার সংসারধর্মের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করি। তাঁর জীবনের শেষভাগে তিনি আমার মনের কথাটুকু ঠিকই বুঝেছিলেন। তাঁর মৃত্যু যখন আসন্ন হ'ল, তিনি গভীর পরিতাপ-প্রকাশ ক'রে একটি চিঠিতে লেখেন যে আমি যে কাজ করেছি, তা ঠিকই করেছি, পিতা যদি পুত্রের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন, তাহলে বলব দাদা আমার কাছ থেকে মার্জনা চেয়েছিলেন। তাঁর সন্তানদের সমস্ত ভার তিনি আমার ওপরেই অর্পণ করেন এবং বলেন যেন আমার মনোমতো তাদের আমি মানুষ ক'রে তুলি। আমার সঙ্গে যাতে তাঁর দেখা হয়, সেজন্য তিনি খুবই ব্যাকুল হয়েছিলেন। তারবার্তা পাঠিয়ে তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি থাকতে পারেন কি-না, আমিও ফিরতি তার পাঠিয়ে তাঁকে আসতে বলি। কিন্তু তা আর ঘ'টে উঠল না, দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্রদের বিষয়ে তিনি যেপ্রকার আশা করেছিলেন, তা-ও আমার পক্ষে পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর ছেলেরা সেই পুরনো

আবহাওয়ায় মানুষ হবার ফলে নতুন রাস্তায় এগিয়ে আসতে পারল না। আমিও তাদেরকে ঠিক টেনে নিতে পারিনি। এতে তাদের কোনো দোষ ছিল না। স্বভাব ও সংস্কারের ধারা এমনই প্রবল যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা একপ্রকার অসাধ্যসাধন। যেসব সংস্কার জন্মার্জিত, সেগুলি কি আমরা সহজে মুছে ফেলতে পারি? তাছাড়া, মানুষ নিজেকে যেভাবে গ'ড়ে তোলে, তেমনিভাবে সে তার সন্তান ও আশ্রিতদেরও গ'ড়ে তুলতে পারবে—এরকম আশা করতে যাওয়া বৃথা।

আমার এই কথা থেকে খানিকটা বোঝা যাবে, মা-বাবা হবার দায়িত্ব কী ভীষণ কঠিন!

৬. নিরামিষের প্রতি নিবেদিত

এইভাবে আমার প্রতিদিনের জীবন ত্যাগের আদর্শে সহজ সরল ক'রে গ'ড়ে তুলতে লাগলাম, ধর্মচেতনা প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করতে লাগলাম। সেইসঙ্গে একটা প্রচণ্ড আগ্রহ হ'ল, কীভাবে নিরামিষ আহারের সপক্ষে প্রচারকার্য চালাতে পারি। কোনো ধর্ম প্রচার করার একটিমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় ব'লে আমি যা জানি, তা হ'ল সেই ধর্ম নিজের জীবনে আচরণ করা এবং সত্যের যাঁরা সন্ধানী—তাঁদের সঙ্গে সেই ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করা।

জোহানেস্‌বার্গ-এ একটি নিরামিষ আহারের রেস্তোরাঁ ছিল। কুহ্ন-প্রবর্তিত জল-চিকিৎসায় আস্থাবান্ এক জর্মান ভদ্রলোক ছিলেন এই রেস্তোরাঁর মালিক। আমি নিজে সেই রেস্তোরাঁতে নিয়মিত যেতাম এবং দোকানের আকার যাতে বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে আমার ইংরেজ বন্ধুদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতাম। কিন্তু দেখা গেল, ওই রেস্তোরাঁ বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যাবে না, কারণ টাকা-পয়সার অনটন তাঁর লেগেই ছিল। যতখানি সাহায্য করা উচিত বিবেচনা করেছিলাম, ততটা সাহায্য তো করেইছিলাম, কিছু টাকা-পয়সাও খরচ করেছিলাম। শেষপর্যন্ত রেস্তোরাঁটা উঠেই যায়।

থিয়োসফিস্টদের অনেকেই অল্পবিস্তর নিরামিষাশী ছিলেন। সেই সোসাইটির একজন মহিলা এগিয়ে এসে একটি বেশ জমকালো-ধরনের নিরামিষ ভোজনালয় খুললেন। কারুশিল্পে তাঁর রুচি ছিল। তাঁর হাত ছিল যেমন দরাজ, হিসাবনিকাশে তেমন জ্ঞান ছিল না। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের গোষ্ঠি ছিল বেশ বড়ো। প্রথম-প্রথম তিনি ছোটো আকারেই কাজ শুরু করেছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি স্থির করলেন, বড়ো-বড়ো ঘর ভাড়া নিয়ে ব্যবসাটা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলবেন। আমায় অনুরোধ জানালেন মদৎ দিতে। তাঁর আর্থিক অবস্থা বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। একপ্রকার ধ'রেই নিয়েছিলাম যে বুঝে-সুঝে হিসেব ক'রেই তিনি এ পথে পা দিয়েছেন। তাঁকে ধার দেবার মতো টাকা-পয়সা আমার হাতে তখন মজুদ ছিল। মক্কেলদের অনেকে আমার কাছে তাদের টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখত। তাঁদের একজনের সম্মতিক্রমে তাঁর গচ্ছিত টাকা থেকে এক হাজার পাউন্ড আমি ধার দিই। মক্কেলটি ছিলেন দরাজ দিলের লোক ও অতি সহজেই লোকজনদের বিশ্বাস ক'রে বসতেন। গোড়ায় তিনি

গিরমিটিয়া হয়েই দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন। এঁর নাম ছিল বদ্রি। বদ্রি আমায় বললেন : "টাকা খয়রাত করতে যদি আপনার ইচ্ছা হয়, দিয়ে দিন। আমি এসব ব্যবসার কিছু বুঝি না। আমি কেবল আপনাকেই জানি।"

বদ্রি পরে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম করেছিলেন। জেলও খেটেছিলেন। তাঁর সম্মতিটুকুই যথেষ্ট বিবেচনা ক'রে আমি সেই হাজার পাউন্ড ধার দিয়েছিলাম।

এই ঘটনার দু-তিন মাস পরে আমি জানতে পেলাম, টাকাটা ফেরৎ পাওয়া যাবে না। এতবড়ো একটা লোকসান মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আরো অনেক ভালো কাজে টাকাটা লাগানো যেত। ও টাকা আর ফেরৎ পাওয়া যায়নি। কিন্তু সরলবিশ্বাসী বদ্রির টাকাটা বরবাদ হয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। আমার ভুলের জন্য ও বেচারি কেন প্রায়শ্চিত্ত করবে? সে তো আমাকে বৈ আর কাউকে জানত না। সুতরাং ঘাট্তি টাকাটা আমি নিজেই পূরণ করি।

কোনো-একজন মক্কেল-বন্ধুকে আমি এই ব্যাপারের কথা বলতে তিনি আমায় মিষ্ট ভর্ৎসনা সহকারে বলেছিলেন : "ভাই, আপনার মতো লোকের এরকম কাজ করাটা ঠিক উচিত হয়নি।"

এইখানে ব'লে রাখা ভালো, আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি তখনো পর্যন্ত 'মহাত্মা' হয়ে উঠিনি ; এমন-কি 'বাপুও' হইনি। বন্ধুরা আমায় স্নেহ ক'রে 'ভাই' ব'লে ডাকতেন।

মক্কেল বন্ধু আরো বললেন : "আমাদের নানান কাজে-কর্মে আমরা সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর ক'রে থাকি। ও টাকাটা কখনো আপনার হাতে ফিরে আসবে না। জানি অবশ্য, আপনি কিছুতে বদ্রির লোকসান হতে দেবেন না, নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে ঘাট্তি পূরণ ক'রে দেবেন। এইরকম সব সংস্কারের কাজে, এভাবে যদি মক্কেলদের টাকা খাটিয়ে যেতে থাকেন, সে বেচারারা মারা তো পড়বেই, আপনাকেও অল্পকিছুদিনের মধ্যে পথে বসতে হবে। কিন্তু আপনি যে আমাদের ট্রাস্টি। বুঝতেই তো পারেন, আপনি যদি পথে বসেন, তাহলে ভারতীয় সম্প্রদায়ের হিতের জন্য এতসব কাজকর্ম কিছুই বেঁচে থাকবে না। সব নষ্ট হয়ে যাবে।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই স্পষ্টবাদী বন্ধুটি এখনো বেঁচে আছেন। এঁর মতো পূতচরিত্র মানুষ আমি এপর্যন্ত কোথাও দেখতে পাইনি— না দক্ষিণ আফ্রিকায়, না অন্যত্র। কাউকে অমূলকভাবে সন্দেহ করেছেন বুঝতে যখনই পারতেন, ইনি শুধু যে সেই লোকের কাছে মার্জনা চাইতেন তা নয়, মনের ময়লাটুকু ধুয়ে ফেলার জন্য দস্তুরমতো প্রযত্ন করতেন।

বুঝেছিলাম, আমায় সময়ে সাবধান ক'রে বন্ধুটি উপকার করেছিলেন। বদ্রির টাকাটা আমি পূরণ ক'রে দিয়েছিলাম সত্য, কিন্তু ওভাবে বারবার মক্কেলের টাকা খোয়ালে, নিজের টাকা দিয়ে লোকসান মিটিয়ে ফেলা আমার পক্ষে অসাধ্য হ'ত। তাহলে বাধ্য হয়ে আমায় লোকের কাছে ধারের জন্য হাত পাততে হ'ত। ও কাজটা আমি জীবনে কখনও করিনি, তার কারণ ধার করা বিষয়ে আমার অন্তরে বরাবরই একটা জুগুপ্সা ছিল। বুঝতে পারলাম,

সংস্কারের ইচ্ছা যত প্রবলই হোক্-না-কেন, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যবস্থা করতে যাওয়া কোনোকালেই উচিত নয়। বুঝলাম, লোকেরা বিশ্বাস ক'রে আমার হাতে যে অর্থসম্পত্তি ন্যস্ত করেছিল, সে টাকা ওভাবে ধার দিয়ে, *গীতা*-র একটি মূল শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ আমি করেছিলাম। *গীতা*-য় বলে যে ব্যক্তি সমভাবী হবেন তাঁকে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না-রেখে অনাসক্তভাবে কাজ ক'রে যেতে হবে। সন্দেহ-সংশয়ের ঝড়-তুফানে সাবধান ক'রে দেবার জন্য, আমার এই ভুলের অভিজ্ঞতা হয়েছিল দীপস্তম্ভ বিশেষ।

নিরামিষ আহারের বেদীতে আমায় যে বলি উৎসর্গ করতে হয়েছিল তা ছিল অভাবিতপূর্ব ও অনীপ্সিত। নেহাৎ দায়ে প'ড়ে আমায় এই লোকসানটুকু স্বীকার ক'রে নিতে হয়।

৭. মাটি ও জলের প্রয়োগ

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সহজ ও সরল করতে গিয়ে ওষুধ-বিষুধের প্রতি আমার স্বাভাবিক বিরাগ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ডারবান্-এ যখন আমি ব্যারিস্টরি করি, কিছুকাল শারীরিক দুর্বলতা ও রাতব্যাধিতে আমি কাবু ছিলাম। সেসময় ডক্টর প্রাণজীবন মেহ্তা দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর চিকিৎসায় সে যাত্রা আমি নিরাময় হয়ে উঠি। সেই ব্যারামের পর যদ্দিন-না দেশে ফিরে আসি, আমার কোনো উল্লেখযোগ্য অসুখ-বিসুখ হয়েছিল ব'লে মনে পড়ে না।

কিন্তু জোহানেস্‌বার্গ-এ থাকতে আমার পেট ভালো ক'রে পরিষ্কার হ'ত না, আর প্রায়ই মাথা ধরত। মাঝে-মাঝে জোলাপ নিয়ে ও আহার নিয়ন্ত্রণ ক'রে শরীরটা ঠিক রাখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু শরীর-স্বাস্থ্য আমার ভালো ছিল—এমনটা বলা চলে না। কোষ্ঠ পরিষ্কারের ওষুধ-বিষুধ থেকে কবে যে নিষ্কৃতি লাভ করব, সারাক্ষণ সেই চিন্তা করতাম।

ম্যানচেস্টার শহরে প্রাতরাশ বর্জনের জন্য একটা নো-ব্রেকফাস্ট এসোসিয়েশন্ সংগঠিত হয়েছে, সে খবরটা এইসময় আমার নজরে আসে। এই সমিতির উদ্‌যোক্তারা বলেছিলেন, ইংরেজরা বারবার খায় ও বেশি-বেশি খায়। সকাল থেকে শুরু ক'রে মাঝরাত্তির অবধি ওদের খানাপিনার বিরাম নেই ব'লে, প্রতিমাসে ডাক্তারকে একটা মোটা টাকার ফি দিতে হয়। এই অবস্থার প্রতিকার করতে হ'লে অন্ততপক্ষে ব্রেকফাস্ট বা প্রাতরাশের ব্যাপারটা বাদ দিতে হয়। এসমস্ত সমালোচনা আমার বেলা ঠিক প্রযোজ্য না-হ'লেও, কেমন যেন মনে হ'ল, কয়েকটা কথা আমার বেলাতেও খাটে। তিনবেলা আমি পেট ভ'রে খেতাম, উপরন্তু বিকেলে চা-জলখাবার। স্বল্পাহারী আমি কোনোকালেই ছিলাম না। বিনা-মশলায় নিরামিষ রান্নায় যতরকম উপাদেয় আহার্য তৈরি হতে পারে, তৃপ্তি ক'রে খেতাম। সকাল ছ-সাতটার আগে বড়ো-একটা বিছানা ছেড়ে উঠতাম না। এসব কথা বিচার-বিবেচনা ক'রে আমার মনে হ'ল, সকালবেলার আহারটা আমিও যদি বাদ দিই হয়তো মাথাধরার রোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারব। সুতরাং পরীক্ষা শুরু করা হ'ল। কয়েকটা দিন বেশ কষ্ট

হ'ল, কিন্তু মাথাধরার উপসর্গটা একবারে সেরে গেল। এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারলাম, শরীর-ধারণের জন্য যতখানি প্রয়োজন, আমি তার অতিরিক্ত খেতাম।

কিন্তু এর ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের কোনো উপশম দেখা গেল না। কুহ্‌ন-এর বিধান-মতো কটি-স্নানের ব্যবস্থা করলাম। তার ফলে আরাম কিছুটা হ'ল, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময় হলাম না। ইতিমধ্যে নিরামিষ রেস্তোরাঁর সেই জর্মন মালিক অথবা অন্য কেউ একজন, আমায় প্রাকৃতিক চিকিৎসার জাস্ট-রচিত বই *Return to Nature* পড়তে দিলেন। এই বইয়ে আমি প্রথম শরীর নীরোগ করার জন্য মাটির প্রয়োগের কথা পড়ি। লেখক এমন কথাও এ বইয়ে বলেছেন যে টাট্‌কা ফলমূল ও বাদাম হ'ল মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ও প্রকৃতি-নির্দিষ্ট আহার। আর-সব খাদ্য বাদ দিয়ে কেবল ফলাহারের বিধান আমি তখনই মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু আর কালবিলম্ব না-ক'রে মাটি প্রয়োগের ব্যাপারটা আমি শুরু ক'রে দিই এবং তা থেকে আশ্চর্য সুফল লাভ করি। এই প্রয়োগের পদ্ধতি বিষয়ে দু-চার কথা ব'লে রাখা ভালো। পরিষ্কার মাটি জলে ভিজিয়ে, পাত্‌লা কাপড়ে জড়িয়ে, তলপেটের ওপর পটির মতো ক'রে বেঁধে রাখতে হয়। শুতে যাবার সময় আমি এইরকম পুল্‌টিস্‌ বেঁধে রাখতাম। রাত্রে কিংবা পরদিন সকালবেলা যখনই আমার ঘুম ভেঙে যেত, পটিটা খুলে ফেলতাম। এতে আমার কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগ একেবারে সেরে যায়। পরেও এই মাটি-চিকিৎসার প্রয়োগ বহুবার করেছি। কখনো নিজের ওপর, কখনো বন্ধুদের ওপর এবং এ নিয়ে কখনো যে আমায় আপশোস করতে হয়েছে ব'লে মনে পড়ে না। দেশে ফেরার পর ততটা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে মাটি-চিকিৎসার প্রয়োগ আমি করতে পারিনি, তার অন্যতম কারণ এই যে কোনো-একটা জায়গায় স্থায়ী হয়ে ব'সে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ আমি পাইনি। তাহলে কী হয়, মাটি ও জলের চিকিৎসায় তখনো আমার যেরকম বিশ্বাস ছিল, এখনো সেইরকমই। এখনো অবস্থাবিশেষে খানিকটা পরিমাণে মাটি-চিকিৎসা নিজের ওপর প্রয়োগ ক'রে থাকি। আমার আশেপাশে যেসব সঙ্গী-সাথী থাকেন, সুবিধে পেলেই তাঁদের বলি আমার মতো করতে।

এপর্যন্ত দু-দুইবার আমি কঠিন রোগে ভুগেছি। তবু আমার ধারণা, মানুষের ওষুধ-বিষুধ খাবার প্রয়োজন বিশেষ নেই। হাজারে নশো নিরানব্বই অসুখে সু-নিয়ন্ত্রিত পথ্য, মাটি ও জলের প্রয়োগ কিংবা ঘরোয়া টোট্‌কায় আরোগ্য লাভ করা যায়। ছোটোখাটো জ্বরজ্বালায় যারা ডাক্তার বৈদ্য বা হেকিমের কাছে ছোটে এবং হরেকরকমের ভেষজ বা খনিজ ওষুধ গেলে, তাদের কেবল যে আয়ুক্ষয় হয় তা নয়, উপরন্তু শরীরের প্রভু না-হয়ে শরীরের দাসত্ব করতে গিয়ে, নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না ও ফলে মনুষ্যত্ব পর্যন্ত খুইয়ে বসে।

রোগশয্যায় শুয়েও আমি এসব কথা বলছি ব'লে, আমার কষ্ট কেউ যেন উড়িয়ে না-দেন। আমার যেসব অসুখ-বিসুখ হয় তার কারণ আমার জানা। আমি বেশ বুঝতে পারি, সেসব অসুখের জন্য আমি নিজেই দায়ী এবং বুঝতে পারি ব'লেই ধৈর্য রক্ষা করতে পারি। সত্যি বলতে কী, আমি মনে করি, আমার নিজের অসতর্কতার ফলে যখন অসুখ হয়, ভগবান আমায় শিক্ষা দেন। আমি তাঁর সেই শিক্ষা মাথা পেতে গ্রহণ করি ও সেই কারণেই নানারকম

ওষুধ-বিষুধ খাওয়ার লোভ দমন করতে পারি। আমি জানি, আমার এই একগুঁয়েমির দরুন ডাক্তারেরা বিরক্ত হন। তবু তাঁরা আমায় প্রশ্রয় দেন ব'লেই আমায় ত্যাগ করেন না।

এবার কিন্তু অন্যপ্রসঙ্গে ছেদ টানতে হয়। আর-কিছু বলবার আগে যাঁরা এসব প্রসঙ্গ শুনছেন, তাঁদের একটু সাবধান ক'রে দেওয়া আমার উচিত। আমার বক্তব্য শুনে কেউ যদি জাস্ট-এর বই কিনে ফেলেন, তাঁরা যেন মনে না-করেন যে তিনি যা-বলেছেন তার সমস্তটাই বেদবাক্য। প্রায় সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বই যাঁরা লেখেন তাঁরা বিষয়-বিশেষের কেবল একটা দিকই তুলে ধরতে চান। কিন্তু যে কোনো বিষয় নিদেন কমপক্ষে হ'লেও সাত-সাতটা দিক থেকে দেখা যেতে পারে। পৃথক্‌ভাবে দেখলে হয়তো মনে হতে পারে, ওই সাতভাবে দেখা হ'ল যথার্থভাবে দেখা। কিন্তু তা তো সম্ভব হতে পারে না, স্থান-কাল ও পাত্রের তারতম্য অনুসারে দৃষ্টিকোণেরও অদল-বদল করতে হয়। তাছাড়া অনেক বই-ই লেখা হয় নিছক নামডাকের খাতিরে কিংবা অধিক সংখ্যায় বিক্রি হবে এই আশায়। সুতরাং যাঁরা এসব বই পড়বেন, তাঁদের উচিত বিচার-বিবেচনা ক'রে পড়া এবং বইয়ে বর্ণিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার আগে অভিজ্ঞ লোকেদের পরামর্শ নেওয়া। বিকল্পে, তাঁরা যেন এসব বই ধৈর্যসহকারে পড়েন ও সমস্ত বিষয়টা সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রে তবে যেন প্রয়োগের পথে পা বাড়ান।

৮. সাবধানবাণী

গতবার বলেছিলাম, প্রসঙ্গান্তরে না-গিয়ে মূল কথায় ফিরে যাব। এখন দেখছি গতবার যা বলেছি, তার জের টেনে কিছু বলা দরকার। মাটি-প্রয়োগের পরীক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে, আহার ও আহার্য নিয়েও আমি সেসময় কিছু পরীক্ষা চালিয়েছিলাম। সেবিষয়ে দু-চার কথা এখানে বলাটা হয় তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরে আবার এ নিয়ে কিছু বলা হয় তো দরকার হবে।

তবে আহার ও আহার্য নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা এখন কিংবা এরপরেও বিশদভাবে বলতে যাওয়া ঠিক হবে না, তার কারণ এ বিষয়ে আমার যা-কিছু বলার ছিল তা আমি *Indian Opinion* কাগজে গুজরাতিতে লেখা ও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধে বলেছি। পরে সেসব লেখার ইংরেজি অনুবাদও বেরিয়েছিল *Key to Health* নাম দিয়ে। আমার লেখা পুস্তিকাগুলির মধ্যে এই বইটি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বহুল প্রচারিত ও পঠিত হয়েছে। এমনটা কেন-যে হয়েছে তার কারণ আজও আমার কাছে ঠিক স্পষ্ট নয়। *Indian Opinion* কাগজের গ্রাহকদের জন্যই এই লেখা মূলত লেখা হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি, *Indian Opinion* পড়েননি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দেশের এমন অনেক ব্যক্তিই এই বই দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের অনেকেই আমায় চিঠিপত্র লিখে থাকেন। তাই এই পুস্তিকার বিষয়ে এখানে আমার কিছু বলা দরকার। সেখানে আমি যেসব মতামত প্রকাশ করেছিলাম, তার অদলবদল করার কোনো সঙ্গত কারণ না-থাকলেও,

প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমি এমন কতকগুলি বড়োরকমের পরিবর্তন করেছি, যার বিষয়ে হয়তো এই পুস্তিকার অধিকাংশ পাঠক খবর রাখেন না। আমার মনে হয়, তাঁদেব সেসব কথা জানানো দরকার।

আমি যা-কিছু কাজ করি সবই ধর্মভাবনা-প্রসূত। আমার অন্যান্য লেখার মতো এই পুস্তিকাও লেখা হয়েছিল ধর্মভাবনার দিক থেকে। এই পুস্তিকায় যেসব নীতি ও সিদ্ধান্তের অবতারণা আমি করেছিলাম, গভীর অনুশোচনার সঙ্গে আমার স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আজকের দিনে তার কিছু-কিছু আমি আমার নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারছি না।

শৈশবে মায়ের স্তন্য থেকে মানুষ যতটুকু দুধ খায়, তারপরে আর তার দুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না—এ বিষয়ে আমি ধ্রুবনিশ্চিত। রোদে পাকা ফল ও বাদাম-জাতীয় খাদ্য ছাড়া অন্য আহার্যে তার কোনো দরকার নেই। মাংসপেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের উপযোগী যথেষ্ট পুষ্টি মানুষ আঙুর-জাতীয় ফল ও কাঠবাদাম-জাতীয় বাদাম থেকে সংগ্রহ করতে পারে। এরকম আহার ক'রে যে মানুষ প্রাণধারণ করে তার পক্ষে যৌন ও অন্যান্য প্রবৃত্তি দমন করা সহজ। আমাদের দেশের চলিত কথায় যে বলা হয় মানুষ কেমন হবে তা নির্ভর করে তার খাদ্যাখাদ্যের ওপর, সে কথা যে কতটা সত্য তা আমি ও আমার সহকর্মীরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি। এইসব প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা আমি আমার সেই পুস্তিকায় করেছিলাম।

কিন্তু আমার এমনই দুরদৃষ্ট, ভারতে ফিরে এসে অবস্থা-দুর্বিপাকে আমার কিছু-কিছু সিদ্ধান্তের বিপরীত আচরণ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। খেড়া জেলায় যখন আমি যুদ্ধের সেপাই সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলাম, আহার্য ব্যাপারে একটা গল্‌তি হবার ফলে আমার প্রায় মরণদশা ঘটেছিল। দুধ না-খেয়ে আমার ভাঙা শরীরটাকে আবার জোড়া লাগানো যায় কি-না, আমি তার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। যেসব ডাক্তার, বৈদ্য ও বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাঁদের সকলের শরণ নিয়েছিলাম এই আশায় যে তাঁরা হয়তো দুধের বিকল্পে অন্য-কোনো পুষ্টিকর আহার্যের ব্যবস্থা দেবেন। তাঁদের কেউ ব্যবস্থা দিলেন, মুগবাটা জল, মহুয়ার তেল কিংবা বাদামের দুধ। এইসব নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে আমার শরীর জীর্ণ হয়ে গেল, কিছুতেই রোগশয্যা ত্যাগ করতে পারলাম না। বৈদ্যেরা চরক থেকে শ্লোক আউড়ে বোঝালেন, রোগ নিরাময় করতে হ'লে পথ্যাদি নিয়ে ধর্মীয় ওজর-আপত্তি অসিদ্ধ। দুধ না-খেয়ে আমি যে কী ক'রে বেঁচে থাকতে পারি, সেদিক থেকে এঁরা কিছু সহায়তা করতে পারবেন ব'লে মনে হ'ল না। আর যাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না-ক'রে বীফ্‌ টী ও ব্র্যাণ্ডির বিধান দেন, দুধ ছাড়া আমি কী ক'রে জীবনধারণ করতে পারি, সে বিষয়ে তাঁরা কী-আর বলবেন?

গোরু বা মহিষের দুধ খাবার জো ছিল না, তাহলে ব্রত ভঙ্গ হ'ত। ব্রত নেবার তাৎপর্য অবশ্য এই ছিল যে সকলরকম দুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকা। কিন্তু যেহেতু ব্রতগ্রহণের সময় গো-মাতা ও মহিষ-মাতার ছবিটুকুই আমার মনে ছিল এবং যেহেতু আমার বাঁচার ইচ্ছা প্রবল ছিল, নিজের মনকে ধোঁকা দিয়ে ব্রতের আক্ষরিক দিকটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে

তুলে, আমি ছাগলের দুধ খাব ব'লে মনঃস্থির করলাম। ছাগমাতার দুধ খেতে যখন আমি শুরু করি, আমি যে ব্রতের নিহিতার্থ ভেঙে শেষ করেছি. সে বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল টন্‌টনে।

কিন্তু সেসময় রাউলট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালনা করার একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা আমার সমস্ত চিত্ত অধিকার ক'রে আছে। আর তারই হাত ধরাধরি ক'রে এল বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। তার ফলে আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় ছেদ প'ড়ে যায়।

বলা হয়, মানুষ কী খায় কী পান করে তার সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনো সম্বন্ধ নেই, কারণ আত্মা আহার করে না, পানও করে না। বাইরে থেকে আহরণ ক'রে মানুষ যা শরীরের অভ্যন্তরে গ্রহণ করে, তা হ'ল গৌণ। মুখ্য হ'ল, যা অন্তর থেকে বাইরে এসে প্রকাশিত হয়। এসব যুক্তি-তর্কের কথা আমি জানি। এসব কথার মধ্যে কিছু যে সারপদার্থ না-আছে তা-ও নয়। তবে যুক্তি-তর্কের বিচার-বিবেচনা না-ক'রে, আমি আমার একটি দৃঢ়প্রত্যয়সিদ্ধ সত্যের কথা ব'লে ক্ষান্ত হব। আমার সে প্রত্যয়টি এই : সাধক যদি ভগবৎ-ভীরু হন ও ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে চান, তাহলে কেবল মননে বচনে সংযম অভ্যাস করলেই যথেষ্ট হবে না, কী খাওয়া উচিত কতটা খাওয়া উচিত—এই নিয়েও তাঁকে সংযমী হতে হবে।

সে যা-ই হোক্, আমি যে আমার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছি—এইটুকু বলাই যথেষ্ট বলা হ'ল না। এই নীতি গ্রহণ-বর্জন করার ব্যাপারে আমি সবাইকে সতর্ক ক'রে দিতে চাই। যাঁরা আমার প্রস্তাবিত নীতির অনুসরণে দুধ খাওয়া বর্জন করেছেন, দুধ ছেড়ে দেওয়া যদি সবদিক থেকে তাঁদের হিতের কারণ হয়ে থাকে, অথবা অভিজ্ঞ চিকিৎসক যদি সেরকম ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন, তাহলে অন্য কথা। অন্যথায় তাঁরা যেন এই পরীক্ষা থেকে বিরত হন। এ দেশে ফিরে আসার পর থেকে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ভিত্তিতে বলতে পারি যে যাদের হজমশক্তি দুর্বল অথবা দীর্ঘ রোগভোগে যারা শয্যাশায়ী, তাদের পক্ষে দুধের মতো সহজসাধ্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্য আর-কিছু নেই।

যাঁরা আমার এসব কথা শুনলেন, তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে সত্যকার অভিজ্ঞ যদি কেউ থাকেন, যিনি পুঁথিপড়া বিদ্যার ভিত্তিতে নয়, আপন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারবেন, দুধের বিকল্প এমন কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থ আছে কি-না যা না-কি দুধের মতোই পুষ্টিকর অথচ সহজপাচ্য, তেমন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে আমি বিশেষ বাধিত হব।

৯. শক্তিমানের সঙ্গে লড়াই

এবার সেই এশিয়াটিক বিভাগের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্।

জোহানেস্‌বার্গ ছিল এই বিভাগের অফিসারদের প্রধান ঘাঁটি। আমি লক্ষ করছিলাম, ভারতীয় চৈনিক প্রভৃতি এশিয়াবাসীদের রক্ষার নাম ক'রে, এঁরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন তাদের ভক্ষক। এশিয়াবাসীদের পায়ের নিচে পিষে ফেলার একটা উপক্রম এঁরা করেছিলেন। প্রায়

প্রতিদিন আমার কাছে অভিযোগ আসত : "এ দেশে যাদের প্রবেশের অধিকার আছে, তারা প্রবেশ করার পথ পাচ্ছে না। কিন্তু সে অধিকার যাদের নেই, তারা দিব্য একশো পাউন্ড ক'রে ঘুষ ঠেকিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকে পড়ছে। এই ব্যাপারের প্রতিকার আপনি ছাড়া কে আর করবে?" আমার মনেও তখন ওই একই কথা জাগছিল, এসব পাপ যদি ঝেঁটিয়ে বিদায় না-করতে পারি, তাহলে বৃথাই আমার ট্রান্সভাল্ এসে বসবাস করা।

আমি তাই সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করার কাজে লেগে গেলাম। বেশ-কিছু প্রমাণ জোগাড় ক'রে আমি পুলিশ কমিশনার-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁকে দেখে মনে হ'ল, তিনি ন্যায়পরায়ণ লোক, তাঁর কাছ থেকে হয়তো সুবিচার পাওয়া যাবে। গোড়ায় ভয় ছিল, তিনি হয়তো আমায় আদপেই আমল দেবেন না, আমার কথা গ্রাহ্য করবেন না। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল আমার সব কথা তিনি ধৈর্য ধ'রে মন দিয়ে শুনলেন আর বললেন আমার হাতে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে, সব যেন তাঁর কাছে পেশ করি। সাক্ষীদের ডেকে আনিয়ে তিনি নিজেই জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ও বুঝলেন অভিযোগটা সত্য। কিন্তু আমার মতো তিনিও জানতেন ফরিয়াদী যদি কালা আদমি হয়, শ্বেতাঙ্গ আসামী দোষী সব্যস্ত হ'লেও শ্বেতাঙ্গ জুরিরা হয়তো তার শাস্তিবিধানের সপক্ষে মত দেবেন না। তৎসত্ত্বেও পুলিশ কমিশনার বললেন, "তবু একবার দেখাই যাক্-না চেষ্টা ক'রে। জুরিরা তাদের ছেড়ে দেবে এই ভয়ে আমাদের তো উচিত হয় না এরকম দুষ্ট লোকদের ছাড়া-গোরুর মতো যদৃচ্ছা চরতে দেওয়া। এদের আমি গ্রেপ্তার করাব। আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আমার কাছে এরকম নিশ্চিতির কোনো প্রয়োজন ছিল না। একাধিক অফিসারের ওপর, আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাদের সকলের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ তো আমার হাতে ছিল না। তাই যে দু-জনের অপরাধ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না, কেবল তাদের নামে ওয়ারেন্ট জারি করা হ'ল।

আমার গতিবিধি চলাফেরার খবর গোপন রাখা সম্ভবপর ছিল না। অনেকেই জানত, আমি রোজই একরকম পুলিশ কমিশনার-এর ওখানে যাতায়াত করি ও যে দু-জন অফিসারের নামে ওয়ারেন্ট বেরুল, তাদের কয়েকটি গুপ্তচর ছিল। গোয়েন্দাগিরিতে তারা অল্পবিস্তর পটু ছিল নিশ্চয়। তারা আমার অফিসের ওপর নজর রেখেছিল ও আমি কোথায় যাই বা না-যাই সেসব খবরাখবর অফিসারদের কাছে সরবরাহ করত। এইখানে ব'লে রাখা ভালো, অফিসারদুটি লোক এতই খারাপ ছিল যে তাদের টাকা খেয়ে গোয়েন্দাগিরি করার মতো লোকও নিশ্চয় বেশি জুটত না। ভারতীয় ও চৈনিকদের সহায়তা ছাড়া, এদের দু-জনকে গ্রেপ্তার করানো কোনোপ্রকারেই সম্ভব হ'ত না।

একজন তো ফেরার হ'ল। পুলিশ কমিশনার তার নামে ফেরারী পরোয়ানা জারি ক'রে তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে ট্রান্সভাল্-এ আনিয়ে নিলেন। মামলা চলল। তাদের বিরুদ্ধে যদিচ জোর সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল, যদিচ জুরিরা জানতেন একজন তাদের মধ্যে ফেরারও হয়েছিল, তবু তারা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

এই ঘটনায় আমি খুবই হতাশ হয়েছিলাম। পুলিশ কমিশনারও বিশেষ দুঃখিত হয়েছিলেন। ওকালতি ব্যবসায় আমার যেন ঘেন্না ধ'রে গেল। ওকালতি বুদ্ধির কারসাজিতে কীভাবে পাপ বা অন্যায় ঢাকতে পারা যায়, তা দেখে এরকম বুদ্ধির প্রতি একটা ধিক্কার জন্মাল।

সে যা-ই হোক্, এই দু-জন অফিসারের অপরাধ তো ঢাকবার মতো ছিল না। তাই আদালতের বিচারে তারা খালাস পেলেও, সরকারের পক্ষে তাদের কাজে বহাল রাখা সম্ভব ছিল না। দু-জনকেই বরখাস্ত করা হ'ল। আগের তুলনায় এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্ট-এর নোংরামো কিছু-পরিমাণে কমল। ভারতীয়রাও প্রাণে একটু যেন ভরসা পেল। এই ঘটনার ফলে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেল এবং সেইসঙ্গে আমার পসারও। মাসে-মাসে ঘুষ দিতে গিয়ে যে শত-শত পাউন্ড ভারতীয়েরা অপব্যয় করছিল, তার সবটুকু না-হ'লেও কিছুটা অন্তত বেঁচে গেল। সবটুকু আর কী ক'রেই-বা বাঁচে, অসাধু যারা তাদেরও তো খেয়ে-প'রে বেঁচে থাকতে হবে! বাঁচোয়া হ'ল এইমাত্র যে মিথ্যার আশ্রয় যারা নিতে না-চায়, তাদের পক্ষে সত্যের পথে চলাটা কিছু-পরিমাণে যেন সম্ভব হ'ল।

ব'লে রাখা ভালো, লোক হিসেবে এই দুটি অফিসার যতই খারাপ হোন্-না-কেন, ব্যক্তিগতভাবে এদের প্রতি আমার কোনো বিরাগ ছিল না। তারা নিজেরাও এ কথা বেশ জানত। সঙ্কটে প'ড়ে তারা যখন আমার দ্বারস্থ হয়, আমি তাদের সাহায্য করতেও কুণ্ঠিত হইনি। আমি যদি প্রস্তাবের বিরোধিতা না-করি, তাহলে জোহানেস্‌বার্গ মিউনিসিপালিটিতে তাদের চাকরি জুটে যেতে পারে—এরকম একটি কথা তাদের এক বন্ধু এসে আমায় বললেন। আমি সঙ্গে-সঙ্গে কথা দিই যে, এতে আমি বাগড়া দেব না। তারা সে চাকরি পেয়েও গিয়েছিল।

আমার এইরকম মনোভাব ও আচরণের ফলে, যেসব অফিসারদের সঙ্গে আমার কাজ-কারবার করতে হ'ত, তারা আমার সম্বন্ধে বেশ সহজ হতে পারতেন। অনেকসময় এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্ট-এর সঙ্গে আমায় লড়াই করতে হয়েছে, কড়া-কড়া কথা শোনাতে হয়েছে। তবুও তাদের সৌহার্দ আমি হারাইনি। তখন আমি ঠিক বুঝতাম না যে এইরকমের আচরণ আমার স্বভাবসিদ্ধ। পরে বুঝতে পারি, এ আচরণ সত্যাগ্রহেরই অঙ্গবিশেষ ও অহিংসাধর্মের অন্যতম গুণ।

মানুষ ও তার কাজ এক জিনিস নয়, কর্মকে কর্মী থেকে পৃথক্ ক'রে দেখতে হয়। ভালো কাজের কদর হবে, মন্দ কাজ নিন্দিত হবে—এমনটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে লোক ভালো কাজ করেছে তাকে যেমন সমাদর করা হয়, তেমনি মন্দ যে করেছে তার প্রতি কিঞ্চিৎ মায়া-দয়া দেখানো উচিত। 'পাপকে ঘৃণা ক'রো, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা ক'রো না।'—এই নীতিকথাটুকু সহজবোধ্য হ'লেও কচিৎ-কখনো আমাদের আচরণে তার প্রতিফলন দেখি। ফলে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

এই অহিংসাই হ'ল সত্য সাধনার ভিত্তি। প্রতিদিন এ কথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে এই জমির ওপর শক্তভাবে দাঁড়াতে না-পারলে সত্যের সন্ধান করতে যাওয়া বৃথা।

রাষ্ট্রিক হোক্ বা অন্যবিধ হোক্, যে কোনো তন্ত্রের বিরোধিতা ক'রে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়তে পারি। কিন্তু ওই তন্ত্র যিনি রচনা করেছেন, তাঁকে প্রতিহত করা বা আক্রমণ করা, একপ্রকার আত্মহননের তুল্য। মানুষমাত্রেরই দোষ আছে, ত্রুটি আছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, আমরা সকলে একই স্রষ্টার সন্তান এবং আমাদের সকলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের শক্তি বহুবিচিত্র হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। কোনো একজন ব্যক্তিকে অবমাননা করলে, সেই ঐশী শক্তিকেই হেয় করা হয়, একজন কারো ক্ষতি করলে সমগ্র বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১০. একটি সুপবিত্র স্মৃতি

আমার জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী, যেন একপ্রকার ষড়যন্ত্র ক'রেই আমায় নানা জাতি ও নানা ধর্মের লোকদের নিকট-সম্পর্কে আমায় বারবার এনে ফেলেছে। তাঁদের সকলের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা থেকে একটি যে কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হ'ল এই : আপন কিংবা পর, স্বদেশী কিংবা বিদেশী, সাদা কিংবা কালো, হিন্দু-মুসলমান, পার্সি, খ্রিষ্টান বা য়িহুদি-নির্বিশেষে, যে কোনো মানুষকে আমি অন্য মানুষের থেকে তফাৎ ব'লে দেখতে পারিনি। এরকম ভেদাভেদ বা বৈষম্যের চিন্তা কখনো আমার মনে উদয় হয়নি। এটা যে আমার বিশেষ একটা গুণ এমন কথা আমি বলি না, বরঞ্চ বলব আমার স্বভাবের প্রবণতার মধ্যেই এটা কেমন ক'রে যেন রয়ে গেছে। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ প্রভৃতি গুণগুলি অর্জন করার জন্য যেমন সক্রিয় ও সচেতনভাবে আমায় সতত সাধনা করতে হয়, এই অভেদবোধ লাভ করতে গিয়ে আমায় সেরকম কোনো কষ্ট করতে হয়নি।

ডারবান্-এ আমি যখন প্র্যাক্‌টিস্ করি, আমার অফিসের কেরানীরা অনেকসময় আমার বাসায় বসবাস করতেন। তাদের কেউ ছিল হিন্দু, কেউ-বা খ্রিষ্টান, অথবা প্রদেশের হিসেবে কেউ গুজরাতি, কেউ তামিল। তাদেরকে আমি আপনারজন ব'লেই মনে করতাম, অন্য-চোখে তাদের দেখেছি ব'লে আমার মনে পড়ে না। তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতাম যেন তারা আমার পরিবারেরই লোক। আমার এই আচরণে কোনোপ্রকার বাধা সৃষ্টি করলে আমার স্ত্রীকেও আমি ছেড়ে কথা কইতাম না। তাঁর সঙ্গে বচসা কিংবা মন কষাকষিও হ'ত। আমার এক খ্রিষ্টান কেরানী ছিলেন, তাঁর মা-বাবা ছিলেন অচ্ছুৎ পঞ্চম জাতির লোক।

ডারবান্-এ আমাদের বাসাটা ছিল বিলিতি-ধরনে তৈরি। কোনো কামরায় জল নিকাশের ব্যবস্থা ছিল না ব'লে, প্রত্যেক কামরায় পায়খানার বদলে মলমূত্র ত্যাগের জন্য চেম্বারপট্-এর ব্যবস্থা ছিল। মেথর কিংবা চাকর দিয়ে এসব তোলা পায়খানা সাফ্ করাতাম না। সাফ্ করতেন আমার স্ত্রী অথবা আমি। যেসব কেরানী সম্পূর্ণ ঘরের লোক ব'নে যেতেন তাঁরা অবশ্য নিজেদের চেম্বারপট্ নিজেরাই সাফ্ করতেন। কিন্তু খ্রিষ্টান কেরানীটি নবাগত, সুতরাং তার শোবার ঘরের দেখাশুনো তদারকির কাজ করাটা ছিল আমাদের দু-জনের কর্তব্যবিশেষ। ইতিপূর্বে এরকম নবাগতদের পট্ আমার স্ত্রী যে পরিষ্কার না-করেছেন এমন নয়। কিন্তু

ওই অচ্ছুৎ পঞ্চম-এর ব্যবহার-করা পট্‌টা সাফ্ করবেন কী ক'রে? এই নিয়ে আমাদের ঝগড়া শুরু হ'ল। আমি যে পট্‌গুলি পরিষ্কার করি তা-ও তিনি সইতে পারছেন না, অথচ তাঁর নিজেরও সংস্কার ও প্রবৃত্তিতে বাধছে। আজকের দিনেও চোখ বুজলে স্পষ্ট দেখতে পাই, কস্তুরবা কাঠের সিড়ি বেয়ে নামছেন, হাতে তাঁর সেই পট্, চোখ থেকে তাঁর লাল আগুন যেন ঠিক্‌রে পড়ছে, গাল বেয়ে পড়ছে মুক্তোর বিন্দুর মতো চোখের জল, মূর্তিমতী তিরস্কারের মতো তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার প্রেম ছিল নিষ্ঠুর। আমি ভাবতাম, আমি তো কেবল ওঁর স্বামী নই—ওঁর শিক্ষকও। শিক্ষা তাঁকে যা দিতাম তার মূলে ছিল আমার অন্ধ ভালোবাসার অত্যাচার।

তিনি যে পট্ নিয়ে নিচে নেমে এলেন, তা আমার কাছে যথেষ্ট ব'লে মনে হ'ল না। তাঁকে এ কাজ করতে হবে প্রসন্নমনে, হাসিমুখে। গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বললাম, "আমার বাড়িতে এসব ন্যাকামো চলবে না।"

আমার কথাগুলো যেন তীরের মতো তাঁকে গিয়ে বিঁধল।

তিনিও বেশ চেঁচিয়েই জবাব দিলেন : "বেশ তো, তোমার ঘর নিয়ে তুমি থাকো। আমায় চ'লে যেতে দাও।" কথাটা শুনে প্রচণ্ড রাগে আমি যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আমার অন্তরে সমস্ত দয়া-মায়ার উৎস যেন নিমেষে শুকিয়ে গেল। আমি তাঁর হাত ধ'রে, সেই অজানা অসহায় নারীকে হিড়হিড় ক'রে টেনে, সিঁড়ির উল্‌টো দিককার খিড়কি গেট অবধি নিয়ে গেলাম। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাঁকে বের ক'রে দেব এই উদ্দেশ্যে গেট্-টা খুলতে লেগেছি, ঘুরে দেখি কস্তুরবা হাপুসনয়নে কাঁদছেন, তাঁর চোখ থেকে জলের বন্যা নামছে। তিনি আমায় বললেন, "তুমি কি লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছ? চণ্ডাল রাগ কি তোমায় সব-কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে? আমায় যদি বের ক'রে দাও, আমি কোথায় যাব? এখানে আমার বাপ-দাদা কেউ নেই যে তাঁদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেব। আমি তোমার পত্নী ব'লে কি তোমার লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মুখ বুজে সব সইব? দোহাই তোমার, ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করো। গেট্-টা বন্ধ ক'রে দাও। লোকে যদি তোমার-আমার এই খেয়োখেয়ি দেখে ফেলে, কী ভাববে বলো তো।"

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল, কিন্তু ভাবখানা দেখালাম এমন যেন কিছুই হয়নি। গেট্-টা বন্ধ ক'রে চ'লে এলাম। স্ত্রী যদি আমায় না ছেড়ে যেতে পারে, আমিই-বা কি স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে পারি। এরকম বকাঝকা গালমন্দ তো আর নতুন নয়। আগেও কতবার হয়েছে ও শেষপর্যন্ত মিটেও গেছে। কস্তুরবার এমন অদ্ভুত সহনশক্তি যে প্রতিটি যুদ্ধে জয় হয়েছে তাঁর।

আজ আমি খানিকটা অনাসক্তভাবে এই ঘটনাটা যে বর্ণনা করতে পারছি, তার কারণ যে যুগে এটা ঘটেছিল, সুখের বিষয় বলতে হবে সে যুগটা আমরা পার হয়ে এসেছি। আজকের দিনে আমি আর সেই মোহান্ধ স্বামী নই, স্ত্রীর শিক্ষাগুরুও নই। কস্তুরবা যদি একহাত নিতে চান, তাহলে আমার সেযুগের বদ্ ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে পারেন সুদে-আসলে। আজ আমরা পরস্পরের প্রতি কামভাবনা-মুক্ত। অনেক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে

দিয়ে আমাদের সখ্যভাব শুদ্ধ হয়েছে। কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশা না-রেখে, তিনি আমার অসুখে-বিসুখে তদ্গত হয়ে সেবা-শুশ্রূষা ক'রে এসেছেন।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮৯৮ সনে, তখন ব্রহ্মচর্যপালনের কল্পনাও আমার মনে স্থান পায়নি। সেসময় আমি ভাবতাম, আমার স্ত্রী হলেন স্বামীর আজ্ঞাবহ নর্মসহচরী। তিনি যে আমার সহধর্মিনী, সহচরী, আমার সুখে-দুঃখে সহভাগিনী—এ কথা আমার মনেও ছিল না।

১৯০০ সন থেকে আমার ভাবের আমূল পরিবর্তন হতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত ১৯০৬ সনে একটা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু সেসব প্রসঙ্গের উল্লেখ আমি যথাস্থানে করব। এখানে এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে আমার যৌনক্ষুধার ধীরে-ধীরে উপশম ঘটার পর থেকে আমাদের সংসার-জীবনও সুখে-শান্তিতে ও মাধুর্যে ভরপুর হতে লাগল।

আমার এই স্মৃতিকথা শুনে কেউ যেন মনে-না করেন যে আজ আমরা আদর্শ দম্পতি এবং আমাদের উভয়ের লক্ষ্যে ও আদর্শে এখন সম্পূর্ণ সাযুজ্য এসেছে। আমার যে আদর্শ তা থেকে স্বতন্ত্র কোনো আদর্শ তাঁর আছে কি-না, সে বিষয়ে কস্তুরবা নিজেও হয়তো জানেন না। হয়তো আজকের দিনেও আমি এমনসব কাজ ক'রে থাকি যার সঙ্গে তাঁর মনের সায় নেই। সে বিষয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা পর্যন্ত করি না, কারণ আমি জানি আলাপ-আলোচনায় কোনো লাভ নেই। যেসময় তাঁকে লেখাপড়া শেখানো উচিত ছিল, সেসময় না তাঁর বাবা-মা, না আমি তাঁকে সেই সুযোগ দিতে পেরেছি। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু স্ত্রীর মধ্যে যে গুণ অস্বাভাবিক পরিমাণ দেখা যায়, সেই গুণ কস্তুরবার মধ্যে ছিল প্রচুর মাত্রায়। সে গুণটি হ'ল এই : ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, জ্ঞানে হোক্ অজ্ঞানে হোক্, আমার অনুগামী হওয়াটাকেই তিনি তাঁর জীবনের চরম সার্থকতা ব'লে মনে করেছেন এবং আমার সংযত জীবনযাপনের সাধনায় তিনি কখনও বাধা সৃষ্টি করেননি। জ্ঞান বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির দিক থেকে আমাদের উভয়ের মধ্যে যতই তারতম্য থাক্-না কেন, আমার সর্বদা মনে হয়েছে আমাদের মিলিত জীবনে সুখ ও সন্তোষের অভাব ঘটেনি এবং আমরা পরস্পরকে প্রগতির পথে চলতে সহায়তা করেছি।

১১. ইউরোপীয়দের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা

আমার জীবনকথার এমন একটি পরিচ্ছেদে এখন এসে পৌঁছেছি যে এবার হয়তো পাঠকদের জানানো দরকার, সপ্তাহে-সপ্তাহে কীভাবে এই কাহিনী লেখা হয়ে আসছে। লিখতে যখন শুরু করেছিলাম, তখন কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছ'কে নিয়ে নামিনি। তার সন্ধানে আমি যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, কোনো দিনলিপি বা কাগজপত্রে তার এমন-কোনো হিসেব বা বিবরণ আমি রাখতে পারিনি, যার ওপর নির্ভর ক'রে এ কাহিনী লেখা যেত। বলা যায় যে লেখার সময় তিনি যেমন লেখান, তেমন-তেমন লিখি। আমি যেসব কথা ভাবি বা যেসব কাজ করি, সেসবই যে তাঁরই প্রত্যাদেশে, এমন কথা আমি জোর ক'রে বলতে

পারি না। তবে আমার জীবনে বড়ো-বড়ো যা-কিছু কাজ করেছি, এমন-কি আমার যেসব কাজ তুচ্ছ বা নগণ্য ব'লে মনে করা হয়, সেসব যখন একবার পর্যালোচনা ক'রে দেখি, বুঝতে পারি যে তিনিই আমাকে দিয়ে এসব কাজ করিয়েছেন, এমন বলাটা হয়তো অন্যায় বলা হবে না।

আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, তাঁকে আমি জানিও না। জগৎ-সংসার ভগবানকে মানে। আমিও সেই বিশ্বাস নিজের জীবনে মেনে নিয়েছি। আমার এই ভগবৎ-বিশ্বাস এতই অনড়, এতই অটল, যে আমার কাছে এ যেন উপলব্ধি-বিশেষ। কিন্তু কথা উঠতে পারে যে, বিশ্বাসকে উপলব্ধির সমার্থক ব'লে দাবি করাটা সত্যের আলাপ করা। তার চেয়ে বরঞ্চ এই কথা বলাটাই আমার পক্ষে ঠিক হবে যে আমার ভগবৎ-বিশ্বাসের স্বরূপটা যে কেমন, তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না।

আমার এই কথা শোনবার পর, হয়তো কিছুটা সহজে লোকে বুঝতে পারবে কেন আমার মনে হয় যে তিনি আমায় যেমন লেখাচ্ছেন আমি তেমন-তেমন এই কাহিনী লিখে চলেছি। এর আগের পরিচ্ছেদটি যখন লিখতে শুরু করি, গোড়ায় তার নাম দিয়েছিলাম যে নাম দিয়েছি বর্তমান পরিচ্ছেদের। কিন্তু লিখতে গিয়ে, তার প্রস্তাবনাস্বরূপ আমার কিছু বলা দরকার। সুতরাং শিরোনাম বদ্‌লে আমায় অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হয়।

এই পরিচ্ছেদ লিখতে গিয়ে আমায় শুরুতেই একটি সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। আমার যেসব ইংরেজ বন্ধুদের বিষয়ে আমি এখন লিখতে চাই, তাদের বিষয়ে কতটুকু লিখব আর কতটুকুই-বা বাদ দেব—এ প্রশ্নটা কঠিন সমস্যা-বিশেষ। সত্যেরই সন্ধানে আলোচনা করা হয়। অবার চট্ ক'রে ঠিক বলাও যায় না কোন্-কোন্ বিষয় বা ঘটনা প্রাসঙ্গিক হবে। এমন-কি এই জীবনকথা লেখাটাও ঠিক সঙ্গত হচ্ছে কি-না সে বিষয়েও আমি এখনো স্থিরনিশ্চিত নই।

অনেককাল আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম, ইতিহাসের উপাদানরূপে আত্মজীবনী-মাত্রই অকিঞ্চিৎকর। এখন সে কথাটা যেন আমার কাছে বেশি পরিষ্কার হয়েছে। যা-কিছু আমার মনে পড়ে সেসমস্ত কথা তো আমি এই কাহিনীতে লিখছি না। সত্যের খাতিরে কতটুকু রাখতে হয় বা কতটুকু ছাড়তে হয়—সে কথাই-বা কে আমায় ব'লে দেবে? আমি এই যে আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়োভাবে আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিষয়ে একতরফা বিবরণী দিয়ে চলেছি, আইনের আদালতে আমার এই সাক্ষ্যের কী-ই-বা মূল্য? এপর্যন্ত আমি যা-কিছু বলেছি, তাই নিয়ে অনুসন্ধিৎসু কোনো লোক যদি আমায় জেরা করতে বসেন, তাহলে তিনি হয়তো অনেক বেশি আলোকপাত করতে পারবেন। আর সে ব্যক্তি যদি আমার বিরূপ সমালোচক হন তাহলে তো কথাই নেই। প্রশ্নবাণে জর্জরিত ক'রে বহু লোকের সামনে তিনি আমার সব ভণ্ডামি প্রতিপন্ন করতেন। আমার মিথ্যা দর্প চূর্ণ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারতেন।

তাই এক-একবার মনে হয় এসমস্ত কথা না-লিখলেই হয়তো হ'ত ভালো। কিন্তু আমার অন্তরাশ্রিত বিবেক যতক্ষণ-না বারণ করে, লিখে যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় নেই।

সাধু ব্যক্তিরা বলেন কাজ একবার শুরু করলে তার শেষ দেখতে হয়। সে কাজ নীতি-বিগর্হিত যদি না-হয় তাহলে তা মাঝপথে ছাড়তে নেই।

সমালোচকরা তুষ্ট হবেন এরকম ইচ্ছা নিয়ে এই জীবনকথা লিখছি না। এ লেখাটিই হ'ল সত্যের সন্ধানে আমার একরকম পরীক্ষা-বিশেষ। এই লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল আমার সহকর্মীদের মনে আশ্বাসের সঞ্চার করা ও তাদের কিছু চিন্তার খোরাক জোগানো। আর সত্য বলতে কী, তাদের অনুরোধেই তো এই লেখার সূচনা। জয়রামদাস ও স্বামী আনন্দ গোড়াতে যদি এ প্রস্তাবটা না-করতেন এবং প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার জন্য অনবরত আমার পিছনে না-লেগে থাকতেন, তাহলে হয়তো এ লেখা আদৌ ঘ'টে উঠত না। সুতরাং যদি আমার জীবনকথা লিখতে যাওয়া ভুল হয়ে গিয়ে থাকে, সে ভুলের জন্য তাঁরাও অংশত দায়ী।

এবার ইউরোপীয়দের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক্। আমার ডারবান্-এর বাড়িতে ভারতীয়রা যেমন ঘরের লোকের মতো বসবাস করতেন, তেমনভাবে আমার ইংরেজ বন্ধুরাও থাকতেন। আমার সঙ্গে থাকাটা সবারই যে ভালো লাগত এমন নয়। তাই ব'লে আমার রেওয়াজ ছেড়ে দেব, এমন পাত্র আমি ছিলাম না। সকল ক্ষেত্রে আমার এ-কাজ সমীচীন হয়েছে ব'লে বলা চলে না। তিক্ত অভিজ্ঞতা কিছু যে না-ঘটেছিল এমন নয়। কিন্তু সেসব ঘটনার সঙ্গে ভারতীয়, ইউরোপীয় উভয় শ্রেণীর লোকই জড়িত ছিলেন। সেজন্য আমার কোনো আপশোস নেই। এইধরনের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এবং প্রায়ই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের অসুবিধা ও দুর্ভাবনার কারণ হওয়া সত্ত্বেও, আমি আমার স্বভাব বদ্‌লাইনি। বন্ধুবান্ধবেরা নিজগুণে সেসমস্ত সহ্য করেছেন। অজ্ঞাতকুলশীল লোকেদের সঙ্গে আমার সংশ্রব তাদের যদি ভালো না-লেগে থাকে, আমি দ্বিধামাত্র না-ক'রে আপনার লোকেদেরই দোষ ধরেছি। যাঁরা ভগবৎ-বিশ্বাসী, তাঁরা নিজেদের মধ্যে যেমন, তেমনি অপরের মধ্যেও অর্থাৎ সর্বভূতে ভগবানকে দেখতে পাবেন ব'লে আশা করা যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা যথোচিত বীতরাগ হয়ে সকলের সঙ্গে বসবাস করতে পারেন। অন্তরঙ্গতার সুযোগ যদি আপনা থেকে এসে পড়ে তাহলে সেটা পরিহার করা যুক্তিযুক্ত নয়। বরঞ্চ সেবার ভাব নিয়ে মোহের দ্বারা প্রভাবিত না-হয়ে সে সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। তাহলেই মানুষ সকলের সঙ্গে একত্র থাকার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।

অতএব বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর, যদিও আমার বাড়িতে তিলধারণের স্থান ছিল না, জোহানেস্‌বার্গ থেকে আগত দু-জন ইংরেজ অতিথিকে আমি স্থান দিই। এঁদের দু-জনেই ছিলেন থিয়োসফিস্ট। একজনের নাম ছিল মিস্টার কিচিন। এঁর বিষয়ে পরে আরো-কিছু বলা যাবে। এই দুই বন্ধুর কারণে আমার স্ত্রীকে প্রায়ই চোখের জল ফেলতে হয়েছিল। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমার জন্য তাঁকে আরো অনেকবার কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। অনেক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে! ইংরেজ বন্ধুদের পরিবার-পরিজনের মতো নিজের বাড়িতে এনে রাখা, এই ছিল আমার প্রথম। বিলেতে থাকতে আমি ইংরেজদের বাড়িতে থেকেছি। অবশ্য তাঁরা যেমন থাকেন, সেইভাবে নিজেকে মানিয়ে চলতাম অর্থাৎ

বাড়িতে থাকা কিংবা বোর্ডিং-এ থাকার মধ্যে বিশেষ-কিছু তফাৎ ছিল না। ডারবান্-এ ছিল ঠিক তার উল্‌টো। ইংরেজ বন্ধুরা প্রায় যেন ঘরের লোক ব'নে গিয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ভারতীয় রীতি-রেওয়াজ-মাফিক চলবার চেষ্টা করতেন। বাইরের আকারপ্রকার ও আসবাবপত্রে যদিও আমার বাড়ির ধাঁচটা ছিল ইউরোপীয়, অন্দরমহলের ব্যবস্থাদি মূলত ছিল দেশজ–ভারতীয়। আমার এখনো বেশ মনে পড়ে, তাঁদের বাড়ির লোকের মতো ক'রে রাখতে যদি-বা আমাদের কিছু-কিছু অসুবিধা হয়ে থাকে, বাড়ির লোকের মতো হয়ে থাকতে এই দুই বন্ধুর কোনো অসুবিধা হয়নি। ডারবান্-এর তুলনায় জোহানেস্‌বার্গ-এ আমি অনেক বেশি ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসি।

১২. ইউরোপীয়দের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব

জোহানেস্‌বার্গ-এ থাকতে একটা সময় এসেছিল যখন আমার দফতরে ভারতীয় কেরানি ছিল চার-চারজন। কেরানি হ'লে কী হয়, তাদের আমি স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতাম। ওই চারজন লোকও আমার কাজের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। টাইপিং না-করলে অফিস চলে না–অথচ আমিই যা একটু-আধটু টাইপিং করতে পারতাম–অন্যেরা একেবারেই জানত না। কেরানিদের মধ্যে থেকে দু-জনকে টাইপিং করতে শেখালাম। কিন্তু ইংরেজিতে তারা ছিল এতই কাঁচা যে কেবল তাদের দিয়ে কাজ সামলানো শক্ত ছিল। এদের একজনকে আবার হিসেবপত্র রাখার কাজও শেখাতে হয়েছিল। নাটাল থেকে কাউকে যে আনিয়ে নেব তারও উপায় ছিল না, কারণ পারমিট্ ছাড়া কেউ তো ট্রান্সভাল্-এ প্রবেশই করতে পারত না। আমার নিজের কাজের সুবিধা হবে ব'লে পারমিট্ অফিসারের অনুগ্রহ চাইতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

এমন অবস্থায় কী করা যায়, ভেবে পাচ্ছিলাম না। বকেয়া কাজ এমন জ'মে গিয়েছিল, যে না-ওকালতির কাজ, না-জনসেবার কাজ, শত চেষ্টাতেও এঁটে উঠতে পারছিলাম না। ইউরোপীয় কোনো কেরানিকে কাজে বহাল করতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক আমার মতো কালা আদমির কাছে কাজ করতে কি রাজি হবে? তবু ভাবলাম, একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। টাইপরাইটারদের এজেন্ট এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। তাঁকে গিয়ে ধরলাম, যদি তিনি আমায় একজন স্টেনোগ্রাফার দেন। মহিলা স্টেনোগ্রাফার মিলতে পারে ; তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, তাদের মধ্যে থেকে কাউকে পাওয়া যায় কি-না, তিনি চেষ্টা ক'রে দেখবেন। সদ্য স্কট্‌ল্যান্ড থেকে আগত মিস্ ডিক্ ব'লে একটি স্কচ্ মেয়ের সন্ধান তিনি পেলেন। সৎভাবে জীবিকা অর্জন করা যায় এমন কোনো কাজ করতে মেয়েটির আপত্তি ছিল না। তাছাড়া মেয়েটি ছিল অভাবী। এজেন্ট মিস্ ডিক্-কে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাকে দেখেই আমার ভালো লাগল।

জিজ্ঞেস করলাম, "কোনো ভারতীয়ের অধীনে চাকরি করতে তোমার আপত্তি নেই তো?"

সে দ্বিধামাত্র না-ক'রে বলল, "মোটেই না।"

"কীরকম মাইনে চাও তুমি?"

"আচ্ছা, সাড়ে সতেরো পাউন্ড কি খুব বেশি হবে?"

"তোমার কাছ থেকে যেধরনের কাজ পেতে চাই, তা যদি করতে পার, মোটেই বেশি হবে না। কবে নাগাদ কাজে লাগতে পার?"

"বলেন তো, এই মুহূর্তেই।"

তার জবাবে খুব খুশি হলাম। কালবিলম্ব না-ক'রে তাকে একাধিক চিঠির বয়ান ব'লে গেলাম।

কিছুদিনের মধ্যে সে আমার মেয়ের মতো, বোনের মতো হয়ে উঠল, নিছক স্টেনোগ্রাফার আর রইল না। মিস্ ডিক্ কাজের মেয়ে, কালেভদ্রে কখনো তার কাজে হয়তো এক-আধটু খুঁত ধরতে পেরেছি। হিসেবের খাতাপত্রও থাকত তার হাতে। হাজার-হাজার পাউণ্ড-এর লেনদেন হ'ত তার হাত দিয়ে। সে পূর্ণমাত্রায় আমার বিশ্বাস অর্জন করেছিল। তার চাইতেও বড়ো কথা এই যে, আমি এতটা তার বিশ্বাসভাজন হয়েছিলাম যে সে তার মনের গোপনতম কথা, তার অন্তরাশ্রিত ভাবনা, আমায় বলতে কুণ্ঠাবোধ করত না। পতি-নির্বাচনের ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছনোর আগে, সে আমার পরামর্শ নিয়েছিল। কন্যাকে সম্প্রদান করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমারই। মিসেস্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড হবার সঙ্গে-সঙ্গে মিস্ ডিক্-কে আমার দপ্তরের কাজ ছেড়ে যেতে হয়। তাহলে কী হয়, বিবাহের পরেও যখনই কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর শরণাপন্ন হয়েছি, তিনি অকুণ্ঠভাবে সহায়তা করেছেন।

এবার মিস্ ডিক্-এর শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য একজন স্থায়ী-স্টেনোটাইপিস্ট-এর প্রয়োজন হ'ল। ভাগ্যক্রমে আরেকটি মেয়েকে এ কাজের জন্য পাওয়া গেল। ইনি হলেন মিস্ শ্লেশিন। এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটান মিস্টার কালেন্‌বাখ্—যাঁর বিষয়ে অনেক কথা পরে বলা যাবে। বর্তমানে মিস্ শ্লেশিন ট্রান্সভাল্-এর একটি হাই স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত আছেন। তিনি যখন আমার কাছে আসেন তখন তাঁর বয়স প্রায় সতেরো বা তার কাছাকাছি। তাঁর কোনো-কোনো খামখেয়ালিপনা কখনো-কখনো মিস্টার কালেন্‌বাখ্ বা আমার পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হ'ত। স্টেনোটাইপিস্ট হয়ে চাকরির খাতিরে যে সে চাকরি করতে এসেছিল এমন নয়, এসেছিল তার অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াবার জন্য। বর্ণবিদ্বেষ ব্যাপারটা মোটে তার ধাতেই ছিল না। বয়সে জ্যেষ্ঠ বা অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদেরও সে বড়ো-একটা গ্রাহ্য করত না। কাউকে যদি তার কোনো কারণে ভালো না-লাগত, তাহলে তার মুখের ওপর স্পষ্ট কথা ব'লে, তাকে অপমান করতেও তার কিছুমাত্র বাধত না। তার এইরকম ঠোঁটকাটা স্বভাবের ফলে আমায় প্রায়ই অস্বস্তিকর বিপদে পড়তে হ'ত। কিন্তু তার স্বভাবে ছলাকলা কিছু ছিল না, আসলে সে ছিল নিতান্ত সহজ সরল মানুষ। তাই তার ওপর রাগ বা বিরক্তি পুষে রাখা সম্ভবপর হ'ত না, মুহূর্তের মধ্যে সব-কিছু মুছে যেত। তার ইংরেজি আমার চাইতে ভালো ব'লে এবং তার আনুগত্যে আমার পুরোমাত্রায় আস্থা

ছিল ব'লে, অনেকসময় অদলবদল করার চিন্তামাত্র না-ক'রে তার টাইপ-করা চিঠিতে আমি সই দিয়ে দিতাম।

তার স্বার্থত্যাগের তুলনা হয় না। বেশ-কিছুকাল ধ'রে সে আমার কাছ থেকে মাসে মাত্র ছ-পাউন্ড নিত। পরবর্তীকালে অনেক ব'লে-ক'য়েও মাসে দশ পাউন্ডের বেশি নিতে আমি তাকে রাজি করাতে পারিনি। কিছু বেশি নেবার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করলে সে আমায় দস্তুরমতো ধমক দিয়ে বলত, "আপনি কি মনে করেন পয়সার জন্য আপনার কাছে আছি? আমি এখানে আছি আপনার সঙ্গে কাজ করতে আমার ভালো লাগে ব'লে, আপনি যে আদর্শ নিয়ে কাজ করছেন সে আদর্শ আমার ভালো লাগে ব'লে।"

একবার সে আমার কাছ থেকে চল্লিশ পাউন্ড চেয়ে নিয়েছিল, বলেছিল ধার যদি দিতে পারি তবেই টাকাটা নেবে, নচেৎ নয়। গত বছর সে পুরো টাকাটা শোধ ক'রে দিয়েছে। যেমন ছিল তার ত্যাগ, তেমনি ছিল তাঁর মনের সাহস। অসাধারণ কিছু-কিছু মেয়ের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ যাদের চরিত্র, শৌর্যে-সাহসে যারা বীর যোদ্ধার মতো ; তাদের মধ্যে মিস্ শ্লেশিন অন্যতম। এখন তার বয়স হয়েছে। সে যখন আমার কাছে ছিল তখন তার মনের কথা যেমন ভালো ক'রে জানতাম, আজ আর তেমন ক'রে জানি না। কিন্তু আমার অন্যান্য পুণ্যস্মৃতির মতো, এই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। তাই তার সম্বন্ধে যতটুকু আমার জানা আছে, সেটুকু যদি না-বলি তাহলে সত্যের আলাপ করা হয়।

কাজকে যখন সে ব্রতরূপে গ্রহণ করত, সে কাজ করতে গিয়ে সে দিনরাতের মধ্যে কোনো ভেদ রাখত না। কোনো জায়গায় গিয়ে জরুরি খবর পৌঁছতে হবে, মিস্ শ্লেশিন তৈরি। রাতের গভীর অন্ধকারে একা-একা বেরিয়ে পড়তে সে একটুও ইতস্তত করত না। বরঞ্চ সঙ্গে কোনো লোক দেবার কথা বললে রেগেমেগে অস্থির হ'ত। শক্ত-সমর্থ হাজারো ভারতীয় ভাই তার মুখ চেয়ে থাকত ও সে যা বলত মেনে চলত। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় নেতৃস্থানীয় সকলেই যখন জেলে ছিলাম, মিস্ শ্লেশিন একাহাতে লড়াই করেছেন। একটা সময় গেছে যখন হাজারো টাকার লেনদেন, হাজারো চিঠিপত্রের বিলিব্যবস্থা—এমন-কি *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* কাগজের পরিচালনা—সব-কিছু তাকেই করতে হয়েছে। কাজে তার কোনো ক্লান্তি ছিল না।

মিস্ শ্লেশিন-এর বিষয়ে এইরকম আরো অনেক-অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু তা না-ক'রে, তার বিষয়ে গোখলে কী বলেছিলেন সেই কথা ব'লে এই প্রসঙ্গের ছেদ টানব। আমার প্রত্যেকটি সহকর্মীকেই গোখলে জানতেন। তাদের অনেককেই তাঁর বেশ ভালো লাগত। মাঝে-মাঝে তাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ও মতামত তিনি আমায় ব্যক্ত করতেন। ভারতীয় কিংবা ইউরোপীয় আমার সকল সহকর্মীদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থান দিয়েছিলেন মিস্ শ্লেশিনকে। বলেছিলেন, "ত্যাগ, নিষ্ঠা ও অভয়—এই তিনটি গুণ মিস্ শ্লেশিন-এর চরিত্রে আমি যেমন দেখেছি, তেমনটা কদাচিৎ দেখা যায়। আমার মতে, তোমার সব সহকর্মীদের মধ্যে তার স্থান সর্বাগ্রে।"

১৩. *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন*

অন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলবার আগে, দু-চারটে জরুরি বিষয়ে এখানেই কিছু বলা দরকার। তাহলেও একজন ইউরোপীয়ের কথা আমার এখানেই বলা উচিত। কেবল মিস্ ডিক্-কে দিয়ে আমার সকরকম কাজ চালানো দুষ্কর ছিল। আমার কাজের সহায়তা করার জন্য আরো-কিছু লোকের প্রয়োজন ছিল। ইতিপূর্বে মিস্টর রীচ্-এর বিষয়ে আমি কিছু বলেছি। তাঁকে আমি ভালো ক'রেই চিনতাম। তিনি এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁকে আমি বলি, সে কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি যেন শিক্ষানবিশ এটর্নি হিসাবে আমার কাছে চ'লে আসেন। আমার এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে আসেন এবং তার ফলে আমার কাজের বোঝা অনেকটা হাল্কা হয়।

এইরকম সময়ে মদনজিৎ *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* নামে একটি কাগজ প্রকাশ করার প্রস্তাব আমার কাছে পেশ করেন ও আমার পরামর্শ চান। পূর্ব থেকেই তিনি একটি ছাপাখানার তদারকি করছিলেন, সুতরাং তাঁর প্রস্তাবে আমি সায় দিই। ১৯০৪ সনে *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* চালু করা হ'ল। কাগজের প্রথম সম্পাদক হলেন মনসুখলাল নাজর। কিন্তু সম্পাদকীয় কাজের ভারটা একপ্রকার আমার ওপরেই চাপল। দীর্ঘকাল ধ'রে এই কাগজ দেখাশোনার কাজটা একপ্রকার আমাকেই বহন করতে হয়েছে। মনসুখলাল এ কাজ চালাতে যে না-পারতেন, এমন নয়। ভারতে থাকতে তিনি বেশ-কিছুটা সময় সাময়িকপত্রের কাজ করেছিলেন। কিন্তু আমি থাকতে, দক্ষিণ আফ্রিকার জটিল সব সমস্যা বিষয়ে কিছু মতামত প্রকাশ করতে তিনি কিছুতেই ভরসা পেতেন না। আমার বিচারবুদ্ধির ওপর তাঁর গভীর আস্থা থাকায়, সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখার দায়টা তিনি আমার ওপরেই চাপিয়েছিলেন। আজকের দিনে যেমন, সেকালেও *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* বেরুত সপ্তাহে-সপ্তাহে। সূচনায় এই সাপ্তাহিকের ভাষা ছিল গুজরাতি, হিন্দি, তামিল ও ইংরেজি। আমি লক্ষ করলাম, হিন্দি ও তামিল বিভাগ রাখা হ'ত নামে মাত্র। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই দুটি ভাষার আলাদা বিভাগ রাখা, এভাবে তা সাধিত হতে পারে না। এভাবে রাখা মানে একপ্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা করা—এই মনে ক'রে আমি হিন্দি ও তামিল বিভাগ তুলে দিই।

গোড়ায় আঁচ করতে পারিনি যে এই কাগজের জন্য আমায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। অনতিকাল পরে দেখা গেল, আমি যদি পয়সা না-জোগাই, কাগজ চালু রাখা যাবে না। ভারতীয় ইউরোপীয় উভয় সম্প্রদায়ের লোকই জানত যে নামে আমি সম্পাদক না-হ'লেও, আসলে কাগজ চালাবার দায়টা আমারই। কাগজটা একেবারেই প্রকাশিত যদি না-হ'ত, তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু বের করার পর কাগজ যদি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, তাহলে টাকাকে টাকা তো যাবেই, মান-ইজ্জতও থাকবে না। অগত্যা আমাকেই টাকা ঢালতে হ'ত। শেষপর্যন্ত এমন দাঁড়াল যে আমার যাবতীয় উদ্‌বৃত্ত টাকা *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন*-এর দরুণ জলাঞ্জলি দিতে হ'ত। মনে আছে, একটা সময়ে প্রতি মাসে আমায় পচাঁত্তর পাউন্ড ক'রে পাঠাতে হয়েছে।

কিন্তু আজ এত বছর পরে যখন পিছন ফিরে তাকাই বুঝতে পারি, এই পত্রিকা প্রকৃতই

দক্ষিণ আফ্রিকা-স্থিত ভারতীয়দের প্রভূত সেবা করেছে। এই পত্রিকা থেকে আর্থিক লাভ হবে—এইধরনের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি প্রথম থেকেই ছিল না। যতদিন এ-পত্রিকা আমার হাতে ছিল, আমার জীবনযাত্রা বা ভাবধারার পরিবর্তনের সঙ্গে *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* তালরক্ষা ক'রে চলেছে। এখনকার *ইয়ং ইণ্ডিয়া* বা *নবজীবন*-এর মতো, সেকালের *ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন* আমার জীবনের একটা দিক প্রতিফলিত করেছে। প্রতিসপ্তাহে আমি এই কাগজের পাতায়-পাতায় আমার অন্তরাশ্রিত ভাবধারা ঢেলে দিয়েছি, নীতি হিসেবে সত্যাগ্রহ বলতে আমি কী বুঝি এবং কেমন ক'রে সে নীতি কার্যে পরিণত করা যায়—সে বিষয়ে বিশদভাবে বলবার প্রযত্ন করেছি। জেলে কয়েদ থাকার সময়টা বাদ দিলে, দশ বছর ধ'রে অর্থাৎ ১৯১৪ সন অবধি, *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* পত্রিকার হেন একটি সংখ্যা বের হয়নি, যেখানে আমার কোনো-না-কোনো প্রবন্ধ না-বেরিয়েছে। যথোচিত চিন্তাভাবনা বা বিচার না-ক'রে, কিংবা নিছক খুশি করার উদ্দেশ্য নিয়ে, আমি সেসব প্রবন্ধে একটি কথাও লিখিনি ; জ্ঞান-বুদ্ধি ও সাধ্য-মতো একটি কথাও বাড়িয়ে বলিনি। *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* ছিল বাক্যে ও চিন্তায় আমার আত্মসংযম সাধনার বাহন। বন্ধুবান্ধবেরা তার ভিতর দিয়ে আমার মনের নাগাল পেতেন। সমালোচকরা এসব লেখায় এমন-কিছু পেতেন না যা তাঁদের কাছে আপত্তিজনক মনে হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন*-এর সুর এমন একটা গ্রামে বাঁধা থাকত যে এর বিষয়ে কিছু বলতে গিয়ে, সমালোচকের লেখনীতে লাগাম না-পরিয়ে উপায় ছিল না। *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* যদি না-থাকত, সত্যাগ্রহের আন্দোলন চালু করা হয়তো সম্ভবপরই হ'ত না। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য সংবাদের জন্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য, পাঠকেরা গভীর আগ্রহে এই পত্রিকার পথ চেয়ে থাকতেন। মানুষের মনের কত বিচিত্র যে রঙ, কত বিচিত্র গঠন—তার একটা আঁচ আমি পেতাম এই পত্রিকার মারফৎ। তার একটা কারণ এই যে আমি নিয়ত চেষ্টা করতাম, যাতে সম্পাদকের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় অথচ স্বার্থলেশহীন হয়। অনেক পত্রলেখকের উচ্ছ্বসিত অন্তরের আবেগ বহন ক'রে অসংখ্য চিঠিপত্র আমার হাতে আসত। তাদের নিজ-নিজ স্বভাব অনুসারে কোনো-কোনো চিঠিতে থাকত সৌহার্দের সুর, কেউ-কেউ লিখত সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে, কেউ-কেউ নিছক তিক্ততা ঢেলে দিত চিঠিতে। এইসব চিঠিপত্র মন দিয়ে প'ড়ে, চিঠির মর্ম হজম ক'রে, তারপর জবাব লিখতে গিয়ে, আমার বেশ-একটা শিক্ষার সুযোগ ঘটেছিল। মনে হ'ত, এইসব চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে সমগ্র ভারতীয় সমাজ যেন আমার মুখোমুখি ব'সে তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ভাষায় প্রকাশ করছে। এ থেকে আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, সংবাদপত্রসেবীর দায়িত্ব কতখানি। ভারতীয় সম্প্রদায়ের চিন্তাভাবনা এইভাবে আয়ত্ত করার ফলে, অদূর ভবিষ্যতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত আমি করি তা কার্যকর হয়েছিল, শালীন হয়েছিল ও দুর্বার হয়েছিল।

ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন প্রকাশের প্রথম মাস থেকেই আমি বুঝতে পারি যে সাংবাদিকতার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত জনসেবা। সংবাদপত্রের শক্তি একটি প্রবল শক্তি। কিন্তু বাঁধভাঙা বন্যার জল যেমন প্রবল প্লাবনে গ্রামকে গ্রাম ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিতে পারে, ক্ষেতের পাকা

ফসল নষ্ট ক'রে দিতে পারে, তেমনি সাংবাদিকের অসংযত লেখনী নিছক কেবল ধ্বংসই ডেকে আনতে পারে। বাইরের শক্তি দিয়ে যদি এই অসংযম দমন করার চেষ্টা হয়, তাহলে তার চেয়ে অনেক ভালো সমস্ত শাসন-বারণ তুলে দেওয়া! নিয়ন্ত্রণটা যদি আত্মনিয়ন্ত্রিত হয় তাহলেই মানুষ তা থেকে উপকার লাভ করতে পারে। এইসব যুক্তি যদি ভুল না-হয়, তাহলে ভেবে দেখুন, পৃথিবীর কয়টি পত্রপত্রিকা এরকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। যেসব কাগজ নিতান্তই বেকার, সেগুলি বন্ধ করবে কে? সেগুলি যে কোনো কর্মের নয়—তাই-বা বিচার করবে কে? কাজের জিনিস আর অকাজের জিনিস, ভালো জিনিস ও মন্দ জিনিস চিরকাল পাশাপাশি চলতে থাকবে। এই দুইধরনের জিনিস থেকে মানুষ চিরকাল তার রুচি অনুসারে যে কোনো একটি বেছে নেয়।

১৪. কুলিপাড়া অথবা অচ্ছুৎ বস্তি

যেসব সম্প্রদায় সমাজের সেবায় অন্যদের তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, আমরা হিন্দুরা তাদের অচ্ছুৎ জ্ঞান ক'রে দূরে সারিয়ে রাখি। শহরের বা গ্রামের প্রত্যন্তে তারা বসবাস করে। গুজরাতিতে তাঁদের বস্তিকে বলা হয় ঢেড়বারো। অনেকে নামটা শুনলেই নাকে কাপড় দেয়। খ্রিষ্টান হওয়ার পরে ইউরোপীয়রাও একটা সময়ে য়িহুদিদের অস্পৃশ্য ব'লে মনে করত। যে অঞ্চলে তাদের থাকতে দেওয়া হ'ত, ঘেন্না ক'রে তার নাম দেওয়া হ'ত গেট্টো। আজ দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরাও যেন অচ্ছুৎ ব'নে গেছি। দেখা যাক্, এন্ড্রুজ-এর ত্যাগ ও শাস্ত্রীর ভানুমতীকি 'খেল্'-এর ফলে আমরা মানুষের মর্যাদা ফিরে পাই কি-না।

প্রাচীনকালে য়িহুদিরা ভাবত, অন্যসব জাতি থেকে আলাদা ক'রে স্বয়ং ভগবান তাদের বেছে নিয়েছেন। তাদের সেই স্বজাতি-অভিমানের দরুন অদ্ভুত অন্যায়ভাবে দণ্ড বহন করতে হয়েছে তাদের উত্তরপুরুষদের। প্রায় একইভাবে হিন্দুরা মনে করেছে তারা আর্য অথবা সুসভ্য এবং নিজেদেরই পরিজনকে অনার্য বা অস্পৃশ্যজ্ঞানে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ফলে অদ্ভুত অন্যায়ভাবে হ'লেও, নিয়তির বিধান দক্ষিণ আফ্রিকা-স্থিত হিন্দুদের কেবল নয়, মুসলমান ও পার্সিদেরও অব্যাহতি দেয়নি। ধর্মের তফাৎ থাকলেও তারা তো একই দেশের, একই বর্ণের লোক। সুতরাং হিন্দুদের সঙ্গে-সঙ্গে মুসলমান ও পার্সিদেরও একই দুর্ভোগ সইতে হয়েছে।

এবার হয়তো আপনারা খানিকটা বুঝতে পারবেন, কেন আমি বর্তমান প্রসঙ্গের নাম দিয়েছি কুলিপাড়া। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রে নাম দেওয়া হয়েছে কুলি। ভারতে কুলি বলা হয় যারা মোট বহন করে কিংবা দিন-মজুরি খাটে এমনসব লোকদের। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় কুলি কথাটার প্রয়োগ হয় অবজ্ঞাসূচক অর্থে—আমরা যে অর্থে পারিয়া বা অচ্ছুৎ কথা ব্যবহার করি। কুলিদের বসবাসের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যেসব জায়গা বরাদ্দ ক'রে দেওয়া হয়, সেসব পাড়াকে বলা হয় লোকেশন অথবা বস্তি।

জোহানেস্‌বার্গ-এ এইরকম একটি কুলি লোকেশন ছিল। অন্যান্য শহরেও লোকেশন ছিল, সেখানে ভারতীয়রা থাকত প্রজাস্বত্বের অধিকারে, তাদের কোনো মালিকানাস্বত্ব ছিল না। কিন্তু জোহানেস্‌বার্গ-এ লোকেশন-এর জমি তারা পেয়েছিল নিরানব্বুই বছরের ইজারায়। এই লোকেশন-এ বসতি ছিল ঘন। লোকেসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে-সঙ্গে লোকেশন-এর পরিধি বাড়াবার কোনো সুযোগ বা ব্যবস্থা ছিল না। লোকেশন-এর পায়খানাগুলি কোনোপ্রকারে সাফ্ করা ছাড়া, জোহানেস্‌বার্গ মিউনিসিপালিটি স্বাস্থ্যের দিক থেকে প্রয়োজনীয় অন্য-কিছু ব্যবস্থা করত না। না-ছিল ভালো আলোর ব্যবস্থা, না-রাস্তাঘাটের। লোকেশন-এর লোকদের কিসে হিত হয়, সে বিষয়ে যে মিউনিসিপালিটির বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তারা যে স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে যত্নবান্ হবে, এমন আশাই দুরাশা। বাসিন্দাদেরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন-কিছু জ্ঞান ছিল না যাতে তারা মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধান বা সহায়তা ব্যতিরেকে নিজেদের কাজ নিজেরাই ক'রে নিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যেসব ভারতীয়রা গিয়েছিল, তারা সবাই যদি এক-একজন রবিনসন ক্রুশো হ'ত, তাহলে ব্যাপার দাঁড়াত অন্যরকম। কিন্তু রবিনসন ক্রুসোরা একজোট হয়ে কোথাও যে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে সেরকম নজির মেলে না। সচরাচর লোকে বিদেশে যায় ধনের ধান্দায় অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় যেসব ভারতীয় গিয়েছিল, তাদের অধিকাংশ ছিল ভূমিহীন কপর্দকশূন্য, নির্বোধ কৃষক। উচিত ছিল, তাদের দেখাশোনা করা, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। ব্যবসায়ী কিংবা শিক্ষিত ভারতীয়েরা গিয়েছিল তাদের পরে এবং সংখ্যায় তারা ছিল যৎসামান্য।

মিউনিসিপালিটির গাফিলতি ছিল শাস্তির যোগ্য। কর্তব্যে তাদের অবহেলার সঙ্গে বাসিন্দাদের অজ্ঞানতা যুক্ত হ'লে পর, লোকেশন যে ঘোরতরভাবে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে—এতে আর বিচিত্র কী! লোকেশন-এর দুরবস্থার প্রতিবিধান করা দূরের কথা, নিজেদের অবহেলার ফলে যে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির সূত্রপাত, মিউনিসিপালিটি সেইটাকেই অজুহাত বানিয়ে, লোকেশন উচ্ছেদ করার উপক্রম করল। সেই উদ্দেশ্যে স্থানীয় বিধানসভার কাছ থেকে বাসিন্দাদের উৎখাত করার জন্য তারা এক্তিয়ার নিয়ে নিল। আমি যখন জোহানেস্‌বার্গ-এ বসবাস করব ব'লে স্থির করেছি, তখনকার পরিস্থিতি ছিল এইরকম।

লোকেশন-এর জমির ওপর বাসিন্দাদের মালিকানাস্বত্ব ছিল ব'লে, ক্ষতিপূরণের জন্য তারা ন্যায্যত দাবি করতে পারত। খেসারতের পরিমাণ ধার্য করার জন্য একটি বিশেষ ট্রাইবিউনাল গঠিত হয়েছিল। মিউনিসিপালিটি যে পরিমাণ খেসারত দেবার প্রস্তাব করত, সে প্রস্তাব অযৌক্তিক মনে হ'লে বাসিন্দারা সেই আদালতে আপিল করতে পারত। শুনানির পর আদালত যদি টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দিতেন তাহলে মামলার তাবৎ খরচখরচা বহন করতে হ'ত মিউনিসিপালিটিকে।

বেশিরভাগ বাসিন্দা এই দাবি নির্ধারণের মামলায় আমাকে তাদের উকিল নিযুক্ত করে। এই মামলা থেকে পয়সা রোজগার করব—এমন ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি তাই আমার মক্কেলদের বলেছিলাম যে তারা যদি জেতে, তাহলে ট্রাইবিউনাল মামলার খরচখরচা বাবদ

যা সব্যস্ত ক'রে দেবেন সেটুকু পেলেই আমি খুশি হব। তাছাড়া, মামলার ফলাফল যাই হোক্‌-না-কেন, দলিল-পিছু আমায় দশ পাউন্ড দক্ষিণা দিতে হবে। এ কথাও ওদের বলেছিলাম, মামলার দরুণ ওরা আমায় যে টাকা দেবে, তার আদ্ধেকটা আমি আলাদা রেখে দেব এবং সেই টাকায় গরীবদের জন্য একটা হাসপাতাল বা সেইরকম কোনো-একটা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলব ব'লে আমার ইচ্ছা। আমার এই কথায় তারা সকলেই বেশ খুশি হয়েছিল—খুশি তো হবারই কথা।

প্রায় সত্তরটা মামলার মধ্যে কেবল একটিতেই আমাদের হার হয়। সুতরাং হরেদরে দক্ষিণা যা পাওয়া গিয়েছিল, সে মোটা অঙ্কের। কিন্তু *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন*-এর দাবির আর অন্ত ছিল না। যদ্দূর মনে পড়ে, ওই টাকা থেকে প্রায় ষোলশো পাউন্ড গিয়েছিল *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন*-এর পেটে। এই মামলাগুলির জন্য আমায় বেশ খাটতে হয়েছিল। মক্কেলরা সবসময় আমায় ঘিরে থাকত। এদের বেশিরভাগ গোড়ায় এসেছিল গিরমিটিয়া হয়ে বিহার অঞ্চল থেকে অথবা দক্ষিণ ভারত থেকে। গিরমিটের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পর এরা স্বাধীনভাবে দোকানপাট পত্তন ক'রে দিন গুজরান করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে যেসব ভারতীয় বেপারী স্বেচ্ছায় দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিল, তাদের নিজেদের একটা সঙ্ঘ ছিল। প্রাক্‌-গিরমিটিয়া বেপারীরা যেসব বিশেষ-বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হ'ত, সেগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য তাদের এক আলাদা প্রতিষ্ঠান ছিল। এদের মধ্যে কেউ-কেউ ছিলেন যাদের উদার মন ও মহৎ চরিত্র। এদের নেতৃস্থানীয় লোকেদের মধ্যে ছিলেন সঙ্ঘের সভাপতি শ্রী জয়রাম সিং, আর ছিলেন শ্রী বদ্রি—যিনি সভাপতি না-হ'লেও সভাপতির সমতুল্য ছিলেন। এ দু-জনের মধ্যে কেউই আর ইহজগতে নেই। এঁদের কাছ থেকে আমি প্রচুর সহায়তা পেয়েছিলাম। শ্রীবদ্রির সঙ্গে পরে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিনি এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এদের দু-জনের ও অন্য বন্ধুদের মধ্যস্থতায় আমি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় বহু বাসিন্দার নিকট-সংস্পর্শে আসি। মামলা-মোকদ্দমায় শুধু যে তাদের আইন-উপদেষ্টা আমি ছিলাম, তা নয়। আমি একেবারে যেন তাদের ভাই ব'নে গিয়েছিলাম, ঘরে-বাইরে তাদের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার অংশীদার হয়েছিলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা আমায় কী ব'লে ডাকত, আপনারা হয়তো জানতে চাইবেন। আমায় কেবল গান্ধী ব'লে ডাকতে আবদুল্লা শেঠের ঘোরতর আপত্তি ছিল। আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে, তিনি বা অন্য কেউ আমায় সাহেব ব'লে মনে করেননি বা সাহেব ব'লে ডেকে আমায় অপমান করেননি। আবদুল্লা শেঠ আমার একটি সুন্দর নাম চালু করেন, সে নাম হ'ল ভাই। তাঁর এই ভাই ডাকে, অন্যেরাও আমায় ভাই ব'লে ডাকতে শুরু করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে চ'লে আসা পর্যন্ত আমায় সকলে ভাই ব'লেই ডাকত। প্রাক্‌-গিরমিটিয়াদের মুখে আমার এই ভাই সম্বোধনটুকু ভারি মধুর লাগত।

১৫. প্লেগ : ১

মিউনিসিপালিটি লোকেশন-এর মালিকানা পেল সত্য, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয়দের সেখান থেকে উঠিয়ে দিল না। লোকেশন-এর বাসিন্দাদের উপযোগী নতুন জায়গাজমি বাড়িঘর না-কেনা পর্যন্ত, কী ক'রেই-বা উচ্ছেদ করে। এ কাজটা মিউনিসিপালিটির পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না, সুতরাং তারা একপ্রকার বাধ্য হয়েই নোংরা ভারতীদের সেই নোংরা লোকেশন-এ থাকতে দেয়। এখন অবশ্য নোংরামির মাত্রা একেবারে চরমে উঠল। যে জমিতে এককালে ভারতীয়রা ছিল মালিক, এখন সেখানে তারা মিউনিসিপালিটির প্রজামাত্র। ফলে ঘরবাড়ি ও আশেপাশের পরিবেশ একেবারে কদর্য হয়ে উঠল। যখন মালিক ছিল, তখন খানিকটা আইনের ভয়ে বা অন্য কারণে তারা তবু খানিকটা পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করত। মিউনিসিপালিটি এখন নতুন মালিক। তাদের সেরকম কোনো ভয়ডরের বালাই নেই। বাড়িগুলোতে বাসিন্দাদের সংখ্যা যেমন-যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি স্তূপাকার হয়ে উঠল আবর্জনা ও অব্যবস্থা।

এইরকম অবস্থা দেখে ভারতীয়দের মন যখন একেবারে বিষিয়ে গেছে—ঠিক সেইসময়েই লাগল প্লেগ এবং মড়ক। এ আবার মারীর মধ্যে মহামারী—ফুসফুসের প্লেগ, যা না-কি গ্রন্থির প্লেগ-এর তুলনায় অনেক বেশি মারাত্মক ও সাঙ্ঘাতিক।

খুব বরাতজোর বলতে হবে, এই কালা প্লেগ-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিল জোহানেস্‌বার্গ-এর উপকণ্ঠে এক সোনার খনির মজদুরদের বস্তিতে—ভারতীয়দের লোকেশন-এ নয়। এই খনি-মজদুরদের বেশিরভাগ ছিল নিগ্রো। তাদের বস্তি পরিষ্কার-পরিচ্ছিন্ন রাখার পুরোপুরি দায়িত্ব ছিল খনির শ্বেতাঙ্গ মালিকদের। ওই খনিতে কিংবা খনির আনুষঙ্গিক কাজে কিছু ভারতীয়ও নিযুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে থেকে তেইশজনের হঠাৎ ছোঁয়াচ লাগে। একদিন সন্ধেবেলা তারা রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাদের লোকেশন-এর বাসায় ফিরে আসে। মদনজিৎ ঠিক সেইসময় লোকেশন-এ উপস্থিত ছিলেন, *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* কাগজের জন্য চাঁদা ও গ্রাহক সংগ্রহ করার কাজে। তাঁর হৃদয়ে ভয়ডর ব'লে কোনো পদার্থ ছিল না। মহামারীর কবলে এই তেইশজনের দুরবস্থা দেখে তিনি প্রাণে গভীর ব্যাথা পান। তৎক্ষনাৎ তিনি পেন্সিলে একটি চিরকুট লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। চিরকুটে লেখা ছিল, "এখানে হঠাৎ কালা প্লেগ দেখা দিয়েছে। অগৌণে চ'লে আসুন ও কালবিলম্ব না ক'রে যেমন-যেমন ব্যবস্থা করা দরকার তার উদ্‌যোগ করুন। তা না-হ'লে সাঙ্ঘাতিক অবস্থা দাঁড়াবে। পত্রপাঠ চ'লে আসবেন।"

লোকেশন-এ একটি বাড়ি খালি প'ড়ে ছিল। মিউনিসিপালিটির তোয়াক্কা না-ক'রে মদনজিৎ সেই বাড়ির তালা ভেঙে, সেইখানে সব রোগীদের সরালেন। আমি কিছুক্ষণ বাদে সাইকেল যোগে লোকেশন-এ যাই। সেখানে পৌঁছেই টাউন-ক্লার্ককে চিঠি লিখে খবর দিই কী অবস্থায় এবং কোন্ কারণে তালা ভেঙে বাড়িটা আমাদের দখল করতে হয়েছে।

ডক্টর উইলিয়াম গডফ্রে তখন জোহানেস্‌বার্গ-এ প্র্যাক্‌টিস্ করছেন। খবর পেয়েই তিনি

আমাদের সেই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে এলেন। একাহাতে তিনি ডাক্তার ও নার্স-এর কাজ করতে শুরু ক'রে দিলেন। কিন্তু একজন নয়, দু-জন নয়, তেইশজন রোগীদের সামলানো, আমাদের তিনজনের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে নির্মল অন্তর নিয়ে যদি চাওয়া যায় তাহলে সঙ্কটে-বিপদে সহায়-সম্বল যেন আপনা থেকে জোটে। তখন আমার দফতরে ভারতীয় কর্মী ছিলেন চারজন—কল্যাণদাস, মানেকলাল, গুণবন্তরায় দেশাই ও আরেকজন যার নাম এখন আর আমার মনে পড়ে না। কল্যাণদাসকে তার বাবা আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। সুখের বিষয়, সেসময় কল্যাণদাস ছিলেন অবিবাহিত, সুতরাং দ্বিধামাত্র না-ক'রে তার ওপর আমি এমনসব কাজের ভার চাপাই যার মধ্যে দস্তুরমতো বিপদ-আপদের ঝুঁকি ছিল। খাস জোহানেস্‌বার্গ থেকে আমি মানেকলালকে সংগ্রহ করেছিলাম। যদ্দূর স্মরণ হয়, সেসময় তারও বিয়ে হয়নি। এদের কেরানি বলুন কিংবা আমার সহকর্মী বলুন বা আমার পুত্রই বলুন—আমি এই চারজনকেই এই সেবার কাজে আহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কল্যাণদাসের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করার কোনো প্রসঙ্গই ছিল না। অন্যদের জিজ্ঞেস করামাত্র জবাব এল : আপনি যেখানে আমরাও সেখানে। দুটি-চারটি কথা—কিন্তু কত মধুর লাগল সে কথা শুনে।

মিস্টার রীচ্-এর সংসার ছিল বড়ো—আশ্রিতের সংখ্যা বেশি। এ কাজে ঝাঁপ দিতে পারলে তিনি খুশি হতেন, প্রস্তুতও ছিলেন। আমিই তাকে বারণ করলাম। তাঁকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে আমার মন সরছিল না একেবারেই। সুতরাং তাঁকে বিপজ্জনক এলাকার বাইরের কাজ সামলাবার ভার দেওয়া হ'ল।

সেবাকার্য ও রাত্রি-জাগরণের সেই একটা রাত ছিল একটানা আতঙ্কের। ইতিপূর্বে আমি অনেক রোগীর পরিচর্যা করেছি কিন্তু কালা প্লেগ-এ আক্রান্ত রোগীদের সেবা করা, সেই আমার প্রথম। ডক্টর গডফ্রে-র সাহস দেখে আমরাও সাহসে বুক বাঁধলাম। পরিচর্যার দিক থেকে বিশেষ-কিছু করার মতো কাজ ছিল না। যথাসময়ে দাগ ধ'রে ওষুধ খাওয়ানো, তারা কী চায় না-চায় তার তদারকি করা, রোগীদের শরীর ও বিছানাপত্র সাফ্‌সুতরো রাখা ও তাদের মনে আশ্বাস সঞ্চার করা—এসব ছাড়া আর কি-ই-বা কাজ করতে পারতাম।

সেই চারটি তরুণ যেরকম অদম্য উৎসাহে ও সাহসে নির্ভর ক'রে সেবার কাজ করেছিল তা দেখে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। ডক্টর গডফ্রে আর মদনজিতের মতো একজন অভিজ্ঞ লোক যে ভয়ে মুষড়ে পড়বেন না, সে তো তবু বোঝা যায়। কিন্তু এই চারজন অনভিজ্ঞ তরুণের আচরণ ছিল একেবারে অভাবনীয়।

যতদূর মনে পড়ে, মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে গিয়ে সে রাতটা আমরা জয়ী হয়েছিলাম।

কিন্তু সমস্ত ঘটনাটি দুঃখের হ'লেও আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে ও আমার ধর্মভাবনার দিক থেকে এ ঘটনার তাৎপর্য এমন গভীর যে আমার মনে হয়, আর দুটি কিস্তি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আমি এই প্রসঙ্গের ছেদ টানতে পারব না।

১৬. প্লেগ : ২

খালি বাড়িটার তালা খুলে সেখানে প্লেগ-এর রোগীদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করেছিলাম ব'লে, টাউন-ক্লার্ক আমায় কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি একপ্রকার খোলাখুলি স্বীকার করেন যে ওইরকম জরুরী অবস্থায় কালবিলম্ব না-ক'রে টাউন-কাউন্সিল কোনো ব্যবস্থা করতে পারতেন না। সেইসঙ্গে কথা দেন যে তাদের সাধ্যে যতটুকু কুলায়, ততটুকু সহায়তা তাঁরা আমাদের দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত হবার পর তাঁরা যথাসত্বর প্রতিকারের চেষ্টায় উদ্‌যোগী হলেন।

পরদিন মিউনিসিপালিটি আমায় একটি খালি গুদামঘর দখল করার কথা ব'লে প্রস্তাব করেন, আমি যেন রোগীদের সেখানে স্থানান্তর করি। কিন্তু তাঁরা সেই গুদামঘর সাফ্‌সুতরো ক'রে দেবার দায়িত্ব নিলেন না। অব্যবহারের ফলে গুদামঘরটা ছিল ভীষণ নোংরা। আমরা নিজেরাই কয়েকজন হাত লাগিয়ে বাড়িটা যথাসম্ভব পরিষ্কার ক'রে ফেলি। কয়েকজন দয়ালু ভারতীয়দের কাছ থেকে দানস্বরূপ কয়েকটি তক্তপোশ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় ক'রে, একটা অস্থায়ীধরনের হাসপাতাল খাড়া করি। মিউনিসিপালিটি থেকে একজন নার্স এলেন ব্র্যান্ডির বোতল ও অন্য-কিছু ওষুধপত্তর ও সরঞ্জাম নিয়ে। ডক্টর গডফ্রে-র হাতেই থাকল হাসপাতালের ভার।

নার্স-মহিলাটির হৃদয়ে বেশ দয়া-মায়া ছিল। রোগীদের সেবা করার জন্য তাঁর বেশ আগ্রহও ছিল। কিন্তু পাছে ছোঁয়াচ লেগে তাঁর অসুখ করে, সেই ভয়ে, আমরা তাঁকে রোগীদের কাছেও বড়ো-একটা যেতে দিতাম না।

আমাদের বলা হয়েছিল, কিছু সময় অন্তর-অন্তর রোগীদের আমরা যেন ব্র্যান্ডি খাওয়াই। ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবার জন্য নার্স আমাদেরও একটু-একটু ব্র্যান্ডি খেতে বলতেন। তিনি নিজেও খেতেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে থেকে কেউ ব্র্যান্ডি ছুঁতে রাজি ছিল না। সত্যি বলতে কী, ব্র্যান্ডি খেলে রোগীদের উপকার হতে পারে এটা আমি ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারিনি। ব্র্যান্ডি বাদ দিয়ে চলতে রাজি, এমন তিনজন রোগীকে আমি ডক্টর গডফ্রে-র অনুমতিক্রমে মাটি-চিকিৎসায় রেখেছিলাম। তাদের কপালে ও বুকে আমি ভেজা মাটির পুল্‌টিস্ বেঁধে রাখতাম। এদের মধ্যে থেকে দু-জন সেরে ওঠে। বাদ-বাকি বিশজনই গুদামের সেই অস্থায়ী হাসপাতালে মারা যায়।

ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হয়ে ওঠেন। জোহানেস্‌বর্গ থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে একটি সংক্রামক রোগীদের হাসপাতাল ছিল, তাকে বলা হ'ত লাজারেট্টো। যে দু-জন বেঁচে উঠল তাদের সেই লাজারেট্টোর ধারে-কাছে একটি তাঁবুতে স্থানান্তর করা হ'ল। স্থির হ'ল আবার যদি কেউ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে তাদেরকেও সেখানে পাঠানো হবে। এইভাবে আমরা স্বেচ্ছাসেবকের কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পেলাম।

দু-দিন বাদে আমরা জানতে পেলাম, সেই ভালোমানুষ নার্সটি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেছেন। দুটি রোগী যে কেমনভাবে বেঁচে উঠল, আমরাই-বা

কেমন ক'রে ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা পেলাম, তার কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত। তবে এই অভিজ্ঞতার ফলে মাটি-চিকিৎসার ওপর আমার আস্থা যে পরিমাণে বেড়ে যায় সেই পরিমাণেই অনাস্থা জন্মে ওষুধ হিসাবে ব্র্যান্ডির উপযোগ ও উপকার বিষয়ে। আমি ভালো ক'রেই জানি, আমার এই আস্থা-অনাস্থা কোনো দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু তখন আমার মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, আজও তা নড়চড় করার মতো কোনো হেতু খুঁজে পাইনি। তাই মনে হ'ল, সে কথাটা এখানে উল্লেখ করা বিহিত হবে।

প্লেগ-এর মড়ক ছড়িয়ে পড়তেই আমি খবরকাগজে একটি কড়া চিঠি লিখি। সেই চিঠিতে বলেছিলাম লোকেশন-এর দখল নিজেদের হাতে নেবার পর মিউনিসিপালিটি সেই অঞ্চল তদারকির কাজে গাফিলতি করেছেন এবং প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটার জন্য তারাই সত্য-সত্য দায়ী। এই চিঠি পড়ার ফলে মিস্টার হেনরি পোলক আমার সঙ্গে হাত মেলান, আর খানিকটা এই চিঠির সূত্রেই রেভারেন্ড জোসেফ ডোক্-এর সঙ্গে আমার সৌহার্দের সূচনা।

ইতিপূর্বে আমি নিশ্চয় ব'লে থাকব, একটি নিরামিষ ভোজনের রেস্তোরাঁয় আমি মিয়মিত আহারাদি করতাম। এখানেই আমার সঙ্গে মিস্টার এলবার্ট ওয়েস্ট-এর পরিচয় হয়। সেই রেস্তোরাঁয় প্রতিসন্ধ্যায় আমরা একত্র হতাম এবং আহারাদি সেরে একসঙ্গে বেড়াতে বেরতাম। ওয়েস্ট ছিলেন একটি ছোটোখাটো ছাপাখানার অংশীদার। কাগজে তিনি প্লেগ সম্বন্ধে লেখা আমার সেই চিঠি পড়েন। সেদিন সন্ধ্যায় আমায় রেস্তোরাঁয় না-দেখে তিনি বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

মড়ক লাগতেই আমি ও আমার সহকর্মীরা আমাদের আহার্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছিলাম। এর অনেক আগের থেকে আমি একপ্রকার নিয়ম ক'রে নিয়েছিলাম যে ছোঁয়াচে অসুখের প্রাদুর্ভাব ঘটলে পেটটা যথাসম্ভব হাল্কা রাখতে হয়। সুতরাং সেসময় সন্ধ্যাবেলার ডিনার আমি বাদ দিয়েছিলাম। দুপুরেও লাঞ্চ অন্যদের আসবার আগেভাগে সেরে নিতাম। রেস্তোরাঁর মালিককে আমি বেশ ভালো চিনতাম। তাঁকে ব'লে রেখেছিলাম, যেহেতু প্লেগ রোগীদের পরিচর্যায় আমি নিযুক্ত আছি, তাই বন্ধুবান্ধবদের যতটা এড়িয়ে থাকা যায় ততই ভালো।

দু-একদিন আমায় রেস্তোরাঁয় না-দেখে, একদিন ভোরবেলা মিস্টার ওয়েস্ট আমার বাড়ি চ'লে এলেন। দরজার কড়া ধ'রে তিনি যখন নাড়া দিচ্ছেন, আমি ঠিক তখনই আমার অভ্যাসমতো সকালবেলা হেঁটে বেড়াবার জন্য বেরচ্ছি। দরজা খুলতে ওয়েস্ট বললেন, "ক-দিন আপনাকে রেস্তোরাঁয় না-দেখে ভারি অস্বস্তিতে ছিলাম। আপনার নিজের কিছু ঘটল কি-না তাই নিয়ে আশঙ্কা হচ্ছিল। তাই ভাবলাম, ভোর থাকতে এসে, আপনি বেরিয়ে যাবার আগে আপনাকে ধরি। এখন আপনি আমায় কাজে লাগাতে চান তো আমি প্রস্তুত। রোগীদের পরিচর্যার কাজে তো আমি সাহায্য করতে পারি। আপনি তো জানেনই, আমি একা মানুষ, আমার গলগ্রহ কেউ নেই।"

তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং একপ্রকার চিন্তা না-ক'রেই সঙ্গে-সঙ্গে বললাম,

"দেখুন, রোগীর সেবার কাজে আপনাকে আর লাগাব না। নতুন রোগী না-এসে পড়লে, দু-একদিনের মধ্যে আমাদের কাজ হয়তো শেষ হয়ে যাবে। অন্য-একটা কাজ অবশ্য আছে।"

"বলুন, কী কাজ?"

"ডারবান্-এ গিয়ে আপনি কি *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* কাগজের ছাপাখানার ভার নিতে পারবেন? মদনজিৎ এখানকার কাজে এখনো হয়তো কিছুকাল আটকে থাকবেন। তাই ডারবান্-এ কাউকে যেতে হয়। আপনি যদি যেতে পারেন তাহলে ও ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

"আপনি তো জানেন মিস্টার গান্ধী, আমার নিজেরও একটা ছাপাখানা আছে। তা থাক্—খুব সম্ভব আমি ডারবান্ যেতে পারব। আজ সন্ধের মধ্যে কথাটা যদি পাকা করি, খুব অসুবিধা হবে কি? সন্ধেবেলা বেড়াতে-বেড়াতে সব কথা বলা যাবে।"

আমি মিস্টার ওয়েস্ট-এর কথা শুনে খুব খুশি হলাম। সন্ধেবেলা ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল। উনি ডারবান্ যেতে রাজি হলেন। অর্থ উপার্জনের ধান্দায় তো উনি আর যেতে চাইছেন না, সুতরাং বেতনের ব্যাপারটা ছিল গৌণ। তবু স্থির হয়, তিনি মাসিক দশ পাউন্ড ক'রে মাইনে নেবেন এবং ছাপাখানা ও কাগজ থেকে যদি কখনো লাভ দাঁড়ায়, তাহলে তার একটা অংশ তিনি পাবেন। ঠিক তার পরের দিনই, রাতের মেল গাড়িতে ক'রে মিস্টার ওয়েস্ট ডারবান্ রওনা হয়ে গেলেন। এখান-ওখান থেকে তাঁর যা-কিছু পাওনা ছিল, তার উসুলের ভার তিনি আমায় দিয়ে গেলেন। সেদিন থেকে শুরু ক'রে যদ্দিন-না আমি দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে আসি, তিনি ছিলেন আমার সমস্ত সুখ-দুঃখের সখী।

মিস্টার ওয়েস্ট ছিলেন বিলেতে লিংকনশায়ার-এর লাউথ গ্রামের এক কৃষক পরিবারের ছেলে। সাধারণ স্কুলে যৎসামান্য লেখাপড়া করতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু অভিজ্ঞতার বিদ্যালয়ে আপন চেষ্টায় তিনি অনেক-কিছু শিখেছিলেন। আমি বরাবর তাঁকে দেখেছি সচ্চরিত্র, সংযত, ভগবৎ-ভীরু ও পরদুঃখকাতর ইংরেজরূপে।

পরে ওয়েস্ট ও তাঁর পরিবারবর্গ বিষয়ে আরো দু-চার কথা বলা যাবে।

১৭. লোকেশন-এ অগ্নিকাণ্ড

রোগীদের পরিচর্যার দায়িত্ব থেকে আমি ও আমার সহকর্মীরা অব্যাহতি পেলেও, কালা প্লেগ-এর মড়ক লাগার ফলে অন্য অনেক কাজের ফয়সালা আমাদের করতে হয়। লোকেশন সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটির উপেক্ষা ও অনাগ্রহের কথা এর আগেই বলেছি। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষায় তারা ছিল সদাসতর্ক। সে কাজে তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করত। এখন প্লেগ-এর আতঙ্ক দূর করার জন্য মিউনিসিপালিটি টাকা ঢালতে লাগল জলের মতো। ভারতীয়দের স্বাস্থ্যরক্ষায় তাদের অবহেলা নিয়ে মিউনিসিপালিটিকে যতই কেন দোষারোপ ক'রে থাকি, শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের মঙ্গল-বিধানে তাদের উদ্যম ও তৎপরতাকে প্রশংসা

না-ক'রে পারিনি। তাদের এই সাধু প্রচেষ্টায় আমি যথাসাধ্য সহযোগিতাও করেছি। আমার বিশ্বাস, ওইভাবে আমি যদি এগিয়ে এসে সহায়তা না-করতাম, মিউনিসিপালিটিকে বেশ-একটু বেকায়দায় পড়তে হ'ত। অবশ্য কার্যসিদ্ধির জন্য তারা সশস্ত্র সৈন্য আমদানি করতে কিংবা তার চেয়েও খারাপ কাজ করতে পিছপা হ'ত না।

কিন্তু সেসব করার কিছু দরকার হয়নি। ভারতীয়দের আচরণে মিউনিসিপালিটির কর্তাব্যক্তিরা রুষ্ট হবার কোনো কারণ খুঁজে পাননি। এর ফলে প্লেগ-দমনের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি করা তাঁদের পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়। ভারতীয়দের মধ্যে আমার যতখানি প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তার সবটুকু প্রয়োগ ক'রে আমি তাদের বলেছিলাম, মিউনিসিপালিটির সবরকম বিধিনিষেধ তারা যেন বিনা-বাক্যে মেনে নেয়। অতটা করা ভারতীয়দের পক্ষে খুব বেশি সহজসাধ্য ছিল না। তৎসত্ত্বেও তাদের মধ্যে একজনও আমার উপদেশ-নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল ব'লে আমার মনে পড়ে না।

লোকেশন-এর চারদিকে কড়া পাহারা বসানো হ'ল। অনুমতি ছাড়া কেউ সেখানে ঢুকতেও পারত না, বেরুতেও পারত না। আমি ও আমার সহকর্মীরা আমাদের ইচ্ছামতো যাওয়া-আসার অনুমতি পেয়েছিলাম। মিউনিসিপালিটি ঠিক করে যে জোহানেস্‌বার্গ থেকে তেরো মাইল তফাতে একটি খোলা জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে লোকেশন-এর লোকদের স্থানান্তর করবে ও তিন সপ্তাহ সেখানে তাদের রাখবে। ওই তিন সপ্তাহকালের মধ্যে সমস্ত লোকেশন-এ তারা আগুন ধরিয়ে দেবে। কিন্তু তিন সপ্তাহের মতো রশদপত্র সংগ্রহ করা ও তাঁবু খাটানো প্রভৃতি কাজ করা তো সময়সাধ্য। এইসব উদ্‌যোগ-আয়োজন করতে যে সময় দরকার, সেইসময়ের মতো পাহারা না-বসিয়ে উপায় ছিল না।

লোকেশন-এর লোকেরা আতঙ্কে একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। কিন্তু সদাসর্বদা আমি তাদের আশেপাশে ধারেকাছে ছিলাম ব'লে তারা একটু আশ্বস্ত হয়। গরীবদের মধ্যে অনেকে তাদের যৎসামান্য সঞ্চয় মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিল। এখন সেসমস্ত মাটি খুঁড়ে বের করতে হ'ল। ব্যাঙ্ক-এর সঙ্গে তারা কোনোকালে কাজ-কারবার করেনি, অনেকে জানতও না ব্যাঙ্ক কীরকম প্রতিষ্ঠান। আমি তাদের গচ্ছিত টাকার ভার নিলাম। আমার দফতরে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা জমতে লাগল। এরকম সঙ্কটকালে আমার পক্ষে পারিশ্রমিক- বাবদ কোনো দক্ষিণা নেবার প্রসঙ্গ উঠতেই পারে না। তবু কোনোপ্রকারে কাজটা আমি সামলে নিলাম। আমার ব্যাঙ্ক-এর ম্যানেজারের সঙ্গে আমার বেশ খাতির ছিল। তাঁকে আমি বললাম যে, সমস্ত টাকা তাঁর ওখানে আমায় জমা দিতে হবে। তামায় ও রূপায় এতগুলো টাকা জমা নিতে ব্যাঙ্ক-এর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তাছাড়া প্লেগ-অধ্যুষিত জায়গা থেকে আসা টাকা-পয়সা ছুঁতে ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদের আপত্তি হবারও ভয় ছিল। কিন্তু ম্যানেজার ভদ্রলোক আমায় সবরকম সুবিধা ক'রে দেন। স্থির হয় টাকা-পয়সা জীবানুনাশক প্রক্রিয়ায় শুদ্ধ ক'রে তবে ব্যাঙ্কে পাঠানো হবে। যদ্দূর মনে পড়ে, এইভাবে আমি প্রায় ষাট হাজার পাউন্ড ব্যাঙ্ক-এ জমা দিই। যাদের সঞ্চিত টাকা ছিল অপেক্ষাকৃত মোটা অঙ্কের, তাদের বলি, টাকাটা যেন তারা

স্থায়ী আমানতে রাখে। তারা আমার পরামর্শমতো কাজ করেছিল। এর ফলে তাদের কারো-কারো ব্যাঙ্ক-এ টাকা রাখার অভ্যাস হয়ে যায়।

একটি স্পেশ্যাল ট্রেন-যোগে লোকেশন-এর বাসিন্দাদের জোহানেস্‌বার্গ-এর নিকটবর্তী ক্লিপ্‌স্‌প্রুইট ফার্ম-এ স্থানান্তর করা হয়। মিউনিসিপালিটি সরকারি টাকায় তাদের প্রয়োজনীয় রশদ ও অন্যসব জিনিস সরবরাহ করে। তাঁবু দিয়ে তৈরি সেই শহরটি দেখে মনে হ'ত যেন সৈনিকদের ছাউনি। তাঁবুতে থাকার অভ্যাস না-থাকায় অনেকের কাছে এরকম ব্যবস্থা অভিনব ও অস্বস্তিকর ব'লে মনে হয়ে থাকবে। তবে বিশেষ কোনো অসুবিধা তাদের ভুগতে হয়নি। দৈনিক একবার ক'রে সাইকেল-যোগে আমি সেই ছাউনি দেখে আসতাম। চব্বিশ ঘণ্টা পেরুতে-না-পেরুতে তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে ছাউনির বাসিন্দারা নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে আনন্দে দিনযাপন করতে লাগল।

যদ্দূর মনে পড়ে, লোকেশন যেদিন খালি ক'রে দেওয়া হয়, তার পরের দিনই সেখানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অগ্নিকাণ্ড থেকে একটি বস্তুও উদ্ধার করার জন্য মিউনিসিপালিটির কোনো আগ্রহ ছিল না। ওই একইসময়ে, বাজার অঞ্চলে মিউনিসিপালিটির যে কাঠের গুদাম ছিল, তাতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এর ফলে মিউনিসিপালিটির লোকসান হয় প্রায় হাজার দশ পাউন্ড। বাজারে মরা ইঁদুর লক্ষ করা গিয়েছিল ব'লে মিউনিসিপালিটি এইরকম কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

মিউনিসিপালিটিকে ব্যায়ভার বহন করতে হয়েছিল মোটা টাকার। কিন্তু তার ফলে রোগ আর বেশি ছাড়তে পারেনি ও শহরের লোক হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল।

১৮. একটি বইয়ের ইন্দ্রজাল

এই কালা প্লেগ-এর মড়কের ফলে গরীব ভারতীয়দের মধ্যে আমার প্রভাব বিস্তৃত হ'ল, সেই সঙ্গে আমার পশার বাড়ল, আর আমার দায়িত্বও। ওদিকে নূতন পরিচিত কিছু-কিছু ইউরোপীয়দের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পেল যে তাদের প্রতি আমি একটা নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করতে লাগলাম।

ওয়েস্ট-এর সঙ্গে যেমন, তেমনি মিস্টার পোলক-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সেই নিরামিষ আহারের রেস্তোরাঁয়। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ডিনারে বসেছি, আমার টেবিল থেকে সামান্য একটু ব্যবধানে অন্য-একটি টেবিলে ডিনার-রত একটি যুবকের কাছ থেকে একটা কার্ড এল—তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক। আমি তাঁকে আমার টেবিলে এসে বসতে বললাম, তিনিও সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এলেন। তিনি বললেন : "আমি এখানকার *The Centre* কাগজের একজন সহ-সম্পাদক। প্লেগ বিষয়ে খবরকাগজে আপনি যে চিঠি লেখেন, সেটি প'ড়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা জাগে। আজ আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল ব'লে আমি ভারি খুশি হয়েছি।"

মিস্টার পোলক-এর সহজ সরল ব্যবহারে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলাম। সেই রাত্রেই আমরা পরস্পরের পরিচয় লাভ করলাম। দেখা গেল, জীবনের অনেকগুলি মৌলিক বিষয়ে আমাদের চিন্তাভাবনায় অনেকখানি মিল। তিনি সাদাসিধে জীবনযাপন পছন্দ করতেন। জ্ঞানবুদ্ধিমতে যা তিনি ন্যায্য ও করণীয় ব'লে বিবেচনা করতেন, ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করায় তাঁর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। নিজের জীবনে তিনি অনেকগুলি মৌলিক পরিবর্তনসাধন করেছিলেন বিনা-দ্বিধায়, বিন্দুমাত্র কালহরণ না-ক'রে।

ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন চালানোর খরচ প্রতিদিন বেড়েই চলেছিল। ওয়েস্ট-এর কাছ থেকে প্রথম যে রিপোর্ট আসে, তা প'ড়ে তো দস্তুরমতো ভয় পাই। তিনি লিখেছিলেন : "আপনি ছাপাখানা ও কাগজ থেকে যে লাভের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, আমি তো সেরকম কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। বরঞ্চ আমার আশঙ্কা হয় যে লোকসানও হতে পারে। হিসেবপত্র ঠিকমতো রাখা হয়নি। মোটা-মোটা টাকা বকেয়া প'ড়ে আছে। কিন্তু সেগুলি আদায় করা যাবে কি-না সন্দেহ, কারণ হিসেব থেকে মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝবার জো নেই। খোলনলচে অনেক-কিছু অদলবদল করতে হবে। কিন্তু এসব নিয়ে আপনি আতঙ্কিত হবেন না। আমি আমার সাধ্যমতো সব-কিছু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করব। এসেছি যখন, থেকেও যাব—তা লাভ হোক্ কিংবা লোকসানই হোক্।'

লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে মিস্টার ওয়েস্ট যদি চ'লেও যেতেন, আমি তাঁকে কোনো দোষ দিতে পারতাম না। বরঞ্চ, সাক্ষ্য-প্রমাণের অপেক্ষা না-রেখে আমি যে লাভের কথা তুলেছিলাম, তাই নিয়ে উল্‌টে তিনি আমায় ভৎর্সনা করতে পারতেন। কিন্তু অনুযোগের সুরে তিনি একটি কথাও বলেননি। আমার ধারণা, এই ব্যাপার দেখার পর মিস্টার ওয়েস্ট হয়তো ভেবে থাকবেন যে আমি সহজেই মানুষকে বিশ্বাস ক'রে বসি। কোনোপ্রকার যাচাই না-ক'রেই আমি মদনজিতের দেওয়া হিসাব মেনে নিয়েছিলাম ও তারই ভিত্তিতে লাভের সম্ভাবনার কথা ওয়েস্টকে বলেছিলাম।

এখন আমি বুঝেছি যে জনসেবার কাজে যিনি নামবেন, বিচার বা ওজন না-ক'রে তাঁর পক্ষে কোনো কথা স্থির নিশ্চয়ভাবে বলতে যাওয়া ঠিক হয় না। সত্যের সন্ধানী যিনি হবেন, তাঁকে প্রতিপদক্ষেপে সাবধানে চলতে হয়। পুরোপুরি যাচাই না-ক'রেই কাউকে কোনো কথা মেনে নিতে বলা, সত্যের একপ্রকার অপলাপ করা। সখেদে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এতৎসত্ত্বেও আমার এই বিশ্বাসপ্রবণতার দুর্বলতা থেকে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারিনি। এর জন্য মূলত দায়ী হ'ল আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা—আমি অনেকসময় আমার শক্তির অতিরিক্ত দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিই। হাতের চেয়ে আম বড়ো হয়ে যায়। অতিরিক্ত কাজের এই লোভের ফলে, আমার চেয়েও আমার সহকর্মীদের অনেক অস্বস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

মিস্টার ওয়েস্ট-এর রিপোর্ট পেয়েই আমি নাটাল রওনা হয়ে যাই। মিস্টার পোলক-কে আমি সব কথা খুলে বলেছিলাম। তিনি স্টেশনে এসে আমায় গাড়িতে তুলে দেবার সময়

আমার হাতে একটি বই দিয়ে বলেন যে রাস্তায় বইখানা পড়তে আমার নিশ্চয় ভালো লাগবে। বইখানি ছিল রাস্কিন-এর *Unto This Last*।

একবার পড়তে শুরু ক'রে বইখানা ফেলে রাখা অসম্ভব মনে হ'ল। বইখানা আমার সমস্ত মন যেন অধিকার ক'রে বসল। জোহানেস্‌বার্গ থেকে ডারবান্ চব্বিশ ঘণ্টার রাস্তা। ডারবান্-এ ট্রেন গিয়ে পৌঁছলো সন্ধেবেলা। সে রাতটা আমার ঘুমই হ'ল না। মনে-মনে সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম যে রাস্কিন-এর ওই বইয়ের আদর্শে নিজের জীবনটা ঢেলে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলব।

এই প্রথম আমার রাস্কিন-এর লেখা পড়া। ছাত্রাবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বড়ো-একটা কিছু পড়িনি। কর্মজীবনে প্রবেশ করবার পর, বই পড়ার মতো অবসর আমার খুব কমই মিলেছে। পুথিগত বিদ্যা আমার খুব বেশি ব'লে আমি দাবি করতে পারি না। বই পড়ার ব্যাপারে আমায় একপ্রকার বাধ্য হয়ে যে সংযম অভ্যাস করতে হয়েছে, তাতে আমার খুব-যে ক্ষতি হয়েছে, তেমন কথা আমি বলব না। বরঞ্চ বলা যায়, সীমিতভাবে আমি যতটুকু যা পড়েছি, সেটুকু পুরোপুরি আত্মসাৎ করতে পেরেছি। এইসব স্বল্পসংখ্যক বইয়ের মধ্যে যা অচিরাৎ আমার সমস্ত জীবনযাত্রাকে ঢেলে সাজিয়েছে, তা হ'ল *Unto This Last*। পরে আমি এই বই গুজরাতিতে *সর্বোদয়* অথবা *সর্বজন হিত* নাম দিয়ে অনুবাদও করেছিলাম।

আমার মনে হয়, আমার অন্তরের গভীরে যেসব প্রত্যয় প্রচ্ছন্ন ছিল, রাস্কিন-এর এই মহৎ রচনার মধ্যে আমি সেগুলিকে স্পষ্ট প্রতিফলিত দেখতে পাই। সেইজন্যই এ বই পলকে আমার চিত্ত জয় করে ও আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে নেবার জন্য এরকম দুর্বার প্রেরণা দেয়। প্রকৃত কবি হলেন তিনি, যিনি মানুষের অন্তরাশ্রিত শুভভাবনাকে জাগ্রত করতে পারেন। কবির প্রভাব সকল লোকের ওপর সমান হতে পারে না, কারণ প্রত্যেক মানুষের মনোবিকাশের স্তর স্বতন্ত্র।

Unto This Last বইয়ের মূল শিক্ষণীয় বস্তু আমার মতে এই :

এক। সমষ্টির কল্যাণে ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত।

দুই। কাজ হিসেবে উকিলের ওকালতি ও নাপিতের হাজামতি—দুই-ই তুল্যমূল্য, কারণ নিজ-নিজ ক্ষেত্রে কাজ ক'রে জীবিকা নির্বাহে সকলেরই অধিকার সমান।

তিন। বাঞ্ছিত জীবনযাত্রার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল শ্রমনির্ভর জীবন—অর্থাৎ চাষীর জীবন ও হস্তশিল্পীর জীবন।

এই তিনটি সিদ্ধান্তের প্রথমটি আমার জানা ছিল। দ্বিতীয়টিও আবছাভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। কিন্তু তৃতীয়টির কথা আমি ইতিপূর্বে ঘুণাক্ষরে ভেবে দেখিনি। *Unto This Last* প'ড়ে একটি কথা আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল—তা হ'ল এই যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিদ্ধান্ত প্রথমটির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। ভোরবেলা আমি জেগে উঠলাম, এইসব সিদ্ধান্ত আমার জীবনযাত্রায় প্রয়োগ করার সঙ্কল্প নিয়ে।

১৯. ফিনিক্স্-এর পত্তন

Unto This Last বইখানি আমার মনের উপর কীরকম গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই বিষয়ে মিস্টার ওয়েস্ট-এর সঙ্গে আমি আলোচনা করি। তাঁকে বলি, একটি খামারবাড়ি পত্তন ক'রে, সেইখানে আমরা যদি *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* কাগজ ও ছাপাখানা স্থানান্তর করি, তাহলে বেশ হয়। তাহলে সেই খামারে সবাই পেট-ভাতায় গতর খাটাবে এবং অবসরসময়ে ছাপাখানার কাজে হাত লাগাবে। ওয়েস্ট এই প্রস্তাবে সায় দেন। স্থির হয়, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে প্রতিজন কর্মী মাথা-পিছু মাসিক তিন পাউণ্ড খাওয়া-পরা বাবদ দক্ষিণা পাবেন।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল যে দশ-বারোজন লোক ছাপাখানায় কাজ করত, তারা কি শহর-জনপদ ছেড়ে চল্‌তি পথ থেকে অনেক দূরের বাড়িতে বসতি করতে রাজি হবে? তাছাড়া কেবল পেট-ভাতায় তারা কি খুশি হয়ে কাজ করবে? আমরা দু-জনে যুক্তি ক'রে ঠিক করলাম যে গোড়াতে যারা এরকম ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না-পারবে, তারা বেতনের ভিত্তিতেই কাজ করতে থাকুক। আস্তে-আস্তে অন্যদের দেখাদেখি তারাও হয়তো প্রতিষ্ঠানের আদর্শ অনুসরণ ক'রে তার সদস্যশ্রেণীভুক্ত হতে চাইবে।

কাগজ ও ছাপাখানার কর্মীদের কাছে এই প্রস্তাব ও অন্যান্য শর্ত উপস্থাপিত করলাম। প্রস্তাবটা মদনজিৎ-এর আদৌ মনঃপূত হ'ল না। তাঁর ধারণা হ'ল যে কাজে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব ঢেলে দিয়েছেন, আমার আহাম্মুকিতে তার সবটুকুই বরবাদ হয়ে যাবে। তিনি আরো বললেন যে কর্মীরা সবাই পিট্টান দিয়ে পালাবে, *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* আর বেরুবে না, ছাপাখানাটাও চালু রাখা যাবে না।

ছাপাখানায় যারা কাজ করত তাদের মধ্যে ছিল ছগনলাল গান্ধী, সম্পর্কে আমার ভাইপো। ওয়েস্ট-এর সঙ্গে যখন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়, ছগনলাল সেখানে উপস্থিত ছিল। তার স্ত্রী-পুত্র ছিল। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে সে নিজের ইচ্ছাতেই আমার কাছে থেকে শিক্ষাদীক্ষা ও কাজকর্ম করতে প্রস্তুত হয়েই আমার সঙ্গে এসেছিল। আমার প্রতি তার আস্থা ছিল পুরোমাত্রায়। সুতরাং দ্বিধাদ্বিরুক্তি না-ক'রে আমার পরিকল্পিত কাজে সে যোগ দেবে ব'লে তৎক্ষণাৎ মনঃস্থির করল। তখন থেকে ছগনলাল আমার কাছেই আছে। ছাপাখানার মেশিনম্যান গোবিন্দস্বামী তো সঙ্গে-সঙ্গে প্রস্তাবের অনুকূলে মত দিল। আর-সকলে যোজনায় যোগ না-দিলেও বলল যে ছাপাখানা যেখানে যাবে সেখানেই যেতে তারা রাজি।

আমার মনে হয়, কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে সব ব্যবস্থা পাকা করতে আমার দিনদুয়েকের বেশি লাগেনি। কথাবার্তা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে ডারবান্-এর কাছাকাছি কোনো রেল স্টেশনের লাগাও এক খণ্ড জমির জন্য খবরকাগজে বিজ্ঞাপন দিই। জবাবে ফিনিক্স্-এর জমির প্রস্তাব আসে। ওয়েস্ট ও আমি সরেজমিনে জায়গাটা দেখতে যাই। সাতদিনের মধ্যে আমরা কুড়ি একর মতো জমির বন্দোবস্ত নিই। জমিতে সুন্দর একটি ছোটোখাটো ঝরনা ছিল, আর ছিল কতকগুলি আম ও কমলালেবুর গাছ। এই জমির লাগাও আরো একখণ্ড আশি একর পরিমাণ জমি প'ড়ে ছিল। এই জমিতে বেশ-কিছু ফলের গাছ ছিল, আর

সংস্কারের অভাবে জীর্ণ একটা বসতবাড়ি। এই জমিটাও কেনা হ'ল। সবসুদ্ধ খরচ পড়ল এক হাজার পাউন্ড।

আমি কোনো কাজ হাতে নিলেই পার্সি রুস্তমজী আমার সহায় হতেন। আমার এই নতুন কাজের পরিকল্পনা তাঁর ভালো লেগেছিল। একটি বড়ো গুদামের ব্যবহার করা একগাদা টিন ও বাড়িঘর তৈরি করার অন্যান্য সব সরঞ্জাম, তিনি আমায় পাঠিয়ে দিলেন। তাই দিয়ে তো কাজ শুরু করা গেল। বুওর যুদ্ধের সময় স্বেচ্ছাসেবক হয়ে আমার সঙ্গে কাজ করেছিল, এরকম কয়েকজন ছুতোর ও রাজমিস্ত্রি, ছাপাখানার জন্য ঘর তোলার কাজে আমায় সাহায্য করার জন্য চ'লে এল। পঁচাত্তর ফুট লম্বা ও পঞ্চাশ ফুট চওড়া ছাপাখানার জন্য একটি কারখানা-ঘর তৈরি হয়ে গেল মাসখানেকেরও কম সময়ে। ওয়েস্ট ও আর-সকলে সবরকম বিঘ্ন-বিপদ তুচ্ছ ক'রে, ছুতোর ও রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে সেইখানেই র'য়ে গেলেন। জায়গাটা ছিল জনবসতিবিহীন ঘন ঘাসে ঢাকা জঙ্গল-বিশেষ। সর্পসঙ্কুল ছিল ব'লে জায়গাটা ছিল বসবাসের পক্ষে দস্তুরমতো বিপজ্জনক। প্রথম-প্রথম সবাইকে থাকতে হয়েছিল তাঁবু ফেলে। আমাদের অধিকাংশ জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি আমরা হপ্তাখানেকের মধ্যে গোরুরগাড়িতে ক'রে ফিনিক্স্-এ এনে ফেলি। জায়গাটা ছিল ডারবান্ থেকে চোদ্দ মাইল দূরে, ফিনিক্স্ স্টেশন থেকে আড়াই মাইলের মধ্যে।

ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন কাগজের একটিমাত্র সংখ্যা অন্যত্র—মারকুরি প্রেস-এ ছাপতে হয়েছিল।

ভারত থেকে আমার যেসব আত্মীয়-বন্ধু আমার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাগ্য-অন্বেষণে এসেছিলেন ও নানারকম ব্যবসার ধান্দায় লিপ্ত ছিলেন, এবার আমি তাঁদের ফিনিক্স্-এ টানবার চেষ্টা করলাম। তাঁরা ওখানে গিয়েছিলেন রোজগারপাতি করতে, সুতরাং সবাইকে যে টানতে পারব, তেমন সম্ভাবনা ছিল না। তবু তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ-কেউ আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে হচ্ছে একটিমাত্র নাম—তিনি হলেন মগনলাল গান্ধী। অন্যেরা নিজ-নিজ ধান্দায় ফিরে যান। মগনলাল গান্ধী একেবারে তাঁর ব্যবসাপত্র গুটিয়ে ফেলে, চিরকালের মতো তাঁর ভাগ্য আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন। নৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে, যারা প্রথম থেকে আমার সহকর্মী, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধিক্ষমতায়, আত্মোৎসর্গে ও ভক্তিগুণে মগনলাল হলেন সর্বাগ্রগণ্য। স্বয়ংশিক্ষিত হস্তশিল্পী হিসাবে তাঁর তুল্য আর-কেউ ছিলেন ব'লে আমার মনে হয় না।

এইভাবে ফিনিক্স্ প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয় ১৯০৪ সালে। নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আজও সেই ফিনিক্স্ থেকেই *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে।

কিন্তু গোড়াতে যেসব অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, যেসব ব্যবস্থার অদলবদল করতে হয়, যেসব আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে চলতে হয়, সেসমস্ত প্রসঙ্গ আলাদাভাবে বলা দরকার।

২০. প্রথম রাত

ফিনিক্স্ থেকে *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* কাগজের প্রথম সংখ্যাটি বের করা খুব সহজসাধ্য হয়নি। দুটি বিষয়ে আমি যদি গোড়া থেকে সতর্ক না-হতাম তাহলে এই সংখ্যাটি হয় বাদ দিতে হ'ত, কিংবা দেরি ক'রে বের করতে হ'ত। আমাদের ছাপাখানার যন্ত্র ইঞ্জিন-এর সাহায্যে চলে—এ আমার ঠিক মনঃপূত ছিল না। যে পরিবেশে ক্ষেত-খামারের কাজ হাতে করার কথা, সেখানে মুদ্রাযন্ত্রও হাতে চালালে যেন ঠিক মানানসই হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরকম ব্যবস্থা সম্ভবপর হবে না মনে ক'রে একটা অয়েল-ইঞ্জিন বসানো হয়েছিল। আমি কিন্তু ওয়েস্টকে ব'লে রেখেছিলাম, যদি অয়েল-ইঞ্জিন কখনো বিগড়োয়, তাহলে কাজ চালিয়ে দেবার মতো একটা বিকল্প ব্যবস্থা যেন থাকে। তিনি তদনুসারে হাতে-চালানো যায় এরকম একটি চাকা বসিয়ে রেখেছিলেন। *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন*-এর আকার ছিল, সচরাচর দৈনিক কাগজের আকার যেমন হয়ে থাকে। ফিনিক্স্-এর মতো পাণ্ডব-বর্জিত দেশে ওই আকারের কাগজ ছাপাতে যাওয়া ঠিক সমীচীন হবে বলে মনে হ'ল না। তাই কাগজের আকার ছোটো ক'রে ফুলস্কেপ সাইজে আন হ'ল—যাতে অবস্থা-বিপাকে ট্রেডল্-এও ছাপা চলতে পারে।

প্রথম-প্রথম *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* বেরুবার আগের দিনে আমাদের সকলকে অনেক রাত অবধি জাগতে হ'ত। কাগজ ভাঁজ করার কাজটা ছোটোবড়ো সবাই মিলে হাতে-হাতে করত। সচরাচর কাজ শেষ হতে-হতে রাত দশটা থেকে বারোটা বেজে যেত। কিন্তু সেই প্রথম রাতটার কথা কোনোকালে ভুলব না। ফর্মা তৈরি ক'রে মেশিনে আঁটা হ'ল। কিন্তু মেশিন আর চলে না। ডারবান্ থেকে একজন ইঞ্জিনীয়ারকে আনা হয়েছিল ইঞ্জিন বসাতে ও চালু করতে। তিনি আর ওয়েস্ট দু-জনে মিলে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সবাই যেন অথৈ জলে পড়লাম—সবারই মনে গভীর দুশ্চিন্তা। হতাশ হয়ে ওয়েস্ট শেষপর্যন্ত আমার কাছে এসে ধরা গলায় বললেন, "ইঞ্জিনটা কিছুতে চলছে না। এই সপ্তাহের সংখ্যাটা সময়মতো বের করতে পারব ব'লে মনে হচ্ছে না।" বেচারার দু-চোখে জল।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "ইঞ্জিন যদি না-চলে, আমরা নাচার। কিন্তু চোখের জল ফেলে লাভ কী? বরঞ্চ আসুন, চেষ্টা দেখা যাক্, অন্য-কিছু করা সম্ভব হয় কি-না। আচ্ছা সেই হাত-চাকাটা দিয়ে কিছু করা যায় না?"

ওয়েস্ট জবাবে বললেন, "চাকা ঘুরোবার মতো লোক কোথায়? আমরা যে কয়জন আছি সেই কাজের পক্ষে যথেষ্ট নই। পালা ক'রে চার-চারজন হাত লাগালে তবে মেশিন চলতে থাকবে। অত লোক কোথায়? আমরা যে কয়জন আছি, সবাই তো একেবারে থ'কে গেছি।"

কারখানা-ঘরে তখনই দরজা-জানালা বসানো বাকি ছিল ব'লে, ছুতোররা তখনো আমাদের ওখানেই ছিল। তারা তখন ছাপাখানার মেঝেতে সব লম্বা হয়ে ঘুম দিচ্ছে। তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে ওয়েস্টকে আমি বললাম, "আমরা কিন্তু এদের কাজে লাগাতে পারি।

আর রাতটা তো পুরো প'ড়েই আছে কাজটা শেষ করার জন্য। আমার মনে হয়, এরকম একটা চেষ্টা দেখলে হয়।"

ওয়েস্ট বললেন, "ছুতোরমিস্ত্রিদের ঘুম থেকে তুলে ওঠাতে আমি ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। তাছাড়া, আমাদের নিজেদের লোকেরা বাস্তবিকই খুব ক্লান্ত।"

আমি বললাম, "ও-দিকটা না-হয় আমি সামলাব।"

ওয়েস্ট বললেন, "তা যদি পারেন, তাহলে হয়তো কার্যোদ্ধার হয়ে যায়।"

আমি ছুতোরমিস্ত্রিদের ঘুম থেকে তুলে বললাম, তারা যদি আমাদের কাজে একটু হাত লাগায়। বেশি বলা-কওয়া করতে হ'ল না। তারা বলল, "বিপদের সময় এতটুকু যদি না-করতে পারি তাহলে তো আমরা কোনো কাজেরই নই। আপনারা বিশ্রাম করুন, আমরা চাকা ঘুরাব। আমাদের কাছে এ কাজ কিছুই না।" আমাদের ছাপাখানার লোকেরা তো তৈরি হয়েই ছিল।

ওয়েস্ট-এর আনন্দের অবধি রইল না। আমরা কাজ শুরু করতেই তিনি একটি খ্রিষ্টের ভজন গাইতে শুরু করলেন। ছুতোরদের দলের একজন হয়ে আমিও চাকা ঘোরাতে থাকি। আর-সকলে পালা ক'রে এসে হাত লাগাল। এইভাবে কাজ চলল সকাল সাতটা অবধি। তখনো ছাপতে অনেকখানি বাকি। আমি তখন ওয়েস্টকে বললাম, এবার হয়তো তিনি ইঞ্জিনীয়ারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলতে পারেন ইঞ্জিন চালানোর জন্য আরেক-দফা চেষ্টাচরিত্র করতে। যদি চলে তাহলে আমাদের কাজটাও যথাসময়ে শেষ হতে পারে।

ওয়েস্ট ইঞ্জিনীয়ারকে জাগালেন। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে ইঞ্জিন-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আর তিনি হাত লাগাতেই কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—ইঞ্জিন ধকধক ক'রে উঠল। আনন্দের আতিশয্যে আমরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম। আমাদের সমবেত চীৎকারে প্রেস-ঘরটা যেন গমগম ক'রে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল? কাল সারাটা রাত ধ'রে কত আমাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি কিছুতেই কিছু হ'ল না। অথচ আজ সকালবেলা ছুঁতে-না-ছুঁতেই ইঞ্জিন এমনভাবে চলতে শুরু করল যেন কোনোকালে বিফল হয়নি।"

আমার এখন ঠিক মনে নেই কে আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন—ওয়েস্ট না ইঞ্জিনীয়ার। জবাবটা হ'ল এই : "কেন এমন হয় ঠিক বলা যায় না। যন্ত্রপাতি মাঝে-মধ্যে এমন আচরণ করে যে মনে হয় মানুষের [illegible] মেশিনও কাজ [illegible] করতে গিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে চায়।"

আমি নিশ্চয় ব্যাপারটা একটু [illegible] দেখি। আমার মনে হয়, আমাদের বাজিয়ে নেবার জন্য ইঞ্জিন কিছুক্ষণ [illegible] ছিল, [illegible] যখন দেখল, আমাদের শ্রমনিষ্ঠায় কোনো ফাঁকি নেই, [illegible] আমাদের [illegible] পুরস্কার হিসেবে ইঞ্জিন [illegible] আপনা থেকে চালু হয়ে গেল।

খবরকাগজের সেই সংখ্যাটি যথাসময়ে [illegible] চ'লে গেল, আমরাও সবাই খুব খুশি হলাম।

শুরু থেকেই [illegible] যথাসময়ে [illegible] জোর দেবার ফলে, সময়নিষ্ঠা [illegible] একটি [illegible] হয় ফিনিক্স প্রতিষ্ঠানে। একটা

সময় আসে যখন অগ্রপশ্চাৎ সমস্ত প্রশ্ন বিবেচনা করবার পর, আমরা স্থির করি যে ইঞ্জিন চালানো আমরা বন্ধ করব এবং হাতের জোরে চাকা ঘুরিয়ে ছাপাখানাটাকে আমরা চালু রাখব। নৈতিক উৎকর্ষের দিক থেকে ফিনিক্স্ সেসময় তার সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল ব'লে আমার বিশ্বাস।

২১. পোলক ঝাঁপ দিলেন

ফিনিক্স্ প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেছিলাম সত্য, কিন্তু একনাগাড়ে সেখানে বেশিদিন থাকা কখনো সবার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। এ নিয়ে বারবার আমার মনে একটা ক্ষোভ থেকে গেছে। গোড়ায় ভেবেছিলাম, অল্পে-অল্পে প্র্যাক্‌টিস্ করা ছেড়ে দিয়ে, ফিনিক্স্-এ গিয়ে বসবাস করব, গতর খেটে পেট-ভাতা উপার্জন করব, ফিনিক্স্-কে সফল ক'রে তোলার কাজে ও সেবায় নিজেকে চবিতার্থ মনে করব। কিন্তু সেটা হবার ছিল না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি মানুষ ভাবে এক ভগবান করেন এক। তবে সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ করেছি যে মানুষ যদি সত্যের সাধক হয়, তাহলে তার ঈপ্সিত উদ্দেশ্য বিফল হ'লেও আখেরে ক্ষতি তো হয়ই না, বরঞ্চ আশাতিরিক্ত লাভ হয়ে থাকে। ফিনিক্স্ পরিকল্পিত পথে সবসময় চলেনি, ফিনিক্স্-এ যেসব ঘটনা ঘটে তার সবই প্রত্যাশিত বলা যায় না। তত্রাচ বলা চলে, এজন্য ক্ষতি কিংবা লোকসান ঘটেনি—যদিও বলা শক্ত যে যা-ঘটেছে তার মধ্যে আমাদের প্রত্যাশার অতিরিক্ত মঙ্গল নিহিত ছিল কি-না।

যাতে গতর খেটে আমরা প্রত্যেকে পেট-ভাতা কামাই করতে পারি, সেজন্য ছাপাখানার আশেপাশে আমরা মাথা-পিছু তিন একর ক'রে জমি ভাগ ক'রে নিয়েছিলাম। আমি নিজেও একখণ্ড জমি পেয়েছিলাম। সাধারণ চাষীদের মতো মাটি কিংবা ইঁটের গাঁথনি, দেওয়ালের ওপর খড়ের চাল—এইরকম বাসার কথা আমরা ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল যে করুগেটেড টিন নিয়ে আমাদের ঘোরতর আপত্তি ছিল, সেই টিন দিয়েই বাড়ি ছাওয়া হতে লাগল। আসলে [illegible] লাগত বেশি। তখন আমাদের সবাই [illegible] সইছিল না।

মনসুখলাল নাজর [illegible] তিনি যুক্ত হতে চাইলেন না। [illegible] তিনি পরিচালনার কাজ করতেন। ছাপাখানায় [illegible] না। তৎসত্ত্বেও স্থির হ'ল ফিনিক্স্ প্রতিষ্ঠানের [illegible] নেবেন। কম্পোজ করবার কাজ ছাপাখানার [illegible] ও একঘেয়ে কাজ খুব কমই আছে। [illegible] দিল আমি এ কাজে [illegible] টেক্কা দি[illegible]

আগে কোনোদিন সে ছাপাখানার কাজ করেনি, কিন্তু দু-দিনে সে একজন ওস্তাদ কম্পোজিটর হয়ে উঠল। কেবল যে সে দ্রুতগতিতে কম্পোজ করত এমন নয়, ছাপাখানার অন্যান্য সব কাজ সে চট্‌পট্‌ আয়ত্ত ক'রে নিল। আমার বরাবর ধারণা, মগনলাল নিজে জানে না যে সে কেমন শক্তিধর।

তখনো আমরা ঠিকমতো গুছিয়ে বসতে পারিনি, বাড়ি-ঘর তৈরির কাজ তখনো শেষ হয়নি। সেই অবস্থাতেই আমার অসম্পূর্ণ কুলায় ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ল জোহানেস্‌বার্গ। সেখানকার কাজ আমার নজর-মনোযোগ ছাড়া দীর্ঘদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

জোহানেস্‌বার্গ-এ ফিরে যাবার পরে পোলককে বলি আমার জীবনযাত্রায় বিরাট পরিবর্তনের সূচনার কথা। তিনি যখন শুনলেন যে তাঁর ধার-দেওয়া বইটি এত কার্যকর হয়েছে, তাঁর খুশির অবধি রইল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন :

"এই নতুন কাজে আমিও কি যোগ দিতে পারি না?"

আমি বললাম : "অবশ্যই পারেন। আপনি যদি চান, আমাদের প্রতিষ্ঠানে আপনার জন্য নিশ্চয় স্থান হবে।"

"চাই মানে? আমি তো প্রস্তুত। এখন আপনারা আমায় গ্রহণ করলেই হয়।"

তাঁর এই দৃঢ়সঙ্কল্প দেখে আমি মুগ্ধ হই। *ক্রিটিক* কাগজের অধিকারীর কাছে একমাসের নোটিশ দিয়ে তিনি অব্যাহতি চেয়ে নিলেন ও কালবিলম্ব না-ক'রে ফিনিক্স্‌-এ চ'লে গেলেন। সহজে সবার সঙ্গে সমানভাবে মেশার ক্ষমতা ছিল ব'লে, দুইদিনে তিনি সকলের হৃদয় জয় করেন ও ফিনিক্স্‌-পরিবারের আপনারজন হয়ে যান। তাঁর স্বভাবটাই ছিল এমন সহজ ও সরল যে একদিনের জন্যও তিনি ভাবেননি ফিনিক্স্‌-এর জীবনযাত্রা অদ্ভুত অথবা কষ্টসাধ্য। বরঞ্চ ওইধরনের জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে সহজেই এক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে বেশিদিনের মতো ফিনিক্স্‌-এ আমি তখন থাকতে দিতে পারিনি। মিস্টার রীচ্‌ স্থির করেন, বিলেত গিয়ে তিনি তাঁর আইন অধ্যয়ন শেষ ক'রে আসবেন। একাহাতে অফিসের সমস্ত কাজ সামলানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। আমি তখন পোলক-কে বলি তিনি যেন অফিসের কাজে আমায় সহায়তা করেন ও সেইসঙ্গে এটর্নি হবার জন্য শিক্ষানবিশি করেন। তখন মনে-মনে ইচ্ছা ছিল যে একদিন আমরা দু-জনেই আইন ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে, ফিনিক্স্‌-এ গিয়ে বসব। কিন্তু তা আর কখনো ঘ'টে ওঠেনি। পোলকের স্বভাবটাই ছিল এমন যে যাঁকে তিনি বন্ধুভাবে বিশ্বাস করতেন, তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি বা কথাকাটাকাটি না-ক'রে তাঁর কথাটুকুই মেনে নিতে চাইতেন। তিনি ফিনিক্স্‌ থেকে চিঠি লিখে আমায় জানালেন যে যদিও সেখানকার জীবন তাঁর বেশ লাগছে এবং তিনি বেশ মনের আনন্দে আছেন, যদিও তাঁর মন বলছে তিনি ফিনিক্স্‌ প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার কাজে সাহায্য করতে পারবেন, তবু আমি যদি মনে করি অফিসের কাজে যোগ দিয়ে এটর্নি হতে পারলে আমরা সত্বর আমাদের আদর্শে পৌঁছুতে পারব, তাহলে তিনি ফিনিক্স্‌ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর চিঠি পেয়ে আমার খুবই ভালো লাগল। পোলক ফিনিক্স্‌ ছেড়ে জোহানেস্‌বার্গ এলেন ও এটর্নি হবার জন্য আমার কাছে নাম লেখালেন।

ঠিক এইরকম সময়ে আমার আমন্ত্রণে একজন স্কচ্ থিয়োসফিস্ট পোলক-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে আমার অফিসে শিক্ষানবিশ এটর্নিরূপে যোগ দেন। এঁকে একসময় স্থানীয় কোনো আইন পরীক্ষার পড়ায় আমি তালিম দিয়েছিলাম। এঁর নাম ছিল মিস্টার ম্যাক্‌ইনটায়র।

এইভাবে ফিনিক্স-এর আদর্শ সত্বর বাস্তবে রূপদান করার সাধু ইচ্ছাই আমায় যেন কোনো বিপরীতগামী স্রোতের গভীরে টেনে নিয়ে চলল। ভগবানের ইচ্ছা যদি অন্যরকম না-হ'ত, তাহলে হয়তো সহজ সরল জীবনের নামে আমি যে মোহজাল বিস্তার করেছিলাম, সেই ফাঁদেই আমি বন্দী হয়ে থাকতাম।

আশাতীত ও কল্পনাতীত উপায়ে আমি স্বয়ং কীভাবে রক্ষা পেলাম এবং আমার আদর্শ কীভাবে রক্ষা পেল—সেসব কথা পরে উত্থাপন করা যাবে। অতঃপর অন্য কয়েকটি প্রসঙ্গের কথা ব'লে নিতে হবে।

২২. রাখেন কৃষ্ণ

অদূর ভবিষ্যতে আমি যে ভারতে ফিরতে পারব—সে আশা ইতিপূর্বেই আমাকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলাম বড়োজোর বছরখানেকের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসব। বছর তো ঘুরে গেল, কিন্তু দেশে ফেরার সম্ভাবনা আর যেন দেখা গেল না। অগত্যা স্থির করলাম, আমার স্ত্রী ও ছেলেদের আনিয়ে নেব।

যে জাহাজে তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকা এলেন, সেই জাহাজের কাপ্তেন-এর সঙ্গে খেলতে গিয়ে আমার সেজ ছেলে রামদাসের হাত ভাঙে। কাপ্তেন বেশ ভালো ক'রে তার দেখাশোনার ব্যবস্থা করেন ও রামদাসকে জাহাজের ডাক্তারের চিকিৎসায় রাখা হয়। রামদাস যখন জাহাজ থেকে নামল, তার ভাঙা হাতটা কাঁধের সঙ্গে ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধা। ডাক্তার ব'লে দিয়েছিলেন, বাড়ি পৌঁছেই যেন কোনো ভালো ডাক্তার দিয়ে ক্ষতস্থানটুকু ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার ক'রে মলম ইত্যাদি লাগানো হয়। সেই সময়টাতে আমি আমার মাটি-চিকিৎসার সাফল্যে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী। আমার হাতুড়ে চিকিৎসায় যেসব মক্কেলের আস্থা ছিল, তাদের ওষুধের বদলে মাটি ও জলের প্রয়োগ করতে রাজি করাতেও পারতাম।

এখন প্রশ্ন হ'ল রামদাসের ভাঙা হাতের বেলা আমি কী করি? তার তখন মাত্র আট বছর বয়স। তাকে জিজ্ঞেস করি, আমি যদি তার ক্ষতস্থান ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করি, তাতে কি সে ভয় পাবে? সে হেসে বলল, ভয় পেতে যাবে কেন? ওই বয়সে তার পক্ষে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ তার বিচার বিবেচনা-করা রামদাসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু হাতুড়ে চিকিৎসা যে রীতিমতো ডাক্তারি চিকিৎসা থেকে আলাদা—সে বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল টন্‌টনে। বাড়িতে যে আমি টোট্‌কা চিকিৎসা-প্রয়োগে অভ্যস্ত, সে কথাও সে জানত। আমার চিকিৎসায় তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল ব'লে সে ব্যান্ডেজ-বাঁধা হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। ভয়ে-ভয়ে

আমি সন্তর্পণে ব্যান্ডেজটা খুললাম, ক্ষতস্থান ধুয়ে পরিষ্কার করলাম এবং তারপর তার ওপরে পরিষ্কার মাটির পুলটিস্ লাগিয়ে, হাতটা যেমন ঝুলিয়ে বাঁধা ছিল তেমন ক'রে বেঁধে রাখলাম। এইভাবে চলল দিনের পর দিন। প্রায় একটা মাস ধ'রে। ক্ষতস্থানটুকু তার মধ্যে সম্পূর্ণ সেরে উঠল। কোনো বিঘ্ন ঘটেনি, উপরন্তু ডাক্তারি চিকিৎসায় যে সময়ের মধ্যে ঘা সেরে যাবে ব'লে জাহাজের ডাক্তার বলেছিলেন, মাটি-চিকিৎসায় তার চেয়ে বেশি সময় লাগেনি।

এই ঘটনায় ও অন্য পরীক্ষার ফলে গৃহ-চিকিৎসায় আমার আস্থা বেড়ে যায় এবং আমি অধিকতর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এসব প্রয়োগ করতে থাকি। প্রয়োগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হতে থাকে। একটা সময় ক্ষত-চিকিৎসায়, জ্বর, অজীর্ণ ও লিভার সংক্রান্ত এবং অন্যান্য অসুখেও, আমি মাটি, জল ও উপবাসের প্রয়োগ করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগ আরাম করতেও পেরেছিলাম। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে আমার যে পরিমাণ আত্মপ্রত্যয় ছিল, আজ আর তা আমার নেই। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখাও গেছে এরকম পরীক্ষায় বিপদের সম্ভাবনাও বর্তমান আছে।

এসব প্রয়োগ যে সফল হয়েছিল সেই কথা প্রমাণ করার জন্য আমি এই প্রয়োগের কথা বলছি না। সর্বতোভাবে কোনো প্রয়োগ যে সফল হয়েছে, তেমনটা আমি দাবি করতে পারি না। নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে কোনো চিকিৎসকও সেরকম দাবি করতে পারেন না। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় আমার উদ্দেশ্য হ'ল কেবল এই কথা বলা যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা যিনি করতে চান, তাঁর উচিত সর্বাগ্রে সেসব পরীক্ষা নিজের ওপর প্রয়োগ করা। তা যদি করা হয়, তাহলে অনতিবিলম্বে সত্য আবিষ্কৃত হয়, আর পরীক্ষা যদি সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়, তাহলে ভগবান গবেষকের সহায় হন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেমন বিপদের সম্ভাবনা ছিল, ঠিক তেমনি বিপদের সম্ভাবনা ছিল ইউরোপীয়দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ-স্থাপনের পরীক্ষায়। অবশ্য বিপদের ঝুঁকিটা দুই ক্ষেত্রে দুইরকমের। কিন্তু সেসব সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি না-দিয়েই আমি ইউরোপীয়দের নিকট-সম্পর্কে এসেছিলাম।

পোলক-কে আমার সঙ্গে আমার বাসায় এসে বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ করলাম। আমরা একসঙ্গে রইলাম ঠিক মায়ের পেটের ভাইয়ের মতন। যে মহিলা অল্পদিনের মধ্যে মিসেস্ পোলক হলেন, তাঁর সঙ্গে পোলক বেশ-কয়েকবছর ধ'রে বাগদত্ত হয়েছিলেন। সুসময়ের অপেক্ষায় তাঁরা বিয়ের দিনক্ষণ পিছিয়ে রাখছিলেন। আমার ধারণা, বিবাহিত-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, পোলক-এর ইচ্ছা ছিল তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করেন। রাস্কিন-এর রচনার তাৎপর্য তিনি আমার চেয়ে ঢের বেশি ভালো বুঝতেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতার আওতায় তিনি মানুষ হয়েছিলেন ব'লে, রাস্কিন-এর শিক্ষা তৎপর হয়ে তাঁর জীবনে ও আচরণে অনুসরণ করায় তাঁর যেন বাধা ছিল। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি : "হৃদয়ে-হৃদয়ে যেখানে মিলন হয়ে গেছে, যেমন হয়েছে আপনাদের বেলা, সেখানে কেবল আর্থিক অনটনের কথা ভেবে বিয়ে পিছিয়ে রাখা কোনো কাজের কথা নয়। দারিদ্র যদি প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে গরীবেরা তো কোনোকালেই বিয়ে

করতে পারে না। তাছাড়া, আপনি এখন তো আমার বাড়ির লোক, সুতরাং সংসার চালাবার খরচ জোগাড় করার কোনো প্রশ্নই নেই। আমার তো মনে হয়, কালবিলম্ব না-ক'রে আপনার বিয়েটা সেরে ফেলা উচিত।"

ইতিপূর্বেই বলেছি পোলক-কে কোনোদিন আমায় এককথা দু-বার ক'রে বলতে হয়নি। আমার যুক্তির সারবত্তা তিনি ঠিকই বুঝলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে ভাবী মিসেস্ পোলক-কে চিঠি লিখলেন। তিনি তখন বিলেতে। তিনি খুশি হয়ে বিবাহ-প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি জানালেন ও কয়েকমাসের মধ্যে জোহানেস্‌বার্গ এসে পৌঁছলেন। বিয়ের জন্য কিছু খরচখরচা করা, এমন-কি বিয়ের কনের জন্য বিশেষ সাজসজ্জার ব্যবস্থা করার কোনো প্রসঙ্গ ছিল না। বিবাহ-বন্ধন পাকা-পোক্ত করার জন্য বিশেষ কোনো ধর্মানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন ছিল না—কারণ মিসেস্ পোলক ছিলেন খ্রিষ্টান আর পোলক নিজে য়িহুদি। সদাচারের ধর্ম ছিল উভয়ের ধর্ম।

প্রসঙ্গত এই বিয়ে নিয়ে একটি যে মজার ব্যাপার ঘটেছিল তার উল্লেখ করতে হয়। ট্রান্সভাল্-এ শ্বেতাঙ্গদের বিবাহের যিনি রেজিস্ট্রার, কালো বা নিকৃষ্ট বর্ণের লোকেদের বিবাহ দিতে তাঁর কোনো এক্তিয়ার ছিল না। পোলক-দের বিয়েতে আমি ছিলাম মিতবর। মিতবর হওয়ার জন্য ইউরোপীয় কাউকে যে পাওয়া যেত না, তা নয়, কিন্তু পোলক-এর তা নিয়ে ঘোরতর আপত্তি ছিল। সুতরাং আমরা তিনজন একসঙ্গে চ'লে গেলাম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার-এর অফিসে। যে বিয়েতে আমি মিতবর, সে বিয়ের বর-কনে যে শ্বেতাঙ্গ হবে তার নিশ্চয়তা কী? রেজিস্ট্রার প্রস্তাব করলেন বিয়েটা অনুসন্ধান-সাপেক্ষে মুলতবি রাখা হোক্। পরের দিন ছিল রবিবার। তার পরের দিন আবার নববর্ষের দিন, সুতরাং ছুটির দিন। ওই সামান্য ওজুহাতে বিবাহের মতো একটি সুগম্ভীর সামাজিক অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ সব পাল্‌টে যাবে—এ আমার কাছে অসহ্য মনে হ'ল। রেজিস্ট্রেশন বিভাগের বড়ো কর্তা চীফ্ ম্যাজিস্ট্রেট-এর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বিবাহার্থী-যুগলকে সঙ্গে ক'রে আমি সটান তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি সব কথা শুনে প্রচুর হাসতে লাগলেন এবং আমার হাতে রেজিস্ট্রার-এর নামে একখানা চিঠি দিয়ে দিলেন। বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়ে গেল।

এপর্যন্ত যেসব ইউরোপীয় আমাদের সঙ্গে বসবাস করেছেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে আমার পূর্ব থেকে অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল। এবার আমাদের সংসারে এমন একটি ইংরেজ মহিলা এলেন, যিনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। নববিবাহিত দম্পতির সঙ্গে কোনো কারণে আমাদের মনকষাকষি হয়েছে, এরকম ঘটনা আমার তো মনেই পড়ে না। মিসেস্ পোলক ও আমার স্ত্রীর মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা যদি কিছু ঘ'টেও থাকে, তাহলে তা এমন-কিছু নয় যেমনটা যে কোনো একত্রবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত পরিবারে না-ঘটে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, আমাদের পরিবার ছিল মূলত পাঁচমিশেলি। নানা জাতের নানা মেজাজের থেকে আমাদের পরিবারে অবাধে আসা-যাওয়া মেলামেশা করতে পারত। আসলে আমরা যদি ঠিকমতো ভেবে দেখতে পারি, দেখতে পাব, এক পরিবারে মিলেমিশে থাকাটা আত্মীয়-সম্বন্ধ বা আপন-পরের ভেদাভেদের ওপর নির্ভরশীল। আমরা সকলে এক পরিবারের লোক।

ওয়েস্ট-এর বিয়ের প্রসঙ্গটাও এখানে ব'লে নিতে হয়। আমার জীবনের এই পর্বে ব্রহ্মচর্য বিষয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা তখনো ঠিক যেন দানা বাঁধেনি। তাই আমার অবিবাহিত বন্ধুদের বিবাহ দিয়ে ঘরসংসারী ক'রে তোলার জন্য আমার দস্তুরমতো একটা আগ্রহ ছিল। ওয়েস্ট যখন তাঁর মা-বাবাকে দর্শন করার জন্য লাউথ যান, আমি তাঁকে বলেছিলাম, সম্ভব হ'লে তিনি যেন বিবাহ ক'রে সস্ত্রীক ফিরে আসেন। ফিনিক্স্ ছিল আমাদের সবাইকার গৃহ-পরিবার। আর আমরা ভাবতাম, আমরা সবাই যেন চাষাভুষো হয়ে গেছি। তাই বিবাহ ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নিয়ে আমাদের কোনো ভয় বা সঙ্কোচ ছিল না। ওয়েস্ট লীস্টার থেকে একজন সুন্দরী তরুণীকে জীবনসঙ্গিনী ক'রে ফিনিক্স্-এ ফিরলেন। মিসেস্ ওয়েস্ট-এর পরিবারের লোকেরা লেস্টার-এর এক জুতোর কারখানায় কাজ করতেন। তিনি নিজেও কিছুদিন সেই কারখানায় কাজ করেছিলেন। তাঁকে যে আমি সুন্দরী বলেছি সে তার চরিত্রমাধুর্যের গুণে। তাঁর এই গুণ ছিল ব'লে তাঁকে দেখামাত্র আমার ভালো লেগেছিল। হৃদয় যদি পবিত্র ও নির্মল হয়, মুখের লাবণ্যে তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাকেই আমি বলি সত্যকার সৌন্দর্য। ওয়েস্ট-এর সঙ্গে তাঁর শাশুড়িও এসেছিলেন। বৃদ্ধা আজও জীবিত আছেন। পরিশ্রম করায় তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না আর তিনি এমন খোশমেজাজে সব কাজকর্ম করতেন যে আমরা সকলে তাঁর কাছে হার মেনেছিলাম।

শ্বেতাঙ্গ বন্ধুদের যেমন বিবাহ করায় রাজি করালাম, তেমনি ভারতীয় বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহ দিলাম দেশ থেকে তাঁদের পরিবারবর্গকে ফিনিক্স্-এ আনিয়ে নিতে। এইভাবে ফিনিক্স্ একটি পল্লীগ্রামের রূপ নিল। ছয়টি পরিবার সেখানে এসে বাসা বাঁধল। এবং তাদের বংশবৃদ্ধি পেতে লাগল।

২৩. গার্হস্থ্যের দিকে একনজর

আগেই বলেছি যদিচ সংসার-খরচটা ছিল মোটারকমের, জীবনযাত্রা সরলীকরণের দিকে চেষ্টাটা শুরু হয়েছিল ডারবান্-এ থাকতেই। কিন্তু রাস্কিন-এর শিক্ষার প্রভাবে জোহানেস্‌বার্গ-এর বাড়িতে যেসব অদলবদল করা হয়, তাতে খরচ-খরচা কঠোরভাবে কমিয়ে ফেলা হতে থাকে।

ব্যারিস্টর-এর বাড়ি যতটা সম্ভব সাদাসিধে করা যায়, তার চেষ্টা করতে আমি ত্রুটি করিনি। কিন্তু কিছু আসবাবপত্র না-রেখে তো উপায় ছিল না। সুতরাং অদলবদলটা বাইরে যতটা-না হয়েছিল চার চাইতে অনেক বেশি হয় অন্তরে। সবরকম কায়িক পরিশ্রমের কাজ নিজের হাতে করবার আগ্রহ বেড়ে যায়। আমার ছেলেদেরও আমি তদনুসারে মানুষ করতে থাকি।

বাজারের পাউরুটি কেনা আমরা বন্ধ ক'রে দিলাম। কুহ্ন-এর পদ্ধতিতে আমরা বিনা-খাম্বিরে আ-ছাঁটা আটা দিয়ে পাউরুটি তৈরি করতে লাগলাম। মিলের আটায় এরকম

রুটি তৈরি করা যায় না। মনে হ'ল, হাতে পেষাই আঁটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, সরল জীবনযাত্রার সহায়ক ও দামের দিক থেকেও বেশ সস্তা হবে। আমি তাই সত্তর পাউন্ড দাম দিয়ে একটা হাতে ঘোরাবার জাঁতা কিনে ফেললাম। একজন লোকের পক্ষে লোহার চাকাটা ঘোরানো একটু শক্ত, কিন্তু দু-জনে ঘোরালে বেশ সহজ। পোলক, আমি ও ছেলেরা সচরাচর চাকাটা ঘোরাতাম। আমার স্ত্রীও মাঝে-মাঝে হাত লাগাতেন, যদিচ জাঁতায় আটা ভাঙার সময়টা ছিল তাঁর রসুই শুরু করার সময়। দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার পর মিসেস্ পোলক-ও এ কাজে যোগ দিলেন। জাঁতা ঘোরাবার কাজটা ছেলেদের শরীর-স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ উপকারী হয়েছিল। জাঁতা ঘোরাবার কাজ বা অন্য-কোনো কাজ কখনো তাদের ঘাড়ে চাপাতে হ'ত না। কাজ ছিল তাদের কাছে খেলা। খেলার ছলে তারা এসে জাঁতা ঘোরাত। একটু ক্লান্ত হ'লেই কাজের মাঝপথে তাদের ছুটি নেবার কোনো বারণ ছিল না। কিন্তু আমার এই ছেলেরা আমার কাজ করতে কখনো ক্লান্তি মানত না। এইরকম অন্যান্য ছেলেদের কথা পরে বলব। কাজে কুঁড়ে ছেলে যে আমি একেবারে পাইনি তা নয়। কিন্তু বেশিরভাগ ছেলেই কাজের আনন্দে কাজ করত। তখনকারকালে কাজে পরাঙ্মুখ বা অল্প মেহনতে থ'কে যাবার মতন ছেলে, আমার খুব কমই জুটেছে।

বাড়ির কাজ করবার জন্য একটি চাকর ছিল। কিন্তু সে বাড়িতে থাকত পরিবারেরই একজনের মতো। ছেলেরা সব তার কাজে মদৎ দিত। পায়খানার মলমূত্র মিউনিসিপ্যালিটির মেথর নিয়ে যেত, কিন্তু পায়খানার পাত্র ও বসবার জায়গা আমরা নিজেরাই পরিষ্কার ক'রে নিতাম, চাকরকে দিয়ে সে কাজ করাতাম না, তার কাছ থেকে সে কাজ প্রত্যাশাও করতাম না। ছেলেদের পক্ষে এই শিক্ষা বেশ কার্যকর হয়েছিল। আমার কোনো ছেলেই মেথরের কাজ ঘৃণার চোখে দেখত না, স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলিও তারা বেশ রপ্ত ক'রে নিয়েছিল। জোহানেস্‌বার্গ-এর বাড়িতে অসুখ-বিসুখ বড়ো একটা হ'তই না। কখনো কারো অসুখ হ'লে ছেলেরা উপযাচক হয়ে সেবা ও দেখাশোনার ভার নিত। তাদের পুথিগত বিদ্যার প্রতি আমি মনোযোগ দিইনি এমন কথা আমি মানি না, তবে এ কথাও ঠিক যে সে বিদ্যা জলাঞ্জলি দিতে আমি একটুও দ্বিধা করিনি। এই নিয়ে আমার বিরুদ্ধে আমার ছেলেদের কিছু অভিযোগ করার কারণ থাকতে পারে। মাঝে-মাঝে তারা যে এরকম অসন্তোষ প্রকাশ না-করেছে তা নয়। এদিকে আমার কিছুটা ত্রুটি থেকে গেছে—সব মেনে নেওয়াই ভালো। তারা পুথিগত বিদ্যা পায় এ বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল। আমি নিজেই সে বিদ্যা তাদের দেবার জন্য প্রযত্নও করেছি, কিন্তু এ কাজে প্রায়ই কোনো-না-কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে। বাড়িতে শিক্ষার জন্য আমি কোনো ব্যবস্থা করিনি ব'লে, রোজ আমি তাদের সঙ্গে নিয়েই আমার অফিস পর্যন্ত যেতাম, আবার অফিসের কাজকর্ম সেরে একসঙ্গে বাড়ি ফিরে আসতাম। যাতায়াতে এই পাঁচ মাইল আমাদের পক্ষে উত্তম ব্যায়ামের কাজ করত। এইভাবে পথ চলতে গিয়ে এবং অন্য লোক সঙ্গে না-থাকলে আলাপ-আলোচনায় মুখে-মুখে তাদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতাম। আমার বড়ো ছেলে হরিলাল ভারতেই থেকে গিয়েছিল। তাকে বাদ দিলে আমার অন্য ছেলেরা জোহানেস্‌বার্গ-এ এইভাবেই মানুষ হয়েছিল। যদি একেবারে

নিয়ম ক'রে প্রতিদিন একটা ঘণ্টাও আমি তাদের পুথিগত বিদ্যার জন্য দিতে পারতাম, আমার ধারণা, তারা আদর্শ শিক্ষা লাভ করতে পারত। তাদের জন্য আমি যথেষ্ট পুথিগত বিদ্যার আয়োজন করতে পারিনি ব'লে তাদের যেমন খেদ আছে আমারও তেমনি। বড়ো ছেলে হরিলাল তো অন্য লোকের অজ্ঞাতসারে আমার কাছে বহুবার এ নিয়ে তার অভিযোগ জানিয়েছে। এমন-কি, পরে খবরকাগজ মারফৎ প্রকাশ্যে তার অনুযোগ জানাতে সে বিরত হয়নি। আমার অপর ছেলেরা আমায় অনন্যোপায় মনে ক'রে উদারভাবে আমার ত্রুটি মার্জনা করেছে। এ নিয়ে আমি খুব যে মর্মাহত, এমন কথা আমি বলব না। আমার আপশোস বলতে যদি কিছু থেকে থাকে সে এই কারণে যে আমি আদর্শ পিতা হতে পারিনি। আমি এখনো এই কথাই বলব যে আমার ছেলেদের পুথিগত বিদ্যা আমি যদি কোনো উৎসর্জন ক'রে থাকি তাহলে সে হল সমাজসেবার বেদীতে। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে সমাজসেবার যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম, আজ যদি তা ভুয়ো ব'লে প্রতিপন্নও হয়, তত্রাচ আমি বলব তাদের চরিত্রগঠনের জন্য যা কিছু করা দরকার, তা করতে আমি কোনো ত্রুটি করিনি। এ বিষয়ে আমার বিবেক পরিষ্কার। আমি মনে করি, সন্তানদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করা প্রত্যেক মা-বাপের অবশ্যকর্তব্য। আমার সমস্ত উদ্যম সত্ত্বেও যদি আমার ছেলেদের চরিত্রের মধ্যে ত্রুটি দেখা যায়, তাহলে তার জন্য আমার যত্নের অভাব দায়ী নয়, দায়ী হ'ল ছেলেদের বাপ-মায়ের স্বভাবচরিত্রের ত্রুটি। সেগুলি সন্তানের স্বভাবচরিত্রে প্রতিফলিত হয় ব'লে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

মা-বাবার আকৃতি যেমন সন্তানে অর্শায় তেমনি তাদের দোষ-গুণও। পরিবেশেরও একটা গুরুত্ব অবশ্যই থাকে। কিন্তু সূচনায় যে মূলধন নিয়ে সন্তান তার জীবন আরম্ভ করে সে তার পুরুষানুক্রম পাওয়া সম্পত্তি। বংশার্জিত দোষ-ত্রুটি সন্তানেরা সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম ক'রে এসেছে, এরকম দৃষ্টান্তও আমি দেখেছি। এটা যে সম্ভবপর হয় তার কারণ এই যে পবিত্রতা হ'ল আত্মার সহজাত গুণ।

ছেলেদের ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে কি-না—এই নিয়ে পোলকের সঙ্গে প্রায়ই আমার তুমুল বচসা হ'ত। বহুকাল থেকে আমার বদ্ধমূল ধারণা এই যে যেসব ভারতীয় মা-বাপ সন্তানদের শিশুকাল থেকে ইংরেজিতে চিন্তা করতে ও কথা বলতে শেখান, তারা সন্তানদ্রোহী ও দেশদ্রোহী। দেশের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উত্তরাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত রাখার দরুন, তাদের সন্তানেরা তদনুপাতে দেশসেবার কাজে অনুপযোগী হয়। এরকম বিশ্বাসে আমি দৃঢ় ছিলাম ব'লে, আমি একপ্রকার ইচ্ছা ক'রেই সবসময় ছেলেদের সঙ্গে গুজরাতিতে কথা বলতাম। পোলকের এটা আদৌ পছন্দ হ'ত না। সে মনে করত আমি ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছি। সে তার সমস্ত যুক্তির জোরে, প্রেমের জোরে আমায় বোঝাতে চাইত যে ছেলেরা যদি শিশুকাল থেকে ইংরেজির মতো একটি বিশ্বজনীন ভাষা আয়ত্ত করে, তাহলে জীবনের দৌড়বাজিতে তারা অতি সহজেই অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারবে ও অনেক বেশি গুছিয়ে নিতে পারবে। পোলক-এর যুক্তি আমার মনঃপূত হয়নি। এখন আর আমার ঠিক মনে পড়ে না, আমার আচরণ সঙ্গত ব'লে পোলক স্থির নিশ্চিত

হয়েছিল কি-না। সম্ভবত আমার জেদ দেখেই এ বিষয়ে সে আর বেশি কথাকাটাকাটি করতে চায়নি। এ তো প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা। তখন আমি যে মত পোষণ করতাম, এই বিশ বছরে অনেক-কিছু দেখেশুনে আমার সেই মত আরো বেশি দৃঢ় হয়েছে। পুরোপুরি পুথিগত বিদ্যা না-পেয়ে আমার ছেলেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে, তবু মাতৃভাষার সঙ্গে যে পরিচয় তাদের আপনা থেকেই হয়েছে, তাতে তাদেরও লাভ হয়েছে, দেশেরও। তা না-হ'লে আজ তার নিজের দেশে পরবাসী ব'লে পরিগণিত হ'ত। দুটো ভাষা তারা স্বাভাবিকভাবেই আয়ত্ত করেছে—মাতৃভাষা গুজরাতি ও দক্ষিণ আফ্রিকার মুখ্যভাষা ইংরেজি। প্রতিদিন বহু ইংরেজ বন্ধুর সংসর্গে আসার ফলে তারা মোটামুটি সহজেই ইংরেজি বলতে বা লিখতে পারে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে আপনা থেকেই তারা দ্বি-ভাষিক।

২৪. জুলু 'বিদ্রোহ'

জোহানেস্‌বার্গ-এ সংসার পেতে ভাবলাম এবার আমি স্থিতিবান্ হলাম। কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বসা আমার অদৃষ্টে নেই। যেই ভাবলাম, এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচা যাবে, অমনি একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল। খবরকাগজ থেকে জানা গেল, নাটাল-এ জুলুরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। জুলুদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ ছিল না, তারা কখনো কোনো ভারতীয়ের ক্ষতিসাধন করেনি। 'বিদ্রোহ' কথাটাই সত্য না মিথ্যা—সে বিষয়ে আমি সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু তখনকার দিনে আমার একান্ত বিশ্বাস ছিল যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য সমস্ত জাতের পক্ষে কল্যাণকর। আমার রাজভক্তি এতই খাঁটি ছিল যে ভুলেও আমি কখনো চাইতাম না যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ক্ষতি হোক্। 'বিদ্রোহে'র ন্যায়-অন্যায় বিচার করার ওপর আমার সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে—এ আমি তখন ভাবতেও পারতাম না। নাটাল-এ প্রতিরক্ষার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল। প্রয়োজন হ'লে এই বাহিনীতে নূতন লোকও ভর্তি করা হ'ত। খবরকাগজ থেকে জানা গেল 'বিদ্রোহ' দমন করার জন্য এই বাহিনী সংগঠনের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

নাটাল-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার দরুন আমি নিজেকে নাটাল-বাসী ব'লে মনে করতাম। আমি গভর্নরকে চিঠি লিখে জানালাম, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আহতদের সেবার জন্য আমি ভারতীয়দের মধ্যে থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স দল গঠন করতে প্রস্তুত আছি। তিনি পত্রপাঠ আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

এত তাড়াতাড়ি প্রস্তাব গৃহীত হবে ব'লে আমি আশা করিনি। তবু গভর্নরকে চিঠি লেখার আগেই মোটামুটি প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা আমি ক'রেই রেখেছিলাম। আমার প্রস্তাব গৃহীত হ'লে আমি স্থির করেছিলাম যে জোহানেস্‌বার্গ-এর সংসারটা তুলে দেব। পোলক কোনো একটা ছোটো বাড়িতে উঠে যাবেন এবং ছেলেদের নিয়ে আমার স্ত্রী গিয়ে বসবাস করবেন ফিনিক্স্-এ। এই ব্যবস্থায় আমার স্ত্রীর পূর্ণ সম্মতি ছিল। এরকম কোনো কাজে তাঁর দিকে

কখনো কোনো বাধা পেয়েছি ব'লে আমার মনে পড়ে না। তাই গভর্নরের কাছ থেকে জবাব পাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমি বাড়িওয়ালাকে নিয়ম-মাফিক একমাসের নোটিস দিয়ে দিলাম। কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলাম ফিনিক্স্-এ, কিছু পোলকের কাছে রেখে দিলাম।

ডারবান্-এ গিয়ে আমি লোকজনের সন্ধান করতে লাগলাম। বেশ-বড়ো একটা দল গঠন করার দরকার ছিল। আমরা শেষপর্যন্ত দলে চব্বিশজন হলাম। দলে আমি বাদে আর-চারজন ছিলেন গুজরাতি। একজন পাঠান বাদে বাদ-বাকি আর-সকলে ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় গিরমিট-মুক্ত লোক।

আমায় পদাধিকার দেবার উদ্দেশ্যে ও কাজের সুবিধার জন্য চলিত রেওয়াজ অনুসারে চিকিৎসা-বিভাগের প্রধান আমায় অস্থায়ীভাবে সার্জেন্ট-মেজর পদে নিযুক্ত করেন। আমার নির্বাচিত তিনজনকে 'সার্জেন্ট' ও একজনকে 'করপোরাল' নিযুক্ত করা হয়। সরকারের কাছ থেকে জঙ্গী পোশাকও আমরা পেলাম। ছয় সপ্তাহ ধ'রে আমাদের দল সেবাকর্মে সক্রিয় ছিল। 'বিদ্রোহ'-এর জায়গায় পৌঁছবার পর আমরা দেখলাম, সেখানে এমন-কিছু ছিল না যাকে 'বিদ্রোহ' ব'লে অভিহিত করা যায়। প্রতিরোধের কোনো লক্ষণ কোথাও দেখা গেল না। জুলুদের ওপর একটি নূতন কর চাপানো হয়েছিল। জুলুদের এক দলপতি তাঁর দলের লোকেদের বারণ ক'রে দেন এই নতুন কর দিতে। একজন সারজেন্ট কর আদায় করতে গিয়ে তাদের হাতে খুন হয়। এই সামান্য ব্যাপারটাকেই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে 'বিদ্রোহ' নাম দেওয়া হয়। সে যা-ই হোক্, আমার সত্যকার টান ছিল জুলুদের প্রতি। সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স-এ গিয়ে যখন শুনলাম, আমাদের দলের মুখ্য কাজ হবে আহত জুলুদের সেবা-শুশ্রূষা করা, আমি মনে-মনে খুশি হয়েছিলাম। সেখানে আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ডাক্তার আমাদের স্বাগত করার পর বলেন যে শ্বেতাঙ্গ অ্যাম্বুলেন্স দল জুলুদের সেবা-শুশ্রূষা করতে নারাজ। জুলুদের আহতস্থানে পচন শুরু হয়েছে। তিনি তাদের নিয়ে যে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। নির্দোষ জুলু বেচারাদের পক্ষে আমাদের আসাটাকে তিনি ভগবানের করুণা ব'লে বর্ণনা করলেন। তারপর আমাদের হাতে ব্যান্ডেজ, জীবাণুনাশক ওষুধপত্র ও অন্যান্য সব সরঞ্জাম দিয়ে, নিজে সঙ্গে ক'রে জোড়াতাড়া দেওয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। আহত জুলুরা, আমাদের দেখে খুব খুশি। শ্বেতাঙ্গ সৈনিকেরা বেড়ার ওদিক থেকে উঁকি মেরে আমাদের লক্ষ করত ও জুলুদের শুশ্রূষা করতে বারণ করত। তাদের কথায় আমরা কান দিতাম-না ব'লে, তারা রেগেমেগে অকথ্য ভাষায় জুলুদের গালাগাল দিত।

ক্রমে-ক্রমে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। চেনাশোনা হবার পর তারা আর আমাদের অ্যাম্বুলেন্স দলের কাজে বাধা সৃষ্টি করত না। তাদের অধিনায়কদের মধ্যে ছিলেন কর্নেল স্পার্কস্ ও কর্নেল ওয়াইলি। ১৮৯৬ সনে এঁরা দুজনই আমার ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। আমার আচরণে তাঁরা খুবই আশ্চর্য হন ও আমায় বিশেষভাবে ডেকে ধন্যবাদ জানান। তাঁরাই আমাকে জেনারেল ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আপনারা যেন ভেবে বসবেন না যে এঁরা সত্যিকার পেশাদার সৈনিক ছিলেন। কর্নেল ওয়াইলি ছিলেন

ডারবান্-এর একজন নাম-করা উকিল। কর্নেল স্পার্কস্ একটি বড়ো কসাইখানার মালিক ছিলেন। জেনারেল ম্যাকেঞ্জি ছিলেন নাটাল-এর একজন নামকরা খামারবাড়ির কর্তা। এঁরা সকলেই স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহে শিক্ষালাভ করেন ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

যেসব আহত জুলুদের সেবার ভার আমরা পেয়েছিলাম, তারা কেউই যুদ্ধে আহত হননি। এদের একদলকে সন্দেহ ক'রে বন্দী করা হয়। জেনারেল-এর আদেশে এদের বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। এরা জখম হয়েছিল সেই চাবুকের ঘায়ে। বিনা-চিকিৎসায় সেইসব ঘা পেকে উঠেছিল। আহতদের একদল ছিল মিত্রপক্ষীয় জুলু। শত্রুপক্ষ থেকে আলাদা ক'রে নেবার জন্য এদের একধরনের প্রতীক চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গ সৈনিকেরা ভুল ক'রে এদের ওপর গুলি চালিয়েছিল।

আহত জুলুদের পরিচর্যা করা ছাড়াও আমার অন্য-একটি কাজ জুটেছিল, তা হ'ল শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের জন্য ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ওষুধ তৈরি করা। ডক্টর বুথ-এর সেই ছোটো হাসপাতালে একবছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায়, এইধরনের ওষুধ তৈরির কাজ আমার কাছে বেশ সহজসাধ্য হয়েছিল। এই কাজ করতে গিয়ে বহু শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়।

যে সৈন্যদলের সঙ্গে আমাদের অ্যাম্বুলেন্স দল যুক্ত করা হয়—তারা ক্ষিপ্রগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ক্রমাগত ছুটে বেড়াত। যেখানেই বিপদের সম্ভাবনা, সেইখানেই আমাদের ছুটতে হ'ত। আমাদের দলের অধিকাংশ ছিল অশ্বারোহী সেনাদল। ছাউনি তুলে অশ্বারোহী সেনাদল এগিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের পিছু-পিছু ডুলি কাঁধে আমাদের পায়দল ছুটতে হ'ত। একাধিকবার আমাদের দৈনিক চল্লিশ মাইল পর্যন্ত মার্চ ক'রে চলতে হয়েছে। কিন্তু গন্তব্য যেখানেই হোক্-না-কেন, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা তাঁর কাজ করবার সুযোগ লাভ ক'রে ধন্য হয়েছি। আমাদের মুখ্য কাজ হ'ত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের ভুলে যেসব মিত্রপক্ষীয় জুলু আহত হ'ত, ডুলিতে ব'য়ে তাদের ছাউনিতে আনা ও তাদের সেবা ও পরিচর্যা করা।

২৫. হৃদয়মন্থন

জুলু 'বিদ্রোহে'র ব্যাপার থেকে আমি প্রচুর নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, প্রচুর চিন্তার খোরাকও পেয়েছিলাম। বুয়র যুদ্ধ থেকে যুদ্ধের বিভীষিকা সম্বন্ধে ততটা ভালো বুঝতে পারিনি, যতটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম এই 'বিদ্রোহ'-দমনের যুদ্ধ থেকে। আসলে এটা তো যুদ্ধ ছিল না। ছিল মানুষ-শিকার। এ কেবল আমার একলার মত নয়, যেসব ইংরেজের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। নিরপরাধ নির্দোষ জুলুদের গ্রামে প্রত্যেকদিন সকালবেলা যখন বাজি-পট্‌কার মতো দুড়ুম-দুড়ুম শব্দ ক'রে রাইফেলের গুলি ফাটত, মনে হ'ত এ যেন আমার পক্ষে একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা, মনে হ'ত বেশিদিন এমনটা সহ্য করতে পারব না। কিন্তু অসহ্য

হ'লেও আমি কোনোপ্রকারে সহ্য করতাম এই কথা ভেবে যে, আমার সেবাদলের কাজ তো কেবল আহত জুলুদের পরিচর্যা করা। আমি বেশ বুঝতে পারতাম, আমরা না-দেখলে তাদের আর-কেউ দেখত না। এই সেবার কাজ ক'রে আমার বিবেক-বুদ্ধিকে আমি শান্ত করতাম।

আরো অনেকগুলি কারণে মনের মধ্যে চিন্তার উদয় হ'ত। জায়গাটা ছিল জনবিরল। পাহাড় ও উপত্যকার মাঝে-মাঝে, দূরে-দূরে ছড়ানো জুলুদের 'ক্রাল' অথবা গ্রাম। জুলুরা সাদাসিধে সরল স্বভাব-জাত, শ্বেতাঙ্গ বিদেশীরা তাদের বলে 'অসভ্য'। আহতদের ব'য়ে নিয়ে যাবার সময়, অথবা এমনিতেই যখন এই সুদূর-বিস্তার নিস্তব্ধ নির্জনতার মধ্যে দিয়ে মার্চ ক'রে চলতাম, গভীর চিন্তার মধ্যে আমার সমস্ত মন মগ্ন হয়ে যেত।

আমি ব্রহ্মচর্য ও তার তাৎপর্য বিষয়ে অনেক চিন্তা করি। ব্রহ্মচর্যের উপযোগিতায় আমার আস্থা একেবারে যেন মনের গভীরে প্রবেশ করে। আমার সহকারীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার একটু-আধটু আলোচনাও হয়। ব্রহ্মচর্য-বিনা আত্ম-উপলব্ধি যে ঘটে না সে বোধ তখনো আমার জাগেনি। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম, যদি কেউ একমনা হয়ে মানবজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়, তাহলে তার পক্ষে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করা ছাড়া গতি নেই। আমার মন বলছিল, এইধরনের সেবার কাজে আমায় নিজেকে আরো বেশি ক'রে দিতে হবে। যদি পারিবারিক জীবনের ভোগবিলাসে জড়িয়ে পড়ি, সন্তান উৎপাদন ও সন্তানের লালন-পালন নিয়ে দিন কেটে যায়, তবে তো সেবার কাজ আমি যথাযথভাবে করতে পারব না।

এককথায় বলতে গেলে, যুগপৎ ইন্দ্রিয়সেবা ও আত্মার উন্নতিসাধন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। বর্তমান অবস্থার কথাটাই ধরা যাক্, আমার পত্নী যদি সন্তানসম্ভবা হতেন, তাহলে কি এই সেবার কাজে এমন সহজে আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম? ব্রহ্মচর্য অবলম্বন না-করলে নিজের পরিবার ও পরিবারের বাইরে সমাজ ব'লে যে বৃহত্তর পরিবার আছে—এই দুই পরিবারের সেবার কাজ একসঙ্গে চলতে পারে না। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করলে একটির সঙ্গে অপরটিকে মানিয়ে নেবার কোনো বাধা থাকে না।

এইভাবে চিন্তা করতে গিয়ে, আমি চূড়ান্তভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রতগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। এই ব্রতগ্রহণের সম্ভাবনার কথা মনে আসতেই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আনন্দের উন্মাদনা এল। বাধাবন্ধন-মুক্ত কল্পনার চোখে যেন দেখতে পেলাম উদার বিস্তৃত সেবার ক্ষেত্র- কোথাও যেন তার সীমারেখা নেই।

এইভাবে যখন আমার কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম একপ্রকার চরমে উঠেছে, খবর এল যে বিদ্রোহ দমনের কাজটা প্রায় শেষ হবার মুখে। অল্পদিনের মধ্যে আমরা ছুটি পাব। এর দু-একদিনের মধ্যে আমাদের ছুটির হুকুম এসে গেল। আমরা সবাই নিজ-নিজ বাড়িতে ফিরে গেলাম।

এর কিছুদিন পরেই গভর্নরের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। আমাদের এম্বুলেন্স দলের কাজের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বিশেষভাবে তাঁর ধন্যবাদ জানালেন।

ফিনিক্স্-এ পৌঁছেই আমি গভীর আগ্রহে ছগনলাল, মগনলাল, ওয়েস্ট ও আর-সকলের কাছে ব্রহ্মচর্যের বিষয় উত্থাপন করি। কথাটা তাদের ভালো লাগে এবং তারা ব্রতগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা মেনেও নেয়। সেইসঙ্গে ব্রহ্মচর্য-পালন করা কত যে কঠিন সে কথাটাও তারা জানায়। কেউ-কেউ সাহসে ভর দিয়ে ব্রহ্মচর্য-পালনে এগিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ সফলকামও হয়েছে ব'লে আমি জানি।

আমিও ঝাঁপ দিলাম—আজীবন ব্রহ্মচর্য-পালনের ব্রতগ্রহণ করলাম। স্বীকার করা ভালো, ব্রতগ্রহণ করার সময় আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, এ কাজের গুরুত্ব কতখানি এবং কত কঠিন এই কাজ। আজকের দিনেও এই দুরূহ কাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমায় মোকাবেলা করতে হয়। ব্রতগ্রহণের গুরুত্ব যে কতখানি, তা আমি প্রতিদিন বেশি ক'রে বুঝতে পারছি। ব্রহ্মচর্য-বর্জিত জীবন আজ আমার কাছে নিঃস্বাদ মনে হয়, মনে হয় পশুজনোচিত। পশু তার আপন প্রকৃতির নিয়মে আত্মসংযম কাকে বলে তা জানে না। মানুষ আত্মসংযম অভ্যাস করতে পারে ব'লে এবং যে পরিমাণে তা পারে, সেই পরিমাণে সে মানুষ। আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্যের গুণকীর্তন এককালে আমার অতিশয়োক্তি ব'লে মনে হ'ত। এখন প্রতিদিনই পরিষ্কার বুঝতে পারি, সে প্রশংসা সঙ্গত ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সত্য।

যে ব্রহ্মচর্য এত আশ্চর্য ফলপ্রসূ, তা যে সহজ নয় এবং নিছক শরীরী-ব্যাপার নিশ্চয় নয়, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ইন্দ্রিয়-সংযমে তার সূচনা, কিন্তু সেখানেই তার শেষ নয়। পূর্ণবিকশিত ব্রহ্মচর্যে অপবিত্র মনন-চিন্তনেরও স্থান নেই। সত্যিকার ব্রহ্মচারী যিনি হবেন, তিনি স্বপ্নেও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার কথা ভাববেন না। যতদিন-না সে অবস্থায় তিনি উপনীত হন, ততদিন তাঁর পথচলার বিরাম হতে পারে না।

কায়িক ব্রহ্মচর্য-পালনেও আমায় কম বেগ পেতে হয়নি। আমি সেদিক থেকে এখন মোটামুটি নিরাপদে আছি, এই পর্যন্ত বলতে পারি। তবে আসলে মনন চিন্তনের ওপরে যে অধিকার পূর্ণমাত্রায় কায়েম করা দরকার, তা এখনো আমার আয়ত্ত হয়নি। আগ্রহ বা চেষ্টার অভাব নেই। কিন্তু কোথা থেকে কীভাবে যে অবাঞ্ছিত চিন্তারাশি গূঢ় আক্রমণে আমায় মননে বিধ্বস্ত করতে আসে, তা আমি আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। মনের ঘরে কুলুপ দিয়ে কুচিন্তা ঠেকিয়ে রাখা যায় নিশ্চয়। আমাদের প্রত্যেককে নিজের-নিজের চাবি খুঁজে নিতে হয়। সাধুসন্তেরা তাঁদের নিজ-নিজ অভিজ্ঞতার নজির আমাদের জন্য রেখে গেছেন সত্য। কিন্তু তাঁরা কেউ সর্বজন-প্রযোজ্য অমোঘবিধান দিয়ে যাননি। চরিত্রের পরিপূর্ণতা অথবা বিভ্রম থেকে মুক্তিলাভ একমাত্র তাঁর দয়াতেই সম্ভবপর হতে পারে। সেইজন্যই যাঁরা তাঁর সাধনা করেছেন তাঁরা আমাদের জন্য রামনামের মতো মন্ত্র রেখে গেছেন। তাঁদের তপশ্চর্যা, তাঁদের বিশুদ্ধ চরিত্রের দীপ্তিতে এইসকল মন্ত্র চিরকালের জন্য ভাস্বর হয়ে আছে। ভগবানের দয়ায় নির্ভরশীল হয়ে সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না-করলে, মানুষ তার মনকে সম্পূর্ণ স্ববশে আনতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ

আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। পূর্ণব্রহ্মচর্য-পালনের সাধক হয়ে, জীবনের প্রতিমুহূর্তে আমি এই শিক্ষার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারছি।

আমার এই সাধনা ও সংগ্রামের অল্পবিস্তর ইতিহাস অন্য প্রসঙ্গে এরপরে বলব। আজকের প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই ব্রতপালনের সূচনায় আমার প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিয়ে। উৎসাহের প্রাবল্যে প্রথম-প্রথম মনে হয়েছিল ব্রতপালন বেশ সহজসাধ্য হবে। আমার জীবনযাত্রায় প্রথম যে পরিবর্তন করেছিলাম তা হ'ল এই যে স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শোবার অভ্যাস অথবা তাকে একান্তে পাবার চেষ্টা আমি ত্যাগ করলাম।

এইভাবে যে ব্রহ্মচর্য আমি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ১৯০০ সন থেকে পালন ক'রে আসছিলাম, ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি তা আমি ব্রতের জোরে বেঁধে নিলাম।

২৬. সত্যাগ্রহের জন্মকথা

জোহানেস্‌বার্গ-এর ঘটনাবলি দিন-দিন এমন রূপ পরিগ্রহ করছিল যে পিছন ফিরে তাকালে বুঝতে পারি, আমার এই আত্মশুদ্ধির সাধনা ছিল যেন সত্যাগ্রহের প্রস্তুতিতে আমার অন্য পদক্ষেপ। আজ পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখি, ব্রহ্মচর্যের ব্রতগ্রহণ করা অবধি আমার জীবনের প্রতিটি মুখ্য ঘটনা যেন নেপথ্যে এবং আমার নিজেরই অগোচরে আমায় তৈরি ক'রে চলেছিল সত্যাগ্রহের জন্য। সত্যাগ্রহকে নাম দিয়ে চিহ্নিত করার আগের থেকে সত্যাগ্রহ-নীতির জন্ম হয়। আর সত্য বলতে কী, সত্যাগ্রহ যখন জন্ম-পরিগ্রহ করল, আমিও ঠিক জানতাম না সত্যাগ্রহ কী বস্তু। ইংরেজিতে সত্যাগ্রহ বোঝাতে আমরা যেমন 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' কথাটা প্রয়োগ করতাম, গুজরাতিতেও অবিকল সেই কথাটিই ব্যবহার করতাম। ইউরোপীয়দের একটি সভায় সত্যাগ্রহের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে আমি লক্ষ করি, 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' কথাটা সীমিত অর্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেউ-কেউ বলতে পারে যে 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' দুর্বলের হাতিয়ার, বিদ্বেষের ভাব থেকে তার সূচনা হতে পারে এবং শেষপরিণামে তা খোলাখুলিভাবে হিংসার রূপ ধারণ করতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় আন্দোলনের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আমায় এরকম সব প্রথাগত ধারণা খণ্ডন করতে হয়েছিল। তখন থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, ভারতীয়েরা যদি তাদের সংগ্রামের প্রকৃত চেহারাটুকু তুলে ধরতে চায় তাহলে তাকে একটি নতুন নাম দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে।

কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই আমার মাথা থেকে সেরকম একটি নতুন নাম বেরুল না। আমি তখন *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* পত্রের যোগে নামমাত্র একটি পুরস্কার ঘোষণা ক'রে বলি, পাঠকদের মধ্যে কেউ যদি সর্বতোগ্রাহ্য একটি নাম পাঠাতে পারেন, তাঁকে সেই পুরস্কার দেওয়া হবে। এই প্রতিযোগিতার ফলে সৎ এবং আগ্রহ এই দুটি কথার সন্ধি ঘটিয়ে মগনলাল গান্ধী 'সদাগ্রহ' কথাটি প্রস্তাব ক'রে পাঠান এবং সেজন্য পুরস্কৃত হন। কিন্তু 'সদাগ্রহ'

কথাটির অর্থ আরো বিশদ করার জন্য আমি সে কথাটি 'সত্যাগ্রহ'-এ রূপান্তরিত করি। তখন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আন্দোলনের গুজরাতি নাম হয় 'সত্যাগ্রহ'। এই নামটিই পরে চালু হয়ে যায়।

এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ইতিহাস বলতে গেলে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন আমার বাকি জীবনের ইতিহাস—অপিচ, ওই ভূখণ্ডে সত্যের সন্ধানে আমার তাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাসও বলা যেতে পারে। য়ার্বেদা জেলে কয়েদ থাকার সময় আমি এই ইতিহাসের অনেকখানি লিখে ফেলি। জেল থেকে খালাস হবার পর বাকি অংশ শেষ করি। এই ইতিহাস প্রথমে ধারাবাহিকভাবে *নবজীবন* পত্রে প্রকাশিত হয় এবং পরে পুস্তক আকারে। বালজী গোবিন্দজী দেশাইয়ের ইংরেজি অনুবাদে আমার এই লেখাটি *কারেন্ট থট্* পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার প্রধান-প্রধান পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে সব কথা জানতে আগ্রহী পাঠকেরা যাতে পড়তে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এখন এই ইংরেজি অনুবাদও পুস্তকাকারে প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। যাঁরা ইতিপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার এই সত্যাগ্রহের ইতিহাস পাঠ করেননি, তাঁদের আমি এ বই প'ড়ে দেখতে বলি। সে বইয়ে আমি যেসব কথা লিখেছি আমার এই জীবনকথায় তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার ব্যক্তিজীবনের যেসব ঘটনা সে বইয়ে বিবৃত হয়নি, এর পরেকার কয়েকটি পরিচ্ছেদে কেবল সেইসব ঘটনার কথা বলব। সেসব প্রসঙ্গ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে, ভারতে ফিরে আসবার পর সত্যের সন্ধানে আমি যেসব প্রয়োগ-পরীক্ষা ক'রে চলেছি, তার বিষয়ে দু-চার কথা বলতে শুরু করব। সুতরাং যাঁরা আমার এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা পূর্বাপর পারম্পর্যে অনুধাবন করতে চান, তাঁরা যেন এখন থেকে *দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস* হাতের কাছে রাখেন।

২৭. আহার্য নিয়ে আরেক-দফা পরীক্ষা

কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য-পালন করায় আমার আগ্রহ ছিল গভীর। সেইসঙ্গে আমার মনে প্রবল ইচ্ছা ছিল সত্যাগ্রহ সংগ্রামে আমি যেন সর্বাধিক সময় দিতে পারি এবং অন্তরে-বাহিরে শুচি হয়ে সেই সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি। সেইজন্য আহার্য ব্যাপারে নানারকম অদলবদল ক'রে রসনার সংযম অভ্যাসের দিকে আমি অধিকতর মনোযোগ দিতে শুরু করি। ইতিপূর্বে আহার্যে যে পরিবর্তনসাধন করেছিলাম তার মূলে ছিল স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদ। এখন আহার্য নিয়ে যেসব পরীক্ষা শুরু করলাম তার প্রেরণা ছিল ধর্মভাবনা।

উপবাস এবং স্বল্পাহার—এই দুই চিন্তা এখন আমার কাছে প্রধান হয়ে উঠল। মানুষের জীবনে সচরাচর দেখা যায় ইন্দ্রিয়পরতা ও রসনাতৃপ্তির লোভ হাত ধরাধরি ক'রে চলে। আমার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটেনি। ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা ও রসনার চরিতার্থতা—এই দুই-

প্রকার লিপ্সা দমন করতে গিয়ে আমায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এই দুই রিপুকে আমি যে স্ববশে আনতে পেরেছি, এমন দাবি আমি আজও করতে পারি না। আমার ধারণা, আমি রীতিমতো উদরপরায়ণ ছিলাম। বন্ধুরা আহার্য বিষয়ে আমার সংযম ব'লে যা মেনে নিয়েছেন, আমি সেটা আদৌ মেনে নিতে পারিনি। যেটুকু সংযম পালন করতে পেরেছি, সেটুকুও যদি না-পারতাম তাহলে পশুর অধম হয়ে কবে আমি রসাতলে ডুবে যেতাম! সে যা-ই হোক্, আমার নানা দোষ-ত্রুটি বিষয়ে আমার নিজের ধারণা পরিষ্কার ছিল ব'লে, আমি সেগুলি থেকে মুক্ত হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। আমার এই শরীর যে আজও টিকে আছে এবং এই শরীরকে দিয়ে আমার করণীয় কাজ যে আমি ক'রে চলেছি, তার মূলে আছে আমার সেই প্রচেষ্টা।

একে তো নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সজাগ ছিলাম, দৈবক্রমে কিছু ভালোলোকের সংস্রবেও এসেছিলাম। ফলে একাদশী তিথিতে কেবল ফলাহার বা উপবাস করতে শুরু করেছিলাম। জন্মাষ্টমী ও অন্যান্য তিথিও যথারীতি পালন করতে লাগলাম।

গোড়ায় শুরু করেছিলাম ফলাহার দিয়ে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযম বা রসনা-সংযমের দিক থেকে ফল কিংবা অন্নের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখতে পাইনি। লক্ষ করেছিলাম, উপভোগের দিক থেকে অন্ন যেমন উপাদেয় হতে পারে, ফলও তেমনি। বরঞ্চ ফলাহারে একবার অভ্যস্ত হ'লে ফল যেন অধিকতর স্বাদু ব'লে মনে হতে পারে। সেই কারণে একাদশী প্রভৃতি তিথিতে উপবাস কিংবা একবেলা আহারের ওপর আমি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে থাকি। তাছাড়া প্রায়শ্চিত্ত কিংবা অনুরূপ কারণ উপস্থিত হ'লেই আমি সেই সুযোগে উপবাসের বিধান সন্তোষের সঙ্গে মেনে নিতাম।

কিন্তু এটাও লক্ষ করলাম, পাকযন্ত্র ক্লেদমুক্ত হয়ে শরীর ঝরঝরে হবার ফলে ক্ষুধা বৃদ্ধি পেল, আহারে বেশ রুচিও জন্মাল। বুঝলাম, উপবাস যেমন সংযমের সহায়ক হতে পারে তেমনি ভোগেরও। অপর লোকেদের নজির ও আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, আমার এই উক্তি আশ্চর্য শোনালেও, সত্য। শরীর-স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান ক'রে দেহযন্ত্রকে কর্মক্ষম ক'রে তোলায় আমার আগ্রহ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু আপাতত আমার মুখ্য লক্ষ্য ছিল ইন্দ্রিয়-সংযম এবং রসনার লোভ জয় করা। সেই উদ্দেশ্যে আমি একের পর এক খাদ্যবস্তু নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলাম. আহার্যের পরিমাণও ক্রমে-ক্রমে হ্রাস করছিলাম। কিন্তু রসনাতৃপ্তির লিপ্সার হাত থেকে নিস্তার লাভ করা আমার কপালে ছিল না, সে যেন সর্বক্ষণ আমার পেছনে লেগেই ছিল। একধরনের আহার্য ছেড়ে অন্যধরনের আহার্য ধরলে কী হয়, প্রত্যেকবার যেন মনে হতে লাগল যে আগেরটির তুলনায় পরেকার আহার্য অধিকতর উপাদেয়।

আহার্য নিয়ে এইসব পরীক্ষা-প্রয়োগের ব্যাপারে বেশ-কয়েকজন আমার সহচর হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন হেরমান্ কালেন্‌বাখ্। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস বিষয়ক আমার বইয়ে আমি এই বন্ধুটির পরিচয় দিয়েছি, সুতরাং আবার সে বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। কি উপবাস, কি আহার্যের অদলবদলে কালেন্‌বাখ্

সদাসর্বদা আমার সাথী ছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন জোরদার, সেসময় আমি তাঁর সঙ্গে তাঁরই বাড়িতে থাকতাম। আহার্যের অদলবদল বিষয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতাম। পুরাতন আহার্য পরিহার ক'রে নূতন আহার্যে আমরা যেন স্বাদ পেতাম বেশি। সেইসময় আহার্যের আস্বাদ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে আমাদের ভালোই লাগত, ঘুণাক্ষরে মনেও হ'ত না, এরকম আলোচনা অনুচিত কিংবা ক্ষতিকর। অনেক-কিছু দেখেও অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির ফলে এখন আমি বলতে পারি, আহার্যের আস্বাদ নিয়ে আলাপ-আলোচনায় রত থেকে আমি ভুল করেছিলাম। রসনার তৃপ্তির জন্য আহার করা ঠিক নয়, আহার করতে হয় কেবল শরীর-পালনের জন্য। মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাম শরীর-পালনে এবং দেহ-স্থিত আত্মার সেবায় নিযুক্ত থাকলে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার তাগিদ অন্তর্হিত হয়। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে তখন মানুষের আর অস্বাভাবিক রুচি থাকে না, ইন্দ্রিয়গ্রাম ও প্রকৃতি-নির্দিষ্ট পথে আপন-আপন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে।

প্রকৃতির ঈপ্সিত ছন্দের সঙ্গে আমাদের জীবনের ছন্দ মেলাবার সাধনায় আমরা যতই প্রয়োগ-পরীক্ষা করি-না কেন কিংবা যতরকম ত্যাগ করি-না কেন—শেষপরিণামে যদি আমরা সফল হতে পারি, তাহলে এ সমস্তই অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সকলরকম প্রচেষ্টা আজকের দিনে উল্‌টোখাতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নশ্বর দেহকে নানাভাবে বিভূষিত রাখার জন্য, ক্ষণিকের অস্তিত্বকে দুটোদিনের জন্য দীর্ঘায়িত করবার চেষ্টায়, আমরা শত-শত প্রাণ বলি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। ফলে আমরা নিজেদেরই হনন করি—শরীরে ও আত্মায় বিনাশপ্রাপ্ত হই। কোনো একটি পুরাতন ব্যাধি থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য আমরা শত-শত নূতন ব্যাধি ডেকে আনি। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের তাড়নায় বিপর্যস্ত হয়ে শেষপর্যন্ত ভোগের শক্তিটুকুও আমরা খুইয়ে বসি। এসমস্ত ব্যাপার আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে, কিন্তু আমরা যে চোখ থাকতেও অন্ধ।

কী উদ্দেশ্যে এবং কী ভাবনা থেকে আহার ও আহার্য নিয়ে আমি পরীক্ষা ও প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, সে কথা তো বলা হ'ল। এরপরে সেইসব পরীক্ষা ও প্রয়োগের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

২৮. কস্তুরবার সৎসাহস

কস্তুরবার তিন-তিনবার কঠিন অসুখ হয় ও একপ্রকার অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসে। তিনবারই সে নিরাময় হয় ঘরোয়া চিকিৎসার গুণে। মারাত্মক রোগে সে যখন প্রথম আক্রান্ত হয় সেসময় সত্যাগ্রহ হয় শুরু হবার মুখে কিংবা শুরু হয়েই গেছে। তার অসুখের প্রধান উপসর্গটা ছিল বারবার রক্তস্রাব। আমাদের এক চিকিৎসক-বন্ধু অস্ত্রোপচারের প্রস্তাব করলেন। গোড়ায় খানিকটা ইতস্তত ক'রে, কস্তুরবা অস্ত্রোপচারে সম্মতি দিলেন। অত্যধিক রক্তস্রাবে সে তখন খুবই দুর্বল, তাই বিনা-ক্লোরোফর্মেই অস্ত্রোপচার করতে হয়। কস্তুরবাকে

খুবই যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্তু কষ্টস্বীকারে তাঁর অবিচল সাহস ছিল বিস্ময়কর। অস্ত্রোপচার সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। ডাক্তার ও তাঁর পত্নী একনিবিষ্ট হয়ে কস্তুরবার সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। জোহানেস্‌বার্গ-এ ফিরে যাবার জন্য আমায় অনুমতি দিয়ে, ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন যে রোগিণীর জন্য আমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু দিনকয়েক বাদেই চিঠি আসে যে কস্তুরবার শরীর-স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে। এত দুর্বল যে বিছানাতেও উঠে বসতে পারে না এবং একদিন তো অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার জানতেন, আমার অনুমতি-বিনা রোগিণীকে মদ কিংবা মাংস দেওয়া চলবে না। জোহানেস্‌বার্গ-এ তিনি আমায় টেলিফোন ক'রে বললেন, আমি যেন কস্তুরবাকে গোমাংসের সুরুয়া দেবার প্রস্তাবটা অনুমোদন করি। জবাবে আমি তাঁকে জানালাম যে অনুমতি আমি তো দিতে পারি না। তাঁর যদি উত্তর দেবার মতো অবস্থা থাকে, তাহলে তাঁকেই জিজ্ঞেস করা ভালো। তিনি তখন যা ভালো বুঝবেন, করবেন। ডাক্তার বললেন, "এ বিষয়ে রোগিণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে আমি চাই না। আপনি বরঞ্চ চ'লে আসুন। আমায় যদি আমার ইচ্ছামতন ওষুধ-পথ্যের বিধান দিতে না-দেন, তাহলে রোগিণীর জীবন-মরণ ব্যাপারে আমি নিজের কাঁধে দায়িত্বের ঝুঁকি নিতে পারব না।"

আমি সেদিনই ট্রেনে চেপে ডারবান্ পৌঁছই। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি বেশ শান্ত সুরে আমায় জানালেন, "যখন আপনাকে আমি ফোন করি, তার আগেই মিসেস্ গান্ধীকে গোমাংসের সুরুয়া দেওয়া হয়ে গেছে।"

"তাহলে তো ডাক্তার আপনি আমার সঙ্গে ছলনা করেছেন।"

"রোগীকে ওষুধ-পথ্যের বিধান দেব—তাতে ছলনার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাছাড়া আমরা ডাক্তারেরা অনেক ক্ষেত্রে মনে করি যে রোগীকে বাঁচাবার খাতিরে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে রোগী কিংবা তার আত্মীয়বর্গের কাছে সত্য গোপন করা কিংবা তাদের চোখে ধুলো দেওয়া ডাক্তারের গুণবিশেষ।"

ডাক্তার কথাটা বেশ দৃঢ়ভাবেই বললেন। যদিচ তাঁর কথায় আমি মনে-মনে গভীর বেদনা অনুভব করলাম, আমার অশান্ত অবস্থাটা চেপেই রাখলাম। ডাক্তার কেবল যে মানুষ ভালো তা নয়, তিনি আমার সহৃদয় বন্ধু। তাঁর কাছে ও তাঁর স্ত্রীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ মেনে নিতে আমার কোনো দ্বিধা ছিল না। কিন্তু চিকিৎসাসূত্রে তিনি যে নীতিকথার অবতারণা করলেন, সেটা মেনে নিতে আমি রাজি ছিলাম না। আমি তাঁকে বললাম :

"আচ্ছা ডাক্তার, এখন আপনি কী করতে চান বলুন তো। তিনি যদি স্ব-ইচ্ছায় মাংস—এমন-কি গোমাংস—খেতে চান, আমি কিছু বলব না। কিন্তু তা যদি না-হয়, আমি কিছুতেই এসব জিনিস তাঁকে খেতে দিতে পারি না—এমন-কি তাঁর নিশ্চিত মরণের সম্ভাবনা থাকলেও না।"

"আপনার তত্ত্বকথা নিয়ে আপনি থাকুন। এখন আমি যে কথাটা বলি, শুনে রাখুন। যতদিন আপনার স্ত্রী আমার চিকিৎসাধীন থাকবেন, আমি তাঁকে যেরকম ওষুধ-পথ্য দিতে চাই, সেটা সম্পূর্ণ আমার বিচার-বিবেচনার বিষয়। এ ব্যবস্থা যদি আপনার মনঃপূত না-হয়,

তাহলে সখেদে আপনাকে বলতে বাধ্য হব যে আপনি রোগিনীকে স্থানান্তর করুন। আমার ঘরে আমার চোখের সামনে তিনি মরবেন, এ আমি বরদাস্ত করতে পারব না।"

"তবে কি আপনি বলতে চান যে ওঁকে এতদ্দণ্ডেই স্থানান্তর করতে হবে?"

"আমি কি একবারও বলেছি যে তাঁকে আপনি নিয়ে যাবেন? আমার চিকিৎসায় আপনি বাগড়া দিতে আসবেন না, এইটুকুই আমার বক্তব্য। আমি যেমন চিকিৎসা করতে চাই তা যদি করতে দেন, তাহলে আমি ও আমার স্ত্রী তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্য আমাদের সাধ্যমতো সব-কিছু করব। তাহলে মনে লেশমাত্র দুশ্চিন্তা না-রেখে আপনি আপনার কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু এই সোজা কথাটুকু আপনি যদি বুঝতে না-চান তাহলে নিতান্তই বাধ্য হয়ে আমায় বলতে হয় যে আপনার স্ত্রীকে আমার এখান থেকে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো।"

যদ্দূর মনে পড়ে, আমার কোনো ছেলে আমার সঙ্গেই ছিল। সে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলে যে তার মাকে যেন গোমাংসের সুরুয়া দেওয়া না-হয়। অতঃপর আমি স্বয়ং কস্তুরবার সঙ্গে কথা ব'লে তার মতামত জানতে চাই। সে তখন এতই দুর্বল যে তার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করার সত্য-সত্য কোনো অর্থ ছিল না। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করাটা আমার পক্ষে কষ্টকর হ'লেও, কর্তব্যবোধে তাকে আমি ডাক্তারের সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হয়েছিল, আনুপূর্বিক সব জানাই। দ্বিধাহীন দৃঢ়তার সঙ্গে কস্তুরবা বলল :

"গোমাংসের সুরুয়া আমি কিছুতেই খাব না। বহু পুণ্যফলে মানুষ মানুষ হয়ে জন্মায়। গর্হিত খাদ্য খেয়ে এই মানুষের দেহ অশুচি করার চেয়ে, আমার কাছে অনেকগুণে শ্রেয় যদি তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি।"

আমার সাধ্যমতো আমি সব কথা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বললাম সে যেন মনে না-করে যে আমার মতেই মত দিয়ে তাকে চলতে হবে। আমাদের পরিচিত হিন্দু বন্ধুবান্ধবদের কেউ-কেউ যে দ্বিধা না-রেখে ওষুধ হিসেবে মদ মাংস সেবন করেছে, সেসব নজিরও তার সামনে উপস্থাপিত করলাম। কিন্তু কিছুতেই তাকে টলানো গেল না। সে দৃঢ়কণ্ঠে আমায় বলল, 'না, এই মুহূর্তেই এখান থেকে তুমি আমায় নিয়ে চলো।"

তার কথা শুনে আমি যে খুব খুশি হয়েছিলাম, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাকে স্থানান্তর করতে ভয় করছিল, তৎসত্ত্বেও স্থির করলাম, কস্তুরবাকে বাড়িতে নিয়ে যাব। ডাক্তারকে তার স্থির সঙ্কল্পের কথা বলাতে তিনি রাগে যেন ফেটে পড়লেন :

"কীরকম হৃদয়হীন লোক মশাই, আপনি! স্ত্রীর শরীর-স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় এসব প্রসঙ্গ তাঁর কাছে উত্থাপন করতেও আপনার সঙ্কোচ বোধ করা উচিত ছিল। আমি ডাক্তার, আমি আপনাকে বলছি, এখান থেকে স্থানান্তর করার মতো অবস্থা তাঁর এখন নয়। তাঁকে এখন একটুও নড়ানো-চড়ানো ঠিক হবে না। পথে যেতেই যদি তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে একান্তই যদি আপনি আপনার জিদ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হন, তাহলে আপনার যা-খুশি আপনি করতে পারেন। যদি তাঁকে মাংসের সুরুয়া দিতে

বারণ করেন, তাহলে একটা দিনের জন্যও তাঁকে আমার বাড়িতে রাখবার ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।"

সুতরাং আমরা স্থির করলাম, কালবিলম্ব না-ক'রে আমরা চ'লে যাব। তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। রেল স্টেশনটাও নেহাৎ কাছাকাছি নয়। ডারবান্ থেকে ফিনিক্স্ যেতে হবে রেলগাড়ি চেপে। নিঃসন্দেহে বলা চলে, আমি যে দায়িত্ব ঘাড় পেতে গ্রহণ করেছিলাম, সে ছিল খুবই কঠিন দায়িত্ব। কিন্তু ভগবানের প্রতি ভরসা রেখে আমি আমার কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হলাম। আগেভাগে ফিনিক্স্-এ একজন লোক পাঠিয়ে ওয়েস্ট-কে খবর দিলাম যেন তিনি একটা ডুলি নিয়ে স্টেশনে হাজির থাকেন। ডুলিতে কস্তুরবাকে নিয়ে যাবার জন্য ছ-জন বাহক যেন আসে। আর যেন বোতলে ক'রে গরম দুধ ও গরম জল আনা হয়। ডারবান্ থেকে ফিনিক্স্-গামী রেলগাড়ি যাতে ধরা যায় সেই উদ্দেশ্যে আমি একটি রিক্‌সা ডেকে, কস্তুরবার সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাকে রিক্‌সায় উঠিয়ে নিয়ে রওনা দিলাম স্টেশনের দিকে।

কস্তুরবাকে আমি কী-আর সাহস দিতে পারি, সে নিজেই আমায় আশ্বাস দিয়ে বলল, "তুমি একটুও ভেবো না। দেখো, আমার কিছু হবে না।'"

অনেকদিন একপ্রকার অনাহারে থাকার ফলে কস্তুরবার দেহ তখন অস্থিচর্মসার। ডারবান্ স্টেশনের প্লাটফর্মটা ছিল খুবই লম্বা। প্লাটফর্মের ভিতরে রিক্‌সা ঢুকতে দেওয়া হ'ত না ব'লে ট্রেনে চাপবার আগে অনেকখানি রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে হ'ত। আমি তাই কস্তুরবাকে কোলে ক'রে প্লাটফর্ম অতিক্রম করি। তারপর তাকে আমাদের কামরায় শুইয়ে দিই। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে ফিনিক্স্ স্টেশন থেকে তাকে আমরা ডুলিতে উঠিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান অবধি নিয়ে যাই। সেখানে পৌঁছে তার জল-চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। ধীরে-ধীরে সে নিরাময় হয়ে ওঠে ও শরীরের শক্তি ফিরে পায়।

ফিনিক্স পৌঁছবার দু-তিনদিন পরে আমাদের ওখানে একজন স্বামীজী এসে হাজির হন। তিনি কোথা থেকে যেন জানতে পেরেছেন যে আমরা নিতান্ত জিদবশত ডাক্তারের উপদেশ অমান্য ক'রে ডারবান্ ছেড়ে চ'লে এসেছি। তাই আমাদের প্রতি মমতাবশত তিনি এসেছেন সমস্ত বিষয়টা আলোচনা ক'রে আমাদের বোঝাতে। যদ্দূর মনে পড়ে স্বামীজী যখন এসে উপস্থিত হন, সেসময় আমার মেজোছেলে মণিলাল ও সেজোছেলে রামদাস সেখানে ছিল। তিনি *মনুস্মৃতি* থেকে শ্লোক আবৃত্তি ক'রে বলতে লাগলেন যে আমিষ আহার দোষের নয়। আমার রুগ্না স্ত্রীর সাক্ষাতে কোনো বাদানুবাদ হয়, এ আমার মনঃপূত ছিল না, কিন্তু শিষ্টতার খাতিরে আমায় এসব মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছিল। *মনুস্মৃতি*-র ওই শ্লোকগুলি আমারও জানা ছিল, সুতরাং আমায় বোঝাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি এ কথাও জানতাম যে কারো-কারো মতে বলা হ'ত শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত। সে যা-ই হোক্-না-কেন, নিরামিষহারের যৌক্তিকতা বিষয়ে আমার নির্ণয় ছিল আমার নিজের প্রত্যয়সিদ্ধ, এ বিষয়ে শাস্ত্রীয়বিধানের ওপর নির্ভরশীল আমি ছিলাম না। আর এ বিষয়ে কস্তুরবার বিশ্বাস ছিল অটল, অনড়। শাস্ত্রাদির জ্ঞান তার ছিল না, তার বাপ-দাদার অনুসৃত প্রথাগত আচার ও ধর্মই ছিল তার

কাছে সদাচার ও সত্যধর্ম। তার কাছে তা-ই ছিল যথেষ্ট। আর আমার ছেলেরা তো তাদের বাবার প্রত্যয়ে ছিল সম্পূর্ণ আস্থাবান্। সুতরাং স্বামীজীর উপদেশ নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। কস্তুরবা সমস্ত বাদানুবাদের ছেদ টেনে দিয়ে বলেন :

"দেখুন স্বামীজী, আপনি যা-ই বলুন-না কেন, গো-মাংসের সুরুয়া খেয়ে আমি রোগমুক্ত হয়ে উঠতে চাই না। দয়া ক'রে আর আমায় বিরক্ত করবেন না। আপনার আরো যদি আলাপ-আলোচনা করবার বাসনা থাকে, আমার স্বামী ও ছেলেদের সঙ্গে কথা ব'লে দেখতে পারেন। এ বিষয়ে আমার নিজের কিন্তু মন স্থির—সে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।"

২৯. পরিবারে সত্যাগ্রহ

আমার সর্বপ্রথম জেলযাত্রা ঘটে ১৯০৮ অব্দে। জেলে থাকাকালীন আমি লক্ষ ক'রে দেখেছি, জেল-কয়েদীদের এমন কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়, যা না-কি আত্মসংযমের সাধক অথবা ব্রহ্মচারীর পক্ষে আপনা থেকে মেনে চলা উচিত। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। জেলের নিয়ম-অনুসারে দিনের শেষ খাওয়াটা কয়েদীদের সেরে নিতে হয় সূর্যাস্তের আগে। এই খাওয়াটা শেষ হবার পর ভারতীয় কিংবা আফ্রিকান কয়েদীদের চা কিংবা কফি দেওয়া হ'ত না। দরকার হ'লে রান্না খাবারে যোগ করার জন্য আলাদা নুন চাইলে পাওয়া যেত, কিন্তু কেবল রসনার তৃপ্তির খাতিরে মশলা-জাতীয় কিছু পাওয়া যেত না। জেলের মেডিকাল অফিসারের কাছে আমি ভারতীয়দের জন্য গুঁড়ো মশলা চেয়েছিলাম। আর বলেছিলাম, রান্নার সময়ে যেন ডাল কিংবা তরিতরকারিতে নুন যোগ করতে দেন। ডাক্তার জবাবে বললেন, "এখানে তো লোকে রসনা-চরিতার্থ করতে আসে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য মশলাপাতির দরকার নেই। আর নুন? মেখে খান কিংবা মিশিয়ে রান্না করুন, একই কথা।"

শেষপর্যন্ত বহুকষ্টে এসব নিয়মের কড়াক্কড়ি কিঞ্চিৎ লাঘব হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আত্মসংযমের দিক থেকে এসব বিধিনিষেধ কিছু মন্দ ছিল না। বাইরে থেকে জবরদস্তি ক'রে যখন বিধিনিষেধ চাপানো যায়, তার ফলাফল সবসময় ভালো হয় না। কিন্তু নিজের থেকে যদি নিয়মের বন্ধন স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়,-তার যে সুফল নিশ্চিত—সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। জেল থেকে খালাস পাবার অব্যবহিত পরেই আমি আলুন ও বিনি-মশলার রান্না খাওয়ার পরীক্ষা নিজের ওপর প্রয়োগ করি। পারতপক্ষে আমি চা পান করতাম না এবং দিনের শেষ আহার সেরে নিতাম সূর্যাস্তের আগেই। আমার সেই অভ্যাস আজ অনায়াসে দিনকৃত্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনার ফলে আমি নুন খাওয়া সম্পূর্ণ পরিহার করতে বাধ্য হই। একাদিক্রমে দশ বছর আমি এই ব্রত পালন ক'রে এসেছি। নিরামিষ আহার-বিষয়ক কিছু-কিছু বই প'ড়ে আমি জেনেছিলাম যে নুন জিনিসটা মানুষের খাদ্যের অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ নয়। পরন্তু নুন বাদ দেওয়া স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে অনুকূল। তা থেকে আমার ধারণা হয়েছিল যে

আলুন আহার ব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রশস্ত। যাদের শরীর কমজোর তাদের পক্ষে ডাল খাওয়া ভালো নয়, এ কথাও আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও বুঝেছিলাম, ডাল বর্জন করাটাই ভালো। অথচ ডাল ছিল আমার বিশেষ প্রিয়—ডাল খেতে আমি দস্তুরমতো ভালোবাসতাম।

অস্ত্র-চিকিৎসার পর কস্তুরবার রক্তস্রাব কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকলেও, তার অসুখের উপশম ঘটেনি। রক্তস্রাব আবার শুরু হ'ল, কিছুতেই যেন তা আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। কেবল জল-চিকিৎসার অসুখটাকে বাগ মানানো সম্ভবপর হবে ব'লে মনে হচ্ছিল না। আমার চিকিৎসা-ব্যবস্থায় কস্তুরবার খুব বেশি আস্থা না-থাকলেও সে যেন এ ব্যবস্থা একপ্রকার মেনেই নিয়েছিল। আমার বিরুদ্ধতা সে করতে চায়নি। বাইরে থেকে অন্য-কোনো চিকিৎসককেও ডাকতে চায়নি। আমার সবরকম চিকিৎসা যখন বিফল হ'ল, আমি তাকে বিশেষ ক'রে বলি সে যেন নুন ও ডাল খাওয়া ছেড়ে দেয়। অনেক যুক্তি-তর্ক, অনেক অনুনয়-বিনয়েও কোনো ফল হ'ল না। তাকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। শেষপর্যন্ত উল্‌টে সে আমাকে বলল যে, যদি আমায় কেউ নুন ও ডাল ছেড়ে দিতে বলে, আমিও ছেড়ে দিতে পারব না। তার কথায় আমি মনে যেমন দুঃখ পেলাম, তেমনি আবার খুশিও হলাম। এবার আমি তাকে বুঝিয়ে দিতে পারব, কতখানি ভালোবাসা আমি তার জন্য উজাড় ক'রে দিতে পারি। মুখে তাকে বললাম, "তোমার এই ধারণাটা ভুল। আমার যদি অসুখ হয় এবং ডাক্তার আমায় বলেন নুন, ডাল অথবা আর কোনো আহার্যবস্তু পরিহার করতে, আমি বিনা-বাক্যব্যয়ে ডাক্তারের সেই আদেশ মেনে নেব। ডাক্তারের বিধান দেবারও দরকার হবে না। এই দেখো না, আজ থেকে আমি একবছরের মতো নুন আর ডাল ছোঁব না। তোমায় এই কথা দিলাম, সে তুমি ছেড়ে দাও বা না-দাও।"

কস্তুরবার যেন আঁতে ঘা লাগল। গভীর অনুশোচনায় সে বলল, "আমার ঘাট হয়েছে, তুমি আমায় মাপ করো। তুমি কেমন একরোখা মানুষ সে কথা জেনে-শুনে ওভাবে তোমায় উস্‌কে দেওয়াটা আমার অন্যায় হয়েছে। তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, নুন আর ডাল খাওয়া আমি বাদ দেব। কিন্তু দোহাই তোমার, তোমার ওই প্রতিজ্ঞা তুমি ফিরিয়ে নাও। তা না-হ'লে আমার লঘুপাপে তুমি বড়ো গুরুদণ্ড দেবে। সে আমি সইতে পারব না।"

"তুমি নুন আর ডাল ছেড়ে দেবে, সে তো খুব ভালো কথা। ছেড়ে দিলে তোমার শরীর-স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো বৈ মন্দ হবে না, এ আমি নিশ্চিত জানি। কিন্তু আমি একবার যখন কথা দিয়ে ফেলেছি, সে কথা আর আমি ফিরিয়ে নিতে পারি না। এতে আমারও উপকার হবে নিশ্চয়। কারণ যাই হোক্-না-কেন, মানুষ যদি সংযম পালন করে, তাতে তার মঙ্গল হতে বাধ্য। সুতরাং তুমি আর আমায় অনুনয়-বিনয় করতে এসো না। ধ'রে নাও আমার পক্ষেও এটা হবে পরীক্ষা-বিশেষ। তাছাড়া এতে ক'রে আমিও তোমার সঙ্কল্প-সাধনে সহায়তা করতে পারব।"

আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না ব'লে বেচারা কস্তুরবা হাল ছেড়ে দিল। সে বলল,

"তুমি যা একরোখা মানুষ, কারও যে কথা শুনবে তেমন পাত্রই নও।" কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে সে মনের দুঃখ হাল্‌কা করার চেষ্টা করল।

আমি এই ঘরোয়া ঘটনাটিকে সত্যাগ্রহের অন্যতম নিদর্শন ব'লে অভিহিত করতে চাই। আমার জীবনের মধুরতম স্মৃতির মধ্যে এটি একটি।

এই ঘটনার পর থেকে কস্তুরবার শরীর-স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। এই অবস্থান্তরের কারণটা কী, সে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পেরেছি ব'লে বলতে পারি না। নুন ও ডাল ছেড়ে দিয়ে, কিংবা ছেড়ে দেবার দরুন খাওয়াদাওয়ার হেরফের করার জন্য, কী এমনটা ঘটল? দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমার কড়া শাসন ও তদারকিতে কস্তুরবাকে যেসব নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হ'ত—এমনটা ঘটল কি তারই ফলে? ব্রতগ্রহণ ও ব্রতপালনের উল্লাসবশত কি এই নিরাময় সত্বর সাধিত হ'ল? ব্যাধিমুক্তির অনুকূলে এইসব কারণের কোন্‌টা কতখানি কাজ করেছিল, সে আমি ঠিক জানি না। কেবল এইটুকুই বলতে পারি, কস্তুরবা দ্রুত আরোগ্যলাভ করতে শুরু করল, রক্তস্রাব পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল এবং এইসব হবার ফলে হাতুড়ে চিকিৎসায় আমার সুনামও কিঞ্চিৎ বেড়ে গেল।

আহার্য থেকে নুন ও ডাল বাদ দেবার ফলে আমার নিজেরও বেশ উপকার হ'ল। একটা বছর ঘুরে গেল, অথচ বর্জিত বস্তুর জন্য আমি কোনো ব্যাকুলতা অনুভব করিনি। বরঞ্চ দেখা গেল যে আমার ইন্দ্রিয়গ্রাস আগের তুলনায় অনেক বেশি শান্ত হয়ে এসেছে। এই পরীক্ষার ফলে আমার আত্মসংযমের বাসনা বৃদ্ধি পায়। দেশে ফিরে আসার পরেও অনেক বছর ধ'রে আমি নুন, ডাল আর স্পর্শ করিনি। মাঝে একবারমাত্র, ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে (আমি যখন লন্ডনে), নুন ও ডাল খেতে শুরু করি, সে বিষয়ে যথাস্থানে বলব।

নুন ও ডাল ছাড়ার পরীক্ষাটা আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে আমার একাধিক সহকর্মীর ওপর প্রয়োগ করি। তার ফল ভালোই হয়েছিল। নুন ও ডাল-বিহীন আহারের গুণাগুণ বিষয়ে ডাক্তারদের মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু নিছক নীতির দিক থেকে দেখলে বলা যায়, আহারে-বিহারে বাসনা বর্জন করতে পারলে আত্মার মঙ্গল হয়। ভোগী ও ত্যাগীর জীবনের ধারা যেমন আলাদা-আলাদাখাতে প্রবাহিত হয়, তেমনি তাদের আহার ও আহার্যের মধ্যেও পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। ব্রহ্মচর্য-পালনে যাঁরা প্রয়াসী, তাঁরা অনেকসময় ভোগী ব্যক্তির জীবনযাপনের ধারায় গা ভাসিয়ে দেবার ফলে, নিজেদের আদর্শের মূলে নিজেরাই কুঠারাঘাত ক'রে থাকেন।

৩০. সংযমের পথে

কস্তুরবার অসুখের ফলে আহারাদির ব্যাপারে আমায় কিছু অদলবদল করতে হয়। সে কথা ইতিপূর্বে বলেছি। পরে ব্রহ্মচর্যের সহায়ক হবে মনে ক'রে খাদ্যের তালিকায় আরো-কিছু হেরফের করি।

আমার এই পরীক্ষার প্রথম ধাপে দুধ খাওয়া ছেড়েছিলাম। প্রথম-প্রথম রায়চন্দ্‌ভাইয়ের মুখেই শুনি যে দুধ খেলে পাশব প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। নিরামিষ আহার বিষয়ক কিছু-কিছু বই প'ড়ে এই ধারণা আরো দৃঢ় হয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য ব্রতগ্রহণ না-করা পর্যন্ত দুধ ছেড়ে দেবার ব্যাপারে আমি ঠিক মনঃস্থির ক'রে উঠতে পারিনি। শরীররক্ষার জন্য দুধ যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় নয়, এ কথা অনেককাল আগেই আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু এতদিনের অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া সহজ হয়নি। ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য দুধটা ছেড়ে দেওয়া দরকার—এই ধারণা যেসময় দিনে-দিনে আমার মনে দৃঢ়তর হচ্ছিল, ঠিক সেইসময়ে খাটালের মালিকেরা গোরু-মোষের ওপর কীরকম নিষ্ঠুর-নির্যাতন করে, সেই বিষয়ে কলকাতা থেকে পাঠানো কিছু-কিছু কাগজপত্র আমার হাতে এসে পড়ে। এইসব বিবরণ আমার মনের ওপর একটা অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে এবং এই নিয়ে কালেন্‌বাখ্‌-এর সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনাও হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাসে এবং আমার এই জীবনকথার অন্যত্র আমি কালেন্‌বাখ্‌-এর পরিচয়সূত্রে দু-চার কথা বলেছি। তৎসত্ত্বেও বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে আরো-কিছু এখানে বলা দরকার। নিতান্ত আকস্মিকভাবে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে। তিনি ছিলেন আমার সহকর্মী খান্‌-এর বন্ধুস্থানীয়। খান্‌ লক্ষ করেন যে কালেন্‌বাখ্‌ অন্তরে-অন্তরে ছিলেন বিষয়-বিরাগী। তাই তিনি আমাদের দু-জনের মধ্যে পরিচয়-সাধন করিয়ে দেন।

পরিচয় কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হ'লে কালেন্‌বাখ্‌-এর বে-হিসাবী বিলাসপ্রিয়তা দেখে আমি প্রথম-প্রথম স্তম্ভিত বোধ করি। কিন্তু প্রথম-দর্শনেই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর সুগভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাই, তাঁর কয়েকটি প্রশ্নে। কথাপ্রসঙ্গে সে সময় আমরা গৌতম বুদ্ধের সংসার-ত্যাগের বিষয়ে আলোচনা করি। অল্পসময়ে তাঁর সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়—এমন-কি আমাদের উভয়ের চিন্তাধারা একইখাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং তিনি স্থির করেন জীবনযাত্রায় আমি যেসব অদলবদল করছিলাম সেইভাবে তিনি তাঁর নিজের জীবনযাত্রাও নিয়ন্ত্রিত করবেন।

তখনো পর্যন্ত তিনি ছিলেন সংসারে একা মানুষ। বাড়িভাড়া বাদ দিয়ে নিজের জন্য তখন তাঁর মাসিক খরচ ছিল বারোশো টাকা। এবার তিনি তাঁর সংসারযাত্রা এমনই সাদাসিধে ক'রে ফেললেন যে তাঁর মাসিক খরচ ক'মে গিয়ে একশো কুড়ি টাকায় দাঁড়াল। জোহানেস্‌বার্গ-এর সংসার তুলে দেবার পর, আমি প্রথমবার যখন জেল থেকে খালাস

হয়ে বেরুলাম, আমরা দু-জন একত্র বসবাস করতে আরম্ভ করি। আমাদের সে জীবন ছিল রীতিমতো কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন।

দুধ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, এইভাবে একত্র থাকার সময়ে। কালেন্‌বাখ্‌ আমায় বললেন : "দুধ খাওয়া যে হানিকর, এমন কথা হরদম আলোচনা ক'রে কী লাভ? হানিকর যদি হয় তাহলে ছেড়ে দেওয়াই তো ভালো। এমন তো নিশ্চয় নয় যে দুধ না-খেলে আমাদের চলবে না।" বিস্ময়ে-আনন্দে তাঁর সেই প্রস্তাবের সমর্থনে, আমরা দু-জনেই তদ্দণ্ডে প্রতিজ্ঞা করলাম যে দুধ ছেড়ে দেব। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে, টলস্টয় ফার্ম্‌-এ।

কিন্তু এতটুকু ত্যাগে আমার মন উঠল না। এই ঘটনার অল্পকিছুদিন পরে স্থির করি, নিছক ফলাহার ক'রে জীবনধারণ করব—তা-ও এমনসব ফল যা সহজে পাওয়া যায় ও দামেও শস্তা। দীনের মতো দীন হয়ে আমরা জীবনধারণ করব—এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে প্রবল হ'ল।

দেখা গেল, ফলাহারে অনেক সুবিধা। রান্নাবান্নার হ্যাঙ্গাম একপ্রকার চুকিয়ে দেওয়া গেল। আমাদের প্রতিদিনের আহার হ'ল কাঁচা চীনেবাদাম, কলা, খেজুর ও জলপাই-তেল।

ব্রহ্মচর্যের সাধনা যাঁরা করতে চান, তাঁদেরকে এই প্রসঙ্গে একটু সাবধান ক'রে দিতে চাই। এপর্যন্ত আমি ব'লে এসেছি যে খাদ্যাখাদ্যের সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের খুবই অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। আসলে কিন্তু এই সাধনার মূলে আছে মানুষের মন। চিত্তবৃত্তি যদি স্বভাবত মলিনতাযুক্ত হয়, তাহলে শত উপবাসেও তা শুদ্ধ রাখা যায় না। সে ক্ষেত্রে আহারের ইতরবিশেষেও কোনো ফলোদয় হয় না। আত্মসমীক্ষায় নিষ্ঠাবান্‌ হতে হয়, ঈশ্বরে নির্ভরশীল হতে হয়। তৎসত্ত্বেও ইন্দ্রিয়-বাসনার মূলোৎপাটন সম্ভবপর হয় না যদি-না ঈশ্বর কৃপা করেন। তবে দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ যে নিবিড়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। ইন্দ্রিয়াসক্ত মনের লোভ থাকে আহার-বিলাস-ব্যসনের প্রতি। এই প্রবণতা দমন করতে হ'লে খাদ্যাখাদ্য নিয়ে বিধিনিষেধ ও উপবাসের উপযোগিতা মেনে নিতে হয়। মন যদি ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়গ্রাসকে স্ববশে রাখা দূরের কথা, মনই ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে যায়। সুতরাং শরীরের জন্য সর্বদা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন শুদ্ধ ও অনুত্তেজক খাদ্য এবং কখনো-কখনো উপবাস পালন।

খাদ্যাখাদ্য বিচার ও উপবাসকে যাঁরা সব-কিছু ব'লে মনে করেন, তাঁরা যেমন ভুল করেন, তেমনি ভুল করেন যাঁরা এই দুটিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দিতে চান। খাদ্যের বাছবিচার ও উপবাস যে সংযম সাধকের সহায়ক—আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমায় এই শিক্ষাই দেয়। এই দুইয়ের সাহায্য-বিনা ইন্দ্রিয়লিপ্সা মন থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায় না।

৩১. উপবাস

ভাত রুটি ও দুধ বর্জন ক'রে আমি যখন ফলাহার নিয়ে পরীক্ষা চালাতে লেগেছি, সেইরকম সময়ে আত্মসংযমের সহায়ক হবে মনে ক'রে আমি মাঝে-মাঝে অনশনব্রত-পালন করতে শুরু করি। আমার এই পরীক্ষায় কালেন্‌বাখ্ আমরা দোসর হলেন। স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে যখন-তখন উপবাস করার অভ্যাস আমার আগের থেকেই ছিল। এখন একজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির কাছ থেকে শুনতে পেলাম আত্মসংযম-সাধনের জন্য উপবাস করা দরকার।

বৈষ্ণব পরিবারে আমার জন্ম। যে মায়ের আমি সন্তান, কঠোরতম ব্রত-উপবাস-পালনেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। সুতরাং দেশে থাকতে আমি নিজেও যদি একাদশী ও অন্য কিছু-কিছু ব্রত-উপবাস-পালন ক'রে থাকি, তা একটুও বিচিত্র নয়। কিন্তু তখন যেসব ব্রত-উপবাসাদি আমি পালন করেছি, সে নিতান্তই আমার মায়ের দেখাদেখি। ভেবেছি, সেরকম করলে মা-বাবা আমার প্রতি খুশি হবেন।

উপবাসের কার্যকরতা সম্বন্ধে তখন আমার কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না, বিশ্বাসের দৃঢ়তাও ছিল না। কিন্তু স্বচক্ষে যখন দেখলাম, আমার সেই বন্ধুটি উপবাস-পালনের ফলে উপকৃত হয়েছেন, তখন ব্রহ্মচর্য ব্রত-পালনের সুবিধা হবে এই আশায় তাঁর দেখাদেখি আমিও একাদশী তিথিতে উপবাস করতে শুরু করলাম। সচরাচর দেখা যায়, হিন্দুরা উপবাসের সময়েও দুধ ও ফল খাওয়া দোষের ব'লে মনে করেন না। দুধ ও ফল খেয়ে আমি তো প্রতিদিনই উপবাস পালন করছিলাম। এবার সত্যকার উপবাস শুরু করলাম, জল ছাড়া আর-কিছু খাব না, স্থির করলাম।

এই পরীক্ষা যেসময় শুরু করি, তখন হিন্দু পঞ্জিকার মতে ছিল শ্রাবণ মাস। হিজরী গণনায় সেটা ছিল মুসলমানদের রমজানের মাস। আমাদের গান্ধী-পরিবারে বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় সম্প্রদায়েরই ব্রত-পালনের রেওয়াজ ছিল। বৈষ্ণব হাবেলিতে যেমন আমাদের গতায়াত ছিল তেমনি শিব মন্দিরেও। পরিবারস্থ কোনো-কোনো লোক পুরো শ্রাবণ মাসটা 'প্রদোষ' পালন করতেন অর্থাৎ সূর্যাস্ত না-হওয়া পর্যন্ত আহার স্পর্শ করতেন না। আমিও 'প্রদোষ' পালন করার সঙ্কল্প ধারণ করলাম।

এসব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ও প্রয়োগ শুরু হয়েছিল টলস্টয় ফার্ম্-এ থাকতে। সেখানে আমি ও কালেন্‌বাখ্ ছিলাম কতিপয় সত্যাগ্রহী পরিবারের তদারকিতে। সেসব পরিবারে কিছু-কিছু অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েও ছিল। এদের লেখাপড়ার জন্য আমরা একটি স্কুল চালাতাম। শিক্ষার্থীদের মধ্যে চার-পাঁচজন ছিল মুসলমান। ইস্‌লামের ধর্মীয় রীতিনীতি যাতে তারা নিষ্ঠা-সহকারে পালন করতে পারে, আমি সেজন্য সবরকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে দিতাম ও তাদের উৎসাহ দিতাম। প্রতিদিনের নমাজ পড়ায় তাদের যেন কোনো শৈথিল্য না-আসে, সেদিকে আমার নজর ছিল। সেইসব ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ-কেউ ছিল পার্সি ও খ্রিষ্টান। তারাও যাতে নিজ-নিজ ধর্মের রীতি-রেওয়াজ মেনে চলে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা আমি আমার কর্তব্য ব'লে মনে করতাম।

রমজানের মাসে আমার কথায় মুসলমান ছেলেমেয়েরা রোজা রাখতে রাজি হয়ে যায়। আমি তো পূর্ব থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলাম 'প্রদোষ'ব্রত পালন করব। এবার আমি হিন্দু, পার্সি ও খ্রিষ্টান ছেলেমেয়েদেরও বললাম আমাদের সঙ্গে যোগদান করতে। তাদের আমি বুঝিয়ে বলি, আত্মত্যাগের মতো ভালো কাজে আর-পাঁচজনের সঙ্গে হাত মেলাতে পারলে, তার ফল ভালো হয়। টলস্টয় ফার্ম্-এ যাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন। হিন্দু ও পার্সি ছেলেমেয়েরা সর্বাংশে মুসলমান ছেলেমেয়েদের দেখাদেখি সব-কিছু করতে চাইত না, তার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। সূর্যাস্ত না-হওয়া পর্যন্ত মুসলমান ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা করতে হ'ত—তারা উপবাসভঙ্গ করতে পারত না। অন্যেরা তা করত না, এবং তার ফলে মুসলমান বন্ধুদের জন্য ভালো-ভালো খাবার রেঁধেবেড়ে পরিবেশন করার সময় ও সুযোগ পেত। মুসলমানদের মতো ভোর-রাতে উঠে তারা ভরপেট খেতেও চাইত না। মুসলমানেরা ছাড়া আর-সকলেই অবশ্য দিনমানে জল খেত।

এইসব পরীক্ষার ফলে প্রত্যেকে বেশ বুঝতে পারে, উপবাস ও একাহারের ফল কেমন ভালো হতে পারে। এতে ক'রে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগবৃত্তিও অঅবশ বৃদ্ধি পায়।

টলস্টয় ফার্ম্-এ আমরা সকলেই নিরামিষ আহার করতাম। সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি যে আমি যাতে কষ্ট না-পাই এবং আমার খাতিরেই, সকলে নিরামিষাহারের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। রোজা-পালনের সময় মুসলমান ছেলেমেয়েরা মাংসাহারের অভাব নিশ্চয় মনে-মনে অনুভব ক'রে থাকবে। কিন্তু সে কথা তারা ঘুণাক্ষরেও আমায় কখনো জানতে দেয়নি। তারা বেশ তৃপ্তি ও আনন্দেব সঙ্গে নিরামিষ ভোজন করত। তাদের হিন্দু-বন্ধুরা ফার্ম্-এর সহজ সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে মানায়—এইরকম রুচিকর ও উপাদেয় নিরামিষ ভোজ্য তাদের জন্য তৈরি ক'রে দিত।

আমি খানিকটা ইচ্ছা ক'রেই উপবাস-পালনের সার্থকতার কথা বলতে গিয়ে আমার এই কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেলেছি। তা না-করলে এইসব আনন্দস্মৃতির কথা অন্যত্র পাড়া যেত না। পরোক্ষভাবে আমার অন্য-একটি স্বভাবগুণের কথা উল্লেখ করতে চেয়েছি, সেটি হ'ল এই যে, যে কাজ আমার কাছে ভালো ব'লে মনে হয়েছে, আমি সর্বদা সেস'ব কাজে আমার সহকর্মীদের টানতে চেয়েছি। টলস্টয় ফার্ম্-এ যারা আমার সঙ্গী ছিলেন, উপবাস বিষয়ে তাঁদের বিশেষ-কিছু জানা ছিল না। কিন্তু আমার 'প্রদোষ'-পালন ও মুসলমানদের রোজা রাখবার সূত্রে, আত্মসংযমের উপায় হিসেবে উপবাসের কার্যকরতার দিকে তাঁদের আগ্রহ জন্মায়।

এইভাবে ফার্ম্-এ আত্মসংযমের একটা অনুকূল আবহাওয়া আপনা থেকে তৈরি হয়ে যায়। ফার্ম্-এর তাবৎ বাসিন্দা অতঃপর আংশিক কিংবা পূর্ণ উপবাস-পালনে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করেন। আমার নিশ্চিত ধারণা, তাতে তাদের উপকার হয়ে থাকবে। আহারে সংযমের ফলে তাদের অন্তর কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল, ইন্দ্রিয়বাসনা প্রশমিত করার চেষ্টায় কতটা সহায়ক হয়েছিল, সে বিষয়ে অবশ্য জোর দিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি আমি কিছু বলতে পারব

না। আমি নিজে যে শরীরে-মনে এর ফলে যথেষ্ট লাভবান্ হয়েছিলাম—সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নেই। অবশ্য উপবাস ও অনুরূপ সংযমের ফল সকলের ক্ষেত্রে যে সমান না-ও হতে পারে—সে কথা আমার অজানা নয়।

উপবাস আত্মসংযমের সহায়ক হবে এই মনে ক'রে যখন উপবাস পালন করা হয়, কেবল তখনই তা ইন্দ্রিয়দমনে সহায়তা করতে পারে। আমার কোনো-কোনো বন্ধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে লক্ষ করেছেন যে উপবাসের পর তাদের কামবাসনা তীব্রতর হয়েছে, রসনাতৃপ্তির লোভ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে *ভগবদ্গীতা*-র দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি শ্লোক ভালো ক'রে ভেবে দেখার যোগ্য :

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥

বিষয়ভোগে অসমর্থ কিংবা পরাঙ্মুখ হ'লে মানুষ ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে নিবৃত্ত হন বটে, কিন্তু বিষয়ে তাঁর আশক্তি দূর হয় না। পরব্রহ্মের দর্শন পেলে বিষয় ও বিষয়তৃষ্ণা উভয়েরই নিবৃত্তি ঘটে।

এ থেকে বোঝা যায়, আত্মসংযমের সাধনায় উপবাস ও অনুরূপ কৃচ্ছ্রসাধন একটা উপায়মাত্র। কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট বা সমস্ত হতে পারে না। শরীরের উপবাস ও মনের উপবাস যদি একত্র হাত ধরাধরি ক'রে না-চলতে পারে, তাহলে সে উপবাস নিছক ভণ্ডামি এবং সে মিথ্যাচার সর্বনাশ ডেকে আনে।

৩২. স্কুলমাস্টার

ইতিপূর্বে ব'লে রেখেছি যে *দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস*-এ যেসব কথা আমি বলিনি অথবা ভাসাভাসাভাবে বলেছি, কেবল সেইসব প্রসঙ্গ আমি অতঃপর অবতারণা করব। সে কথাটা আপনারা যদি মনে রাখেন তাহলে দেখবেন এইসব প্রসঙ্গের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে।

ফার্ম্-এর বাসিন্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে-সঙ্গে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কথাটা আপনা থেকেই এসে পড়ে। যাদের স্কুলে যাবার বয়স, সেইসব ছেলেদের কেউ ছিল হিন্দু, কেউ-বা মুসলমান, কেউ পার্সি, কেউ খ্রিষ্টান। তাছাড়া কয়েকজন হিন্দু মেয়েও ছিল। তাদের জন্য বাইরে থেকে শিক্ষক নিযুক্ত করা সম্ভবপর ছিল না। আমার মনে হয়েছিল যে তার দরকারও ছিল না। সম্ভবপর ছিল না কেন, তার কারণটা বলি। ভারতীয়দের মধ্যে সুযোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা বেশি ছিল না। তেমন একজন কাউকে পাওয়া যদি-বা যেত, সামান্য বেতনে জোহানেস্‌বার্গ থেকে একুশ মাইল দূরে কেউই নিশ্চয় আসতে চাইত না। টাকাকড়ির দিক থেকে আমাদের ফার্ম্-এর অবস্থাও তো খুব স্বচ্ছল ছিল না। ফার্ম্-এর বাইরে থেকে কোনো শিক্ষক আমদানি করা হয়—সেটাও আমার দরকার ব'লে মনে হয়নি। চলতি শিক্ষাপদ্ধতিতে

আমার আস্থা ছিল না। ইচ্ছা হয়েছিল যে হাতে-কলমে একবার পরীক্ষা ক'রে শিক্ষাপদ্ধতি ঠিক কেমন হওয়া উচিত, আমি নিজেই শিখে নেব। এইটুকুমাত্র আমার জানা ছিল যে সত্যকার অনুকূল পরিবেশ যদি প্রস্তুত করা যায়, তাহলে মা-বাবাই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন। তাহলে বাইরে থেকে যত কম সহায়তা নেওয়া যায়, ততই ভালো। তাছাড়া টলস্টয় ফার্ম্ ছিল গৃহ-পরিবারের মতো, এবং আমি ছিলাম সেই পরিবারের পিতৃ-স্থানীয়। সুতরাং পারতপক্ষে এই পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ভার আমাকেই বহন করতে হয়।

আমার এই ধারণাটা যে একেবারে নিখুঁত ছিল, এমন কথা বলা যায় না। এইসব তরুণবয়স্কেরা শিশুকাল থেকে আমার কাছে তো মানুষ হয়নি। ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশে তারা বড়ো হয়ে উঠেছে। সকলের ধর্মও এক নয়। পিতৃ-স্থানীয় হ'লেও বর্তমান অবস্থায় আমি কি তাদের প্রতি যথোচিত সুবিচার করতে পারব?

কিন্তু বরাবর আমি হৃদয়বত্তার বিকাশ ও চারিত্রচর্চাকে মুখ্য স্থান দিয়ে এসেছি। পরিবেশ ও বয়ঃক্রম নির্বিশেষে সকলকেই সমভাবে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যেতে পার—এই বিশ্বাসে আমি দৃঢ় ছিলাম ব'লে, আমি স্থির করলাম, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দিনের চব্বিশটি ঘণ্টাই তাদের পিতার স্থলবর্তী হয়ে কাটাব। তাদের শিক্ষার সত্যকার বুনিয়াদ হবে তাদের চরিত্রগঠন, এই কথা আমার মনে ছিল। এই ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, বাকি সব শিক্ষণীয় বিষয় ছেলেরা নিজেদের চেষ্টায় কিংবা বন্ধুদের সহায়তায় আয়ত্ত করতে পারবে।

কিন্তু সেইসঙ্গে পুথিপড়ার বিদ্যাটাও আয়ত্ত করা দরকার, এ আমি ভালো ক'রেই জানতাম। তাই কালেন্‌বাখ্ ও প্রাগ্‌জী দেশাইয়ের সহায়তা নিয়ে আমি গুটিকতক ক্লাস খুললাম। শরীরচর্চার দিকটাও আমি অবহেলা করিনি। তাদের প্রতিদিনের কৃত্যতেই শরীরচর্চার সুযোগ ছিল। ফার্ম্-এ কোনো চাকরবাকর ছিল না। রান্নাঘরে হেঁশেলের কাজ থেকে শুরু ক'রে একেবারে পায়খানা ঝাঁটপাট দেওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজ আমাদের নিজেদেরই করতে হ'ত। ফার্ম্-এ ফলের গাছ ছিল অনেক। সেগুলির তদারকি করতে হ'ত। শাক-সব্‌জির বাগানেও কাজ ছিল বিস্তর। ফলফুল, তরিতরকারির বাগানে কালেন্‌বাখ্-এর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। স্থানীয় সরকারের মডেল ফার্ম্-এ শিক্ষানবিশি ক'রে তিনি বাগানের কাজ শিখেছিলেন হাতেকলমে। ফার্ম্-এর ছোটোবড়ো সবাইকে হয় রান্নাঘরে নতুবা বাগানে খানিকটা সময় কাজ করতে হ'ত। বেশিরভাগ কাজ অল্পবয়সীরাই উৎসাহভরে সম্পন্ন করত। বড়ো-বড়ো গর্ত খোঁড়া, গাছ কাটা, কাঠ ফাড়া, মোট বওয়া—কোনো-কিছুতেই তাদের ক্লান্তি ছিল না। এসব কাজে তাদের অঙ্গসঞ্চালন করতে হ'ত প্রচুর। কাজ তারা খুশি হয়েই করত ব'লে, আলাদাভাবে খেলাধুলা কিংবা কখনো-কখনো সবাই মিলে কাজে ঢিলে দিত, ফাঁকি দিত অথবা আদপেই কাজ করতে চাইত না। মাঝে-মাঝে তাদের এইসব ছেলেমানুষি আমি যেন দেখেও দেখতাম না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি বেশ শক্ত হয়ে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় ক'রে নিতাম। আমার এই চাপ দেওয়াটা অনেকসময় তাদের মনঃপূত না-হ'লেও, তারা কখনো বেঁকে বসেছে ব'লে আমার মনে পড়ে না। শক্ত যখন হতাম, যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাদের বুঝিয়ে বলতাম যে হেলাফেলায় কোনো কাজ করাটা ঠিক হয় না।

তখন-তখন আমার কথাটা মেনে নিলেও, পরমুহূর্তে তারা কাজ ছেড়ে খেলা নিয়ে মাতত। সে যা-ই হোক্, মোটামুটি কাজ আমাদের ভালোভাবেই চলত এবং তার ফলে আর যা হোক্ বা না-হোক্, ছেলেদের শরীর-স্বাস্থ্যের দস্তুরমতো উন্নতি ঘটেছিল। ফার্ম্-এ অসুখবিসুখের বালাই বড়ো একটা ছিল না—অবশ্য এর জন্য অনেক অংশে দায়ী ছিল জল-হাওয়ার গুণ ও আহারাদির ব্যাপারে সময়ানুবর্তিতা।

এখানে হাতের কাজ শেখার বিষয়ে দু-চার কথা বলা দরকার। আমার বাসনা ছিল, প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যেন বৃত্তি হিসেবে একটা-কোনো হাতের কাজ রপ্ত করে। এই উদ্দেশ্যে কালেন্‌বাখ্-কে পাঠানো হয় একটি খ্রিষ্টীয় মঠে। সেখানে তিনি জুতো তৈরির কাজ শিখে আসেন। আমি তাঁর কাছ থেকে কাজটা শিখে নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদেরা শেখাই। কালেন্‌বাখ্ ছুতোরের কাজও অল্পসল্প জানতেন। ফার্ম্-এ একজন সহকর্মী ছিলেন যিনি কাঠের কাজ বেশ ভালোই জানতেন। তাই কাঠের কাজ শেখাবার জন্য একটি ছোটোখাটো ক্লাস পত্তন করা হ'ল। রান্নাবান্নার কাজ ছোটোদের অনেকেই জেনে নিয়েছিল।

এইধরনের শিক্ষাব্যবস্থা তাদের কাছে ছিল একেবারে নতুন। তারা স্বপ্নেও ভাবেনি এইধরনের কাজ কোনোদিন তাদের শিখতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বেশিরভাগ ভারতীয় ছাত্রের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল লেখা, পড়া ও অঙ্ক কষা।

টলস্টয় ফার্ম্-এর পর্বেই আমরা স্থির করি, যে কাজ বড়োরা করতে চান না বা করতে পারেন না, ছোটোদের তেমন কোনো কাজ করতে বলা ঠিক হবে না। ফলে ছেলেদের কাজে তাদের মাস্টারমশায়েরাও সহযোগ করতেন ও হাত লাগাতেন। সুতরাং ছোটোরা যা-কিছু শিখত, বেশ খুশি হয়েই শিখত।

পুথিগত বিদ্যা ও চরিত্রগঠনের শিক্ষা সম্বন্ধে এরপরে বলা যাবে।

৩৩. পুথিগতবিদ্যা

টলস্টয় ফার্ম্-এ শরীরচর্চার অনুষঙ্গরূপে কীভাবে কিছুটা কারিগরিশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা গিয়েছিল, সে বিষয়ে ইতিপূর্বেই বলেছি। যতটুকু যা ব্যবস্থা হয়েছিল আমার পক্ষে তা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না-হ'লেও, মোটামুটি এই দুই ব্যাপারে ফল কিছু মন্দ হয়নি।

কিন্তু পুথিগত বিদ্যা দান করার কাজটা ছিল অপেক্ষাকৃত কঠিন। তার জন্য যেসব উপায়-সম্বল বা শিক্ষা-দীক্ষা প্রয়োজন, তা আমার ছিল না। উপরন্তু, এই ব্যাপারে যতখানি সময় আমি দিতে চাইতাম, ততখানি সময়ও আমার হাতে ছিল না। সারা সকালে গতরখাটা পরিশ্রম ক'রে আমি যখন শ্রান্ত, অবসন্ন—যখন সমস্ত শরীর চাইত একদণ্ড জিরিয়ে নিতে, ঠিক সেইসময় শুরু হ'ত আমাদের পুথিপড়ার ক্লাস। দেহে-মনে যে সময়টা বেশ তাজা থাকা দরকার, ঠিক তখুনি একপ্রকার ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে আমি ক্লাস নিতে বসতাম। সকাল-

বেলাটা কেটে যেত খেতে, বাগানে কিংবা রান্নাঘরের কাজে। সুতরাং স্কুল বসত দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পরে—এর চেয়ে সুবিধাজনক সময় বরাদ্দ করা যেত না।

পুথিগত বিদ্যার জন্য আমরা তিনি ঘণ্টার বেশি সময় দিতে পারতাম না। হিন্দি, তামিল, গুজরাতি ও উর্দু—এই চারটে ভাষাই পড়াতে হ'ত। শিক্ষার মাধ্যম ছিল শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা। ইংরেজিও পড়াতে হ'ত। তাছাড়া গুজরাতি হিন্দু ছেলেমেয়েদের কিছুটা সংস্কৃতও। ভাষা ছাড়া সবাইকেই ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতে প্রাথমিক জ্ঞান দিতে হ'ত।

তামিল ও উর্দু আমিই পড়াব ব'লে বলেছিলাম। যৎসামান্য তামিল যা আমি শিখতে পেরেছিলাম, তা জাহাজে যাতায়াতের সময় কিংবা জেলে কয়েদ থাকতে। আমার তামিল বিদ্যার দৌড় ছিল পোপ-রচিত তামিল শিক্ষার সেই উৎকৃষ্ট পুস্তিকাটুকু অবধি। আর উর্দু হরফের সঙ্গে আমার যৎসামান্য যে পরিচয়, তা ঘটেছিল সেই একবার জাহাজে পাড়ি দেবার কালে। মুসলমান-বন্ধুদের সংস্পর্শে আসার ফলে যে কয়টি ফার্সি ও আরবি বহুপ্রচলিত কথা শিখেছিলাম, তাই ছিল উর্দুতে আমার ভাষাজ্ঞানের সীমা। হাই স্কুলে যতটুকু শেখা, তার ছেয়ে বেশি সংস্কৃত জ্ঞান আমার ছিল না। গুজরাতি জ্ঞানও ছিল তথৈবচ।

এই মূলধন সম্বল ক'রে আমায় কাজ চালাতে হ'ত। ভাষা ও সাহিত্য ব্যাপারে আমার সহকর্মীদের পুঁজি ছিল আমার চাইতেও কম। কিন্তু দেশের সমস্ত ভাষার প্রতি আমার ভালোবাসা, শিক্ষক হিসেবে আমার ক্ষমতায় আত্মবিশ্বাস, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের অভাব—এবং সর্বোপরি তাদের উদারমনের প্রশ্রয়—এইসব-কিছু মিলে আমাদের অনেক ঘাটতি পূরণে সহায়তা করেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম হবার ফলে তামিল ছেলেরা তামিল যা জানত, তা নিতান্তই যৎসামান্য। আর তামিল অক্ষরজ্ঞান তাদের ছিলই না। সুতরাং আমি তাদের শেখাতাম তামিল বর্ণপরিচয় ও প্রাথমিক ব্যাকরণ। কাজটা ছিল নিতান্তই সহজ। ছাত্রেরা বেশ জানত, তামিল কথাবার্তা বলায় আমায় তাদের কাছে হার মানতে হবে। ইংরেজি না-জানা কোনো তামিল যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তখন এইসব ছেলেরাই আমার দোভাষীর কাজ করত। তাদের কাছ থেকে আমার অজ্ঞতা ঢাকবার জন্য কখনো কোনো চেষ্টা করতাম না ব'লে, আমি দিব্যি কাজ চালিয়ে নিতাম। শুধু ভাষার বেলা কেন, অন্যসব ক্ষেত্রেই আমি আসলে যেমন, তার বেশি গুণে নিজেকে কখনো জাহির করতে চাইনি। সুতরাং ভাষার জ্ঞান আমার যত সামান্যই হোক্-না-কেন, শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আমি কখনো হারাইনি। তামিলদের তুলনায় মুসলমান ছেলেদের উর্দু শেখানো বরঞ্চ কিছু সহজ ছিল। অক্ষরজ্ঞান তাদের ছিল। বই পড়ায় যাতে তাদের আগ্রহ বাড়ে, হাতের লেখার ছাঁদ যাতে সুন্দর হয়—এইদিকে নজর রাখাই ছিল আমার কাজ।

এইসব ছেলেমেয়েদের অনেকেরই অক্ষরজ্ঞান সন্তোষজনক ছিল না, কেউ-কেউ ইতিপূর্বে কোনো স্কুলেও যায়নি। কিন্তু এদের সঙ্গে হাতেনাতে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, যদি এদের আলস্যের জড়তা দূর করা যায় এবং লেখাপড়ার ওপর নজর রাখা যায়, তাহলে শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমার বিশেষ-কিছু করণীয় থাকে না। এতটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট

থাকতাম ব'লে, নানা বয়সের পড়ুয়াদের একই ক্লাসে বসিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয় আমি পড়াতে পারতাম।

পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা বিষয়ে কত-কিছু শোনা যায়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের অভাব কোনোদিন আমার গায়ে লাগেনি। এমন-কি হাতের কাছে যেসব বই পেয়েছিলাম, সেগুলিও খুব বেশি কাজে লাগিয়েছি ব'লে আমার মনে পড়ে না। ছেলেদের ওপর একগাদা বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া দরকার ব'লে আমার কখনো মনেও হয়নি। আমার বরাবরের বিশ্বাস এই যে শিক্ষকেরাই শিক্ষার্থীর প্রকৃত পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষকেরা বইয়ের সাহায্যে আমায় যেসব জিনিস শিখিয়েছিলেন, তার যৎসামান্যই এখন আমার মনে আছে। কিন্তু বই বাদ দিয়ে তাঁরা মুখে-মুখে আমায় যা শিখিয়েছিলেন, সেসবের স্মৃতি এখনো আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ছেলেরা যতটা-না দেখে শেখে তার চেয়ে অনেক বেশি অপেক্ষাকৃত অল্পআয়াসে কানে শুনে শেখে। আগাগোড়া কোনো বই আমি আমার শিক্ষার্থীদের পড়িয়েছি ব'লে মনে পড়ে না। কিন্তু নানা বই পড়ে নিজের মনে যতটুকু হজম ক'রে আত্মসাৎ করতাম, সেই বিদ্যাটুকু নিজের ভাষায় তাদের কাছে ধরতাম। আমার একান্ত বিশ্বাস, সেসব কথা এখনো আমার শিক্ষার্থীদের হয়তো মনে আছে। বই প'ড়ে শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমি মুখে-মুখে যতটুকু তাদের বলতাম, তা তারা চট্ ক'রে ধরতে পারত এবং অনায়াসে সেসব কথার পুনরাবৃত্তিও করতে পারত। পুথিপড়াটা তাদের কাছে ছিল পরিশ্রম-বিশেষ, কিন্তু আমার মুখের কথা তারা কান পেতে শুনত। যদি নিজের দোষে কথাটা গুছিয়ে সরস ক'রে বলতে না-পারতাম তাহলে অবশ্য আমার কথায় তারা ততটা কান দিত না। আমার কথা শুনে তাদের মনে যেসব প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার উদয় হ'ত, তাই থেকে আমি খানিকটা আঁচ করতে পারতাম, কতটুকু তারা বুঝতে বা গ্রহণ করতে পেরেছে।

৩৪. আত্মিক শিক্ষা

ছেলেদের শরীর ও মনের শিক্ষা নিয়ে আমাকে যতটা-না বেগ পেতে হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি বেগ পেতে হয়েছিল তাদের আত্মার শিক্ষার ব্যাপারে। আত্মাকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে গেলে ধর্মগ্রন্থাদির আশ্রয় নেওয়া বিষয়ে আমার খুব বেশি আস্থা ছিল না। অবশ্য আমি এটা বিশ্বাস করতাম যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই উচিত যে ধর্মে তার জন্ম, সেই ধর্মের মূল কথাগুলি সে জানবে এবং সেই ধর্মের শাস্ত্র বিষয়ে তার মোটামুটি জ্ঞান থাকবে। তাদেরকে এইধরনের জ্ঞান দেবার জন্য আমি যথাসাধ্য ব্যবস্থাও করেছিলাম। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হ'ত এটা তাদের বৌদ্ধিক শিক্ষারই অঙ্গ-বিশেষ। টলস্টয় ফার্ম্-এ এইসব বালকদের শিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করার অনেক আগের থেকেই আমি বেশ বুঝতে

পেরেছিলাম, আত্মার শিক্ষা দেহ ও মনের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এবং এর জন্য বিশেষধরনের শিক্ষার বা সাধনার প্রয়োজন। আত্মার বিকাশসাধন মানে চারিত্রগঠন এবং এমন একটা-কিছু লাভ করা যার ফলে মানুষ আত্মজ্ঞান পরাজ্ঞান অথবা ভগবৎ-জ্ঞানের প্রতি প্রযত্নশীল হতে পারে। আমি এটাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম, তরুণদের মানুষ ক'রে তুলতে হ'লে, আত্মার বিকাশ তাদের শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত। আত্মার চর্চা ব্যতিরেকে কোনো শিক্ষাই মানুষের কাজে লাগে না। সেরকম শিক্ষার ফল বরঞ্চ বিষময় হতে পারে।

আমি জানি, অনেকে মনে করেন চতুরাশ্রমের সর্বশেষ স্তরে না-পৌছন পর্যন্ত, অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ না-করা পর্যন্ত, মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা কুসংস্কারমাত্র। এ কথা কে না-জানে আত্মজ্ঞানের মতো অমূল্য অভিজ্ঞতালাভের প্রস্তুতি মানুষ যদি তার জীবনের অন্তিম অবস্থা পর্যন্ত স্থগিত রাখে, তাহলে মানুষ যা লাভ করে, তা আর আত্মোপলব্ধি থাকে না, তা পর্যবসিত হয় ভীমরতিগ্রস্ত বৃদ্ধের শোচনীয় দ্বিতীয় শৈশবে। সে তখন সংসারের বোঝাস্বরূপ হয়ে কেবলমাত্র প্রাণে বেঁচে থাকে। আমার বেশ পরিষ্কার মনে আছে, ১৯১১-১২ খ্রিষ্টাব্দে আমি যখন ছাত্রদের পড়াতাম তখনো আমার এইরকমই ধারণা ছিল। তফাতের মধ্যে এই যে তখন হয়তো আমার এই ধারণা আমি ঠিক আজকের ভাষায় ব্যক্ত করতে পারিনি।

এখন কীভাবে এই আত্মার শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, তাই নিয়ে আমি ভাবতে বসলাম। নিজ-নিজ ধর্মীয় ভজন তারা যাতে মুখস্থ করে ও আবৃত্তি করে—এই দিয়ে শুরু হ'ল। সেই সঙ্গে নীতিকথার বই থেকে তাদের কিছু-কিছু অংশ প'ড়ে শোনাতাম। কিন্তু তাতে আমার মনের যথেষ্ট সন্তোষ হচ্ছিল না। যতই অন্তরঙ্গভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলাম, ততই যেন স্পষ্টত বুঝতে পারলাম যে পুথি প'ড়ে বা পড়িয়ে আত্মার জ্ঞান দেওয়া যায় না। শরীরকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হলে যেমন শরীর চালনা করতে হয়, মনকে শিক্ষিত করতে গেলে যেমন মন চালনা করা দরকার, তেমনি আত্মার জ্ঞানলাভ করতে হ'লে তা কেবলমাত্র আত্মিক সাধনার সাহায্যেই সম্ভব। এই সাধনায় সফল হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণত নির্ভর করে গুরু যিনি, তাঁর নিজের জীবন ও আচরণের ওপর। সেইজন্য ছাত্রেরা কাছে থাকুক্ কিংবা দূরেই থাকুক্, আচার্যকে সদাসর্বদা সতর্ক হয়ে চলা দরকার।

গুরু শত যোজন দূরেও যদি থাকেন, আপন আচরণের প্রভাবে তিনি শিক্ষার্থীর চিত্ত প্রভাবিত করতে পারেন। আমি নিজে যদি মিথ্যাচারী হই, তাহলে আমার পক্ষে বালকদের সর্বদা সত্যবাদী হতে বলা বিফল হতে বাধ্য। গুরু নিজে যদি ভীরু ও কাপুরুষ হন, শিষ্যেরা অকুতোভয় বীর হতে পারে না। যে লোক আত্মসংযমের ধার ধারে না, সে কী ক'রে তার ছাত্রদের সংযমের সুফল বিষয়ে শিক্ষা দেবে? অতএব আমি বুঝলাম, যেসব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার কাজ-কারবার, যাদের সঙ্গে আমি সর্বক্ষণ রয়েছি, তাদের সামনে আমায় নিরন্তর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। জীবন্ত পুথি হয়ে তাদের সামনে আমায় দাঁড়াতে হবে—যাতে আমার আচরণ দেখে তারা নিজেদের আচরণ বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে

ছেলেরাই আমার শিক্ষক হয়ে দাঁড়াল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, আমার নিজের জন্য যতটা না-হোক্ তাদেরই খাতিরে আমায় ভালো হতে হবে ও ভালোভাবে থাকতে হবে। সুতরাং টলস্টয় ফার্ম্-এর সাধনা ও সংযমের পথে আমি যদি বেশি ক'রে অগ্রসর হয়ে থাকি, তার জন্য আমি অনেক অংশে আমার শিক্ষার্থীদের কাছে ঋণী।

এদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল যে কারো তোয়াক্কা করত না, নিয়ম-শাসন মানত না, কথায়-কথায় মিথ্যা কথা বলত ও অন্য ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করত। একদিন তো তার উৎপাত একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। আমি আর ধৈর্য ধ'রে থাকতে পারলাম না, রেগে গেলাম। ছেলেদের আমি কখনো মারধোর করতাম না, কিন্তু সেদিন আমি আর আমার রাগ দমন করতে পারলাম না। তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তাতে কোনো ফল হ'ল না। তার গোঁয়ার্তুমি একচুলও কমল না, বরঞ্চ উল্‌টে সে আমাকেই নাকাল করতে চাইল। সামনে একটা রুল প'ড়ে ছিল, শেষপর্যন্ত সেটা তুলে নিয়ে তার হাতে এক ঘা লাগালাম। তাকে মারতে গিয়ে আমার সমস্ত শরীরটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। সে নিশ্চয় আমার অবস্থা লক্ষ ক'রে থাকবে। আমার এরকম চেহারা এর আগে তাদের কেউই দেখেনি। ছেলেটি কেঁদে ফেলল ও আমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করল। রুলের আঘাত লেগে যন্ত্রণায় যে সে কেঁদে উঠেছিল এমন নয়। সতেরো বছরের তাগড়া ছেলে, ইচ্ছা করলে আমায় এক ঘা বদ্‌লা মারা তার পক্ষে একটুও কঠিন ছিল না। কিন্তু রুলটাকে হিংসার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে গিয়ে আমি নিজের মনে কী মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলাম, সেটা নিশ্চয় সে বুঝে থাকবে। এই ঘটনার পর কোনোদিন সে আমার কথার অবাধ্যতা করেনি। কিন্তু সেই আঘাত দেবার কথা মনে পড়লে আজও আমি মনে-মনে বেদনা অনুভব ক'রে থাকি। আমি অনুতপ্তচিত্তে স্বীকার করি, সেদিন সেই ছেলেটির কাছে আমি আমার আত্মার পরিচয়টুকু তুলে ধরতে পারিনি, আমার পাশবিকতা দিয়ে তাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম।

শারীরিক শাস্তিবিধানে বরাবরই আমার ঘোরতর আপত্তি। আমার মনে পড়ে কেবল একবার আমি আমার কোনো ছেলেকে এইধরনের শাস্তি দিয়েছিলাম। রুল দিয়ে আঘাত দেওয়াটা আমি ঠিক কাজ করেছিলাম, না ভুল কাজ করেছিলাম, সে আমি আজও স্থিরনিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না। কাজটা হয়তো ঠিক করিনি, কারণ আমি মেরেছিলাম রাগের মাথায়, শাস্তি দেবার ইচ্ছা নিয়ে। যদি এ কাজটা কেবল আমার মনোবেদনার অভিব্যক্তি হ'ত, তাহলে আমি বলতাম, যা করেছিলাম ঠিকই করেছিলাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাগও যেমন ছিল, দুঃখও তেমনি।

এই ঘটনার পর থেকে ছেলেদের শোধরানোর উপায় বিষয়ে আমি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করি, এবং অপেক্ষাকৃত ভালো একটা উপায়ও আমি খুঁজে পাই। সদ্যোবর্ণিত ঘটনার বেলা সেই উপায় প্রয়োগে সুফল ফলত কি-না, সে আমি নিশ্চিত বলতে পারি না। ছেলেটি ওই ব্যাপারটা অনতিকালেই ভুলে যায়। আমার মনে হয় না, শাস্তির ফলে সে সত্যি-সত্যি শুধরেছিল। তাই এটুকু বলতে পারি যে এই ঘটনার ফলে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের কীরকম কর্তব্য হওয়া উচিত, তা যেন আমি আগের তুলনায় আরো স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পেরেছিলাম।

এই ঘটনার পরেও ছেলেরা বেচাল যে করেনি এমন নয়, কিন্তু এরপর আমি কখনও কায়িক দণ্ডের শরণ নিইনি। এইভাবে ছেলেমেয়েদের আত্মার শিক্ষা দিতে গিয়ে আমি নিজেই আত্মিক গুণের প্রভাব ও শক্তি বিষয়ে দিন-দিন যেন বেশি ক'রে জানতে ও বুঝতে শিখলাম।

৩৫. আলোয়-কালোয়

টলস্টয় ফার্ম্-এ থাকতে কালেন্‌বাখ্ একটি সমস্যার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কথাটা ইতিপূর্বে কখনো আমার মনে হয়নি। বলেইছি তো, ফার্ম্-এ কয়েকটি দস্তুরমতো দুরন্ত ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ ছিল খামখেয়ালি ও বাউন্ডুলে। প্রতিদিনই এইসব ছেলেদের সঙ্গে আমার তিন ছেলে ও আমার ছেলেদের মতো যাদের স্বভাব সেইরকম ছেলেরাও, মেলামেশা করত। কালেন্‌বাখ্ এতে বিশেষ অস্বস্তি ভোগ করতেন। অবশেষে তাঁর ধারণা হ'ল, এইধরনের বেয়াড়া বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আমার তিন ছেলেকে একত্র রাখা ঠিক হচ্ছে না।

চুপ থাকতে না-পেরে একদিন তো কালেন্‌বাখ্ আমায় ব'লেই ফেললেন : "দেখুন, এইসব আজেবাজে ছেলের সঙ্গে আপনার ছেলেরা মেলামেশা করবে—এটা আমার ভালো ঠেকছে না। এর একমাত্র ফল হবে এই যে এরকম কুসংসর্গে থাকার ফলে তারাও অধঃপাতে যাবে।

তাঁর এই কথায় আমি মুহূর্তেকের জন্য ঘাবড়ে গিয়েছিলাম কি-না আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তবে জবাবে আমি তাঁকে যা বলেছিলাম সে কথাগুলি আমার মনে আছে। আমি বলেছিলাম : "এই বাউন্ডুলে ছেলেদের থেকে আমার নিজের ছেলেদের আমি কী ক'রে পৃথক্ করি? দুই পক্ষের প্রতিই আমার সমান দায়িত্ব। আমি ডেকে নিয়েছি ব'লেই-না এরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এদের হাতে কিছু পয়সাকড়ি দিয়ে আমি যদি বিদায় ক'রে দিই, তবে তো কালবিলম্ব না-ক'রে এরা জোহানেস্‌বার্গ পালাবে এবং ঠিক আগের মতো চলাফেরা করতে থাকবে। আর সত্যি কথা বলতে কী, তাদের অভিভাবকদের মতো এইসব ছেলেছোকরাও হয়তো মনে-মনে ভাবে, এখানে এসে তারা আমায় বিশেষভাবে বাধিত করেছে। এখানে আসার ফলে তাদের যে অনেক অসুবিধা সইতে হচ্ছে—সে আমিও যেমন জানি, আপনিও তেমন জানেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য যে কী, সে বিষয়ে আমার ধারণা পরিষ্কার। এখানে তাদের আমায় রাখতেই হবে, সুতরাং তাদের সঙ্গে মিলেমিশেই আমার ছেলেদের জীবনযাপন করতে হবে। তাছাড়া আপনি নিশ্চয় চান না যে আমার ছেলেদের আমি এমন শিক্ষা দিই যে এখন থেকেই তারা মনে করতে থাকে, অন্য ছেলেদের তুলনায় তারা একধাপ উঁচু। যদি তাদের মাথায় এই হামবড়াই ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের জাহান্নমে যেতে কতক্ষণ। ভালোভাবে মানুষ হয়ে ওঠার জন্য অন্য ছেলেদের সঙ্গে তাদের মেলামেশা দরকার। তাহলে তারা নিজেদের চেষ্টায় কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা

মন্দ বাছাই করতে শিখবে। তাছাড়া আমার ছেলেদের মধ্যে সত্যিকার ভালো গুণ যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে তার প্রভাব যে অন্যদের ওপর পড়বে—সেটাই-বা আমরা না-ভাবব কেন? সে যা-ই হোক্, তাদের এখানে রাখা ছাড়া আমার যখন গত্যন্তর নেই, তাতে যদি কিছু বিপদের ঝুঁকিও থাকে, আমাদের তা বইতে হবে।

কালেন্‌বাখ্ তাঁর আপত্তি প্রকাশ ক'রে মাথা নাড়লেন।

আমার কিন্তু মনে হয় না, এই পরীক্ষার ফল সত্যি-সত্যিই খারাপ হয়েছিল। আমার মনে হয় না, এর ফলে আমার ছেলেদের কোনো ক্ষতি হয়েছিল কিংবা তারা যেমন ছিল তার চেয়ে মন্দ হয়েছিল। উল্‌টে বরঞ্চ তাদের কিছু লাভই হয়ে থাকবে ব'লে আমার মনে হয়। হামবড়াই ভাব তাদের মধ্যে লেশমাত্র যদি থেকেও থাকত, ভয়ে সেটা তাদের অন্তর থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে থাকবে। তারা সবরকম ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলতে-মিশতে শিখেছিল। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাবার ফলে তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষালাভ করেছিল।

এই পরীক্ষা ও অন্য অনুরূপ পরীক্ষা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে ভালো ছেলেরা যদি মন্দ ছেলেদের সঙ্গে একত্র বসবাস করে কিংবা একইসঙ্গে লেখাপড়া করে, তাতে তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি ঘটে না। অবশ্য এইরকম পরীক্ষা চলবার সময় ছেলেমেয়েদের ওপর পিতামাতা ও অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

যেসব ছেলেমেয়েদের পুতুপুতু ক'রে সযত্নে ঘরের মধ্যে তুলে রাখা হয়, তারা যে সবসময় সবরকম লোভ এড়িয়ে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে এ কথা ঠিক যে ভিন্ন-ভিন্নভাবে লালিত-পালিত ছেলেমেয়েদের যখন একত্র রেখে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়, তখন আসলে যাঁদের সুকঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, তাঁরা হলেন সেইসব ছেলেমেয়েদের মা-বাবা অথবা শিক্ষক। তাঁদের সবাইকে তখন সর্বদা চোখ, কান খুলে সন্ত্রস্ত সতর্ক থাকতে হয়।

৩৬. অনশনে প্রায়শ্চিত্ত

ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে মানুষ করা বা লেখাপড়া শেখানো যে কত কঠিন কাজ, দিন-দিন এ কথা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। সত্যই যদি তাদের ভারপ্রাপ্ত অভিভাবক ও শিক্ষক হিসেবে তাদের প্রতি আমার যথোচিত কর্তব্য পালন করতে হয়, তাহলে সর্বাগ্রে দরকার তাদের অন্তরে প্রবেশ করা, তাদের মর্মজ্ঞ হওয়া। তাদের সুখে-দুঃখে আমায় সহভাগী হতে হবে, তাদের নানা সমস্যা সমাধানে আমায় সহায়তা করতে হবে, তাদের উচ্ছল যৌবন জলধিতরঙ্গ প্রবাহিত করাতে হবে ঠিক-ঠিক খাতের মধ্যে দিয়ে।

জেল থেকে কিছু-কিছু সত্যাগ্রহী মুক্তিলাভ ক'রে তাঁদের পরিবারবর্গকে টলস্টয় ফার্ম্-থেকে স্থানান্তর করলেন। ফলে ফার্ম্-এর জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে লাগল। অবশিষ্ট যারা ছিল, তাদের ঘরবাড়ি ছিল ফিনিক্স্ আশ্রমে, সুতরাং তাদের সেখানে পাঠিয়ে দিই।

ফিনিক্স্‌-এ ফেরৎ যারা গেল, তাদের নিয়ে আমায় একটা অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। তখনকার দিনে আমায় কখনো থাকতে হ'ত জোহানেস্‌বার্গ-এ, কখনো-বা ফিনিক্স্‌-এ। জোহানেস্‌বার্গ-এ থাকাকালে একদিন খবর পেলাম আশ্রমের দুটি ছেলেমেয়ের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আমাদের পিছু হটতে হয়েছে কিংবা সরাসরি পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে—এরকম খবর এলেও আমি ততটা বিচলিত হতাম না, যতটা হলাম এই নৈতিক পতনের খবরে। এ যেন একেবারে বিনা-মেঘে বজ্রপাত। সেইদিনই ট্রেন ধ'রে ফিনিক্স্‌ রওনা হলাম। কালেন্‌বাখ্‌ আমায় কিছুতেই একলা ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। আমার বিচলিত অবস্থা তিনি লক্ষ করেছিলেন, কারণ ফিনিক্স্‌ থেকে খবরটা আমি তাঁর মুখেই শুনেছিলাম। কালেন্‌বাখ্‌ আমার সঙ্গী হলেন।

ট্রেন্‌-এ চলতে-চলতে মনে হ'ল এরকম ক্ষেত্রে আমার ঠিক কর্তব্য কী তা যেন আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। যে ছেলে অভিভাবকের আশ্রয়ে থাকে কিংবা শিক্ষকের কাছে পাঠগ্রহণ করে, তার যদি পতন হয়, তাহলে সেজন্য শিক্ষক কিংবা অভিভাবক কিছু-পরিমাণে দায়ী, এ কথা অস্বীকার করতে যায় না। ওই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আমার নিজের দায়িত্ব যে কতখানি তা আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার স্ত্রী এ বিষয়ে আমায় পূর্ব থেকেই সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু সহজেই আমি মানুষকে বিশ্বাস ক'রে বসি ব'লে, তাঁর কথায় তখন আমি কান দিইনি। এখন আমার মনে হ'ল, আমি যদি প্রায়শ্চিত্ত পালন করি তাহলে দুষ্কৃতকারীরা বুঝতে পারবে কত বড়ো অন্যায় তারা করেছে এবং তাদের এই অধঃপতনের ফলে আমি মনে কী গভীর বেদনা অনুভব করেছি। সাতদিন আমি অনশনে থাকব এবং সাড়ে-চার মাসকাল একাহারে থাকব—এইরকম একটি সঙ্কল্প আমি গ্রহণ করলাম। বহু চেষ্টা ক'রেও কালেন্‌বাখ্‌ এই স্বেচ্ছা-গৃহীত ব্রত থেকে আমায় নিরস্ত করতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত এই ব্রতপালনের যৌক্তিকতা তিনি মেনে নিলেন এবং ধ'রে বসলেন যে তিনিও ব্রত-উদ্‌যাপনে আমার সঙ্গী হবেন। তাঁর এই নির্মল স্নেহের দাবি আমি উপেক্ষা করি, এমন আমার জো ছিল না।

সঙ্কল্পে মনঃস্থির হবার সঙ্গে-সঙ্গে মনের ওপর থেকে একটা প্রকাণ্ড বোঝা যেন নেমে গেল। আমি অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করতে লাগলাম। দোষী দু-জনের প্রতি যে রাগ ও বিদ্বেষ জমা হয়েছিল, তার ঘোরটা কেটে গেল। মন যেন কানায়-কানায় ভ'রে উঠল তাদের প্রতি নিছক অনুকম্পায়। এইভাবে ট্রেনে যেতে-যেতেই আমার মন অনেখানি হাল্‌কা ক'রে, আমি ফিনিক্স্‌ গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছে আরো-কিছু তালাশ-তদন্ত ক'রে, এই ঘটনার বিষয়ে যা-কিছু খুঁটিনাটি জানার ছিল, জেনে নিলাম।

আমার উপবাসে সকলেই মনে বেদনা অনুভব করেন, কিন্তু এর ফলে আশ্রমের আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যায়। পাপ ও দুষ্কৃতি যে কত সাঙ্ঘাতিক বস্তু, সেটা আশ্রমের সকলেই বুঝতে পারেন। এর ফলে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক মধুরতর হয় এবং তাদের সঙ্গে আমার সত্যকার যোগাযোগ দৃঢ়তর হতে থাকে। কিছুকাল পরে এই

ঘটনারই জের হিসেবে অনন্যোপায় হয়ে পক্ষকালের জন্যে আমায় অনশন পালন করতে হয়। এই উপবাসের যে ফল হয়েছিল, তা আমার নিজেরও আশাতিরিক্ত।

এইসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম ব'লে কেউ যেন মনে না-করেন যে ছাত্রদের কেউ কোনো দোষ বা অপরাধ করলেই অবশ্যকর্তব্যজ্ঞানে শিক্ষককে অনশন পালন করতে হবে। তবে আমার বিশ্বাস, ক্ষেত্রবিশেষে এইরকম মোক্ষম ওষুধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে গেলেও দুটি ব্যাপারে সাবধানে থাকতে হয়—দৃষ্টিকে আবিলতামুক্ত রাখতে হয় এবং নৈতিক যোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হতে দিতে নেই। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যদি প্রকৃত প্রণয় না-থাকে, শিষ্যের দুষ্কৃতিতে গুরুর সমস্ত অন্তর যদি ব্যথিত বোধ না-করে, গুরুর প্রতি শিষ্যের যদি ভক্তি না-থাকে, তাহলে সেরকম ক্ষেত্রে উপবাস কেবল অবান্তর নয়, উপরন্তু ক্ষতিকরও হতে পারে। এইরকম বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে উপবাস বিধেয় কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পরে। কিন্তু শিষ্যের দোষ-ত্রুটির জন্য শিক্ষক স্বয়ং যে দায়ী এ কথা নিঃসন্দেহ বলা চলে।

এই প্রথম উপবাস-ব্রত পালন করাটা আমাদের দু-জনের পক্ষে খুব বেশি কষ্টসাধ্য হয়নি। সচরাচর আমার দিনকৃত্য যা থাকে, তার কোনোটিই স্থগিত রাখতে কিংবা বাদ দিতে হয়নি। এই ব্রত-পালনের যুগে আমি যে গোঁড়া ফলাহারী ছিলাম—সে বিষয়ে নিশ্চয় আপনাদের মনে থাকবে। দ্বিতীয় উপবাসের সময় দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকটায় আমার দস্তুরমতো ক্লেশ হয়েছিল। তখনো পর্যন্ত রামনামের আশ্চর্য মহিমা ও কার্যকারিতা বিষয়ে আমি সব কথা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি। তার ফলে কষ্ট সহ্য করার শক্তি ও ক্ষমতাও আমার সেই অনুপাতে কম ছিল। উপরন্তু, সেসময় উপবাস-পালনের প্রক্রিয়া বিষয়েও আমার সম্যক্ জ্ঞান ছিল না। আমি জানতাম না যে যতই বিস্বাদ লাগুক্-না কেন, যতই বমির ভাব আসুক্-না কেন, উপবাসের সময় প্রচুর জল খেতে হয়। প্রথম উপবাসের পর্বটা মোটামুটি সহজে চুকে গিয়েছিল ব'লে, দ্বিতীয়টির বেলা তেমন সতর্ক ও সাবধানও থাকিনি। প্রথম উপবাসের সময় আমি প্রতিদিন কুহ্ন-পদ্ধতিতে স্নান করতাম। দ্বিতীয় উপবাসকালে দু-তিনদিন এই পদ্ধতিতে স্নান করার পর তা বন্ধ ক'রে দিই। জল বিস্বাদ লাগত ও জল খেলেই বমির ভাব আসত ব'লে, জল খেতাম খুবই কম। তার ফলে গলা এতটা শুকিয়ে গিয়েছিল ও ক্ষীণ হয়েছিল যে পক্ষকালের সেই উপবাসের শেষদিকে কথা বলতে হ'ত ফিস্‌ফিস্ শব্দে। তৎসত্ত্বেও আমার সমস্ত লেখার কাজ আমি শেষদিন পর্যন্ত চালিয়ে গেছি, আমার সেই ক্ষীণ গলার কথা শুনে লিপিকার শ্রুতিলিখনে আমার বক্তব্য লিখে নিতেন। তাছাড়া আমি প্রতিদিন নিয়মিত *রামায়ণ* ও অন্য ধর্মগ্রন্থাদির পাঠ শুনতাম। জরুরি ব্যাপারে মতামত ও উপদেশ-নির্দেশ দেবার মতো শক্তি আমার ছিল যথেষ্ট পরিমাণে।

৩৭. গোখলে-সংসর্গে

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কিত অনেকগুলি স্মৃতিকথা বাদ না-দিলে কাহিনী বড়ো দীর্ঘ হয়ে যাবে। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্তে গোখলের নির্দেশ বহন ক'রে চিঠি এল যেন আমি লণ্ডন ঘুরে দেশে ফিরি। জুলাই মাসে কস্তুরবা, কালেন্‌বাখ্‌ ও আমি সমুদ্রপথে বিলাত পাড়ি দিলাম।

সত্যাগ্রহের সময় থেকেই আমি রেলপথে যাতায়াত করতাম তৃতীয় শ্রেণীতে; সুতরাং এবার জলপথেও আমরা হলাম তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। কিন্তু আমাদের দেশের রেল-স্টীমারের তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে এই জাহাজের তৃতীয় শ্রেণীর আকাশপাতাল তফাৎ। দেশের রেলে-স্টীমারে শোবার জায়গা তো দূরের কথা, অনেকসময় ভালো ক'রে বসার জায়গাও মেলে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নেই বললেই হয়। কিন্তু আমাদের এই লণ্ডনগামী জাহাজে হাত-পা মেলে শোওয়া-বসার জায়গা ছিল পর্যাপ্ত। সব-কিছু ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উপরন্তু জাহাজ কোম্পানি আমাদের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল। শৌচাদির জন্য একটি পায়খানা আমাদের নামে রিজার্ভ ক'রে রেখেছিল। আমরা ফলাহারী ব'লে স্টুঅর্ডকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যেন আমাদের প্রয়োজনমতো ফল ও বাদাম-জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করে। সচরাচর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কপালে কালেভদ্রে ফল, বাদাম বা মেওয়া-জাতীয় খাদ্য জোটে। এইসব সুবিধা থাকার ফলে আমাদের আঠারোদিনের সমুদ্রযাত্রা আরামেই কেটেছিল।

এইবারকার সমুদ্রযাত্রার দু-চারটা ঘটনার বিষয়ে বলা যেতে পারে। দূরবীন ছিল কালেন্‌বাখ্‌-এর ভীষণ শখের জিনিস। এ যাত্রাতেও তাঁর সঙ্গে একাধিক বেশ ভালো ও দামি দূরবীন ছিল। প্রতিদিন দূরবীন নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা ও তর্ক হ'ত। আমি কালেন্‌বাখ্‌-কে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, আমরা যেধরনের সাদাসিধে জীবন আমাদের আদর্শ ব'লে গ্রহণ করেছি, দূরবীনের মতো শৌখিন ও মূল্যবান্‌ সমাগ্রীর সঙ্গে তার কোনো সঙ্গতি নেই। আসলে ওটা তো সম্পত্তি—সুতরাং পরিগ্রহবিশেষ। একদিন, আমরা যখন আমাদের কেবিন্‌-এর পোর্টহোল অর্থাৎ গোল জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের সেই দৈনিক তক্‌রার চরমে গিয়ে পৌঁছল।

আমি কালেন্‌বাখ্‌-কে বললাম : "প্রতিদিন ওই একই ব্যাপার নিয়ে আমাদের দু-জনের মধ্যে মনকষাকষি ক'রে কী লাভ। যে জিনিস নিয়ে এত কথাকাটাকাটি, সেগুলো সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেই তো সমস্ত ল্যাঠা চুকে যায়।"

কালেন্‌বাখ্‌ জবাবে বললেন : "নিশ্চয়, নিশ্চয়, ঠিক কথাই তো বলছেন। ও জঞ্জাল জলেই ফেলে দিন, আপদ বিদায় হোক্‌।"

আমি বললাম, "বুঝে-সুঝে কথা বলো। আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না। ফেলে দিতেই চাই।" সঙ্গে-সঙ্গে কালেন্‌বাখ্‌-এর জবাব এল, "আহা, আমিও তো তাই চাই।"

ব্যস্‌, সঙ্গে-সঙ্গে আমি দূরবীন ছুঁড়ে জলে ফেলে দিলাম। ওগুলোর দাম ছিল প্রায় সাত

পাউন্ড মতো। কিন্তু সে দামের অনেক বড়ো ছিল দূরবীন নিয়ে কালেন্‌বাখ্‌-এর মোহ। মোহ থেকে মুক্তি পাবার পর ওই ফেলে-দেওয়া দূরবীন নিয়ে কালেন্‌বাখ্‌-কে কোনোদিন আপশোস করতে দেখিনি।

কালেন্‌বাখ্‌ ও আমার মধ্যে এইরকম ঘটনা আরো অনেক ঘটেছিল। এই-যে ঘটনার কথা বললাম এটি একটি নমুনামাত্র।

তখন সত্যের সন্ধানে সবে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে ব'লে আমরা এইভাবে প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু নতুন জিনিস শিখে নিতে লাগলাম। সত্যের পথে চলতে গেলে ক্রোধ, স্বার্থবুদ্ধি, ঘৃণা প্রভৃতি আপনা থেকেই বিদূরিত হয়, তা না-হ'লে সত্যকে লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি মোহ বা রিপুর বশবর্তী, তার মনের অভিপ্রায় মহৎ হতে পারে, সে তার মুখের কথায় সত্যবাদীও হতে পারে, কিন্তু সে কখনো সত্য লাভ করতে পারে না। সুখ-দুঃখ অনুরাগ-বিরাগ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি না-পাওয়া পর্যন্ত সত্যের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

সমুদ্রপথে বেরুবার অল্পকিছুদিন আগে আমার একটি অনশন-পর্ব শেষ হয়। তখনো পর্যন্ত আমি আমার আগের শক্তি ফিরে পাইনি। ক্ষিদেটাকে চাঙ্গা ক'রে তোলবার জন্য এবং আহার ভালোভাবে পরিপাক করার জন্য আমি প্রতিদিন ডেক্‌-এ পদচারণা করতাম। কিন্তু ওই সামান্য ব্যায়ামও আমার দুর্বল শরীর সইল না, পায়ে বেশ ব্যথা হতে লাগল। লন্ডন পৌঁছবার পর দেখা গেল, সমুদ্রভ্রমণের ফলে আমার শরীর ভালো হওয়া দূরের কথা, বরঞ্চ খারাপই হয়েছে। ডক্টর জীবরাজ মেহ্‌তার সঙ্গে সেখানে আমার পরিচয় হয়। তাঁকে আমার উপবাস ও উপবাসের শেষে আমার নিম্নাঙ্গের ব্যথা বিষয়ে আনুপূর্বিক সব কথা বললাম। তিনি বললেন, "কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে যদি না-থাকেন, তাহলে পা-দুটো জন্মের মতো অসাড় ও পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।"

তখন আমি বুঝতে পারি, দীর্ঘ অনশনের পর হৃতশক্তি ফিরে পাবার জন্য তাড়াহুড়ো ক'রে কিছু করতে যাওয়া ঠিক নয়। আর আহারে সংযত থাকা তো অতি অবশ্যই দরকার। উপবাস-পালন করার সময় যতটা নয়, তার চাইতে অনেক বেশি সতর্ক ও সংযমী হতে হয় উপবাস-ভঙ্গের সময়।

মাদীরার ঘাটে আমাদের জাহাজ লাগতেই শুনতে পেলাম যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধ বাধতে পারে। ইংলিশ চ্যানেল্‌-এ আমরা যখন প্রবেশ করলাম জানা গেল যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। জাহাজেই কিছুটা সময় আমাদের আটক থাকতে হ'ল। সমস্ত চ্যানেল্‌ জুড়ে জলের নিচে বিস্ফোরক বোমা পোঁতা থাকার ফলে, চ্যানেল্‌-এর মধ্যে দিয়ে আমাদের জাহাজের গুণ-টানা রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। সাদাম্‌টন পৌঁছতে আমাদের প্রায় দুটো দিন লেগে গেল।

ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করল ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট। আমরা লন্ডনে পা দিলাম ৬ আগস্ট তারিখে।

৩৮. যুদ্ধের সঙ্গে আমার যোগ

বিলেতে পৌঁছবার পর জানতে পেলাম গোখলে প্যারিস্ শহরে আট্‌কা পড়েছেন। শরীর-স্বাস্থ্য সারাবার জন্য তিনি গিয়েছিলেন প্যারিস্ ; এখন লন্ডনের সঙ্গে প্যারিস্-এর যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে ব'লে, জানা যাচ্ছে না তিনি কবে নাগাদ ফিরে আসতে পারবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না-ক'রে দেশে ফিরতে মন চাইছিল না। কিন্তু লন্ডনের কেউই তো ঠিক ক'রে বলতে পারছিল না কবে তিনি ফিরবেন।

তাঁর ফিরে না-আসা পর্যন্ত তাহলে আমি কী করি? এই-যে যুদ্ধ বাধল এই যুদ্ধেই-বা আমার কর্তব্য কী? দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহী আন্দোলনে আমার সঙ্গে জেলে গিয়েছিলেন সোরাবজী আদাজানিয়া। তিনি তখন লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ছেন। বাছা-বাছা সত্যাগ্রহীদের মধ্যে সোরাবজী অন্যতম ছিলেন ব'লে, তাঁকে বিলেতে পাঠানো হয়েছিল ব্যারিস্টারি পড়তে। কথা হয়েছিল, ব্যারিস্টর হয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে আমার স্থান নেবেন। লন্ডনে তাঁর সমস্ত খরচখরচা চালাতেন ডক্টর প্রাণজীবনদাস মেহ্‌তা। ডক্টর মেহ্‌তার মধ্যস্থতায় এবং তাঁর উপস্থিতিতেই, ডক্টর জীবরাজ মেহ্‌তা ও আপরাপর ভারতীয় যেসব ছাত্র তখন বিলেতে পড়াশুনো করছেন, তাদের কারও-কারও সঙ্গে সমবেতভাবে আমার আলাপ-আলোচনা হয়। তাঁদের পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে বিলেতে ও আয়র্লন্ড-এ যেসব ভারতীয় প্রবাসী আছেন, তাঁদের সবাইকে একটি সভায় ডাকা হবে। আমি এই সভার সামনে আমার বক্তব্য পেশ করব।

আমার মনে হয়েছিল, বিলেত-প্রবাসী ভারতীয়দের উচিত যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের যথাসাধ্য মদৎ দেওয়া। ইংরেজ ছাত্রেরা স্বেচ্ছায় সেনাদলে নাম লিখিয়েছে। ভারতীয় ছাত্রেরাই-বা কেন পিছিয়ে থাকবে? আমার এইধরনের যুক্তির অনেকে বিরোধিতা করেছিলেন। কেউ-কেউ আপত্তি ক'রে বলেছিলেন, ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে তো জমিন-আশমান ফারাক্। আমরা তাঁদের গোলাম, তাঁরা আমাদের মনিব। প্রভুর যখন বিশেষ ঠেকা তখন কি ক্রীতদাস স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে মনিবের সঙ্গে সহযোগ করতে পারে? দাসত্বের বন্ধন থেকে যে দাস মুক্তি লাভ করতে চায়, প্রভুর দুর্যোগই তো তার সুবর্ণ সুযোগ। এইধরনের কথাবার্তা তখন আমার বিশেষ ভালো লাগেনি। ইংরেজ ও ভারতীয় যে একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত নয়, সে না-হয় মেনে নিলাম। কিন্তু ইংরেজরা আমাদের একেবারে গোলাম বানিয়ে রেখেছে, এ কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে শক্ত ছিল। আমার তখন ধারণা ছিল, এইধরনের মনোভাবের দরুণ দায়ী হ'ল কোনো-কোনো আমলাতন্ত্রী ব্রিটিশ অফিসারের উদ্ধত স্বভাব এবং এরজন্য গোটা ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতিকে দায়ী করা ঠিক নয়। প্রভুত্বপরায়ণ ইংরেজ অফিসারদের দোষ আমরা আমাদের প্রেম দিয়ে জয় করতে পারি। ব্রিটিশের সহযোগে ও সহায়তায় আমরা যদি নিজেদের অবস্থার উন্নতিবিধান করতে চাই, তাহলে অসময়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্যবিশেষ। শাসনপদ্ধতিতে গলদ নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু আজকের দিনে সেটা যত অসহনীয় মনে হয়

তখন কিন্তু সেরকম মনে হ'ত না। আজ যদি তাদের এই শাসনপদ্ধতিতে আস্থা হারিয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমি না-চাই, তখনকার আমার সেই বিলেত-প্রবাসী বন্ধুদের পক্ষে সেরকম করা কি সম্ভবপর হ'ত?—না-হয় মেনেই নিলাম যে শাসনপদ্ধতি ও শাসক—এই উভয়ের প্রতিই আস্থা তাঁরা সম্পূর্ণ হারিয়ে থাকবেন।

যেসব বন্ধু আমার বিপক্ষে দাঁড়ালেন, তাদের ধারণা হ'ল যে অকুতোভয়ে ভারতের দাবি পেশ করবার এবং ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি-বিধান করবার পক্ষে সেটাই ছিল মাহেন্দ্রক্ষণ।

ইংরেজদের দুর্যোগকে আমাদের সুযোগ ব'লে মনে করাটা আমার কাছে অনুচিত ব'লে মনে হয়েছিল। যুদ্ধ চালু থাকা অবস্থায় আমাদের দাবি পেশ না-করাটাই আমার কাছে মনে হয়েছিল অধিকতর শোভন হবে ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক হবে। অতএব আমার প্রস্তাবে আমি অটল থাকি এবং স্বেচ্ছাসেবক যাঁরা হতে চান, তাঁদের নাম দিতে বলি। আমার প্রস্তাবে বেশ ভালোই সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকরূপে যাঁরা নাম দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন ধর্মের লোক।

এইসব তথ্য জানিয়ে লর্ড ক্রিউ-কে আমি একটি চিঠি লিখে বললাম, আমাদের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে কি-না বিবেচনা করার জন্য যদি তাঁরা তেমন দরকার বোধ করেন, এম্বুলেন্স-কাজে আমরা শিক্ষানবিশি করতেও রাজি আছি।

খানিকটা ইতস্তত ক'রে লর্ড ক্রিউ আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সঙ্কট-মুহূর্তে আমরা তার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত হয়েছি দেখে তিনি আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সেবা-শুশ্রূষা ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারে ডক্টর কেন্ট্‌লি-র বেশ নামডাক ছিল। তাঁরই অধীনে স্বেচ্ছাসেবকদের তালিম দেওয়া শুরু হয়। শিক্ষাক্রম ছিল মাত্র ছয় সপ্তাহের, কিন্তু ওই স্বল্পসময়ের মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসার সকলপ্রকার কাজে তালিম দেওয়া হয়েছিল।

ক্লাস্‌-এ আমরা ছিলাম প্রায় আশিজন। ছয় সপ্তাহ পরে আমাদের পরীক্ষা নেওয়া হ'ল। একজন বাদে আমরা সকলেই পাশ করলাম। এখন এদের জন্য সরকার থেকে কুচকাওয়াজ ও অন্যান্য সব কাজে তালিম দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। এ কাজের ভার ছিল কর্নেল বেকার নামে একজন সামরিক অফিসারের হাতে।

লন্ডন শহরের তখন দেখবার মতো রূপ। কোথাও ভয়ডরের চিহ্নমাত্র নেই, সকলেই নিজ-নিজ সধ্যমতো যুদ্ধের ব্যাপারে মদৎ দিতে ব্যস্ত। পূর্ণবয়স্ক শক্তসমর্থ পুরুষেরা তো সেনাদলে নাম লিখিয়ে সমরবিদ্যার তালিম নিতে লাগলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ও অশক্ত যারা এবং যারা স্ত্রীলোক—তারা এখন কী করেন? সত্যি যদি তাঁরা কাজ করতে চান, তাহলে কাজের তো অভাব ছিল না। তাঁদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধে আহত হতে পারে, এমনসব সৈনিকদের উপযোগী জামাকাপড় কেটে সেলাই করতে লাগলেন, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি তৈরি করতে লাগলেন।

'লিঙ্কিঅম্'—নামে মহিলাদের একটি ক্লাব্‌ স্থির করলেন আহত সৈনিকদের পোশাক

আশাক তৈরির কাজে তাদের সদস্যের নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ছিলেন এই ক্লাব্-এর একজন সদস্য। তিনি তো এই পোশাক তৈরির কাজে সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছেলেন। এই প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়। নমুনা-মাফিক কাটা একগাদা কাপড় তিনি আমার সামনে রেখে বললেন, আমি যেন সেলাই করিয়ে সেগুলি তাঁকে ফেরৎ দিবি। তাঁর এই দাবি আমি সাগ্রহে মেনে নিয়েছিলাম। প্রাথমিক চিকিৎসায় তালিম নেবার ফাঁকে-ফাঁকে আমি ও আমার স্বেচ্ছাসেবক-বন্ধুরা, আমাদের সাধ্যে যতটা কুলোয় সেলাই-ফোঁড়াই ক'রে পোশাকগুলি যথাস্থানে ফেরৎ দিয়েছিলাম।

৩৯. ধর্ম-পরীক্ষা

কয়েকজন ভারতীয়কে সঙ্গী ক'রে যুদ্ধের কাজে যোগ দেবার জন্য আমরা নাম লিখিয়েছি—এই খবরটা দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছবামাত্র আমার কাছে দুটি তারবার্তা আসে। তার মধ্যে একটি ছিল পোলক-এর। তিনি আমায় প্রশ্ন ক'রে পাঠালেন, আমার অহিংসা-ব্রতের সঙ্গে এই যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারটার সঙ্গতি কোথায়।

আমি পূর্ব থেকেই কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম যে এইধরনের একটা আপত্তি হয়তো উঠতে পারে। *হিন্দ্ স্বরাজ অথবা ইন্ডিয়ান হোমরুল*-নামে আমার বইটিতে আমি এই প্রশ্ন তুলেছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুদের সঙ্গেও এ নিয়ে বহুদিনই আলাপ-আলোচনাও করেছি। যুদ্ধ ব্যাপারটা যে নীতি-বিগর্হিত, সে বিষয়ে আমরা ছিলাম সকলেই একমত। আমি যখন আমার আততায়ীর বিরুদ্ধেই মামলা রুজু করতে চাইনি, আমার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি হওয়াটা কি সঙ্গত। বিশেষত আমি তো আদৌ জানিও না ন্যায়-অন্যায় কোন্ পক্ষে। বুয়র যুদ্ধে আমি যে যোগদান করেছিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুরা সকলেই সে কথা জানতেন। তবে তাঁরা একপ্রকার ধ'রেই নিয়েছিলেন, বুয়র যুদ্ধের পর যুদ্ধ বিষয়ে আমার মতামত আমূল পরিবর্তিত হয়ে থাকবে।

আসলে ঠিক যে-যে কথা বিচার-বিবেচনা করার ফলে বুয়র যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য নিজেকে প্ররোচিত করেছিলাম, বর্তমান ক্ষেত্রেও সেইসব যুক্তি-তর্ক আমার মনকে অধিকার করেছিল। যুদ্ধে যোগদান করব অথচ সঙ্গে-সঙ্গে অহিংসা-ব্রতও পালন করব—এ দুটো যে একসঙ্গে চলতে পারে না, তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের প্রকৃত কর্তব্য যে কী, সে কথা সবসময় মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পারে না। সত্যের সন্ধানীকে অনেকসময় অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলতে হয়।

নীতি হিসেবে অহিংসার ব্যাপকতা বহুবিস্তৃত। হিংসার অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে মর্ত্যলোকের অসহায় মানুষ আমরা বসবাস ক'রে থাকি। প্রাণহনন ক'রে প্রাণধারণ করা বিষয়ে যে কথা বলা হয়, তার একটা গভীর তাৎপর্য আছে। ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, বাহ্য আচরণে হিংসা প্রকাশ না-ক'রে মানুষের একদণ্ডও বাঁচার উপায় নেই। পান, আহার, চলাফেরা প্রভৃতি

প্রাণধারণের যাবতীয় কর্মে, কিছু-না-কিছু হিংসাত্মক অথবা প্রাণহননের কাজ না-ক'রে মানুষের উপায় নেই। মানুষের সকল কর্মের উৎস যদি হয় তার অন্তর-আশ্রিত করুণা, যদি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণীকে হনন না-ক'রে বরঞ্চ তাকে রক্ষার জন্য সে প্রাণপণে প্রযত্ন করে, অর্থাৎ হিংসার নগপাশ থেকে মুক্তিলাভের জন্য যদি সে নিরন্তর সাধনা করে—তবেই অহিংসাব্রতী তাঁর ধর্মে অটল থাকতে পারেন। এরকম সাধক যিনি হন, প্রতিদিন তাঁর ইন্দ্রিয়-সংযম বৃদ্ধি পায়, তাঁর চিত্ত অধিকতর অনুকম্পায়ী হয়, কিন্তু বাহ্য হিংসা থেকে তিনি কোনোক্রমেই পুরোপুরি নিবৃত্তিলাভ করতে পারেন না।

তাছাড়া, যেহেতু অহিংসার ভিত্তিই হ'ল এই যে সকল প্রাণী একই প্রাণের দ্বারা প্রাণিত, যে কোনো প্রাণী-বিশেষের ভুল বা অন্যায়ের প্রভাব অন্যসকল প্রাণীর ওপর পড়তে বাধ্য। এই কারণেই মানুষ হিংসার স্পর্শদোষ থেকে নিজেকে কখনোই পুরোপুরি মুক্ত রাখতে পারে না। মানুষ যতকাল সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের মধ্যে বসবাস করতে থাকবে, হিংসক কাজের হিস্সা গ্রহণ না-ক'রে তার উপায় নেই—কারণ সমাজের অস্তিত্বই নির্ভর করছে হিংসার ওপর। যুদ্ধ যখন বাধে, অহিংসাব্রতীর উচিত যুযুধান দুইপক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ বন্ধ করা। যে ব্যক্তির পক্ষে এই কর্তব্যপালন করা সাধ্যাতীত, যুদ্ধের প্রতিরোধ করার মতো শক্তি অথবা যোগ্যতা অথবা অধিকার যার নেই, সে ব্যক্তি না-হয় যুদ্ধে যোগদান করল। তৎসত্ত্বেও কায়মনোবাক্যে সে চেষ্টা করতে পারে নিজেকে, নিজের জাতিকে, এমন-কি সমগ্র বিশ্বকে যুদ্ধ থেকে বাঁচাবার জন্য।

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সহায়তায় আমি আমার নিজের ও আমার দেশের লোকের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারব—আমার মনে-মনে সেইরকম একটা আশা ছিল। তখন আমি আছি ইংলন্ডে। ব্রিটিশ নৌবহর তখন দেশরক্ষার কাজে টহলদারি করছে। ইংলন্ডের সামরিক প্রতাপের ছায়ায় আমি তখন আশ্রয়প্রার্থী। তার সেই শক্তির মধ্যে যে হিংসক সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, আমি ছিলাম তার প্রত্যক্ষ ভাগীদার। সুতরাং আমি যদি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করতে না-চাই, যদি তার পতাকার তলায় বসবাস করতে চাই, তাহলে তিনটি বিকল্পের যে কোনো একটি আমায় বেছে নিতে হয়। প্রথমত, খোলাখুলিভাবে যুদ্ধের প্রতি আমার বিরোধিতা ঘোষণা ক'রে, সত্যাগ্রহ-নীতি অনুসারে আমি বলতে পারতাম যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য যতদিন যুদ্ধের পথ ত্যাগ না-করে ততদিন আমি সাম্রাজ্যকে বয়কট ক'রে তার সঙ্গে অসহযোগ করব। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের যেসব আইনের বিরোধিতা করা চলে, সেইসব আইন অমান্য ক'রে আমি জেলে যেতে পারতাম। তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যের সপক্ষে যুদ্ধে যোগদান ক'রে, যুদ্ধ-জনিত হিংসার মুখোমুখি মোকাবিলা করবার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারতাম। এই শক্তি বা যোগ্যতা আমার নিজের ছিল না ব'লে মনে হয়েছিল, তাই ভেবেছিলাম, আমার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করা ছাড়া অন্য পথ নেই।

অহিংসার দৃষ্টি দিয়ে আমি যখন দেখি, তখন বুঝতে পারি, হাতিয়ার হাতে যারা লড়ে এবং যারা সেই লড়িয়েদের সাহায্য করে—তাদের মধ্যে সত্যকার কোনো পার্থক্য নেই। যে লোক স্বেচ্ছায় ডাকাতি দলের সঙ্গে কাজ করে, তাদের চিঠিচাপাটি, মোট-বোঝা এদিক-ওদিক

চালাচালি করে, লুটপাট ডাকাতির সময় পাহারা দেয়, জখম হ'লে পর যে ডাকাতদের সেবা-শুশ্রূষা করে—সে লোকের অপরাধ ডাকাত-দলের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। তেমনি, যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করা ছাড়া অন্য কাজ যারা করে না, তাদেরকেও যুদ্ধের অপরাধ থেকে বেকসুর খালাস দেওয়া যায় না।

পোলক-এর তারবার্তা পাওয়ার আগেই এইসব প্রশ্ন নিয়ে এইভাবে আমি নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে রেখেছিলাম। এখন তারবার্তা পাওয়ার পরে, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এইসব প্রশ্ন আলোচনা ক'রে বুঝতে পারি, যুদ্ধে যোগদান করাটা আমার কর্তব্য। আজকের দিনেও যখন পর্যালোচনা করতে বসি, আমার মনে হয় না আমার যুক্তিতে কোনো ছিদ্র বা ভুল ছিল। তাছাড়া তখন ব্রিটিশ সম্পর্কের প্রতি আমার চিত্ত অনুকূল থাকার ফলে, তখনকার ধারণা-মতন আমি যে কাজ করেছিলাম, তা নিয়ে আমার আজও কোনো ক্ষোভ নেই।

আমি অবশ্য জানি যে তখনকার দিনেও এইসব যুক্তি ও বিচার নিয়ে আমার অনেক বন্ধুর মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল, সবাইকে আমি নিজের পক্ষে টানতে পারিনি। আসলে প্রশ্নটাই জটিল। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত থাকতে পারে ব'লে, যারা অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী এবং সারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে, অহিংসার সাধনা করতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্য ক'রে আমার নিজের তরফের যুক্তি-তর্ক, সাফাই আমি যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও পরিষ্কার ভাষায় নিবেদন করলাম। সত্যনিষ্ঠ যিনি হবেন, নিছক প্রচলিত প্রথার সঙ্গে আপস-রফা ক'রে চলাটা তাঁর পক্ষে ঠিক উচিত হয় না। সর্বদা নিজেকে শুধরে নেবার জন্য তাঁর প্রস্তুত থাকা উচিত। নিজের ভুল, অন্যায় বুঝতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে, ফলাফল কী হবে সেসব কথা না-ভেবেই তিনি নিজের ত্রুটি স্বীকার করবেন ও কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

৪০. ছোটো সত্যাগ্রহ

এইভাবে নিছক কর্তব্যবোধের ভিত্তিতে যদিও যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য আমি সামিল হয়েছিলাম, সরাসরি যুদ্ধে নামা আমার বেলা সম্ভবপর হয়নি। কেবল তাই নয়, ওইরকম সঙ্কটের দিনেও কতকগুলি কারণে আমায় একটা ছোটোখাটো সত্যাগ্রহ পর্যন্ত করতে হয়েছিল।

ইতিপূর্বে নিশ্চয় বলেছি, আমাদের নাম অনুমোদিত ও তালিকামুক্ত করার পর, কুচকাওয়াজ প্রভৃতিতে আমাদের তালিম দেবার জন্য কর্তৃপক্ষ একজন জঙ্গী অফিসার নিয়োগ করেছিলেন। আমাদের সকলের ধারণা ছিল, কেবল তালিম দেওয়ার বিশেষ ব্যাপারেই এই হুকুমদায়ি অফিসারের এক্তিয়ার থাকবে এবং অন্যসব ব্যাপারে আমিই আমাদের দলের নেতৃত্ব করব। মনে হয়েছিল, আভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে দলের লোক আমার কাছে জবাবদিহি করবে, এবং সেই ফৌজি অধিনায়ক আমার মারফৎ দলের লোকের সঙ্গে লেনদেন

করবেন। কিন্তু তাঁর নিজের অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ে সেই অফিসারের ধারণা যে অন্যরূপ ছিল, তা তিনি শুরু থেকেই আমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার ত্রুটি করেননি।

সোরাবজী আদাজানিয়া বুদ্ধিবিচারে সুচতুর মানুষ ছিলেন। গোড়াতেই তিনি আমায় সতর্ক ক'রে দিয়ে বলেছিলেন, "এই লোকটার বিষয়ে সাবধান থাকবেন গান্ধীভাই। রকম দেখে মনে হচ্ছে লোকটা আমাদের ওপর কর্তাতি করতে চায়। ওর হুকুমবাজি আমরা বরদাস্ত করতে পারব না। অবশ্য ফৌজি ব্যাপারে ওর কাছ থেকে তালিম নিতে আমরা রাজি। কিন্তু কেবল ও লোকটা নয়, যেসব ছেলেছোকরাকে ও আমাদের কুচকাওয়াজে তালিম দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছে, তাদের পর্যন্ত ভাবগতিক দেখে মনে হয় যে আমরা তাদের আজ্ঞাবহ সেপাইমাত্র।"

এইসব তরুণবয়স্কেরা ছিলেন অক্সফোর্ড্-এর ছাত্র। আমাদের তালিম দেবার কাজে ও.সি. এইসব ছেলেছোকরাকে সেক্‌শন অফিসার-রূপে বহাল করেছিলেন।

ও.সি. ব্যক্তিটির মুরুব্বিয়ানা ও হামবড়াভাব আমার নজরেও এসেছিল। তৎসত্ত্বেও সোরাবজীকে আমি বললাম, এ নিয়ে তিনি যেন মাথা না-ঘামান এবং অস্থির না-হন। কিন্তু সহজে নিরস্ত হবার পাত্র তিনি ছিলেন না। ঈষৎ হেসে তিনি আমায় বললেন : "মুশকিলটা কি জানেন গান্ধীভাই, যে যা বলে আপনি তাই চট্ ক'রে বিশ্বাস ক'রে বসেন। শুরুতে এরা মিঠে কথায় আপনার মন ভোলাবে। তারপর চোখ যখন আপনার খুলবে, আমাদের বলবেন সত্যাগ্রহ করতে। তার ফলে আপনার দুর্ভোগ তো বটেই, সেইসঙ্গে আমাদেরও দুর্ভোগ কিছু কম নয়।"

জবাবে আমি বললাম, "আমার সঙ্গে হাত যখন মিলিয়েছ, দুর্ভোগ না-স'য়ে উপায় কী? সত্যাগ্রহীর জন্মই হয়েছে ঠক্‌বার জন্য। ও.সি. যদি আমাদের ঠকাতে চায় তো ঠকাক্। কতবার পই-পই ক'রে তোমাদের বলিনি, যে লোক ঠকায় শেষপর্যন্ত সে নিজেই ঠকে।"

সোরাবজী হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, "বেশ তো। তাহলে আপনি অনবরত ঠকতে থাকুন। সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে একদিন নিজে হয়তো প্রাণে মরবেন এবং সেইসঙ্গে আমাদের মতো আপনদেরও আপনার পিছু-পিছু টেনে নেবেন।"

এই প্রসঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন বিষয়ে স্বর্গতা মিস্ এম্‌লি হব্‌হাউস্ আমায় যা লিখেছিলেন, সে কথা মনে পড়েছে। তিনি বলেছিলেন, "সত্যের খাতিরে একদিন যদি আপনাকে ফাঁসি যেতে হয়, তাতেও আমি আশ্চর্য হব না। ভগবান যেন আপনাকে ঠিক পথে চালনা করেন ও সদাসর্বদা আপনাকে রক্ষা করেন।"

সোরাবজীর সঙ্গে আমার এসব কথাবার্তা হয়েছিল সেই ফৌজি অফিসার ও.সি.-রূপে নিযুক্ত হবার ঠিক পরেই। দু-চারদিন যেতে-না-যেতেই তাঁর সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক ভেঙে যাবার দাখিল হ'ল। সেই পক্ষকাল অনশনের পর আমার শরীর তখনো ঠিক সুস্থ-সবল হয়নি। তত্রাচ আমি কুচকাওয়াজে যোগ দিতে শুরু করলাম। বাসস্থান থেকে কুচকাওয়াজের জায়গাটা ছিল মাইল-দুয়েক দূরে। সেই রাস্তাটুকু আমায় প্রায় পায়ে হেঁটেই পার হতে হ'ত। ফলে প্লুরিসিতে আক্রান্ত হয়ে আমি বেশ কাহিল হয়ে পড়লাম। শরীরের এইরকম অবস্থাতেও

আমায় ক্যাম্পেই সপ্তাহান্তটা কাটাতে যেতে হ'ত। একদিন অন্যেরা ক্যাম্পে র'য়ে গেল, কেবল আমিই বাড়ি ফিরে এলাম। এই ঘটনা থেকে সত্যাগ্রহের প্রশ্ন আসে।

ও.সি. একটু যেন নির্বিচারে তাঁর কর্তৃত্ব চালাতে শুরু করলেন। সামরিক, বে-সামরিক সমস্ত ব্যাপারে তিনি যে আমাদের কর্তা ব্যক্তি, এ কথা তিনি আমাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর প্রভুত্বশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয়ও আমরা পেলাম। সোরাবজী কালবিলম্ব না-ক'রে আমার কাছে চ'লে এলেন। ও.সি.-র হামবড়াই নির্বিবাদে মেনে নিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। সোরাবজী আমায় বললেন :

"হুকুম যা আসবে তা যেন আপনার মারফৎ আসে—এই আমরা চাই। এখনো তো আমরা কেবল ট্রেনিং ক্যাম্পে তালিম নিচ্ছি। এই অবস্থাতেই নানারকম অদ্ভুত-অদ্ভুত হুকুম আমাদের ওপর জারি করা হচ্ছে। তালিম দেবার কাজে সহায়তা করার জন্য যেসব ছেলেছোকরাকে লাগানো হয়েছে, তাদের ও আমাদের মধ্যে যেরকম বিভেদ-ব্যবধান খাড়া করা হচ্ছে, সেগুলি দস্তুরমতো আপত্তিজনক। ও.সি.-র সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত কিংবা বিহিত বোঝাপড়া এখুনি ক'রে নিতে হয়। তা না-হ'লে এভাবে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ভারতীয় ছাত্র হুকুমবাজি সইতে যাবে কেন? আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যে ব্রত স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছি, এখন সে কাজ করতে গিয়ে সমস্ত আত্মসম্মান খুইয়ে বসব—তা আমরা ভাবতেও পারি না।"

ও.সি.-র কাছে গিয়ে তাঁর নামে যেসব নালিশ আমার কাছে এসেছিল, তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি আমায় লিখিতভাবে জানালেন যে ওজর-আপত্তি কিছু যদি থেকে থাকে তা লিখিতভাবে জানানো দরকার। সঙ্গে-সঙ্গে এ-ও লিখলেন যে নালিশ যদি করতে হয় তাহলে তা করতে হবে দস্তুর-মোতাবেক। অভিযোগকারীদের সমঝিয়ে দিতে হবে সোজাসুজি ও.সি.-র কাছে নালিশ উপস্থিত করা চলবে না। গোড়ায় অভিযোগপত্র পেশ করতে হবে সেক্শন কমাণ্ডার-এর কাছে, তিনি সেগুলি তাঁর অধীনস্থ ইন্‌স্ট্রাক্টর-এর হাত দিয়ে ও.সি.-র কাছে হাজির করবেন।

জবাবে তাঁকে আমি জানাই যে আমার নিজের কোনো এক্তিয়ার আছে ব'লে আমি দাবি করি না। ফৌজি আদবকায়দা অনুসারে আমি সিপাই বৈ আর-কিছু নই। কিন্তু যেহেতু স্বেচ্ছাব্রতী দলের আমি সভাপতি, বেসরকারিভাবেও অন্তত আমায় এদের প্রতিনিধি ব'লে মেনে নেওয়া উচিত। যেসব অনুরোধ-উপরোধ নালিশ-অভিযোগ আমার কাছে এসেছিল, সেগুলিও বিশদ ক'রে বললাম। অসন্তোষের মুখ্য কারণটা ছিল এই যে দলের লোকেদের মতামতের বালাই না-রেখেই ও.সি. কয়েকজন সেক্শন কমাণ্ডার নিয়োগ ক'রে ফেলেছেন। এখন সেই ত্রুটি সংশোধনের একমাত্র উপায় সেইসব সেক্শন কমান্ডারদের সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায়, ও.সি.-র অনুমোদন-সাপেক্ষে, দলের মধ্য থেকেই সেক্শন লীডার নির্বাচন করা।

প্রস্তাবটা ও.সি.-র মনঃপূত হ'ল না। তিনি বললেন, সেপাইদের দল তাদের দলপতি

বেছে নেবে, এটা ফৌজি নিয়ম-কানুনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। আর দলের দাবিতে দলপতিরূপে নিযুক্ত লোকদের সরিয়ে দেওয়া যদি হয়, তাহলে নিয়মানুবর্তিতা জহান্নামে যাবে।

সুতরাং সভা ডেকে স্থির হ'ল কুচকাওয়াজ থেকে আমরা বিরত থাব। আমাদের এই সত্যাগ্রহের পরিণাম যে সাঙ্ঘাতিক হতে পারে সে কথা আমি দলের সবাইকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যের সমর্থনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। প্রস্তাবের মূল কথাটা ছিল এই যে, বর্তমানে যারা সেক্‌শন কমান্ডার বা করপোরাল-রূপে নিযুক্ত হয়েছেন তাদের সরিয়ে দেওয়া হোক্ এবং তাদের স্থলে ভলান্টিয়ার দল থেকে উপনায়ক নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হোক্। এই ব্যবস্থা যদি মেনে নেওয়া না-হয়, তাহলে আমাদের দল বাধ্য হয়ে কুচকাওয়াজ ও সাপ্তাহিক ক্যাম্প্-এ যোগদান থেকে বিরত থাকবে।

আমি তখন ও.সি.-কে চিঠি লিখে জানালাম, তিনি যে আমার প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন এতে আমি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছি ও হতাশ হয়েছি। তাঁকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলাম কর্তৃত্ব করার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই, বরঞ্চ সেবা করাতেই আমার আগ্রহ। আমার পূর্ব ইতিহাস থেকে একটি নজিরও তাঁর কাছে তুলে ধরলাম, বললাম, বুয়র যুদ্ধের সময় যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা-স্থিত ভারতীয় এম্বুলেন্স বাহিনীতে সরকারিভাবে আমার কোনো পদাধিকার ছিল না, কর্নেল গলওয়ে এবং আমাদের দলের মধ্যে একটি দিনের জন্যও কোনো বিসম্বাদ ঘটেনি। আমার কাছ থেকে দলের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিষয়ে স্থির নিশ্চয় না-হওয়া পর্যন্ত কর্নেল একটি পা-ও এগোতেন না। চিঠির মধ্যে পূর্বদিন সন্ধ্যায় যে প্রস্তাব আমরা পাশ করেছিলাম, তার একটি কপিও পাঠিয়ে দিলাম।

ও.সি.-র দিক থেকে এর ফলাফলটা ভালো হয়নি। তাঁর ধারণা হয় যে সভা ডেকে সেই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে, সামরিক নিয়মানুবর্তিতার দিক থেকে আমরা ঘোরতর অন্যায় ক'রে ফেলেছি।

অতঃপর সব কথা জানিয়ে প্রস্তাবের একটা কপি-সুদ্ধ আমি ভারত-সচিবের নামে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। আমার চিঠির জবাবে তিনি আমায় বুঝিয়ে লিখলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। অধিনায়ক যিনি তিনিই উপনায়ক নিয়োগ করতে পারেন--এই নিয়মের প্রতি তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেইসঙ্গে তিনি আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন যে ভবিষ্যতে যখন উপনায়ক নিয়োগ করা হবে, ও.সি. নিশ্চয়ই আমার সুপারিশ বিবেচনা করবেন।

তারপর আমাদের দু-জনের মধ্যে অনেক চিঠি লেখালেখি হয়। কিন্তু সেই বিরস কাহিনীর জের টেনে কী লাভ? কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে দেশে প্রতিদিন আমাদের যেসব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, তার সঙ্গে বিলেতের সেই অভিজ্ঞতার সামান্যই তফাৎ। ছলে-বলে-কৌশলে ও.সি. আমাদের দলের মধ্যেই ভাঙন ধরালেন। প্রস্তাবের সপক্ষে যারা মত দিয়েছিল তাদের কাউকে-কাউকে তিনি ভয় দেখিয়ে বা ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের কথার খেলাপ ঘটালেন।

এইসময় অপ্রত্যাশিতভাবে নেট্‌লি হাসপাতালে বহুসংখ্যক আহত সৈনিকের একটা দল

এসে পড়ে। তাদের সেবা-তদারকির জন্য আমাদের দলের ডাক পড়ে। ও.সি যাদের টানতে পেরেছিলেন, তারা নেট্‌লি গেল, অন্যেরা যাবে না ব'লে জবাব দিল। তখন আমি যদিও শয্যাশায়ী, দলের লোকেদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারত-দপ্তরের উপসচিব মিস্টার রবার্টস্ সেসময় বহুবার আমার সন্ধানে এসে আমায় সম্মানিত করেন। অন্যদের যাতে আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নেট্‌লি পাঠাই তার ওপর তিনি জোর দিতে থাকেন। তিনি বলেন যে ভারতীয় ভলান্টিয়ারের দল পৃথক্ দল-রূপে থাকে। তাদের ওপর এক্তিয়ার থাকবে কেবলমাত্র ও.সি.-র, কেবল তার কাছেই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। তা যদি হয় তাহলে তো আত্মমর্যাদায় কোনো ঘা লাগেনি। ব্রিটিশ সরকারও তাতে খুশি হবে, আর হাসপাতালে বহুসংখ্যক আহত যারা এসে পড়েছে, তাদেরও তাহলে সেবা-শুশ্রূষা হবে। এই প্রস্তাব আমার ও আমার সঙ্গীদের মনঃপূত হয়, ফলে যারা ইতিপূর্বে যেতে চায়নি তারাও নেট্‌লি গেল।

কেবল আমিই শয্যাগত অবস্থায় পিছনে প'ড়ে রইলাম—তাছাড়া আমার তো অন্য উপায় কিছু ছিল না।

৪১. গোখলের বদান্যতা

বিলেতে থাকতে আমার প্লুরিসি হয়েছিল, সে কথা ইতিপূর্বে বলেছি। রোগাক্রান্ত হবার অল্পকিছুদিন পরেই গোখলে লন্ডন ফিরে এলেন। কালেন্‌বাখ্ ও আমি নিয়মিত তাঁর কাছে যেতাম। যুদ্ধ বিষয়েই অধিকাংশ সময় কথাবার্তা হ'ত। জর্মানির ভূগোল ছিল কালেন্‌বাখ্-এর নখদর্পণে, তাছাড়া ইউরোপের নানা জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। মানচিত্রের সাহায্যে কালেনবাখ্ গোখলে-কে যুদ্ধ সম্পর্কিত অঞ্চলগুলি দেখাতেন।

আমার প্লুরিসি রোগের বিষয়েও প্রতিদিন আলোচনা হ'ত। আহার ও আহার্য নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার তখনো কোনো বিরাম ছিল না। আমার আহার্য-তালিকার মধ্যে তখন অন্তর্ভুক্ত ছিল চীনেবাদাম, পাকা কলা, কাঁচা কলা, লেবু, জলপাই-তেল, বিলিতি বেগুন ও আঙুর। দুধ, ভাত, রুটি, ডাল প্রভৃতি আহার্য আমি সর্বতোভাবে বর্জন ক'রে চলতাম।

আমার চিকিৎসা করতেন ডক্টর জীবরাজ মেহ্‌তা। তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যেন আমি দুধের সঙ্গে ভাত বা রুটি-জাতীয় কিছু খাবার খাই। কিন্তু আমি তাঁর অনুরোধে টললাম না। কথাটা গোখলের কানে গিয়ে পৌঁছল। ফলাহারের সপক্ষে আমি যেসব যুক্তি-তর্ক হাজির করতাম, তার প্রতি তাঁর তেমন আস্থা ছিল না। তিনি চাইতেন, স্বাস্থ্যের খাতিরে ডাক্তার আমায় যে আহার্যের বিধান দেন, আমি যেন তাই মেনে নিয়ে চলি।

গোখলে স্বয়ং যে ক্ষেত্রে চাপ দিচ্ছেন, সেখানে তাকে অমান্য করাটা আমার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। যখন তিনি জোর দিয়ে বলবেন যে আমার মুখে 'না' বলাটা তিনি মেনে নিতে রাজি নন, তখন অগত্যা প্রশ্নটা ভালো ক'রে ভেবে দেখার জন্য তাঁর কাছ

থেকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় চেয়েছিলাম। কালেন্‌বাখ্‌ ও আমি সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরার পথে আলোচনা করতে লাগলাম এ অবস্থায় আমার কী করা উচিত। আহার্য নিয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আমার সহচর। বর্তমান পরীক্ষা তাঁর এমন-কিছু খারাপও লাগছিল না। কিন্তু তাঁর কথার ভাবে বুঝলাম শরীর-স্বাস্থ্যের খাতিরে এ পরীক্ষা আমায় যদি ছাড়তেও হয়, তিনি তাতে অন্যমত করবেন না। তাই একমাত্র বিবেকের বাণীর শরণ নেওয়া ছাড়া আমার আর অন্য উপায় রইল না। অন্তরে সেই বাণী শুনে আমার ইতিকর্তব্য স্থির ক'রে নিতে হবে।

সমস্ত রাত মনের মধ্যে নানা চিন্তার ওলট-পালট ঘ'টে গেল। পরীক্ষা যদি ছেড়ে দিই, তাহলে এতদিন ধ'রে এই প্রশ্ন নিয়ে যেসব মতবাদ গ'ড়ে তুলেছি, সেসমস্ত বিসর্জন দিতে হবে। অথচ বর্জন করব কেন, আমার এই চিন্তাধারার মধ্যে তো কোনো খুঁৎ নেই। প্রশ্নটা ছিল এই যে, গোখলের স্নেহ-ভালোবাসার চাপে কতটা নিজেকে নোয়াতে পারব, এবং তথাকথিত শরীর-স্বাস্থ্যের খাতিরেই-বা পরীক্ষা-প্রয়োগে কতখানি হেরফের করতে পারব? শেষপর্যন্ত স্থির করলাম, মুখ্যত ধর্মভাবনা-প্রণোদিত হয়ে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছি, সেগুলি বর্জন করব না। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে পাঁচমিশেলি ভাবনা কাজ করেছে, সেখানে ডাক্তারের উপদেশটাই মেনে নেব। দুধ খাওয়া ছেড়েছিলাম মুখ্যত ধর্মভাবনা থেকে। কলকাতার গোয়ালারা তাদের গোরু-মোষের বাঁট থেকে দুধের শেষ বিন্দুটুকু কীরকম নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় দোহন ক'রে নেয়, সেই ছবিটুকু আমার চোখের ওপর যেন ভাসত। আমার এ কথাও মনে হ'ত, পশুর মাংস যদি মানুষের খাদ্য না-হয়, তাহলে পশুর দুধও মানুষের খাদ্য ব'লে গণ্য করা উচিত নয়। দুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কিছুতেই শিথিল হতে দেব না—এইপ্রকার পণ ক'রে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম। এইভাবে মনঃস্থির করার পর মনটাও অনেকটা হাল্‌কা হ'ল। গোখলের সামনে দাঁড়াতে বুক দুর-দুর করছিল, তবে মনে-মনে ভরসা ছিল যে আমার সঙ্কল্পের তিনি মান রাখবেন।

সন্ধ্যাবেলা রোজকারমতো ন্যাশনাল লিবারেল ক্লাব্‌-এ কালেন্‌বাখ্‌ ও আমি গেলাম গোখলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আমায় দেখেই তিনি প্রশ্ন করলেন : "ডাক্তারেব বিধান মেনে নেবে ব'লে মনঃস্থির ক'রে এসেছ তো?" যথোচিত নম্রভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে আমি জবাব দিলাম : "ডাক্তারের সমস্ত বিধান আমি মেনে নেব, কেবল একটি ব্যাপার ছাড়া। দোহাই আপনার, তা নিয়ে আপনি আমার ওপর চাপ দিতে যাবেন না। দুধ, দুগ্ধজ খাবার কিংবা মাংস—এসব আমি খাব না। এইসব না-খাওয়ার ফলে যদি আমার মৃত্যুও ঘটে—সে-ও আমার পক্ষে শ্রেয়।

"এই কি তোমার শেষ কথা"—গোখলে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, "বলতে আমার খুবই বাধো-বাধো ঠেকছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি অনুপায়। মত বদ্‌লানো আমার পক্ষে সাধ্য নয়। আমি বুঝতে পারছি, আমার সঙ্কল্পের কথা শুনে আপনি মনে ব্যথা পাবেন। আমায় আপনি ক্ষমা করুন।"

গোখলের কণ্ঠস্বরে একটু বেদনার ছোঁওয়া লাগল, তত্রাচ তিনি গভীর স্নেহে আমায়

বললেন, "তোমার এইভাবে মনঃস্থির করাটা মোটেই আমার মনঃপূত নয়। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সংস্রব আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। তবে এ নিয়ে আর তোমায় পীড়াপীড়ি করতে আমি চাই না।" এই ব'লে তিনি ডক্টর জীবরাজ মেহ্‌তার দিকে ফিরে বললেন : "গান্ধীকে উত্যক্ত ক'রে আর দরকার নেই। তিনি তাঁর চারদিকে যে গণ্ডি টেনেছেন, তারই মধ্যে থেকে যতটুকু বিধান তিনি মেনে নিতে পারেন, তারই ব্যবস্থা করুন।"

ডাক্তার আপত্তি জানালেন, অসন্তোষও প্রকাশ করলেন, কিন্তু তিনি তো নিরুপায়। তিনি মুগডালের সুরুয়ার বিধান দিলেন, বললেন সুরুয়ায় একটু যেন হিং-এর ফোড়ন থাকে। এ বিধান আমি স্বীকার ক'রে নিলাম। দু-একদিন হিং-ফোড়ন দেওয়া মুগডালের সুরুয়া খেয়েও দেখলাম। কিন্তু তাতে আমার বেদনা বেড়ে গেল। ডাল আমার সইল না ব'লে আমি আবার ফলে ও বাদামে ফিরে গেলাম। পথ্যের দিকটা যেমনই হোক্, বাইরে থেকে শরীরের যেমন চিকিৎসা চলছিল তা চলতে থাকল। তাতে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম ঘটল, কিন্তু আমার নানারকম বিধিনিষেধের ফলে ডাক্তার রীতিমতো বিব্রত বোধ করছিলেন।

এরই মধ্যে লন্ডন শহরে অক্টোবর মাসের ধোঁয়াশা সহ্য করতে না-পেরে গোখলে দেশে ফিরে গেলেন।

৪২. প্লুরিসি চিকিৎসা

প্লুরিসি কিছুতেই সারছিল না ব'লে একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আমি অবশ্য বুঝেছিলাম, ওষুধ খেয়ে রোগ দূর হবে না। পথ্যের কিছুটা অদলবদল ক'রে, বাহ্য উপচারের শরণ না-নেওয়া পর্যন্ত অসুখ সারবে না।

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর এলিন্‌সন্‌-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ইনি নিজে নিরামিষাহারী ছিলেন এবং আহার ও আহার্যের হেরফের ক'রে চিকিৎসা করতেন। তিনি আমায় খুব ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। আমি কেন যে দুধ খাব না ব'লে পণ করেছি—সে কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলি। তিনি আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন : "আপনাকে দুধ খেতে দিলে তো। আমি তো ঠিক করেছি, আপনাকে কিছুদিন স্নেহজাতীয় পদার্থ ছুঁতেই দেব না। এই কথা ব'লে তিনি বিধান দিলেন কিছুকাল আমি যেন আটার পাউরুটি, বীট, মুলো, পেঁয়াজ প্রভৃতি কন্দজাতীয় সব্‌জি এবং শাক খেয়ে থাকি। তাজা ফল ও বিশেষ ক'রে কমলালেবুও খেতে বললেন। শাক-সব্‌জি রান্না না-ক'রে চিবিয়ে খেতে বললেন এবং চিবিয়ে খাওয়ার অসুবিধা থাকলে সরু ক'রে কুচিয়ে কেটে নিতে বললেন।

তিনদিন ডক্টর এলিন্‌সন্‌-এর ব্যবস্থামতো পথ্য করলাম। কিন্তু কাঁচা সব্‌জি ঠিক যেন আমার ধাতে সইল না। শরীরটাও আমার তেমন জুতসই ছিল না যে পরীক্ষাটা আমার নিজের ওপর পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারি। কাঁচা সব্‌জি খেতে আমি ঠিক ভরসাও পাচ্ছিলাম না।

ডক্টর এলিন্‌সন্‌ বিধান দেন আমার কামরার সবক-টি জানালা আমি যেন চব্বিশ ঘণ্টা খুলে রাখি, কুসুম-কুসুম গরম জলে স্নান করি, বুকে তেল মালিশ করি এবং প্রতিদিন যেন পনেরো থেকে ত্রিশ মিনিট কাল খোলা হাওয়ায় পায়চারি ক'রে বেড়াই। তাঁর এই প্রস্তাব আমার বেশ ভালোই লেগেছিল।

আমার ঘরের জানালাগুলি ছিল প্রায় দরজার আকারের। পুরোপুরি জানালা খোলা রাখলে ঘরে বৃষ্টির ছাঁট এসে ঢুকত। জানালার মাথায় আলোহাওয়া ঢুকবার যেসব ঘুলঘুলি ছিল, সেগুলি আবার খোলবার জো ছিল না। তাই শার্সির কাচ ভাঙিয়ে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা ক'রে নিলাম। জানালাগুলিও এমনভাবে খুলে রাখতাম যাতে হাওয়া ঢোকে কিন্তু বৃষ্টির ছাঁট ঢুকতে না-পায়।

এইরকম সব ব্যবস্থা করার ফলে শরীর কিছুটা সারল বটে, কিন্তু রোগ পুরোপুরি দূর হ'ল না।

লেডি সিসিলিয়া রবার্টস্‌ মাঝে-মাঝে আমায় দেখতে আসতেন। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমি যাতে আবার দুধ খাওয়া ধরি সেজন্য তিনি খুবই পীড়াপীড়ি করতেন। আমায় নোয়াতে না-পেরে তিনি এমন পদার্থের সন্ধান করতে লাগলেন যা দুধ নয় অথচ যার মধ্যে দুধের সমস্ত গুণ আছে। তাঁর কোনো বন্ধু তাঁকে মল্টেড্‌ মিল্ক্‌-এর সন্ধান দিয়ে, না-জেনেশুনেই তাঁকে নিশ্চিতি দিয়ে বলেন যে মল্টেড্‌ মিল্ক্‌-এ এক ফোঁটাও দুধ নেই, অথচ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমনভাবে প্রস্তুত যে তার মধ্যে দুধের সমস্ত গুণ বর্তমান। আমি জানতাম, আমার ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি লেডি রবার্টস্‌-এর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাই বিনা-বাক্যব্যয়ে আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলাম। তিনি মল্টেড্‌ মিল্ক্‌ ব'লে যে চূর্ণ আমায় দিয়েছিলেন, আমি তা নিঃসংশয়ে জল গুলে খেতে গিয়ে বুঝলাম, তার স্বাদটা অবিকল দুধের মতো। ততক্ষণে অবশ্য যা হবার তা হয়ে গেছে, তবু বোতলের লেবেল্‌ প'ড়ে বুঝতে পারলাম মল্টেড্‌ মিল্ক্‌ দুগ্ধজ পদার্থ দিয়েই তৈরি সুতরাং ওটা ছাড়তে হ'ল।

খবরটা চিঠি লিখে সিসিলিয়াকে জানিয়ে বললাম, তিনি যেন এ ব্যাপার নিয়ে উতলা বোধ না-করেন। পত্রপাঠ তিনি আমার ওখানে এসে গভীর খেদ প্রকাশ করেন। তাঁব বন্ধু লেবেল্‌-এর কথাগুলি প'ড়েও দেখেননি। আমি অনুনয় ক'রে বললাম, এ নিয়ে তিনি যেন অনুশোচনা না-করেন। তিনি এত কষ্ট ক'রে যে জিনিস সংগ্রহ করলেন, তা আমি কাজে লাগাতে পাবলাম না—সে তো আমার পক্ষেই পরিতাপের বিষয়। না-জেনেশুনে দুধ খেয়েছি ব'লে আমি খুব যে বিচলিত হইনি এবং নিজেকে অপরাধী মনে করিনি—সে কথাটাও তাঁকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে বললাম।

লেডি সিসিলিয়ার সঙ্গে আমার এই যোগাযোগের অনেকখানি মধুর স্মৃতির কথা আমায় বাদ দিতে হচ্ছে। দুঃখে, সঙ্কটে, হতাশার দিনে একাধিক বন্ধু আমার মনে সান্ত্বনা-বিধান করেছেন ব'লে আমার মনে পড়ে। যে ব্যক্তি ভগবৎ-বিশাসী, তিনি এইসব সখ্যের মধ্যে ভগবানের করুণা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তাঁর অপার কৃপায় পরম দুঃখের মধ্যেও মানুষ মাধুর্যের সন্ধান লাভ করতে পারে।

ডাক্তার এলিন্‌সন্‌ আবার যখন আমায় দেখতে আসেন, অনেকগুলি বিধিনিষেধের কড়াকড়ি শিথিল ক'রে দেন। চীনেবাদামের মাখন ও জলপাই-তেলের মধ্যে যে স্নেহপদার্থ আছে তা আমায় তিনি সেবনের অনুমতি দেন। আমার যদি ইচ্ছা হয়, তাহলে শাক-সব্‌জি রান্না ক'রেও আমি ভাতের সঙ্গে খেতে পারি—এইপ্রকার বিধান দেন। পথ্য ব্যাপারে এইসব অদলবদল আমার খুবই ভালো লেগেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এত ক'রেও আমি পুরোপুরি রোগমুক্ত হতে পারিনি। অনেকখানি সেবা-যত্ন ও শুশ্রূষার দরকার তখনো ছিল। বেশিরভাগ সময়ই আমায় শয্যাশায়ী হয়ে কাটাতে হ'ত।

ডক্টর মেহ্‌তাও মাঝে-মাঝে এসে আমায় পরীক্ষা ক'রে যেতেন এবং প্রতিবারই ব'লে যেতেন যে তাঁর কথামতন আমি যদি চলি তাহলে অচিরেই তিনি আমায় রোগমুক্ত ক'রে তুলতে পারেন।

এইভাবে যখন দিন কাটছে, তখন একদিন মিস্টার রবার্টস্‌ আমায় দেখতে এসে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বললেন : শরীরের এই অবস্থায় আপনার পক্ষে নেট্‌লি যাওয়া সম্ভবপর হবে না। আর-কিছুদিন পরে দস্তুরমতো ঠাণ্ডা পড়বে। তাই আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি ভারতে ফিরে যান। সেখানে গেলে আপনার অসুখ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যাবে। আপনার অসুখ সারাবার পরেও যুদ্ধ যদি চলতে থাকে তাহলে দেশে থেকেও আপনি নানাভাবে সহায়তা করবার প্রচুর সুযোগ পেতে পারবেন। ইতিমধ্যে আপনি যতটুকু যা করতে পেরেছেন, আমার কাছে অন্তত তা এখন কিছু কম নয়।"

তাঁর পরামর্শ আমি মেনে নিলাম এবং ভারতে ফিরে যাবার জন্য আয়োজন করতে লাগলাম।

৪৩. দেশের দিকে

কালেন্‌বাখ্‌ আমার সঙ্গে বিলেত গিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে আমরা একইসঙ্গে ভারতে যাবে। বিলেতে আমারা একই বাড়িতে ছিলাম। ইচ্ছা ছিল, আমরা একই জাহাজে দেশের দিকে পাড়ি দেব। কিন্তু তখন জর্মনদের ওপর কড়া নজর থাকায়, কালেন্‌বাখ্‌ শেষপর্যন্ত পাসপোর্ট পাবেন কি-না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল। আমি অবশ্য পাসপোর্ট পাবার জন্য যথাসাধ্য করেছিলাম। মিস্টার রবার্টস্‌ও কালেন্‌বাখ্‌-এর পাসপোর্ট পাওয়ার অনুকূলে ছিলেন এবং সেই মর্মে ভারতের ভাইস্‌রয়-এর কাছে একটি তারবার্তাও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু লর্ড হার্ডিং সঙ্গে-সঙ্গে জবাব পাঠালেন : "ভারত সরকার সখেদে জানাচ্ছে যে এইরকম ঝুঁকি নিতে তাঁরা প্রস্তুত নন।" তাঁর এই সোজা জবাব যে যুক্তিযুক্ত, সে আমরা সকলেই বুঝেছিলাম।

কালেন্‌বাখ্‌-এর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ায় আমার প্রাণে খুবই বেজেছিল। তবে আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে এই বিচ্ছেদ তাঁর পক্ষে অনেক বেশি মর্মান্তিক হয়ে থাকবে। ভারতে

আসতে পারলে আজ সে মাটি চ'ষে, কাপড় বুনে, মনের সুখে সহজ সরল জীবন নির্বাহ করতে পারত। এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সে তার জীবনযাত্রার আগেকার ধরনধারণে ফিরে গেছে। স্থপতির ব্যবসায় সে রোজগারও করছে প্রচুর।

আমরা চেয়েছিলাম, জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হয়ে যেতে। কিন্তু পি. এণ্ড্ ও. জাহাজে তৃতীয় শ্রেণী না-থাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসতে হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমরা যে মেওয়া এনেছিলাম, তা সঙ্গে নিতে হ'ল। জাহাজে টাট্কা ফল সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু শুক্নো ফল পাওয়া শক্ত।

ডক্টর জীবরাজ মেহ্‌তা আমার পাঁজরে মেডেজ প্লাস্টার এঁটে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন রেড্ সী না-পৌছনো পর্যন্ত আমি যেন সেই প্লাস্টার না-খুলি। দুটো দিন তো কোনোপ্রকারে এই অস্বাচ্ছন্দ্য সহ্য করা গেল, কিন্তু শেষপর্যন্ত আর পারা গেল না। বেশ কষ্ট ক'রে প্লাস্টারটা ছাড়ানো গেল। আমি তখন ইচ্ছামতো নাওয়া-ধোওয়ার সুবিধা ফিরে পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমার আহার ছিল প্রধানত বাদাম-জাতীয় খাদ্য ও ফল। দেখা গেল, দিন-দিন শরীর-স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগল। সুয়েজ খাল পৌছবার মুখে মনে হ'ল অনেকখানি যেন ভালো হয়ে গেছি। অবশ্য দুর্বলতা তখনো ঘোচেনি, কিন্তু মনে হ'ল বিপদটা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। প্রতিদিন একটু-একটু ক'রে আমি অঙ্গসঞ্চালনের মাত্রা বাড়াতে লাগলাম। আমার ধারণা, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলহাওয়ার গুণে আমার শরীর-স্বাস্থ্যের এই উন্নতি ঘ'টে থাকবে।

পূর্ব-অভিজ্ঞতার তুলনায়, কিংবা অন্য কোনো কারণে কি-না ঠিক বলতে পারি না, এ যাত্রা এই পি.এণ্ড্ ও. জাহাজে ইংরেজ ও ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যে যেরকম ব্যবধান দেখলাম, তেমনটা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসবার সময়েও লক্ষ করিনি। দু-চারজন ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় যে হয়নি এমন নয়—কিন্তু সে নিতান্তই শিষ্টাচার-মোতাবেক। দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়া-আসার সময় জাহাজে যেমন দিলখোলা আলাপ-আলোচনার সুযোগ একাধিকবার ঘটেছিল, এ যাত্রা তেমনটা হয়নি বললেই চলে। আমার মনে হয়, এর কারণটা হ'ল এইপ্রকার জ্ঞাতসারে হোক্, অজ্ঞাতসারে হোক্ ইংরেজরা মনে করে সে শাসক শ্রেণীর লোক আর ভারতীয়রা ভাবে যে সে পরাধীন জাতির লোক।

কতক্ষণে দেশে পৌছব, এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে মুক্তি লাভ করব—সেই কথা ভেবে খুবই ব্যাকুল বোধ করছিলাম।

এডেন্ বন্দরে পা দিয়ে মনে হ'ল প্রায় যেন দেশে পৌছে গেছি। এডেন্‌ওয়ালাদের আমরা বেশ ভালোই চিনতাম। ডারবান্ থাকতে কেকোবাদ কাওয়াসজী দিনশা ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

আর-কিছুদিন পরেই আমরা বোম্বাই পৌছলাম। দীর্ঘ দশটা বছর প্রবাসে নির্বাসিত থাকার পর, দেশে ফিরে এসে কত যে আনন্দ হ'ল কী বলব!

আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য গোখলের উদ্‌যোগে একটি আয়োজন প্রস্তুত ছিল। দুর্বল শরীর সত্ত্বেও তিনি সেই সভায় যোগ দেবার জন্য বোম্বাই এসেছিলেন। আমরা ভারতে

ফিরে আসার অন্যতম কারণ ছিল এই যে আমি মনে-মনে আশা করেছিলাম যে গোখলের সঙ্গে একা মিলেমিশে আমি একাত্ম হয়ে যাব, নিজের বোঝা আর নিজেকে ব'য়ে বেড়াতে হবে না। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম।

৪৪. ব্যারিস্টর-জীবনের কিছু স্মৃতি

ভারতে ফিরে আসার পর আমার জীবনধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হয়, সেইসব কাহিনীতে আসার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার দু-চারটি অভিজ্ঞতার কথা বলতে হয়। এইসব ঘটনার কথা ইতিপূর্বে আমি ইচ্ছা ক'রেই বাদ দিয়েছিলাম।

কতিপয় আইনজীবী বন্ধু ধরেছেন আমি যেন আমার ব্যারিস্টর-জীবনের স্মৃতিকথা কিছু বলি। সেসব কথা তো এক-আধটা নয় ; সব কথা যদি বলতে বসি তাহলে তাই নিয়ে একখানা আলাদা বই হয়ে যেতে পারে। তাহলে হয়তো আমি মূল কাহিনীর খেইটুকু হারিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু আমার সত্যের সাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু-কিছু ঘটনার যদি অবতারণা করি, তা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক না-ও হতে পারে।

যদ্দূর স্মরণ হয়, ইতিপূর্বে আমি ব'লে থাকব, আইনের ব্যবসা করতে গিয়ে কখনও অসত্যের আশ্রয় নিইনি। আমার বেশিরভাগ ওকালতির কাজ ছিল জনসেবার ব্যাপার নিয়ে। এসব করতে গিয়ে আমি নিতান্ত খরচ-খরচার অতিরিক্ত কিছু দাবি করতাম না। কখনো-কখনো সেসব খরচও আমি নিজের পকেট থেকে দিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম, আমার আইন-ব্যবসা বিষয়ে আমি এই যে মোদ্দা কথাটুকু বলেছি, তার অতিরিক্ত কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু আমার আইনজীবী বন্ধুরা এত অল্পে সন্তুষ্ট নন, তাঁরা আরো-কিছু জানতে চান। তাঁরা হয়তো মনে করেন, যেসব ক্ষেত্রে আমি সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হতে চাইনি, সেইসব ঘটনার কথা যদি খুব সংক্ষেপেও বলি তাহলে ব্যবহারজীবী সম্প্রদায়ের উপকার হতে পারে।

ছাত্র-অবস্থায় শুনেছিলাম, উকিলের ব্যবসা মানে মিথ্যার বেসাতি। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমি পদমর্যাদা অথবা অর্থসম্পত্তি অর্জন করব—এরকম বাসনা আমার মনে কখনো স্থান দিইনি ব'লে, এসব কথা আমার মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

আইন-ব্যবসায়ে সততা বা সত্যনিষ্ঠা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমায় বহুবার শক্ত পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। কতবার বুঝতে পেরেছি, প্রতিপক্ষের উকিল সাক্ষীদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে হাজির করেছেন। আমি যদি আমার মক্কেল কিংবা তার সাক্ষীদের অসত্য-কথনে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দিই, তাহলে আমাদের সুনিশ্চিত জয় হয়। কিন্তু এইরকম লোভের ফাঁদে আমি কখনো পা দিইনি। মনে পড়ে, কেবল একটা মামলা জেতবার পর আমার সন্দেহ হয়েছিল যে মক্কেল আমায় মিথ্যা ব'লে ঠকিয়েছে। আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি এইমাত্র চাইতাম যে আমার মক্কেলের দিকে যদি সত্য থেকে থাকে তাহলে যেন আমি মকদ্দমায় জয়লাভ করতে পারি। মামলায় জিতিয়ে দেব, এমন কড়ার ক'রে

আমি কখনো আমার ওকালতির ফি ধার্য করেছি ব'লে আমার মনে পড়ে না। হার-জিৎ যা-ই হোক্, আমার নির্দিষ্ট দক্ষিণা আমি পাব—এইটুকুই আমি আশা করতাম, তার বেশিও নয়, কমও নয়।

সূচনাতেই আমার নূতন মক্কেলদের আমি সবাধান ক'রে দিতাম যে কেস্ যদি মিথ্যা হয় কিংবা সাক্ষীদের শিখিয়ে-পড়িয়ে যদি মামলা সাজাতে হয়, তাহলে যেন তাঁরা আমার হাতে কেস্ না-দেন। এর ফলে আমার এমন একটা সুনাম র'টে যায় যে মিথ্যা কেস্ আমার কাছে ঘেঁষতই না। এমন-কি, আমার নিয়মিত মক্কেল যারা ছিল তারা পরিষ্কার কেস্গুলি আমার হাতে তুলে দিত এবং সন্দেহজনক কেস্ চালাবার জন্য অন্য উকিল নিযুক্ত করত।

একটি কেস্ নিয়ে আমায় অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। কেস্টা এনেছিলেন আমার বাছা-বাছা মক্কেলদের একজন। কেস্ ছিল জটিল হিসাব-নিকাশের ব্যাপার নিয়ে চলেওছিল অনেকদিন ধ'রে। দফায়-দফায় কেস্টার শুনানি হয়েছিল একাধিক আদালতে। শেষপর্যন্ত আদালত হুকুম দেন যে হিসাবদক্ষ একাউন্টেট্ কয়েকজন হিসাবের খাতাপত্র দেখে সালিশি করবেন। সালিশদের রায় অনুসারে আমার মক্কেল সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন। কিন্তু অনবধানবশত সালিশেরা হিসাবে একটি ভুল ক'রে বসেন। নগণ্য হ'লেও সে ভুল মস্ত ভুল, কারণ খরচের ঘরের একটি অঙ্ককে তাঁরা ধরেছিলেন জমার ঘরে। প্রতিপক্ষীয়েরা সম্পূর্ণ অন্য কারণে সালিশি রায়ের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। আমাদের মক্কেলদের তরফে আমি ছিলাম ছোটো কৌঁসুলি। বড়ো কৌঁসুলি সালিশের ভুল লক্ষ করার পর বললেন যে এ ভুল আমাদের মক্কেল মেনে নিতে বাধ্য নন। মক্কেলের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন-কিছু কোনো কৌঁসুলি স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য নন—এই মত তিনি স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করলেন। আমি বললাম, যেটা ভুল সেটা স্বীকার করাই উচিত।

আমার কথার বিরুদ্ধতা ক'রে বড়ো কৌঁসুলি বললেন, তাহলে তো কোর্ট গোটা সালিশটাকেই নাকচ ক'রে দেবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মাথা-খারাপ না-হ'লে কোনো উকিল তাঁর নিজের মক্কেলকে এইরকম ফ্যাসাদে ফেলতে চাইবেন না। অন্ততপক্ষে আমি তো এইধরনের ঝুঁকি নিতে বিন্দুমাত্র রাজি নই। নতুন ক'রে মামলার যদি শুনানি হয়, মক্কেলকে গ্যাঁটের কড়ি কত যে গুণতে হবে তা কেউ বলতে পারে না, আর শেষপরিণাম যে কী হতে পারে তাই-বা কে বলবে।"

আমাদের এই কথাবার্তার সময় মক্কেল সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমি বললাম, "আমার তো মনে হয়, এ ঝুঁকি আমাদেরও নিতে হয়, মক্কেলদেরও। আমরা যদি ভুলটা স্বীকার না-করি, তাহলেই কোর্ট যে একটা ভুল ফয়সালা মেনে নেবে, তারই-বা নিশ্চয়তা কী? আমার ভুল স্বীকার করলে মক্কেলের যদি ক্ষতি হয়, তাতেই-বা হানি কী?"

"কিন্তু ভুলটা আমরা আদপেই মেনে নেব-বা কেন?", বড়ো কৌঁসুলি প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম, "ভুলটা কোর্ট-এর কিংবা প্রতিপক্ষের নজরে যে পড়বে না, তারই-বা নিশ্চয়তা কী?"

বড়ো কৌঁসুলি মনঃস্থির ক'রে ফেলেছেন—এমনি সুরে বললেন, "বেশ তো, আপনি কি তাহলে সওয়াল-জবাবের ভার নিয়ে এই কেস্ চালাবেন? আপনি যেমন শর্ত দিচ্ছেন, সেই শর্তে আমি কোর্ট-এ হাজির হতে পারব না।"

আমি বিনীতভাবে জবাব দিলাম, "আপনি যদি না-দাঁড়াতে চান এবং মক্কেলেব যদি আপত্তি না-থাকে, তাহলে আমিই না-হয় দাঁড়াব। ভুল যদি স্বীকার করা না-হয় তাহলে আমাকেও এই কেস্ থেকে স'রে দাঁড়াতে হবে।"

এই ব'লে আমি মক্কেলের দিকে তাকালাম। তিনি যেন একটু বিব্রতবোধ করলেন। একেবারে গোড়া থেকেই আমি এই মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমার ওপরে মক্কেলের সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। আমার স্বভাবটাও তিনি ভালোভাবেই জানতেন। তিনি বললেন : 'বেশ তো, তাহলে আপনিই আদালতে দাঁড়ান, ভুলটাও স্বীকার করুন। অদৃষ্টে যদি হার থাকে, তাহলে আমরা হারব। ভগবান সত্যের সহায় হবেন।"

মক্কেলের কথা শুনে আমি খুবই খুশি হলাম। আশা করেছিলাম, তিনি এইরকম কথাই বলবেন। সিনিয়র কৌঁসুলি আবার আমায় সাবধান ক'রে দিলেন, আমার জেদি স্বভাবের দরুণ অনুকম্পা প্রকাশ করলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমায় তাঁর সাধুবাদও জানালেন।

কোর্ট-এ কী ঘটেছিল, সে কথা এর পরেরবার বলব।

৪৫. হাতসাফাই?

আমি যে পরামর্শ দিয়েছিলাম তার মধ্যে যে কোনো ভুল ছিল না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কিন্তু কেস্টা আমি ঠিকমতো লড়তে পারব কি-না, সে বিষয়ে আমার প্রচুর সংশয় ছিল। মনে আশঙ্কা হয়েছিল যে এরকম শক্ত একটা কেস্ সুপ্রিম কোর্ট-এর সামনে চালানো, আমার পক্ষে খুবই কঠিন হবে। আদালতে দাঁড়িয়েই আমার যেন বুক ধড়ফড় করতে লাগল।

হিসেবের ভুলের প্রসঙ্গ তুলতেই একজন জজ বললেন : "এ আপনার ওকালতি বুদ্ধির বাহাদুরি নয় তো, মিস্টার গান্ধী?"

রাগে আমার সমস্ত অন্তর জ্বলছিল, জজসাহেবের এই মন্তব্য শুনে। যেখানে ছল-চাতুরীর লেশমাত্র ছিল না, সেখানে চালাকিবাজির দোষারোপ অসহ্য মনে হ'ল। মনে-মনে আমি নিজেকে বললাম, যেখানে শুরু থেকেই বিচারকের বিরুদ্ধ-পক্ষপাত, সেখানে এই কঠিন মামলা জেতবার সম্ভবনা সুদূর। তবু আমি যথাসাধ্য মনকে শান্ত ক'রে ধীরভাবে জজসাহেবকে বললাম : "লর্ডশিপ্, আমার সব কথা না-শুনেই ছলচাতুরী সন্দেহ করছেন দেখে আমি খুবই বিস্মিত বোধ করছি।" জজ বললেন, "না-না, আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছে না। ওটা নিতান্তই অনুমান।"

"আমার ধারণায়, এ ক্ষেত্রে অনুমানটাও এক হিসাবে অভিযোগ। লর্ডশিপ্-এর কাছে

আমার বক্তব্য এই যে আগে তিনি আমার সব কথা শুনুন, তারপর যদি বিচারে দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তাহলে না-হয় করবেন।"

জজ বললেন, "আপনার কথায় বাধা দিয়েছি ব'লে আমি দুঃখিত। ভুলচুকের ব্যাপারটা বিশদ করার জন্য আপনার যা বলবার বলুন।"

বক্তব্য বিশদ করার জন্য প্রচুর তথ্য আমার কাছে মজুত ছিল। ভাগ্যে জজসাহেব প্রশ্নটা ওইভাবে তুলেছিলেন। তার ফলে আমি শুরু থেকেই আমার বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা বিষয়ে কোর্ট-এর সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছি। তাঁরা আমার কথা মনে দিয়ে শুনছিলেন ব'লে আমি উৎসাহিত বোধ করি এবং সেই ভরসায় সমস্ত ব্যাপারটা সবিস্তারে বুঝিয়ে বলতে সক্ষম হই। কোর্ট আমার সব কথা ধৈর্য ধ'রে শুনলেন এবং বুঝতে পারলেন, সে হিসেবের ভুলটা নিতান্তই অসাবধনতাবশত ঘ'টে থাকবে। অতএব তাঁরা বহু পরিশ্রমসিদ্ধ সেই সালিশি-মীমাংসার সবটুকু অগৌণে নাকচ ক'রে দেওয়া ঠিক হবে না ব'লে মনে করলেন।

প্রতিপক্ষের কৌঁসুলি স্থির ক'রে নিয়েছিলেন যে হিসেবের ভুলটুকু স্বীকার ক'রে নেবার ফলে তাঁদের কাজ খুব সহজ হয়ে গেছে এবং সালিশি ফয়সালা নাকচ করবার জন্য তাঁদের দিক থেকে খুব বেশি বাদানুবাদ করার দরকার হবে না। কিন্তু জজসাহেবরা ক্রমাগত তাঁর কথার পৃষ্টে কথা পাড়তে লাগলেন, কারণ ইতিপূর্বে আমার বক্তব্য শুনে তাঁরা মনঃস্থির ক'রে ফেলেছেন যে ভুলটা নিতান্তই ভুল এবং তা এমন ভুল নয় যা সহজে শুধ্‌রে নেওয়া যায় না। কৌঁসুলি সালিশি মীমাংসা বাতিল করবার জন্য ক্রমাগত বাক্‌যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু যে জজসাহেব সূচনায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, এখন তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি আমার যুক্তির সমর্থন করতে লাগলেন। অপরপক্ষের কৌঁসুলিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : "আচ্ছা, ধরুন মিস্টার গান্ধী যদি হিসেবের ভুলটুকু স্বীকার না-করতেন, তা হ'লে আপনি কী বলতেন? সালিশি করার জন্য আমরা কোর্ট থেকে যেরকম বিচক্ষণ ও সততাসম্পন্ন একজন হিসাবনবিশ নিযুক্ত করেছিলাম, তাঁর চেয়েও যোগ্যতর কোনো ব্যক্তিকে আমরা তো নিযুক্ত করতে পারতাম না।"

জজসাহেব আরো বললেন : "কোর্ট ধ'রে নিচ্ছেন, আপনার কেস্ আপনি নিশ্চয় বেশ ভালো ক'রেই জানেন। যে ভুলচুক যে কোনো নিপুণ হিসাবনবিশের ক্ষেত্রেও সম্ভবপর হতে পারে, সেই ভুলচুকের অতিরিক্ত ত্রুটি আপনি যদি দর্শাতে না-পারেন, তাহলে এই মামুলি ভুলের দরুণ কোর্ট বাদী-বিবাদী পক্ষকে নতুন ক'রে মামলা দায়ের করার খরচপত্রের হুজ্জতে জোর ক'রে ফেলতে রাজি হতে পারেন না। যে ভুলটুকু অনায়াসেই শুধ্‌রে নেওয়া চলে, তার জন্য আমরা নতুন ক'রে শুনানির আদেশ দিতে পারি না।"

এইভাবে প্রতিপক্ষ-কৌঁসুলির আপত্তি অগ্রাহ্য করা হ'ল। ভুলটুকু সংশোধন করার সাপেক্ষে কোর্ট সালিশি-মীমাংসার সপক্ষে রায় দিলেন, না সালিশকে আদেশ দিলেন ভুল শুধ্‌রে পুনরায় ফয়শালা সুপারিশ করতে, সে কথাটা এখন আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

আমার তো আনন্দের অবধি রইল না। আমার মক্কেল ও আমাদের পক্ষের সিনিয়র

কৌসুলিরা খুব খুশি হলেন। মিথ্যার সঙ্গে আপস-রফা না-ক'রে, সত্যের পথে থেকেও যে আইনের ব্যবসা চালানো অসম্ভব নয়—আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হ'ল।

এসব সত্ত্বেও একটি কথা আপনাদের আমি মনে রাখতে বলি। সত্যের পক্ষে চললেও আইনের ব্যবসা তো ব্যবসামাত্র। সব ব্যবসার মূলে একটি যে গলদ আছে, আইন-ব্যবসা তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

৪৬. মক্কেল যেখানে সহযোগী

আইন-ব্যবসার ক্ষেত্রে নাটাল ও ট্রান্সভাল্-এর মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। নাটাল-এর বার-এ এড্ভোকেট ও এটর্নি—এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিই সদস্যশ্রেণী-ভুক্ত হতে পারবেন। ব্যারিস্টরেরা এড্ভোকেট্ হিসাবে প্র্যাক্টিস্ করতে পারেবেন, আবার ইচ্ছা করলে সেইসঙ্গে এটর্নি হিসাবেও। ট্রান্সভাল্-এর ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম, বোম্বাইয়ে যেমন সেখানেও তেমনি, ব্যারিস্টর ও এটর্নিদের ক্ষেত্র ছিল আলাদা। সেখানে ব্যারিস্টরেরা হয় এড্ভোকেট-রূপে কিংবা এটর্নি-রূপে প্র্যাক্টিস্ করতে পারতেন। নাটাল-এ থাকতে আমি এড্ভোকেট-এর সনদ নিয়েছিলাম, ট্রান্সভাল্ এটর্নির। ট্রান্সভাল্-এর বেলা এটর্নির সনদ নিয়েছিলাম দুটি কারণে—এড্ভোকেট হ'লে সেখানকার ভারতীয়দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংসর্গ আমি করতে পারব না এবং ট্রান্সভাল্-এর শ্বেতাঙ্গ এটর্নিরা আমার মতো কালা এড্ভোকেটকে কেস্ দিত না।

কিন্তু ট্রান্সভাল্-এও ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে এটর্নিরা মক্কেলের হয়ে দাঁড়াতে পারত। একবার জোহানেস্বার্গ-এর এক ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে কেস্ চালাতে গিয়ে আমি বুঝতে পারি, মক্কেল আমায় তার কেস্ ভুল বুঝিয়েছে। সওয়াল-জবাবের সময় দেখা গেল, সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। সুতরাং আমি আর-কোনো বাদানুবাদ না-ক'রে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলি, তিনি যেন কেস্ ডিস্মিস্ ক'রে দেন। প্রতিপক্ষের এড্ভোকেট তো হতভম্ব। ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু ভারি খুশি। মিথ্যা কেস্ আনার জন্য মক্কেলকে আমি ধমকধামক দিই। সে জানত, আমি মিথ্যা কেস্ হাতে নিই না। আমি তাকে সেই কথা বুঝিয়ে বলার পর সে নিজের ভুল স্বীকার করে। আমার ধারণা, ম্যাজিস্ট্রেটকে তার বিরুদ্ধে রায় দিতে বলায় সে আমার প্রতি রুষ্ট হয়নি। সে যা-ই হোক্, এইরকম আচরণের ফলে আইন-ব্যবসার দিক থেকে আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। উল্টে এর ফলে আমার কাজ সহজতর হয়। লক্ষ করলাম, সত্যের প্রতি আমার অনুরাগের প্রমাণ পেয়ে সমব্যবসায়ী সমাজে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়, এবং বর্ণবৈষম্যের বাধা সত্ত্বেও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আমি তাদের স্নেহ-ভালোবাসা লাভেও সমর্থ হয়েছিলাম।

আইন-ব্যবসা করতে গিয়ে আমার আরেকটি দস্তুর দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—মক্কেল কিংবা সমব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আইন বিষয়ে আমার অজ্ঞতা আমি কখনো রাখতে-ঢাকতে চাইতাম না। আইনের কোনো ব্যাপার বুঝে উঠতে না-পারলেই আমি মক্কেলকে ব'লে দিতাম

অন্য কোনো এড্‌ভোকেট-এর পরামর্শ নিতে। সে যদি আমায় ছেড়ে যেতে নারাজ হ'ত, তাহলে তাকে ব'লে কোনো প্রবীণ অভিজ্ঞ এড্‌ভোকেট-এর সহায়তা চাইতাম। আমার এই অকপট আচরণের ফলে মক্কেলদের কাছ থেকে আমি অসীম স্নেহ ও আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলাম। সিনিয়র কৌঁসুলির সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন হ'লেই তারা সদাসর্বদা ফি দেবার জন্য প্রস্তুত থাকত। তাদের এই স্নেহ-ভালোবাসা ও বিশ্বাস লাভ করার ফলে আমার জনহিতের কাজ অনেকখানি সহজ হয়েছিল।

ইতিপূর্বে আমি নিশ্চয় ব'লে থাকব, দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার আইন-ব্যবসা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, প্রবাসী ভারতীয়দের হিতসাধন। লোকসেবা করতে গেলে সূচনায় লোকের বিশ্বাস অর্জন না-করলে সফলকাম হওয়া যায় না। দরাজদিল্ ভারতীয়রা আমার আইন-ব্যবসাকে নিছক পয়সা উপার্জনের উপায়মাত্র মনে না-ক'রে, তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে যদি জনসেবার পর্যায়ে উন্নীত ক'রে থাকে, তাহলে তা তাদের উদার মনেরই পরিচয়। নিজেদের অধিকার কায়েম করার জন্য যখন আমি তাদেরকে কারাবরণ করতে বলেছি, তারা অম্লানবদনে সেই কষ্ট স্বীকার ক'রে নিত। আমার উপদেশ-নির্দেশের যৌক্তিকতা বিচার করার জন্য তারা অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকেনি, আমার প্রতি আস্থা ও প্রীতিবশত নির্বিচারে তারা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

এইসব কথা বলতে গিয়ে অনেক মধুর স্মৃতি আমার মনে জাগছে। শত-শত মক্কেল আমার বন্ধুস্থানীয় হয়ে জনসেবার কাজে আমার হাতে হাত মিলিয়েছে, বিপদে-আপদে ভরা আমার প্রবাসজীবন তাদের সংসর্গে মধুময় হয়েছে।

৪৭. মক্কেলের সঙ্কটমুক্তি

ইতিমধ্যে পার্সি রুস্তমজীর নামের সঙ্গে আপনারা পরিচিত হয়ে থাকবেন। যাঁরা আমার মক্কেল ছিলেন আবার সহ্‌কর্মীও ছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বরঞ্চ বলা চলে যে গোড়ায় তিনি ছিলেন আমার সহকর্মী। পরে আমার মক্কেলও হন। আমায় তিনি এতটা বিশ্বাস করতেন যে নিতান্ত ঘরোয়া ও পারিবারিক ব্যাপারেও তিনি আমার পরামর্শ চাইতেন ও তদনুসারে চলতেন। অসুখবিসুখেও তিনি আমার শরণাপন্ন হতেন। আমাদের দু-জনের জীবনযাত্রায় প্রচুর পার্থক্য থাকলে কী হয়, তিনি আমার বিধান-মতো ঘরোয়া টোট্‌কা চিকিৎসাও বিনা-দ্বিধায় মেনে নিয়ে চলতেন।

একবার আমার এই বন্ধুটি এক গুরুতর সঙ্কটে পড়েন। যদিও তাঁর কাজ-কারবারের অনেক কথাই তিনি আমায় জানাতেন, একটি ব্যাপার কিন্তু অতিসন্তর্পণে আমার কাছ থেকেও তিনি গোপন ক'রে রেখেছিলেন। বোম্বাই ও কলকাতার বাজার থেকে তিনি প্রচুর মাল আমদানি করতেন। অনেকসময় এই আমদানির ব্যাপারে তিনি শুল্ক ফাঁকি দিতেন অর্থাৎ চোরাকারবার করতেন। কিন্তু শুল্ক বিভাগের গণ্যমান্য অফিসারদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা

থাকায়, কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি যে তিনি সন্দেহের যোগ্য। তিনি যেমন-যেমন চালান পেশ করতেন তেমন-তেমন শুল্ক ধার্য হ'ত—এত তাঁকে শুল্ক বিভাগের লোকেরা বিশ্বাস করত। এমনও হতে পারে যে তাঁর এই চোরাকারবারের ব্যাপারে কোনো-কোনো অফিসারের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল।

গুজরাতি কবি একটি খুব লাগসই কথা বলতেন, চুরি ব্যাপারটা পারদের মতন, লুকিয়ে-ছুপিয়ে রাখা যায় না। পার্সি রুস্তমজীর বেলাতেও তার অন্যথা হ'ল না। তাঁর চুরি ধরা পড়ল। বেচারি বন্ধুমানুষ বিপদে প'ড়ে আমার কাছে ছুটে এলেন। দু-গাল বেয়ে তাঁর চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। তিনি আমায় বললেন :

"ভাই, তোমায় আমি ঠকিয়েছি। আমি পাপী, আমার পাপ আজ ধরা প'ড়ে গেছে। আমি চোরাকারবার করেছি, আর আমার রক্ষা নেই। আমায় এবার জেলে যেতে হবে, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। এই সঙ্কট থেকে এক তুমিই আমায় রক্ষা করতে পার। তোমার কাছ থেকে আমার কোনো কথা গোপন রাখিনি—এক এই ব্যাপারটা ছাড়া। ভেবেছিলাম, ব্যবসার ফন্দিফিকিরের কথা তুলে কেন আর তোমায় বিরক্ত করি। তাই চোরাকারবারের ব্যাপারটা ফাঁস করতে চাইনি। এখন তাই নিয়ে আমার আর অনুশোচনার অন্ত নেই।"

আমি রস্তমজীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "তোমায় এই বিপদ থেকে একমাত্র তিনিই উদ্ধার করতে পারেন। সমস্তই তাঁর হাতে। সমস্ত দোষ অকপটে যদি স্বীকার করতে পার, তোমায় রক্ষা করা যায় কি-না চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।"

গভীর বিষাদে বেচারি পার্সির মুখখানা মলিন হয়ে উঠল।

সে আমায় জিজ্ঞেস করল, "তোমার কাছে তো সব কথা স্বীকার করলাম। তা-ও কি যথেষ্ট হ'ল না?"

গলার স্বর মোলায়েম ক'রে আমি বললাম, "তুমি তো আমার প্রতি কোনো অন্যায় করনি, অন্যায় করেছ সরকারের কাছে। সুতরাং আমার কাছে দোষ স্বীকার করলে তো কোনো কাজ হবে না।"

পার্সি রুস্তমজী বললেন, "তুমি যেমন-যেমন বলবে আমি তাই করব। তবু একবার কি আমার পুরনো কৌঁসুলির সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখবে না? তিনিও তো আমার বন্ধুমানুষ।"

খোঁজখবর ক'রে জানা গেল চোরাকারবারের ব্যাপারটা যদিও অনেককাল ধ'রে চলেছিল, যে চুরি ধরা পড়েছিল তার টাকার অঙ্কটা ছিল যৎসামান্য। আমরা রুস্তমজীর সেই কৌঁসুলির কাছে গেলাম। নথিপত্র ঘেঁটে তিনি বললেন : "মামলাটা এমন যে জুরি-ছাড়া এর নিষ্পত্তি হতে পারে না। নাটাল-এর জুরি একজন ভারতীয়কে নিষ্কৃতি দেবে ব'লে মনে তো হয় না। তবু আশা ছাড়তে চাই না।"

কৌঁসুলিকে আমি অন্তরঙ্গভাবে চিনতাম না। পার্সি রুস্তমজী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "আপনি যা বললেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই ব্যাপারে মিস্টার গান্ধী আমায় যেমন বলবেন, আমি সেইভাবে চলতে ইচ্ছা করি। তিনি আমায় খুবই ভালো ক'রে চেনেন। অবশ্য দরকার হ'লেই তিনি আপনার কাছে উপদেশ-নির্দেশের জন্য আসবেন।"

কৌঁসুলির বক্তব্য বিষয় এইভাবে ধামাচাপা দিয়ে, আমরা দু-জন রুস্তমজীর দোকানে চ'লে গেলাম।

এবার নিরিবিলিতে তাকে আমার মতামত বিশদ ক'রে বোঝাতে গিয়ে আমি বললাম, "এটা এমন কেস্ নয় যে কোর্টে নিয়ে না-গেলে এর নিষ্পত্তি হবে না। তোমার বিরুদ্ধে কেস্ আনবেন, না, তোমায় ছেড়ে দেবেন, সেটা নির্ভর করছে কাস্টম্‌স্ অফিসার-এর ওপর। তিনি অবশ্য চলবেন এটর্নি জেনারেল্-এর নির্দেশ অনুসারে। এই দুই ব্যক্তির কাছেই আমি যাবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমার প্রস্তাব এই যে তাঁরা যে অর্থদণ্ড ধার্য করবেন, তুমি তা দিতে সম্মত আছ—এই কথাটুকু তুমি তাঁদের বলো। আমার তো মনে হয়, তাঁরা এইরকম ব্যবস্থায় রাজি হ'লেও হতে পারেন। আর রাজি যদি না-হতে চান তাহলে তোমায় জেলে যাবার জন্য তৈরি থাকতে হবে। আমার তো ধারণা, জেলে যাওয়াটা যত-না লজ্জাকর তার চেয়ে ঢের বেশি লজ্জাকর সেই অপরাধ যার জন্য জেলে যেতে হতে পারে। লজ্জাকর কাজটুকু তো করার আর বাকি নেই। এখন যদি জেলে যেতে হয় তাহলে জানবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইভাবেই করতে হয়। অবশ্য সত্যকার প্রায়শ্চিত্ত তখনই হবে যখন চোরাকারবার আর কখনো করবে না ব'লে মনে-মনে সঙ্কল্প গ্রহণ করবে।

পার্সি রুস্তমজী যে আমার এইসমস্ত কথা ভালোভাবে গ্রহণ করেছিলেন, এমন কথা আমি বলতে পারি না। তিনি এমনিতে ছিলেন নির্ভীক মানুষ, কিন্তু তদন্তে তাঁর সাহস তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন বলা চলে। তাঁর নাম-যশ—সব-কিছু তিনি খোয়াতে বসেছেন। এত যত্নে, এত পরিশ্রমে তিনি যে ইমারত গ'ড়ে তুলেছিলেন, তা যদি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, কোথায় তিনি দাঁড়াবেন!

মুখে তিনি বললেন, "বলেইছি তো, এখন আমি তোমার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ ক'রে ফেলেছি। তুমি রাখো কিংবা ফেলে দাও—সবই তোমার ওপর নির্ভর করছে।"

এই ব্যাপারে আমি অনুরোধ-উপরোধের চরম করেছিলাম। কাস্টম্‌স্ অফিসার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎক্রমে আমি অকপট নির্ভয়ে তাঁকে সব কথা খুলে বলি। হিসেবপত্রের সমস্ত খাতা তাঁর সামনে ধ'রে দেব ব'লে কথা দিই। তাঁকে এ কথাও জানাই যে রুস্তমজী নিতান্তই লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

কাস্টম্‌স্ অফিসার আমায় বললেন, "আমাদের ওই বুড়ো পার্সিটাকে আমার বেশ ভালো লাগে। লোকটা এরকম আহাম্মুকি ক'রে ফেলল—সত্যি খুব দুঃখের বিষয়। কিন্তু আপনি তো জানেন, এ ক্ষেত্রে আমার কী কর্তব্য। এটর্নি জেনারেল্ আমায় যেমন-যেমন বলবেন, আমায় তেমন-তেমন করতে হবে। সুতরাং আপনি তাঁর কাছে যান ও তাঁকে অনুকূল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।"

আমি বললাম, "দেখবেন, মানুষটাকে যেন আদালতে হাজির না-হতে হয়। তাহলেই আমি কৃতজ্ঞ থাকব।"

তাঁর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করার পর আমি এটর্নি জেনারেল্-এর সঙ্গে পত্রালাপ করার পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সুখের বিষয়, আমার অকপট আচরণে তিনি

খুশি হয়েছিলেন। আমি যে কোনো কথা লুকোতে চাইনি—এ বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চয় হয়েছিলেন।

আমি যে লেগে থাকলে সহজে ছাড়ি না এবং সব কথা খোলখুলি বলি, এইসব দেখেশুনে এটর্নি জেনারেল্-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "না, মশাই, আপনাকে দেখছি না-বলবার উপায় নেই।" এইধরনের কথা তিনি এই কেস্ সম্পর্কেই বলেছিলেন, না, অপর কোনো কেস্ সম্পর্কে—সে কথা আমার এখন ঠিক মনে নেই।

পার্সি রুস্তমজীর বিরুদ্ধে এই মামলাটির আপস-মীমাংসা হয়ে যায়। তাঁর স্বীকারোক্তি-মতো তিনি যত টাকা শুল্ক ফাঁকি দিয়েছিলেন তার দু-গুণ টাকা তাঁকে খেসারত দিতে হয়। তাঁর যাঁরা ওয়ারিসান কিংবা সমব্যবসায়ী তাঁরা যাতে সময় থাকতে সতর্ক হন ও সাবধান হন, সেই উদ্দেশ্যে শুল্ক ফাঁকি দেবার এই কাহিনী একটি কাগজে আনুপূর্বিক লিখে, সেটি কাচ দিয়ে বাঁধিয়ে রুস্তমজী নিজের অফিসে টাঙিয়ে রেখেছিলেন।

রুস্তমজীর বেপারী বন্ধুরা আমায় সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছিলেন যে এই নিতান্ত সাময়িক অনুতাপ দেখে আমি যেন না-ভুলি। রুস্তমজীকে এ কথা বলায় তিনি বলেছিলেন, "ভাই, তোমাকেও যদি ঠকাতে যাই, তাহলে আমার কপালে যে কী আছে ভাবলেও আঁতকে উঠি।"

পঞ্চম ভাগ

১. প্রথম অভিজ্ঞতা

ফিনিক্স্ থেকে যে দল রওনা হয়ে গিয়েছিল, আমি দেশে পৌঁছবার আগেই তারা দেশে এসে গিয়েছিল। গোড়ায় স্থির ছিল, আগাম আমি দেশে গিয়ে পৌঁছব। কিন্তু বিলেতে যুদ্ধ ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আমার সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেল। বিলেতে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক থাকতে হবে বুঝতে পেরে, ফিনিক্স্-এর দলের জন্য কোথায় আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে—এই নিয়ে ভারি ভাবনা হ'ল। ইচ্ছা ছিল দল যেন না-ভাঙে এবং দলের সবাই একসঙ্গে থেকে ফিনিক্স্-এর মতো দিনকৃত্যাদি করে। এমন কোনো আশ্রয়ের কথা জানা ছিল না যেখানে তাদের গিয়ে উঠতে বলতে পারতাম। তাই আমি তাদের তারবার্তা পাঠিয়ে বললাম, তারা যেন এন্ড্রুজ-এর সঙ্গে দেখা করে ও তাঁর নির্দেশমতো বসবাসের ব্যবস্থা করে।

তদনুসারে প্রথম প্রথম কাংড়ি গুরুকুলে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। সেখানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী নিজের সন্তানের মতো ক'রে তাদের রেখেছিলেন। তারপরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়। এখানেও কবি ও তাঁর লোকেরা অনুরূপ সমাদরে তাদের আপন ক'রে নেন। এই দুই জায়গায় তারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল তা তাদের পক্ষে যেমন, আমার পক্ষেও তেমনি লাভজনক হয়েছিল।

এন্ড্রুজকে আমি মাঝে-মাঝে বলতাম যে কবি, শ্রদ্ধানন্দজী ও প্রিন্সিপাল সুশীল রুদ্র ছিলেন তাঁর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। দক্ষিণ আফ্রিকা থাকতে এই তিনজনের প্রসঙ্গে বহু কথা তিনি আমায় বলতেন—এ কাজে তাঁর যেন ক্লান্তি ছিল না। দিনের পর দিন এন্ড্রুজ-এর মুখে এই তিন মহান্ ব্যক্তির গুণকীর্তন শোনা আমার দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক মধুর ও উজ্জ্বল স্মৃতির মধ্যে অন্যতম। ফিনিক্স্-দলের সঙ্গে এন্ড্রুজ স্বভাবতই সুশীল রুদ্রের যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন। প্রিন্সিপাল রুদ্রের আশ্রম ছিল না—কিন্তু তিনি তাঁর গোটা বাসাবাড়িটাই ফিনিক্স্-দলের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির লোকেরা প্রথম দিনেই ফিনিক্স্-দলকে এমন আপন ক'রে নিয়েছিলেন যে তাদের মনেই হয়নি ফিনিক্স্ ছেড়ে তারা অনেক-অনেক দূরে চ'লে এসেছে।

বোম্বাই বন্দরে পা দিয়ে আমি জানতে পাই যে সে সময় ফিনিক্স্ দল শান্তিনিকেতনে। গোখলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে যত তাড়াতাড়ি তাদের সঙ্গে মিলতে পারি, সেইজন্য আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম।

বোম্বাইয়ে আমার অভ্যর্থনার জন্য যেসব সভা হযেছিলেন, তার একটিতে আমায় ছোটোখাটো একটা সত্যাগ্রহ করতে হয়।

জাহাঙ্গীর পেটিট্-এর বাড়িতে আমার সম্মানার্থ যে সভা বসেছিল, সেখানে আমি সাহস ক'রে সম্বধর্নার উত্তর গুজারাতিতে দিতে পারিনি। গিরমিটিয়া কুলিদের মধ্যে আমার জীবনের একটা মস্ত বড়ো অংশ কেটেছে। প্রাসাদের মতো সেই বাড়ির চোখবাঁধানো ঐশ্বর্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল আমার মতো নিতান্ত গেঁয়ো মানুষ এই জাঁকজমকের মধ্যে কেমন ক'রে এল। তখনকার দিনে আমার পরিধেয় ছিল কাথিয়াওয়াড়ি কুর্তা, পরনে ধুতি আর মাথায় পাগড়ি। আজকালকার তুলনায় সেই পোশাক কিঞ্চিৎ সভ্যভব্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পেটিট্ প্রাসাদের সেই ঐশ্বর্য-চাক্‌চিক্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেবলি মনে হতে লাগল, আমি যেন হংসো মধ্যে বকো যথা। সে যা-ই হোক্, স্যর ফিরোজশা মেহ্‌তার স্নেহপ্রচ্ছায়ে থাকার দরুণ এখানকার কাজটা এ-রকম ভালোয়-ভালোয় কেটে গেল।

অতঃপর এল গুজরাতিদের পালা। আমায় সম্বর্ধনা না-জানিয়ে গুজরাতিরা আমায় বোম্বাই ছেড়ে যেতে দেবে না বলল। উত্তমলাল ত্রিবেদী ছিলেন এই সভার উদ্‌যোক্তা। এই সভার কার্যক্রম বিষয়ে আগের থেকেই জানতে পেরেছিলাম। গুজরাতি ব'লে মিস্টার জিন্না এই সভায় উপস্থিত ছিলেন—সভাপতি না প্রধান বক্তা হিসেবে, সে কথা এখন আমার মনে নেই। তিনি ইংরেজিতে একটি সুন্দর নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। যদ্দুর মনে পড়ে, অন্য বক্তাদের অনেকে ইংরেজিতেই বক্তৃতা দেন। আমার পালা যখন এল আমি গুজরাতিতেই আমার ধন্যবাদ জানালাম এবং বুঝিয়ে বললাম, গুজরাতি ও হিন্দুদের প্রতি আমার পক্ষপাতের কী কারণ। সেইসঙ্গে গুজরাতিদের কোনো সভায় ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবার বিপক্ষে সবিনয় আপত্তি তুলেছিলাম। খুবই বাধো-বাধো লেগেছিল এইভাবে বলতে—চল্‌তি প্রথার বিরুদ্ধে এভাবে আপত্তি জানানো বিশেষ ক'রে দীর্ঘকাল প্রবাসের পর ঘরে-ফিরে-আসা একজন অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে—সঙ্গত ও সমীচীন হবে কি-না এ বিষয়ে আমার খুবই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু একপ্রকার জোর ক'রে গুজরাতিতে জবাব দেবার জন্য কেউ আমায় ভুল বুঝেছেন ব'লে মনে হ'ল না, বরঞ্চ মনে হ'ল তাঁরা বেশ সহজ মনে আমার এই প্রতিবাদ মেনে নিয়েছেন।

এই সভার অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে ভরসা জন্মাল যে আমার দেশবাসীর সামনে আমার অভিনব বিচারধারা রাখবার চেষ্টায় আমায় হয়তো খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।

বোম্বাইয়ে দুটোদিন থাকবার পর, এইসব প্রাথমিক অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে সঞ্চয় ক'রে, আমি গোখলের আহ্বানক্রমে পুণা চ'লে যাই।

২. গোখলের সঙ্গে পুণায়

বোম্বাইয়ে পা দিতেই গোখলের কাছ থেকে খবর এল যে গভর্নর-এর বিশেষ ইচ্ছা যেন আমার সঙ্গে দেখা হয়। পুণায় যাবার আগেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হতে পারলে ভালো। তদনুসারে আমি লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রাথমিক কুশল জিজ্ঞাসাদির পর তিনি আমায় বললেন :

"আপনাকে একটা কথা বলি। সরকারের বিরুদ্ধে যদি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া মনস্থ করেন, তাহলে কাজে নামবার আগে একবার এসে আমার সঙ্গে যেন দেখা করেন।"

জবাবে আমি বললাম : "সে আর বেশি কথা কী, স্বচ্ছন্দে আপনাকে কথা দিলাম। সত্যাগ্রহী হিসেবে আমি একটি নিয়ম মেনে চলি, সেটি হ'ল এই যে কারও বিরুদ্ধে কিছু করবার আগে, অপরপক্ষের মতামত ভালো ক'রে জেনে নিতে চাই, যতটা সম্ভব তার সঙ্গে একমত হতে চেষ্টা করি। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে এ নিয়ম আমি যথোচিত নিষ্ঠায় পালন ক'রে এসেছি। এখানেও আমার তাই করার ইচ্ছা।"

লর্ড উইলিংডন আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন : "আপনার যখন খুশি আমার কাছে চ'লে আসবেন। দেখতে পাবেন, নেহাৎ ইচ্ছা ক'রে এই প্রদেশের সরকার কোনো অন্যায় কাজ করতে চায় না।"

জবাবে আমি বললাম : "সেই আশা ও বিশ্বাসই তো আমার সম্বল।"

এই সাক্ষাৎকারের পরে আমি পুণা গেলাম। পুণায় আমার যেসব মহামূল্য অভিজ্ঞতা ঘটেছিল তার আনুপূর্বিক স্মৃতিকথা বলতে পারব ব'লে মনে হয় না। গোখলে ও তাঁর সার্ভেন্ট্‌স্‌ অব ইন্ডিয়া সোসাইটির সদস্যদের অপর্যাপ্ত স্নেহে আমি একেবারে যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। যদ্দুর স্মরণ হয়, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য গোখলে তাঁদের সবাইকে পুণায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, নানা বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা হয়।

গোখলের বিশেষ আগ্রহ ছিল আমি যেন সোসাইটির সদস্যশ্রেণী-ভুক্ত হই। এ বিষয়ে আমার আগ্রহও কিছু কম ছিল না। কিন্তু সদস্যদের মনে হয়েছিল যে আমার মত ও পথের সঙ্গে তাঁদের মত ও পথের এমনই পার্থক্য যে আমার পক্ষে সোসাইটিতে যোগদান করা ঠিক হবে না। গোখলে কিন্তু ভেবেছিলেন, আমার নৈতিক আদর্শে আমি যতই দৃঢ় হই-না-কেন, পরমতসহিষ্ণুতা আমার কিছু কম ছিল না। তিনি বললেন :

"সোসাইটির সদস্যেরা দেখছি এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি যে তুমি ভিন্ন মতের লোকের সঙ্গে আপস-রফা ক'রে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারো। এঁরা কিন্তু এঁদের নিজেদের আদর্শে অবিচল এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ ক'রে থাকেন। আশা করি, এঁরা তোমায় সদস্যরূপে স্বীকার ক'রে নেবেন। যদি না-ও নেন, ঘুণাক্ষরে ভেবো না যেন, তোমার প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা বিন্দুমাত্র কম আছে। পাছে সেই সম্ভ্রমের ভাবটুকুর মধ্যে একটুও ইতরবিশেষ হয়, সেই ভয়ে এঁরা ঝুঁকি নিতে ইতস্তত করছেন। সে

যা-ই হোক্, তুমি বিধিবদ্ধভাবে সোসাইটির সদস্যরূপে স্বীকৃত হও বা না-ই হও, আমার চোখে এখন থেকে তুমি সদস্য হয়েই রইলে।

গোখলেকে আমার মনোগত বাসনার কথা নিবেদন করি। তাঁকে আমি জানালাম, সোসাইটির সদস্যরূপে স্বীকৃত হই কিংবা না-ই হই, আমি চাই এমন একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে যেখানে আমার ফিনিক্স্-পরিবারের সঙ্গে আমি কায়েম হয়ে বসবাস করতে পারি। যেহেতু আমি গুজরাটি, মাতৃভূমির সেবার মধ্যে দিয়েই সমগ্র দেশের সেবা আমার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত। সুতরাং গুজরাটের কোথাও যদি বসবাস করতে পারি তাহলে আমার পক্ষে ভালো। আমার এই কথাটা গোখলের বেশ মনে ধরেছিল। তিনি বললেন :

"বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। খুব ঠিক কথা বলেছ। সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলাফল যেমনই হোক্-না-কেন, আশ্রম চালাবার খরচখরচা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিও। আমি মনে করব, সে আশ্রম আমারই।"

গোখলের কথা শুনে আমার আনন্দের অবধি রইল না। দ্বারে-দ্বারে ঘুরে-ঘুরে অর্থ-সংগ্রহের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারব—সে কথা ভাবতেও ভালো লাগছিল। উপরন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার সমস্ত দায়টুকু আমায় যে একাহাতে সামলাতে হবে না, ঠেকায় পড়লে যে একজন মুরুব্বি-স্থানীয় লোকের কাছ থেকে ঠিক পথের দিশা পাওয়া যাবে—এই নিশ্চিতি পেয়ে আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা মস্ত বোঝা যেন মাথা থেকে নেমে গেল।

গোখলে ডক্টর দেবকে ডেকে পাঠালেন ও তাঁকে ব'লে দিলেন সোসাইটির খাতায় যেন আমার নামে একটা হিসাব খোলা হয়। আশ্রম-স্থাপনের জন্য বা জনহিতের অন্য-কোনো কাজে যদি আমার টাকার দরকার হয়, তাহলে যেন সেই হিসাব থেকে সব টাকা দেওয়া হয়।

এবার আমি শান্তিনিকেতন যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। আমার চ'লে আসার আগের দিন আমায় বিদায়-সংবর্ধনা জানাবার জন্য গোখলে বাছা-বাছা গুটিকতক বন্ধুকে একটি ছোটো পার্টিতে আমন্ত্রণ করলেন। তাঁর আজ্ঞায় আমার রুচি ও পছন্দ-মাফিক আহার্য পরিবেশন করা হ'ল : ফল, মেওয়া ও বাদাম-জাতীয় খাদ্য। পার্টির স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল তাঁর ঘর থেকে কয়েক পা দূরে। কিন্তু তখন তাঁর এমনই অসুস্থ শরীর যে উঠে সেই দু-পা হেঁটে এসে যে পার্টিতে যোগ দেবেন--তেমন শক্তিও ছিল না। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহবশত তিনি আসবার জন্য জেদ করতে লাগলেন। এলেনও শেষপর্যন্ত এবং মূর্ছা গেলেন, সকলে ধরাধরি ক'রে তাঁকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আজকাল প্রায়ই তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন। সংজ্ঞা ফিরে অসতেই তিনি ব'লে পাঠালেন, আমাদের পার্টি যেন চলে, যেন বন্ধ করা না-হয়।

পার্টি না-ব'লে কতিপয় বন্ধু-স্থানীয় ব্যক্তির মন-খোলা আলাপ-আলোচনার ক্ষুদ্র ছোটোখাটো আসর বলা যেতে পারত। সোসাইটির অতিথি-ভবনের সামনে খোলা আকাশের তলায় আমরা কয়েকজন মিলে বাদাম, খেজুর ও ফল-সহযোগে জলযোগ করতে-করতে সকল বিষয়ে গল্পগুজব করছিলাম।

গোখলের এই মূর্ছা যাবার ব্যাপারটুকু আমার জীবনের একটি মামুলি ঘটনা বলা অবশ্য যায় না। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

৩. হুম্‌কি

আমার দাদার বিধবা স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি পুণা থেকে রাজকোটে ও তারপরে পোরবন্দরে যাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ পরিচালনার সময় আমি আমার পরিধেয় সাজপোশাক এমনভাবে অদলবদল ক'রে নিয়েছিলাম যাতে তা গিরমিটিয়া কুলিদের সাজপোশাকের কাছাকাছি যায়। বিলেতে থাকতেও ঘরের মধ্যে ওইরকম পোশাকই পরতাম। বোম্বাই বন্দরে যখন পা দিই আমার পরনে ছিল কাথিয়াওয়াড়ি পোশাক—ধুতি, কুর্তা, কোট ও একখানা সাদা চাদর। এসবই ছিল ভারতীয় মিল-কাপড়ে তৈরি। বোম্বাই থেকে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হিসেবে যাব ব'লে, মনে হ'ল চাদর ও কোটটা অনাবশ্যক বোঝা-মতন হবে। ওগুলি পরিহার ক'রে আট আনা কি দশ আনা পয়সা খরচ ক'রে মাথায় চড়ালাম একটা কাশ্মীরী টুপি। এমন পোশাকে যদি ট্রেনে চাপি, গরীব সহযাত্রীরা নিশ্চয় আমায় তাদেরই একজন ব'লে মনে করবে।

সেসময় প্লেগ্‌ রোগ কিছু-কিছু হচ্ছিল ব'লে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হ'ত—সম্ভবত বিরাম্‌গাম্‌-এ কিংবা ওয়ঢ়ওয়ান্‌-এ। আমার গায়ে সামান্য জ্বর ছিল। শরীরের তাপ পরীক্ষা ক'রে ইন্‌স্পেক্টর আমার নামধাম পাতায় টুকে নিয়ে বললেন, আমি যেন রাজকোট গিয়েই সেখানকার মেডিকেল অফিসারের কাছে হাজিরা দিই।

কেউ নিশ্চয় আগাম খবর দিয়ে থাকবে যে আমি ও ওয়ঢ়ওয়ান্‌ হয়ে রাজকোট অভিমুখে যাচ্ছি। দেখলাম ওয়ঢ়ওয়ান্‌-এর নাম-করা লোকসেবক মোতিলাল দর্জি স্টেশনে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমদানি-রপ্তানির ওপর শুল্ক আদায় করা নিয়ে বিরাম্‌গাম্‌ স্টেশনে রেলযাত্রীদের কত যে হেনস্তা সইতে হয়—সে বিষয়ে তিনি আমায় বলতে এসেছিলেন। গায়ে জ্বর থাকায় বেশি কথা বলার ইচ্ছা ছিল না। মোতিলালের কথায় ছেদ টানতে গিয়ে তাঁকে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে জবাব দিই :

"জেলে যেতে রাজি আছেন?"

যেসব ছেলেছোকরা না-ভেবেচিন্তে ঝোঁকের মাথায় বড়োবড়ো কথা বলে, গোড়াতে ভেবেছিলাম, মোতিলাল হয়তো তাদেরই একজন। কিন্তু সে ছিল অন্যধরনের মানুষ, দৃঢ়নিশ্চিতভাবে মোতিলাল আমায় বলল :

"আপনি যদি আমাদের নেতৃত্ব করেন, তাহলে জেলে যেতে আমরা তৈরি। কাথিয়াওয়াড়ি হিসেবে আপনাদের ওপর আমাদের দাবি সবার আগে। এখুনি-এখুনি আপনাকে আমরা আট্‌কে রাখতে চাই না। কিন্তু কথা দিন ফিরতি-পথে আপনি আমাদের এখানে নেমে যাবেন। এখানকার তরুণ সম্প্রদায় কত উৎসাহে কতসব কাজকর্ম ক'রে চলেছে, দেখতে পেলে

আপনি খুশি হবেন। দেখে নেবেন আপনি, যখনই ডাক দেবেন, আমরা সবাই আপনার ডাকে সাড়া দেব।"

"মোতিলালের কথা শুনে আমি মুগ্ধ হলাম। তার সঙ্গে যিনি এসেছিলেন তিনি, মোতিলালের প্রশংসা ক'রে বললেন : "আমাদের বন্ধুবর দর্জি হ'লে কী হয়, দর্জির কাজে সে এমনি ওস্তাদ যে দৈনিক একঘণ্টা কাজ করলেই, মাস গেলে পনেরো টাকা অনায়াসে তার হাতে আসে। ওই টাকাতেই তার নিজের খরচখরচা চ'লে যায়। বাকি সময়টা মোতিলাল দেয় জনহিতের কাজে। আমরা লেখাপড়া জানা হ'লে কী হয়, তাকে দেখে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। আমরা সকলে তার নেতৃত্বে চলি।"

পরে যখন মোতিলালের নিকট-সম্পর্কে আসি, বুঝতে পারি, সেই সঙ্গী লোকটি তার গুণের কথা যা-যা বলেছিল সেগুলি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত ছিল না। আমার আশ্রম স্থাপিত হ'লে সে প্রতিমাসে নিয়ম ক'রে কয়েকটা দিন আশ্রমে এসে থাকত ও সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজে ছোটোদের তালিম দিত, আশ্রমের লোকেদের জামাকাপড়ও কিছু-কিছু সেলাই ক'রে দিত। আশ্রমে থাকার সময় প্রতিদিন সে আমায় বিরাম্‌গামের কথা ও রেলযাত্রীদের হয়রানির কথা শোনাত। যাত্রীদের এই দুর্ভোগ তার কাছে অসহ্য ব'লে মনে হ'ত। সবে তখন সে যৌবনে পা দিয়েছে। দু-দিনের অসুখে হঠাৎ সে চ'লে গেল। তার অভাবে ওয়ঢ়ওয়ানের সর্বজনীন জীবন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলা চলে।

রাজকোটে পৌঁছবার পরদিন সকালবেলা আমি মেডিকেল অফিসারের সামনে হাজিরা দিলাম। রাজকোট শহরে আমি তো একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল ছিলাম না। সব কথা শুনে ডাক্তারটি ভারি লজ্জায় পড়লেন ও ইন্‌স্পেক্টর-এর আচরণে উষ্মা প্রকাশ করলেন। অবশ্য রাগ করার কোনো হেতু ছিল না, কারণ ইন্‌স্পেক্টর যা করেছিলেন সে নিতান্ত কর্তব্যবোধে। তিনি আমায় চিনতেন না, আর চিনলেও, কর্তব্যের অন্যথা করাটা তাঁর পক্ষে অনুচিত হ'ত। মেডিকেল অফিসার বললেন, আর যেন আমি হাজিরা দেবার জন্য তাঁর কাছে না-যাই, তিনিই একজন ইন্‌স্পেক্টরকে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের বাসস্থানে।

মড়ক যখন লাগবার সম্ভবনা দেখা দেয়, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির খাতিরে তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাটা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। বড়ো লোক কিংবা নামী লোকেরা স্বেচ্ছায় যদি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হন, তাহলে তাদের পদমর্যাদা যেমনই হোক্-না-কেন, গরীব সহযাত্রীরা যেসব নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হন, তাদের উচিত স্বেচ্ছায় সেসব নিয়ম মেনে চলা। সরকারী কর্মচারীদেরও উচিত সেসব নিয়ম প্রয়োগের বেলা কোনো ইতরবিশেষ না-করা। আমার অভিজ্ঞতায় বলে যে, অফিসারেরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মানুষ ব'লে গণ্য করে না, মনে করে তারা যেন ভেড়ার পাল। তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তারা যদি কথার পৃষ্ঠে কথা বলে তা তাদের কাছে অসহ্য মনে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এমনভাবে চলতে-ফিরতে হয় যেন তারা অফিসারদের হুকুমের চাকর। অফিসারেরা কারো কোনো তোয়াক্কা না-রেখে তাদের মারধোর করে, ঠকায়। তাদের সকলরকমে নাজেহাল ক'রে তবে টিকিট দেয়, ফলে অনেকসময় তারা ট্রেন [illegible] করে। আমি এসব

ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছি। এসব অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার তখনই সম্ভব যখন শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিদের কেউ-কেউ স্বেচ্ছায় গরিবিয়ানা মেনে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করবেন। গরীব সহযাত্রীরা যেসব সুখ-সুবিধা পায় না, তাঁরা যদি সেইসব সুখ-সুবিধা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, অসুবিধা, অন্যায় ও অবিচার প্রভৃতিকে অবশ্যম্ভাবী মনে না-ক'রে যখন সেসবের নিরাকরণে তাঁরা রুখে দাঁড়াতে পারবেন, তখনই কেবল সংস্কার সম্ভবপর হতে পারে।

কাথিয়াওয়াড়ে যখনই গেছি বিরাম্‌গামের শুল্ক বিভাগের অত্যাচার ও অনাচার বিষয়ে অনেক অভিযোগ আমার কানে এসেছে। কালবিলম্ব না-ক'রে আমি তাই লর্ড উইলিংডন আমায় যে কথা দিয়েছিলেন তার সুযোগ নেবার জন্য তৎপর হলাম। এই উৎপাত বিষয়ে যতরকম তথ্য সংগ্রহ করা যায় সব আমি একত্র ক'রে প'ড়ে ফেললাম। অভিযোগ যা কানে এসেছিল সেগুলি যে ভিত্তিহীন নয়, সে বিষয়ে স্থির-নিশ্চিত হয়ে আমি বোম্বাই সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করলাম। লর্ড উইলিংডন-এর প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করলাম, লাটসাহেবের সামনেও হাজিরা দিলাম। লর্ড উইলিংডন সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন যে আসলে দোষটা দিল্লীর। তাঁর সেক্রেটারি বললেন, "ব্যাপারটা আমাদের আওতায় থাকলে কবে আমরা এই শুল্কের দেওয়াল তুলে ফেলতাম। আপনার উচিত, দিল্লীর কাছে দরবার করা।"

দিল্লী-স্থিত ভারত সরকারকে চিঠি লিখে সব কথা জানালাম। তাঁরা কেবল আমার চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করলেন, তার বেশি-কিছু করলেন না। প্রতিকার হ'ল অনেকদিন পরে, যখন লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের একটা সুযোগ ঘটে। তাঁর কাছে সমস্ত প্রসঙ্গটা পাড়ার পর তিনি গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিরাম্‌গামের ব্যাপারটা তিনি কিছুই জানতেন না। ধৈর্য ধ'রে তিনি আমার সমস্ত কথা শুনলেন। সঙ্গে-সঙ্গে টেলিফোন তুলে বিরাম্‌গাম্‌ সম্পর্কিত সমস্ত কাগজপত্র তলব করলেন এবং বললেন আত্মপক্ষ সমর্থনে কর্তৃপক্ষের যদি কোনো সন্তোষজনক যুক্তি বা সাফাই না-থাকে, তাহলে তিনি কর্ডন তুলে নেবার হুকুম দেবেন। এই সাক্ষাৎকারের অল্পকিছুদিন পরে খবরকাগজে পড়লাম বিরাম্‌গামে শুল্ক আদায়ের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে।

এই ঘটনাকে আমি ভারতে সত্যাগ্রহের সূচনা ব'লে মনে করি। বোম্বাই সরকারের সঙ্গে বিরাম্‌গাম্‌ সম্পর্কে যখন আমার কথাবার্তা চলছে, তখন সরকারের সেক্রেটারির কাথিয়াওয়াড়ের বাগাস্রায় একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি সত্যাগ্রহের উল্লেখ করেছিলাম ব'লে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আমায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন : "আপনি তো আমাদের শাসাতে চেয়েছেন—কেমন কি-না? আপনার কি ধারণা আপনার ধমকধামকে আমাদের মতো প্রবলশক্তি সরকার মাথা নোয়াবে?"

সেক্রেটারির কথার জবাবে আমি বলেছিলাম : "হুম্‌কি দিতে তো আমি চাইনি। আমি চেয়েছি, জনসাধারণকে শেখাতে ও বোঝাতে। তাদের অভাব-অভিযোগের আইনসঙ্গত

প্রতিকার কিছু যদি থেকে থাকে তাহলে সে উপায় বাৎলানো আমার কর্তব্যবিশেষ। যে দেশ স্বাধিকার অর্জন করতে চায়, কোন্-কোন্ পথে কী-কী উপায়ে সে স্বাধীন হতে পারে সে সমস্ত তার ভালো ক'রে জেনে নেওয়া উচিৎ। সচরাচর অন্য উপায় না-থাকলে লোক চরমপন্থা হিসেবে হিংসার আশ্রয় নেয়। সত্যাগ্রহ কিন্তু নেহাৎই অহিংসার হাতিয়ার। এই অস্ত্র কোথায় কেমনভাবে চালাতে হয়, কোথায় এ অস্ত্র আদৌ চলে না—এসব কথা জনগণের কাছে বিশদ করা আমার কর্তব্য। ব্রিটিশ সরকার যে প্রবল শক্তিসম্পন্ন সরকার, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, কিন্তু অস্ত্র হিসেবে সত্যাগ্রহ যে আমোঘ, সে বিষয়েও আমার কোনো সংশয় নেই।"

চতুর সেক্রেটারি-সাহেব অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে বললেন, "বেশ, বেশ, দেখা যাবে।"

৪. শান্তিনিকেতন

রাজকোট থেকে রওনা হয়ে চ'লে গেলাম শান্তিনিকেতনে। সেখানকার ছাত্র ও শিক্ষকেরা আমায় এমন স্নেহ-ভালোবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেন যে আমি একেবারে অভিভূত বোধ করি। সংবর্ধনার আয়োজন যা হয়েছিল তার মধ্যে অনাড়ম্বর সরলতা, কলারুচি ও হৃদ্যতার একটি মধুর সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এই শান্তিনিকেতনেই কাকাসাহেব কালেলকরের সঙ্গে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয়।

কালেলকরকে লোকে কেন 'কাকাসাহেব' বলত সে কথা তখন আমি জানতাম না। কেশবরাও দেশপাণ্ডে ছিলেন আমার সমসাময়িক, বিলেতে থাকতে আমাদের দু-জনের মধ্যে বেশ ভাব হয়েছিল। পরে শুনেছিলাম, বরোদা রাজ্যে দেশপাণ্ডে গঙ্গাদাস বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যালয়ে একটা গৃহ-পরিবারের পরিবেশ গ'ড়ে তোলার জন্য, তিনি এই স্কুলের শিক্ষকদের নামের সঙ্গে কোনো-না-কোনো আত্মীয়-সম্বন্ধের নাম যুক্ত ক'রে দিতেন। কালেলকর যখন ওখানকার শিক্ষক তাঁকে 'কাকা' বলে ডাকা হ'ত। তেমনি ফাড়কে-কে 'মামা' ও হরিহর শর্মাকে 'আন্না' অথবা দাদা ব'লে সম্বোধন করা হ'ত। অন্য শিক্ষকদেরও এইরকম নাম দেওয়া হয়েছিল। কাকার বন্ধু আনন্দানন্দকে বলা হ'ত 'স্বামী', তেমনি মামার বন্ধু পটবর্ধনকে নাম দেওয়া হয়েছিল 'আপ্পা'। এঁরাও পরে সেই বিদ্যালয়ের পরিবারভুক্ত হন। কালে এঁদের সকলেই একে-একে আমার সহকর্মী হয়ে আমার কাজে যোগদান করেন। দেশপাণ্ডে নিজে 'সাহেব' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। স্কুল উঠে গেলে এই গৃহ-পরিবারও ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এদের মধ্যে সেই আত্মিক যোগ কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি। নিজেদের নামের সঙ্গে সেইসব পারিবারিক নাম তাঁরা কখনো বর্জন করেননি।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়লাভ করার ইচ্ছায় কাকাসাহেব তখন বরোদা ছেড়ে বেরিয়েছেন। আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই তিনিও তখন সেখানে।

তাঁদের দলের আরো-একজন লোক তখন শান্তিনিকেতনে উপস্থিত, তিনি হলেন চিন্তামন শাস্ত্রী। এঁরা দু-জনই সংস্কৃত পড়ানোর কাজে সাহায্য করতেন।

শান্তিনিকেতনে ফিনিক্স্-পরিবারের বসবাসের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মগনলাল গান্ধী ছিলেন এই পরিবারের কর্তা। ফিনিক্স্ আশ্রমের যাবতীয় নিয়ম যথাযথ নিষ্ঠায় যাতে পালিত হয়—সেই ছিল মগনলালের মুখ্য কাজ। জ্ঞানে, সাধনার একাগ্রতায়, স্নেহমমতার গভীরতায় মগনলালের ব্যক্তিত্ব এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল শান্তিনিকেতনের সর্বত্র।

এন্ড্রুজ তো সেখানে ছিলেনই। পিয়ার্সন্‌ও ছিলেন। যেসব বাঙালি শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আমরা আসতে পেরেছিলাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন জগদানন্দবাবু, নেপালবাবু, সন্তোষবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু, নগেনবাবু, শরৎবাবু ও কালীবাবু।

আমার যেমন স্বভাব, ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে আমি কালবিলম্ব না-ক'রে মিলেমিশে এক হয়ে গেলাম। আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বন বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু ক'রে দিলাম। মাস্টারমশায়দের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে আমি বললাম যে বেতনভোগী রান্নার লোকেদের বিদায় ক'রে দিয়ে, তাঁরা যদি ছেলেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের রান্নাবান্না নিজেরাই করেন, "তাহলে ছেলেদের শারীরিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রেখে রান্নাঘরের কাজটা তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এতে ক'রে ছাত্রেরাও হাতেকলমে স্বাবলম্বী হতে শিখবে। দু-চারজন শিক্ষক মাথা নাড়ালেন ব'লে মনে হ'ল। কেউ-কেউ আবার পরম উৎসাহে আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন। নতুন-কিছু করতে পারলে ছেলেরা খুবই খুশি হয়। সেইটেই তাদের স্বভাব। সুতরাং তারা যে এগিয়ে এল তাতে আর বিচিত্র কী! কাজটা তো চালু ক'রে দেওয়া গেল। এ বিষয়ে যখন কবিগুরুর মতামত জিজ্ঞেস করতে গেলাম, তিনি বললেন শিক্ষকেরা যদি এ কাজে অনুকূল থাকেন, তাহলে তাঁর নিজের দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই। ছেলেদের ডেকে কবি বললেন : "এই যে পরীক্ষায় তোরা নেমেছিস, এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে স্বরাজের চাবিকাঠি।"

পরীক্ষা সফল ক'রে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় পিয়ার্সন্-এর শরীর ক্ষয় হতে লাগল। এ কাজে তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না। ছাত্রদের একটা দল কুটত শাকসব্জি, একদল চাল-ডাল বেছে-ধুয়ে পরিষ্কার করত। অপরাপর-দল করত অন্যসব কাজ। রান্নাঘর ও তার আশেপাশের নালা-নর্দমা সাফ্‌সুতরো রাখার দায়িত্বটুকু স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন নগেনবাবু ও তাঁর দলবল। তাঁরা যখন কোদাল চালিয়ে তাদের কাজ ক'রে যেতেন—দেখে আমার ভারি আনন্দ হ'ত।

কিন্তু সেই একশো পঁচিশজন ছেলে ও তাদের শিক্ষকেরা এইরকম গতর খাটাবার কাজ দিনের পর দিন হাসিমুখে ক'রে যাবেন—এরকম আশা করা যায় না। প্রতিদিনই এসব নিয়ে আলোচনা হ'ত। কিছু লোক তো শুরুতেই হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু পিয়ার্সন্ তেমন পাত্রই নন যে সহজে থ'কে যাবেন। সর্বদা দেখা যেত, রান্নাঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে-করতে তিনি প্রসন্নবদনে একটা-না-একটা কিছু কাজ ক'রে চলেছেন। রান্নাঘরের বড়ো-বড়ো

বাসনকোসন মাজবার ভার তিনি নিয়েছিলেন আপন হাতে। মাজাঘসার একঘেয়ে পরিশ্রমের ক্লান্তি কিছু-পরিমাণে লাঘব করার জন্য, পিয়ার্সন্-এর দলের কাছাকাছি ব'সে একদল ছেলে সেতারে গৎ বাজাত। মোটকথা সবাই পরম উৎসাহে কোনো-না-কোনো কাজে হাত লাগিয়েছিল, মধুচক্রের মৌমাছিদের মতো হয়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতন।

অদলবদল একবার শুরু ক'রে দিতে পারলে আপন আবেগেই কাজ এগিয়ে চলতে থাকে। ফিনিক্স্-পরিবারের লোকেরা কেবল যে নিজেদের রান্নাবান্না নিজেরাই করত এমন নয়, তাদের আহার্যও ছিল নিতান্ত সাদাসিধে। মশলা চাটনি আচার প্রভৃতি মুখরোচক জিনিস তারা সযত্নে বর্জন ক'রে চলত। ভাত, ডাল, তরিতরকারি এমন-কি আটা-ময়দাও তারা একত্র ভাপে সেদ্ধ ক'রে নিত। বাংলা রান্না সংস্কার করার মতলবে শান্তিনিকেতনের ছেলেরাও এরকম একটা রান্নাঘর চালু করেছিল। এই রান্নাঘর পরিচালনা করতেন দুয়েকজন শিক্ষক ও কতিপয় ছাত্র।

এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা কিছুদিন পরে অবশ্য বন্ধ হয়ে যায়। যা-হোক্, আমার তো মনে হয়, এইধরনের পরীক্ষা কিছুকাল চালাবার দরুন এই প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্ষতি হয়নি। এ থেকে শিক্ষকেরা এমন অনেক অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে থাকবেন যা আখেরে তাঁদের কাজে দিয়ে থাকবে।

ইচ্ছা ছিল, শান্তিনিকেতনে কিছুকাল থেকে যাব। কিন্তু নিয়তির অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। একটা সপ্তাহ ঘুরতে-না-ঘুরতে পুণা থেকে তারবার্তায় খবর এল গোখলের স্বর্গবাস হয়েছে। সারা শান্তিনিকেতন শোকের সাগরে নিমগ্ন হ'ল। আশ্রমের সবাই আমার কাছে এলেন তাঁদের সহবেদনা জানাতে। 'জাতির এই অপূরণীয়' ক্ষতিতে শোকপ্রকাশ করার জন্য মন্দিরে বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা হ'ল। খুবই ভাবগম্ভীর হয়েছিল সেই অনুষ্ঠান। সেদিনই আমার পত্নী ও মগনলালকে সঙ্গে নিয়ে আমি পুণা রওনা হয়ে যাই। আর-সকলে শান্তিনিকেতনে থেকে গেল।

এন্ড্রুজ বর্ধমান অবধি এসেছিলেন আমাদের পৌঁছে দিতে। তিনি আমায় একটি প্রশ্ন করেছিলেন : "আপনার কি মনে হয় ভারতে কখনো সত্যাগ্রহের সম্ভাবনা দেখা দেবে? তেমন দিন যদি আসে, তবে কখন তা আসবে ব'লে আপনার ধারণা?"

আমি জবাবে বলেছিলাম, "এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব কঠিন। একটি বছর আমি কিছু করব না স্থির করেছি। গোখলে আমার কাছ থেকে কথা নিয়েছেন যে একটা বছর আমি সারা দেশ ঘুরে-ঘুরে দেখব-শুনব-জানব। সেই শিক্ষানবিশি যদ্দিন চালু থাকবে ততদিন দেশের ও দশের প্রসঙ্গে আমি কোনো মতামত ব্যক্ত করব না। বছর ঘুরে গেলেও আমি মতামত প্রকাশের জন্য তড়িঘড়ি মুখ খুলব না। সুতরাং আমার মনে হয় না আগামী বছর-পাঁচেকের মধ্যে সত্যাগ্রহ শুরু করার কোনো প্রসঙ্গ আসবে।"

এই সূত্রে একটা কথা আমি বলতে পারি। *হিন্দ্ স্বরাজ অথবা ইন্ডিয়ান্ হোম রুল* বইয়ে আমি যেসব কথা লিখেছি, তার কিছু-কিছু কথা নিয়ে গোখলে হাসাহাসি করতেন, বলতেন : "একটা বছর দেশে কাটাবার পর দেখবে আপনা থেকে তোমার চিন্তাধারা শুধ্রে গেছে।"

৫. তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুর্ভোগ

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের টিকিট কেনার ব্যাপারেও কী নিদারুণ দুর্ভোগ ভুগতে হয়, বর্ধমান স্টেশনে তা টের পেলাম। টিকিট কেনার জানালার কাছে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে জবাব এল : থার্ড ক্লাস-এর টিকিট এমন সাততাড়াতাড়ি কাটা হয় না।

স্টেশনমাস্টার-এর দ্বারস্থ হওয়া গেল। সহজে তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। একজন দয়া ক'রে বাৎলে দিলেন কোথা দিয়ে কেমন ক'রে গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যেতে পারে। টিকিট কেনার ব্যাপারে আমাদের হ্যাঙ্গামের কথা তাঁকে বলাতে তিনিও ওই একই জবাব দিলেন : "থার্ড ক্লাস্-এর টিকিট এত আগেভাগে পাওয়া যাবে না।"

টিকিট বিকিকিনির জানালাটা খোলামাত্র আমি টিকিট কেনবার জন্য এগিয়ে গেলাম। কিন্তু টিকিট কেনা কি এতই সহজ ব্যাপার! খিড়কির কাছে গিয়ে দেখি সেখানে জোর যার মুলুক তার। যেসব যাত্রীদের চক্ষুলজ্জার বালাই ছিল না, অন্যদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে যাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তারা একের পর এক এসে আমায় একপ্রকার গায়ের জোরে ঠেলে দিতে লাগল। কাজেকাজেই প্রথম যে দঙ্গল খিড়কি খোলামাত্র টিকিট কিনতে ছুটে গিয়েছিল, আমি তাদের সকলের শেষে টিকিট হাতে পেলাম।

ট্রেন তো এল। কিন্তু কামরায় ঢুকতে পারা—সে আরেক ব্যাপার! কলকাতা থেকে যেসব যাত্রী ওই কামরায় গাদাগাদি ক'রে এসেছিল, তারা তো কিছুতেই নতুন যাত্রীদের ঢুকতে দেবে না। দুই দলে সে কী বাক্‌বিতণ্ডা, গালাগালি, ধাক্কাধাক্কি। আমরা ক-জন প্ল্যাটফর্ম-এর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটোছুটি করছি জায়গার খোঁজে। সর্বত্র সেই একই জবাব : "এ কামরায় তিলমাত্র জায়গা নেই। অন্য কামরা দেখুন।"

গার্ড সাহেবের শরণাপন্ন হওয়া গেল। তিনি বললেন : "অত হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করলে কোনো ফ্যায়দা হবে না। যে যেখানে পারেন ঠেলেঠুলে উঠে পড়ুন। তা না-হ'লে এরপরের ট্রেনটা ধরবেন।"

আমি বিনীতভাবে তাঁকে জানালাম : "কিন্তু সাহেব, আমার যে একটা জরুরি কাজ আছে। আজ তো না-গেলেই নয়।"

আমার অনুনয়ে কান দেবেন গার্ড সাহেবের তেমন সময়ই ছিল না। আমি ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গেলাম। মগনলালকে বললাম যেখানে খুশি উঠে পড়তে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আমি উঠে পড়লাম একটা ইন্টার ক্লাস কামরায়। আমরা কী করছি না-করছি গার্ড সাহেব একনজর দেখে নিলেন। ট্রেন আসানসোল স্টেশনে পৌঁছলে তিনি কামরায় এসে ঢুকলেন আমাদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া উসুল করতে। আমি তাঁকে বললাম : "যেসব যাত্রী টিকিট খরিদ করেছেন, তাঁদের জায়গা খুঁজে-পেতে দেওয়া আপনার কর্তব্য ছিল। আর কোথাও জায়গা না-পেয়ে আমরা এই কামরায় এসে উঠেছি। তৃতীয় শ্রেণীতে আমাদের জন্য জায়গা যদি ক'রে দিতে পারেন, আমরা খুশি হয়ে সেখানে উঠে যাব।"

গার্ড সাহেব বললেন, "দেখুন, বেশি বক্‌বক্‌ করবেন না। জায়গা আমি দিতে পারব না। হয় বাড়তি মাশুল দিন নয় তো কেটে পড়ুন।"

যে কোনো উপায়ে পুণা আমাকে পৌঁছতেই হবে। গার্ড সাহেবের সঙ্গে ঝগড়াঝামেলা বাঁধাতে তাই আমি চাইনি। তিনি পুণা পর্যন্ত বাড়তি ভাড়া দাবি করলেন। আমি বৃথা বাক্যব্যয় না-ক'রে টাকাটা ফেলে দিলাম। এই অন্যায়-অবিচারে মনে-মনে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম।

মোগলসরাই আমরা পৌঁছলাম পরের দিন সকালবেলা। ইতিমধ্যে মগনলাল তৃতীয় শ্রেণীতে আমাদের জন্য একটা জায়গা ঠিক ক'রে রেখেছিল। ইন্টার ক্লাস কামরাটা ছেড়ে আমরা সেখানে উঠে গেলাম। টিকিট কলেক্টরকে সমস্ত ঘটনার কথা বললাম। মোগলসরাই স্টেশনে এসে আমরা যে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে এসেছি, সেই মর্মে তাঁর কাছ থেকে একটি সার্টিফিকেট্‌ চাইলাম। তিনি সার্টিফিকেট্‌ দিতে নারাজ হলেন। প্রতিকারের জন্য শেষ-পর্যন্ত আমি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করি। জবাবে তাঁরা জানান :

"সার্টিফিকেট্‌ যোগ করতে না-পারলে বাড়তি মাশুল ফেরৎ দেওয়া আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ। তবে আপনার ক্ষেত্রে নিয়মের অন্যথা করা গেল। কিন্তু বর্ধমান থেকে মোগলসরাই পর্যন্ত যে বাড়তি পয়সা আপনার দেয়, সে টাকা ফেরৎ দেওয়া গেল না।"

এরপরেও আমার বহুবার তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে হয়েছে। সে বিষয়ে অভিজ্ঞতাও জমেছে প্রচুর। সব কথা যদি লিখে ফেলি, মস্ত একটা বই হয়ে যাবে। কিন্তু আমার এই জীবনকথায় সেইসব ঘটনার দু-চারটেমাত্র প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি, তার বেশি নয়। শরীর অপটু হবার ফলে আমাকে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত বাধ্য হয়ে বন্ধ করতে হয়েছে। এ নিয়ে তখনো আমার মনে যেমন গভীর আক্ষেপ ছিল, আজও তেমনি।

মূলত রেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় ও অবিচারের ফলেই যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুর্ভোগ সইতে হয়, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু যাত্রীদের নিজেদের মধ্যে সৌজন্যের অভাব, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি-সম্মত অভ্যাসের অভাব, স্বার্থপরতা ও অজ্ঞতা এই দুর্ভোগের জন্য যে অনেক অংশে দায়ী, সে কথাটাই-বা অস্বীকার করি কীভাবে? খুবই দুঃখ হয়, যখন দেখি যাত্রীরা নিজেরাও জানে না তাদের আচরণে গলদ কোথায়। কোথায় তারা রূঢ় ও স্বার্থপর এবং তাদের নোংরামো কোথায়, সেই বোধটুকুও অনেকসময় তাদের থাকে না। তারা ভাবে যা-কিছু তারা করে, সেই করাটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় এইসব সাধারণ মানুষের প্রতি উদাসীন ও তাদের কথা একেবারেই ভাবে না ব'লে, এইরকমটা ঘ'টে থাকে ব'লে আমার বিশ্বাস। আসল গলদ সেইখানে।

কল্যাণে যখন আমরা পৌঁছলাম, আমাদের সমস্ত দেহ-মন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। স্টেশনের কল থেকে একটু জল সংগ্রহ ক'রে মগনলাল ও আমি স্নান সেরে নিলাম। আমার স্ত্রীর স্নানের কীপ্রকার ব্যবস্থা করা যায়, সেই কথা ভাবছি এমনসময় আমাদের চিনতে পেরে সার্ভেন্টস্‌ অব ইন্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম সদস্য কৌল আমাদের কাছে এলেন। তিনিও পুণা অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন স্নানের জন্য আমার স্ত্রীকে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর

বাথরুমে নিয়ে যাবেন। তাঁর এই সৌজন্যসুলভ প্রস্তাব গ্রহণ করতে আমার ইতস্তত বোধ হচ্ছিল। আমি জানতাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর বাথরুমে স্নানাদির সুযোগ নেবেন, তেমন অধিকার আমার স্ত্রীর ছিল না। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি এই অনুচিত কর্মে সায় দিই। ওই বাথরুম ব্যবহারে আমার স্ত্রীর যে খুব বেশি আগ্রহ ছিল, তেমন নয়। সত্যের প্রতি আমার যতটা-না টান, তার চাইতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর টান যেন বেশি প্রবল হ'ল। সেইজন্যই উপনিষদ্ বলেছেন মায়ার হিরন্ময় পাত্র দিয়ে সত্যের মুখখানি আবৃত ও আচ্ছন্ন থাকে।

৬. চাওয়া-পাওয়া

পুণায় পৌঁছে শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পন্ন হয়ে যাবার পর, আমরা আলোচনা করতে বসলাম, অতঃপর সোসাইটির কাজ কীভাবে চলবে এবং আমি সদস্যরূপে সোসাইটিতে যোগ দেব কি-না। এই আলোচনা চালাতে গিয়ে আমায় খুবই সতর্ক থাকতে হয়। গোখলের জীবৎকালে সদস্যরূপে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য আমার আবেদন পেশ করবার কোনো প্রসঙ্গই ওঠেনি। তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ মেনে চলাটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হ'ত এবং সে আমি খুশি মনেই মেনে নিয়ে চলতাম। ভারতে জনসেবার ক্ষেত্র তখন ছিল আমার কাছে ঝটিকাক্ষুব্ধ দুস্তর পারাবার-বিশেষ। এই তুফানে পাড়ি জমাতে গেলে আমার প্রয়োজন ছিল একজন সুযোগ্য কর্ণধারের। গোখলেকে আমি পেয়েছিলাম এইরকম একজন কাণ্ডারীরূপে এবং তাঁর আওতায় থেকে আমি বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভয় ছিলাম। এখন তিনি চ'লে গেছেন, এখন আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। বুঝতে পারলাম, এবার সদস্য হিসেবে প্রবেশলাভের জন্য আমার চেষ্টিত হওয়া কর্তব্য। বুঝলাম, তা যদি আমি করি, গোখলের পরলোকগত আত্মা তৃপ্ত হয়। সুতরাং সঙ্কোচ পরিহার ক'রে, সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে, আমি অন্য সদস্যদের চিত্ত জয় করার কাজে উঠে-প'ড়ে লাগলাম।

সেইসময়ে সোসাইটির অধিকাংশ সদস্যই পুণায়। আত্মসমর্থনে আমি তাঁদের কাছে নিজের হয়ে ওকালতি করতে লাগলাম। আমার সম্বন্ধে তাঁদের মনে যেসব দ্বিধা-সন্দেহ-আশঙ্কা, সেগুলি দূর করার জন্য যত্নবান্ হলাম। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল, আমার বিষয়ে সদস্যেরা একমত নন। একদল আমার সদস্যশ্রেণীভুক্ত হবার অনুকূলে মত দিলেন। অন্যদল সেই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরুদ্ধতা করলেন। আমি জানতাম, উভয়পক্ষই আমার প্রতি সমানভাবে স্নেহাসক্ত ছিলেন। কিন্তু সম্ভবত সোসাইটির প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল গভীরতর, অন্ততপক্ষে আমার প্রতি তাঁদের টানের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। কাজেকাজেই আমাদের সমস্ত আলোচনার মধ্যে কোনো তিক্ততা ছিল না, কথাবার্তা যা-কিছু হয়েছিল সমস্তই নিছক নীতি নিয়ে। যাঁরা আমার বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের ধারণায় অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ে তাঁদের মতামতের সঙ্গে আমার মতামতের ছিল জমিন-আসমান ফারাক্। সুতরাং তাঁদের আশঙ্কা হয়েছিল আমি যদি সদস্যশ্রেণী-ভুক্ত হই তাহলে যেসব

উদ্দেশ্য নিয়ে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত, সেইসব উদ্দেশ্যগুলি সমূলে বিপর্যস্ত হতে পারে। সেরকম একটা সম্ভাবনা স্বভাবতই তাঁদের কাছে দুঃসহ ব'লে মনে হয়ে থাকবে।

অনেক আলাপ-আলোচনার পর আমাদের সভাভঙ্গ হয় এবং স্থির হয় যে চরম সিদ্ধান্ত কয়েকদিন পরে নেওয়া হবে।

বাসস্থানে ফেরবার পথে নানা প্রশ্ন আমার মনে তোলপাড় করতে থাকে। অধিকাংশের ভোটের জোরে সদস্য হওয়া কি আমার পক্ষে সাজে? তেমন যদি হয়, তাহলে গোখলের প্রতি আমার যে আনুগত্য, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য যথাযথভাবে রক্ষিত হবে কি? পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আমাকে সদস্য ক'রে নেওয়া বিষয়ে সোসাইটির মধ্যেই যখন এমন তীব্র মতভেদ, আমার উচিত আবেদনপত্র তুলে নেওয়া। তাহলে বিরোধীপক্ষ একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। সোসাইটি তথা গোখলের প্রতি এইভাবেই আমার আনুগত্য যথার্থভাবে দেখানো যেতে পারে। একমুহূর্তের ঝলকে আমি মনঃস্থির ক'রে ফেললাম এবং তদ্দণ্ডেই শাস্ত্রীমশায়কে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালাম, আমায় সদস্য হিসাবে মনোনয়ন করার সেই স্থগিত সভা তিনি যেন আদৌ না-ডাকেন। বিরোধীপক্ষ আমার এই সঙ্কল্পে বিশেষ প্রীতিলাভ করলেন। একটা অস্বস্তির হাত থেকে তাঁরা বেঁচে গেলেন। তাদের সঙ্গে আমার সৌহার্দ আরো যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। সদস্য হবার আয়োজনটা ফিরিয়ে নেবার ফলে আমি যেন সত্য-সত্য সোসাইটির সদস্য হয়ে গেলাম।

পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য না-হয়ে আমি সমীচীন কাজই করেছিলাম। যাঁরা আমার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরাও সঙ্গত কাজই করেছিলেন। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি, নৈতিক প্রশ্নে তাঁদের ও আমার মত ও পথের মধ্যে তফাৎ ছিল বিস্তর। মতভেদ আছে ব'লে তাঁদের কাছ থেকে আমি যে দূরে স'রে গেছি কিংবা আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে কোনো তিক্ততার সঞ্চার হয়েছে—এমনটা কিন্তু ঘটেনি। আজও আমরা ভাই-ভাই। সোসাইটির পুণা কেন্দ্র চিরকাল আমার কাছে তীর্থস্থান র'য়ে গেছে।

খাতাপত্রে আমি সোসাইটির সদস্য হইনি, কিন্তু অন্তরে-অন্তরে আমি চিরকাল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি। দৈহিক যোগ থেকে আত্মিক যোগ অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। যে দৈহিক যোগের সঙ্গে আত্মার কোনো যোগ নেই, সে সম্বন্ধ আত্মাবিহীন শরীরের সমান।

৭. কুম্ভমেলা

এরপর আমি রেঙ্গুন যাই ডক্টর মেহ্‌তার সঙ্গে দেখা করতে। বর্মা যাবার পথে কলকাতায় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে উঠি। বাঙালি-সুলভ অতিথিসেবার পরাকাষ্ঠা দেখেছিলাম তাঁর বাড়িতে। তখনকার দিনে আমি ছিলাম ঘোরতরভাবে ফলাহারী। কলকাতার বাজারে যতরকমের ফল ও মেওয়া পাওয়া যেত, সবরকম আমার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। বাড়ির

মেয়েরা সারারাত ধ'রে আমার জন্য বাদামপেস্তা-জাতীয় খাদ্যের খোসা ছাড়িয়ে তৈরি ক'রে রাখতেন। দিশি কায়দায় পরিপাটি ক'রে কেটে-ধুয়ে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে টাট্‌কা ফল আমার পাতে পরিবেশন করা হ'ত। আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের জন্য নানারকম উপাদেয় সব খাবারদাবার তৈরি হ'ত। তাঁদের মধ্যে আমার ছেলে রামদাসও ছিলেন। এঁদের অতিথিসেবার আন্তরিকতায় আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু দু-তিনজন অতিথির জন্য বাড়ি-সুদ্ধ লোক শশব্যস্ত থাকবেন—এতে আমার খুবই অস্বস্তি বোধ হ'ত। কিন্তু তাঁদের সমাদরের অত্যাচার থেকে কী ক'রে যে রেহাই পাওয়া যায়, সে রাস্তাটুকু আমার জানা ছিল না।

রেঙ্গুনের জাহাজে আমি ছিলাম ডেক্ প্যাসেঞ্জার। বসু মশায়ের বাড়িতে সমাদরের আতিশয্যে বিব্রত বোধ করতাম। জাহাজে আমাদের কপালে জুটেছিল অনাদরের আতিশয্য। যেসব মামুলি সুখসুবিধা না-থাকলে জীবন অতিষ্ঠ হয়, জাহাজের ডেক্ প্যাসেঞ্জারদের ভাগ্যে সেটুকুও ছিল না। নামেমাত্র স্নানের ঘর ব'লে যে জায়গাটা ছিল, সে ছিল অসহ্য নোংরা। পায়খানাগুলি ছিল নরককুণ্ড-বিশেষ। মলমূত্র মাড়িয়ে বা ডিঙিয়ে না-গেলে সেখানে পৌঁছনো যেত না।

রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এরকম দুরবস্থা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। জাহাজের চীফ্ অফিসার-এর শরণ নিয়েও কোনো ফল হ'ল না। একেই নোংরা ও দুর্গন্ধের অবধি ছিল না। উপরন্তু অবিবেচক সহযাত্রীদের অভ্যাসদোষে নোংরামি চরমে উঠেছিল। যেখানে-সেখানে তারা থুথু ফেলে, সারা ডেক্ জুড়ে পানের পিক, বিড়ির টুক্‌রো ও এঁটোকাঁটার জঞ্জাল। আর হৈ-চৈ গোলমালের তো অন্ত নেই। প্রত্যেকটি লোক ডেক্-এর কতটা জায়গা জবরদখল, করা চলে, তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। নিজেদের জন্য যতটা জায়গা দরকার, তার চেয়ে বেশি জায়গা দখল করছিল তাদের লটবহরের জন্য। এইভাবে দুটোদিন আমাদের খুবই কষ্টে কাটাতে হ'ল।

রেঙ্গুন পৌঁছে আমি জাহাজ কোম্পানির এজেন্টকে আনুপূর্বিক সমস্ত কথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখি। এই চিঠি লেখার ফলে এবং ডক্টর মেহ্‌তার চেষ্টায় ফিরতি-পথে ডেক্-এর যাত্রী হয়ে এলেও সে যাত্রাটা তেমন দুঃসহ মনে হয়নি।

রেঙ্গুনেও দেখা গেল আমার ফলাহারের দরুন গৃহকর্তার হয়রানি কিছু কম হ'ল না। তবে আমি ছিলাম বলতে গেলে ডক্টর মেহ্‌তার ঘরের লোক। সুতরাং তাঁর ওখানে আহার্য-তালিকার আধিক্য থেকে কাটছাঁট করতে আমায় ততটা বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু ফল কতরকম খেতে পারি, সে সম্বন্ধে তখনো কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না ব'লে, বাজার থেকে যখন নানাধরনের ফল আসত, চোখের খিদে ও জিভের খিদে প্রবল থাকায় বাস্তবপক্ষে লোভ সংবরণ করতে পারতাম না। খাওয়াদাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। আমি নিজে তো চাইতাম, দিনের শেষ আহারটা রাত পড়বার আগেভাগে খেয়ে ফেলি। কিন্তু কোনোদিনই রাত আট-নয়টার আগে শেষ খাওয়াটা সেরে ফেলা যেত না।

হরিদ্বারে প্রতি বারো বছর অন্তর-অন্তর কুম্ভমেলা হয়। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে কুম্ভমেলার

সেইরকম একটা যোগ পড়েছিল। মেলায় যোগ দেবার জন্য আমার বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। তবে গুরুকুলে মহাত্মা মুন্সীরামজীর দর্শন পাবার জন্য আমার আগ্রহ ছিল প্রবল। গোখলের সোসাইটি থেকে বড়ো একটি সেবাদলকে পাঠানো হয়েছিল কুম্ভমেলায় কাজ করতে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ছিলেন সেই সেবাদলের নেতা এবং ডক্টর দেব ছিলেন মেডিকেল অফিসার। সেই সেবাদলের কাজে যোগ দেবার জন্য ফিনিক্স্-পরিবারের হয়ে আমার কাছে একটা আমন্ত্রণ এসেছিল। আমার আগেই ফিনিক্স্-দলকে নিয়ে মগনলাল গান্ধী হরিদ্বার চ'লে গিয়েছিলেন। রেঙ্গুন ছেড়ে আমি সেই দলের সঙ্গে যোগ দিই।

কলকাতা থেকে হরিদ্বার অবধি রেলযাত্রায় আমার খুবই হয়রানি হয়েছিল। রাতে অনেকসময় গাড়িতে আলো পর্যন্ত জ্বলছিল না। সাহারানপুর থেকে তো যাত্রীদের জন্য এমনসব গাড়ি বরাদ্দ করা হ'ল, যে-গাড়িতে মাল যায়, গোরু মোষ যায়। আর সে কী গাদাগাদি ভিড়। মাথার ওপর ছাদ নেই। দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর সোজা মাথার ওপর অগ্নি-বর্ষণ করত। পায়ের তলায় লোহার পাতের মেঝে, পা উঠত তেতে-পুড়ে। মনে হ'ত, আমাদের যেন তন্দুরিতে ফেলে রুটিসেঁকা করছে। ওই অবস্থাতেও দেখা গেল, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাবার দাখিল হ'লেও, গোঁড়া হিন্দুরা মুসলমানের হাত থেকে 'পানি' খেতে চাইত না, অপেক্ষা ক'রে থাকত যতক্ষণ-না পানিপাড়ে এসে 'হিন্দু' জল দিয়ে যেত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে এইসব হিন্দুরাই অসুখের সময়, ডাক্তারের ব্যবস্থামতো এমনসব ওষুধ গেলে যাতে মদ থাকে। গোমাংসের সুরুয়া খেতেও তারা তখন ওজর-আপত্তি তোলে না। খ্রিষ্টান কিংবা মুসলমান কম্পাউন্ডার যখন মিক্সচার্-এ ওষুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে তাদের হাতে তুলে দিত, তখন তো তারা বিনা-দ্বিধায়, জিজ্ঞাসাবাদ না-ক'রেই দাগ ধ'রে-ধ'রে ওষুধের সঙ্গে 'পানি'ও গেলে।

শান্তিনিকেতনে থাকতেই বুঝেছিলাম, ভারতে আমাদের বিশেষ কাজ হবে মেথর-ঝাড়ুদারের কাজ। একটি ধর্মশালার লাগাও জমিতে তাঁবু খাটিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পায়খানা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ডক্টর দেব তাঁবুর ধারে-কাছে কয়েকটি গর্ত খুড়িয়ে রেখেছিলেন। পয়সা দিয়ে মেথরদের এইসব গর্ত সাফ্ করানো হ'ত। পায়খানার তত্ত্ব-তদারকির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হ'ত মেথরদের মর্জি-মেজাজের ওপর। আমি দেখলাম, ফিনিক্স্-দলের কাজের ক্ষেত্র তো প্রস্তুত হয়েই রয়েছে। ডক্টর দেবকে আমি বললাম যে মলের ওপর মাটি চাপা দেওয়া কিংবা মল নিঃসারণের সমস্ত ব্যবস্থার ভার নিতে আমাদের দল রাজি। তিনি বেশ খুশি হয়েই আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। প্রস্তাবটা করেছিলাম আমি, কিন্তু আসল কাজের হেপাটা সামলাতে হয়েছিল মগনলাল গান্ধীকে। আমি তো একপ্রকার আমার নির্দিষ্ট তাঁবুতে ব'সে-ব'সেই দিন কাটিয়ে দিতাম। বহু পুণ্যার্থী আমার কাছে এসে জুটত, আমার দর্শনলাভের জন্য কিংবা আমার সঙ্গে ধর্ম ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করার জন্য। এর ফলে একটি মুহূর্তের জন্য আমার অবসর বলতে কিছু ছিল না। স্নানের ঘাটেও দর্শনার্থীরা আমার পিছু নিত। খেতে বসেছি, তখনো তাদের চোখ এড়াবার উপায় ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি যৎসামান্য যতটুকু জনসেবার

কাজ করতে পেরেছিলাম, ভারতের সর্বত্র তার প্রভাব যে কত গভীর হয়ে পড়েছিল, তার একটা পরিচয় পেয়েছিলাম এই হরিদ্বারে।

বলা বাহুল্য, পরিস্থিতিটা আমার পক্ষে মোটেই প্রীতিকর ছিল না। মনে হ'ল, আমি যেন একটা জাঁতাকলে আট্‌কা প'ড়ে গেছি। যেখানে কেউ আমায় চেনে না, সেখানে ভারতের অগণিত জনসাধারণের সঙ্গে-সঙ্গে আমাকেও সেই তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করার মতো দুর্ভোগ সইতে হয়। যেখানে আমায় কেউ চিনে ফেলল, সেখানে সঙ্গে-সঙ্গে আমায় দর্শন-অভিলাষীদের শিকার ব'নে যেতে হয়। এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন্‌টি যে অধিকতর অনুকম্পার যোগ্য, অনেক ভেবেচিন্তেও আমি তার কূলকিনারা ক'রে উঠতে পারিনি। এইটুকু বলতে পারি যে দর্শনার্থীদের অন্ধ ভক্তি দেখে যতটা-না রাগ হ'ত তার চেয়ে অনেক বেশি হ'ত মনোবেদনা। তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করা আমার পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হ'লেও, স্বেচ্ছাবৃত দুর্ভোগের দরুন আমি মনে-মনে একটা উদ্দীপনা অনুভব করতাম, তা থেকে আমার রাগ বড়ো-একটা হ'ত না।

তখনকার দিনে এদিকে-ওদিকে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার মতো শক্তি ছিল আমার যথেষ্ট। আর কপালক্রমে তখন আমার বিষয়ে লোক-জানাজানির বহরটা কম ছিল ব'লে, আমি যদৃচ্ছা রাস্তাঘাটে বেরুলে খুব বেশি হ্যাঙ্গাম-হুজ্জত পোয়াতে হ'ত না। এইভাবে লোকের চোখ এড়িয়ে হরিদ্বারের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করেছিলাম, পুণ্যার্থীদের মধ্যে ধর্মভাবনা যতটা-না ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ভণ্ডামি, নোংরামি ও চিত্তচাঞ্চল্য। চারিদিক থেকে পিলপিল ক'রে যেসব সাধুর দল সেখানে জমায়েত হয়েছিল, তাদের দেখে মনে হয়েছিল যেন উপাদেয় সব বস্তু উপভোগ করবার জন্য তাদের জন্ম।

এইখানে আমি পাঁচ পা-ওয়ালা একটি গোরু দেখি। দেখে প্রথম-প্রথম খুব আশ্চর্য ঠেকেছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ লোকেরা অনতিবিলম্বে আমার বিস্ময় ভেঙে দেয়। তাঁদের কাছ থেকে জানতে পেলাম যে এই পাঁচ-পেয়ে গোরুটি দুষ্ট মালিকের লোকঠকানোর কারসাজি, তার লোভের শিকার। জলজ্যান্ত কোনো বাছুরের একটা পা কেটে, সেই পা এই গোরুর কাঁধে সেলাই ক'রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই দুনো কসাইপনার লক্ষ্য হ'ল নীরেট লোকেদের ঠকিয়ে পয়সা কামানো। এমন কোন্ হিন্দু আছে পাঁচপেয়ে গোরু দেখে যে না-অবাক্ হবে। ভগবানের এই আজব সৃষ্টি দেখে ভক্তিতে গদগদ হয়ে পয়সা না-ঢালবে সে লোককে কি হিন্দু বলা যায়?

কুম্ভমেলার দিন এসে গেল। আমার জীবনপঞ্জিতে সেদিনটা উৎসবের দিন ব'লে চিহ্নিত হয়ে আছে। আমি পুণ্য অর্জনের আশায় হরিদ্বার যাইনি। পুণ্য সঞ্চয় করার লোভে তীর্থে-তীর্থে ধরনা দেবার মোহ আমার নেই। আমার কেবল মনে হ'ল, কুম্ভমেলায় যোগদানের জন্য যে সতেরো লক্ষ লোক সমাগত হয়েছে ব'লে প্রকাশ, তাদের সবাই ভণ্ড কিংবা হুজুগপ্রিয় হতে পারে না। তারা সবাই নিশ্চয় নিছক তামাসা দেখবার লোভে আসেনি। তাদের মধ্যে এমন অনেকে নিশ্চয় এসে থাকবে যারা কেবলমাত্র পুণ্য হবার আগ্রহে, শুদ্ধ হবার আগ্রহে, এসে থাকবে। এইধরনের শ্রদ্ধা বা ধর্মবিশ্বাস, মানুষের আত্মাকে উন্নত করতে

পারে কি-না এবং পারলেও সে কতখানি, সে বিষয়ে নিশ্চিত-কিছু বলতে যাওয়া কেবল শক্ত নয়, হয়তো অসম্ভবও।

তাই, গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আমার সমস্ত রাতটা বিনিদ্র কাটল। চতুর্দিকে ভণ্ডামি দিয়ে পরিবৃত থাকলেও, এইসব যাত্রীদের মধ্যেই আছেন সেইসব পবিত্র আত্মা, যাঁরা একদিন পাপবিমুক্ত হয়ে ভগবৎ-সন্নিধানে দাঁড়াবেন। যদি তীর্থযাত্রায় হরিদ্বারে আসাটাই পাপ বা অন্যায় ব'লে মনে ক'রে থাকি, তাহলে প্রকাশ্যে তীর্থযাত্রার বিরুদ্ধতা করতে হ'ত এবং তার জের টেনে কুম্ভের যোগ লাগবার সঙ্গে-সঙ্গে হরিদ্বার ছেড়ে আমায় চ'লে যেতে হ'ত। আর যদি তীর্থযাত্রায় হরিদ্বারে আসা ও কুম্ভমেলায় যোগদান করাটা পাপ বা অন্যায় না-হয়, তাহলে ধর্মের নামে হরিদ্বারে যেসব অনাচার চলছে, তারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কোনো আত্মোৎসর্গের কর্ম ক'রে আমার নিজেকেও শুদ্ধ ক'রে নিতে হয়। ব্রত ও সঙ্কল্পের ওপর নিজের জীবনকে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি ব'লে, আমার পক্ষে এরকম চিন্তাভাবনা অস্বাভাবিক ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল কলকাতায় ও রেঙ্গুনে আমায় আপ্যায়ন করার জন্য আতিথ্যপরায়ণ গৃহস্বামীরা কতভাবে অকারণে হয়রান হয়েছেন। তাঁদের এইসব হয়রানির পরোক্ষ কারণ আমি স্বয়ং। তাই আমি মনঃস্থির করলাম যে দৈনিক আহার্যের সংখ্যা আমি বেঁচে নেব এবং দিনের শেষে খাওয়াটা আমি সূর্যাস্তের আগেই সেরে নেব। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, নিজেকে যদি এভাবে বিধিনিষেধের ডোরে বাঁধতে না-পারি, তাহলে ভবিষ্যতেও আমি অন্য গৃহস্বামীদের প্রচুর অসুবিধার মধ্যে ফেলব। তাহলে কোথায় আমি নিজেই লোকের সেবায় নিযুক্ত থাকব, না লোকেদেরই বরঞ্চ নিযুক্ত রাখব আমার নিজের সেবায়। সুতরাং আমি সঙ্কল্প নিলাম যে ভারতে যতদিন থাকি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচটি পদের বেশি খাব না এবং সন্ধ্যার পর কিছুতেই খাব না। এই সঙ্কল্পসাধনে আমায় যেসব অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়াতে হতে পারে, সেসব অসুবিধার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার ক'রে দেখলাম। আমার ব্রতপালন যাতে নিশ্ছিদ্র হয়, সেদিকে আমার খেয়াল ছিল তীক্ষ্ণ। রোগে-ব্যারামে যেসব ওষুধপত্রের বিধান দেওয়া হয়, সেগুলিকে পর্যন্ত যদি পাঁচ দফা খাদ্যবস্তুর অন্তর্গত ক'রে দেখা হয়, তাহলে কীপ্রকার সুবিধা-অসুবিধা ঘটতে পারে, সে বিষয়ে আমি মনে-মনে একটা পর্যালোচনা ক'রে নিলাম। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হ'ল যে রোগ হোক্, অসুখ হোক্, অন্যপ্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকলেও, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ দফার বেশি খাদ্যবস্তু কোনোক্রমেই গলাধঃকরণ করব না।

তেরো বছর হ'ল আমি এই ব্রত পালন ক'রে চলেছি। এর ফলে আমায় কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু ব্রত যেমন আমাকে যাচাই ক'রে নিয়েছে, আমিও তেমনি ব্রতকে ব্যবহার করেছি আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবে। অনেক ব্যাধির আক্রমণ প্রতিহত করেছে আমার এই ব্রত। এর ফলে আমার আয়ুরও কিছুটা বৃদ্ধি ঘটেছে। অন্তত্পক্ষে এই আমার বিশ্বাস।

৮. লছমনঝোলা

হরিদ্বার থেকে গুরুকুল গিয়ে বিশালবপু মহাত্মা মুন্সীরামের দর্শনলাভ ক'রে মনে-মনে ভারি একটা তৃপ্তি অনুভব করলাম। হরিদ্বারের প্রচুর হট্টগোল ও গুরুকুলের স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশের আকাশ-পাতাল তফাতটুকু মুহূর্তে যেন বোধগম্য হ'ল।

মহাত্মার অপরিসীম স্নেহ-ভালোবাসায় আমি অভিভূত বোধ করলাম। ব্রহ্মচারীরাও অতিথি-পরিচর্যায় তৎপর। এখানেই আচার্য রামদেবজীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাঁকে দেখামাত্র বোঝা গেল, কতখানি শক্তি ও ক্ষমতার তিনি অধিকারী। একাধিক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও, অল্পসময়ের মধ্যে আমাদের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

আচার্য রামদেবজী ও অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে গুরুকুলে শিক্ষার অঙ্গরূপে শ্রমশিল্প প্রবর্তনের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। গুরুকুল ছেড়ে চ'লে আসবার সময় বিচ্ছেদের বেদনা বুকে খুব বেজেছিল।

গঙ্গার ওপর দোদুল্যমান লছমনঝোলার বহু প্রশংসা শুনেছিলাম অনেকের মুখে। হৃষীকেশ থেকে এই সেতুর ব্যবধান হবে বেশ কয়েক মাইল। বন্ধুরা অনুরোধ করলেন, হরিদ্বার ছেড়ে যাবার আগে আমি যেন একবার লছমনঝোলা অবধি ঘুরে আসি। আমি স্থির করেছিলাম, অন্য তীর্থযাত্রীদের মতো এই পথটুকু আমি পায়ে হেঁটেই যাব। সুতরাং দুই দফায় আমায় এই পথ অতিক্রম করতে হয়।

হৃষীকেশে থাকতে কতিপয় সন্ন্যাসী আমার সাক্ষাতে এসেছিলেন। তাঁদের একজনের আমার প্রতি বিশেষ টান জন্মায়। ফিনিক্স্-এর দল ছিল আমার সঙ্গে। তাদের দেখে স্বামীজীর মনে বহুতর প্রশ্ন জাগে।

ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আমাদের দু-জনের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে ধর্মে আমার অনুরাগ গভীর। আমি গঙ্গাস্নান ক'রে যখন ফিরছি, আমার গায়ে জামা ছিল না, মাথায় টুপি ছিল না। আমার মাথায় টিকি নেই, গলায় পৈতে নেই দেখে স্বামীজী মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন : "হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হয়েও আপনি টিকি পৈতে ছাড়া চলাফেরা করেন দেখে আমার খুবই খারাপ লাগছে। এ দুটি হিন্দুত্বের প্রতীকচিহ্ন। তাবৎ হিন্দুর উচিত এই দুটি চিহ্ন ধারণ করা।"

এ দুটি চিহ্ন কেন আমি বর্জন করেছিলাম, তার একটা ইতিহাস আছে। যখন আমি বছর-দশেকের, ছোকরা ব্রাহ্মণ ছেলেদের গলায় পৈতের সঙ্গে বাঁধা চাবির গোছা দেখে আমার ভারি হিংসে হ'ত। খুব ইচ্ছা করত আমারও যেন পৈতের সঙ্গে চাবির গোছা বাঁধা থাকে। সেকালের কাথিয়াওয়াড়ে বৈশ্য পরিবারের মধ্যে উপবীত ধারণের বড়ো-একটা রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু সেসময় প্রথম তিন বর্ণের হিন্দুদের পৈতে পরা অবশ্যকর্তব্য ব'লে একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। ফলে গান্ধী-পরিবারের কেউ-কেউ উপবীতধারী হয়েছিল। যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত আমাদের দু-তিনজন ভাইকে রামরক্ষার শ্লোক মুখস্থ করাতেন,

তাঁরই হাতে আমাদের পৈতে হয়। যদিচ আমার চাবির গোছা থাকার কোনো হেতুই ছিল না, আমি যেন কোত্থেকে একগোছা চাবি জোগাড় ক'রে পৈতের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলাম। কিছুকাল পরে পৈতে যখন ছিঁড়ে যায়, মনেও পড়ে না তার অভাবে আমি কাতর হয়েছিলাম ব'লে। কেবল এইটুকুই মনে আছে যে নতুন পৈতে আমি ধারণ করিনি।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার হিতকামীরা আবার আমায় পৈতে ধরাবার জন্য বারকয়েক চেষ্টাচরিত্র করেছিলেন। তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। তাঁদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে গিয়ে আমি বলতাম যে শূদ্রেরা যদি পৈতে পরতে না-পায়, তাহলে কোন্ অধিকারে অন্য বর্ণের লোকেরা পৈতে পরবে? আমার ধারণায় যে প্রথাটার কোনো প্রয়োজন নেই, সেই প্রথা পুনরায় চালু করার সপক্ষে কোনো সুযুক্তি আমি খুঁজে পাইনি। পৈতা ব'লে পৈতার প্রতি আমার কোনো বিরূপতা ছিল না। কিন্তু কেন পৈতা পরব তার কোনো সঠিক কারণ আমার জানা ছিল না।

বৈষ্ণব ব'লে আমার গলায় আমি কণ্ঠি ধারণ করতাম। গুরুজনেরা মনে করতেন টিকি রাখা আবশ্যিক, তাই মাথায় আমার টিকিও একটা ছিল। বিলেত যাবার অল্পকিছুদিন আগে টিকি আমি বাদ দিয়েছিলাম। টুপি খুললে খোলা মাথায় টিকি দেখে সাহেবরা আমায় নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে, বর্বর মনে করবে, আমার মনে তখন সেরকম একটা আশঙ্কা ছিল। এই কাপুরুষোচিত ভয় আমায় এমন পেয়ে বসেছিল যে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে আমার ভাইপো ছগনলালকে আমি তার টিকি কেটে ফেলতে বাধ্য করি। সে যে তার ধর্মবিশ্বাস-মোতাবেক টিকি রেখেছিল, টিকি কেটে ফেলতে বললে সে যে মনে বেদনা অনুভব করতে পারে—এইসব কথা বিবেচনা না-ক'রেই তাকে দিয়ে একপ্রকার জোর ক'রেই এ কাজ করাই। আমার ভয় হয়েছিল যে টিকি থাকলে ছগনলালের জনসেবার কাজে বিঘ্ন হতে পারে।

আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা স্বামীজীর কাছে বিবৃত ক'রে বলেছিলাম : পৈতে আমি পরব না। শত-শত হিন্দু যখন পৈতে না-প'রেও হিন্দু ব'লে গণ্য হয়, পৈতে পরার কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না। তাছাড়া, পৈতে হ'ল দ্বিজত্বের প্রতীক। যিনি উপবীত ধারণ করবেন, তিনি শুচি হবেন, সাত্ত্বিক হবেন, আত্মিক-জীবনে উন্নতিসাধনের জন্য যত্নবান্ হবেন—এইরকম একটা সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায়। কিন্তু ভারত ও হিন্দু সমাজের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থায়, এইরকম মহান, তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক ধারণের অধিকার কোনো হিন্দুর আছে কি-না, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ। অস্পৃশ্যতার পাপ থেকে হিন্দু-ধর্ম যখন মুক্ত হবে, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ দূর হবে, যেসব পাপ ও মিথ্যাচারে আজ হিন্দু-সমাজ বিপর্যস্ত, সেগুলি যখন নির্মূল হবে, একমাত্র তখনই পৈতে নেবার অধিকার আমরা ফিরে পাব। তাই উপবীত গ্রহণের ব্যাপারে আমার মন বেঁকে বসে। তবে টিকি রাখার ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন, তা নিঃসন্দেহে ভেবে দেখার মতো। একদিন টিকি আমার ছিল, মিথ্যা চক্ষুলজ্জার খাতিরে তা আমি বর্জন করেছি। এখন মনে হচ্ছে, আবার আমার টিকি রাখা উচিত। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ ক'রে দেখব।"

পৈতে নিয়ে আমি যা বলেছিলাম, স্বামীজীর তা মনঃপূত হয়েছিল ব'লে মনে হয়নি।

আমার ধারণা অনুসারে পৈতে ধারণের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি আমি দিয়েছিলাম, তাঁর ধারণায় সেইগুলিই ছিল পৈতে ধারণের সপক্ষে যুক্তি। কিন্তু পৈতের বিষয়ে হৃষীকেশে যে মতামত ব্যক্ত করেছিলাম, আজও আমি প্রায় সেইরকম কথাই হয়তো বলব। যতদিন পৃথিবীতে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম থাকবে, ততদিন প্রত্যেক ধর্মের বিশেষ-বিশেষ প্রতীকচিহ্নের প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে এই প্রতীক কুসংস্কারে পর্যবসিত হয়, এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার উপায়রূপে ব্যবহার করা হয়, তখন তা হয় বর্জনের যোগ্য। আমার মনে হয় না, আজকের দিনে উপবীত হিন্দুধর্মের উন্নতির সহায়ক। তাই আমি সে বিষয়ে আজও বীতরাগ।

যেহেতু ভয় ও চক্ষুলজ্জার খাতিরে কাপুরুষের মতো একদিন আমি টিকি বর্জন করেছিলাম, বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির করলাম, আবার টিকি গজাতে হবে।

এবার লছমনঝোলার কথায় ফিরে যাওয়া যাক্। হৃষীকেশ ও লছমনঝোলার নিসর্গ শোভা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। পূর্বজদের প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে আমার মাথা আপনা থেকে নত হ'ল। প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যসন্ধানে তাঁরা যে কেবল পটু ছিলেন এমন নয়, পরন্তু বহিঃপ্রকৃতিতে সুন্দরের প্রকাশকে ধর্মভাবের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাঁরা বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁরা আমাদের নমস্য।

কিন্তু এইসব রমণীয় স্থান মানুষ যে কীভাবে অপব্যবহার করে, তাই দেখে আমার মনে শান্তি ছিল না। হরিদ্বারের মতো হৃষীকেশেও লোকে পথের দুই ধার ও গঙ্গার তীর কী বিশ্রীভাবে নোংরা করে। গঙ্গার পবিত্র জল দূষিত করতেও তাদের বাধে না। মানুষের যাওয়া-আসার রাস্তায়, কিংবা নদীর ধারে-ধারে লোকে মলমূত্র ত্যাগ করছে দেখে, আমার সমস্ত মন যন্ত্রণায় বিষিয়ে গিয়েছিল। অথচ দু-পা এগিয়ে গেলেই তো লোকালয়ের বাইরে নিরিবিলি জায়গায় সহজেই তারা বসতে পারত।

দেখা গেল, লছমনঝোলা আর-কিছু নয়, গঙ্গানদীর ওপর লোহার তৈরি ঝোলানো সেতুমাত্র। লোকমুখে শুনলাম, আগে সেখানে ছিল সুন্দর একটি দড়ির তৈরি সাঁকো। কিন্তু কোনো দানবীর মারোয়াড়ির মাথায় কী এক খেয়াল গজাল! তিনি দড়ির সেই ঝোলাটিকে ফেলে দিয়ে সেই জায়গাতেই তৈরি করলেন বিপুল অর্থব্যয়ে লোহার একটি পুল। অতঃপর তিনি সেই পুলের চাবিটি সরকার-বাহাদুরের হাতে স'পে দেন। দড়ির সাঁকো আমি চোখেও দেখিনি, সুতরাং সে বিষয়ে আমার কিছু বলা সাজে না। কিন্তু এটুকু স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, প্রকৃতির সেই পরিবেশে লোহার পুলটা একেবারে বেমানান এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপহারক। তীর্থযাত্রীদের এই সেতুর চাবি সরকার-বাহাদুরের হাতে ন্যস্ত করাটা, আমার কাছে একেবারে অসহ্য ব'লে মনে হয়েছিল, যদিচ তখনকার দিনে আমি একজন রীতিমতো রাজভক্ত প্রজা ছিলাম।

পুল পেরিয়ে নদীর অপরতীরে স্বর্গাশ্রম। নামটা শুনতে বেশ, কিন্তু আসলে খুবই বিতিকিচ্ছিরি জায়গা। টিন দিয়ে ছাওয়া কয়েকটি নোংরা চেহারার ঘরবাড়ির বস্তিমাত্র। শুনলাম, এসব ঘর তৈরি হয়েছে সাধকদের জন্য। আমি যেসময় যাই, তখন এসব ঘরে

বড়ো-একটা কেউ ছিল ব'লে মনে পড়ছে না। মূল বাড়িটায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দেখে খুব-যে ভালো লেগেছিল ব'লে বলতে পারি না।

কিন্তু হরিদ্বারের অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে অমূল্য হয়েছিল। আমি যে কোন্ জায়গায় বসবাস করব, কী-কী কাজ করব—সেই বিষয়ে মোটামুটি মনঃস্থির আমি হরিদ্বারে থাকতেই করেছিলাম।

৯. আশ্রম প্রতিষ্ঠা

কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে তীর্থযাত্রায় যাবার আগেও একবার আমি হরিদ্বার গিয়েছিলাম।

সত্যাগ্রহ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মে তারিখে। শ্রদ্ধানন্দজীর ইচ্ছা ছিল, আমরা যেন হরিদ্বারে বসি। কলকাতায় আমার কতিপয় বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলেন বৈদ্যনাথধামে বসতে। আবার কেউ-কেউ রাজকোটের হয়ে জোর সুপারিশ করেছিলেন। আমেদাবাদ হয়ে যাবার পথে সেখানকার কয়েকজন বন্ধু আমেদাবাদে বসবার জন্য আমায় পীড়াপীড়ি ক'রে বলেছিলেন যে আশ্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় খরচপত্র তাঁরা সংগ্রহ ক'রে দেবেন, বসবাসের জন্য একটি বাড়িও ঠিক ক'রে দেবেন।

আমেদাবাদের প্রতি আমার নিজেরও একটা পক্ষপাতিত্ব ছিল। আমি নিজে গুজরাটি ব'লে আমার ধারণা হয়েছিল যে গুজরাতি ভাষার মাধ্যমেই দেশের সেবা আমি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারব। এককালে আমেদাবাদ ছিল হাতে-চালানো তাঁত শিল্পের কেন্দ্র। তাই মনে হয়েছিল, চরকায় সুতো কাটার মতো একটি কুটীরশিল্প প্রচলনের দিক থেকে আমেদাবাদ হয়তো অনুকূল ক্ষেত্র হতে পারে। তাছাড়া আমেদাবাদ হ'ল গুজরাটের রাজধানী। অন্য জায়গার তুলনায় এই শহরের ধনী লোকদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য লাভ করা হয়তো সহজতর হবে।

আমেদাবাদের বন্ধু-ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অস্পৃশ্যতার প্রসঙ্গ আপনা থেকেই এসে পড়ে। আমি তাঁদের স্পষ্টাস্পষ্টি বলি যে আশ্রমে প্রবেশলাভের জন্য উপযুক্ত কোনো যদি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোক পাই, তাহলে প্রথম সুযোগেই তাকে আমি ভর্তি ক'রে নেব।

নিজেকে চোখঠারানোভাবে জনৈক বৈষ্ণব বন্ধু তখন বলেছিলেন, "আপনি যেমনটি চান তেমন অচ্ছুৎ পাওয়া কি চারটিখানি কথা?"

শেষপর্যন্ত আমি স্থির করলাম, আমেদাবাদেই আমি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করব। বসবাসের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়তা পেয়েছিলাম আমেদাবাদের ব্যারিস্টর জীবনলাল দেশাইয়ের কাছ থেকে। তিনি কোচরাব-এ স্থিত তাঁর বাংলো বাড়ি আমাদের ভাড়া দিতে চাইলেন। আমরাও তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম।

গোড়াতেই আমাদের স্থির করতে হ'ল, আশ্রমের কী নাম দেওয়া যায়। বন্ধু-ব্যক্তিদের

মতামত জানতে চাইলাম। সেবাশ্রম, তপোবন প্রভৃতি নাম প্রস্তাবিত হ'ল। সেবাশ্রম নামটা আমার মনে ধরেছিল, বুঝতে পেরেছি,কিন্তু কেমন সেবা ও কোন্ প্রণালীতে সেবা—নামে সেটা নির্দিষ্ট ছিল না। তপোবন নামটা একটু যেন আত্মম্ভরী গোছের ব'লে মনে হ'ল। তপশ্চর্যা আমাদের কাছে যতই ভালো লাগুক্-না কেন, আমরা তো আসলে নিজেদের তপস্বী ব'লে দাবি করতে পারি না। সত্যনিষ্ঠাকে আমরা ধর্ম ব'লে মেনে নিয়েছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিল সত্যের সন্ধান করা ও সর্ব বিষয়ে সত্যকে সবলে অবলম্বন ক'রে থাকা। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি যে পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলাম, আমি চেয়েছিলাম তার সঙ্গে দেশের লোক যেন পরিচিত হয়। দেশে আমার সেই পদ্ধতি কতখানি কার্যকর হতে পারে—সেটাও আমি পরীক্ষা ক'রে দেখতে চেয়েছিলাম। সেইদিকে লক্ষ রেখে আমি ও আমার সহচরেরা স্থির করি যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম দেব সত্যাগ্রহ আশ্রম। ওই একটি নামে আমাদের লক্ষ্যবস্তু ও সেখানে পৌঁছবার পদ্ধতি—এই উভয় বিষয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আশ্রম পরিচালনার জন্য পালনীয় বিধিব্যবস্থার একপ্রস্থ নিয়মাবলী প্রণয়ন করা প্রয়োজন হবে ব'লে মনে হ'ল। এরকম নিয়মাবলীর একটি খসড়া প্রস্তুত ক'রে, আমাদের বন্ধু ও হিতৈষীদের কাছে পাঠানো হ'ল ও তাদের মতামত চাওয়া হ'ল। এইভাবে পাওয়া নানান্ অভিমতের মধ্যে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামতের কথা এখনও আমার মনে আছে। নিয়মাবলী তাঁর মনঃপূত হয়েছিল। তিনি কেবল বলেছিলেন যে যেহেতু দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনয় গুণের অভাবটুকু পরম পরিতাপের বিষয়, আশ্রমের পালনীয় কৃত্যের মধ্যে বিনয়ের চর্চার একটা বিশেষ স্থান থাকা উচিত। বিনয়ের অভাব আমি নিজেও লক্ষ করেছিলাম। কিন্তু আমার কেমন যেন আশঙ্কা হ'ল যে বিনয়-গুণ যদি ব্রতপালনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অস্তিত্বই লোপ পাবে। সত্যকার নম্রতা বা দীনভাবের অর্থ হ'ল অহমিকাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া। আত্মবিলুপ্তি ও মোক্ষলাভের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। মোক্ষলাভ পালনীয় ব্রতের অঙ্গ হতে পারে না। বরঞ্চ বলা চলে, নানারকম ব্রতপালন করলে মানুষ মোক্ষলাভের উপযুক্ত হয়। যে ব্যক্তি অপরের সেবা করতে চায় কিংবা মোক্ষলাভ করতে চায়, সে যদি নম্র নিরভিমান ও স্বার্থলেশহীন না-হয় তাহলে সে সত্যকার সেবক কিংবা মুমুক্ষু হতে পারে না। সেবার কাজে যদি নম্রতা না-থাকে, তাহলে কেবল স্বার্থবুদ্ধি ও অহংভাবের চরিতার্থতা ছাড়া আর-কিছু হতে পারে না।

সেসময় আমাদের দলে তামিল ছিলেন প্রায় তেরোজন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাঁচটি তামিল বালক তো আমাদের সঙ্গেই এসেছিল। অন্যেরা এসেছিল দেশের নানা অঞ্চল থেকে। সবাই মিলে স্ত্রী-পুরুষে আমরা ছিলাম প্রায় পঁচিশজন।

এইভাবে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হ'ল। একই হেঁসেলে আমরা খেতাম এবং একই পরিবারের লোকের মতো চলাফেরা করতে চেষ্টা করতাম।

১০. যাচাই

আশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ার কয়েকমাসের মধ্যেই আমাদের একটি অপ্রত্যাশিত পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। অমৃতলাল ঠক্কর চিঠি লিখে জানালেন যে একটি দীন দরিদ্র অথচ সৎস্বভাবের অচ্ছুৎ পরিবার আমাদের আশ্রমে এসে বসবাস করতে চান। আমরা কি তাঁদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি?

চিঠি পেয়ে আমি একটু দুর্ভাবনায় পড়লাম। ভাবতেও পারিনি যে আশ্রম স্থাপনার এত অল্পদিনের মধ্যে, ঠক্কর বাপার মতো প্রখ্যাত ব্যক্তির সুপারিশক্রমে একটি অন্ত্যজ পরিবার আমাদের আশ্রমে আশ্রয় নিতে চাইবেন। আমার সঙ্গী-সাথীদের ওই চিঠি দেখালাম। তাঁরা প্রস্তাব শুনে খুশি হলেন।

জবাবে আমি অমৃতলাল ঠক্করকে লিখে জানালাম যে, যদি পরিবারস্থ সকলে আশ্রমের নিয়মাবলি মেনে চলতে রাজি থাকেন তাহলে তাঁদেরকে আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

পরিবার বলতে দুদাভাই, তাঁর স্ত্রী দানীবেন এবং তাঁদের মেয়ে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী তখন সবেমাত্র হাঁটি-হাঁটি পা-পা করতে শুরু করেছে। দুদাভাই একসময় বোম্বাই শহরে মাস্টারি করতেন। আশ্রমের নিয়মাবলি তাঁরা মেনে চলবেন বলায় আমরা তাঁদের গ্রহণ করলাম।

যেসব মিত্রস্থানীয় ব্যক্তিরা আশ্রমের সহায়তা ও আনুকূল্য করছিলেন, এই অচ্ছুৎ পরিবারের আশ্রমে যোগ দেওয়ার খবর শুনে তাঁরা বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন। গোড়াতেই অসুবিধা ঘটল কুয়ো থেকে জল তোলার ব্যাপারে। কুয়োটা ছিল ভাগের, সুতরাং বাংলোর যিনি মালিক, তিনি তাঁর এক্তিয়ার-মাফিক জল তোলার ব্যাপারটা কিছু-পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। মালিকের যে লোক জল তোলার সরঞ্জামের ভারপ্রাপ্ত ছিল সে বাগড়া দিতে শুরু করল। আমরা বাল্‌তি দিয়ে যখন জল তুলতাম, সে লোকটি নানারকম ওজর-আপত্তি তুলত। বলতে লাগল, আমাদের বাল্‌তির জলের ছিটেফোঁটা লাগলেও নাকি তার শরীর অশুচি হয়ে যাবে। লোকটি আমাদের উদ্দেশ ক'রে প্রচুর গালিবর্ষণ করতে লাগল আর দুদাভাইয়ের ওপরে তো রীতিমতো অত্যাচার শুরু করল। আমি সবাইকে ব'লে দিলাম ও লোকটার গালাগাল কেউ যেন গায়ে না-মাখে এবং কুয়ো থেকে জল তুলতেও যেন কিছুতে না-ছাড়ে। গালাগালির বদলে আমরা গালাগাল দিলাম না দেখে লোকটা লজ্জা পেল ও আমাদের হেনস্তা করাও ছেড়ে দিল।

কিন্তু সবরকম অর্থসাহায্য বন্ধ হয়ে গেল। যে মিত্রটি সংশয় প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন যে আশ্রমের নিয়মাবলি পালন করার মতো অচ্ছুৎ ব্যক্তি পাওয়া হয়তো যাবে না, তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে সেরকম মানুষ কখনো এসে জুটতে পারে।

অর্থসাহায্য বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে গুজব রটল যে আমাদের না-কি সামাজিক দিক থেকেও একঘরে করবার কথা হচ্ছে। এমনটা ঘটতে পারে ব'লে আমরা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। সঙ্গী-সাথীদের আমি ব'লে রেখেছিলাম, আমাদের যদি একঘরে করা হয়, প্রয়োজনমতো সুখ-সুবিধা থেকে যদি আমাদের বঞ্চিত করাও হয়, আমরা আমেদাবাদ ছেড়ে চ'লে যাব

না। বরঞ্চ আমরা অচ্ছুৎদের পাড়ায় উঠে যাব এবং গতর খাটিয়ে মজদুরি ক'রে যে যতটুকু রোজগার করতে পারি তাই দিয়ে আশ্রম চালিয়ে যাব।

শেষপর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে একদিন মগনলাল গান্ধী এসে আমায় নোটিস দিলেন, "হাতে আমাদের যা-কিছু ছিল সব ফুরিয়ে গেছে, আসছে মাসের খরচ আমাদের নেই।"

আমি শান্তভাবে বললাম, "তাহলে তো আমাদের অচ্ছুৎদের বস্তিতে উঠে যেতে হয়।"

এই প্রথম যে আমায় এরকম সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে, এমন তো নয়। এরকম অবস্থায় যখনই পড়েছি, শেষমুহূর্তে স্বয়ং ভগবান আমার সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের অর্থসঙ্কটের কথা তুলে মগনলাল আমায় সতর্ক ক'রে দেবার অল্পকিছুদিন পরে, আশ্রমের একটি ছেলে এসে আমায় খবর দিল যে বাইরে মোটরগাড়িতে ব'সে একজন শেঠ অপেক্ষা করছেন এবং তিনি না-কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গেলাম। তিনি আমায় বললেন, "আমার ইচ্ছা আশ্রমের কাজে কিছু সাহায্য করি। আপনি কি আমার সাহায্য নেবেন?"

আমি বললাম, "অবশ্যই নেব। সত্যি বলতে কী, এই মুহূর্তে আমাদের হাতে একটি পয়সাও অবশিষ্ট নেই—আমরা কপর্দকশূন্য।"

তিনি বললেন, "কাল এ সময় আমি আসতে চাই। আপনি তখন থাকবেন তো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, থাকব বৈ-কি।" অতঃপর তিনি চ'লে গেলেন।

পরদিন, একেবারে ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায়, আমাদের বাড়ির কাছাকাছি মোটরটা এসে দাঁড়াল। হর্ন বাজল। ছেলেরা এসে আমায় খবরটা দিল। শেঠ ভিতরে এলেন না। আমিই বাইরে গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমার হাতে তেরো হাজার টাকার একতাড়া নোট গুঁজে দিয়ে, মোটর হাঁকিয়ে চ'লে গেলেন।

এরকম সাহায্যলাভের আশা আমি কস্মিনকালেও করিনি। আর সাহায্য দেবার ধরনটাও কেমন অদ্ভুত। ভদ্রলোক ইতিপূর্বে কখনো আশ্রমে আসেননি। যদ্দুর মনে পড়ে, ইতিপূর্বে একবারমাত্র তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে থাকবে। আশ্রমে পা দেওয়া নয়, কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা নয়, স্রেফ্ সাহায্য দান ক'রেই চ'লে যাওয়া! এটা আমার পক্ষে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। এই সাহায্যলাভের ফলে তখনকার মতো অচ্ছুৎ পাড়ায় উঠে যাবার কোনো প্রশ্ন রইল না। অন্তত একবছরের মতো আমরা এখন নিশ্চিন্ত।

আশ্রমের বাইরে তখন যেমন বিরুদ্ধতার ঝড় ব'য়ে চলেছিল, আশ্রমের ভিতরেও তেমনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালে যদিচ অচ্ছুৎ মিত্রেরা আমার বাড়িতে আসতেন ও আমার সঙ্গে বসবাস ও আহারাদি করতেন, একটি অচ্ছুৎ পরিবার এসে আর-পাঁচজনের সঙ্গে আশ্রমে থাকবেন—এটা আমার স্ত্রী ও আশ্রমের অন্য মেয়েদের ঠিক যেন মনঃপূত হয়নি। চোখে দেখে ও কানে শুনে আমি সহজেই বুঝতে পারতাম যে দানীবেনকে ঠিক অপছন্দ না-করলেও তাঁর প্রতি তাঁদের একটা উপেক্ষার ভাব ছিল। অর্থসঙ্কট আমায় যতটা-না ভাবিয়েছে তার চেয়ে অনেক অসহ্য দুশ্চিন্তার বোঝা আমায় বইতে হয়েছে আশ্রমের ভিতরকার এই ঝড়ের চেহারা দেখে। দানীবেন ছিলেন সাধারণ মেয়ে। দুদাভাই

স্বল্পশিক্ষিত হ'লেও মানুষটি ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান্। তাঁর ধৈর্যশীল স্বভাবটুকু আমার বেশ ভালো লাগত। মাঝে-মাঝে তিনি চ'টে উঠলেও, মোটের ওপর তিনি ছিলেন সহনশীল মানুষ। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতাম, ছোটোখাটো লাঞ্ছনা অপমান তিনি যেন হজম ক'রে নেন। তিনি নিজে তো আমার কথা মেনে নিতেনই, উপরন্তু তাঁর পত্নীকেও বলতেন আমার কথামতো চলতে।

এই অচ্ছুৎ পরিবারকে আশ্রমভুক্ত ক'রে নেবার ফলটা আশ্রমের পক্ষে বেশ শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। সূচনাতেই আমরা যেন জগৎ-সমক্ষে প্রচার ক'রে দিয়েছিলাম যে অস্পৃশ্য প্রথার সঙ্গে আমাদের আশ্রম আপস-রফা করতে রাজি নয়। আশ্রমকে যাঁরা মদৎ দিতে চাইতেন, তাঁদেরকে এই কথাটুকু বুঝেসুঝে কাজে নামতে হ'ত। পরিণামে আশ্রমের অস্পৃশ্যতা-বিরোধী কাজও অনেকটা সহজতর হয়েছিল। আশ্রমের ক্রমবর্ধমান দৈনিক খরচ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যকার গোঁড়া হিন্দুরাই বহন ক'রে এসেছেন তা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে হয়তো অস্পৃশ্যতা প্রথার ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে আসছে। এই অনুমানের সপক্ষে অন্য অনেক নজির হয়তো উপস্থিত করা যায়। কিন্তু যে আশ্রমে জাতপাতের বালাই একেবারেই নেই, সেইরকম একটি প্রতিষ্ঠনকে সনাতনী হিন্দুরাও যে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করতে লেগেছেন—সেটা প্রমাণ হিসেবে খুব বেশি অকিঞ্চিৎকর বলা চলে না।

দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকগুলি ঘটনার কথা আমায় বাদ দিয়ে যেতে হচ্ছে। মূল সমস্যা থেকে উদ্‌ভূত অনেক ছোটোখাটো অথচ গুরুতর প্রশ্নের কীভাবে আমরা মীমাংসা করলাম, অভাবনীয় বাধাবিঘ্ন কীভাবে আমরা অতিক্রম করলাম, সত্যের সন্ধানে আমার এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানারকম প্রসঙ্গ, আমায় উহ্য রাখতে হচ্ছে। তারপরে যা আমি বলব তার মধ্যে সব কথা না-বলতে পারার দোষ বা ত্রুটি থেকে যাবে। আমার এই নাটকের নানা ভূমিকায় যেসব কুশীলব নেমেছেন, তাঁদের অনেকে এখনো জীবিত থাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি বিষয় আমি বিশদভাবে বলতে পারব না। যেসব ঘটনার সঙ্গে তাঁরা জড়িত ছিলেন, সেসব বলতে গেলে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে হয়। অনুমতি-ব্যতিরেকে কারো নাম ধ'রে কিছু বলা সঙ্গত হয় না। অপরপক্ষে তাঁদের সম্মতি নেওয়া, তাঁদের সম্পর্কে যা-কিছু বলতে চাই, সেসব বলবার আগে তাদের দিয়ে সেগুলি যাচাই ক'রে নেওয়া—এসব তো কোনো কাজের কথা হতে পারে না। উপরন্তু, আত্মকথা রচনা করতে গিয়ে পদে-পদে অন্য লোকের শরণাপন্ন হওয়াটাও কোনো কাজের কথা নয়। অতএব আমার আশঙ্কা হয় যে অতঃপর আমি যেসব কথা বলব, যদিচ সত্যের সাধনের পক্ষে সেসব কথা জানা দরকার, আমার সে কাহিনী থেকে কিছু-কিছু ঘটনার কথা আমায় বাধ্য হয়ে বাদ দিয়েই বলতে হবে। তৎসত্ত্বেও, ভগবান যদি ইচ্ছা করেন, অসহযোগ আন্দোলনের যুগ অবধি এই কাহিনীর জের আমি টানতে পারব ব'লে আশা রাখি।

১১. গিরমিটিয়া প্রথার বিলোপ

একেবারে সূচনা থেকেই, ঘরে ও বাইরে যেসব ঝড়-তুফানের মধ্যে দিয়ে আশ্রমকে চলতে হয় সেসব কথা কিছুক্ষণের মতো স্থগিত রেখে, অন্য একটি যে ব্যাপার আমায় হাতে নিতে হয়েছিল সে বিষয়ে দু-চার কথা বলব।

পাঁচ বছর কিংবা তারও কম মেয়াদে যারা চুক্তিবদ্ধ হয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে মজুরি করতে যেত তাদের বলা হ'ত গিরমিটিয়া। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের স্মাট্স্-গান্ধী চুক্তি অনুসারে, নাটাল-বাসী গিরমিটিয়াদের মাথা-পিছু যে তিন পাউন্ড কর দিতে হ'ত, তা তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণভাবে গিরমিট্ প্রথার গলদ তখনো নিরাকরণ করা যায়নি।

১৯১৬-র মার্চ মাসে ইম্পিরিয়েল লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল্-এ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গিরমিট্ প্রথা একেবারে রহিত করার জন্য একটি প্রস্তাব আনেন। তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে গিরমিট্ প্রথা যথাসময়ে রদ করা যাবে ব'লে মহামান্য ব্রিটিশ সরকার-বাহাদুরের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি তিনি পেয়ে গেছেন। আমার কিন্তু মনে হ'ল, এইরকম অস্পষ্ট নিশ্চিতিতে নিশ্চিন্ত না-থেকে, অগৌণে এই প্রথা রদ করার জন্য আমাদের আন্দোলন করা উচিত। স্রেফ্ কর্তব্যপালনে অবহেলাবশত ভারত সরকার এই কু-প্রথার কু-ফল এতদিন সহ্য ক'রে এসেছেন। আমার মনে হ'ল, প্রতিকারের জন্য এবার যদি দেশের লোক আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে পারে, তাহলে সুফল ফলতে বাধ্য। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, কাগজে কয়েকটি লেখা পাঠালাম, দেখলাম, দেশের জনমত কালবিলম্ব না-ক'রে এই প্রথা তুলে দেবার সপক্ষে। মনে প্রশ্ন জাগল, ব্যাপারটা কি সত্যাগ্রহ আন্দোলন গ'ড়ে তোলবার মতো বিষয় হয়ে উঠতে পারে। সেটা যে সম্ভবপর, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেটা কেমন ক'রে ঘটানো যেতে পারে—সে আমার জানা ছিল না।

'যথাসময়ে রদ করা'র ব্যাপারটা যে কী, ভাইস্রয় তা নিয়ে দ্বিধাদ্বিরুক্তি না-ক'রে সোজা ব'লে দিলেন : যথাসময়ের অর্থ হ'ল বিকল্প ব্যবস্থা চালু করতে যতটুকু সময় লাগা উচিত ততটুকু সময়।

সুতরাং ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অবিলম্বে গিরমিট্ প্রথা রদ করার একটি বিল্ উত্থাপনের জন্য পণ্ডিত মালব্য ভাইস্রয়-এর অনুমতি চাইলেন। লর্ড চেম্স্ফোর্ড অনুমতি দিলেন না। বুঝলাম, ভারতব্যাপী আন্দোলন গ'ড়ে তোলবার জন্য এবার আমায় পরিক্রমায় বেরুতে হবে।

মনে হ'ল, আন্দোলন শুরু করবার আগে বড়োলাটের কাছে আমার হাজিরা দেওয়া উচিত হবে। সাক্ষাতের জন্য আবেদন পেশ করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আবেদন মঞ্জুর হ'ল। মিস্টার মাফি (এখন যিনি স্যর জন মাফি) ছিলেন ভাইস্রয়-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ অন্তরঙ্গতা হয়। লর্ড চেম্স্ফোর্ড-এর সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছিল বেশ সন্তোষজনক। সঠিক কোনো কথা না-দিলেও তিনি বললেন, যথাসাধ্য করবেন।

আমার সফর শুরু হ'ল বোম্বাই থেকে। ইম্পিরিয়েল সিটিজেন্স এসোসিয়েশন্-এর তরফ থেকে মিস্টার জাহাঙ্গীর পেটিট্ একটি জনসভা ডাকবেন ব'লে স্থির হয়। গোড়ায় এসোসিয়েশন্-এর কার্যকর সমিতি, একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে জনসভার কাছে যে প্রস্তাব রাখা হবে তার মুসাবিদা প্রস্তুত করেন। এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন ডক্টর স্টান্লি রীড, শ্রী (বর্তমানে স্যর) লল্লুভাই সামলদাস, শ্রীনটরাজন্ এবং মিস্টার পেটিট্ স্বয়ং। আলোচ্য বিষয় ছিল গিরমিট্ প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা এবং সেই মর্মে ভারত সরকারকে জানানো। বিকল্প ছিল তিনটি : ১। যথাশীঘ্রসম্ভব রদ করতে হবে ; ২। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে রদ করতে হবে ; এবং ৩। অবিলম্বে রদ করতে হবে। আমি ছিলাম তারিখ দিয়ে সময়টা বেঁধে দেবার পক্ষে—কারণ তা যদি করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকার যদি আমাদের প্রস্তাব-মাফিক কাজ না করেন, তাহলে অতঃপর কী করা যেতে পারে, আমরা স্থির করতে পারি। শ্রীলল্লুভাই ছিলেন 'অবিলম্বে রদ' করার পক্ষে—তাঁর মতে 'অবিলম্বে' কথাটায় '৩১ জুলাইয়ে'র চেয়ে কম সময় বোঝায়। আমি বুঝিয়ে বলি, 'অবিলম্বে' কথাটার অর্থ জনসাধারণ বুঝতে পারবে না। আমরা যদি তাদের কাজে টানতে চাই—তাহলে আমাদের বক্তব্য তাদের কাছে স্পষ্ট ক'রে ধরতে হবে, সঠিক তারিখ নির্দিষ্ট ক'রে দিতে হবে। 'অবিলম্বে' কথাটার অর্থ প্রত্যেকেই নিজের-নিজের মতো করতে চাইবে, সরকার বলবেন এক, জনসাধারণ বলবে আর। কিন্তু ৩১ জুলাই তারিখটার অর্থ নিয়ে ভুল বোঝার কোনো বালাই থাকতে পারে না। ওই তারিখের মধ্যে সরকার যদি কিছু না-করেন, তাহলে আমরা এর পরের ধাপে এগিয়ে যেতে পারি। আমার যুক্তিটা যে জোরদার—ডক্টর রীড তা বুঝতে পারলেন এবং শেষপর্যন্ত শ্রীলল্লুভাইও তা মেনে নিলেন। খসড়া প্রস্তাবে লেখা হ'ল ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে গিরমিট্ প্রথা রহিত হবার সংবাদ যেন সরকার-বাহাদুর ঘোষণা করেন। সেই মর্মে একটি প্রস্তাব বোম্বাইয়ের জনসভায় গৃহীত হয়। অন্যান্য শহরেও জনসভা ডেকে অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

শ্রীমতী জইজি পেটিট্-এর অক্লান্ত চেষ্টায় ভাইস্‌রয়-এর সঙ্গে মোলাকাৎ করার জন্য মহিলাদের একটি ডেপুটেশন্ সংগঠিত হ'ল। বোম্বাই থেকে যেসব মহিলা এই ডেপুটেশন্-এ যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে লেডি টাটা ও দিলসাদ বেগম ছিলেন ব'লে আমার মনে পড়ে। ডেপুটেশন্-এর ফল বেশ ভালো হয়েছিল। ভাইস্‌রয় তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

করাচী, কলকাতা ও অন্য নানা জায়গায় আমি গিয়েছিলাম। সব জায়গাতেই সভায় বেশ লোকজন হয়েছিল—উৎসাহ দেখা গিয়েছিল যথেষ্ট। আন্দোলন শুরু হবার মুখে আমি আশাও করিনি যে এতটা সাড়া পাওয়া যাবে।

তখনকার দিনে আমি একা-একা চলাফেরা করতাম ব'লে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হ'ত। সি.আই.ডি.-র লোকেরা সর্বক্ষণ আমার পেছন-পেছন লেগে থাকত। আমার দিক থেকে কোনো-কিছু লুকানো-ছুপানো থাকত না ব'লে তারা আমায় জ্বালাতন করত না, আর আমিও তাদের ঝঞ্ঝাট ঘটাতাম না। সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে, তখনো মহাত্মা

নামের ছাপটা আমার গায়ে এঁটে বসেনি। আমায় চিনে ফেললে অবশ্য মহাত্মা নামের ধ্বনি থেকে আমার রেহাই পাওয়া দুষ্কর হ'ত।

একটিবারের একটা ঘটনার কথা বলি। পরপর কয়েকটা স্টেশনে ডিটেক্‌টিভরা আমার কামরায় ঢুকে আমায় জ্বালাতন করে, টিকিট দেখতে চায় ও টিকিটের নম্বর টুকে নেয়। আমি অবশ্য বিনা-ওজরে তাদের সমস্ত জেরা ও প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম, সহযাত্রীরা ধ'রে নিয়েছিল, আমি একজন সাধু কিংবা ফকির। প্রত্যেক স্টেশনে আমায় এভাবে বিরক্ত করা হচ্ছে দেখে তারা ভীষণ চ'টে যায়। ডিটেক্‌টিভদের গালিগালাজ দিয়ে তারা বলে, "নাহক, সাধুবাবাকে খামোকা বিরক্ত কেন করছ তোমরা?" আমার দিকে ফিরে তারা বলল, "এইসব বদমাসদের ফের যেন আপনার টিকিট দেখাতে যাবেন না।"

আমি শান্তভাবে তাদের বলি, "ওঁরা যদি আমার টিকিট দেখতে চান, আমার আর দেখাতে কী কষ্ট। ওঁরা তো ওঁদের কর্তব্যপালন ক'রে চলেছেন।" যাত্রীরা আমার কথায় বড়ো-একটা খুশি হলেন ব'লে মনে হ'ল না। আমার প্রতি তাদের সহানুভূতি আরো যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এবং নির্দোষ লোকেদের ওপর অনর্থক হামলা করা হচ্ছে ব'লে তীব্র ভাষায় আপত্তি জানাতে লাগল।

কিন্তু ডিটেক্‌টিভরা কী-আর এমন করেছিল। আসল কষ্টটা ছিল তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করা। লাহোর থেকে দিল্লী যাবার পথে ভোগান্তির একশেষ হয়েছিল। করাচী থেকে লাহোর হয়ে আমি যাত্রা করছিলাম কলকাতার দিকে। লাহোরে গাড়ি বদ্‌লাবার কথা। গাড়িতে একটা জায়গা পাওয়া একেবারে অসম্ভব ব'লে মনে হ'ল। গাড়িগুলোতে একেবারে ঠাসাঠাসি ভিড়। এক যাদের গায়ের জোর ছিল তারাই কেবল ঠেলেঠুলে ঢুকল। দরজায় তালা দেওয়া দেখে কেউ-কেউ জানলা দিয়ে গ'লে উঠে পড়ল। সভার জন্য নির্দিষ্ট তারিখে কলকাতায় আমায় পৌঁছতেই হবে। এ ট্রেনটা যদি ছেড়ে দিতে হয় তাহলে যথাসময়ে পৌঁছনো যাবে না। গাড়িতে ওঠবার আশা আমি একপ্রকার ত্যাগ করলাম—কেউ আমায় ঢুকতে দিতে রাজি নয়। আমার এই দুরবস্থা দেখে শেষপর্যন্ত একটি কুলি এসে আমায় বলল, "বারো আনা ফেলতে পারো তো, তোমার জন্য একটা জায়গা জোগাড় ক'রে দিতে পারি।" আমি বললাম, "বেশ, রাজি। আমার জন্য জায়গা ক'রে দিতে পারো যদি, নিশ্চয় বারো আনা তুমি পাবে।" পরপর সমস্ত কামরা ঘুরে-ঘুরে কুলি বেচারি যাত্রীদের কত মিনতি ক'রে বলল, কেউ তার কথায় কান দিল না। তারপর, ট্রেন যখন ছাড়ে-ছাড়ে, জনকয় যাত্রী চেঁচিয়ে বলল, "জায়গা এখানে নেই। তবে জানলা গলিয়ে ঢুকিয়ে দিতে পারো তো ঢুকিয়ে দাও। ঠায় দাঁড়িয়ে যেতে হবে কিন্তু।" জোয়ান কুলি আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "কেমন, রাজি তো?" আমি সম্মতি জানাতেই সে আমায় কোলপাঁজা তুলে জানলা দিয়ে ঠেলে গলিয়ে দিল। এইভাবে আমি কামরায় উঠলাম, আর কুলিও তার সেই বারো আনা রোজগার করল।

সে রাতটা ছিল আমার ধৈর্যপরীক্ষার রাত। অন্য যাত্রীরা যেন তেন প্রকারেণ একটা জায়গা ক'রে নিয়েছিলেন। ওপরের বাংক-এর শেকলটা ধ'রে আমায় পাক্কা দু-ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়। 'ব'সে পড়ুন', 'বসছেন, না কেন'—ব'লে জনাকয়েক যাত্রী ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যান

ক'রে আমায় বিরক্ত করতে থাকে। আমি যত তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে জায়গা না-থাকলে বসব কী ক'রে, তাদের এই ঘ্যানঘ্যান আর থামে না। আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখে তাদের ঘোরতর অস্বস্তি—যেহেতু তারা নিজেরা তখন ওপরের বাংক-এ সটান লম্বমান। অনবরত প্রশ্নবাণে তারা আমায় জর্জরিত করতে লাগল, আমিও ধীরভাবে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলাম। এতে তারা শেষপর্যন্ত শান্ত হয়। কেউ-কেউ এদের মধ্যে থেকে আমার নাম জিজ্ঞেস করে। নাম বলাতে এদের মাথা হেঁট হয়। মার্জনা ভিক্ষা ক'রে আমার জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়। অবশেষে ধৈর্যের পুরস্কার মিলল। ততক্ষণে আমার সমস্ত দেহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন আর মাথাটাও ঘুরছিল। যখন তাঁর করুণা না-পেলে নয়, ভগবান তখন অগতির গতি হয়ে আসেন।

এইভাবে আমি কোনোপ্রকারে দিল্লী পৌঁছই ও সেখান থেকে কলকাতা রওনা হয়ে যাই। কলকাতার জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা। কলকাতায় আমি তাঁর বাড়িতেই উঠি। যেমন করাচীতে তেমনি কলকাতায়—দেখা গেল গিরমিট্ প্রথা সত্বর তুলে দেবার জন্য জনসাধারণের বিপুল আগ্রহ। কলকাতার সভায় জনকয়েক ইংরেজও এসেছিলেন।

৩১শে জুলাইয়ের আগেই সরকার ঘোষণা করেন যে চুক্তিবদ্ধ মজদুর হিসেবে কোনো ভারতীয়কে দেশান্তরী করা চলবে না।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আমি এই প্রথার বিরুদ্ধে একটি দরখাস্তের খসড়া লিখেছিলাম। সেই দরখাস্তে বলেছিলাম যে স্যর ডব্লু. ডব্লু. হান্টার যে প্রথাকে ক্রীতদাস প্রথা অথবা গোলামির সমতুল্য ব'লে নিন্দিত করেছেন, আশা করা যায়, একদিন তার অবসান ঘটবে।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম যখন এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা হয়, অনেকেই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি যে গিরমিট্-প্রথা তুলে না-দিলে সত্যাগ্রহ শুরু হতে পারে—এই সম্ভাবনা দেখা দিতেই এই প্রথার উচ্ছেদ ত্বরান্বিত হয়।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের সেই আন্দোলনে কারা-কারা যোগ দিয়েছিল, কী-কী ঘটনা ঘটেছিল সে বিষয়ে আপনাদের কারো যদি জানতে ইচ্ছা থাকে, আপনারা আমার *Satyagraha in South Africa* বইখানা প'ড়ে দেখতে পারেন।

১২. নীল-কলঙ্ক

চম্পারণ রাজর্ষি জনকের ভূমি। সেখানে যেমন আমবাগানের ছড়াছড়ি, তেমনি ১৯১৭ অবধি নীলচাষের বহু ক্ষেত ছিল। আইনের বলে চম্পারণের চাষীদের নিজ জমির বিশ ভাগের তিন ভাগ জমিতে জোতদারের জন্য নীলের চাষ করতে হ'ত। বিশ কাঠা জমির তিন কাঠা অংশে নীল লাগাতে হ'ত ব'লে এই প্রথার নাম দেওয়া হয়েছিল তিন কাঠিয়া।

সত্যি বলতে কী, চম্পারণের ভৌগোলিক সংস্থান বিষয়ে জানা দূরে থাক্, চম্পারণের নাম পর্যন্ত তখন আমার জানা ছিল না। নীলচাষের ব্যাপারটাও একপ্রকার আমার অজ্ঞাত ছিল। মোড়কে প্যাক্-করা নীল আমি দেখে থাকব। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে সেই নীলের উৎপত্তিস্থল চম্পারণ এবং সেখানকার হাজারো চাষী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নীল উৎপাদন করে।

নীলচাষের মই দিয়ে যেসব চাষীদের অন্তর দলিত-মথিত হচ্ছিল, রাজকুমার শুক্ল ছিল তাদেরই একজন। তার অন্তরে যেমন জ্বালা তেমন জ্বালায় জ্বলছিল তার হাজারো চাষীভাই। সে তাই মরীয়া হয়ে সঙ্কল্প নিয়েছিল যেমন ক'রে হোক্ নীলের এই কলঙ্ক মোচন করতে হবে।

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে আমি যখন কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য লখনউ যাই, শুক্ল সেখানে ধাওয়া ক'রে আমায় পাকড়াও করে। চম্পারণে যাবার জন্য আমায় সে পীড়াপীড়ি ক'রে বলল, "আমাদের কত যে দুর্ভোগ ভুগতে হয়, সব কথা উকিলবাবুর কাছ থেকে জানতে পারবেন।" উকিলবাবুটি আর-কেউ নয়, বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ। পরে ইনি আমার চম্পারণের কাজে সহযোগ ক'রে আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। বিহারের তাবৎ জনসেবার কাজে ইনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। একদিন রাজকুমার শুক্ল উকিলবাবুকে নিয়ে আমার তাঁবুতে উদয় হ'ল। উকিলবাবুর পরণে কালো আলপাকার আচ্‌কান ও পাৎলুন। প্রথম দর্শনে তিনি আমার মনে কোনোপ্রকার দাগ কাটলেন না। গরীব ও সরলপ্রাণ চাষাভুসোদের ঠকিয়ে যারা লুটেপুটে খায়—মনে হয়েছিল, এই উকিলবাবুটি তাঁদেরই একজন হবেন। তাঁর মুখে চম্পারণের বিষয়ে দু-চারটে কথা শোনবার পর, আমি আমার অভ্যস্ত রেওয়াজ-মাফিক বলি, নিজের চোখে সমস্ত অবস্থাটা না-দেখে আসা পর্যন্ত এ বিষয়ে আমি কোনো মতামত দিতে পারি না। কংগ্রেসে অবশ্যই আপনার প্রস্তাবটা তুলবেন, কিন্তু দয়া ক'রে এখন আমায় এর সঙ্গে জড়াতে যাবেন না। রাজকুমার শুক্ল অবশ্য চেয়েছিল, কংগ্রেস থেকে যেন খানিকটা সহায়তা মেলে। চম্পারণের চাষীদের দুরবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ কংগ্রেসের অধিবেশনে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

এতে রাজকুমার শুক্ল খুশি হ'ল, কিন্তু ঠিক যেন তৃপ্ত হ'ল না। তার ইচ্ছা ছিল, আমি স্বয়ং চম্পারণ গিয়ে যেন সেখানকার রায়তদের দুঃখ-দুর্গতি প্রত্যক্ষ করি। তাকে আমি তখন বলেছিলাম, আমি যে সফরে বেরুবার তোড়জোড় করছি, সেই সফর-তালিকায় চম্পারণকে

অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেব এবং সেখানে দু-একটাদিন থেকেও যাব। সে আমায় বলল, "একটা দিনই যথেষ্ট। একটিবার তো নিজের চোখে দেখে নিন—তা হ'লেই হ'ল। তার বেশি চাই না আমি আপনার কাছ থেকে।"

লখনউ থেকে আমি গেলাম কানপুর। সেখানে গিয়ে দেখি, রাজকুমার শুক্ল ঠিক আমার পিছু-পিছু এসে গেছে। এবার সে রীতিমতো জোর করতে লাগল, বলল, "এখান থেকে চম্পারণ খুবই কাছে। একটা দিন না-হয় দিলেন আমাদের জন্য।"

জবাব দিতে গিয়ে আরো যেন জড়িয়ে পড়লাম, বললাম, "এবারকার মতো আমায় ক্ষমা করুন। কিন্তু কথা দিচ্ছি, আমি যাব।"

আশ্রমে ফিরে গেলাম। সেখানেও নাছোড়বান্দা রাজকুমার সশরীরে হাজির। বলে কি-না : "বেশ তো, এরা দিন স্থির ক'রে বলুন ক'বে যাবেন।" আমি বললাম, "হুঁ, আচ্ছা। অমুক তারিখে আমায় কলকাতায় থাকতেই হবে। সেখানে গিয়ে সে-সময় আমার সঙ্গে দেখা করুন। তারপর আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন কেমন?" তখন আমি ঘুণাক্ষরে জানতাম না কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে, কোন্-কোন্ জিনিস দেখতে হবে।

কলকাতায় ভূপেনবাবুর বাড়ি পৌঁছে দেখি, আমার আগেই রাজকুমার শুক্ল সেখানে এসে দিব্য আড্ডা গেড়েছে। এই সহজ সরল নিরক্ষর চাষা মানুষটা একপ্রকার তার সঙ্কল্পের জোরেই আমার চিত্ত যেন জয় ক'রে নিল।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে, চাষীভাইয়ের সঙ্গে চাষার মতো পোশাক প'রে, আমরা দু-জন কলকাতা ছেড়ে চম্পারণের পথে যাত্রা করলাম। কোন্ ট্রেন যে আমাদের ধরতে হবে—সেটাও আমার জানা ছিল না। রাজকুমার শুক্ল আমায় যে ট্রেনে বসিয়ে দিল, তাতে চ'ড়ে আমরা পরদিন সকালবেলা পাটনায় পৌঁছলাম।

সেই আমার প্রথমবার পাটনা যাওয়া। সেখানে আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব এমন কেউ ছিল না যার বাড়িতে গিয়ে ওঠবার কথা আমি ভাবতেও পারি। কেমন যেন মনে হয়েছিল, নেহাৎ চাষাভুসো মানুষ হ'লে কী হয়, পাটনায় হয়তো রাজকুমার শুক্লর কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে থাকবে। ট্রেনে একসঙ্গে আসবার সময় তাকে একটু ভালো ক'রে জানবার সুযোগ পেলাম। পাটনায় পৌঁছে তার সম্বন্ধে আমার মোহ একেবারে ঘুচে গেল। দুনিয়া যে কী বস্তু সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই—নেহাৎ সাদাসিধে গোবেচারা মানুষ। যেসব উকিলবাবুদের সে বন্ধু-মানুষ ব'লে স্থিরনিশ্চিত ছিল, তাঁরা মোটেই সেরকম ছিলেন না। বেচারা রাজকুমার ছিল তাদের কাছে চাকরবাকরের সমগোত্রীয়। চাষাভুসো মক্কেলদের সঙ্গে উকিলদের ব্যবধান ছিল ভরা গঙ্গার এপার-ওপারের মতো।

রাজকুমার শুক্ল আমায় রাজেন্দ্রবাবুর পাটনার বাড়িতে নিয়ে যায়। আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না, রাজেন্দ্রবাবু তখন পুরী কিংবা অন্য কোথাও গিয়ে থাকবেন। তিনি বাড়ি ছিলেন না। তাঁর বাংলোর তদারকিতে যে দুয়েকজন চাকর ছিল, তারা আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। আমার কাছে খাদ্যবস্তু কিছু ছিল। কিছু খেজুর দরকার হওয়ায়, রাজকুমার নিজেই বাজার থেকে তা জোগাড় ক'রে আনল।

বিহারে তখন ছুঁৎমার্গের ভীষণ বালাই। চাকরেরা যখন কুয়োর জল ব্যবহার করছে আমার তখন কুয়ো থেকে জল তোলার জো ছিল না। আমি কোন্ জাতের লোক চাকরেরা তো জানে না। তাদের ভীষণ ভয় আছে আমার বাল্তির জলের ছিঁটে লেগে তারা অশুদ্ধ হয়ে যায়। রাজকুমার আমায় বাড়ির ভেতরকার পায়খানায় যেতে বলতেই, চাকরটি সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের পায়খানা দেখিয়ে দিল। এরকম ব্যাপার আমার গা-সহা হয়ে গিয়েছিল ব'লে, আমি আশ্চর্য হইনি, বিরক্তও হইনি। চাকরেরা ভেবেছিল, রাজেন্দ্রবাবু থাকলে যেমনটা চাইতেন, তারা ঠিক সেইরকমটি ক'রে তাদের কর্তব্য পালন করছে।

এইরকমসব মজার-মজার অভিজ্ঞতার ফলে রাজকুমার শুক্লের প্রতি শ্রদ্ধা আমার বেড়ে যায়। তেমনি তার সম্বন্ধে জ্ঞানও আমার একটু বাড়ল। আমি বুঝলাম, রাজকুমার শুক্ল আমায় পথ দেখাতে পারবে না। লাগাম আমায় নিজের হাতেই ধরতে হবে।

১৩. শান্তিপ্রিয় বিহারী

লন্ডনে যখন ব্যারিস্টরির জন্য পড়াশুনো করতেন তখন থেকে মৌলানা মজহর-উল্-হক্ সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয়। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেস্-এর বোম্বাই অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়। তখন তিনি মুসলিম লীগ-এর সভাপতি। আমার সঙ্গে সেই পুরাতন পরিচয় ঝালিয়ে নিয়ে মৌলানাসাহেব বলেছিলেন, কখনো যদি পাটনা যাই তাঁর বাড়িতে গিয়ে যেন উঠি। তাঁর সেই আমন্ত্রণের সূত্র ধ'রে তাঁকে আমি একটি ছোট্ট চিঠি লিখে জানাই, কী উদ্দেশ্যে আমার পাটনায় আগমন। পত্রপাঠ তিনি স্বয়ং চ'লে এলেন তাঁর মোটরে এবং তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমায় পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যে এ যাত্রা তিনি যদি কেবল চম্পারণ যাবার প্রথম গাড়িটুকু ধরিয়ে দিতে আমায় সাহায্য করেন তাহলেই যথেষ্ট। বিহারে আমি এই প্রথম এসেছি, নতুন লোকের পক্ষে রেলগাইড দেখে গাড়ি ঠিক করা বৃথা চেষ্টা। রাজকুমার শুক্লের সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ কথা বললেন। অতঃপর পরামর্শ দিলেন প্রথমে যেন আমি মুজঃফফ্রপুর যাই। সেদিনই সন্ধেবেলা তিনি আমায় মুজঃফফ্রপুরগামী ট্রেন্-এ তুলে দিলেন।

আচার্য কৃপালানী তখন মুজঃফফ্রপুরে। হায়দ্রাবাদ সিন্ধ-এ যখন যাই তখন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। ডক্টর চৈতরামের মুখে তখন আচার্য কৃপালানীর ত্যাগ ও সহজ সরল জীবনযাত্রার বিষয়ে দু-চার কথা শুনেছিলাম। তিনি তখন [illegible] যে আচার্য কৃপালানীর দেওয়া টাকা থেকেই তাঁর আশ্রামের অনেকখানি খরচ নির্বাহ হয়। মজঃফ্ফরপুর গভর্মেন্ট কলেজে আচার্য ছিলেন প্রফেসর। আমি সে শহরে পা দেবার অল্পকিছুকাল আগে তিনি সরকারি কাজে ইস্তফা দিয়েছেন। আমি কখন মজঃফ্ফরপুর পৌঁছব—সেই খবর দিয়ে আচার্যকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। রাতদুপুরে ট্রেন গিয়ে পৌঁছলে কী হয়, দেখি কী অত রাতেও একদল ছাত্র-সমেত তিনি স্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর

নিজের বাড়ি-ঘর বলতে তখন কিছু ছিল না, থাকতেন প্রফেসার মালকানীর সঙ্গে। আমিও আচার্যের সঙ্গে-সঙ্গে প্রফেসর মালকানীর অতিথি হলাম। তখনকার দিনে কোনো সরকারি কলেজের প্রফেসর আমার মতো লোককে নিজের বাড়িতে এনে আশ্রয় দিচ্ছেন—এমন ঘটনা একপ্রকার অসাধারণ ব্যাপার ছিল।

আচার্য কৃপালানী আমাকে বিহারের এবং বিশেষ ক'রে ত্রিহুত অঞ্চলের ঘোর দুর্গতির কথা বিশদ ক'রে বলেন এবং প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দেন আমি যে কাজ করতে এসেছি সে কাজ করা খুব সহজ হবে না। বিহারীদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ এমনিতেই ছিল ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। আমি ওখানে গিয়ে পড়বার আগেই তিনি তাঁদের কয়েকজনকে ব'লে রেখেছিলেন কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমার বিহারে আসা।

সকালবেলা জনকয়েক উকিল এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের মধ্যে রামনবমী প্রসাদ-এর কথা আমার এখনো বিশেষভাবে মনে পড়ে। তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি আমায় বললেন : "এখানে প্রফেসর মালকানীর সরকারি বাংলোয় থেকে, আপনি যে কাজ করতে এসেছেন তা করা সম্ভবপর হবে না। আপনি বরঞ্চ আমাদের কারো বাড়িতে উঠে আসুন। গয়াবাবু এখানকার একজন নামজাদা উকিল। তাঁর বাড়িতে উঠবার জন্য তাঁর হয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ করতে এসেছি। স্বীকার করা ভালো, সরকার-বাহাদুরকে সবাই আমরা সমীহ ক'রে চলি। তবে আমাদের যথাসাধ্য আমরা আপনার কাজে সহায়তা করব। রাজকুমার শুক্ল আপনাকে যেসব কথা বলেছে তার অনেকটাই সত্য। দুঃখের কথা, আজ এখানে আমাদের নেতৃস্থানীয়েরা কেউ উপস্থিত নেই। তবে আমি বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই দুজনের নামেই তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করা যায়, শীগগিরি তাঁরা এসে পড়বেন। তাঁদের কাছ থেকে সব-কিছু আপনি জানতে পারবেন। তাছাড়া তাঁরা নিশ্চয় আপনার কাজে নানাভাবে সহায়তা করতে পারবেন। এখন বলি কী, দয়া ক'রে আপনি গয়াবাবুর বাড়িতে উঠে আসুন।"

এ অনুরোধ এড়িয়ে যাই এমন আমার সাধ্য ছিল না। গয়াবাবু পাছে বিব্রত বোধ করেন, তাই নিয়ে একটু ইতস্তত বোধ করছিলাম। কিন্তু তিনি আমার সঙ্কোচ দূর ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ ক'রে দেন। আমি তাঁর বাড়িতে উঠে গেলাম। সেখানে তিনি ও তাঁর বাড়ির লোকেরা অজস্র স্নেহে আমায় অভিষিক্ত করলেন।

ইতিমধ্যে দ্বারভাঙ্গা থেকে ব্রজকিশোরবাবু ও পুরী থেকে রাজেন্দ্রবাবু এসে পড়লেন। লখনউ থাকতে যে বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি আর দ্বারভাঙ্গা থেকে আগত এই ব্রজকিশোরবাবু একই ব্যক্তি নন ব'লে মনে হ'ল। এবার তাঁর মধ্যে দেখলাম বিহারীদের স্বভাবসুলভ বিনয়, সরলতা, সৌজন্য ও প্রত্যয়ের গভীরতা। হৃদয় আমার আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। তাঁর প্রতি অন্য বিহারী উকিলদের শ্রদ্ধা ও আস্থা দেখে আমি যেমন বিস্মিত হয়েছিলাম, তেমনি খুশিও হয়েছিলাম।

অনতিকাল পরে মনে হ'ল, এই মিত্রমণ্ডলীর সঙ্গে আমি যেন আজীবন অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা হয়ে আছি। ব্রজকিশোরবাবু মামলার সমস্ত তথ্য আমায় বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

চম্পারণের গরীব রায়তদের মামলা তিনি স্বেচ্ছাক্রমে নিজের হাতে নিতেন। আমি যখন সেখানে, তখনো আদালতে তাঁর এরকম দুটো মামলা ঝুলছিল। এইধরনের কোনো মামলায় জয় হ'লে, গরীবদের কিছু উপকার করা গেল এই ভেবে তিনি নিজের মনকে প্রবোধ দিতেন। এইসব সরলচিত্ত চাষাভুসোদের কাছ থেকে কোনোপ্রকার ফি না-নিয়েই যে তিনি মামলা চালাতেন, এমন নয়। সচরাচর উকিলেরা মনে করেন যে ফি না-নিলে তাঁদের সংসার চালানো দুষ্কর হয়ে উঠবে, আর সংসারের ব্যয়ই যদি নির্বাহ করা না-যায়—তাহলে কীভাবে এবং কতটুকুই-বা গরীবের উপকারে তাঁরা লাগতে পারবেন। তাঁরা কীরকম ফি নেন এবং বাংলা ও বিহারে ব্যারিস্টরেরা কী হারে ফি হাঁকেন সেইসব টাকার অঙ্ক শুনে তো আমি একেবারে স্তম্ভিত। আমায় তাঁরা জানালেন :

"কেবল পরামর্শটুকু দেবার জন্য আমরা তো অমুককে দশ হাজার টাকা ফি দিয়েছিলাম।" হাজার ছাড়া এঁদের মুখে কথা নেই। এই নিয়ে আমি তাঁদের মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলাম। তাঁরা আমার বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছিলেন এবং আমায় ভুল বোঝেননি।

আমি তাঁদের বললাম : "দেখুন, কেস্‌গুলো আমি ভালো ক'রে পড়েছি। পড়ে-শুনে আমার ধারণা, এসব কেস্ নিয়ে আইন-আদালত করতে যাওয়া বৃথা। সেটা বন্ধ করতে হবে, তার কারণ তা থেকে কোনো লাভ হবে না। যেখানে রায়তদের এভাবে পিষে মারা হচ্ছে, সবাই যেখানে ভীতসন্ত্রস্ত, সেখানে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে কী ফ্যায়দা? রায়তদের মন থেকে ভয়ের ভাবটুকু সমূলে নির্মূল করাই হবে কাজের মতন কাজ। তিনকাঠিয়া প্রথাকে বিহার থেকে ঝেঁটিয়ে বের ক'রে না-দেওয়া পর্যন্ত, আমাদের আর স্বস্তি নেই। ভেবেছিলাম দুটোদিনে এখানকার কাজ সেরে আমি চ'লে যেতে পারব। এখন দেখছি, দুই বছরেও এ কাজ হবে কি-না সন্দেহ। তেমন যদি দরকার হয়, ততটা সময়ও আমি একাজে দিতে পারি। আপাতত তো সবে পায়ের নিচের জমিটুকু পরখ ক'রে দেখছিমাত্র। সত্যি যখন কাজে নামতে পারব, আপনাদের সাহায্য দরকার হবে।" দেখা গেল, ব্রজকিশোরবাবু খুবই ঠাণ্ডামেজাজের মানুষ। তিনি শান্তভাবে বললেন : "আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য আমরা করব। এখন কীরকম সাহায্য আপনার দরকার সেই কথা আমাদের বুঝিয়ে বলুন।"

এইভাবে আমাদের আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে দুপুর-রাত অবধি। আমি তাঁদের বললাম : "দেখুন, আপনারা আইনজ্ঞ মানুষ, কিন্তু আপনাদের আইনের জ্ঞান আমার খুব একটা কাজে লাগবে না। মুহুরির কাজে ও দোভাষীর কাজে আমার সহায়তার প্রয়োজন। এ কাজে জেলে যাওয়াও দরকার হতে পারে। আপনারা যদি ততখানি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকেন, আমি খুবই খুশি হব। কিন্তু আমি বলি কী, আপনারা ঠিক ততটুকুই এগিয়ে আসুন, যতটা এগিয়ে আসা আপনাদের পক্ষে সম্ভব। অনির্দিষ্টকালের জন্য আপনাদের ওকালতি ব্যবস্থা বন্ধ রাখা, কিংবা ওকালতি ছেড়ে মুহুরিগিরি করা—সে-ও তো নেহাৎ চারটিখানি কথা নয়! এই অঞ্চলের দেহাতি হিন্দি বুঝতে আমার কষ্ট হয়। কৈথি কিংবা উর্দুতে লেখা দলিলপত্রাদি পড়তে আমি পারব না। ওগুলো আপনারা আমায় তর্জমা ক'রে দেবেন। পয়সা

খরচ ক'রে এসব কাজ করানো আমাদের সাধ্যাতীত। জনসেবার ভাব নিয়ে এসমস্ত কাজ বিনা-পয়সায় করতে হবে।"

ব্রজকিশোরবাবু আমার বক্তব্য চট্ ক'রে বুঝে নিলেন। পালাক্রমে আমার ও তাঁর সঙ্গীদের জেরা ক'রে তিনি সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে নিতে চাইলেন। কার্যক্ষেত্রে আমার বক্তব্যের অর্থ কেমন দাঁড়াবে, অর্থাৎ কাজটা শেষ করতে কতদিন লাগবে, কতজন লোককে দিয়ে কাজটা করাতে হবে, তারা পালাক্রমে কাজ করলে কাজ চলবে কি-না ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় তিনি জেনে নিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর উকিল-ভাইদের জিজ্ঞেস করলেন কে কতটা ত্যাগস্বীকার করতে পারবেন।

অবশেষে তাঁদের কাছ থেকে এই নিশ্চিতি পাওয়া গেল : "আমাদের মধ্যে থেকে কেউ-কেউ তৈরি থাকব যেমন কাজ আপনি আমাদের দিয়ে করিয়ে নিতে চান, তেমন সব কাজ করতে। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ-কেউ তৈরি থাকব যতটা সময় আপনি আমাদের কাছে চান, ততটা সময় দিতে। জেলে যাওয়ার ব্যাপারটা আমাদের কাছে নতুন। তা নিয়ে আমরা কতটুকু কী করতে পারি, ভেবে-চিন্তে দেখব।"

১৪. অহিংসার মুখোমুখি

আমি চেয়েছিলাম, সরেজমিনে চম্পারণ-এর কৃষক-সম্প্রদায়ের অবস্থার তদারকি করব এবং সেই সূত্রে নীলকরদের বিরুদ্ধে তাদের যেসব অভিযোগ ভালো ক'রে বুঝে নেব। এই উদ্দেশ্যসাধন করতে গেলে দরকার ছিল হাজার-হাজার রায়তের সঙ্গে সাক্ষাতে কথা বলা। মনে হ'ল, এই তদন্তের কাজে হাত দেবার আগে বিভাগীয় কমিশনার-এর সঙ্গে দেখা করা এবং নীলকরদের সপক্ষে যা বলবার থাকতে পারে সে তাদের নিজেদের মুখ থেকে জেনে নেওয়া আমার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য। দেখা করতে চেয়ে চিঠি লিখলাম। দুই পক্ষই সাক্ষাতের দিনক্ষণ স্থির ক'রে জবাব দিলেন।

নীলকর সমিতির সেক্রেটারি আমায় সোজা মুখের ওপর ব'লে দিলেন যে আমি একজন বহিরাগত লোক। জমির মালিক ও জমির রায়ত—এই উভয়ের মধ্যে কী ঘটছে-না-ঘটছে, তাই নিয়ে আমার নাক-গলানো নেহাৎই অনধিকারচর্চা। হ্যাঁ, তবে যদি আমার কিছু প্রার্থনাদি থাকে তাহলে আমি লিখিতভাবে দরখাস্ত পেশ করতে পারি। যথোচিত বিনয়-সহকারে তাঁকে আমি বললাম যে আমি নিজেকে বহিরাগত ব'লে মনে করি না, এবং রায়তরা যদি চায় তাহলে তাদের অবস্থার তদন্ত-তদারকি করায় আমার সম্পূর্ণ এক্তিয়ার আছে।

কমিশনার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতে তিনি আমায় খুব একচোট ধমকধামক দিয়ে শাসালেন এবং বললেন আমি যদি ভালো চাই তো যেন অগৌণে ত্রিহুত ছেড়ে চ'লে যাই।

আমার সহকর্মীদের এইসমস্ত কথা জানিয়ে বললাম যে আমি যাতে আর এগুতে না-পারি সেই উদ্দেশ্যে সরকার হয়তো আমায় বাধা দেবেন, হয়তো প্রত্যাশিত সময়ের আগেই আমায়

জেলে যেতে হতে পারে। গ্রেপ্তার যদি হতেই হয়, তাহলে হয় মোতিহারিতে কিংবা সম্ভব হ'লে বেতিয়াতে গ্রেপ্তার হওয়া ভালো। অতএব যথাসত্বর ওই দুই জায়গায় আমায় চ'লে যেতে হয়।

চম্পারণ ত্রিহুত বিভাগের একটি জেলা। মোতিহারি ওই জেলার সদর। রাজকুমার শুক্লের বাড়ি ছিল বেতিয়ার কাছে। বেতিয়ার প্রতিবেশী অঞ্চলে নীলকুঠির আশপাশে যেসব রায়তদের বাস, সারা জেলায় তাদের মতো দরিদ্র ও দুর্ভাগা আর-কেউ ছিল না। রাজকুমার শুক্ল চেয়েছিল আমি তাদের এই দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করি। এ বিষয়ে আমার আগ্রহও কিছু কম ছিল না।

সুতরাং সঙ্গী-সাথী-সহ সেদিনই আমি মোতিহারি রওনা হয়ে যাই। সেখানে বাবু গোরখাপ্রসাদ আমাদের আশ্রয় দেন, ফলে তাঁর বসতবাড়ি পান্থনিবাসে পরিণত হয়। টায়েটুয়ে কোনোপ্রকারে সেখানে আমাদের সকলের স্থান হ'ল। পৌঁছবার দিনই খবর এল, মোতিহারি থেকে পাঁচ মাইল দূরের একটি গ্রামে, একজন চাষীর ওপর অত্যাচার হয়েছে। স্থির হ'ল, পরদিন সকালবেলা বাবু ধরণীধর প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তাকে দেখতে যাব। গুজরাটে যেমন গোরুগাড়ি, চম্পারণে তেমন হাতিই হ'ল বহুব্যবহৃত বাহন। পরদিন হাতির পিঠে চেপে আমরা সেই গ্রামের পথে রওনা হলাম। অর্ধেক পথ যেতে-না-যেতে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর এক আর্দালি এসে আমাদের ধরল এবং বলল : "সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব আপনাকে সেলাম জানিয়েছেন।"

ব্যাপারটা বুঝে নিলাম। ধরণীধরবাবুকে আমাদের সেই গন্তব্য গ্রামের দিকে এগুতে ব'লে, আমি হাতির পিঠ থেকে নেমে, আর্দালির আনা ঠিকে গাড়িতে চ'ড়ে বসলাম। সে তখন আমার হাতে চম্পারণ ছেড়ে চ'লে যাবার একটি নোটিস জারি ক'রে আমাকে আমার বাসস্থান অবধি নিয়ে এল। আমার ওপর নোটিস জারি হয়েছে—সেই মর্মে একটি রশিদ লিখে দিতে বলায়, আমি আর্দালির হাতে একটি চিঠি লিখে পাঠালাম। চিঠিতে লেখা ছিল, যেহেতু আমার তদন্তের কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, আমার পক্ষে নোটিস মান্য ক'রে চম্পারণ ছেড়ে চ'লে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। চম্পারণ ছেড়ে চ'লে যাবার আদেশ অমান্য করার ফলে পরের দিন আদালতে হাজিরা দেবার সমন পেলাম।

সারারাত জেগে আমি যেখানে যেসব চিঠি লেখবার, লিখে ফেললাম ও বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদকে যেসব পরামর্শ দেবার ছিল, দিয়ে দিলাম।

নোটিস ও সমনজারির কথাটা দাবানলের মতো শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। লোকমুখে শুনেছিলাম, ইতিপূর্বে মোতিহারিতে এরকম দৃশ্য কেউ না-কি দেখেনি। গোরখবাবুর বাড়িতে ও কাছারিবাড়িতে সেদিন লোকে লোকারণ্য। ভাগ্যিস যা-যা করণীয় ছিল সমস্ত রাত্রে সেরে রেখেছিলাম, তা না-হ'লে অত লোকের ভিড়ের সঙ্গে এঁটে ওঠা শক্ত হ'ত। জনতাকে বাগে আনার কাজে আমার সঙ্গীরা প্রচুর সহায়তা করেছিলেন। আমি যেখানে-যেখানে যাচ্ছিলাম, লোকেরা দলে-দলে আমার পিছনে ছুটছিল। এই জনতাকে শান্ত রেখে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমার সঙ্গীরা।

কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের ও আমার মধ্যে একধরনের হৃদ্যতা জন্মায়। সরকারি নোটিসের বিরুদ্ধে আমি আইনত লড়তে পারতাম। তা না-ক'রে আমি সব নোটিস বিনা-বাক্যে মেনে নিয়েছিলাম। রাজকর্মচারীদের প্রতি আমার আচরণও ছিল শিষ্টতা-সম্মত। তা থেকে তাঁরা বুঝতে পারেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ বা বিরাগ ছিল না। আমি কেবল অহিংসভাবে তাঁদের অন্যায় হুকুম প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলাম। এতে তাঁরা কিঞ্চিৎ নিরাপদ ও নিরুদ্বেগ বোধ করেন এবং আমায় কোনোরকমে হেনস্থা না-ক'রে জনতা-নিয়ন্ত্রণে তাঁরা বেশ খুশি হয়েই আমার ও আমার সহকারীদের সহায়তা গ্রহণ করেন। সেইসঙ্গে তাঁরা এটাও বুঝতে পারেন যে তাঁদের প্রভুত্বের আসন যে টলেছে জনগণের আচরণই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ক্ষণকালের জন্য হ'লেও তারা দণ্ড-তিরস্কারের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে, তাদের নবলব্ধ বন্ধুর মধ্যে যে প্রেমের শক্তি দেখেছে তারই যেন অনুগামী হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, চম্পারণে কেউ আমায় চিনত না, জানত না। চাষীদের সকলেই ছিল নিরক্ষর ও অজ্ঞ। গঙ্গানদী থেকে অনেক দূরে, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে, প্রায় নেপালের কাছাকাছি হ'ল চম্পারণের অবস্থান। ভারতের অন্য অংশ থেকে যেন এ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন। এ দেশে বেশিরভাগ লোক কংগ্রেস-এর নাম পর্যন্ত শোনেনি। যদি-বা কেউ কংগ্রেস-এর নাম শুনেও থাকে, সে নাম মুখে আনতে তারা তখন ভয় পেত—কংগ্রেস-এর সদস্য হওয়া তো দূরের কথা। এতকাল পরে এবার এই অঞ্চলে কংগ্রেস ও কংগ্রেস-কর্মীদের যথার্থ প্রবেশ ঘটল—যদিচ কংগ্রেস-এর নামে নয়—তবু সত্য-সত্য কংগ্রেস-এরই কাজে।

আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ইতিপূর্বেই স্থির হয়েছিল যে কংগ্রেস-এর নামে আমরা কিছু করব না। নামের দিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না, আমাদের লক্ষ্য ছিল কাজে। মিথ্যা ছায়ার পিছনে আমরা ঘুরতে চাইনি, আমরা চেয়েছিলাম সত্যিকার খাঁটি কাজ। সে সময়ে বিহারের এই অঞ্চলে রাজকর্মচারীদের কাছে এবং এইসব সরকারি কর্মচারীদের কলের পুতুলের মতো নাচাতেন যেসব নীলকরেরা—তাঁদের কাছে, কংগ্রেস ছিল চক্ষুশূল। কংগ্রেস বলতে তাঁরা বুঝতেন উকিলদের বাক্‌যুদ্ধ, আইনের ফাঁক বের ক'রে আইনের কারচুপি, বোমা ও রাজদ্রোহ, কূটনীতি ও ছলচাতুরী। উভয় শ্রেণীর লোকেদের এই মিথ্যা ধারণা আমরা ঘোচাতে চেয়েছিলাম। তাই আমরা স্থির করেছিলাম যে কংগ্রেস্-এর নাম পর্যন্ত আমরা নেব না। চাষাভুসোদের ঘুণাক্ষরেও বলব না কংগ্রেস নামে কোনো প্রতিষ্ঠান আছে এবং কীভাবে সেখানে কাজকর্ম হয়। আমরা ভেবেছিলাম, কথায় না-হ'লেও কাজে যদি তারা কংগ্রেস-এর আদর্শ অনুসরণ ক'রে চলতে পারে, তাহলেই যথেষ্ট।

লোকের গোচরে বা অগোচরে খোলাখুলিভাবে কিংবা গোপনে কংগ্রেস থেকে কাউকে এ অঞ্চলে দৌত্য করতে পাঠানো হয়নি। কাউকে পাঠানো হয়নি ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে রাখতে। হাজার-হাজার কৃষকদের কানে বার্তা পৌঁছে দেবে, রাজকুমার শুক্লের তেমন ক্ষমতাই ছিল না। এর আগে এদের মধ্যে কেউ কোনো রাজনৈতিক কাজ করেনি। চম্পারণের বাইরের জগৎ সম্বন্ধে এদের কোনো ধারণাই ছিল না। তবু এরা আমায় এমনভাবে গ্রহণ করল যেন

এদের সঙ্গে যুগযুগান্তর সখ্যের ডোরে আমি বাঁধা। যা-ই আমি বলি, এইসব চাষাভুসোদের মুখোমুখি যখন আমি দাঁড়ালাম, অকস্মাৎ ভগবৎ-দর্শন আমার হ'ল, আমি হাতে-হাতে সত্য ও অহিংসা লাভ করলাম, তাহলে কেউ যেন মনে না-করেন, এ আমি বাড়িয়ে বলছি। যা আমি বললাম, তা বর্ণে-বর্ণে সত্য।

এই উপলব্ধি আমার কীভাবে ঘটল সে কথা যখন বিচার করতে বসি, বুঝতে পারি, এক মানুষকে ভালোবাসা ছাড়া আমি তো অন্য-কোনো সুকৃতি দাবি করতে পারি না। মানুষের প্রতি আমার এই প্রীতির উৎস হ'ল অহিংসায় অটল নিষ্ঠা। প্রেম অহিংসার ফলশ্রুতি।

চম্পারণের সেই একটি দিন আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন। চাষীদের যেমন, আমারও তেমনি সেই একটি দিন এসেছিল জীবনের পরমলগ্ন হয়ে।

আইন অনুসারে সেদিন আমায় কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল সত্য। কিন্তু আসলে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন সরকার-বাহাদুর। আমায় ধরবার জন্য কমিশনার-সাহেব যে ফাঁদ পেতেছিলেন, সে ফাঁদে পা দিয়েছিলেন সরকার স্বয়ং।

১৫. মামলা প্রত্যাহার

শুনানি শুরু হ'ল। সরকার-পক্ষের উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং ও অন্যান্য রাজকর্মচারীরা সবাই দস্তুরমতো ফাঁপরে প'ড়ে গেছেন, তাঁদের সকলেরই প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় গোছের অবস্থা। সরকারি উকিল ম্যাজিস্ট্রেটকে বারবার ক'রে বললেন কেস্‌টা যেন মুলতবি রাখা হয়। আমি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানালাম যে কেস্ যেন স্থগিত রাখা না-হয়, কারণ চম্পারণ ছেড়ে চ'লে যাবার আদেশ যে আমি অমান্য করেছি—সে অপরাধ আমি স্বীকার করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি। এই ব'লে আমি একটি বিবৃতি প'ড়ে গেলাম। তার কথাগুলি ছিল এইরকম :

"আদালতের অনুমতিক্রমে আমি ছোটো একটি বিবৃতি পেশ করতে চাই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আমার ওপর পেনাল কোড্-এর ১৪৪ ধারা অনুসারে যে অর্ডার জারি করা হয়েছিল, তা অমান্য ক'রে আমি খুবই একটি গুরুতর কাজ করেছি। কেন যে তা করেছি, সেই কারণটা আমি এখানে বিশদ করতে চাই। আমি সবিনয়ে বলব ব্যাপারটা আর-কিছু নয়, স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আমার মতের অনৈক্যমাত্র। জনকল্যাণ ও দেশসেবার বাসনা নিয়ে আমি এ দেশে এসেছি। আমার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ এসেছিল আমি এসে যেন এখানকার রায়তদের সাহায্য করি, কারণ রায়তদের দৃঢ় বিশ্বাস যে নীলকরদের কাছ থেকে তারা সুবিচার-সম্মত ব্যবহার পাচ্ছে না। সমস্যাটা ঠিক যে কী সেটা না-জেনে তো কোনোপ্রকার সাহায্য করা যায় না। তাই আমি এসেছি, ঠিক অবস্থাটা বুঝে নিতে—এবং সম্ভব হ'লে স্থানীয় শাসক-সম্প্রদায় ও নীলকরদেরই সাহায্যে। অন্য-কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমি তো আসিনি ; তাই আমার মনে হয় না আমার আসাতে লোকের শান্তি-

ভঙ্গ হতে পারে অথবা প্রাণহানি হ'তে পারে। আমার ধারণা, এইধরনের দশের কাজে—আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। স্থানীয় শাসকেরা কিন্তু কথাটা অন্যভাবে চিন্তা করেছেন। কোথায় তাঁদের অসুবিধা তা আমি একটু বুঝতে পারি। আমি এ কথাও মানি, তাঁরা যেমন-যেমন খবর পেয়েছেন, তাঁদের সেইমতো কাজ করতে হয়েছে। আইন-মান্যকারী অন্য নাগরিকদের মতো সরকারি আদেশ সঙ্গে-সঙ্গে মেনে নেওয়াটাই আমার স্বভাবসঙ্গত। এবারও আমার প্রথম-প্রথম সেইরকম ইচ্ছাই হয়েছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা যদি আমি কার্যে পরিণত করতাম, তাহলে যাদের জন্যে আমার এ দেশে আসা, তাদের প্রতি আমার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা হ'ত না। আমার মনে হয়, এতদ্দণ্ডে কেবলমাত্র তাদের মধ্যে থেকেই আমি তাদের সেবা করতে পারি। সুতরাং স্বেচ্ছায় চম্পারণ ছেড়ে আমি চ'লে যাব, সে আমি ভাবতে পারি না। এই দুই বিভিন্নপ্রকার কর্তব্যের পরস্পর-বিরোধিতার মধ্যে প'ড়ে আমার যে অবস্থা হয়েছে, তাতে রায়তদের কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে নেবার দায়িত্ব আমায় বাধ্য হয়ে চাপাতে হচ্ছে স্থানীয় শাসকদের ওপর। ভারতের সার্বিক জীবনে আমি যেপ্রকার স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছি-সেখানে যথেষ্ট যত্ন ও সাবধানতা-সহকারে আমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা দরকার। সে কথা আমি সম্যক্ অবগত আছি। এটাও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জটিল শাসনব্যবস্থার অধীনে আমাদের জীবননির্বাহ করতে হয়, তাতে আমার মতো অবস্থায় পড়লে, যে কোনো আত্মসম্ভ্রমী ব্যক্তির পক্ষে নিরাপদ ও সম্মানজনক একটিমাত্র পথ খোলা রয়েছে। আমি সেই পথে চলব ব'লে মনঃস্থির করেছি অর্থাৎ আইন অমান্য করার দরুণ যদি দণ্ড আমার প্রাপ্য হয় তা আমি বিনা-প্রতিবাদে মেনে নেব।

"যে দণ্ড আদালত আমার বিরুদ্ধে ধার্য করবেন, সেটাকে লঘু করার উদ্দেশ্যে সাফাই হিসাবে আমার এই বিবৃতি পেশ করছি, এমন নয়। আমি এইটুকুই বলতে চাই যে আইনের অধিকারকে অশ্রদ্ধা করার জন্য আমি কর্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করেছি এমন নয়, করেছি সেই উচ্চতর আইনের নির্দেশ পালন করার জন্য, যাকে বলা হয় বিবেকের বাণী।"

অতঃপর শুনানি মুলতবি রাখার জন্য সঙ্গত কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারি উকিল এরকম একটি অভাবনীয় ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ব'লে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায় দেওয়া স্থগিত রাখলেন। ইতিমধ্যে সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আমি ভাইস্‌রয়, পাটনা-স্থিত বন্ধুদের, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও অন্যান্যদের কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে দিই।

দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করার জন্য আদালতে হাজিরা দেবার আগেই, ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছ থেকে লিখিত বার্তা এসে গেল যে ছোটোলাটের হুকুম-অনুসারে আমার বিরুদ্ধে কেস্ তুলে নেওয়া হ'ল। কলেক্টর সাহেবও পত্রযোগে জানালেন, প্রস্তাবিত তদন্ত আমি যদি চালিয়ে যেতে চাই আমায় কেউ বাধা দেবে না, বরঞ্চ আবশ্যক হ'লে কাজকর্মচারীরা তদন্তের কাজে আমায় যথাসাধ্য সহায়তা করবেন। এমন চট্ ক'রে এরকম সুফল যে ফলবে—এ আমরা কেউই ভাবতেও পারিনি।

কলেক্টর মিস্টার হেকক্-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মনে হ'ল, লোকটি ভালো

এবং ন্যায়ের পথে চলার জন্য আগ্রহী। তদন্তের কাজে যে কোনো কাগজপত্র দেখবার দরকার হ'লে আমি চেয়ে নিতে পারি ব'লে মিস্টার হেকক্ আমায় বললেন, আর বললেন যে তাঁর সঙ্গে আমার যখন খুশি আমি গিয়ে দেখা করতে পারি।

অহিংস থেকে কীভাবে আইন অমান্য করা যায় সে বিষয়ে দেশ এইভাবে তার প্রথম পাঠ গ্রহণ করল। চম্পারণে তো বটেই, খবরকাগজেও এই ব্যাপার নিয়ে দেশময় আলোচনা হয়। তার ফলে আমার এই তদন্তের কাজ আশাতিরিক্ত প্রচার লাভ করে।

তদন্ত ঠিকমত চালিয়ে যেতে হ'লে দরকার ছিল যে সরকার-পক্ষ নিরপেক্ষ থাকবেন। তার জন্য বিভিন্ন খবরকাগজ থেকে তাঁদের নিজস্ব সংবাদদাতা মোতিহারিতে পাঠাবার দরকার ছিল না। সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই প্রসঙ্গ নিয়ে বাদানুবাদ প্রকাশ করারও কোনো দরকার ছিল না। বস্তুত সেসময় চম্পারণের অবস্থাটা ছিল যেমন জটিল, তেমনি স্পর্শকাতর। তখন কাগজে-কাগজে জোরালো সমালোচনা কিংবা অতিরঞ্জিত রিপোর্ট প্রকাশ করা মানে আমার প্রস্তাবিত কাজে বিঘ্ন ঘটানো। সুতরাং বড়ো-বড়ো কাগজের সম্পাদকদের আমি চিঠি লিখে জানালাম, তাঁরা যেন কষ্ট ক'রে রিপোর্টার না-পাঠান। প্রকাশযোগ্য খবর কিছু যদি থাকে তা আমি নিজেই তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেব এবং নিয়মিত তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলব।

আমি বুঝেছিলাম, সরকার আমায় তদন্তের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য চম্পারণে থাকবার হুকুম দেবার ফলে, নীলকর সাহেবরা খুশি হতে পারেননি। খোলাখুলিভাবে মুখে কিছু না-বললেও রাজকর্মচারীরাও যে ভেতরে-ভেতরে এই ব্যবস্থা পছন্দ করেননি, তা-ও আমি জানতাম। মিথ্যা খবরে কিংবা যে খবর থেকে ভুল ধারণা জন্মাতে পারে, তেমন খবর যদি কাগজে বের হতে থাকে, তাহলে তো এই উভয়পক্ষই তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠবেন। তখন আমাকে ছেড়ে তাদের এই আক্রোশ গিয়ে পড়বে ওইসব গরীব ও ভীতসন্ত্রস্ত রায়ত বেচারিদের ওপর। তার ফলে এই মামলার ঠিকঠাক তথ্য অনুসন্ধানের পথে আমায় গুরুতর বাধার সম্মুখীন হতে হবে।

এত সাবধানে আঁটঘাট বেঁধে সন্তর্পণে চলা সত্ত্বেও, নীলকরেরা আমার বিরুদ্ধে একটা বিষে-ভরা আন্দোলন গ'ড়ে তুলেছিল। খবরকাগজে আমার ও আমার সঙ্গীদের নামে তারা নানারকম কুৎসা রটনা করেছিল। কিন্তু আমার অতিসতর্কতা এবং নিতান্ত সামান্য ব্যাপারেও সত্যপালনে আমার প্রবল নিষ্ঠা থাকায়, যে আঘাত তারা আমায় হানতে চেয়েছিল, সে আঘাত তাদের গায়েই গিয়ে লাগে।

নীলকরেরা ব্রজকিশোরবাবুর নামে যতরকম কুৎসা রটানো যায়, রটাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার ফল হ'ল উল্‌টো ; যত তাঁকে ওরা নিন্দা করে, লোকসমাজে ততই যেন তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকল।

অতিসামান্য কারণে অনর্থ ঘ'টে যেতে পারে, চম্পারণে তখন ছিল এইরকম পরিস্থিতি। এই অবস্থায় অন্য প্রদেশের কোনো নেতাকে বিহারে ডেকে আনা সঙ্গত হবে না ব'লে আমার মনে হয়েছিল। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আমায় ভরসা দিয়ে লিখেছিলেন যে আমি

একবার ডাক দিলেই তিনি এসে পড়বেন। তাঁকেও আমি কষ্ট দিইনি। এর ফলে চম্পারণের সংগ্রাম রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। কিন্তু নেতাদের কাছে এবং বড়ো- বড়ো কাগজের সম্পাদকদের কাছে আমি মাঝে-মাঝে রিপোর্ট পাঠিয়ে বলতাম, এসব রিপোর্ট কেবল তাঁদের অবগতির জন্য, প্রকাশের জন্য নয়। আমি দেখেছি, শেষ লক্ষ্য রাজনৈতিক যদিও-বা হয়, নীতিগত প্রশ্ন অর্থাৎ অ-রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন করতে গেলে, তার মধ্যে রাজনীতির ছোঁওয়া লাগলে উদ্দেশ্যসাধনে ক্ষতি হয় এবং রাজনীতি থেকে বিচ্যুত করলে কাজটা সহজতর হয়। ক্ষেত্র যেমনই হোক্-না-কেন, জনগণের নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা আখেরে যে রাজনৈতিক দিক থেকেও দেশ এগিয়ে যেতে পারে, চম্পারণের আন্দোলন থেকে আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

১৬. তদন্ত-পদ্ধতি

চম্পারণ তদন্তের আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে যাওয়া মানে সেই সময়কার চম্পারণে রায়তদের ইতিহাসের অবতারণা করা। আমার জীবনকথার প্রসঙ্গে সেইসব বিস্তারিত বিবরণ দেবার কোনো অর্থ নেই। এক হিসেবে চম্পারণ তদন্ত ছিল সত্য ও অহিংসার পথে একটি দুঃসাহসী পদক্ষেপ। সেইদিক থেকে সপ্তাহে-সপ্তাহে যেসব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল, আমি কেবল সেইগুলিরই উল্লেখ করতে চাই। আপনাদের মধ্যে যাঁরা তার বিশদ বিবরণ জানতে ইচ্ছা করেন তাঁরা হিন্দিতে লেখা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের চম্পারণ সত্যাগ্রহের ইতিহাস পড়তে পারেন। শুনেছি, তার একটি ইংরেজি অনুবাদ শীঘ্রই বেরুবার কথা।

আপাতত আমাদের তদন্ত-পদ্ধতি বিষয়ে দু-চার কথা বলা যাক্। গোরখবাবুর বাড়িতে ব'সে তদন্ত চালানো সম্ভবপর ছিল না। তা যদি করা হ'ত তাহলে বেচারা গোরখবাবুকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যেতে বলতে হ'ত। ভাড়া-বাড়ি পাওয়া সম্ভবপর হ'ত না, কারণ আমাদের বাড়ি-ভাড়া দেবার মতো বুকের পাটা তখনো মোতিহারির লোকেদের ছিল না। যাই হোক্, ব্রজকিশোরবাবু একটা কায়দা ক'রে অনেকখানি খোলা জায়গা-সমেত একটা বাড়ি জোগাড় করলেন। আমরা সকলে সেখানে উঠে গেলাম।

একেবারে বিনা-পয়সায় কাজ চালিয়ে যাওয়া ঠিক সম্ভবপর ছিল না। এইরকম কাজের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থসাহায্য ভিক্ষা করার রেওয়াজ তখন ছিল না। ব্রজকিশোরবাবু ও তাঁর অধিকাংশ বন্ধুই ছিলেন উকিল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে থেকে টাকাটা হয় তুলে দিতেন, নতুবা দরকার পড়লে অন্য বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে টাকা পেয়ে যেতেন। নিজেদের মধ্যে থেকেই টাকাটা যদি উঠে যায় তাহলে অন্যদের কাছ থেকে টাকা চাওয়া যায় কী ক'রে? এই ছিল তাঁদের যুক্তি। আমি স্থির করেছিলাম, চম্পারণ-রায়তদের কাছ থেকে আমি একটি পয়সাও নেব না। তা যদি করতে যাই, লোকে নিশ্চয় তার কদর্থ করবে। সেইসঙ্গে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলাম এই তদন্তের কাজ চালাবার জন্য আমি দেশের জনসাধারণের

কাছে হাত পাতব না। সেরকম করতে গেলে একটা স্থানীয় সমস্যা সর্বভারতীয় রূপ নিত ও রাজনীতি-ঘেঁষা হয়ে পড়ত। বোম্বাইয়ের বন্ধুরা ১৫ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের সেই দান প্রত্যাখ্যান করি। স্থির করলাম, ব্রজকিশোরবাবুর মধ্যস্থতায় ও সাহায্যে, চম্পারণের বাইরে যেসব ধনবান্ ও বিত্তবান্ বিহারী আছেন, তাঁদের কাছ থেকে যতটা অর্থসাহায্য পাওয়া সম্ভব তা গ্রহণ করব, এবং তাতে যদি না-কুলায় তাহলে আমার রেঙ্গুন-স্থিত বন্ধু ডক্টর প্রাণজীবন মেহ্‌তার শরণাপন্ন হব। ডক্টর মেহ্‌তা ব'লে রেখেছিলেন, দরকার হ'লেই তিনি টাকা পাঠিয়ে দেবেন। সুতরাং টাকার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না। চম্পারণে দরিদ্রদের দুর্গতি দেখে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম যে তাদের আস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যতটা সম্ভব কম খরচে আমরা কাজ চালিয়ে যাব। সুতরাং খুব বেশি টাকার দরকার হবে ব'লে মনে হয়নি। আখেরে দেখাও গেল যে বাস্তবপক্ষে খুব বেশি-কিছু আমাদের খরচ করতে হয়নি। আমার ধারণা সবসুদ্ধ আমরা, তিন হাজার টাকার বেশি খরচ করিনি। যদ্দুর মনে পড়ে, যে টাকা সংগৃহীত হয়েছিল, তা থেকে কয়েক শো টাকা বেঁচে গিয়েছিল।

প্রথমদিকে আমার সঙ্গীসাথীদের জীবনযাত্রার ধরনধারণ আমার কাছে এমন অদ্ভুত ঠেকত যে তাই নিয়ে আমি প্রায়ই হাসিঠাট্টা ক'রে একহাত নিতাম। প্রত্যেকটি উকিলের একটি ক'রে চাকর ও ঠাকুর ছিল। প্রত্যেকের হেঁসেল ছিল আলাদা। অনেকসময় দুপুর-রাতের আগে তাঁদের রাতের খাওয়া হয়ে উঠত না। যদিচ নিজেদের খরচ তাঁরা নিজেরাই চালাতেন, তাঁদের এসব অনিয়ম আমার ভালো ঠেকত না। আমার ঠাট্টাতামাশা তাঁরা হাসিমুখেই সহ্য করতেন ; ইতিমধ্যেই তাঁদের সঙ্গে আমার এমনি ভাব জ'মে উঠেছে যে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কোনো বালাই ছিল না। শেষপর্যন্ত স্থির হয়, ঠাকুর-চাকর বিদায় ক'রে সকলে এক হেঁসেলে এবং নির্দিষ্ট সময়ে আহারাদি করবেন। এঁরা সবাই আবার নিরামিষাশী ছিলেন না। কিন্তু দু-দুটো রান্নাঘর চালাতে গেলে খরচ বেশি প'ড়ে যাবে ব'লে স্থির হয়, সকলেই নিরামিষ খাবেন এবং রান্নাবান্না হবে সাদাসিধে-ধরনের।

এইসব ব্যবস্থার ফলে খরচ অনেক হ্রাস পেল। সময় ও পরিশ্রমের অপব্যয়ও অনেকখানি নিবারণ করা গেল। সেইসময় এই দুটি জিনিসের প্রয়োজন হয়েছিল সমধিক। বিবৃতি দেবার জন্য দলে-দলে চাষীরা সব আসতে লাগল। তাদের পেছন-পেছন সঙ্গীসাথী আত্মীয়স্বজন প্রচুর আসত ব'লে, বাড়ির হাতায় ও বাগানে লোক যেন আর ধরত না। দর্শনার্থীদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করতে গিয়ে আমার সঙ্গীরা প্রায়ই বিফলকাম হতেন। ফলে বারকয়েক নির্দিষ্ট সময়ে আমায় দেখা দিতেই হ'ত। বয়ান লিখে নেবার জন্য পাঁচ-সাতজন স্বেচ্ছাব্রতী নিয়ত ব্যস্ত থাকতেন, তৎসত্ত্বেও অনেকসময় কিছু-কিছু লোক বয়ান লেখাতে না-পেরে, সন্ধ্যা লাগতে হতাশ হয়ে রাতে ফিরে যেত। সব বিবৃতি লিখে নেবার ঠিক দরকারও হ'ত-না, কারণ অনেকে একইধরনের কথা বলত। তবু তাদের সন্তোষের জন্য তাদের বক্তব্য শুনতে হ'ত। তাদের আগ্রহ দেখে আমার বেশ ভালো লাগত।

বিবৃতি যাঁরা লিখে নিতেন তাঁদের কয়েকটা নিয়ম মেনে চলতে হ'ত। বলা ছিল, প্রত্যেকটি কৃষককে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করতে হবে। জেরায় যে আটকে যেত, তার বিবৃতি

বাতিল করা হ'ত। এইভাবে বিবৃতি লিখতে গিয়ে অতিরিক্ত সময় লাগত বেশ-খানিকটা, কিন্তু শেষপর্যন্ত যা দাঁড়াত তা হ'ত একেবারে অকাট্য।

ডিটেক্‌টিভ বিভাগের একজন-না-একজন অফিসার বিবৃতি লিখে নেবার সময় সর্বদা হাজির থাকত। ইচ্ছা করলে তদের আসা-যাওয়া অবশ্যই বন্ধ করা যেত। কিন্তু প্রথম থেকেই আমরা স্থির ক'রে নিয়েছিলাম যে তাদের উপস্থিতি নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য তো করবই না, উপরন্তু তাদের প্রতি সৌজন্য দেখাব এবং সম্ভবপক্ষে তারা যেসব খবরাখবর চায়, সরবরাহ করব। তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। উল্‌টে বরঞ্চ তাদের সামনাসামনি বিবৃতি দেবার ফলে চাষীদের মনে অধিকতর সাহসের সঞ্চার হয়েছিল। সি. আই. ডি.-দের সম্বন্ধে তাদের অযথা আতঙ্ক দূর হওয়া ছাড়াও, ডিটেক্‌টিভদের উপস্থিতিতে বিবৃতি দিতে গিয়ে তারা সংযত হয়ে কথা বলত, অতিরঞ্জন করতে যেত না। সি. আই. ডি. বন্ধুদের কাজই হ'ল লোকেদের ফাঁদে-ফ্যাসাদে ফেলা, সুতরাং চাষীরা তাদের সামনে দস্তুরমতো সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলত।

আমার বাসনা ছিল, নীলকরদের বিরক্তি উৎপাদন না-ক'রে ভদ্র ব্যবহারে তাঁদের চিত্ত জয় করা। তাই যেসব নীলকরদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থাপিত হ'ত, আমি অগৌণে তাঁদের কাছে চিঠি লিখে সাক্ষাতে সব কথা জানাতাম। নীলকরদের সমিতির অধিবেশনেও উপস্থিত থেকে আমি চাকরদের অভিযোগের বিষয় তাঁদের জানাতাম ও সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য বিষয়ও জেনে নিতাম। নীলকরদের কেউ-কেউ আমায় ঘৃণা করত, কেউ-কেউ উপেক্ষাও করত। আবার মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যবহারে আমি সৌজন্যের পরিচয়ও পেয়েছি।

১৭. চম্পারণের সঙ্গী

জুটি হিসাবে ব্রজকিশোরবাবু ও রাজেন্দ্রবাবুর তুলনা হয় না। তদন্তের কাজে তাঁরা এমনই তদ্‌গত ছিলেন যে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ না-ক'রে আমি একটি পা-ও অগ্রসর হতাম না। তাদের সঙ্গীসাথী বা সাগরেদ বলতে অন্য যেসব উকিল ছিলেন—যেমন শম্ভুবাবু, অনুগ্রহবাবু, ধরণীবাবু, রামনবমীবাবু প্রভৃতি এঁরা তো সর্বক্ষণই থাকতেন আমাদের সঙ্গে। মাঝে-মাঝে বিন্ধ্যবাবু ও জনকধারীবাবুও আসতেন আমাদের কাজে সহায়তা করতে। এঁরা সকলেই ছিলেন বিহারের লোক—বিহারী। রায়তদের বিবৃতি লিখে নেওয়া ছিল তাঁদের মুখ্য কাজ।

আর আচার্য কৃপালানী যে আমাদের সঙ্গে জুটে পড়বেন, এতে আর আশ্চর্য কী। তিনি সিন্ধি হ'লে কী হয়, বিহারের খাঁটি বিহারীর চাইতে তিনি কিছু কম বিহারী ছিলেন না। যাঁরা দেশের কাজ করেন, তাঁরা যখন অন্য প্রদেশে গিয়ে বসেন, তাঁদের মধ্যে সামান্য দু-চারজনকে দেখেছি যাঁরা বেমালুম সেই প্রদেশের লোকের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন। আচার্য কৃপালানী ছিলেন সেই দু-একজনের একজন। তিনি যে অন্য প্রদেশের লোক,

তাঁকে দেখে সে কথা বোঝবার কোনো উপায় ছিল না। উনি ছিলেন আমার সদার দারোয়ান। আমায় দর্শনার্থীদের হাত থেকে রক্ষা করাটা তিনি কিছুদিনের জন্য তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কখনো হাসিঠাট্টা ক'রে, কখনো-বা অহিংস হুম্‌কির সাহায্য নিয়ে তিনি দর্শনার্থীদের ভিড় রুখতেন। রাত হ'লে তিনি তাঁর মাস্টারি শুরু ক'রে দিতেন। ইতিহাসের নানা বিষয় আলোচনা ক'রে তিনি শ্রোতাদের চিত্তবিনোদন করতেন। এমনসব টীকাভাষ্য দিতেন যাতে স্বভাবভীরু লোকের মনেও সাহসের সঞ্চার হ'ত।

ডাকা-মাত্র যারা হাজির হতে রাজি, তেমনসব সহায়কদের নামের তালিকায় মৌলানা মজহর-উল হক্ নিজের নাম লিখিয়েছিলেন। মাসে দুয়েকবার তিনি নিয়ম ক'রে দেখা দিয়ে যেতেন। তখন তিনি যেরকম জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যবিলাসের মধ্যে থাকতেন, তার সঙ্গে তাঁর আজকের দিনের সাদাসিধে জীবনযাত্রার আকাশ-পাতাল তফাৎ ছিল। তাঁর নবাবিয়ানা দেখে অন্য লোকদের মনে যেরকম ধারণাই হোক্-না-কেন, তিনি আমাদের সঙ্গে এমনভাবে মিশতেন যে আমাদের মনে হ'ত তিনি আমাদেরই একজন।

বিহার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা যত বেশি বৃদ্ধি পেতে লাগল, আমি স্থিরনিশ্চয় হলাম যে গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা না-করা পর্যন্ত এ প্রদেশে স্থায়ী কোনো কাজ গ'ড়ে তোলা সম্ভবপর হবে না। গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা ছিল শোচনীয়। গ্রামের ছেলেমেয়েরা হয় টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াত নতুবা দুটো পয়সার জন্য নীলকরদের ক্ষেতে উদয়াস্ত মেহনৎ করত। তখনকারদিনে মুনিসদের মজুরী ছিল দিনে দশ পয়সার বেশি নয় ; কামিনরা ছ-পয়সা আর ছেলেমানুষেরা তিন পয়সার বেশি পেত না। যে লোক দিনে চার আনা রোজগার করল, তাকে মনে করা হ'ত বিশেষ ভাগ্যবান্।

সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে স্থির করলাম, ছ-টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলব। গ্রামবাসীদের সঙ্গে একটা রফা করা গেল, শিক্ষকদের থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা তারা করবে। অন্যান্য সব খরচ আমরাই যোগাব। গ্রামবাসীদের হাতে নগদ পয়সা বড়ো-একটা থাকত না, কিন্তু চালটা-ডালটা তাদের ক্ষেত থেকেই উঠত। বাস্তবিকপক্ষে ইতিপূর্বেই তারা ব'লে রেখেছিল মাস্টারের খোরাকিটা তারা সিধের মতো ক'রে নিজেদের মধ্যে থেকেই তুলে দেবে।

শিক্ষক যে কোথা থেকে পাওয়া যাবে, এখন সেটাই মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সামান্য পকেট-খরচ নিয়ে কিংবা বিনা-বেতনে কাজ করবেন, এমন মাস্টার স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে পাওয়া ছিল দস্তুরমতো কঠিন। যেমন-তেমন শিক্ষকদের হাতে ছোটোদের শিক্ষার ভার থাকবে, এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না। লেখাপড়ায় তারা সকলেই ব্যুৎপন্ন না-হ'লেও কিছু আসে যায় না, যদি তারা চরিত্রশক্তিতে দৃঢ় হয়।

স্বেচ্ছাব্রতী হিসেবে শিক্ষাদান করবেন এইরকম শিক্ষকদের জন্য আমি কাগজে একটি আপিল বের করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল। বাবাসাহেব সোমন ও পুণ্ডলিককে পাঠিয়ে দিলেন গঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে। বোম্বাই থেকে এলেন অবন্তিকাবাঈ গোখলে আর পুণা থেকে আনন্দীবাঈ বৈশম্পায়ন। আশ্রম থেকে ছোটেলাল, সুরেন্দ্রনাথ ও আমার ছেলে দেবদাসকে আমি আনিয়ে নিলাম। এইরকম সময়ে আমার সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে

নিলেন সপত্নীক মহাদেব দেশাই ও নরহরি পারিখ। কস্তুরবাকেও এই কাজে ডেকে নিলাম। বেশ-একটা জোরালো দল গ'ড়ে উঠল। অবন্তিকাবাঈ ও আনন্দীবাঈ উভয়েই বেশ শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু দুর্গা দেশাই ও মণিবেন পারিখের বিদ্যার দৌড় ছিল যৎসামান্য গুজরাতি। কস্তুরবার আবার সেটুকুও ছিল না। এইসব মহিলারা হিন্দি ভাষায় কী ক'রে তাহলে ছোটোদের শিক্ষা দেবেন?

আমি এঁদের বুঝিয়ে বললাম, তাঁরা ছোটোদের দিয়ে যতটা-না অঙ্ক কষাবেন, লেখাপড়া শেখাবেন, ব্যাকরণ পড়াবেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ক'রে শেখাবেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও উত্তম চালচলন। তাঁদের আরো বলেছিলাম যে এমন-কি গুজরাতি, হিন্দি ও মরাঠি হরফে তারা যতখানি তফাৎ আছে ব'লে অনুমান করেন, আসলে কিন্তু ততটা তফাৎ নেই। তাছাড়া প্রাথমিক শ্রেণীতে বর্ণপরিচয় কিংবা সংখ্যা গুণতে শেখানো, এমন-কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে না। এর ফলে এই মহিলারা যেসব ক্লাস নিয়েছিলেন, সেইসব ক্লাসে বেশ ভালো কাজ হয়েছিল। হাতেকলমে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের আত্মবিশ্বাস জন্মেছিল, কাজ ক'রেও তাঁরা বেশ আনন্দ পেতেন। অবন্তিকাবাঈয়ের পাঠশালা আদর্শ পাঠশালায় পরিণত হয়েছিল। তিনি তাঁর কাজে প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছিলেন। শিক্ষকতার কাজে তাঁর যেমন ছিল প্রবণতা, তেমনি যোগ্যতা। এইসব মহিলাদের মধ্যস্থতায় আমরা তবু খানিকটা যেন গাঁয়ের মেয়েদের নাগাল পেয়েছিলাম।

কিন্তু কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেই আমার কর্তব্য শেষ হ'ল ব'লে আমি মনে ভাবিনি। গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্যরক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গলিগুলি ছিল নোংরা জঞ্জালে ভরা, কুয়োগুলোর আশেপাশে কাদা ও দুর্গন্ধ, বাড়ির উঠোনগুলি ছিল অসহ্য অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়, বুড়ো ধাড়িদের ধ'রে-ধ'রে সেই শিক্ষা দেবার দরকার ছিল। তাদের সকলেরই নানাপ্রকার চর্মরোগ। সুতরাং স্থির হয়, যতটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য-রক্ষার কাজে লাগতে হবে এবং গ্রামজীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটির মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতে হবে।

এ কাজে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়। সার্ভেন্টস্ অব ইন্ডিয়া সোসাইটির কাছে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালাম এ কাজ করার জন্য তাঁরা যেন ডক্টর দেবকে পাঠান। আমার সঙ্গে ডক্টর দেবের বেশ হৃদ্যতা ছিল। চিঠি পাবার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ছয়মাসকালের জন্য সবার কাজ করতে রাজি হয়ে চ'লে এলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা যাঁরা ছিলেন, সবাইকে বলা হ'ল, এবার থেকে তাঁরা ডক্টর দেবের অধীনে, তাঁর নির্দেশমতো কাজ করবেন।

সকলকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারে কিংবা রাজনীতি নিয়ে তাঁরা যেন মাথা না-ঘামান। কারো যদি কোনো অভিযোগ থাকে, আমার কাছে যেন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কর্মীদের মধ্যে কেউ যেন আপন গণ্ডির বাইরে একটিবারের জন্যও পা না-দেন। তাঁরা সকলে অদ্ভুত নিষ্ঠায় আমার সমস্ত নির্দেশ পালন করেছিলেন। একটি দিনের জন্যও নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয়েছিল ব'লে আমার মনে পড়ে না।

১৮. গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ

আমাদের চেষ্টা ছিল, সম্ভবপর হ'লে, প্রত্যেকটি স্কুলের ভার একজন ক'রে পুরুষ ও একজন ক'রে মহিলা কর্মীর হাতে ন্যস্ত করা। এইসব স্বেচ্ছাসেবকের অন্যতম কাজ ছিল আরোগ্য-বিধান ও সাধারণভাবে স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করা। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কাজ করতেন মহিলাকর্মীরা।

আরোগ্য-বিধানের ব্যাপারটা ছিল খুবই সাদাসিধে-ধরনের। স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে যেসব ওষুধপত্র দেওয়া হ'ত, তা ছিল নিছক রেড়ির তেল, কুইনিনের বড়ি ও গন্ধকের মলম। জিভে ক্লেদ দেখা দিলে কিংবা পেট পরিষ্কার না-থাকলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার জন্য রেড়ির তেল দেওয়া হ'ত। জ্বরজ্বালায় প্রথমে একদফা রেড়ির তেল খাওয়ানোর পর, কুইনিনের ব্যবস্থা করা হ'ত। ফোড়া বা খোস-পাঁচড়া দেখা দিলে প্রথমে জায়গাটা বেশ ভালো ক'রে ধুয়ে নিয়ে গন্ধকের মলম লাগানো হ'ত। কোনো রোগীকে বাড়িতে ওষুধ নিয়ে যেতে দেওয়া হ'ত না। গোলমেলে-ধরনের অসুখ হ'লে ডক্টর দেবের পরামর্শ নেওয়া হ'ত। সপ্তাহের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে ডক্টর দেব পালাক্রমে প্রত্যেকটি কেন্দ্র পরিদর্শনে বেরুতেন।

রোগশান্তির এই সাদাসিধে ব্যবস্থার সুযোগ অনেক লোকই নিত। মনে রাখা দরকার, গ্রামদেশে ব্যাধির প্রাদুর্ভাব খুব বেশি হয় না। তেমন কঠিন অসুখও বড়ো-একটা হয় না যা সহজে নিরাময় হবার নয়, অথবা যার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রয়োজন হয়। এই কথাটুকু মনে রাখলে আমরা আরোগ্য-বিধানের যে পরিকল্পনা নিয়েছিলাম, সেটাকে উদ্ভুট্টি ব'লে কেউ হয়তো মনে করবেন না। আর গ্রামের লোকের দিক থেকে যদি দেখা হয়, তাহলে তো বলতে হয়, এতে তাদের খুবই উপকার হয়েছিল।

আরোগ্য-বিধানের চেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করাটা ছিল আরো কঠিন। গ্রামের লোক সাফাই প্রভৃতি কাজে কিছুতেই হাত লাগাতে চাইত না। যেসব কিষান নিজের হাতে চাষবাস করে, তারা পর্যন্ত নিজেদের বাড়ির আবর্জনা নিজেদের হাতে নিকেশ করতে চায় না। কিন্তু ডক্টর দেব সহজে দ'মে যাবার পাত্র ছিলেন না। একটি গ্রামকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদর্শরূপে দাঁড় করাবার জন্য তিনি ও তাঁর স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। রাস্তাঘাট, উঠোন-আঙিনা তাঁরা ঝাড়ু দিয়ে সাফ্‌সুতরো করলেন, কুয়োগুলো ঝালিয়ে নিলেন ও তার আশেপাশের খানাখন্দ বুজিয়ে দিলেন। অন্তরের আবেগ ঢেলে তাঁরা গ্রামবাসীদের ডাক দিলেন যেন স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে তাঁরা নিজেদের গাঁয়ের কাজ নিজেদের হাতেই তুলে নেন। কোনো-কোনো গাঁয়ে নিতান্ত মুখলজ্জার খাতিরে কিছু-কিছু লোক এগিয়ে আসত। আবার কোনো-কোনো গাঁয়ে উৎসাহ এমন প্রবল হ'ত যে গ্রামবাসীরা নিজেদের গতর খাটিয়ে রাস্তা পর্যন্ত তৈরি করত, যাতে আমি মোটর চেপে ওইসব অঞ্চল ঘুরে-ঘুরে দেখে যেতে পারি। বলাবাহুল্য, সকল ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা মধুর হয়েছিল বললে ভুল বলা হবে। কোনো-কোনো গাঁয়ে সমূহ গ্রামবাসির নিশ্চেষ্ট অলসতা আমাদের পক্ষে

বেদনার কারণ হয়েছিল। মনে পড়ে, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ বেশ খোলাখুলি স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে এরকম বারোয়ারি কাজ তারা পছন্দ করে না।

এখানে আমার একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইতিপূর্বে একাধিক সভায় আমি এ বিষয়ে বলেছি। ভীতিহর্‌বা নামে একটি ছোট্ট গাঁয়ে আমাদের একটি স্কুল ছিল। তারই কাছাকাছি, একটি আরো ছোটো গাঁয়ে গিয়ে আমি দেখতে পাই যে কতিপয় মেয়ের পরনে নোংরা ময়লা শাড়ি। আমার স্ত্রীকে বলি, তিনি যেন এদের জিজ্ঞেস করেন এরা কাপড় ধোয় না কেন। তিনি সে কথা বলতে মেয়েদের মধ্যে একজন কস্তুরবাকে নিজের কুড়েঘরে নিয়ে গিয়ে বলে, "ভালো ক'রে একবার দেখে নিন। এ ঘরে কাপড়চোপড় রাখবার না-আছে বাক্সপেট্‌রা, না-আছে আলমারি। পরনে আমার যা দেখছেন সেটাই আমার একমাত্র কাপড়। এখন বলুন, এ কাপড় আমি ধুই কখন ও কী ক'রে? মহাত্মাজীকে বলুন আমায় আরেকটা শাড়ি এনে দিতে। তাহলে আমি রোজ নাইব, রোজ ধোয়া কাপড় পরব, এই আমি আপনাকে কথা দিলাম।"

সারা ভারতে এমন কুড়েঘর তো একটিমাত্র নয়। ভারতের অসংখ্য গ্রামদেশে এরকম কুড়েঘর বিস্তর আছে, এটি তো নমুনামাত্র। বাক্সপেট্‌রা নেই, একখানির জায়গায় দুখানি কাপড় নেই—শতচ্ছিন্ন কানি প'রে লোকটা লজ্জা নিবারণ করছে, এমন হাজারো ঘর আছে আমাদের দেশে।

আরো একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলা দরকার। চম্পারণে বাঁশ ও খড়ের কোনো অভাব নেই। ভীতিহর্‌বার স্কুলঘরটি ছিল বাঁশ ও খড়ের তৈরি। একদিন রাতের অন্ধকারে কে যেন এসে স্কুলঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আশেপাশে নীলকরদের যেসব লোক থাকত, হয়তো তাদেরই কেউ এ কাজটা ক'রে থাকবে। এই অগ্নিকাণ্ডের পর মনে হ'ল আবার বাঁশে-খড়ে তৈরি কাঁচা বাড়ি তোলাটা ঠিক হবে না। ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সোমন ও কস্তুরবা। সোমন স্থির করলেন, এবার পাকা স্কুলবাড়ি তুলবেন। সোমন নিজের হাতে গাঁথনির কাজ করতে লেগে গেলেন। তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আরো-পাঁচজন এসে হাত লাগাল। দেখতে-দেখতে পাকা স্কুলবাড়ি খাড়া হ'ল। মনে ভরসা এল যে, এ বাড়ি চট্‌ ক'রে আগুনে পোড়ানো যাবে না।

এভাবে স্কুলের কাজ, স্বাস্থ্য-রক্ষা ও আরোগ্য-বিধানের কাজ করার ফলে, স্বেচ্ছা-সেবকেরা গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠেন। ফলে ভালো কাজের একটা প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে আমায় স্বীকার করতে হচ্ছে যে এইসব সংগঠনের কাজকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য আমার মনে যে বাসনা ছিল তা অপূর্ণ থেকে যায়। স্বেচ্ছাসেবকেরা এসেছিলেন নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য। বাইরে থেকে নতুন কর্মী আর পাওয়া গেল না। আর বিহার থেকে বিনা-বেতনে স্থায়ী স্বেচ্ছাকর্মী পাবার জো ছিল না। আমার চম্পারণের কাজ সারা হয়ে যাবার ঠিক পরে, বাইরে যেসব কাজ আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিল, আমায় চম্পারণের কাছ থেকে একপ্রকার জোর ক'রেই যেন ছিনিয়ে নিল। তৎসত্ত্বেও ওই

কয়েক মাসের কাজ, চম্পারণের জমিতে খুবই গভীরভাবে শেকড় গেড়েছিল বলতে হবে, কেন-না কোনো-না-কোনোভাবে তার প্রভাব আজও নজরে পড়ে।

১৯. শাসক যদি লোক ভালো হন

ইতিপূর্বে সমাজসেবার কাজের কথা আপনাদের বলেছি। সেই কাজের সঙ্গে-সঙ্গে অন্য কাজটাও অর্থাৎ রায়তদের নালিশ-অভিযোগের বয়ান লিখে নেবার কাজটাও বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। হাজার-হাজার লোকের বয়ান লিখে নেবার ফলে, তার একটা অবশ্যম্ভাবী ফল ফলল। অভিযোগকারী রায়তদের সংখ্যা যেমন-যেমন বাড়তে লাগল, নীলকর সাহেবদের মেজাজও তেমন-তেমন সপ্তমে চড়তে লাগল। আমার এই তদন্তের কাজ পণ্ড ক'রে দেবার জন্য তারা উঠে-প'ড়ে লাগল।

বিহার সরকারের তরফ থেকে একদিন এই মর্মে একটি চিঠি এল : "আপনার তদন্তের কাজটা নিয়ে তো বেশ-কিছুদিন কাটালেন। এবার সে কাজে ক্ষান্ত দিয়ে বিহার ছেড়ে চ'লে গেলে হয় না?" চিঠির কথাগুলো মোলায়েম হ'লেও তার অর্থটা ছিল সুস্পষ্ট।

জবাবে আমি জানালাম, এরকম তদন্তের কাজে তো সময় কিছুটা লাগবেই। এই তদন্তের ফলে যতদিন-না লোকের দুঃখ-দুর্গতির উপশম হয়, ততদিন বিহার ছেড়ে আমি আদৌ চ'লে যেতে চাই না। সরকারকে এ কথাও বলি, রায়তদের অভিযোগ যদি তাঁরা সত্য ব'লে মেনে নেন ও অভিযোগের কারণগুলি দূর করেন, তাহলে তো আমার তদন্তের কাজ আপনা থেকেই শেষ হয়ে যায়। অন্যথায়, আপাতদৃষ্টে রায়তদের অভিযোগ মিথ্যা না-ও হতে পারে, এরকম একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে, একটি সরকারি তদন্ত কমিটি গঠন ক'রে অবিলম্বে তার কাজ শুরু ক'রে দেওয়া উচিত।

বিহারের লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নর স্যর এডওঅর্ড গেইট্ এই চিঠি পেয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমায় ডেকে পাঠান। একটি তদন্ত-কমিটি নিয়োগ করবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে তিনি আমায় তার সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। অন্যান্য সদস্য কারা সেই কমিটিতে থাকবেন—তাঁদের নামগুলো দেখে নিলাম। সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্যর এডওঅর্ডকে জানিয়ে দিলাম, তদন্ত-কমিটির সদস্যপদ নিতে আমি রাজি তবে কতকগুলি শর্তে। যেমন :

- তদন্ত চলার সময় সহকর্মীদের কাছ থেকে শলা-পরামর্শ নেওয়ায় আমার কোনো বাধা থাকবে না।
- তদন্ত কমিটির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হ'লেও, রায়তদের পক্ষ সমর্থনে তাদের হয়ে ওকালতি করায় আমার অধিকার বলবৎ থাকবে।
- তদন্তের ফলাফল যদি আমার সন্তোষজনক না-হয়, যদি কমিটির সুপারিশ আমার কাছে অসঙ্গত মনে হয়, তাহলে রায়তেরা কীভাবে কোন্ পথে চলবে, সে বিষয়ে উপদেশ-নির্দেশ দিতে গেলে কেউ আমায় বাধা দেবে না।

আমার শর্তগুলি যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত ব'লে স্যর এডওআর্ড স্বীকার ক'রে নিলেন ও তদন্তের কথা ঘোষণা ক'রে দিলেন। কমিটির চেয়ারম্যানরূপে নিযুক্ত হলেন স্যর ফ্রাংক স্লাই।

তদন্ত-কমিটি রায়তদের সপক্ষে রায় দিলেন। তাঁরা সুপারিশ করলেন :

• রায়তদের কাছ থেকে জুলুমবাজি ক'রে যেসব কর বে-আইনিভাবে আদায় করা হয়েছিল, তার একটা অংশ নীলকর সাহেবদের ফেরৎ দিতে হবে, এবং

• আইন ক'রে তিনকাঠিয়া প্রথা রদ করতে হবে।

কমিটি যে সর্বসম্মত রিপোর্ট পেশ করেছিল এবং কমিটির সুপারিশ-মাফিক যে ভূমি-আইন পাশ করা হয়েছিল—এর পেছনে অনেকখানি হাত ছিল স্যর এডওঅর্ড গেইট্-এর। তিনি যদি শক্ত না-হতেন, সকলকে একপথে চালনার জন্য নৈপুণ্য না-দেখাতে পারতেন, তাহলে রিপোর্ট সর্বসম্মত হ'ত না, ভূমি-আইনও পাশ করানো যেত না। নীলকর সাহেবদের হাতে ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। রিপোর্ট-এর সুপারিশ সত্ত্বেও, ভূমি-আইনের বিরোধিতা করার জন্য তারা উঠে-প'ড়ে লেগেছিল। কিন্তু, স্যর এডওঅর্ড প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তাঁর স্বমতে দৃঢ় ছিলেন। কমিটির সুপারিশ-মাফিক সব-কিছু কাজ তিনি সুসম্পূর্ণ করেছিলেন, বিন্দুমাত্র ইতস্তত না-ক'রে।

যে তিনকাঠিয়া প্রথা প্রায় শতাধিক বৎসর বিহারে কায়েম ছিল, এইভাবে তার অবসান ঘটল। এই প্রথা রদ হবার সঙ্গে-সঙ্গে নীলকর-রাজের উচ্ছেদ ঘটল। এতকালের দলিত নিপীড়িত রায়ত সম্প্রদায়, এতদিনে যেন নিজেদের সম্বিৎ ফিরে পেল, নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কিছুটা যেন সচেতন হয়ে উঠল। চম্পারণের গ্রামে-গ্রামে একটি অন্ধ কুসংস্কার এতকাল ধ'রে বাসা বেঁধে ছিল যে নীলের দাগ শতবার ধুলেও মুছে যেতে চায় না, এতদিনে প্রমাণ হ'ল সে প্রবাদ মিথ্যা।

ইচ্ছা ছিল, আরো-কয়েকটা বছর বিহারে থেকে গ্রাম-সংগঠনের কাজ করব, আরো-অনেকগুলি স্কুল পত্তন করব, গ্রামজীবনের অভ্যন্তরে আরো নিবিড়ভাবে প্রবেশ করব। এইধরনের কাজের জন্য জমি প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু ভগবান যেন হাত চেপে ধরলেন। এর আগেও তিনি আমার পরিকল্পনামতো কাজ করতে দেননি। আমি ভাবলাম এক, কিন্তু অদৃষ্টের বিধান ছিল আর। শেষপর্যন্ত দৈবই যেন আমায় একপ্রকার জোর ক'রে তাড়িয়ে নিয়ে গেল অন্য-একটি কাজের ক্ষেত্রে।

২০. শ্রমিক-সংসর্গ

বিহারে সেই কমিটির কাজ সবেমাত্র গুটিয়ে নিতে শুরু করেছি, এমনসময় মোহনলাল পাণ্ড্যে ও শঙ্করলাল পারিখ-এর কাছ থেকে চিঠি এল। খেড়া জেলায় অজন্মার ফলে চাষীর বাড়িতে ফসল উঠেছে যৎসামান্য। নির্ধারিত হারে খাজনা দেবার ক্ষমতা তাদের নেই। এই অবস্থায় তাদের কী করণীয় সে বিষয়ে আমি কি তাদের পথ দেখাতে পারি? অকুস্থলে সরেজমিনে সব-কিছু না-দেখে পরামর্শ দেওয়া আমার ধাতে সয় না। আমার সে শক্তিও নেই, সাহসও নেই, যে হুট্ করে একটা নির্দেশ দিয়ে দিতে পারি।

ওই একইসময়ে আমেদাবাদে মিল-মজুরদের দুরবস্থার বর্ণনাসহ শ্রীমতী অনসূয়াবাঈয়ের একটি চিঠি এল। মজুরদের মজুরি ছিল কম, মজুরিবৃদ্ধির জন্য তারা বেশ-কিছুকাল ধ'রে আন্দোলন চালাচ্ছিল। সুযোগ-সুবিধা পাই তো তাদের এই আন্দোলন পরিচালনা করি—সেরকম একটা অভিপ্রায় আমার মনে ছিল। চম্পারণের তুলনায় এই আন্দোলনের ব্যাপারটা ছোটো ব'লে মনে হ'লেও, দূরদেশে ব'সে আমেদাবাদের আন্দোলন চালাব, এমন ভরসা আমার ছিল না। তাই ফুরসৎ পাবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম দানেই আমি আমেদাবাদ চ'লে গেলাম। গোড়ায় ভেবেছিলাম, খেড়া জেলা ও আমেদাবাদের দুটো কাজই কয়েকদিনের মধ্যে সেরে ফেলা এবং অতঃপর চম্পারণে ফিরে এসে সেখানে পল্লীপুনর্গঠনের প্রারব্ধ কাজ তদারকি করতে পারব।

কিন্তু যত ঝটিতি সব-কিছু মিটে যাবে ব'লে আমার মনে হয়েছিল, তেমনটা কার্যক্ষেত্রে হয়ে উঠল না। চম্পারণে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর হ'ল না, ফলে একে-একে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে গেল। আমি ও আমার সহকর্মীরা আমাদের চম্পারণের কাজ নিয়ে মনে-মনে অনেক আকাশকুসুম রচনা করেছিলাম। আপাতত আমাদের সমস্ত আশা শূন্যে মিলাল।

আমরা ভেবেছিলাম, শিক্ষা ও গ্রাম সাফাইয়ের কাজ ছাড়াও অন্য যেসব কাজ আমরা চম্পারণে হাতে নেব, তার অন্যতম হবে গো-সেবা। দেশে ঘুরতে-ফিরতে গিয়ে আমি লক্ষ করেছিলাম যে গো-সেবা ও হিন্দি প্রচার নিয়ে কেবল যেন মারোয়াড়িদেরই মাথাব্যথা, কাজটা যেন তাদেরই একচেটিয়া। বেতিয়ায় থাকতে এক মারোয়াড়ি বন্ধু আমায় তাঁর ধরমশালায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। স্থানীয় মারোয়াড়ি সম্প্রদায়ের কথায় তাঁদের গোশালার কাজ দেখতে আমার আগ্রহ জন্মায়। গো-রক্ষণ বিষয়ে আমার মতামত তার আগে থেকেই তৈরি ছিল। সে কাজ কীভাবে চালানো যায় সে বিষয়ে আমার ধারণা আজও পূর্ববৎ। গো-রক্ষণ বলতে আমি বুঝতাম, প্রকৃষ্টভাবে গরুর লালন-পালন, উন্নততর গো-জাতির প্রজনন, বলদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার নিবারণ, আদর্শ দুগ্ধ-উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। মারোয়াড়ি-বন্ধুরা আমার এ কাজে সম্পূর্ণ সহযোগ করবেন ব'লে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু চম্পারণে আমি স্থির হয়ে বসতে পারলাম কই? সুতরাং সেই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা আর গেল না।

বেতিয়ার সেই গোশালা আজও সেখানে আছে, কিন্তু তা আর আদর্শ দুগ্ধ-উৎপাদন

কেন্দ্রে পরিণত হয়নি। তার সাধ্যের অতীত কাজ করিয়ে নেবার জন্য, চম্পারণের বলদের লেজে আজও ক'ষে মোচড় দেওয়া হয়। নামে যারা হিন্দু, আজও তারা নির্দয়ভাবে গরুকে প্রহার করে ও নিজেদের ধর্মের ওপর কলঙ্ক লেপন করে।

আমার চম্পারণের প্রারব্ধ কাজ আমি সম্পূর্ণ করতে পারিনি—এ নিয়ে নিত্য আমি অনুশোচনা অনুভব করি। যখনই চম্পারণ যাই, আর আমার শান্ত শিষ্ট বিহারী ও মারোয়াড়ি বন্ধুরা এ নিয়ে আমায় তাঁদের মৃদু অনুযোগ জানান, আমার সেই আচম্‌কা ছেড়ে-দেওয়া অসমাপ্ত কৃত্যগুলির কথা ভেবে আমি মনে-মনে হা-হুতাশ করি।

চম্পারণের নানা জায়গায় শিক্ষাদানের কাজ কোনো-না-কোনোরকমে চলেছে। কিন্তু গো-সেবার কাজ সেখানকার জমির গভীরে শিকড় চালাতে পারেনি ব'লে, আমার ঈপ্সিত পথে সে কাজ এগোতে পারেনি।

খেড়ার চাষীদের ব্যাপারে কী করা যায় বা না-যায়, সে নিয়ে তখনো আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে আমেদাবাদের মিল-মজুরদের কাজটা আমি হাতে নিই।

পরিস্থিতিটা খুবই অস্বাস্তিকর ব'লে মনে হ'ল। মজুরদের দাবি ছিল ন্যায্য। তাদের দিকে লড়াইয়ে নামলেন অনসূয়াবাঈ—আর অপরদিকে মিল-মালিকদের পক্ষে লড়াইয়ে নামলেন তাঁরই সহোদর ভাই, অম্বালাল সারাভাই। মিল-মালিকদের এপর্যন্ত বন্ধুভাবেই দেখে এসেছি। তাঁদের সঙ্গে সোজাসুজি লড়াইয়ে নামা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। তাঁদের সঙ্গে প্রথমে কথাবার্তা ক'য়ে দেখলাম। শ্রমিকদের দাবি ন্যায়সঙ্গত কি-না সেই বিচারের ভার সালিশের হাতে দেবার অনুরোধ জানালাম। তাঁরা গোঁ ধ'রে বসলেন যে মালিক-মজুরদের প্রশ্নে তাঁরা সালিশি-মীমাংসার নীতি কিছুতেই মেনে নেবেন না।

অগত্যা মজুরদের বলতে হয় ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে। সে কথা বলবার আগে মজুর ও তাদের দলের নেতাদের খুব নিকট-সম্পর্কে আসবার জন্য তাদের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করেছিলাম। ধর্মঘট সফল ক'রে তুলতে হ'লে কী-কী শর্ত পালন করা দরকার, সে বিষয়ে তাদের বুঝিয়ে বলি :

এক । কোনো অবস্থাতেই হিংসামূলক কাজ করা চলবে না।

দুই । যেসব মজুর ধর্মঘটে যোগ দিতে না-চায়, কোনোমতে তাদের হেনস্তা করা চলবে না।

তিন । ভিক্ষার ওপর নির্ভর ক'রে ধর্মঘটে নামা কিছুতেই উচিত হবে না।

চার । ধর্মঘট যতদিন ধ'রেই চলুক-না-কেন, শক্ত হয়ে থাকতে হবে। ধর্মঘটের সময় সৎ উপায়ে গতর খাটিয়ে রুজি-রোজগার করতে হবে।

এইসব শর্ত বুঝেসুঝে শ্রমিক নেতারা মেনে নিলেন। মজুরেরা একটি সাধারণ সভায় জমায়েত হয়ে একযোগে শপথ নিল যে যদ্দিন তাদের দাবি মানা না-হয় অথবা বিবাদ-নিষ্পত্তির ভার মালিকেরা সালিশের হাতে না-দেন—ততদিন তারা কাজে ফিরে যাবে না।

আমেদাবাদের এই মিল-মজুর ধর্মঘটের সূত্রে বল্লভভাই প্যাটেল ও শঙ্করলাল বাঙ্কার-এর

সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। অনসূয়াবাঈকে আমি আগের থেকেই বেশ ভালো ক'রে চিনতাম।

সবরমতী নদীর ধারে একটি গাছের তলায় প্রতিদিন আমরা ধর্মঘটী মজুরদের সঙ্গে মিলতাম। মজুরেরা হাজারে-হাজারে হাজির হ'ত। তাদের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রতিদিন আমি তাদের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম, বলতাম, তারা যেন কিছুতেই শান্তিভঙ্গ না-করে, আত্মসম্মান না-খোয়ায়। 'এক টেক' অথবা একই পণ লেখা পতাকা হাতে নিয়ে, মজুরেরা প্রতিদিন শহরের রাস্তায়-রাস্তায় শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করত।

ধর্মঘট চলেছিল একুশ দিন ধ'রে। ধর্মঘট চালু থাকাকালে মাঝে-মাঝে আমি মিল-মালিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম, অনুনয় করতাম যেন তাঁরা শ্রমিকদের প্রতি সুবিচার করেন। জবাবে তাঁরা বলতেন, "আমাদেরও তো পণ থাকতে পারে। মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ক হ'ল বাপ-বেটার সম্পর্ক। আমাদের বাপ-বেটার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি নাক গুঁজতে যাবে, সে যেমন কথা? বাপ-বেটার মধ্যে কি সালিশি করা চলে?"

২১. আশ্রমের ওপর একপলক

শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দেবার আগে, আশ্রমের ওপর একপলক চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। চম্পারণে যতদিন ছিলাম আশ্রমের কথা সর্বদা মনে গাঁথা হয়ে থাকত। দু-চারবার ছুট্‌ ক'রে তখন আশ্রমে ঘুরেও গেছি।

তখন আশ্রম ছিল আমেদাবাদের উপকণ্ঠে, কোচরব ব'লে একটি ছোটো গ্রামে। কোচরবে প্লেগ লাগে। স্পষ্টই বুঝলাম, চার দেওয়ালের মধ্যে আমরা নিজেরা যতই সাফ্‌সুতরো থাকি-না-কেন, আশেপাশের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও তার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার কোনো উপায় ছিল না। তখন আমাদের এমন কোনো ক্ষমতা ছিল না যে আমাদের কথায় কোচরব-এর লোকেরা স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম আপনা থেকে পালন করবে। গ্রামের উন্নতিসাধনে আমরা নিজেরাও যে কিছু করব, তেমন আমাদের শক্তি ছিল না।

আমরা বুঝেছিলাম, আমাদের আশ্রম পত্তনের আদর্শ জায়গা হবে শহর ও গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে। তাহলে ছোঁয়াচ থেকে আমরা নিরাপদ থাকব, অথচ শহর ও গ্রামের সঙ্গে যাতায়াতের সুবিধা থাকবে। আর, আমাদের নিজস্ব জমিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে আমরা বসবাস করি, সে অভিলাষ তো আমাদের বরাবরই ছিল।

প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব আমার কাছে এল কোচরব ছেড়ে উঠে যাবার নোটিসরূপে। মুঞ্জাভাই হীরাচাঁদ নামে আমেদাবাদের জনৈক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তখন আশ্রমের বেশ একটা হৃদ্যতা হয়েছিল। শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ সেবার ভাব নিয়ে, আশ্রমের নানা কাজে তিনি আমাদের সহায়তা করতেন। আমেদাবাদের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট জানাশুনো ছিল। তিনি একদিন উপযাচক হয়ে বললেন, আশ্রম পত্তন করবার মতো জমি তিনিই খোঁজ ক'রে বের করবেন।

কোচবর-এর উত্তরে ও দক্ষিণে তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার পর, মুঞ্জাভাইকে আমি বললাম, তিনি যেন কোচরব-এর উত্তর দিকে তিন-চার মাইলের মধ্যে জমির সন্ধান করেন। বর্তমানে আমাদের আশ্রম যে জায়গায় অবস্থিত, সে জায়গা তিনিই খুঁজে বের করেন। জায়গাটা সবরমতী সেন্ট্রাল জেল-এর খুব কাছে বলায় আমার আগ্রহ আরো যেন বেড়ে গেল। সত্যাগ্রাহীদের কপালে জেলে যাওয়া যখন অবধারিত, জেলের কাছেপিঠে সত্যাগ্রহ আশ্রম পত্তন করাই তো সুবিধা। তাছাড়া আমি জানতাম, আশেপাশে জায়গাজমি সাধারণভাবে সাফ্‌সুতরো না-হ'লে সরকার তেমন জায়গায় জেলখানা বসাতে চান না।

দিন-আষ্টেকের মধ্যে বেচাকেনা দলিলপত্রাদির ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। জমিতে ঘরবাড়ি তো দূরের কথা, গাছপালাও ছিল না। তবে সুবিধার মধ্যে ছিল এই যে জমি সবরমতী নদীর ধারে এবং জায়গাটা নিরিবিলি।

স্থির করলাম, যতদিন-না স্থায়ী ঘরবাড়ি ওঠে ততদিন আমরা তাঁবু খাটিয়ে থাকব। কেবল রান্নাবান্নার জন্য একটি টিনের চালা তুলতে হবে।

আশ্রমে লোকজনের সংখ্যা আস্তে-আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মেয়ে-পুরুষে, ছোটোতে-বড়োতে মিলে আমরা তখন প্রায় চল্লিশটি প্রাণী। একই হেঁসেলে আমরা খাওয়াদাওয়া করি। আশ্রম স্থানান্তর করার সিদ্ধান্তটা ছিল আমার নিজের। সেই সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার ভার দেওয়া হয়েছিল—যথাপূর্বম্—মগনলালকে।

স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের দুর্ভোগের অবধি ছিল না। তখন বর্ষা আগতপ্রায়, প্রয়োজনীয় সমস্ত রশদ আনতে হ'ত চার মাইল দূরে শহরের বাজার থেকে। জমিটা বহুকাল ধ'রে পতিত অবস্থায় প'ড়ে ছিল ব'লে, সাপের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। এমন অবস্থায় কচিকাচাদের নিয়ে থাকাটা, দস্তুরমতো বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কথা। সাধারণভাবে ব'লে দেওয়া হয়েছিল যে সাপ-মারা আশ্রমের নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাই ব'লে সাপের ভীতি যে আমাদের মন থেকে ঘুচেছিল এবং এখনো যে আমাদের মনে সাপের ভয় নেই—এমন কথা আমি বলতে পারি না। এ কথা অকপটে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভালো।

ফিনিক্স্‌-এ, টলস্টয় ফার্ম্‌-এ এবং সবরমতীতে বিষধর সরীসৃপকে অবধ্য জ্ঞান করার রীতি প্রচলিত ছিল। এই তিন জায়গাতেই পতিত জমিতে আমাদের বসতি স্থাপন করতে হয়েছিল। কিন্তু কোথাও সর্পাঘাতে প্রাণনাশ হয়নি। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর চোখে যখন এই ঘটনাটা দেখি, এর মধ্যে আমি ভগবানের কৃপার পরিচয় পাই। এ নিয়ে কেউ যেন বিতর্ক না-তোলেন, যেন না-বলেন যে ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করেন না কিংবা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতে নাক গলাবার মতো অবসর তাঁর নেই। আমার নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতায় আমি যে ঘটনাকে সত্য ব'লে মেনেছি, তা অন্যভাবে প্রকাশ করি—এমন ভাষা আমার নেই। ভগবানের বিধান কীভাবে, কোন্‌ পথে চলে, মানুষের ভাষার সাধ্য কী যে তার যথাযথ বর্ণনা দেয়। ভগবান ও ভগবানের বিধান যে বর্ণনার অতীত, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য—কেবল ততটুকুই আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি। তবু যদি মর্ত্যলোকের মানুষ সেই অমৃতস্বরূপের গুণাগুণ প্রকাশ করতে চায়, তাহলে তার নিজের অস্ফুট ও অপরিণত ভাষার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর

নেই। তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো প্রকাশের বাহন মানুষের আয়ত্তে নেই। সাপ বা বিছে না-মারার ব্রতপালন করা সত্ত্বেও, গত পঁচিশ বছরে যে কারো প্রাণহানি হয়নি, সেটাকে আমি যদি নিছক আকস্মিক ঘটনা ব'লে মনে না-করতে পারি, যদি বলি এই ঘটনার পিছনে আছে ভগবানের কৃপা, তাহলে কেউ-কেউ হয়তো বলবেন, এটা আমার নেহাৎই কুসংস্কার। কুসংস্কার যদিই-বা হয়, তবু এই বিশ্বাস আমি সবলে অবলম্বন ক'রে থাকব।

কাপড়কলের মজুরদের ধর্মঘট তখনো চলছে। সেইসময়েই আমাদের তাঁত-ঘরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তখন আশ্রমের প্রধান উদ্‌যোগই ছিল কাপড় বোনা। সুতো কাটার ব্যাপারটা আসে আরো পরে।

২২. অনশন

প্রথম দুই সপ্তাহ মিল-মজুরেরা যে সাহস ও সংযম দেখিয়েছিল তা একেবারে অসাধারণ। রোজ তাদের সভা বসত, বিরটা সভায় তারা যোগ দিত হাজারে-হাজারে। প্রত্যেক অধিবেশনে আমি তাদের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিতাম। হাজারো কণ্ঠে তারা আমায় নিশ্চিতি জানিয়ে বলত যে তারা বরঞ্চ প্রাণ দেবে কিন্তু কিছুতেই কথার খেলাপ করবে না।

এতদিনে তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে শুরু করল। শরীর যাদের দুর্বল, মেজাজ তাঁদের যেমন খিট্‌খিটে হয়, তেমনি ধর্মঘটে ভাঙন ধরার সঙ্গে-সঙ্গে, ধর্মঘট-ভঙ্গকারী মজুরদের প্রতি তাদের রাগ যেন ফেটে পড়তে লাগল। আমার আশঙ্কা হ'ল, যে কোনো মুহূর্তে তারা হয়তো মারধোর হাঙ্গামা শুরু করতে পারে। প্রতিদিনের সভায় যোগদানকারীদের সংখ্যা ধীরে-ধীরে হ্রাস পেতে লাগল। যারা যোগ দিতে আসত তাদেব মুখে-চোখে হতাশার ভাব আর যেন চাপা থাকত না। অবশেষে আমার কাছে খবর এল যে ধর্মঘটীরা হাল ছেড়ে দেবার মতলব করেছে। খবরটা পেয়ে ভারি অস্বস্তি বোধ করলাম। ভাবতে লাগলাম, এরকম অবস্থায় আমার কী করণীয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি বিরাট ধর্মঘট-পরিচালনার অভিজ্ঞতা আমার ছিল। কিন্তু এখানে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম, তা ছিল সম্পূর্ণ অন্যধরনের। মিল-মজুরেরা আমার কথায় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল। দিনের পর দিন আমার সামনে দাঁড়িয়ে তারা সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করেছে। তারা এখন সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙতে পারে—সে সম্ভবনা আমি কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার এই মনোভাবের মূলে কী ছিল—আমার অহমিকা, মজুরদের প্রতি আমার প্রীতি না সত্যের প্রতি আমার ঐকান্তিক অনুরাগ? নিশ্চয় ক'রে কে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে?

একদিন সকালবেলা, মিল-মজুরদের সভায় ব'সে, মনে-মনে হাৎড়ে বেড়াচ্ছি, কিছুতেই পথ খুঁজে পাচ্ছি না, হঠাৎ যেন একটা আলো দেখতে পেলাম। আপনা থেকে আমার মুখে, কেমন ক'রে যেন কথা জোগাল। আমি সভার সামনে ঘোষণা করলাম, "ধর্মঘটীরা যদি

তাদের সঙ্কল্পে দৃঢ় না-হয়, মিট্‌মাট্‌ না-হওয়া পর্যন্ত যদি তারা ধর্মঘট চালিয়ে না-যায় অথবা মিল ছেড়ে চলে না-যায়, ততদিন আমি অন্ন স্পর্শ করব না।"

আমার কথা শুনে মজুরেরা বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। অনসূয়া বেনের দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। শ্রমিককেরা ব'লে উঠল, "না, না, আপনি নয়, আমরাই অনশন করব। আপনি উপোস করলে সে অতি সাঙ্ঘাতিক হবে। আমরা ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। কথা দিচ্ছি, আপনাকে যে শেষপর্যন্ত আমরা প্রতিজ্ঞায় অটল থাকব।"

আমি তাঁদের বললাম, "আপনারা উপোস করতে যাবেন কেন? তার কোনো দরকার নেই। আপনারা যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, সেই পণটুকু রক্ষা করতে পারলেই যথেষ্ট। আপনারা জানেন, আমাদের হাতে পয়সা-কড়ি নেই। পক্ষান্তরে জনসাধারণের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর ক'রে আমরা ধর্মঘট চালিয়ে যেতে চাই না। সুতরাং পেট চালাবার মতো মজদুরি আপনাদের করতেই হবে। তাহলে ধর্মঘট অনির্দিষ্টকালের জন্য চালিয়ে গেলেও আপনাদের দুর্ভাবনায় পড়তে হবে না। আর, আমার অনশনের কথা বলছেন ; ধর্মঘট মিট্‌মাট্‌ হয়ে গেলে অমি অনশনভঙ্গ করব।

ইতিমধ্যে বল্লভভাই চেষ্টা করতে লাগলেন মিউনিসিপালিটির কোনো কাজে মিল-মজুরদের বহাল করা যায় কি-না। কিন্তু সেখানে সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। মগনলাল বললেন যে আশ্রমে আমাদের তাঁত-ঘরের ভিতে বালি ভরাট করার জন্য কিছু মজুরকে কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রস্তাবটা মজুরদের মনে ধরল। অনসূয়াবাঈ মাথায় এক ঝুড়ি বালি ব'য়ে পথ দেখালেন। সঙ্গে-সঙ্গে সবরমতী নদী থেকে আশ্রম পর্যন্ত অসংখ্য শ্রমিক কাতার দিয়ে দাঁড়াল। মাথায় ব'য়ে নিয়ে ঝুড়ি-ঝুড়ি বালি ফেলতে লাগল তাঁত-ঘরের ভিতে। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। শ্রমিকদের মনে যেন নূতন শক্তির সঞ্চার হ'ল। তাদের মজুরি চুকিয়ে দিতে গিয়ে মগনলালকে হিমসিম খেতে হ'ল।

আমার এই অনশনের ব্যাপারে মস্ত একটা খুঁত ছিল। ইতিপূর্বেই তো আপনাদের বলেইছি, মিল-মালিকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ ও হৃদ্যতাপূর্ণ। আমি জানতাম, তাঁদের মনঃস্থির করার ব্যাপারে, আমার উপবাসের প্রভাব তাঁদের ওপর পড়তে বাধ্য। সুতরাং সত্যাগ্রহী হিসেবে তাঁদের বিরুদ্ধে অনশনের অস্ত্র ধারণ করা আমার পক্ষে সাজে না। উচিত ছিল, কেবলমাত্র মিল-মজুরদের ধর্মঘট দিয়ে তাঁদের প্রভাবিত করা। মিল-মালিকদের কোনো দোষ বা ত্রুটি সংশোধন করার জন্য তো আমি অনশনব্রত গ্রহণ করিনি। আমার এই ব্রতগ্রহণ করা বাস্তবিকপক্ষে মজদুরদের কথা খেলাপের দরুণ একপ্রকারের প্রায়শ্চিত্ত। মজুরদের প্রতিনিধি হিসেবে, তাদের অপরাধের অংশীদার হিসেবে এটা ছিল আমার কর্তব্যবিশেষ। মিল-মালিকদের আমি বড়োজোর অনুরোধ-উপরোধ করতে পারতাম। তাঁদের বিরুদ্ধে উপবাস করার মানে, অন্যায়ভাবে তাঁদের ওপর চাপ দেওয়া। তত্রাচ আমার উপবাসের ফলে তাদের ওপর চাপ পড়তে বাধ্য—এমন কথা জেনেশুনেও, উপবাস না-ক'রে আমার

উপায় ছিল না। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, সেই পরিস্থিতিতে অনশনব্রত গ্রহণ করা আমার কর্তব্য।

মিল-মালিকদের মনের কাঁটা দূর করার জন্য আমি দস্তুরমতো প্রযত্ন করেছিলাম। তাঁদের আমি বলেছিলাম, "আমার উপবাসের দরুণ আপনাদের মত পরিবর্তন করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই।" আমার এই নিশ্চিতি পেয়ে তাঁরা একটুও উৎসাহিত বোধ করেননি, বরঞ্চ আমার উদ্দেশে তাঁরা বেশ চোখা-চোখা মিঠেকড়া শ্লেষবাক্যের বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। আর সত্য বলতে কী, সেরকম বলায় তাঁদের অধিকারও ছিল যথেষ্ট।

ধর্মঘটের হুম্‌কিতে ভয় পেয়ে মাথা নোয়াবেন না ব'লে যেসব মিল-মালিক মনঃস্থির করেছিলেন, তাঁদের অগ্রণী ছিলেন শেঠ অম্বালাল। তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও স্বচ্ছ সরল আন্তরিকতা ছিল সত্যিই আশ্চর্য। আমি তা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়তে গেলেও সুখ। বিরোধী দল এবং সেই দলের এ হেন দলপতির ওপর, আমার অনশন এইরকম চিত্তবিক্ষোভের সৃষ্টি করছে দেখে, আমি খুবই বেদনা বোধ করছিলাম। উপরন্তু ছিলেন শেঠ অম্বালালের স্ত্রী সরলা দেবী। আমার প্রতি তাঁর এমন স্নেহ ছিল যেন তিনি আমার মায়ের পেটের বোন। আমার অনশনের দরুণ তিনি এমন গভীর যাতনা ভোগ করেছিলেন—তা আমার কাছে অসহনীয় মনে হচ্ছিল।

অনসূয়া বেন, কতিপয় বন্ধু এবং মিল-মজুরদের মধ্যে কেউ-কেউ প্রথমদিন আমার সঙ্গে-সঙ্গে উপবাস পালন করেন। একদিনের বেশিও উপবাস করতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। অনেক কষ্টে শেষপর্যন্ত তাঁদের নিবৃত্ত করি।

উপবাসের ফলে সর্বত্র একটি মঙ্গলভাবের আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা সকল মিল-মালিকদের হৃদয় স্পর্শ করে। কীভাবে সমস্ত ব্যাপারটা মিট্‌মাট্ ক'রে নেওয়া যায়—তাঁরা সেই রাস্তা খুঁজতে থাকেন। অনসূয়া বেন-এর বাড়িতে তাঁদের আলোচনার বৈঠক বসতে লাগল। আনন্দশঙ্কর ধ্রুব এই আলোচনার মাঝখানে প'ড়ে, সব-কিছু মীমাংসা ক'রে ফেলার জন্য উদ্‌যোগী হন। তাঁকেই শেষপর্যন্ত সালিশ মানা হয়। আমার অনশনের তিনদিনের দিন ধর্মঘট তুলে নেওয়া হ'ল। সেই উপলক্ষে মালিকেরা শ্রমিকদের মধ্যে মিঠাই-মণ্ডা বিতরণ করলেন। ধর্মঘট চালু ছিল কুল্যে একুশ দিন।

বিবাদ-নিষ্পত্তির উৎসব-সভায় মালিকপক্ষের সঙ্গে-সঙ্গে, আমেদাবাদের বিভাগীয় কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন। সেইসময় কমিশনার সাহেব মিল-মজুরদের উদ্দেশ্য ক'রে বলেছিলেন, "সবসময় তোমরা মিস্টার গান্ধীর উপদেশমতো কাজ ক'রো।" পরে এই অফিসার ভদ্রলোকের সঙ্গেই আমায় মল্লযুদ্ধে নামতে হয়েছিল। *ঘটনাটা ঘটেছিল অন্যরকমে,* এবং পরিস্থিতি অদলবদলের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মতিগতিও বদ্‌লে থাকবে। *তিনি সেসময় খেড়া* জেলার গ্রামে-গ্রামে ঘুরে, পাটীদারদের সাবধান ক'রে ব'লে দিয়েছিলেন গান্ধীর কথা কেউ যেন না-মানে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না-ক'রে পারছি না। ব্যাপারটা যেমন কৌতুকের, তেমনি করুণ। মিঠাই বন্টন নিয়ে ঘটনাটা ঘটে। মালিকেরা মণের ওজনে মিঠাই তৈরি

করিয়েছিলেন। হাজার-হাজার মিল-মজুরদের মধ্যে সেই মণ-মণ মিঠাই বিতরণ করার ব্যাপারটা মস্ত একটা সমস্যায় পরিণত হ'ল। একজায়গায় এতগুলি লোককে একাট্টা করা কি সহজ কথা? শেষপর্যন্ত স্থির হ'ল যে সবচাইতে শোভন হয় যদি মিষ্টান্ন বিতরণের সভা বসে সেই গাছের তলায় খোলা আকাশের নিচে, সেই যেখানে একুশদিন আগে শ্রমিকেরা একযোগে পণ নিয়েছিল—'এক টেক'।

আমি ধ'রে নিয়েছিলাম যে, যেসব শ্রমিক গত একুশদিন ধ'রে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা পালন ক'রে এসেছে, মিঠাই বিতরণের সময় তারা নিশ্চয় সারি-সারি লাইন দিয়ে দাঁড়াবে, শান্তভাবে নিজের-নিজের ঠোঙা নেবে, অধীর হয়ে পরস্পরের মধ্যে হুড়োহুড়ি করতে যাবে না। কিন্তু কার্যকালে, আসল পরীক্ষার সময় দেখা গেল, বিতরণেব যতরকম পদ্ধতি, সবই নিষ্ফল হ'ল। বিতরণের ব্যাপারটা মিনিট দুই চলতে না-চলতেই ছত্রভঙ্গ, হট্টগোল। শ্রমিক-নেতারা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য যতরকম চেষ্টা করলেন, সমস্ত ব্যর্থ হ'ল। শেষপর্যন্ত গণ্ডগোল, হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়ি এমন অবস্থায় পৌঁছল যে বেশ-খানিকটা মেঠাই পায়ের তলায় প'ড়ে নষ্ট হয়ে গেল এবং খোলা জায়গায় মিষ্ঠান্ন বিতরণের চেষ্টা বাধ্য হয়ে বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল। অতিকষ্টে উদ্‌বৃত্ত মেঠাই—আমরা শেঠ অম্বালালের মির্জাপুরের বাংলোবাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফেলি। পরের দিন বাংলোবাড়ির হাতার মধ্যে বেশ সুশৃঙ্খলায় মিঠাই-বিতরণপর্বের সমাধা হয়।

এই ঘটনার কৌতুকের দিকটা চোখে অঙুল দিয়ে দেখাবার মতো নিশ্চয় নয়। কিন্তু করুণ দিকটা কোথায়, বিশদ ক'রে বলতে হয়। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছিল যে 'এক টেক' গাছের তলায় মিষ্টান্ন-বিতরণ হবে, সে খরবটা কী ক'রে যেন আমেদাবাদের ভিক্ষুক সম্প্রদায় টের পায়। তারা দলে-দলে এসে সেখানে ভিড় জমায়। শৃঙ্খলা ভেঙে মেঠাই ছিনিয়ে নেবার চেষ্টাটা হয়েছিল এইসব ছন্নছাড়া বুভুক্ষু ভিখিরিদের তরফ থেকেই।

দারিদ্র ও অন্নাভাবের জাঁতাকলে আমাদের দেশের জনসাধারণ ক্রমাগত পিষ্ট হবার ফলে প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে ভিক্ষুকের দল বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেটের জ্বালা এমন জ্বালা যে তারা চক্ষুলজ্জা ও আত্মসম্মান খুইয়ে হন্যে হয়ে উঠেছে। আর আমাদের লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা, কোথায় তাদের বেকারত্ব ঘুচিয়ে, গতর খাটিয়ে তাদের রুজি-রোজগারের জন্য বাধ্য করবেন তা না-ক'রে কেবল ভিক্ষা দিয়ে তাঁদের দায় সারছেন।

২৩. খেড়া সত্যাগ্রহ

একটু যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচব, আমার কপালে সেটুকুও ছিল না। আমেদাবাদ মিল-মজুরদের ধর্মঘট নিষ্পত্তি হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে, আমায় খেড়ার সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে নামতে হ'ল। সর্বত্র অজন্মার ফলে, সে বছর খেড়া জেলায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা। জেলার পাটীদারেরা মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লেগেছে, সেই বছরের মতো ভূমি-রাজস্ব থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি-না।

আমি ওই জেলার কৃষক সম্প্রদায়কে উপদেশ-নির্দেশ দেবার আগেই, অমৃতলাল ঠক্কর খেড়ার অবস্থা নিয়ে তদন্ত ক'রে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। জেলার কমিশনার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎক্রমে সকল কথা আলোচনাও করেছিলেন। মোহনলাল পাণ্ড্যে ও শঙ্করলাল পারিখও এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় বিঠলভাই প্যাটেল ও স্যর গোকুলদাস কাহনদাস পারিখ-এর মারফৎ বোম্বাইয়ের লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল্-এও একটা জোর আন্দোলন গ'ড়ে তোলা গিয়েছিল। একাধিক ডেপুটেশন্ এই প্রশ্ন নিয়ে গভর্নর-এর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন।

সেসময় আমি ছিলাম গুজরাট সভার সভাপতি। সভা বোম্বাই সরকারের কাছে চিঠিপত্রে ও তারবার্তায় অনেক আবেদন-নিবেদন পাঠিয়েছিল। বিশেষ ধৈর্যে আমরা কমিশনার সাহেবের হুম্‌কি ও অপমান হজম ক'রে নিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে সরকারের অফিসারেরা তাঁদের পদমর্যাদা ভুলে গিয়ে, আমাদের চূড়ান্ত অপমান ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলেন। আজকের দিনে সেরকম আচরণ প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হবে।

চাষীদের দাবি ছিল দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আর সে দাবি এমনই যৎসামান্য যে তা মেনে নেবার মতো সঙ্গত কারণ ছিল যথেষ্ট। ভূমি-রাজস্ব আইন বলে যে, কোনো বছরে যদি খাদ্যশস্যের ফলন সিকিভাগেরও কম হয়, তাহলে সে বছরের মত্রো চাষীরা খাজনা-মকুব দাবি করতে পারে। সরকারি হিসেবে না-কি ফলন হয়েছিল সিকিভাগের বেশি। চাষীদের তরফ থেকে হিসেব পেশ ক'রে দেখানো হয়েছিল, গড়পড়তা ফলন সিকিভাগেরও কম। সরকার সে কথা মেনে নিতে রাজি হলেন না। খেড়া জেলার লোক তখন দাবি করল যে তাহলে সালিশ মানা হোক্। সরকার ভাবলেন, সালিশ মানলে তাঁদের রাজশক্তির গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে। সমস্ত আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হবায় পর, সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাক্রমে আমি পাটীদারদের পরামর্শ দিই, তাঁরা যেন সত্যাগ্রহের শরণ নেন।

খেড়া জেলার স্বেচ্ছাসেবকরা ছাড়া, এই আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন বল্লভভাই প্যাটেল, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, অনসূয়া বেন, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, মহাদেব দেশাই ও আরো কেউ-কেউ। সেসময় আদালতে আইনজীবী হিসাবে বল্লভভাইয়ের পসার বেশ জ'মে উঠেছে। আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে তাঁকে সব-কিছু ছেড়ে আসতে হ'ল। সেই যে তিনি ছেড়েছুড়ে বেরুলেন, তারপর বাস্তবপক্ষে সে পথে তিনি আর ফিরে যেতে পারেননি।

নদিয়াদ অনাথ আশ্রমে আমাদের সত্যাগ্রহ শিবির সংস্থাপন করতে হ'ল। আমাদের

সকলের জন্য স্থান সঙ্কুলান হয় এমন অপর-একটি বাড়ি পাওয়া গেল না ব'লে এইরকম ব্যবস্থা করতে হ'ল।

সত্যাগ্রহীরা একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে তাঁদের স্বাক্ষর দিলেন। প্রতিজ্ঞাপত্রটি ছিল এই : "এবছর আমাদের গাঁয়ের ফলন হয়েছে সিকিভাগেরও কম। এ আমাদের জানা কথা। আমরা তাই সরকারের কাছে দরখাস্ত পেশ করছিলাম, আগামী বছরের ফসল ঘরে না-তোলা পর্যন্ত তাঁরা ভূমি-রাজস্ব আদায় যদি স্থগিত রাখেন। সরকার আমাদের প্রার্থনায় কান দেননি। অতএব, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা এই মর্মে শপথ গ্রহণ করছি যে স্বেচ্ছাক্রমে আমরা এই বছরের খাজনা অথবা তার অনাদায়ী অংশ সরকারের হাতে তুলে দেব না। আইনত যুক্তিযুক্ততা বিবেচনা করলে সরকার আমাদের বিরুদ্ধে যা-কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চান, তা তাঁরা করুন। খাজনা না-দেবার জন্য যদি দুর্ভোগ সইতে হয়, সে আমরা হাসিমুখে বহন করব। আমরা যদি এখন স্বেচ্ছাক্রমে সরকারের হাতে খাজনার পয়সা তুলে দিই, প্রমাণ হবে, আমাদের অভিযোগ মিথ্যা এবং তাতে ক'রে আমাদের আত্মসম্মানের হানি হবে। তেমন আমরা কিছুতেই করব না, তার ফলে যদি আমাদের জমিজমা সরকারের বাজেয়াপ্ত হয়, তা হোক্। দ্বিতীয় কিস্তির খাজনা আদায় করা সরকার যদি তামাম জেলায় মুলতবি রাখেন, তাহলে আমাদের মধ্যে যার-যার সঙ্গতি আছে, তারা সরকারকে দেয় পুরো খাজনা অথবা তার অনাদায়ী অংশ জমা দিয়ে দেবে। আমাদের মধ্যে যারা পারগ হয়েও এখনো খাজনা দিচ্ছে না, তাদের না-দেবার কারণ আর-কিছু নয়, তারা যদি এখন খাজনা দিয়ে বসে, তাহলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অপারগ চাষীরা তাদের ঘটিবাটি বেচে কিংবা ধার-কর্জ ক'রে তাদের দেয়টুকু দেবার চেষ্টা করবে এবং তার ফলে অথৈ দুর্দশার জলে হাবুডুবু খাবে। এই অবস্থায় আমরা মনে করি, গরীবদের মুখ তাকিয়ে, সমর্থ লোকদেরও উচিত তাদের দেয় খাজনা জমা দেওয়া আপাতত বন্ধ রাখা।"

এই অন্দোলনের কথা বিশদভাবে বলতে গেলে অনেকটা জায়গা জুড়বে। সুতরাং এই আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি সমধুর স্মৃতিকথা আমায় বাদ দিয়ে যেতে হচ্ছে। যাঁরা এই সংগ্রামের গুরুত্ব বা তাৎপর্য সম্বন্ধে সব কথা গভীরভাবে জানতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা যেন শঙ্করলাল পারিখ রচিত খেড়া সত্যাগ্রহের পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক ইতিহাস প'ড়ে দেখেন।

২৪. 'পেঁয়াজচোর'

চম্পারণ ছিল ভারতের সুদূর একটি কোণে ; তাছাড়া ওখানকার আন্দোলনকে ইচ্ছা ক'রেই খবরকাগজ থেকে তফাৎ করা হয়েছিল ব'লে, বাইরের লোক সেখানে বড়ো একটা যায়নি। খেড়া-সত্যাগ্রহের বেলা লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না। প্রতিদিনই সেখানকার ঘটনার বিষয়ে কিছু-না-কিছু খবর কাগজে বেরত।

সরকারের বিরুদ্ধে এই লড়াই নিয়ে গুজরাটিদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাদের কাছে

এটা ছিল নতুনধরনের পরীক্ষাবিশেষ। এই পরীক্ষা সফল ক'রে তোলার জন্য তাঁরা কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা ঢালতে প্রস্তুত ছিল। সত্যাগ্রহ যে কেবল টাকা দিয়ে চালানো যায় না, এ লড়াইয়ে যে টাকার দরকার সবচাইতে কম—সে কথা তাদের বোঝানো সহজসাধ্য হয়নি। আমার আপত্তি সত্ত্বেও বোম্বাই-স্থিত গুজরাটি ব্যবসায়ীরা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পাঠিয়েছিলেন। ফলে আন্দোলনের শেষেও আমাদের হাতে কিছু টাকা থেকে গিয়েছিল।

একদিকে ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসাহায্য। অন্যদিকে ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজন যথাসম্ভব সংক্ষেপ ক'রে এনে, সহজ সরল জীবনযাত্রায় তাদের দীক্ষাগ্রহণ। সর্ব ক্ষেত্রে তারা এই শিক্ষা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পেরেছিল ব'লে বলতে পারি না। তবে তাদের চালচলনে, আহারে-বিহারে অনেকখানি পরিবর্তন যে ঘটেছিল সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

চাষী ও পাটীদের কাছেও এইধরনের লড়াই ছিল খুবই নতুনধরনের জিনিস। সুতরাং খেড়া জেলার গ্রামে-গ্রামে ঘুরে সত্যাগ্রহের রীতি-নীতি-পদ্ধতি আমাদের বুঝিয়ে দিতে হয়েছিল।

আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল সরকারি অফিসার শ্রেণী-বিষয়ে চাষীদের মন থেকে ভয় ও সন্ত্রাসের ভাবটুকু উপড়ে ফেলা। প্রজাসাধারণ যে কর দেয় তার থেকে এই অফিসারেরা মাইনে পান, সুতরাং আমলারা প্রজাদের প্রভু নন। তাদেরই সেবায়, তাদেরই টাকায় নিযুক্ত মাইনে করা চাকর। তারপর দেখা গেল মনের থেকে ভয়ের ভাব উম্মূল করলেও, লোক-ব্যবহারে মানুষের যে শিষ্টতা রক্ষা ক'রে চলা উচিত—এ কথাটা তাদের বোঝানো একপ্রকার যেন অসম্ভব হয়ে পড়ল। সরকারি আমলাদের যদি পরোয়া না-ক'রে চলতে হয়, তবে তাদের হাত থেকে ইতিপূর্বে যেসব লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ সইতে হয়েছে, তার জবাবে প্রজারাই-বা কেন এখন তাদের ছেড়ে কথা কইবে? আমাদের বদ্‌লা অপমান করতে হবে না? কিন্তু ভয় ভেঙে যাবার ফলে তারা যদি দুর্ব্যবহার শুরু করে, তাহলে যে সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে যায়। অভয়ের সঙ্গে অবিনয় মেশালে সে যে হবে এক পাত্র দুধের সঙ্গে এক ফোঁটা সেঁকোবিষ মেশানোর মতন! পাটীদারেরা শিষ্ট আচরণের শিক্ষা, আমার আশানুরূপ আয়ত্ত করতে পারেনি—এ কথা আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম। নানা ঘটনায় আমি ঠেকে শিখেছি যে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আচরণে শিষ্টতা রক্ষা হ'ল সত্যাগ্রহীর নামে সবচেয়ে দুরূহ শিক্ষা। অবস্থা-বিশেষে কষ্টসাধনায় কথাবার্তা যথাসাধ্য মোলায়েম করার বাহ্যিক ভদ্রতার মধ্যে সত্যাগ্রহীর বিনয়গুণ পর্যবসিত হতে পারে না। নম্রতা হবে সত্যাগ্রহীর স্বভাবসিদ্ধ, সর্বদা তাকে প্রতিপক্ষের মঙ্গলকামনায় উদ্‌বুদ্ধ থাকতে হবে। কেবল বাক্যে নয়, কেবল চিন্তায় নয়, সত্যাগ্রহীর প্রতিদিনের সকল কর্মে ও আচরণে এই নম্রতা ও সর্বজন-মঙ্গলচিন্তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠা চাই।

আন্দোলনের সূচনায় খেড়া জেলার চাষীরা যথেষ্ট সাহস দেখালেও, সরকারের তরফ থেকে কঠোরভাবে তাদের দমন করার তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। কিন্তু সরকার যখন দেখলেন যে আন্দোলনকারীরা তাদের সঙ্কল্পে অনড় ও অটল, তখন তাঁরাও শক্ত

হাতে দমন শুরু করলেন। ক্রোকদার আমলারা প্রজাদের বাড়ি চড়াও হয়ে গোরু-বাছুর বেচল। হাতের কাছে যেসব অস্থাবর সামগ্রী পেল—বাজেয়াপ্ত করল। অনাদায়ী খাজনার জন্য জরিমানার নোটিস জারি করা হ'ল। কোনো-কোনো গ্রামের ক্ষেত থেকে পাকা ফসল তুলে এনে সরকার তা বেচে দিলেন। এইসব দেখে-শুনে চাষীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হ'ল। তাদের কেউ-কেউ দেয় খাজনা মিটিয়ে দিল। কেউ-কেউ তাদের কিছু-কিছু অস্থাবর মালপত্র এমনভাবে এগিয়ে দিল, যাতে খাজনা উসুলের বদলে ক্রোকদারেরা সেগুলি বাজেয়াপ্ত করতে পারে, অপরপক্ষে একদল লোক আখের পর্যন্ত যুঝবে—এই পণ ক'রে মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকল।

যখন এইরকম সব ব্যাপার চলেছে, শোনা গেল শঙ্করলাল পারিখ-এর একজন প্রজা তাঁর জমি বাবদ আদায় সরকারে জমা দিয়ে এসেছে। এই নিয়ে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। যে জমি বাবদ খাজনা জমা দেওয়া হয়েছিল, লোকহিতের জন্য সেই জমি দানপত্র ক'রে শঙ্করলাল তাঁর সেই প্রজার ভুলের দরুণ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি নিজের মান বাঁচালেন ও অন্যদের কাছে একটি সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

আমার মনে হ'ল, এইসব ভীতিবিহ্বল চাষীরা আবার যাতে সাহসে বুক বেঁধে দাঁড়াতে পারে তার জন্য কিছু করা দরকার। আমার নজর পড়ল একটা পেঁয়াজ ক্ষেতের প্রতি। আমার ধারণায়, সরকার ওই ক্ষেত অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত ক'রে থাকবেন। আমি গাঁয়ের লোকদের বললাম, মোহনলাল পাণ্ড্যেয়র নেতৃত্বে তারা যেন ওই ক্ষেতে থেকে সমস্ত পেঁয়াজ তুলে আনে। সবিনয় আইন-অমান্য বলতে যা বোঝায়, এ কাজটাকে আমি তেমন মনে করিনি। আর যদিই-বা তেমন হয় এবং ক্ষেত-কে-ক্ষেত পাকা ফসল বাজেয়াপ্ত করাটা সরকার যদি আইনসম্মত ব'লে মনেও করেনি, তবুও কাজটা হবে লুঠতরাজেরই মতো অন্যায় ও নীতি-বিগর্হিত। সুতরাং বাজেয়াপ্ত করার হুকুম জারি করা থাকলেও, গ্রামবাসীদের উচিত তাদের নিজেদের পাকা ফসল নিজেদের ঘরে তুলে আনা। এইভাবে আইন অমান্য করলে জরিমানা হতে পারে এবং জরিমানা না-দিলে জেলে যেতে হতে পারে, এই শিক্ষাটুকু লোকেদের পাওয়া দরকার ছিল। পেঁয়াজ ক্ষেতের সম্পর্কে সেই সুযোগটা হাতে এসে গেল! মোহনলাল পাণ্ড্যেয় ঠিক এইরকম একটা-কিছু চাইছিলেন। সত্যাগ্রহ-নীতি অনুসরণ করার জন্য একটা-কিছু কাজ ক'রে সত্যাগ্রহীদের কোনো-একজন জেলে যাবার মতো দুঃখবরণ করবার আগেই, আন্দোলন শেষ হয়ে যায়, এটা তাঁর আদৌ ভালো লাগছিল না। তাই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ক্ষেত থেকে পেঁয়াজ তিনি তুলে আনবেন ব'লে এগিয়ে গেলেন। সাত-আটজন সত্যাগ্রহী তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন।

ব'লে-ক'য়ে কিছু লোক আইন ভাঙবে, অথচ তার দরুণ শাস্তি ভোগ করবে না এ-ও কি কখনো সম্ভব হয়? এসব লোক ছাড়া থাকলে সরকারের মান বাঁচে না। মোহনলাল ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেফতার হবার ফলে, লোকেদের উৎসাহ প্রভূত বেড়ে গেল। কারাদণ্ডের ভয় যখন থাকে না, সরকারের দমননীতি, উলটে বরঞ্চ প্রজাদের মনে বল ও ভরসার সঞ্চার করে। মোকদ্দমার দিন সারা তল্লাটের লোক যেন আদালত-প্রাঙ্গণে ভেঙে পড়ল। পাণ্ড্যেয়

ও তার সঙ্গী কয়জনের কয়েকদিনের জন্য জেল হ'ল। আমার মনে হয়, এভাবে কয়েদ দেওয়া অন্যায় হয়েছিল, কারণ ভারতীয় পেনাল কোড্-এ চুরির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়, ক্ষেত থেকে পেঁয়াজের ফসল-তোলা তার আওতায় পড়ে না। কিন্তু আইন-আদালত করাটা সত্যাগ্রহের নিয়ম-বিরুদ্ধ হবে ব'লে আমরা আপিল দায়ের করতে যাইনি।

লোকেরা মিছিল ক'রে কয়েদীদের জেলের দরজা অবধি এগিয়ে দেয়। সেদিন মোহনলাল পাণ্ড্যে লোকেদের কাছ থেকে 'পেঁয়াজচোর' খেতাব পান। আজও অনেকে তাঁকে সেই নামে জানে।

২৫. খেড়া সত্যাগ্রহের সমাপ্তি

খেড়া আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে অপ্রত্যাশিতভাবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, লোকেরা অবসাদের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে যারা দৃঢ়তায় অনমনীয় ছিল তাদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে আমার মনে দ্বিধা ছিল। সত্যাগ্রহীর পক্ষে আপত্তিকর হবে না এমন একটি সুষ্ঠু মীমাংসার পথে আমি আন্দোলন সমাপ্ত করবার একটা উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। দৈবক্রমে এমন একটি রাস্তার সন্ধান পাওয়া গেল। নদিয়াদ তালুকের মামলতদার আমায় খবর পাঠালেন যে সঙ্গতিসম্পন্ন পাটীদারেরা যদি তাদের দেয় রাজস্ব জমা দেয়, তাহলে গরীব চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় মুলতবি রাখা হবে। আমি তাঁর কাছ থেকে লিখিতভাবে এই নিশ্চিতি চাই এবং সেটি পেয়েও যাই। কিন্তু মামলতদারের এক্তিয়ার তো কেবল তাঁর তালুকের মধ্যে। গোটা জেলার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে কালেক্টর সাহেবের ওপর। কাজেই গোটা জেলায় সেই মামলতদারের নিশ্চিতি কার্যকর হবে কি-না, সেই বিষয়ে জানতে চেয়ে আমি কালেক্টর সাহেবকে চিঠি লিখি। জবাবে তিনি জানালেন মামলতদারের লিখিতমতো খাজনা আদায় স্থগিত রাখার অর্ডার সারা জেলায় জারি করা হয়েছে। সে কথা আমি জানতাম না। সেরকম অর্ডার যদি জারি করা হয়ে থাকে, তাহলে তো লোকেরা যে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিল তার শর্ত যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। আপনাদের মনে থাকবে, প্রতিজ্ঞাপত্রের উদ্দেশ্য ছিল হুবহু এই সরকারি ঘোষণার অনুরূপ। সুতরাং এরকম অর্ডার পাশ হয়েছে জেনে আমরা সন্তোষপ্রকাশ করলাম।

কিন্তু আন্দোলনের এইভাবে পরিসমাপ্তি ঘটায় আমি সত্য-সত্য খুশি হতে পারিনি। প্রত্যেক সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন একটা শমে এসে থামে, সেই সমাপ্তির মধ্যে একটি মধুর রসের সঞ্চার হওয়া উচিত। উপস্থিত এই আন্দোলনের সমাপ্তিতে সেরকম মধুর রসের কোনো অবতারণা ঘটেনি। কালেক্টর সাহেব এমন ভাব দেখালেন যেন মিট্মাটের কোনো প্রসঙ্গই তাঁর মনে কখনো উদয় হয়নি। গরীবদের কাছ থেকে খাজনা আদায় মুলতবি রাখার কথা হয়েছিল। কিন্তু বস্তুত তার ফলে কেউ রেহাই পেয়েছিল কি-না সন্দেহ। গরীব কারা তা নির্ণয় করার ভার ছিল প্রজাসাধারণের ওপর, কিন্তু তারা সে অধিকার খাটাতে পারেনি।

সে অধিকার খাটাবার মতো শক্তি ও সাহস ও তাদের ছিল না—সে কথা সখেদে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। আন্দোলনের অন্তে সত্যাগ্রহের জয় হ'ল ধ'রে নিয়ে একটা উৎসবের আয়োজন করা হয়। কিন্তু সে উৎসবে আমি সোল্লাসে যোগ দিতে পারিনি, মনে হয়েছিল পূর্ণ-বিজয়ের মধ্যে যে আত্মিক সন্তোষের সারবস্তু থাকে তা এর মধ্যে ছিল না। বিজয় যেন অন্তঃসারশূন্য।

সত্যাগ্রহের সূচনায় মানুষ যে শক্তি ও উদ্দীপনা নিয়ে অবতীর্ণ হয়, সত্যাগ্রহের অন্তে যদি সে শক্তি ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি লাভ করে, তবেই বলা যেতে পারে সার্থকভাবে সেই সত্যাগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটল।

তা সে যা-ই হোক্, সেই আন্দোলনের পরোক্ষ ফলাফল আজও আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই। আজও লোকে তার সুফল ভোগ করছে। খেড়া আন্দোলনের ফলে গুজরাটি কিষাণদের মধ্যে নূতন চেতনার সঞ্চার হয়। এই সূত্রেই রাজনৈতিক শিক্ষায় তাদের প্রথম হাতেখড়ি।

ডক্টর বেশান্ত্-এর প্রখ্যাত হোমরুল-আন্দোলনের ঢেউ ভারতের কৃষকসমাজের গায়েও এসে লেগে থাকবে। কিন্তু দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে গ্রামীণ জনজীবনের বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াবার তাগিদ দিয়েছিল খেড়া সত্যাগ্রহ। এর থেকেই শিক্ষিত জনসেবার দল চাষীভাইদের সঙ্গে একাত্ম হবার শিক্ষা লাভ করে। এ থেকে তাঁরা তাঁদের কাজের উপযুক্ত ক্ষেত্র সন্ধান ক'রে পান, ফলে তাঁদের কাজের ক্ষমতা ও আত্মত্যাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই আন্দোলনের সূত্রে বল্লভভাই যে নিজের সত্য পরিচয় নিজেই লাভ করেন—সেটাও কিছু কম কথা নয়। এ লাভ যে কতবড়ো লাভ, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি গত বছর বন্যাত্রাণের কাজে এবং বর্তমান বছর বার্দৌলি সত্যাগ্রহে। খেড়া আন্দোলনের ফলে গুজরাটের জনজীবনে নূতন শক্তি ও নূতন তেজের সঞ্চার হয়েছে। গ্রামের পাটীদার নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে চেতনা লাভ করেছে তা সে কোনোকালেই ভুলতে পারবে না। আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হ'লে, ত্যাগ ও দুঃখ-বরণে প্রস্তুত থাকলে মানুষ যে নিজের বন্ধনমুক্তির পথ নিজেই ক'রে নিতে পারে, সেই সত্যটুকু এখন জনসমাজের মনে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হয়ে গেছে। খেড়ার এই আন্দোলনের ফলে, গুজরাটের জমির গভীরে সত্যাগ্রহের মূল সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে।

তাই আন্দোলনের ওইরকম সমাপ্তিতে আমি বিশেষ উৎসাহিত বোধ না-করলেও খেড়ার কৃষক-সত্যাগ্রহীরা পরম উল্লাস বোধ করেছিল। তারা বুঝেছিল, যেমন তারা কর্ম করেছে তেমনি তারা সেই কর্মের ফলও পেয়েছে, তাদের হাতে এখন এমন এক অস্ত্র এসে পড়েছে, যা নাকি সকলরকম অন্যায়, সকলরকম অভিযোগের প্রতিকারে অব্যর্থ অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। সুতরাং তাদের এই আনন্দ উল্লাসের সপক্ষে সঙ্গত কারণ কিছু কম ছিল না।

তৎসত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য যে খেড়ার কৃষকরা সত্যাগ্রহের মর্মার্থ যথাযথ উপলব্ধি করতে পারেনি। এই অজ্ঞতার ফলে তাদের কীপ্রকার দুর্ভোগ ভুগতে হয়, সে বিষয়ে যথাসময়ে আপনাদের বলব।

২৬. একতার জন্য আকুলতা

ইউরোপের বিশ্ব-বিধ্বংসী মহাযুদ্ধ যখন চলছে, খেড়া আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সেইসময়। যুদ্ধের তখন সঙ্কট অবস্থা। সেইসময় একটি সমর-সমিতির অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য ভাইস্‌রয় ভারতের নেতৃস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানালেন। এক অধিবেশনে উপস্থিত হবার জন্য আমার কাছেও সনির্বন্ধ অনুরোধ আসে। ইতিপূর্বেই বলেছি বড়োলাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ও আমার মধ্যে বেশ-একটা হৃদ্যতার সম্বন্ধ ছিল।

আমন্ত্রণরক্ষার জন্য আমি দিল্লী গেলাম। কিন্তু সমর-সমিতির অধিবেশনে যোগ দিতে আমার আপত্তি ছিল। আমার আপত্তির মুখ্য কারণ এই যে আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো নেতাদের সেই অধিবেশনে আমন্ত্রণ করা হয়নি। তখন তাঁরা ছিলেন জেলে। তাঁদের বিষয়ে অনেক কথা শুনে থাকলেও সেসময় মাত্র দু-একবার তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘ'টে থাকবে। দেশসেবায় তাঁদের অনুরাগ ও তাঁদের নির্ভীকতা বিষয়ে অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। তখনো পর্যন্ত হেকিম সাহেবের নিকট-সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আমার ঘ'টে ওঠেনি—যদিও প্রিন্সিপাল রুদ্র ও দীনবন্ধু এন্ড্রুজ তাঁর গুণগানে পঞ্চমুখ হতেন। কলকাতায় মুস্‌লিম লীগ্‌-এর বৈঠকে শোয়েব কুরেশী ও খাজা সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ডক্টর আনসারী এবং ডক্টর আবদুর রহমানের সংস্পর্শেও আমি এসেছিলাম। সজ্জন মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুতা-স্থাপনের সুযোগ আমি তখন খুঁজে ফিরছিলাম। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে পূতচরিত্র, দেশভক্তিতে যাঁরা প্রতিনিধিস্থানীয়—সেইসব মুসলমানদের সঙ্গে মিলেমিশে, আমি মুস্‌লিম সমাজের মতিগতি বুঝে নেবার জন্য উৎসুক ছিলাম। কোনো অনুরোধ বা নির্বন্ধের অপেক্ষা না-রেখেই, মুসলমান বন্ধুরা আমায় যেখানেই নিয়ে যেতে চাইতেন, আমি তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে যেতাম, তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের আশায়।

কয়েক বছর আগের থেকেই, দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার থাকাকালেই বুঝতে পেরেছিলাম, হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যকার সম্প্রীতি নেই। যখনই সুযোগ পেয়েছি এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের প্রতিবন্ধ হটিয়ে দেবার জন্য প্রযত্নের ত্রুটি করিনি। মিথ্যা স্তুতিগান ক'রে কিংবা আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে তোষণ করা আমার স্বভাবসঙ্গত নয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা থেকেই আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম, আমার অহিংসা-নীতির কঠোরতম পরীক্ষা হবে যখন আমি হিন্দু-মুসলমান মিলনের সমস্যা-সমাধানে তৎপর হব। এটুকুও বুঝেছিলাম যে এই সমস্যাই হবে আমার অহিংসা-নীতি প্রয়োগের প্রশস্ততম ক্ষেত্র। আমার সেই ধারণা আজও পূর্ববৎ। জীবনের প্রতিমুহূর্তে আমি বুঝতে পারি, ঈশ্বর আমার সামনে এই প্রশ্ন তুলেছেন, প্রতি মুহূর্ত আমায় যাচাই ক'রে নেবার জন্য।

হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নিয়ে এইসব বদ্ধমূল ধারণা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমি যেন সঙ্গে ক'রে এনেছিলাম। কাজে-কাজেই আলী ভাইদের সংস্পর্শে আসাটা আমার পক্ষে পরিতোষের কারণ হয়েছিল। কিন্তু সম্পর্ক নিকটতর হবার আগেই তাঁদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হ'ল।

যখনই জেল-কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিলত, মৌলানা মহম্মদ আলী বেতুলও ছিন্দওয়াড়ার জেল থেকে আমায় দীর্ঘ চিঠি লিখতেন। আলী-ভাইদের সঙ্গে জেলে দেখা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি।

আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের জেল হবার পর মুসলমান বন্ধুরা আমায় কলকাতায় মুস্‌লিম লীগ্-এর একটি অধিবেশনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁরা আমায় বক্তৃতা দিতে বলায় আমি তাঁদের একটি কথাই বলি—প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আলী-ভাইদের জেল থেকে খালাস করার জন্য আন্দোলন করা। এর কিছুদিন পরে এই মুসলমান বন্ধুরা আমায় আলিগড়ের মুস্‌লিম কলেজে নিয়ে যান। কলেজের তরুণ ছাত্রদের আমি বলেছিলাম, যেন মাতৃভূমির সেবায় তারা ফকিরি বরণ করতে ইতস্তত না-করে।

এরপর আলী-ভাইদের কারামুক্তির জন্য আমি সরকারের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি শুরু করি। এই প্রসঙ্গে খিলাফত বিষয়ে আলী-ভাইদের মতামত ও কার্যকলাপ আমি ভালো ক'রে অনুধাবন করি। এ বিষয়ে মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গেও আমার আলাপ-আলোচনা হয়। আমার মনে হয়, মুসলমান সমাজের প্রকৃত মিত্র ব'লে আমি যদি পরিগণিত হতে চাই, তাহলে আলী-ভাইদের কারামুক্তির জন্য আমায় যথাসাধ্য প্রযত্ন করতে হবে এবং খিলাফৎ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য সহায়তা করতে হবে। খিলাফতের প্রশ্নটি অবিসম্বাদীভাবে ভালো কি মন্দ তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না। নৈতিক দিক থেকে তাঁদের দাবি যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে আমার উচিত তার সমর্থন করা। ধর্মীয় ব্যাপারে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের মানুষের ধর্মবিশ্বাস পৃথক্ হতে বাধ্য। যে ধর্মে যার বিশ্বাস সে ধর্ম তার কাছে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ। ধর্মীয় ব্যাপারে সকল মানুষের বিশ্বাস যদি একইধরনের হ'ত, তাহলে পৃথিবীতে একাধিক ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না। ক্রমে-ক্রমে আমি দেখতে পাই, খিলাফৎ সম্বন্ধে মুসলমানদের দাবি নীতি-বিরুদ্ধ তো নয়ই, এমন-কি ব্রিটেন-এর প্রধানমন্ত্রীও সে দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিলেন। আমার তখন মনে হয়, প্রধানমন্ত্রী মুসলমান সমাজকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সফল ক'রে তোলার জন্য আমি সাধ্যমতো সহায়তা করতে বাধ্য। তাঁর সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোনো দ্ব্যর্থব্যঞ্জক কথা ছিল না। তিনি এমন স্পষ্ট ভাষায় তাঁর কথা দিয়েছিলেন যে মুস্‌লিম দাবির দোষ-গুণ বিচার করার কোনো প্রসঙ্গই ছিল না। তবু যে আমি সে কথা বিচার করেছিলাম, সে কেবল আমার বিবেকবুদ্ধির সন্তোষের জন্য।

খিলাফৎ সমস্যা সম্পর্কে আমার মনোভাব নিয়ে আমার অনেক বন্ধু ও সমালোচক নানারকম বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এইসব সমালোচনা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, খিলাফৎ বিষয়ে আমার ধারণায় এমন কোনো ভুল ছিল না যা আজকের দিনেও সংশোধনযোগ্য ব'লে ভাবতে পারি। কাজেই সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে মুস্‌লিম সমাজের সঙ্গে আমি যেধরনের সহযোগ করেছিলাম, তার জন্য আমার মনের মধ্যে কোনো আপশোস নেই। আবার যদি অনুরূপ ঘটনা ঘটে তাহলে আমার চিন্তনে ও আচরণে আমি পূর্বের ধারাই অনুসরণ করব।

সুতরাং সমর-সমিতির অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে আমি যখন দিল্লী এলাম, মনে-মনে

স্থির ক'রে রেখেছিলাম, মুস্‌লিম দাবির সপক্ষে আমার বক্তব্যটুকু ভাইস্‌রয়-এর কাছে পেশ করব। খিলাফতের প্রশ্ন পরে যেরকম রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তখন সেরকম ছিল না।

কিন্তু দিল্লী পৌঁছবার পর সেই সমর-সমিতির অধিবেশনে যোগ দেবার পথে একটি প্রতিবন্ধক দেখা দিল। যুদ্ধের ব্যাপার যেখানে মুখ্য আলোচ্য বিষয়, সেইরকম একটি আলোচনা-সভায় যোগদান, আমার অহিংসা-নীতির সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে কি-না—দীনবন্ধু এন্ড্রুজ এই প্রশ্ন তুললেন। তিনি আমায় জানালেন, ইংলন্ড ইটালির সঙ্গে কয়েকটি গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, এরকম একটি খবর ফাঁস হবার ফলে, ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এন্ড্রুজ প্রশ্ন তুললেন, এই গোপন চুক্তির সংবাদ যদি সত্য হয়, ইংল্যান্ড যদি অপর একটি ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে সত্য-সত্য সেরকম সমঝোতায় এসে থাকেন, তাহলে দিল্লীর সেই বৈঠকে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হয় কি? আমি ইংল্যান্ড-ইটালির এই গোপনচুক্তির ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরে জানতাম না। তবে এন্ড্রুজ-এর কথাটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং বৈঠকে যোগ দেবার ব্যাপারে আমার দ্বিধার কথা ব্যক্ত ক'রে আমি লর্ড চেমস্‌ফোর্ড-কে একটি চিঠি পাঠালাম। বিষয়টা সাক্ষাতে আলোচনা করার জন্য তিনি আমায় আমন্ত্রণ জানালেন। অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস্টার মেফীর সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা চলে। ফলে আমি সমর-সমিতির বৈঠকে যোগ দেবার সপক্ষে মনঃস্থির করি। ভাইস্‌রয় আমায় মোদ্দা যে কথাটি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হ'ল এই: "ব্রিটিশ কেবিনেট্‌ যা-কিছু স্থির করেন, ভারতের ভাইস্‌রয় যে তার সব-কিছু জানেন, এমন কথা আপনি নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে করেন না। ব্রিটিশ সরকার সবরকম ভুলচুক ও অন্যায়ের ঊর্ধ্বে এমন কথা আমি বলি না, অন্যেরাও বলে না। কিন্তু যদি স্বীকার করেন যে মোটামুটিভাবে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব জগতের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় আসার ফলে ভারতের মোটের ওপর উপকার হয়েছে—তাহলে এ কথাটাও নিশ্চয় মানবেন যে সাম্রাজ্যের এই সঙ্কটকালে প্রত্যেক ভারতবাসীর উচিত তার সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসা। গোপন চুক্তির বিষয়ে ব্রিটিশ সংবাদপত্র কী বলেছেন সে আমিও দেখেছি। বিশ্বাস করুন, কাগজে যা বেরিয়েছে তার বাইরে আমি তার বেশি-কিছুই জানি না। আপনি এ কথাও নিশ্চয় জানেন, অনেকসময় এইসব কাগজ, আজগুবি কাহিনী ছড়ায়। খবরকাগজে বেরুনো একটি নিতান্ত রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে, সাম্রাজ্যের এই সঙ্কট-মুহূর্তে তার সাহায্যে এগিয়ে না-আসাটা কি আপনার পক্ষে ঠিক হবে? যুদ্ধের সমাধা হয়ে গেলে যত নৈতিক প্রশ্ন আপনি তুলতে চান, তুলবেন, তর্ক-বিচারে আমাদের ডাক দিতে চান তো ডাকবেন। কিন্তু এখন সেসব নিয়ে মাথা ঘামবেন না।"

বহু পুরাতন যুক্তি। এর মধ্যে নতুন কথা কিছুই ছিল না। তবে ঠিক তদ্দণ্ডে এবং তখনকার সেই পরিস্থিতিতে, ভাইস্‌রয়-এর এইসব যুক্তি পেশ করার ধরনটা কেমন যেন নতুন ব'লে মনে হয়েছিল, মনও টলেছিল। আমি সমর-সমিতির সেই বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেলাম। স্থির হয়, খিলাফতের প্রশ্নটুকু আমি লিখিত পত্রের আকারে ভাইস্‌রয়-এর কাছে পাঠিয়ে দেব।

১৭. সৈন্য-সংগ্রহ অভিযানে

সমর-সমিতির বৈঠকে যোগ দিলাম। ভাইস্‌রয় বিশেষভাবে চাইলেন, আমিই যেন সৈন্য-সংগ্রহের প্রস্তাব সমর্থন করি। আমি জানালাম, তিনি অনুমতি দিলে আমার বক্তব্যটুকু হিন্দি-হিন্দুস্থানিতে পেশ করব। ভাইস্‌রয় আমার অনুরোধ মেনে নিয়ে বললেন, আমি যেন আমার বক্তব্য ইংরেজিতেও বলি। আমার বক্তৃতা দেবার কোনো প্রসঙ্গ ছিল না। আমার যা বলবার ছিল আমি একটিমাত্র বাক্যে বলেছিলাম : "আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি এবং সমর্থন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সজ্ঞানে স্বীকার করছি।"

হিন্দুস্থানিতে বলেছিলাম ব'লে অনেকে আমায় অভিনন্দিত করলেন ; বললেন যদ্দূর তাঁদের স্মরণ হয় এরকম বৈঠকে কোনো ব্যক্তির হিন্দুস্থানিতে বক্তব্য পেশ করা সেই না-কি প্রথম। বড়োলাটের সভায় আমিই প্রথম হিন্দুস্থানিতে বলেছি—এই খবরে এবং তাঁদের মুখের সেই সাধুবাদে আমার জাতীয় অভিমানে বেশ-একটা ঘা লেগেছিল। আমার সমস্ত মনটা যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল। আমাদের নিজেদের দেশের সভাসমিতিতে দেশের কাজে দেশেরই ভাষাকে একঘরে ক'রে রাখা হবে, আর আমার মতো একজন ফালতু লোক দু-চারটে কথা হিন্দুস্থানিতে বলবার জন্য বাহবা পাবে, এর চেয়ে লজ্জাকর অথবা শোচনীয় আর কী-ই-বা হতে পারে! আমরা যে কত নিচে নেমে গেছি, এইরকম ঘটনা তার সাক্ষ্য দেয়।

সমর-সমিতির বৈঠকে আমি সেই যে একটি কথা বলেছিলাম, আমার কাছে তার তাৎপর্য ছিল যথেষ্ট। সেই বৈঠকের বিষয় কিংবা আমার সমর্থিত সেই প্রস্তাবের বিষয় আমার পক্ষে ভুলে যাবার জো ছিল না। দিল্লীতে থাকাকালে আমার আরো-একটি কাজ করার ছিল। তা হ'ল ভাইস্‌রয়-কে একটি চিঠি লেখা। কাজটা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। আমার মনে হয়েছিল, সরকার ও দেশের জনগণের স্বার্থের খাতিরে আমার বিশদ ক'রে বলা উচিত, আমি কীভাবে এবং কেন সমর-সমিতির বৈঠকে যোগ দিলাম। সরকারের কাছ থেকে দেশের লোক কী চায়—সে কথাটাও মনে হয়েছিল স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার।

লোকমান্য তিলক ও আলী-ভাইদের মতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমর-সমিতির অধিবেশনে আহ্বান জানানো হয়নি ব'লে আমার সেই চিঠিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলাম। যুদ্ধ-জনিত পরিস্থিতিতে মুসলমানেরা কী চায় এবং দেশের লোকেরই-বা রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ন্যূনতম দাবি কী, সেইসব প্রসঙ্গও তুলেছিলাম। এই চিঠিটি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আমি অনুমতি চেয়েছিলাম। ভাইস্‌রয় খুশি হয়ে সেই অনুমতি দিয়েছিলেন।

সমর-সমিতির বৈঠক হয়ে যাবার অব্যবহিত পরে ভাইস্‌রয় সিমলা চ'লে গিয়েছিলেন ব'লে চিঠিটি পাঠাতে হ'ল সিমলায়। আমার কাছে সে চিঠির গুরুত্ব ছিল অনেক। ডাকযোগে পাঠালে সে চিঠি পৌঁছতে দেরি হ'ত। সময় বাঁচাতে চেয়েছিলাম, অথচ যেমন-তেমন লোকের হাতে দিয়ে চিঠিটা পাঠাতে মন সরছিল না। আমি চেয়েছিলাম, কোনো শুদ্ধ চরিত্র লোক নিজের হাতে চিঠি ভাইস্‌রিগাল লজ্-এ পৌঁছে দেন। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও প্রিন্সিপাল

রুদ্র কেম্ব্রিজ মিশন-এর রেভারেন্ড আয়র্লন্ড-এর নাম করলেন। তিনি নিজের হাতে চিঠি সিমলায় পৌঁছে দিতে রাজি হলেন একটা শর্তে, চিঠিখানা তাঁকে পড়তে দিতে হবে এবং প'ড়ে যদি তাঁর ভালো লাগে, তবেই চিঠি তিনি নিয়ে যাবেন। চিঠিতে গোপনীয় কথা তো কিছু ছিল না, সুতরাং আর আপত্তি কী। চিঠি তিনি প'ড়ে দেখলেন, চিঠি প'ড়ে তাঁর ভালো লাগল। জানালেন, চিঠি নিয়ে যেতে তিনি রাজি। আমি রেভারেন্ড আয়র্লন্ড-কে রেলে যাবার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিতে চাই, তিনি সচরাচর ইন্টার ক্লাস্-এ যাতায়াত করেন ব'লে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া নিতে চাইলেন না। রাত-ভর রেলকামরায় কাটাতে হবে জেনে-শুনেও তিনি ইন্টার ক্লাস্ গাড়িতে গেলেন। তাঁর সাদাসিধে-ধরন ও সোজাসুজি স্পষ্ট কথা বলার স্বভাব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার মনে হয়, এইরকম একজন পূতচরিত্র লোকের হাত দিয়ে চিঠি পাঠাবার দরুণ বাঞ্ছিত ফল ফলেছিল। এতে আমার মন অনেকটা হাল্কা হয়েছিল, পথও পরিষ্কার হয়েছিল।

আমার অন্য দায়িত্ব ছিল যুদ্ধের জন্য সৈন্য-সংগ্রহ। এ কাজ শুরু করতে হ'লে খেড়া জেলার চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথায় পাব? সেখানকার স্বেচ্ছাব্রতী সহকর্মীরা ছাড়া কাকেই-বা বলতে পারতাম, সকলের অগে এগিয়ে এসে আমার এই কাজে যোগ দিতে। নদিয়াদ পৌঁছেই বল্লভভাই ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করি। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ সৈন্য-সংগ্রহের প্রস্তাব সহজমনে স্বীকার ক'রে নিতে পারলেন না। প্রস্তাবটা যাঁরা পছন্দ করলেন, তাঁরাও বললেন, এ কাজ আমরা সফল ক'রে তুলতে পারব কি-না সন্দেহ। যে শ্রেণীর লোকদের সেনাদলে যোগ দেওয়ার জন্য বলব ব'লে ভেবেছিলাম সরকারের প্রতি তাদের খুব-একটা প্রেম ছিল না। সরকারি আমলাদের হাতে এই সেদিনও কত লাঞ্ছনা-অপমান তাদের ভুগতে হয়েছে, সে কি তারা সহজে ভুলতে পারে?

তবুও সেনা-সংগ্রহের কাজ শুরু করার সপক্ষে সহকর্মীরা মত দিলেন। কাজে হাত দিতে-না-দিতেই আমার চোখ ফুটল। মনে-মনে যেসব আশা গ'ড়ে তুলেছিলাম, তাতে খুব একটা ঘা লাগল। খাজনা মকুব রাখার আন্দোলনের সময়, খেড়ার লোকে বিনা-পয়সায় আমাদের তাঁদের গোরুগাড়ি ব্যবহার করতে দিত। যে কাজ একজনকে দিয়েই হতে পারে, সে কাজ করার জন্য হাঁক দেওয়ামাত্র দু-দু-জন স্বেচ্ছাব্রতী ছুটে আসত। সেনা-সংগ্রহের কাজে ভাড়া কবুল করলেও গোরুগাড়ি পাওয়া কঠিন হ'ল। আর স্বেচ্ছাসেবকের কথা না-বলাই ভালো। কিন্তু ভয় পেয়ে নিরস্ত হবার পাত্র আমরা ছিলাম না। স্থির হ'ল, গোরুগাড়িতে না-চেপে আমরা বিভিন্ন জায়গায় পায়ে হেঁটে যাব। দৈনিক আমাদের কুড়ি মাইল পায়ে হেঁটে পথ চলতে হ'ত। গোরুগাড়িই মিলল না যখন, গাঁয়ের লোক আমাদের খাওয়াবে, এমনটা আশা করাই বৃথা। আর চেয়ে-চিন্তে খাবার জোগাড় করাটাও ঠিক হ'ত না। সুতরাং স্থির হ'ল প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক আপন-আপন খাবার ঝুলিতে ভ'রে ব'য়ে নিয়ে যাবে। তখন গ্রীষ্মকাল, তাই চাদর বা বিছানা নেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

যেখানেই যেতাম সভা বসাতাম। লোক যে আসত না এমন নয়, তবে দু-একজনের বেশি নাম লেখাবার জন্য এগিয়ে আসত না। লোকে আমাদের নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করত।

কেউ-কেউ বলত, "আপনারা তো মশাই, অহিংসার ভক্ত, তবে আমাদের অস্ত্র ধরতে বলেন কোন্ সুবাদে? সরকার ভারতের এমন কী ভালো করেছে যেজন্য সরকারের সঙ্গে আমাদের হাত মেলাতে হবে?"—এমনিতর নানা প্রশ্ন।

সে যা-ই হোক্, একনাগাড়ে সৈন্য-সংগ্রহের কাজে লেগে থাকায় ফল ফলতে শুরু করল। বেশ-কিছু নাম রেজিস্টার-ভুক্ত করা হয়েছিল। একটা দল গঠন ক'রে বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারলে, তাদের দেখাদেখি আরো লোক নিশ্চয় নাম লেখাতে আসবে। রংরুটদের কোথায় রাখা যেতে পারে, এসব বিষয়ে খেড়ার কমিশনার-এর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার আলাপ-আলোচনা চলছিল।

দিল্লীর সেই সমর-সমিতির দেখাদেখি প্রত্যেকটি বিভাগের কমিশনার নিজ-নিজ এলাকায় বৈঠক ডেকেছিলেন। গুজরাটেও এইধরনের সভা বসেছিল। তাতে যোগ দেবার জন্য আমি ও আমার সহকর্মীরা আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। আমরা হাজির হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু দিল্লীর বৈঠকে যতটা-না অস্বস্তি বোধ করেছিলাম এখানে তার চেয়ে ঢের বেশি অস্বস্তি বোধ হ'ল। এখানকার পরিবেশটা ছিল এমন যেন সবাই আমরা সরকারের হুকুমের চাকর। এরকম গোলামি মনোভাব দেখে আমার ভারি খারাপ লাগছিল। আমি এই বৈঠকে মোটামুটি লম্বা-ই একটা বক্তৃতা দিলাম। আমি যা বললাম তাতে আমলারা খুশি হতে পারেননি, বরঞ্চ তাতে দু-চারটে দস্তুরমতো কড়া কথাই ছিল।

রংরুট হিসেব নাম লেখাবার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমি ইস্তাহার বের করতাম। সৈন্য হবার সপক্ষে আমি যেসব যুক্তি দিতাম, তার একটি কমিশনর সাহেবের ঠিক পছন্দ হয়নি। যুক্তিটি ছিল এই : "ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের নানা অপকীর্তির মধ্যে, ইতিহাস যাকে সবচেয়ে অপকৃষ্ট মনে করবে, সে হ'ল অস্ত্র আইন। এই আইনের বলে একটা গোটা দেশ ও জাতিকে নিরস্ত্র ক'রে রাখা হয়েছে। এই অস্ত্র আইন যদি আমরা রদ করাতে চাই, যদি অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করতে চাই, তাহলে এই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। সরকারের সঙ্কট-মুহূর্তে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যদি সরকারের সাহায্যকল্পে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে, তাহলে আবিশ্বাসের ভাব দূর হয়ে যাবে এবং অস্ত্র রাখা নিয়ে এখন যেসব বিধিনিষেধ আছে, সেগুলি প্রত্যাহৃত হবে।"

কমিশনার আমার এই ইস্তাহারের কথা তুললেন এবং বললেন তাঁর ও আমার মধ্যে মতের অমিল সত্ত্বেও আমি যে সভায় উপস্থিত হয়েছি, এতে তিনি খুবই সন্তোষ লাভ করেছেন। যথাসাধ্য সৌজন্যরক্ষা ক'রে আমাকেও আমার সেই যুক্তির সপক্ষে সাফাই দিতে হয়েছিল।

রেভারেন্ড আয়র্লন্ড-এর হাত দিয়ে ভাইস্রয়-এর কাছে আমি যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলাম, তার কথাগুলি ছিল এই :

"আপনি তো অবগত আছেন, খুব ভালো ক'রে ভেবে দেখার পর আপনাকে জানাতে বাধ্য হই যে সমর-সমিতির বৈঠকে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। কেন যে হবে না সেসব কথা আমার ২৬ এপ্রিল তারিখের চিঠিতে বিশদ ক'রে বলেছি। অতঃপব

আপনার অনুগ্রহে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনার পর আমার মনে হয়, অপর কোনো কারণে না-হ'লেও আপনার প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশত বৈঠকে আমার যোগ দেওয়া উচিত। বৈঠকে যোগ না-দেবার সপক্ষে আমার অন্যতম এবং সম্ভবত মুখ্য কারণ ছিল এই যে আমার ধারণায় যেসব জন-নেতাদের জনমতের ওপর প্রভাব সবচেয়ে বেশি, সেই লোকমান্য তিলক, মিসেস্ বেশান্ত্ এবং আলী-ভ্রাতৃদ্বয়কে, সেই অধিবেশনে আমন্ত্রণ করা হয়নি। এখনো আমার মনে হয়, তাঁদের না-ডাকাটা একটা বড়োরকমের ত্রুটি হয়ে গেছে। সবিনয়ে বলতে চাই যে এই মারাত্মক ভুল হয় তো খানিকপরিমাণে সংশোধন করা যেতে পারে, যদি প্রদেশে-প্রদেশে এইধরনের যেসব বৈঠক অতঃপর ডাকা হবে ব'লে শুনতে পাচ্ছি, সেইসব অধিবেশনে উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে সরকারের প্রতি আনুকূল্য করার জন্য এঁদের অনুরোধ করা হয়। আরো-একটি কথা আপনার কাছে নিবেদন করা উচিত—এঁদের মতো জন-নেতা যাঁরা বহুজনের প্রতিনিধি-স্থানীয়, এঁদের মতামত সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের হ'লেও কোনো সরকারের পক্ষে সমীচীন নয় এঁদের উপেক্ষা করা। সেইসঙ্গে এ কথাও বলি যে এই বৈঠকের বিভিন্ন কমিটিতে সকলরকম পার্টির লোকেদের আপন-আপন মতামত খোলাখুলি পেশ করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল ব'লে, আমি বিশেষ সন্তোষলাভ করেছিলাম। আমার নিজের দিকে থেকে আমি বলব মূল বৈঠকে, কিংবা যে কমিটির সদস্য-পদ দিয়ে আমায় সম্মানিত করা হয়েছিল—সেই কমিটিতে, এই উভয় জায়গাতেই আমি ইচ্ছা ক'রেই আমার মতামত প্রকাশ করতে চাইনি। আমার মনে হয়েছিল, সমর-সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার প্রকৃষ্ট উপায় হবে সেই সমিতির সামনে উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলি সমর্থন করা। আমি সেসব প্রস্তাব সমর্থন করেছি সর্বান্তঃকরণে। আমার সেই মুখের কথা আমি কার্যে পরিণত করতে চাই কালবিলম্ব না-ক'রে। এইসঙ্গে প্রেরিত পৃথক্ পত্রে আমি যে প্রস্তাব করেছি, সরকার তা গ্রহণ করামাত্র আমার কাজ আমি শুরু ক'রে দিতে চাই।

"ডোমিনিয়নগুলির মতো অদূর ভবিষ্যতে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার হতে চাই ব'লে, সাম্রাজ্যের এই সঙ্কটের দিনে আমাদের উচিত দ্বিধাশূন্য হয়ে তাকে যথাসাধ্য সহায়তা করা এবং সে সহায়তা করব ব'লে আমরা স্থিরও করেছি। কিন্তু আসলে এভাবে আমাদের সাড়া দেবার কারণটা আর-কিছু নয়, আমরা ভাবছি ও আশা করছি যে এতে ক'রে একটু আগেভাগে আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাব। সেই কারণে, এবং কর্তব্য করলে অধিকার জন্মায়, এই নীতি অনুসারে এ দেশের লোকেরা নিশ্চয় ধ'রে নিতে পারে, আপনার ভাষণে আপনি যে শাসন-ব্যবস্থার আসন্ন সংস্কারের উল্লেখ করেছেন, তাতে মোটামুটিভাবে কংগ্রেস-লীগ্-প্রস্তাবিত পরিকল্পনা স্থান পাবে। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, সরকারকে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করার কথা বৈঠকের অধিকাংশ সদস্য যে বলেছেন, সে তাঁরা এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই বলেছেন।

"দেশের লোককে আমি যদি পিছু হ'টে যেতে বলতে পারতাম, তাহলে আমি তাদের দিয়ে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়ে নিতাম, এবং বলতাম, যুদ্ধ চালু থাকাকালে তারা যেন 'হোম রুল' কিংবা 'স্বায়ত্ত শাসন'-এর কথা মুখেও না-আনে।

ভারতকে বলতাম, সাম্রাজ্যের এই সঙ্কট-মুহূর্তে যেন তার তাবৎ শক্ত-সমর্থ সন্তানকে সাম্রাজ্যের রক্ষাকল্পে আহুতি দেয়। তা যদি করে তবে ভারত এই বৃহৎ সাম্রাজ্য-পরিবারের একজন বিশিষ্ট সদস্যরূপে স্বীকৃত হবে, এবং জাতিগত বৈষম্য পরিণত হবে দূর অতীতের স্মৃতিরূপে। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায় এমন পথ বেছে নিয়েছে, যার পরিণাম এইরকম ফলপ্রসূ হবে না। জনসাধারণের ওপর এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোনো প্রভাব নেই, এমন কথা আজকের দিনে বলা চলবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার পর থেকে আমি নিয়তই এ দেশের রায়তদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছি। সেই নিকট-পরিচয়ের সূত্রে আপনাকে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, 'হোম রুল'-এর আকাঙ্ক্ষা তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করেছে। কংগ্রেস-এর গত অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এর দ্বারা স্বীকৃত বিধানের বলে, নির্দিষ্টকালের মধ্যে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়াকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হোক্, এই মর্মে একটি যে প্রস্তাব সেই অধিবেশনে গৃহীত হয়, তাতে আমারও হাত ছিল। আমি মানি, এটা একটা বিরাট পদক্ষেপ। এ কথাও আমি নিশ্চিত জানি যে হোম রুল বিষয়ে তাঁদের মনে যে একটি স্পষ্ট ধারণা গ'ড়ে উঠেছে, যথাসত্বর সে স্বপ্ন যদি বাস্তবে পরিণত না-হয়, তাহলে আর-কিছুতেই এ দেশের লোক তুষ্ট হতে পারে না। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তাদের সকল-কিছু বিসর্জন দেওয়াও বহু ভারতীয়ের কাছে তুচ্ছ। সেইসঙ্গে এ কথাও তারা বেশ ভালো ক'রে জানে যে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থেকেই যদি তাদের ঈপ্সিত সেই চরম লক্ষ্যসাধন করতে হয়, তাহলে সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ পর্যন্ত আহুতি দেবার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তার অর্থ এই যে কোনোরকম দ্বিধাদ্বিরুক্তি না-ক'রে আমরা যদি সাম্রাজ্যকে তার আসন্ন সঙ্কট থেকে উদ্ধার করার জন্য কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করতে পারি, তাহলে আমাদের যাত্রাপথ সুগম হয় এবং সত্বর আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য আমরা যদি স্বীকার ক'রে না-নিই, তাহলে সে হবে সমগ্র জাতির স্বার্থকে বলি দেবার সামিল। সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য আমরা যদি কাজ করি তাহলে প্রকারান্তরে 'হোম রুল' অর্জন করার জন্যই আমরা কাজ করছি, এই উপলব্ধিটুকু আমাদের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠা দরকার।

"সুতরাং আমি স্পষ্টত বুঝতে পারছি, সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য যত লোক পাওয়া যায়, তত লোক আমাদের দেওয়া উচিত। জনগণের দিক থেকে যে কথা আমি বলতে পারি, অর্থবলের দিকে থেকে সেরকম কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রদেশের রায়তদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে আমি খুব ভালো ক'রেই বুঝেছি, সম্রাটের রাজকোষে যুদ্ধের ব্যাপারে ভারত যে দান করেছে তা তার সাধ্যের অতিরিক্ত। আমি জানি, আমার এই উক্তি বহুলাংশে আমার দেশের জনমতেরই প্রতিধ্বনি।

"আমার কাছে যেমন, তেমনি অন্য অনেকের কাছে সমর-সমিতির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব, একটি সর্বজন-স্বীকৃত আদর্শসাধনে নিজেদের নিবেদিত করার দিকে একটি অকুণ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি খুবই অদ্ভুত। সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেও আমরা যেন সাম্রাজ্যের পরিবারভুক্ত নই। আমরা নিজেদের উৎসর্গ ক'রে দিতে চাইছি ভবিষ্যতে পরিস্থিতি ভালো

হবে, এই আশায়। আমাদের সেই আশাটা ঠিক যে কী সে যদি আমি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষার আশ্রয় না-নিয়ে একেবারে সাদামাটা স্পষ্ট কথায় খোলাখুলিভাবে না-বলতে পারি, তাহলে আমি আপনার কাছে তথা আমার দেশের সমস্ত লোকের কাছে বিশ্বাসভঙ্গের দোষে অপরাধী হয়ে থাকব। আমাদের সে আশা পূরণ করার জন্য আমি দরদস্তুর করতে চাই না। কিন্তু আপনি তো জানেন, আশাভঙ্গ হওয়ার আরেক অর্থ মোহভঙ্গ হওয়া।

"একটা কথা না-বললে নয়। ঘরোয়া বাদবিসম্বাদ মিটিয়ে নেবার জন্য আপনি আমাদের অনুরোধ জানিয়েছেন। আমলাতন্ত্রের জুলুম ও অন্যায় মুখ বুজে সহ্য ক'রে নেওয়া যদি এই অনুরোধের অঙ্গ হয়, তাহলে তাতে আমি সাড়া দিতে পারি না। জেনেশুনে আগেভাবে ব্যবস্থাদি ক'রে যেসব অন্যায়-অত্যাচার ঘটে, তা আমি আমার সর্বশক্তি-প্রয়োগে প্রতিরোধ করতে বাধ্য। এরকম ক্ষেত্রে বরঞ্চ রাজকর্মচারীদের কাছেই অনুরোধ জানিয়ে বলা দরকার তাঁরা যেন একটি প্রাণীকেও হেনস্তা না-করেন এবং ইতিপূর্বে যতখানি-না করেছেন তার চেয়ে অনেক অধিক পরিমাণে যেন তাঁরা জনমত বুঝে নেবার জন্য ও তাকে যথোচিত মর্যাদা দেবার জন্য তৎপর হন। চম্পারণে বহুকাল ধ'রে যে অত্যাচার চলেছিল তাকে প্রতিহত ক'রে আমি ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতার সার্বভৌমত্ব প্রতিপন্ন ক'রে এসেছি। খেড়ার লোক এতকাল সরকারকে শাপান্ত ক'রে এসেছে, আজ তারা বুঝেছে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যদি দুঃখবরণ করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে যথার্থ শক্তির অধিকারী হতে পারে জনসাধারণ, সরকার নয়। সুতরাং আজ দেখা যাচ্ছে, খেড়ার লোকেদের মনের তিক্ততা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে ; তারা নিজেদের বোঝাচ্ছে, যে সরকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংযত আইন-অমান্য আন্দোলন সহ্য ক'রে নেয়, সে সরকার নিশ্চয় জনগণের সরকার। সেই হিসাবে চম্পারণ ও খেড়ার আন্দোলনে আমার সাফল্য প্রত্যক্ষ ও নিশ্চিতভাবে যুদ্ধ-প্রতিরোধে আমার বিশেষ অবদান। এইধরনের কার্যকলাপ আমায় যদি নিরোধ ক'রে রাখতে বলা হয়, তাহলে সে হবে আমার শ্বাসনিরোধের সামিল। পশুশক্তির বদলে লোকেদের মনে আমি যদি আত্মিক শক্তি অর্থাৎ প্রেমের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে আপনার হাতে এমন ভারত আমি তুলে দেব যা না-কি সারা দুনিয়ার সমস্ত পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। অতএব ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করার সনাতন নীতি আমার জীবনে প্রকাশ করার জন্য আমি নিয়ত তপশ্চর্যা ক'রে যাব এবং যাদের এদিকে প্রবণতা আছে তাদেরও বলব জীবনের এই আদর্শ গ্রহণ করতে। যদি কখনো আমি অন্য কাজে হাত লাগাই, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সেই সনাতন নীতির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ।

"সর্বশেষে আপনাকে বলি, আপনি সম্রাট-বাহাদুরের মন্ত্রীমণ্ডলকে অনুরোধ জানান, মুস্‌লিম রাষ্ট্রগুলির বিষয়ে তাঁরা যেন নিশ্চিত আশ্বাস দেন। এই প্রশ্ন নিয়ে প্রত্যেক মুসলমান যে গভীরভাবে আগ্রহী, সে কথা আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন। হিন্দু হিসেবে তাঁদের এই আগ্রহ বিষয়ে আমি উদাসীন থাকতে পারি না। তাঁদের শোক-দুঃখ আমাদেরও শোক-দুঃখ। মুস্‌লিম রাষ্ট্রগুলির ন্যায্য অধিকার স্বীকার ক'রে নেওয়ায়, মুস্‌লিম ধর্মস্থানগুলির পবিত্রতারক্ষার জন্য, তাঁদের মনোভাবকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়ায় এবং হোম রুল বিষয়ে

ভারতের দাবি ন্যায়সঙ্গতভাবে ও যথাসময়ে মেনে নেওয়ায়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নির্ভর করছে। যেহেতু আমি ইংরেজ জাতিকে ভালোবাসি এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয়ে ইংরেজ-সুলভ রাজভক্তির সঞ্চার করতে চাই, সেই কারণেই আমার এই চিঠি লেখা।"

২৮. যমালয়ের মুখে

সৈন্য-সংগ্রহের কাজ করতে গিয়ে আমার শরীর-স্বাস্থ্য নষ্ট হবার দাখিল হয়েছিল। সেসময় আমার মুখ্য আহার ছিল চীনাবাদামের মাখন ও লেবু। আমি ভালো ক'রেই জানতাম, অত্যধিক স্নেহ-পদার্থ খেলে শরীরের ক্ষতি হয়। এ কথা জানা সত্ত্বেও বাদামের মাখন আমি কিছু কম খেতাম না। ফলে আমার সামান্য আমাশয়ের মতো অসুখ হয়। কিন্তু অসুখের প্রতি আমি তেমন কোনো নজর দিইনি। গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে-ঘুরতে সময় সুযোগ পেলেই আমি সন্ধের মুখে আশ্রমে চ'লে যেতাম। তখনকার দিনে অসুখে-বিসুখে ওষুধ-বিষুধ খাওয়া আমি একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলাম। যেদিন আমাশয়ের মতো হ'ল, সেদিনও সন্ধ্যাতে আমি আশ্রমে গেছি। ভেবেছিলাম, এক বেলা না-খেয়ে থাকলে অসুখ সেরে যাবে। পরদিন সকালবেলা আহারাদি বাদ দিয়ে মনে হ'ল ব্যামো থেকে সে যাত্রা হয়তো রেহাই পাওয়া গেল। অবশ্য সম্পূর্ণ নিরাময় হতে গেলে উপবাসের মেয়াদ আমায় বাড়াতে হবে, সে আমি ঠিকই জানতাম। নিতান্তই যদি কিছু খেতে হয় তাহলে ফলের রস ছাড়া আর-কিছু খাওয়া উচিত হবে না।

সেদিন সকালটা আমি উপোস দিয়েছি, দিনটা ছিল কোন্ যেন পালা-পরবের দিন। কস্তুরবাকে ব'লে দিয়েছিলাম, সেদিন দুপুরেও আমি কিছু খাব না। কিন্তু সে কিছু খাবার আমার সামনে ধ'রে আমায় একটু সাধাসাধি করল আর আমিও লোভ সামলাতে পারলাম না। দুধ কিংবা দুগ্ধজ কোনো পদার্থ আমি সেবন করব না, এইরকম একটি পণ নিয়েছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে। সেই কারণে, ঘিয়ের বদলে তেল দিয়ে ভেজে সে খানিকটা সুজি দিয়ে একটা মিষ্টি হালুয়া-মতন রেঁধেছিল। বাটি ভরতি মুগের ডালও ধরল আমার সামনে। এসব খাবার খেতে আমার দস্তুরমতো ভালো লাগত। আমি দ্বিধা-দ্বিরুক্তি না-ক'রে খেতে ব'সে গেলাম। সূচনায় ভেবেছিলাম, কস্তুরবা যাতে খুশি হয় এবং আমার রসনারও কিঞ্চিৎ তৃপ্তি যাতে হয়, আমি কেবল ততটুকুই খাব, তার অতিরিক্ত খাব না। কিন্তু লোভ নামক শয়তান ঠিক যেন এই সুযোগটার জন্য ওঁৎ পেতে ব'সে ছিল। পাত পেড়ে ব'সে যাবার পর দেখা গেল কম ক'রে খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে আমি পেটপুরে খেয়ে ফেলেছি। সাধ ক'রে আমি যেন মৃত্যুর দূতকে ঘরে ডেকে নিলাম। ঘণ্টাখানেক সময় যেতে-না-যেতে পেটে মোচড় দিয়ে দুরন্ত আমাশয় রোগ দেখা দিল।

সেইদিনই সন্ধেবেলা আমার নদিয়াদ-এ ফেরবার কথা। আশ্রম থেকে সবরমতী স্টেশন মাত্র দর্শ ফার্লং-এর রাস্তা। পায়ে হেঁটে সেইটুকু রাস্তা চলতে গিয়ে আমার প্রায় প্রাণান্ত।

আমেদাবাদে বল্লভভাই গাড়িতে উঠলেন। আমায় দেখেই বুঝতে পারলেন, আমার শরীর খারাপ। কিন্তু আমার কষ্টটা কতখানি অসহ্য ব'লে মনে হচ্ছিল, সে আমি তাঁকে জানতেও দিইনি।

নদিয়াদ পৌঁছলাম রাত যখন প্রায় দশটা। স্টেশন থেকে আমাদের আস্তানা হিন্দু অনাথাশ্রম মাত্র আধ মাইলের রাস্তা। সেই আধ মাইল চলতে গিয়ে আমার মনে হ'ল যেন দশ মাইল হেঁটে এসেছি। অতিকষ্টে তো আশ্রম পৌঁছলাম। কিন্তু থেকে-থেকে পেটে মোচড় দেওয়া সেই বেদনা বৃদ্ধি পেতে লাগল। আশ্রমের পায়খানাটা ছিল বেশ-একটু দূরে। বারবার অতদূর যাতে না-যেতে হয় সেইজন্য আমার পাশের ঘরে একটি কমোড বসানোর প্রস্তাব করলাম। সে কথা বলতে আমার খুবই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, কিন্তু নিতান্ত অনুপায় হয়ে বলতে হ'ল। ফুলচাঁদ কালবিলম্ব না-ক'রে একটা কমোড জোগাড় ক'রে আনলেন। উদ্বেগে ব্যাকুল হয়ে আমার সকল বন্ধুরা আমার বিছানার চারিদিকে ঘিরে বসলেন। তাঁদের স্নেহ ও যত্নের তুলনা হয় না, কিন্তু আমার যন্ত্রণার উপশম তাঁরা ঘটাবেন কী ক'রে? আমার জিদ ও একগুঁয়েমির দরুন তাঁরা যেন আরো অসহায় বোধ করতে লাগলেন। ডাক্তারি চিকিৎসায় আমার ঘোরতর আপত্তি। কোনো ওষুধ আমি খেতে চাইলাম না, ভাবলাম লোভে প'ড়ে আহাম্মুকি যখন করেছি তখন তার শাস্তিও আমায় বহন করতে হবে। অসহায় আতঙ্কে তাঁরা সারারাত জেগে কাটালেন। চব্বিশ ঘণ্টায় আমার দাস্ত হয়েছিল ত্রিশ-চল্লিশবার। আহার ত্যাগ করলাম। গোড়ার দিকে ফলের রসটুকুও খাইনি। খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। এতদিন মনে ক'রে এসেছিলাম, আমার দেহযন্ত্রটা লোহার মতো শক্ত ও মজবুত। এখন সেই শরীরের এমন হাল হ'ল যেন একতাল কাদা বৈ আর-কিছু নয়। রোগের সঙ্গে যুঝব, এমন ক্ষমতা আদৌ ছিল না। ডক্টর কানুগা এসে ওষুধ খাওয়াবার জন্য আমায় খুব পীড়াপীড়ি করলেন। আমি তাঁর কথায় কান দিলাম না। একটা ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে চাইলেন—তাতেও আমি রাজি হলাম না। তখনকার দিনে ইন্‌জেক্‌শন্ নিয়ে আমার অজ্ঞতা ছিল নিতান্তই হাস্যকর। আমি ভাবতাম ইন্‌জেক্‌শন্-মাত্রই সেরাম-জাতীয় জিনিস, পশুদেহ থেকে তৈরি। পরে বুঝেছিলাম, ডক্টর কানুগা-র প্রস্তাবিত ইন্‌জেক্‌শন্-এর উপাদান ছিল গাছগাছড়ার নির্যাস। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে-হতে, ব্যামোর প্রকোপ অনেকখানি বেড়ে গেল। বারবার দাস্ত তখনো সমানে চলছে, ফলে শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নিঙড়ে বেরিয়ে গেল। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এল জ্বর ও বিকার। বন্ধুরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে আরো কয়েকজন ডাক্তার ডাকলেন। কিন্তু রোগী যদি ডাক্তারের কথা শুনতেও না-চায়, তাহলে সে রোগীর চিকিৎসা করা যায় কী উপায়ে?

শেঠ অম্বালাল ও তাঁর সাধ্বী স্ত্রী নদিয়াদ এলেন। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ অন্তে, তাঁরা অতিযত্নে, অতিসন্তর্পণে আমেদাবাদে তাঁদের মীর্জাপুর বাংলোয় আমায় স্থানান্তর করলেন। আমার এই অসুস্থতার সময় আমি যেরকম সস্নেহ ও স্বার্থলেশহীন সেবাযত্ন লাভ করেছিলাম, আর কারো পক্ষে অতখানি সৌভাগ্য লাভ হয়েছে কি-না সন্দেহ। কিন্তু আমার সেই ঘুষঘুষে জ্বরটা কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না, দেহের শক্তিও যেন দিন-দিন ক্ষয় পাচ্ছিল।

মনে ভয় হ'ল, অসুখটা হয়তো অনেকদিন ধ'রে চলবে এবং অসুখ থেকে সেরে উঠতে পারব কি-না সন্দেহ। শেঠ অম্বালালের বাড়িতে তাঁরা আমায় এমন সেবাযত্ন দিয়ে ঘিরে রাখলেও, সেখানে আমার মন যেন টিকছিল না। তাঁকে বারবার বলতে লাগলাম যেন তিনি আমায় আশ্রমে স্থানান্তর করেন। আমার নির্বন্ধাতিশয়ে তাঁকে হার মানতে হ'ল, তিনি আমায় আশ্রমে নিয়ে গেলেন।

আশ্রমে শয্যাগত অবস্থায় আমি যখন রোগযন্ত্রণায় কাতর, বল্লভভাই এসে খবর দিলেন, জর্মানীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছে এবং কমিশনার সাহেব ব'লে পাঠিয়েছেন, সৈন্য-সংগ্রহের কাজ আর চালিয়ে যাবার দরকার নেই। সৈন্য-সংগ্রহ নিয়ে আমায় আর মাথা ঘামাতে হবে না, এই খবর পেয়ে আমি খুবই আশ্বস্ত বোধ করলাম।

তখন আমি নিজের ওপর জল-চিকিৎসার প্রয়োগ করছি। তাতে রোগের কিছুটা আরাম হ'ল বটে কিন্তু শরীরে বলাধান করা শক্তসাধ্য মনে হ'ল। চিকিৎসকের দল নানারকম শলাপরামর্শ দিলেন, কোনোটাই আমার মনঃপূত হ'ল না। তাঁদের মধ্যে থেকে দু-তিনজন গোদুগ্ধের বিকল্পে মাংসের সূপ-এর বিধান দিলেন এবং সেই উপদেশের সপক্ষে আয়ুর্বেদশাস্ত্র থেকে দু-চারটে শ্লোকও প'ড়ে শোনালেন। একজন ডিম খাওয়ার উপকার নিয়ে জোর ওকালতি করলেন। তাঁদের এইসমস্ত প্রস্তাবের উত্তরে আমার একটিমাত্র জবাব ছিল—না।

খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে শাস্ত্রীয় বিধান মেনে চলতে হবে, এ আমি মেনে নিতে পারিনি। খাদ্য ছিল আমার জীবনের আদর্শের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমার সেই আদর্শ ছিল একান্তভাবে আমার নিজস্ব। বাইরে থেকে চাপানো শাস্ত্রীয় বিধি বা নিষেধের ওপর সে আদর্শ আর নির্ভরশীল ছিল না। কেবল বেঁচে থাকার খাতিরে আমি সে আদর্শ বিসর্জন দিতে চাইনি। আমার স্ত্রী ও পুত্রদের বেলায়, আমার স্নেহভাজনদের বেলায় আমি যে আদর্শ নির্মমভাবে পালন ক'রে এসেছি, নিজের বেলায় কী ক'রে তা থেকে আমি ভ্রষ্ট হই?

জীবনে আমার এই প্রথম দীর্ঘকালব্যাপী রোগভোগের সুবাদে, আমি আমার সেই আদর্শের বিচারে করার সুযোগ এইভাবে লাভ করেছিলাম। বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতেও পেরেছিলাম। রাত এল। সেদিন আমি সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিলাম, মনে হ'ল মৃত্যু আমার আসন্ন। অনসূয়া বেন-কে খবর পাঠালাম, তিনি ছুটে আশ্রমে চ'লে এলেন। বল্লভভাই এলেন ডক্টর কানুগাকে সঙ্গে নিয়ে। ডাক্তার আমার নাড়ি পরীক্ষা ক'রে বললেন, "আপনার নাড়ীর গতি বেশ ভালো। ভয়ের কোনো কারণ দেখছি না। অত্যধিক দুর্বলতার দরুন স্নায়ুর বিকার ঘটায় আপনি অনর্থক ভয় পেয়েছেন।" কিন্তু আমার মন ভরসা মানল না। সে রাতটা কাটল বিনিদ্র অবস্থায়।

রাত ভোর হ'ল, তখনো আমি বেঁচে আছি। কিন্তু শেষের সময় যে আগতপ্রায় সেই ভাবটুকু কিছুতেই মন থেকে দূর করা গেল না। তাই যতটুকু সময় জাগ্রত অবস্থায় থাকতাম, আশ্রমবাসীদের মুখে *গীতা*-পাঠ শুনতে লাগলাম। আমার নিজের পড়বার মতো ক্ষমতা ছিল না। কারো সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছা করছিল না। সামান্য-কিছু কথা বলতে হ'লে মাথাটা যেন ঝনঝন ক'রে উঠছিল। কেবল অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য বেঁচে থাকার সাধ

আমার কোনোকালে ছিল না ; সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ আর অবশিষ্ট রইল না। দিন-দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এমন একটা দেহ নিয়ে, অসহায় ও অকর্মণ্য অবস্থায় কেবল সহকর্মী ও বন্ধুজনের সেবা-শুশ্রূষায় জীবনটাকে টিকিয়ে রাখা আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল।

এইভাবে মৃত্যুর অপেক্ষায় যখন দিন গুনছি, একটি অদ্ভুত জীবকে সঙ্গে নিয়ে একদিন ডক্টর তলবলকর এসে উপস্থিত। লোকটি মারাঠি। তখনো তার নামডাক বলতে কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁকে দেখেই মনে হ'ল লোকটি আমারই মতো ছিটগ্রস্ত। তাঁর নিজস্ব চিকিৎসাপদ্ধতি তিনি আমার ওপর প্রয়োগ করবেন, এই উদ্দেশ্য নিয়েই আসা। গ্রান্ট্ মেডিকেল কলেজের পাঠক্রম তিনি প্রায় শেষ ক'রে এসেছিলেন। কিন্তু ডিগ্রি নেননি। পরে জেনেছিলাম, তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক। নাম তাঁর কেলকর—অসম্ভব স্বাধীনচেতা এবং তেমনি জেদি স্বভাবের মানুষ। চিকিৎসায় তাঁর অসাধারণ বিশ্বাস। আমার ওপর এখন তিনি তাঁর সেই চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগ করবেন ব'লে স্থির করলেন। লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'আইস ডক্টর'। তাঁর দৃঢ় ধারণা, পাশ-করা ডাক্তারেরা ব্যাধি ও তার প্রতিকার বিষয়ে এমন কয়েকটা জিনিস ধরতে পারেননি, যা নাকি তিনি আবিষ্কার করেছেন। নিজস্ব পদ্ধতিতে তাঁর সেই গভীর আস্থা তিনি আমার মধ্যে সংক্রামিত করতে পারেননি—এ নিয়ে আমাদের উভয়ের আক্ষেপ এখনো ঘোচেনি। কিছুদূর পর্যন্ত তাঁর পদ্ধতির যুক্তিযুক্ততা স্বীকার ক'রে নিতে পারি, কিন্তু আমার ধারণা বিচার-প্রমাণের অপেক্ষা না-রেখেই তিনি যেন চট্‌জলদি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর আবিষ্কারের সত্যমিথ্যা নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে, আমি ব'লে দিলাম যে আমার শরীরের ওপর তিনি তাঁর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। জল-চিকিৎসার মতো যেসব পদ্ধতি বাইরের প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল, তা নিয়ে তো আমার কোনো আপত্তি ছিল না, কেলকর-পদ্ধতির চিকিৎসায় রোগীর সারা দেহে বরফ বুলিয়ে দেওয়া হয়। আমার দেহের ওপর তাঁর চিকিৎসা যে কতখানি কার্যকর হয়েছিল, সে বিষয়ে তাঁর দাবি পুরোপুরি না-মানতে পারলেও, স্বীকার করতে বাধা নেই যে এই চিকিৎসার ফলে আমার মনে একটা নতুন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার ঘটেছিল। শরীর ও মনের নিকট সম্পর্ক থাকায়, শরীরের ওপরে মনের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকবে। আহারে রুচি ফিরে এল, রোজ পাঁচ-দশমিনিটকাল ধীরে-ধীরে পায়চারি করতেও শুরু করলাম। এবার কেল্‌কর আমার পথ্যের হেরফের করতে চাইলেন। বললেন : "শরীরে আপনি শান্তি পাবেন আর দ্রুত বল সঞ্চার হতে পারে যদি আপনি কাঁচা ডিম খান, এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি। ডিম দুধের মতোই নির্দোষ। ডিমকে ঠিক মাংসের মতো আমিষের কোঠায় ফেলা চলে না। জানেন নিশ্চয়, সব ডিম থেকে বাচ্চা বের হয় না। এইধরনের বাওয়া ডিম বাজারে পাওয়া যায়।" কিন্তু এইধরনের ডিম খেতেও আমার আপত্তি ছিল। তৎসত্ত্বেও শরীর-স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতির ফলে দেশের কাজে আবার আমার আগ্রহ ফিরে আসে।

২৯. রাউলট্ বিল্ ও আমার উভয়সঙ্কট

আমার বন্ধুস্থানীয় লোকেরা ও ডাক্তারেরা আমায় বললেন, বায়ু পরিবর্তনের জন্য আমি যদি মাথেরান গিয়ে কিছুদিন থাকি তাহলে নিশ্চয় অল্পকালের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠব। কিন্তু মাথেরান-এর জলে কোষ্ঠবদ্ধতা বৃদ্ধি পাবার ফলে সেখানে বেশিদিন থাকা খুবই কষ্টকর হবে ব'লে মনে হ'ল। আমাশয়ে আক্রান্ত হবার পর আমার মল নিঃসারণের অস্ত্র হেজে গিয়েছিল ও স্থানে-স্থানে ছিঁড়েও গিয়েছিল। মলত্যাগের সময় এমন জ্বালাযন্ত্রণা হ'ত যে কিছু খেতে হবে ভাবতেও আতঙ্ক হ'ত। এক হপ্তা যেতে-না-যেতে মাথেরান থেকে আমায় পালিয়ে যেতে হ'ল। এইসময়ে শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার আমার শরীর-স্বাস্থ্য তদারকির ভার নিজেব হাতে তুলে নেন। ডক্টর দালাল-এর পরামর্শ নেবার জন্য তিনি আমায় পীড়াপীড়ি করেন. তাঁকে ডাকা হ'ল। কালবিলম্ব না-ক'রে তিনি কেমন মনঃস্থির করতে পারেন দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

তিনি বললেন, "আপনার শরীর-স্বাস্থ্য আমায় যদি নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হয়, আপনাকে দুধ খেতেই হবে। উপরন্তু আপনি যদি আয়রন ও আর্সেনিক ইন্‌জেক্‌শন্ নিতে রাজি থাকেন তাহলে গ্যারান্টি দিয়ে আপনার ভাঙা শরীর পুরোপুরি মেরামত ক'রে দিতে পারি।"

আমি বললাম, "ইন্‌জেক্‌শন্ আপনি দিতে পারেন। কিন্তু দুধের প্রশ্নটা একটু আলাদা। আমি আর দুধ খাব না ব'লে পণ নিয়েছি।"

"পণ নিয়েছেন কীরকম?" ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

আমার পণ নেবার কারণটা কী ডাক্তারকে আমি আনুপূর্বিক বলি। গোরু ও মোষের বাঁট থেকে ফুকা প্রথায় অতিরিক্ত দুধ আদায় করার তথ্যটুকু জানবার পর, দুধের প্রতি কীভাবে আমার গভীর বিতৃষ্ণা জন্মায়, সেইসব কথা তাঁকে জানাই। তাছাড়া তাঁকে এ কথাও বলি যে আমার বরাবরের ধারণা, দুধ বাছুরের খাদ্য, মানুষের খাদ্য নয়। এইসব কারণেই দুধ খাওয়া আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি। এইধরনের কথাবার্তা যখন চলছে, কস্তুরবা আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত কথা শুনছিলেন। আমার কথার মাঝপথে তিনি ব'লে উঠলেন : "তাহলে কিন্তু ছাগলের দুধ খেতে তোমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।"

ডাক্তার এই কথার খেই ধ'রে বললেন : "আপনি যদি ছাগলের দুধটুকুও খান, আমার চিকিৎসার পক্ষে তাই যথেষ্ট।"

আমি পরাজয় স্বীকার করলাম। সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রবল থাকায় বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাও আমার প্রবল হ'ল। আমার সঙ্কল্পের মর্মকথা বিসর্জন দিয়ে, কেবল আক্ষরিক অর্থে আমার প্রতিজ্ঞাবাক্য পালন করব স্থির ক'রে নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম। যখন পণ করেছিলাম, গোরু মোষের দুধের কথাই যদিচ আমার মনে ছিল, প্রকৃতপক্ষে সবরকম দুধই বর্জন করার কথাটা তার মধ্যে উহ্য ছিল। দুধ মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য নয়—আমার মনে এই প্রত্যয় যতদিন বলবৎ, ততদিন আমার দুধ খাওয়া ঠিক নয়। এসব কথা জানা

সত্ত্বেও আমি ছাগলের দুধ খেতে রাজি হয়ে গেলাম। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার কাছে হার মানল। সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগ দেবার উৎসাহে সত্যের পূজারীর সত্যনাশ হ'ল। সেই সত্যনাশের কথা যখন মনে পড়ে আজও অন্তর্জ্বালা অনুভব করি, মন অনুতাপে ভ'রে যায়, সর্বদা ভাবি, ছাগলের দুধ খাওয়ার অভ্যাস কীভাবে পরিহার করা যায়। কিন্তু জনসেবার মোহ একটা অদৃশ্য বন্ধনের মতো আমায় এমন শতপাকে বেঁধে রেখেছে যে এ থেকে এখনো আমার অব্যাহতি নেই।

অহিংসা নিয়ে আমার গবেষণার অঙ্গ হিসেবে আহার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও আমার খুবই ভালো থাকে। তা থেকে আমি প্রচুর আনন্দ পাই, একঘেয়েমি থেকে ছুটি পাই। আহার্য বিষয়ে অহিংসার প্রয়োগ ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লে যে ছাগলের দুধ খাওয়া নিয়ে আমি আজও অস্বস্তি বোধ করি, এমন নয়। ছাগলের দুধ খাওয়া আমার পক্ষে একপ্রকার ব্রতভঙ্গ অথবা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ। আমি যথাযথভাবে সত্যরক্ষা করতে পারিনি ব'লে আমার খারাপ লাগে। আমার কেমন মনে হয় সত্য ও অহিংসা, এই দুয়ের মধ্যে সত্যের আদর্শকেই আমি যেন একটু বেশি ভালো ক'রে বুঝতে পারি। আমি ঠেকে শিখেছি যে সত্যকে আমি যদি সবলে ধারণ ক'রে না-থাকি, অহিংসার জটিল গ্রন্থি আমি কিছুতেই মোচন করতে পারব না। সত্যের আদর্শ যে গ্রহণ করেছে তাকে ব্রত, মানত পালন করতে হয় কেবল আক্ষরিক অর্থে নয়, মর্মার্থেও। এ ক্ষেত্রে আমি আমার প্রতিজ্ঞার অন্তর-আশ্রিত ভাবকে অর্থাৎ তার আত্মাকে হনন ক'রে কেবল তার বাইরের রূপকে অবলম্বন করেছি। যখনই সে কথা আমি ভাবি, আমার সমস্ত মন গ্লানিতে ভ'রে যায়। এ বিষয়ে আমার পরিষ্কার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, সোজা পথটা যেন আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। অথবা হয়তো সোজা পথ ধ'রে চলার সাহসটুকু আমার ছিল না। তলিয়ে দেখলে এ দুটো আসলে একই জিনিস, কারণ সর্বদা দেখা যায়, যেখানে বিশ্বাস শিথিল অথবা বিশ্বাসের একান্ত অভাব, সেখানেই সংশয় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই রাতদিন আমি ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাই, "তুমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস দাও প্রভু, বিশ্বাস দাও।"

ছাগলের দুধ ধরবার অল্পকিছুদিন পরেই ডক্টর দালাল আমার মলনালীতে অস্ত্রোপচার ক'রে আমাকে সারিয়ে তোলেন। নিরাময় হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার জীবনধারণের বাসনা বলবৎ হতে থাকে। সম্ভবত তার কারণ এই যে ভগবান আমার জন্য একটি কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন।

সবে নিরাময় হবার পথে পা বাড়িয়েছি, এমনসময় খবরকাগজের পাতা ওল্টাতে গিয়ে রাউলট্ কমিটির রিপোর্টও আমার চোখে প'ড়ে যায়। কমিটি যেসব সুপারিশ করেছিল তা প'ড়ে তো আমি স্তম্ভিত। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার ও উমর সোবানী এসে আমায় বললেন, আমি যেন এই ব্যাপারে যথাসত্বর বিহিত ব্যবস্থা করি। মাসখানেক কেটে গেলে পর আমি আমেদাবাদ গেলাম। সেখানে বল্লভভাই প্রায় প্রতিদিনই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। আমার আশঙ্কার কথা তাঁর কাছে পেড়ে আমি বলি : "একটা কিছু তো না-করলে নয়।"

জবাবে তিনি বললেন : "এরকম পরিস্থিতিতে কী-ই-বা আমরা করতে পারি?"

আমি বললাম : "মুষ্টিমেয় লোক লিখে দিক যে তারা রাউলট্‌ বিল্‌-এর প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর, তৎসত্ত্বেও এই বিল্‌ যদি আইনে পরিণত হয় তাহলে অগৌণে আমাদের সত্যাগ্রহ করতে হবে। আমি যদি শয্যাগত না-হতাম, আমি একাই এর বিরুদ্ধে লড়তাম এবং আশা করতাম লোকে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। কিন্তু বর্তমানে শারীরিক দিক থেকে আমি এতই অসহায়, ভয় হয় এতটা ঝক্কি যদি সইতে না-পারি।"

এই আলাপ-আলোচনার ফলে স্থির হয়, যেসব লোক আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলত, তাদের ছোটোখাটো একটা বৈঠকে ডাকা হবে। রিপোর্ট-এ যেমন সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রকাশিত হয়েছিল, তার ভিত্তিতে রাউলট্‌ কমিটির ওইধরনের সুপারিশ করার আদৌ কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। সেই সুপারিশের বলে যে-আইন তৈরি করার কথা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো জাতি সে আইন মেনে নিতে পারে না।

শেষপর্যন্ত প্রস্তাবিত বৈঠকটি আশ্রমেই বসে। বড়োজোর জনা-কুড়ি লোককে যোগ দেবার জন্য ডাকা হয়েছিল। যদ্দুর মনে পড়ে, বল্লভভাই ছাড়া সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু, হর্নিম্যান, উমর সোবানী, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার ও অনসূয়া বেন। এই বৈঠকেই সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্রের মুসাবিদা করা হয়। আমার স্মরণ হয়, উপস্থিত সকলেই তাতে স্বাক্ষর করেন। তখন আমার সম্পাদিত কোনো কাগজ ছিল না, তবে মাঝে-মাঝে খবরকাগজ মারফৎ আমার মতামত ব্যক্ত করতাম। এ যাত্রাও আমি খবরকাগজের শরণ নিলাম। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার এই আন্দোলনে সমস্ত উৎসাহ ঢেলে দিলেন। সংগঠনের ব্যাপারে, ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে একটা কাজে লেগে থাকায়, তাঁর যে কী আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, এই প্রথম আমি তার পরিচয় পেলাম।

দেশের কোনো চালু প্রতিষ্ঠান সত্যাগ্রহের মতো অভিনব ও অপরিচিত অস্ত্র হাতে তুলে নেবে, এমন আশা করা দুরাশা হবে মনে হওয়ায়, আমার প্রস্তাবক্রমে সত্যাগ্রহ সভা নাম দিয়ে একটি আলাদা সংস্থা গঠন করা হয়। যেহেতু সভার মুখ্য সদস্যেরা ছিলেন বোম্বাইয়ের বাসিন্দা, স্থির হয় বোম্বাই শহরেই কেন্দ্রীয় দপ্তর পত্তন করা হবে। যারা রাউলট্‌ বিল্‌ প্রতিরোধের পক্ষে ছিল, দলে-দলে এসে সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দিতে লাগল। প্রচারপত্র বের হ'ল, এখানে-ওখানে জনসভা হ'ল। এসব দেখে-শুনে মনে পড়তে লাগল খেড়া জেলার সেই আন্দোলনের কথা।

সত্যাগ্রহ সভার সভাপতি পদে আমিই নির্বাচিত হলাম। সভার সদস্যেরা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত সমাজের মানুষ। অনতিকাল পরে বুঝতে পারলাম, তাঁদের সঙ্গে আমার মতের ঐক্য হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। গোড়াতেই আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম, সভার কাজ চলবে গুজরাতি ভাষায়। তাছাড়া আমার অন্যান্য কাজের ধরনধারণও তাঁদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে থাকবে। এইসব মিলে তাঁদের যথেষ্ট অশান্তি ও অস্বস্তি ঘ'টে থাকবে। তৎসত্ত্বে ও আমি বলব, আমার বহুতর খামখেয়ালিপনা তাঁরা উদারচিত্তে সহ্য ক'রে চলতেন।

কিন্তু সূচনা থেকেই আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম, এই সভা বেশিদিন টিকবে না। সত্য ও অহিংসার ওপর আমি যে গুরুত্ব আরোপ করতাম, ইতিমধ্যেই কোনো-কোনো

সদস্য তার প্রতি বীতরাগ হতে শুরু করলেন। তৎসত্ত্বেও বলব, গোড়ার দিকে আমাদের এই নূতন কাজ পুরোদমে চলেছিল এবং আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল বেশ দ্রুতগতিতে।

৩১. একটি অভূতপূর্ব ঘটনা

রাউলট্ রিপোর্ট-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন যতই তীব্র ও ব্যাপক হতে লাগল, সরকার-বাহাদুর ততই যেন তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড় অটল হয়ে স্থির করলেন, কমিটির সুপারিশ-মাফিক আইন প্রণয়ন করতেই হবে। রাউলট্ বিল্ প্রকাশিত হ'ল। জীবনে একবারমাত্র ভারতের বিধানসভার কার্যকলাপ দেখবার জন্য আমি উপস্থিত ছিলাম, সে হ'ল এই বিল্ নিয়ে বিতর্কের সময়। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁর আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় সরকারকে উদ্দেশ ক'রে তাঁর সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন। স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতায় শাস্ত্রীজীর সেই নরম-গরম কথাগুলি ব'য়ে চলল যেন স্রোতের মতন। ভাইস্‌রয় বক্তার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়ে সমস্ত ভাষণটুকু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন। তখনকার মতো আমার মনে হয়েছিল যে শাস্ত্রীজীর বক্তৃতার এমন ঐকান্তিকতা, এত আবেগ, এ কখনো বৃথা যেতে পারে না। ভাইস্‌রয় নিশ্চয় গভীরভাবে অভিভূত হয়ে থাকবেন।

যে লোক সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে তাকে তবু জাগানো যায়, কিন্তু যে লোক জেগে ঘুমোবার ভান করে, শত চেষ্টা ক'রেও তাকে জাগানো যায় না। সরকার-বাহাদুর ছিলেন এই জেগে-ঘুমোনোর দলে। আইন প্রণয়ন করতে গেলে যতটুকু লৌকিকতা না-করলে নয়, সরকার সেই প্রহসনের ব্যবস্থাটুকুই করেছিলেন বিধানসভার মঞ্চে। তাঁরা আগের থেকেই মনঃস্থির ক'রে রেখেছিলেন। সুতরাং শাস্ত্রীজীর সেই সুগম্ভীর সাবধানবাণী তাঁদের অন্তর স্পর্শ করা দূরে থাক্, কানেও প্রবেশ করল না।

এরকম পরিস্থিতিতে আমার প্রতিবাদ যে অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হবে, এতে আর বিচিত্র কী? ভাইস্‌রয়-এর সাক্ষাৎক্রমে তাঁকে বোঝাবার জন্য বিধিমতো চেষ্টা করলাম। ব্যক্তিগত চিঠিতে এবং সংবাদপত্র মারফৎ চিঠি প্রকাশ ক'রে, আমি তাঁকে বেশ স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিলাম, সরকার যদি তাঁদের সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করেন তাহলে এক সত্যাগ্রহের শরণ নেওয়া ছাড়া আমার উপায়ান্তর থাকবে না। এত প্রয়াস সমস্তই নিষ্ফল হ'ল।

বিল্ তখনো অ্যাক্ট হিসাবে গেজেটভুক্ত হয়নি। এইরকম সময়ে মাদ্রাজ থেকে একটা আমন্ত্রণ এল। আমার শরীর-স্বাস্থ্য তখনো দুর্বল, তবু আমি রেলপথে লম্বা পাড়ি দেবার ঝুঁকি নিলাম। সেইসময়ে প্রকাশ্য জনসভায় চেঁচিয়ে বক্তৃতা করার মতো আমার অবস্থা ছিল না। জনসভায় দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা করতে আমি আজও পারি না। খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে বলতে গেলেই আমার সমস্ত শরীর থর-থর ক'রে কাঁপতে থাকে, বুক ঢিবঢিব ক'রে যেন ঢেঁকির পাট পড়তে থাকে।

তবু মাদ্রাজের আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম। বরাবরই দক্ষিণ ভারতকে আপন ঘরের

মতো দেখে এসেছি। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজের সূত্রে আমার ধারণা হয় তামিল, তেলুগু প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় লোকেদের ওপর আমার বিশেষ একটা দাবি আছে, দক্ষিণ ভারতীয় সজ্জনেরা সর্বদা আমার সে দাবি মেনে নিয়ে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন, আমার ধারণাটা মিথ্যা নয়। আমন্ত্রণের চিঠিটা এসেছিল কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার-এর স্বাক্ষরে। মাদ্রাজ যাবার পথে জানতে পারি, ওই আমন্ত্রণের মূলে ছিলেন রাজাগোপালাচারি। এই সূত্রে রাজাগোপালাচারির সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত বলা যায় অথবা বলা চলে যে এই প্রথম আমরা পরস্পরকে চিনতে-বুঝতে শুরু করি।

সেইসময়ে কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার প্রভৃতি বন্ধুদের নির্বন্ধাতিশয়ে, দশের কাজে আরো সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবার উদ্দেশ্যে, রাজগোপালাচারি সদ্য সালেম ছেড়ে মাদ্রাজ-এ ওকালতি করতে শুরু করেছেন। তাঁর বাড়িতেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সে বাড়িতে দু-দুটোদিন কেটে যাবার পর জানতে পারি যে বাড়িখানা তাঁরই। বাড়িটা ছিল কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার-এর সম্পত্তি। তাই আমি ধ'রে নিয়েছিলাম, আমরা তাঁরই অতিথি। মহাদেব দেশাই-এর কথা শুনে আমার ভুল ভাঙে। স্বভাবকুণ্ঠ রাজগোপালাচারি সর্বদা আড়াল দিয়ে পিছনে থাকতেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বেশ অন্তরঙ্গতা জমে। মহাদেব আমার ভুল সংশোধন ক'রে বললেন, "এ লোকটাকে আপনার কাছে টেনে নেওয়া দরকার।"

আমি মহাদেবের কথা-মাফিক কাজ করলাম। প্রতিদিন রাজাগোপালাচারিকে ডেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম, কীভাবে সংগ্রামী কার্যপদ্ধতি গঠন করা যায়। তখনো পর্যন্ত ভেবে পাচ্ছিলাম না, একমাত্র জনসভা ডাকা ছাড়া অপর কোনো কাজ করা যায় কি-না। রাউলট্ বিল্ আইনে পরিণত হ'লে কীভাবে তার বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলা যায়, তার আমি কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সরকার সেই উপলক্ষ দিলে তবেই-না আইন অমান্য করা সম্ভব। সে সুযোগ যদি না-ই জোটে, আমরা কি অহিংসভাবে অন্য কোনো-কোনো আইন লঙ্ঘন করতে পারি? তা-ও-বা যদি পারি, কোথায় সীমারেখা টানব। এইসব প্রশ্ন ও অনুরূপ নানা সমস্যা আমরা পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা কবতাম।

কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার স্থানীয় জন-নেতাদের নিয়ে, ছোটোখাটো একটা বৈঠক ডেকে এইসব সমস্যার সুরাহা করতে চাইলেন। এই আলোচনায় যাঁরা যোগ দিলেন, তাঁদের মধ্যে বিজয়রাঘবাচারি ছিলেন মুখপাত্র। তিনি পরামর্শ দিলেন, খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য-সমেত আমি যেন সত্যাগ্রহের বিজ্ঞান-বিষয়ে একটি বিশদ গ্রন্থ রচনা করি। আমার মনে হ'ল, কাজটা আমার সাধ্যের অতীত, খোলাখুলিভাবে আমার অপারগতা তাঁর কাছে স্বীকার করলাম।

এইধরনের নানা চিন্তা-ভাবনা যখন চলছে, খবর এল রাউলট্ বিল্ অ্যাক্ট অর্থাৎ আইন হিসেবে পাশ হয়েছে এবং গেজেট-এ তা ছাপাও হয়েছে। রাতে এই কথাটা ভাবতে-ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরবেলায় অন্যদিনের তুলনায় একটু আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। আধো-ঘুম আধো-জাগ্রত অবস্থায়, সেই প্রদোষ অন্ধকারে মনের মধ্যে স্বপ্নের মতো

কী-একটা চিন্তা যেন খেলে গেল। সকাল হতেই রাজাগোপালাচারিকে ডেকে সব কথা বললাম :

"দেখুন, গত রাত্রে স্বপ্নের মতো আমার মনে একটা চিন্তার উদয় হ'ল। যেন একটা প্রত্যাদেশ শুনলাম যে এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে বলতে হবে যে সারা দেশময় আমরা একটা দিন হরতাল পালন করব। সত্যাগ্রহ তো একপ্রকার আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া, আর আমাদের এই যুদ্ধ হ'ল ধর্মযুদ্ধ। অন্যায়কে প্রতিহত করার সংগ্রামে নামবার আগে আমাদের শুদ্ধ হওয়া উচিত, পবিত্র হওয়া উচিত। হরতালের দিন ভারতের তাবৎ লোকে যেন তাদের কাজকারবার বন্ধ রেখে এই দিনটিকে উপবাসের দিন, প্রার্থনার দিন হিসেবে পালন করে। ইস্‌লাম ধর্মে এক রোজের অতিরিক্ত উপবাস করার বিধান নেই, সুতরাং আমাদের উপবাস হবে চব্বিশঘণ্টা-ব্যাপী। বলা শক্ত, সকল প্রদেশ আমাদের এই ডাকে সাড়া দেবে কি-না ; তবে মোটামুটিভাবে আমার নিশ্চিত মনে হয় বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার ও সিন্ধুপ্রদেশ আমাদের হয়তো বিমুখ করবে না। এইসব প্রদেশে হরতাল যদি ঠিকমতো প্রতিপালিত হয়, সে-ও আমাদের কম সন্তোষের কারণ হবে না।"

কথাটা শোনামাত্র রাজাগোপালাচারির মনে ধরে। অন্য বন্ধুদের জানানো হ'লে তাঁরা সকলেই এই প্রস্তাব স্বাগত করলেন। ভারতের জনগণকে সম্বোধন ক'রে আমি ছোটো একটি আপিল লিখে দিলাম। প্রথমে স্থির হয় ৩০শে মার্চ ১৯১৯ হবে হরতাল-পালনের দিন, পরে তা পিছিয়ে দিয়ে ৬ই এপ্রিল ধার্য করা হয়। মনঃস্থির করবার জন্য লোকেদের বেশীদিন সময় দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। অগৌণে প্রতিরোধের কাজ শুরু করা দরকার ব'লে অনর্থক কালক্ষেপ করার দরকারও ছিল না।

কে জানে কেমন ক'রে অঘটন ঘ'টে গেল? সারা দেশ জুড়ে, এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি, প্রতিটি শহর এবং প্রতিটি গ্রামে সেদিন সম্পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হ'ল। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য!

৩১. সেই স্মরণীয় সপ্তাহ! ১

দক্ষিণ ভারতে কিছুদিন কাটিয়ে, খুব সম্ভব ৪ঠা এপ্রিল তারিখে আমি বোম্বাই পৌঁছাই। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার একটি তারবার্তা পাঠিয়ে আমায় বলেছিলেন, আমি যেন অতি অবশ্য ৬ই এপ্রিল-এর অনুষ্ঠানে বোম্বাইয়ে উপস্থিত থাকি।

এদিকে ৩০শে মার্চ তারিখেই, দিল্লী শহরে হরতাল পালিত হয়ে গিয়েছিল। হরতাল যে ৬ই এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রাখা স্থির হয়েছে, সেই তারবার্তা দিল্লীতে পৌঁছেছিল যথাসময়ের অনেক পরে। দিল্লীর লোক শ্রদ্ধানন্দজী ও হেকিম আজমল খাঁর কথায় উঠত-বসত। দিল্লীতে ওইধরনের পূর্ণ হরতাল ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দিল্লীর প্রত্যেক বাসিন্দা এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একতা

এর আগে কখনো দেখা যায়নি। মুসলমানেরা শ্রদ্ধানন্দজীকে মসজিদ থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করে। তিনি তাঁদের সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। এসব ব্যাপার কর্তৃপক্ষীয়ের কাছে অসহ্য মনে হয়। ধর্মঘটীরা শোভাযাত্রা সহকারে দিল্লী স্টেশনের দিকে যাবার পথে পুলিশ তাদের আটকায়। পুলিশের গুলি চালাবার ফলে জনাকয়েক জখম হয় ও মারা যায়। এরপর দিল্লীতে শুরু হয় দমননীতির রাজত্ব। দিল্লীতে যাবার জন্য শ্রদ্ধানন্দজী আমায় জরুরী তারবার্তা পাঠান। আমি জবাবে জানাই, বোম্বাই শহরে ৬ই এপ্রিল-এর অনুষ্ঠান শেষ হওয়ামাত্র আমি দিল্লী রওনা হব।

কিছু ইতরবিশেষ থাকা সত্ত্বেও দিল্লীর ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটে লাহোরে ও অমৃতসরে। অমৃতসর থেকে সত্যপাল ও কিচলু আমায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন সেখানে যাবার জন্য। তাঁদের দু-জনের সঙ্গে আমার তখন পরিচয় পর্যন্ত ছিল না, তবু, আমি তাঁদের লিখে জানালাম যে দিল্লী হয়ে আমি নিশ্চয় অমৃতসর যাব।

৬ই এপ্রিল-এর সকালবেলা বোম্বাই শহরের বাসিন্দারা হাজারে-হাজারে চৌপাটিতে জমায়েত হয়। সমুদ্রে স্নান ক'রে তারা শোভাযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে মাধববাগ-এর দিকে। শোভাযাত্রায় যোগদানকারীদের মধ্যে বেশ-কিছু স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা ছিল, মুসলমানও কিছু কম ছিল না। মাধববাগ থেকে মুসলমান-বন্ধুরা আমাদের কয়েকজনকে কাছের একটি মসজিদে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের অনুরোধে শ্রীমতী নাইডু ও আমি বক্তৃতা দিই। সেই সভায় বিঠ্ঠলদাস জেরাজানি প্রস্তাব করেন, আমরা যেন সমবেত জনতাকে দিয়ে তদ্দণ্ডেই স্বদেশী ও হিন্দু-মুস্‌লিম ঐক্য-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাই। আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা ক'রে বলি এত ব্যস্তসমস্তভাবে প্রতিজ্ঞাপত্র পড়ানো ঠিক হবে না, প্রতিজ্ঞাগ্রহণ করাও উচিত হবে না। জনতা যতটুকু করেছে তা নিয়েই খুশি থাকা উচিত। আমার এই মতামতের সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে আমি বলি যে, একবার শপথ নিলে তা আর পরে ভাঙা চলে না, সুতরাং স্বদেশী বিষয়ক প্রতিজ্ঞার অর্থ বা ব্যঞ্জনা ঠিকমতো বুঝে নেওয়া দরকার, হিন্দু-মুসলমান একতা বিষয়ক প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে গুরুদায়িত্ব বহনের ইঙ্গিত আছে, সে বিষয়েও সম্যক্ ওয়াকিফহাল হওয়া দরকার। সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে এইসব কথা পুরোপুরি বুঝে নিতে হবে. তবেই শপথগ্রহণ করার প্রসঙ্গ উঠতে পারে। সর্বশেষে আমি বলি, যারা স্বদেশী ও হিন্দু-মুস্‌লিম একতা বিষয়ক শপথ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তারা যেন পরের দিন সকালবেলা আবার চৌপাটিতে সমবেত হয়।

বলা বাহুল্য, বোম্বাইয়ের হরতাল সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। অহিংস আইন-অমান্য শুরু করার ব্যাপারেও আগের থেকে সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত ছিল। দু-তিনটি প্রসঙ্গ এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। স্থির হয়, দেশের সমস্ত লোক আপনা থেকে যে আইন ভাঙতে চায়, আমরা সেরকম দু-একটি আইন বেছে নেব আমাদের আন্দোলনের বিষয়রূপে। লবনের ওপর শুল্ক বসাবার যে আইন বলবৎ ছিল. দেশের লোক তা আদপে পছন্দ করত না। এ আইন বাতিল করাবার জন্য একটা জোরদার আন্দোলনও চলছিল কিছুকাল ধ'রে। আমি তাই প্রস্তাব করি যে লবন আইনের বিরোধিতা করার জন্য যেন বোম্বাইয়ের লোকেরা

ঘরে-ঘরে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়ে লবন তৈরি করে। আমার অপর প্রস্তাবটা ছিল সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত পুস্তকের মুদ্রণ ও বিক্রয় সম্পর্কে। আমারই দুখানা বই, *হিন্দ্ স্বরাজ* ও রাস্কিন্-এর *আনটু দিস্ লাস্ট্* অবলম্বনে গুজরাটিতে লেখা *সর্বোদয়*, তখন সরকারের হাতে বাজেয়াপ্ত ছিল ব'লে, ওই দুটি বইয়ের কথা চট্ ক'রে মনে প'ড়ে গেল। বইদুটি ছাপিয়ে যদি প্রকাশ্যে বিক্রি করা হয়, তাহলে সে হবে আইন-অমান্যের সহজতম পন্থা। অতএব ওই দুটি বইয়ের প্রচুর কপি ছাপানো হ'ল, স্থির হ'ল সন্ধ্যায় উপবাসভঙ্গের পর চৌপাটিতে আবার যে বিরাট সমাবেশ হবে, সেইখানে বইদুটি বিক্রি করা হবে।

৬ই এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা এই দুটি নিষিদ্ধ বই বিক্রি করার জন্য একটি বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী শহরের চারদিকে বেরিয়ে পড়ে। সরোজিনী দেবী ও আমিও মোটরগাড়ি চেপে বেরিয়ে পড়লাম। যত বই ছাপা হয়েছিল সমস্ত বিক্রি হয়ে যায়। স্থির হয়েছিল, বই বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ব্যয়-নির্বাহ করার জন্য খরচ করা হবে। প্রত্যেকটি বইয়ের দাম ধার্য করা হয়েছিল চার আনায়। আমার মনে পড়ে না আমার কাছ থেকে ওই নির্ধারিত মূল্যে কেউ বই কিনেছিল ব'লে। পকেটে যার যেমন খুচরো পয়সা ছিল সবটুকু ঢেলে দিয়ে নিজের-নিজের কপি সংগ্রহ করেছিল। পাঁচ-দশ টাকার নোট তো ফস্-ফস্ ক'রে বেরিয়ে এসেছিল, একেকটা বইয়ের দাম দিতে গিয়ে। মনে পড়ে, একজন লোকের কাছে একটি বই বিক্রি ক'রে আমি দাম পেয়েছিলাম প-ঞ্চা-শ টাকা! ক্রেতাদের সবাইকে ভালো ক'রে ব'লে দেওয়া হয়েছিল যে সরকারের বাজেয়াপ্ত বই খরিদ করলে জেলে যেতে হতে পারে, কিন্তু তখনকারমতো লোকের মন থেকে জেলে যাবার ভয় ঘুচে গিয়েছিল।

পরে জানা গিয়েছিল, এই আইন-অমান্যের ব্যাপারে নিজেদের নিষ্ক্রিয়তা ঢাকতে গিয়ে সরকার সাফাই দিয়েছিল যে, যেসব বই সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল, সে বইগুলি বাস্তবপক্ষে বিক্রি করা হয়নি। বিক্রীত বইগুলি তাই নিষিদ্ধ সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। সরকার পুনর্মুদ্রণকে বাজেয়াপ্ত বইয়ের নূতন সংস্করণ ব'লে স্থির করলেন, অতএব এই নূতন সংস্করণের বেচা-কেনা আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় হতে পারে না। সরকার এইভাবে আইন-অমান্যের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন দেখে বহু লোক নিরাশ হয়।

পরের দিন সকালবেলা চৌপাটিতে আব্যর একটি সমাবেশ হ'ল। স্বদেশী ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-বিষয়ে শপথ গ্রহণ করার জন্য সেদিন জমায়েত হবার কথা। যে জিনিসকে হীরা ব'লে ভুল করা হয়েছিল, আসলে সে যে কাচ ছাড়া কিছু নয়, বিঠ্ঠলদাস জেরাজানি এই প্রথম তাঁর সেই ভুল বুঝতে পারলেন। শপথ নেবার জন্য যারা এসেছিল, সংখ্যায় তারা মুষ্টিমেয়। ভগ্নীদের মধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের দু-চারজনের কথা এখনো আমার মনে আছে। পুরুষেরাও এসেছিলেন খুবই কম সংখ্যায়। আমি শপথবাক্যের খসড়া তৈরি ক'রে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। প্রতিজ্ঞার অর্থ ও তাৎপর্যের বিশদ ব্যাখ্যা দেবার পর, আমি তাঁদের দিয়ে সেই শপথবাক্য উচ্চারণ করিয়ে নিয়েছিলাম। সভায় অতি অল্পসংখ্যক লোক এসেছিল ব'লে আমি আশ্চর্য হইনি, দুঃখও পাইনি। জনতা যে হুজুগে মেতে ওঠে এবং

যেখানে ঢাক-ঢোল পেটানো হয় না, সেরকম দেশগঠনের কাজে যে তাদের উৎসাহ থাকে না, এ আমি বরাবর লক্ষ ক'রে এসেছি। এই দুই মনোভাবের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ আমি আজও দেখতে পাই।

আপাতত এ আলোচনা মুলতবি থাক্, কারণ এ বিষয়ে বলতে গেলে আলাদা একটা নিবন্ধ লিখতে হয়। পুরাতন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। ৭ই এপ্রিল রাত্রে আমি বোম্বাই ছাড়লাম, দিল্লী হয়ে অমৃতসর যাব, এই ঠিক ছিল। পরদিন অর্থাৎ ৮ই মথুরায় গাড়ি থামলে সর্বপ্রথম একটা কানাঘুষো শুনতে পাই যে আমাকে হয়তো গ্রেফতার করা হবে। মথুরার পরের স্টেশনে আচার্য গিদ্‌বানী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে সঠিক খবর দিলেন। বললেন যে আমায় যে গ্রেফতার করা হবে সে খবরে কোনো ভুল নেই। আর বললেন, আমার যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে তিনি প্রস্তুত আছেন আমার যে কোনো কাজে লাগতে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বলি, দরকার পড়লেই আমি তাঁর শরণ নেব।

পল্‌বল স্টেশনে গাড়ি পৌঁছবার আগেই আমার হাতে একটি লিখিত হুকুম জারি করা হ'ল। তাতে লেখা ছিল যে সরকার আমায় পঞ্জাবে পা দিতে নিষেধ করছেন, কারণ সরকার আশঙ্কা করেন সেই প্রদেশে আমার উপস্থিতির ফলে শান্তি-ভঙ্গ হতে পারে। পুলিশ আমায় গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলে। আমি তাদের বললাম, "নেমে যেতে তো আমি পারি না। পঞ্জাব থেকে জরুরী তলব এসেছে ব'লেই তো আমি পঞ্জাবে যাচ্ছি। সেখানে অশান্তি ঘ'টে থেকে থাকে তো তার প্রশমনে সহায়তা করতে চাই। আমি তো অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য পঞ্জাব যাচ্ছি না। সুতরাং সখেদে আমায় বলতে হচ্ছে, এই হুকুম তামিল করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।"

গাড়ি তো শেষ পর্যন্ত পল্‌বল পৌঁছল। মহাদেব ছিলেন আমার সঙ্গে। তাঁকে আমি বললাম, তিনি যেন সরাসরি দিল্লী গিয়ে শ্রদ্ধানন্দজীকে সব কথা জানান। তাহলে শ্রদ্ধানন্দজী দিল্লীর লোকেদের বলতে পারেন, তারা যেন বিচলিত না-হয়, যেন শান্তি রক্ষা করে। শ্রদ্ধানন্দজী যেন তাদের বিশদ ক'রে বুঝিয়ে বলেন, পুলিশ আমার ওপর যে হুকুম জারি করেছে, দণ্ডভোগ করতে হতে পারে জেনেও সে হুকুম অমান্য করার সিদ্ধান্ত আমি কেন নিলাম। সর্বশেষে তিনি যেন বলেন, সরকার যদি সত্যই আমার ওপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ করে এবং দেশের লোক তৎসত্ত্বেও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ও শান্ত থাকে, তাহলে কেনই-বা আখেরে আমাদের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

পল্‌বল স্টেশনে আমায় গাড়ি থেকে নামিয়ে পুলিশের হেফাজতে সমর্পণ করা হ'ল। খানিক বাদে দিল্লী থেকে একটি ট্রেন এসে থামল। পুলিশ পাহারায় আমায় উঠিয়ে দেওয়া হ'ল তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায়। মথুরায় পৌঁছবার পর আমায় নিয়ে যাওয়া হ'ল পুলিশ ব্যারাক্-এ। আমায় নিয়ে কী করা হবে, অতঃপর আমায় কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, আমি পুলিশ অফিসারদের জিজ্ঞেস ক'রে দেখলাম। তাঁরা এসব প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলেন না। পরদিন ভোর চারটের সময় আমায় ঘুম থেকে ঠেলে তোলা হ'ল এবং বোম্বাইগামী একটা মালগাড়িতে চালানো হ'ল। দুপুরবেলা আবার আমায় নামিয়ে নেওয়া

হ'ল সওয়াই মাধোপুর স্টেশনে। লাহোর থেকে মেল্ ট্রেন্-এ এলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর মিস্টার বাউরিং। তিনি এসে আমার ভার নিলেন। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে আমাকেও প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায় উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এতক্ষণ 'সাধারণ' কয়েদী ছিলাম, এবার হলাম 'সম্ভ্রান্ত কয়েদী। ইন্সপেক্টর বাউরিং এবার স্যর মাইকেল ও-ডায়ার-এর গুণকীর্তন ক'রে একটা লম্ব বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে সাব মাইকেল-এর কোনো অভিযোগ নেই, আমি পঞ্জাবে পা দিলে সে অঞ্চলের শান্তিভঙ্গ হ'তে পারে এই হ'ল তাঁর আশঙ্কা ইত্যাদি-ইত্যাদি। শেষপর্যন্ত তিনি আমায় অনুরোধ করলেন, আমি যেন স্বেচ্ছাক্রমে বোম্বাই ফিরে যাই এবং পঞ্জাবের মাটিতে পা না-দিই। জবাবে আমি তাঁকে বললাম, আমার পক্ষে এই হুকুম তামিল করা সম্ভব নয় এবং স্বেচ্ছাক্রমে বোম্বাই ফিরে যেতে আমি রাজি নই। সুতরাং উপায়ান্তর না-দেখে ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন যে তাহলে তাঁকে আইনের আশ্রয় নিতে হয়। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমায় নিয়ে কী করতে চান, বলুন দেখি?"

জবাবে তিনি বললেন, তিনি নিজেও ঠিক জানেন না, আমায় নিয়ে কী করা হবে এবং সেটা নির্ভর করবে এরপরে তিনি কী অর্ডার পান, তার ওপর। বাউরিং আরো বললেন, "আপাতত আপনাকে নিয়ে বোম্বাই যাচ্ছি।"

আমরা সুরাট পৌঁছলাম। এখানে অপর একজন পুলিশ অফিসারের হেফাজতে আমায় ন্যস্ত করা হ'ল। আমরা বোম্বাই পৌঁছবার পর এই অফিসার আমায় বললেন :

"এখন আপনি মুক্ত। তবে ভালো হয় যদি মেরিন লাইন্স-এর কাছাকাছি আপনি নামেন। সেখানে আমি আপনার জন্য গাড়ি থামাবার ব্যবস্থা করব। কোলাবায় খুবসম্ভব বহু লোক জমায়েত হবে।"

আমি তাঁকে বললাম, তিনি যেমন বলেন খুশি হয়েই আমি তেমনটি করব। তিনিও খুশি হয়ে আমায় ধন্যবাদ দিলেন। প্রস্তাবিত ব্যবস্থামতো আমি মেরিন লাইন্স স্টেশনেই নেমে যাই। প্ল্যাটফর্ম্-এর বাইরে পা দিয়েই দেখতে পেলাম আমার এক বন্ধুর গাড়ি। বন্ধুটি আমায় রেবাশঙ্কর ঝাভেরির বাড়িতে নামিয়ে দিলেন, রাস্তায় যেতে-যেতে তিনি আমায় জানালেন :

"আপনার গ্রেফতার হবার খবর পেয়ে লোকে রেগে গরম। শহরের সমস্ত লোক ক্ষেপে গিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে পায়ধুনিতে হ্যাঙ্গামা বেঁধে যেতে পারে। ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সেখানে পৌঁছে গেছে।"

আমার গন্তব্য জায়গায় পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই উমর সোবানী ও অনসূয়া বেন এসে হাজির। তাঁরা বললেন :

"এখুনি মোটরগাড়িতে আপনাকে পায়ধুনি যেতে হবে। সেখানকার লোকেরা অশান্ত ও উত্তেজিত। আমাদের সাধ্য নেই ব'লে-ক'য়ে তাদের ঠাণ্ডা করি। এক আপনাকে দেখলে ওরা শান্ত হবে।"

আমি তাঁদের সঙ্গে মোটরগাড়িতে চাপলাম। পায়ধুনির কাছাকাছি যেতেই দেখি, লোকে

লোকারণ্য। আমায় দেখতে পেয়ে সেই বিরাট জনতার আনন্দ যেন ধরে না। নিমেষের মধ্যে তারা শোভাযাত্রার জন্য কাতার দিয়ে দাঁড়াল। হাজার কণ্ঠের সমবেত ধ্বনিতে আকাশ যেন ফেটে পড়ল, বন্দে মাতরম্, আল্লা-হো-আকবর। খাস পায়ধুনিতে পা দিয়ে দেখতে পেলাম রাস্তায় একদল সওয়ার সেপাই বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ওপর ইট-পাটকেল পড়ছে প্রবল ধারায়। আমি মিনতি ক'রে জনতাকে উদ্দেশ ক'রে বললাম তারা যেন শান্তি রক্ষা করে। কিন্তু সেই উত্তেজনার মুখে কে কার কথা শোনে? এক-একবার মনে হ'ল আমাদেরও হয়তো ইট-পাটকেলের হাত থেকে রেহাই মিলবে না। আবদুর রহমান স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে শোভাযাত্রা যখন ক্রফোর্ড মার্কেট-এর দিকে মোড় নেবার উপক্রম করছে, হঠাৎ দেখা গেল, একদল সওয়ার-পুলিশ শোভাযাত্রার মুখোমুখি পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাবখানা এই যে জনতা আরো এগিয়ে ফোর্ট-এর দিকে যেন পা বাড়াতে না-পারে। শোভাযাত্রায় জনতার ঠেসাঠেসি ভিড়। পিছন থেকে ঠেলা পেয়ে সামনের দল প্রায় পুলিশের ব্যূহ ভেঙে এগিয়ে যাবার দাখিল হ'ল। এই ডামাডোলের মধ্যে আমার ক্ষীণকণ্ঠের অনুরোধ-উপরোধ জনতা যে শুনতে পাবে এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে সওয়ার-পুলিশদের অধিনেতা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার অর্ডার দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে সওয়ার পুলিশ বর্শা বাগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে জনতার দিকে তাড়া ক'রে এল। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল আমি হয়তো সওয়ার-পুলিশের কোনো বর্শার শিকার হব। কিন্তু আমার আশঙ্কা ছিল অহেতুক, সওয়ারেরা ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময় মোটরের গা ঘেঁষে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু তাদের বর্শায় গাড়ির লোকেদের কোনো ক্ষতি হয়নি। শোভাযাত্রায় রওনা হবার সময় লোকে সার বেঁধে আসছিল। সওয়ারদের তাড়া খেয়ে লাইন ভেঙে গেল, দিশাহারা হয়ে লোকে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল, প'ড়ে গিয়ে কত লোক পায়ে-পায়ে পিষ্ট হ'ল, আঘাতে-জখমে কত লোক নাজেহাল। ওই ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে ঘোড়া না-পারে এগোতে, না-পারে পেছোতে। রাস্তার এদিকে-ওদিকে কোনো গলিঘুঁজি ছিল না যার মধ্যে দিয়ে জনতা পালাবার পথ পায়। সওয়ারেরা তখন দিশেহারা হয়ে, কোনোপ্রকারে জনতার দঙ্গল থেকে পথ কেটে বেরুতে পারলে বাঁচে। তাদের বর্শার ঘায়ে, ঘোড়ার ক্ষুরের ঘায়ে, এপাশে-ওপাশে কীসব কাণ্ড ঘটছিল সে তারা দেখেও নিশ্চয় দেখতে পায়নি। ঘোড়ায়-মানুষে জড়াজড়ি হয়ে সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

এইভাবে জনতাকে ছত্রভঙ্গ ক'রে তাদের শোভাযাত্রা পণ্ড করা হ'ল। আমাদের মোটরটাকে সওয়ার-পুলিশেরা আটকায়নি। ফিরে যাবার সময় আমি কমিশনার-এর দফ্‌তরের কাছে গাড়ি থামাই, ও তাঁর কাছে সওয়ার-পুলিশের অন্যায় আক্রমণের—বিরুদ্ধে অভিযোগ করি।

৩২. সেই স্মরণীয় সপ্তাহ। ২

আমি তো গিয়ে হাজির হলাম কমিশনার সাহেব মিস্টার গ্রিফিথ্-এর দপ্তরে। সিঁড়ি বেয়ে তাঁর খাসকামরায় যাবার পথে দেখলাম, সিঁড়ির দু-পাশে বর্মে-চর্মে সুসজ্জিত জঙ্গী সেপাই, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য প্রস্তুত। সারা বারান্দায় একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব। খাসকামরায় হাজির হয়ে দেখি মিস্টার গ্রিফিথ্-এর কাছে ব'সে আছেন মিস্টার বাওরিং।

স্বচক্ষে যা দেখে এসেছি কমিশনার সাহেবের কাছে তার যথাযথ বর্ণনা দিলাম। জবাব দিতে গিয়ে কমিশনার সংক্ষেপে বললেন :

"ফোর্ট-এর দিকে এগিয়ে গেলে হ্যাঙ্গামা নিবারণ করা যাবে না ভেবে আমি চাইনি শোভাযাত্রা সেদিকে যায়। তারপর যখন বুঝলাম, অনুরোধ-উপরোধে জনতা কান দেবে না, তখন বাধ্য হয়ে সওয়ার-পুলিশকে হুকুম দিতে হয়, তারা যেন জনতার মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।"

আমি তাঁকে বললাম : "আপনি তো তাহলে জানতেন ওভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে জনতার কী দশা হতে পারে। জানতেন নিশ্চয়, জনতার কিছু-কিছু লোক ঘোড়ার পায়ের তলায় প'ড়ে জখম হতে পারে, আমার তো মনে হয়। আমার তো ধারণা, সওয়ার-বাহিনী পাঠাবার কোনো দরকারই ছিল না।"

মিস্টার গ্রিফিথ্ বললেন, "ওসব কথা আপনারা বুঝতে পারবেন না। লোকের ওপর আপনার শিক্ষার কীরকম প্রভাব হয়েছে সে আমরা পুলিশেরা আপনার চেয়ে ভালো জানি। শুরুতেই আমরা যদি শক্ত না-হতাম তাহলে শেষপর্যন্ত সামাল দেওয়া শক্ত হ'ত। আপনাকে আমি ব'লে রাখছি, লোককে বাগ মানানো আপনার কর্ম নয়। আইন-অমান্যের কথা যত চট্ ক'রে তাদের মাথায় ঢোকে, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারটা তারা অত সহজে বুঝতে পারে না। আপনার উদ্দেশ্য যে ভালো, সেবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু লোকে সেসব বুঝতে চাইবে না। তারা চলে তাদের স্বভাবের প্রবণতা অনুসারে।"

উত্তরে আমি তাঁকে বলি : "সেখানেই তো আপনার সঙ্গে আমার মতে মেলে না। আমার ধারণা জনসাধারণ স্বভাব-সংগ্রামপ্রিয় নয়, শান্তিপ্রিয়।"

এইভাবে বেশ-কিছুক্ষণ ধ'রে আমাদের কথাকাটাকাটি চলতে থাকে। শেষপর্যন্ত মিস্টার গ্রিফিথ্ বললেন :

"আচ্ছা, আপনি যদি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারেন যে জনসাধারণ আপনার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি, আপনি তখন কী করবেন?"

"সে বিষয়ে আমি যদি স্থিরনিশ্চিত হই, তাহলে আমি আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখব।"

"তার মানে? এই তো আপনি মিস্টার বাওরিংকে বলেছেন, ছাড়া পাওয়ামাত্র আপনি পঞ্জাব রওনা হয়ে যাবেন।"

"হ্যাঁ, আমার তো ইচ্ছা ছিল পরের ট্রেন ধ'রে আমি পঞ্জাব চ'লে যাই। কিন্তু আজকের দিনে সে প্রশ্ন অবান্তর।"

"একটু ধৈর্য ধ'রে থাকলেই সমস্ত ব্যাপারটা আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। আমেদাবাদে যে কী ঘটছে সে কি আপনি জানেন? অমৃতসরে কী ঘটেছে সে-ও আপনি জানেন না। সর্বত্র সমস্ত লোক একেবারে যেন ক্ষেপে উঠেছে। সমস্ত তথ্য আমিও জানি না। কোনো-কোনো জায়গায় টেলিগ্রাফ্-এর তার কেটে দিয়েছে। আপনাকে আমি বলতে চাই, এইসমস্ত অঘটন ঘটার জন্য সমস্ত দায়িত্ব আপনার।"

"যেখানেই দেখব দায়িত্ব আমার, সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি ইতস্তত করব না, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন। তবে আমেদাবাদে এইধরনের হ্যাঙ্গামা ঘ'টে থাকলে, আমি সত্যই খুব দুঃখিত ও আশ্চর্য বোধ করব। অমৃতসরের হয়ে আমি জবাবদিহি করতে পারি না। সেখানে আমি কোনোদিনই যাইনি। সেখানকার লোকেরাও কেউ আমায় চেনে না। কিন্তু পঞ্জাবের প্রসঙ্গেও আমি এতটুকু অন্তত নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে পঞ্জাব সরকার যদি সেখানে যেতে আমায় বাধা না-দিত তবে সেখানকার শান্তিরক্ষার কাজে আমি যথেষ্ট সহায়তা করতে পারতাম। আমায় বাধা দিয়ে সরকার সেখানে অনর্থক জনরোষের কারণ ঘটিয়েছেন।"

এইভাবে আমাদের বাদ্‌বিতণ্ডা চলতে থাকল। দেখা গেল, আমাদের একমত হওয়া সম্ভব হবে না। আমি তখন তাঁকে বললাম যে আমার ইচ্ছা চৌপাটিতে জনসভা ডেকে সবাইকে আমি শান্তিরক্ষা করতে বলব। অতঃপর তাঁর ওখান থেকে আমি চ'লে গেলাম। চৌপাটিতে জনসভা হ'ল। সেখানে আমি বিস্তারিতভাবে অহিংস সংগ্রামীর দায়িত্বের কথা ও সত্যাগ্রহের সীমারেখা কোথায় টানতে হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম, "আসলে সত্যাগ্রহ হ'ল সত্যসন্ধ ব্যক্তির হাতে হাতিয়ার। সত্যাগ্রহীকে পণ নিতে হয় যে সকলরকম অবস্থায় সে অহিংস থাকবে। লোকে যদি কায়মনোবাক্যে অহিংস না-হয় তাহলে সত্যাগ্রহের ভিত্তিতে জন-আন্দোলন আমি গ'ড়ে তুলতে পারব না।"

আমেদাবাদে হাঙ্গামা হয়েছে, সে খবর অনসূয়া বেনও পেয়েছিলেন। কেউ-কেউ গুজব রটনা করে যে তিনিও না-কি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। সেই গুজবে মিল্-মজদুরেরা ক্ষেপে আগুন হয়ে ওঠে, ধর্মঘট করে ও দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধায়। পুলিশের একজন সার্জেন্ট এই গোলমালে প্রাণ হারায়। আমি আমেদাবাদ রওনা হয়ে গেলাম। পথে শুনতে পেলাম, নদিয়াদ রেল স্টেশনের কাছে না-কি রেললাইন উপড়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল, বিরাম্‌গামে একজন সরকারি কর্মচারী খুন হয়েছেন এবং আমেদাবাদ শহরে নাকি জঙ্গী আইন জারি হয়েছে। সমস্ত লোক ভীত-সন্ত্রস্ত। হিংসাত্মক কাজে যারা রত ছিল এখন না-কি তাদের সুদে-আসলে গুণগার দিতে হচ্ছে।

আমেদাবাদের পুলিশ কমিশনার মিস্টার প্র্যাট্-এর কাছে নিয়ে যাবার জন্য স্টেশনে একজন পুলিশ অফিসার আমার অপেক্ষায় মোতায়েন ছিলেন। গিয়ে দেখি, কমিশনার সায়েব রেগে লাল হয়ে আছেন। আমি খুবই ধীরভাবে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম এবং বিক্ষোভ

ও অশান্তি ঘটেছে ব'লে দুঃখ প্রকাশ করলাম। জঙ্গী আইন জারি করার কোনো প্রয়োজন ছিল কি-না আমি তাঁকে বিবেচনা ক'রে দেখতে বলি। আরো বলি যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার যে কোনো প্রচেষ্টায় আমি সহযোগ করতে প্রস্তুত। সবরমতী আশ্রমে একটি জনসভা করার জন্য তাঁর অনুমতি ভিক্ষা করি। প্রস্তাবটা তাঁর ভালো লাগে। যদ্দূর স্মরণ হয়, সেই জনসভা ডাকা হয়েছিল ১৩ই এপ্রিল তারিখে, রবিবারে। সেইদিন কিংবা তার পরের দিন জঙ্গী আইন তুলে নেওয়া হয়। জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমি বলি, লোকে যে অন্যায় করেছে, তা যেন তারা বুঝতে চেষ্টা করে। সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে আমি যে তিনদিন-ব্যাপী অনশন পালন করব, সে কথাও আমি সভায় জানাই এবং লোকেদেরও বলি তারা যেন একটা দিন উপবাস করে। যারা হিংসাত্মক কাজ করেছিল, তাদের বলেছিলাম, তারা যেন প্রকাশ্যে তাদের অন্যায় ও অপরাধ কবুল করে।

আমি দেখলাম, আমার সামনে যে কর্তব্য অপেক্ষা ক'রে আছে, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। যে সকল মজদুরদের মধ্যে আমি এতকাল কাজ করেছি, যাদের সেবা করেছি, অন্যদের তুলনায় যারা ভালোভাবে চলবে ব'লে মনে-মনে আশা পোষণ ক'রে এসেছি, তারাই তো দাঙ্গাহাঙ্গামায় যোগ দিয়েছে। সে কথা ভাবতেও আমার অসহ্য বোধ হয়েছিল, মনে হয়েছিল, তাদের অন্যায়—আমার অন্যায়, তাদের অপরাধ—আমার অপরাধ।

একদিকে আমি যেমন লোকেদের বলেছিলাম, তাদের অপরাধ স্বীকার করতে, সরকারকে তেমনি আমি বলেছিলাম, অপরাধীদের মার্জনা করতে। দু-পক্ষের কেউই আমার কথায় কান দেয়নি।

স্যর রমনভাই ও আমেদাবাদের অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক আমার কাছে আসেন ও অনুরোধ জানান আমি যেন সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখি। তাঁদের এই আবেদন ছিল অবান্তর, কারণ আমি ইতিপূর্বেই মনঃস্থির করেছিলাম, যতদিন লোকে শান্তিরক্ষায় শিক্ষিত হয়ে না-উঠবে ততদিন সত্যাগ্রহ বন্ধ থাকবে। তাঁদের এই কথা বলায় তাঁরা খুশি হয়ে ফিরে গেলেন।

কিছু-কিছু লোক অবশ্য আমার এই সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন, সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, এই কড়ারে যদি আমি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা করতে চাই, তাহলে সত্যাগ্রহকে কখনোই গণ-আন্দোলনরূপে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। স-খেদে তাঁদের আমায় বলতে হয়েছিল যে তাঁদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। যাঁদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি, যাঁরা আত্মনিগ্রহ বরণ ক'রেও অহিংস থাকবেন ব'লে আশা ক'রে এসেছি, তাঁরাই যদি হিংসা থেকে মুক্ত না-হতে পারেন, তাহলে কোনোকালে সত্যাগ্রহ সফল ক'রে তোলা যাবে না। যাঁরা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নায়ক হবেন তাঁরা নিজেদের দলের লোকেদের অহিংসা-নীতির চৌহদ্দির মধ্যে সংযত রাখবেন। তা না-হ'লে তাঁদের নেতৃত্বের কোনো অর্থ হয় না। এই বিশ্বাসে তখনো আমি যেমন দৃঢ় ছিলাম, আজও তেমনি।

৩৩. 'পর্বতপ্রমাণ প্রমাদ'

আমেদাবাদের সভা হয়ে যাবার অব্যবহিত পরে চ'লে গেলাম নদিয়াদ। 'হিমালয়ান্ মিস্ক্যাল্কুলেশন্' অথবা 'পর্বতপ্রমাণ প্রমাদ' ব'লে আমার যে কথাটা পরে লোকের মুখে-মুখে খুবই চালু হয়ে যায়, সে কথাটা প্রথম আমি নদিয়াদেই বলি। ভুল যে আমি করেছিলাম, আমেদাবাদে থাকতেই সে বিষয়ে আমার মনে একটা অস্পষ্ট খট্‌কা জেগেছিল। কিন্তু নদিয়াদ পৌঁছে আসল অবস্থাটা আমার নজরে পড়ল। লোকমুখে শুনতে পেলাম যে খেড়া জেলার বহুলোক গ্রেফতার হয়েছে! মনে হ'ল, ঠিকমতো ক্ষেত্র প্রস্তুত না-ক'রে, তড়িঘড়ি খেড়া জেলার ও দেশের অন্য অঞ্চলের লোকেদের আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করতে ডেকে, আমি একটা ভয়ঙ্কর ভুল ক'রে ফেলেছি। এই চিন্তাটা হঠাৎ যখন আমার মনকে অধিকার করে, সেসময় আমি নদিয়াদ-এর একটি জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। আমার এই পর্বতপ্রমাণ ভুল সর্বসমক্ষে স্বীকার করার ফলে লোকে আমায় নিয়ে প্রচুর ঠাট্টা-তামাসা করেছিল। কিন্তু ভুল কবুল করেছিলাম ব'লে কখনো আমি আপশোস করিনি। সর্বদাই আমি মনে ক'রে এসেছি, যে লোক নিজের ভুলকে পর্বতপ্রমাণ ব'লে ভাবে ও অন্য লোকের ভুলকে ছোটো ক'রে দেখতে পায়, একমাত্র সেই লোকের হাতেই নিক্তির ওজন হরেদরে ঠিক থাকে। আমি এটাও বিশ্বাস করি, যে ব্যক্তি সত্যাগ্রহী হতে চায় তার উচিত এই নীতিটুকু অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা।

আমার এই পর্বতপ্রমাণ প্রমাদটা ঠিক যে কী ছিল, একবার তা বিচার ক'রে দেখা দরকার। স্বেচ্ছায় ও যথোচিত সম্ভ্রমের সঙ্গে যে লোক রাষ্ট্রের আইনতন্ত্র মেনে না-এসেছে, তার কোনো অধিকার বা যোগ্যতা নেই আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার। আইন-ভঙ্গ করলে সাজা পেতে হবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সেই ভয়ে আইন মেনে চলি—বিশেষত সেইসমস্ত আইন, যার মধ্যে কোনো নৈতিক প্রশ্নের বালাই নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, চুরির বিরুদ্ধে কোনো আইন থাক্ বা না-থাক্, কোনো সৎ বা ভদ্র ব্যক্তি চট্ ক'রে চুরি করতে যাবেন না। কিন্তু রাতে সাইকেলে বাতি জ্বালাবার নিয়মটুকু ভাঙবার দরুণ, এরকম ব্যক্তির মনেও বিন্দুমাত্র অনুশোচনা দেখা না-যেতে পারে। এমন-কি তাকে যদি বলা হয়, এই বিষয়ে তাঁর একটু অবহিত হওয়া দরকার, তিনি সেই সদুপদেশে কান না-দিয়ে উল্‌টে চ'টেও যেতে পারেন। কিন্তু এ নিয়ে যদি কড়াক্কড়ি বাধ্যবাধকতা থাকে, তাহলে নেহাৎ আইন-ভঙ্গের দরুণ মামলা-মকদ্দমার হুজ্জৎ থেকে রেহাই পাবার জন্য, তিনি হয়তো নিয়ম মেনে চলবেন। স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে সত্যাগ্রহী যেমন নিয়ম পালন করবেন ব'লে আশা করা যায়, এরকম দায়ে-পড়া নিয়ম-পালন তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সভ্য সমাজের নিয়ম-কানুন পালনীয় ব'লেই সত্যাগ্রহী বুঝেসুঝে, আপন ইচ্ছায়, তা পালন করেন। তিনি মনে করেন, সেরকম করা তাঁর ধর্মীয় কর্তব্যবিশেষ। এইরকম নিষ্ঠায় মানুষ যখন সমাজের নিয়ম পালন করেন, তখনইমাত্র তাঁর পক্ষে নিয়মের ন্যায়-অন্যায় বিচার করা সম্ভবপর হবে। তখনইমাত্র তিনি বলতে পারবেন, কোন্‌টা কল্যাণকর কোন্‌টা অকল্যাণের। তখনইমাত্র

বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় বিশেষ-বিশেষ আইন অমান্য করায় তাঁর অধিকার জন্মায়। কোথায়-কোথায় যে সীমারেখা টানতে হয়, সেদিকে আমি নজর দিতে পারিনি ব'লেই আমার ভুল হয়েছিল। আইন অমান্য করার সেই নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করবার আগেই আমি লোকেদের বলেছিলাম আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ওইখানেই আমার ভুল হয়েছিল এবং পরে মনে হয়েছিল সে ভুল পর্বতপ্রমাণ। খেড়া জেলায় পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে খেড়া সত্যাগ্রহের অনেক পুরাতন স্মৃতি আমার মনে ভিড় ক'রে আসে। তখন আমার কেবলই মনে হতে থাকে, যে কথাটা আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কী ক'রে তা আমার নজর এড়িয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার যোগ্য হতে গেলে, আগে তার গভীর তাৎপর্য লোকেদের ভালো ক'রে বুঝে নেওয়া দরকার। তাই যদি হয়, তাহলে আইন-অমান্যের ব্যাপারটা জন-আন্দোলনরূপে গ'ড়ে তোলবার আগে, এমন একদল নির্ভরযোগ্য ও চরিত্রবান্ স্বেচ্ছাব্রতী গ'ড়ে তোলা দরকার, যাঁরা সত্যাগ্রহীর অবশ্য-পালনীয় রীতিনীতির কঠোরতা বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হবেন। এইসব কঠিন শর্ত কী জন্য পালন করা কর্তব্য, সেইসব কারণ তাঁরা জনসাধারণের কাছে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবেন এবং তাদের ঠিকপথে চালনা করার জন্য বিনিদ্র প্রহরায় রত থাকতে পারবেন।

এইধরনের ভাবনা-চিন্তা যখন আমার মনকে অধিকার ক'রে আছে, এইরকম অবস্থায় আমি বোম্বাই গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানকার সত্যাগ্রহ সভার মারফৎ আমি সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবীর দল গঠন করি ও তাদের সাহায্যে সত্যাগ্রহের অর্থ ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিষয়ে জনগণকে শিক্ষিত ক'রে তোলার কাজ শুরু ক'রে দিই। মূলত এই কাজ সম্পন্ন হয় সত্যাগ্রহ বিষয়ে শিক্ষামূলক পত্র-পুস্তিকা প্রচার করে।

এই শিক্ষামূলক কাজ চলতে থাকার কালে লক্ষ করলাম, সত্যাগ্রহে শান্তিরক্ষার ব্যাপারে লোকেদের মধ্যে যথোচিত আগ্রহ সৃষ্টি করা দস্তুরমতো কষ্টসাধ্য। স্বেচ্ছাসেবকের তালিকায় নাম লেখবার জন্য খুব বেশি লোক এগিয়ে আসত না। যারা নাম লিখিয়েছিল, নিয়মিত তালিম নেবার জন্য তারা হাজির হ'ত না। যত দিন যেতে লাগল স্বেচ্ছাসেবী হবার জন্য নতুন লোকের আমদানি হওয়া দূরে থাক্, দলের সংখ্যা দিন-দিন হ্রাস পেতে লাগল। ঠেকে শিখলাম যে আইন-অমান্য আন্দোলনে লোকেদের শিক্ষিত ক'রে তোলার কাজটা যত দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে ব'লে গোড়ায় আশা করেছিলাম, তেমনটা চলবে না।

৩৪. *নবজীবন* ও *ইয়ং ইন্ডিয়া*

এইভাবে, একদিকে আইন-অমান্য আন্দোলনকে হিংসা থেকে মুক্ত রাখার কাজ যেমন শনৈঃ-শনৈঃ হ'লেও অব্যাহত এগিয়ে চলতে থাকল, তেমনি চলতে থাকল পুরোদমে সরকারি দমন-নীতির বে-আইনি দাপট। বিশেষ ক'রে পঞ্জাবে তা প্রকাশ পেল নির্লজ্জ নগ্নরূপে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ধ'রে-ধ'রে জেলে চালান দেওয়া হ'ল। এমন ফৌজি আইন জারি করা হ'ল যার মধ্যে আইনের নামগন্ধ পর্যন্ত ছিল না। বিচারশালার নামে এমনভাবে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠিত হ'ল যাতে ক'রে স্বৈরাচারী শাসকের যথেচ্ছাচারের পোষকতা করা যায়। সাক্ষীসাবুদের বালাই না-রেখে অন্যায়ভাবে শাস্তিবিধান ক'রে বিচারের প্রহসন চলতে লাগল। অমৃতসরে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে নির্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তিদের তুচ্ছ কৃমিকীটের মতো বুকে হেঁটে চলতে বাধ্য করা হ'ল। যদিও প্রধানত জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে ভারত তথা জগতের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল পঞ্জাবের ওপর, আমার তো মনে হয়, মনুষ্যত্বের এই নিদারুণ লাঞ্ছনার তুলনায় জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মন্তুদ ঘটনাও ছিল অকিঞ্চিৎকর।

ফলাফল যেমনি হোক্-না-কেন, সব-কিছু অগ্রাহ্য ক'রে আমায় পঞ্জাবে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হচ্ছিল। সেখানে যাবার জন্য অনুমতি চেয়ে ভাইস্‌রয়-কে চিঠি দিলাম, তারবার্তা পাঠালাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, অনুমতি পাওয়া গেল না। প্রয়োজনীয় অনুমতি-ব্যতিরেকে আমি যদি রওনা হয়ে যেতাম, তাহলে পঞ্জাবের সীমা আমায় অতিক্রম করতে দেওয়া হ'ত না। অবশ্য অহিংসভাবে আইন-অমান্যের সন্তোষটুকু আমার মিলতে পারত। এইভাবে আমার একটা কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হ'ল। আমার মনে হ'ল, সেইসময়কার পরিস্থিতিতে, পঞ্জাবে প্রবেশ করার নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে আমি যদি পঞ্জাব যাই, তাহলে আমার সে কাজটাকে ঠিক আইন-অমান্যের পর্যায়ে ফেলা যাবে না। কারণ যেধরনের শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি আমি চেয়েছিলাম, সে আবহাওয়ার সৃষ্টি তখনো হয়নি। বরঞ্চ উগ্র দমননীতির ফলে পঞ্জাবের সর্বত্র তখন গভীর অসন্তোষ, জনরোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ঠিক সেইসময়ে সম্ভবপর হ'লেও যদি আমি আইন-অমান্য আন্দোলন করতে যাই, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেবার মতো হবে। বন্ধুদের নির্বন্ধ সত্ত্বেও সেই কারণে পঞ্জাব প্রবেশের প্রস্তাবে আমি কান দিইনি। ফলে উভয়ত বহু তিক্ততার সঞ্চার হয়। প্রতিদিন পঞ্জাব থেকে ঘোরতর অবিচার ও অকথ্য অত্যাচারের খবর আমার কানে এসে পৌঁছত। কী আর করব, জড়ভরতের মতো স্থাণু হয়ে ব'সে থাকতাম ও মনে-মনে দাঁত কিড়মিড় করতাম।

ঠিক সেইসময়ে যাঁর হাতে প'ড়ে *বোম্বে ক্রনিক্‌ল* জনমতের বাহন হিসেবে প্রচুর শক্তির অধিকারী হয়েছিল, সেই মিস্টার হর্নিম্যানকে সরকারি কর্তৃপক্ষ চুপিচুপি কোথায় যেন সরিয়ে ফেলল। সরকারের এই কাজে এমন একটা নোংরামি ছিল যে সে কথা মনে পড়লে আজও আমার গা ঘিনঘিন করে। আমি নিশ্চিত জানি, মিস্টার হর্নিম্যান কখনো আইনের বিরুদ্ধতা করতে চাননি। সত্যাগ্রহ-সমিতির অনুমতি-ব্যতিরেকে পঞ্জাব সরকারের নিষেধাজ্ঞা আমি

অমান্য করি, এটা তাঁর মনঃপূত ছিল না। আইন-অমান্য আন্দোলন মুলতবি রাখার প্রশ্নে তিনি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েছিলেন। স্থগিত রাখার সপক্ষে আমার মতামত লোকগোচর করবার আগেই, তিনি সে বিষয়ে আমায় একটি চিঠি লিখেছিলেন। বোম্বাই ও আমেদাবাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের কারণে সে চিঠি আমাব ঘোষণার পরে হাতে এসেছিল। সুতরাং ভারত থেকে হঠাৎ তাঁকে বহিষ্কৃত করায় আমি যেমন আশ্চর্য হয়েছিলাম, তেমনি ক্ষুব্ধ বোধ করেছিলাম।

এইসব ঘটনার ফলে, *বোম্বে ক্রনিক্‌ল*-এর পরিচালকবর্গ আমায় এই কাগজ চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বললেন। ওই কাগজে যাঁরা তখন কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে মিস্টার ব্রেল্‌ভি তো ছিলেনই, সুতরাং আমায় বেশি-কিছু কাজ করতে হয়তো হ'ত না। কিন্তু আমার স্বভাবটাই এমন যে এ দায়িত্ব নিলে আমার ওপর মাত্রাধিক চাপ পড়ত। এই অবস্থায় সরকারই যেন আমায় উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে এলেন ; সরকারের হুকুমে *ক্রনিক্‌ল* প্রকাশ করা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

ক্রনিক্‌ল-পরিচালনায় মুখ্য ছিলেন উমর সোবানী ও শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার। সেইসময় *ইয়ং ইন্ডিয়া* কাগজের পরিচালনাও ছিল তাঁদের হাতে। তাঁরা বললেন, *ক্রনিক্‌ল* প্রকাশ রদ হওয়ায়, আমি যেন এখন *ইয়ং ইন্ডিয়া*-র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করি। তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে সাপ্তাহিক হিসাবে না-চালিয়ে এখন যদি *ইয়ং ইন্ডিয়া* সপ্তাহে দু-বার বের করা হয়, তাহলে *ক্রনিক্‌ল*-এর অভাব অনেকটা দূর হতে পারে। এই কথাটা আমার মনেও উদয় হয়েছিল। সত্যাগ্রহ-নীতির নিহিত তাৎপর্য সকল লোকের সামনে তুলে ধরবার একটা আগ্রহ আমার মনে প্রবল ছিল। তাছাড়া এইধরনের প্রচেষ্টার ফলে পঞ্জাব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমার যথাসাধ্য কর্তব্য করার সুযোগ পেতে পারি ব'লে আশা হ'ল। তখন আমি যা-কিছু লিখতাম, তার পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সত্যাগ্রহের সম্ভাবনাকে বাস্তব ক'রে তোলা। সরকারও আমার এই উদ্দেশ্যের কথা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অতএব বন্ধুদের প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে গেলাম।

কিন্তু ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণকে সত্যাগ্রহ-নীতিতে শিক্ষিত ক'রে তোলা যায় কি? আমার কাজের প্রধান ক্ষেত্র ছিল গুজরাট। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক তখন সোবানী ও ব্যাঙ্কার-এর দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি তখন *নবজীবন* নামে যে গুজরাতি মাসিক সম্পাদনা করতেন তা চলত এই বন্ধুদের অর্থসাহায্যে। মাসিক *নবজীবন*-এর ভারও এঁরা আমার হাতে তুলে দিলেন। যাজ্ঞিক বললেন, এ কাজে তিনি আমার সহায় হবেন। মাসিক *নবজীবন* পত্র সাপ্তাহিকে পরিণত হ'ল।

ইতিমধ্যে *ক্রনিক্‌ল* পুনরায় প্রকাশ হতে শুরু করল। সুতরাং *ইয়ং ইন্ডিয়া* আগেকার মতো সাপ্তাহিক হয়ে বেরুতে লাগল। দুটো আলাদা জায়গা থেকে দুটো সাপ্তাহিক কাগজ বের করা আমার পক্ষে অসুবিধাজনক এবং তাতে খরচও পড়ে বেশি। যেহেতু *নবজীবন* বেরুত আমেদাবাদ থেকে, আমার প্রস্তাবক্রমে *ইয়ং ইন্ডিয়া*-ও স্থানান্তরিত হয়ে আমেদাবাদ চ'লে আসে।

এই ঠাঁইবদলের সপক্ষে অন্য কারণও ছিল। *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছিলাম, এরকম কাগজ চালাতে গেলে নিজেদের প্রেস থাকা দরকার। উপরন্তু তখনকার দিনে প্রেস আইনের এমনই কড়াক্কড়ি যে যেসব প্রেস ব্যবসা হিসাবে চলত, সেইসব প্রেস আমার অবাধ মতামত প্রকাশ করতে নিশ্চয় দোনামনা করত। কাজে-কাজেই নিজেদের ছাপাখানা পত্তন না-ক'রে উপায়ান্তর ছিল না। আমেদাবাদে পত্তন করার সুবিধা থাকায় *ইয়ং ইন্ডিয়া* আমেদাবাদেই উঠে আসে।

এই দুই সাপ্তাহিকের মধ্যে দিয়ে পাঠক-সাধারণকে সত্যাগ্রহ-নীতিতে শিক্ষিত ক'রে তোলবার জন্য আমি যথাসাধ্য প্রযত্ন শুরু করলাম। দুটি পত্রেরই প্রচার ক্রমে-ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে, একসময় দশ হাজারের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল। তবে *নবজীবন*-এর প্রচার যেমন একলাফে বেড়ে গিয়েছিল, *ইয়ং ইন্ডিয়া-র* বেলা তেমনটা হয়নি, বৃদ্ধির হার ছিল অল্পে-অল্পে ধীরে-ধীরে। আমার জেল হবার পর দুটি কাগজেরই প্রচার হ্রাস পায়, এখন তো প্রচার-সংখ্যা আট হাজারের একটু নিচেই হবে।

শুরুতেই আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম, আমাদের সাপ্তাহিকদুটিতে আমরা বিজ্ঞাপন ছাপব না। আমার মনে হয়, সেজন্য আমাদের কোনো ক্ষতিস্বীকার করতে হয়নি। বরঞ্চ আমার বিশ্বাস, এর ফলে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ আমরা বেশি ক'রে পেয়েছি।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই দুটি কাগজ আমার হাতে থাকায় আমি যেন খানিক-পরিমাণে নিজের সঙ্গেও বোঝাপড়া ক'রে নিতে পেরেছি। যে সময়ে আপন ইচ্ছামতো আইন-অমান্য আন্দোলনে নেমে পড়া সম্ভবপর ছিল না, সেইসময়ে এই দুই সাপ্তাহিকের মধ্যে দিয়ে আমার মতামত খোলাখুলি ব্যক্ত করতে পারতাম ও লোকের মনে সাহস জোগাতে পারতাম। তাই আমার ধারণা, দেশের দুর্দিনে এ দুটি কাগজ জনসেবার কাজ বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছিল, এবং জঙ্গী শাসনের জুলুমের চাপ কিছুটা কমাতে পেরেছিল।

৩৫. পঞ্জাবে

পঞ্জাবে যা-কিছু ঘটেছিল তার জন্য স্যর মাইকেল ও-ডায়ার আমাকে দায়ী করেছিলেন। আর পঞ্জাবে জঙ্গী আইন জারি হবার ব্যাপারে পঞ্জাবের কতিপয় রুষ্ট যুবক দায়ী করেছিলেন আমাকেই। তাঁদের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল এই যে, আইন-অমান্য আন্দোলন আমি যদি মাঝপথে থামিয়ে না-দিতাম তাহলে জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ত না। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ আরো-কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ভয় দেখিয়েছিল যে পঞ্জাবে একবার পা দিলে আমায় না-কি প্রাণ হাতে ক'রে ফিরতে হবে না।

আমার মতে কিন্তু আমার কাজটা এমনি নির্ভুল ও সঙ্গত ছিল যে কোনো সুবিবেচক মানুষ আমায় ভুল বুঝতে পারেন ব'লে মনেই হয়নি।

পঞ্জাবে যাবার জন্য আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম। ইতিপূর্বে কখনো পঞ্জাব যাইনি ব'লেই

যেন সব-কিছু ব্যাপার স্বচক্ষে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম। আমায় যাঁরা পঞ্জাবে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন, ডক্টর সত্যপাল, ডক্টর কিচলু ও পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরী—তাঁরা সকলেই তখন জেল-এ। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, তাঁদেরকে ও অন্যান্য বন্দীদের সরকার বেশিদিনের জন্য জেলে আটক রাখতে পরবেন না। যখনই আমি বোম্বাইয়ে থাকতাম, বহু পঞ্জাবি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এরকম সাক্ষাৎকারের সময় আমি তাঁদের সাহস দিতাম, উৎসাহ দিতাম। আমার কথায় তাঁরা ভরসা পেতেন। আত্মপ্রত্যয়ে তখন আমি এমনই দৃঢ় ছিলাম যে অন্য লোকের মনে তার ছোঁয়াচ লাগত।

কিন্তু আমার পঞ্জাবে যাওয়াটা বারবার পিছিয়ে দিতে হচ্ছিল। যখনই অনুমতি চেয়ে ভাইস্‌রয়-কে চিঠি লিখতাম, জবাবে তিনি বলতেন, "এখনো সময় হয়নি।" কাজেই দিন গড়িয়ে যেতে লাগল।

ইত্যবসরে জঙ্গী আইন বলবৎ থাকাকালে পঞ্জাব সরকারের কার্যকলাপ তদন্ত করার জন্য হান্টার কমিটি গঠিত হবে ব'লে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার আগে এন্ড্রুজ গিয়ে পৌঁছেছেন পঞ্জাবে। পঞ্জাবেরর ঘটনাবলী বিষয়ে তিনি তাঁর প্রত্যেক চিঠিতে হৃদয়-বিদারক বর্ণনা পাঠাতেন। এইসব বর্ণনা প'ড়ে আমার মনে হয়, জঙ্গী আইনের জবরদস্ত জুলুম সম্বন্ধে খবরকাগজের রিপোর্ট যতটুকু প্রকাশিত হ'ত, আসলে তা ছিল তার চেয়ে ঢের খারাপ। আমি যেন সত্বর গিয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হই, এন্ড্রুজ সেই মর্মে আমায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। ওদিকে মালব্যজীও অগৌণে পঞ্জাবে যাবার জন্য আমায় একাধিক তারবার্তা পাঠালেন। আবার আমি ভাইস্‌রয়-কে তারবার্তা পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলাম : "এখন কি আমি পঞ্জাব যেতে পারি?" জবাবে তিনি জানালেন : "হ্যাঁ যেতে পারেন, তবে অমুক তারিখের পরে।" কোন্ তারিখ তিনি উল্লেখ করেছিলেন, এখন আমার স্পষ্ট মনে নেই। খুবসম্ভব তারিখটা ছিল ১৭ই অক্টোবর।

লাহোরে পৌঁছে যে দৃশ্য দেখলাম তার স্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। স্টেশনের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। অনেকদিনের ছাড়াছাড়ির পর অতি প্রিয় আত্মীয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার অধীর আগ্রহে শহরের সমস্ত লোক যেন ঘরবাড়ি ছেড়ে স্টেশনে এসে জমায়েত হয়েছে। তাদের আনন্দ যেন ধরে না। পণ্ডিত রামভজ দত্তের বাংলোয় আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। আমার দেখাশোনা তত্ত্ব-তদারকির ভারটা পড়েছিল শ্রীমতী সরলা দেবীর ওপর। বাস্তবিক কাজটা ছিল বিরাট বোঝা বহনের মতোই কঠিন, কেননা আজও যেমন তখনকার দিনেও তেমনি যেখানেই আমি উঠতাম, সে জায়গা পরিণত হ'ত সরাইখানায়।

পঞ্জাবের মুখ্য নেতৃবৃন্দ তখন জেলে থাকার ফলে, পণ্ডিত মালব্যজী, পণ্ডিত মোতিলালজী ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী তাঁদের শূন্য স্থান অধিকার ক'রে ভালোই করেছিলেন। মালব্যজী ও শ্রদ্ধানন্দজীর সঙ্গে পূর্ব থেকেই আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছিল ; লাহোরেই আমি প্রথম মোতিলালজীর সঙ্গে নিকট ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসি। এই অভ্যাগত নেতারা এবং স্থানীয় নেতাদের মধ্যে যাঁদের তখনো পর্যন্ত জেলে যাবার সৌভাগ্য ঘ'টে ওঠেনি, সকলে একযোগে

আমায় যেন আপন ক'রে নিলেন। আমি যে বাইরের থেকে তাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, সে আমার ঘুণাক্ষারেও মনে হয়নি।

সর্বসম্মতিক্রমে আমরা কেমন ক'রে হান্টার কমিটির সামনে সাক্ষ্য না-দেওয়া সাব্যস্ত করি, সে তো এখন ইতিহাস। আমাদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে যেসব যুক্তি ছিল, সেসব তখন প্রকাশ করা হয়। এখানে তার পুনরুক্তি তাই করছি না। কালের পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার ঘটনাবলীর দিকে যখন পিছন ফিরে তাকাই, আজও আমার মনে হয় হান্টার কমিটি বয়কট করার সিদ্ধান্ত ক'রে আমরা ঠিকই করেছিলাম। আমাদের কাজের সমর্থনে এইটুকু বলাই যথেষ্ট।

হান্টার কমিটি বয়কট করার ফলে, বিকল্পে কংগ্রেস-এর তরফ থেকে একটি বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। স্থির হয়, সমান্তরালভাবে আমাদেরও তদন্তের কাজ চালু করা হবে। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত আব্বাস তৈয়বজী, শ্রীযুক্ত এম. আর. জয়াকর ও আমাকে সদস্য ক'রে, পণ্ডিত মালব্যজী এই কমিটি একপ্রকার গঠন ক'রে দেন। তদন্তের জন্য আমরা পঞ্জাবের ভিন্ন-ভিন্ন এলাকা বেছে নিই। কমিটির কাজের ব্যবস্থা করার ভার আমায় দেওয়া হয়েছিল। বেশিরভাগ জায়গায় তদন্ত করার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হয়। এর ফলে পঞ্জাবের মানুষজন ও পঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলের নিকট-পরিচয়-লাভের দুর্লভ সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটেছিল।

তদন্ত করতে গিয়ে পঞ্জাবের স্ত্রীজাতির সঙ্গেও আমার পরিচয়লাভের দুর্লভ সুযোগ ঘটে। প্রথম সাক্ষাতেই মনে হ'ল তাঁদের সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয়। যখন যেখানে গেছি, তাঁরা দলে-দলে আমার সাক্ষাতে এসেছেন। আমায় তাঁরা উপহার দিতেন তাঁদের হাতে-কাটা সুতোর মালা। আমার সামনে যখন এই মালাগুলি স্তূপাকার হয়ে উঠত, আমি বেশ বুঝতে পারতাম, খাদি প্রচারের ব্যাপারে পঞ্জাব একদিন প্রশস্ত ক্ষেত্র হতে পারবে।

জনগণের ওপর কীধরনের অত্যাচার ঘটেছিল, এ নিয়ে আমার তদন্ত যতই অগ্রসর হতে লাগল, কানে এল এমনসব অত্যাচারের কাহিনী, স্বেচ্ছাচারী সরকারি আমলাদের এমনসব দণ্ডমুণ্ড-বিধানের কথা, যা কোনোকালে আমায় শুনতে হবে ব'লে ভাবিনি। এসব কথা শুনে আমি বড়োই বেদনা পেয়েছিলাম। তখন একটা কথা ভেবে আমার খুব আশ্চর্য লাগত যে, যে পঞ্জাব প্রদেশ যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারকে সবার চেয়ে বেশিসংখ্যক সৈন্য জুগিয়েছিল, সেই পঞ্জাব এরকম পাশবিক অত্যাচার-অনাচার মুখ বুঁজে সহ্য করল কী ক'রে? আজকের দিনেও সে কথাটা ভাবতে আমার অবাক লাগে।

কমিটির রিপোর্ট-এর খসড়া তৈরি করার ভারটাও আমাকে দেওয়া হয়েছিল। পঞ্জাবিদের ওপর কীরকম অত্যাচার চলেছিল তা যদি কেউ জানতে চান, তাঁদের আমি এই রিপোর্ট প'ড়ে দেখতে বলি। রিপোর্ট-এ যেসব ঘটনার কথা দেওয়া হয়েছে, জ্ঞানত তার মধ্যে একটিও অতিশয়োক্তি নেই, এমন একটি কথাও বলা হয়নি যার সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তি নেই। রিপোর্ট-এর অন্তর্ভুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অতিরিক্ত আরো অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ এসেছিল কমিটির হাতে। যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল, রিপোর্ট-এ তার স্থান হয়নি। নিছক

সত্যকে তুলে ধরার জন্য লিখিত এই রিপোর্ট প'ড়ে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন ব্রিটিশ-রাজ আপন ক্ষমতা কায়েম রাখার জন্য কত নিচে নামতে পারে, কত অমানুষিক ও বর্বরোচিত পাপ ও অন্যায়ের আশ্রয় নিতে পারে। আমার জ্ঞানমতে এই রিপোর্ট-এ যেসব অনুযোগ-অভিযোগ উপস্থাপিত হয়েছিল, তার একটি কথাও এপর্যন্ত মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হয়নি।

৩৬. খিলাফৎ বনাম গো-সংরক্ষণ

পঞ্জাবের মর্মান্তিক ঘটনাবলীর প্রসঙ্গ ছেড়ে আপাতত একবার অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক্।

কংগ্রেস-এর পক্ষ থেকে পঞ্জাবে ডায়ার-শাসনের ব্যাপারে সবে যখন তদন্ত শুরু হয়েছে, দিল্লীতে খিলাফৎ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য হিন্দু-মুসলমানের এক সম্মিলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেলাম। আমন্ত্রণকারীদের মধ্যে হেকিম আজমল খাঁ সাহেব ও আসফ আলীরও নাম ছিল। চিঠিতে বলা হয়েছিল, স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী সভায় উপস্থিত থাকবেন। যদ্দূর মনে পড়ে, উল্লেখ ছিল যে তিনিই সম্মেলনের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট হবেন এবং সভা বসবে সেই বছরের নভেম্বর মাসে। খিলাফতের প্রশ্ন নিয়ে মিত্রশক্তি যে প্রতারণা করেছেন এবং ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ-শান্তির উৎসবে হিন্দু-মুসলমানের যোগদান করা যুক্তিযুক্ত হবে কি-না, এই ছিল সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়। আমন্ত্রণপত্রে অধিকন্তু বলা হয়েছিল খিলাফতের প্রশ্ন ছাড়াও, সম্মেলনে গো-সংরক্ষণের বিষয় আলোচিত হবে এবং তার ফলে এই সমস্যা সুরাহার একটি সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে। খিলাফতের প্রসঙ্গে গো-সংরক্ষণের প্রশ্ন উত্থাপন করার প্রস্তাব আমার ভালো লাগেনি। আমন্ত্রণের উত্তরে আমি লিখেছিলাম যে যদিও সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, খিলাফৎ ও গো-সংরক্ষণের ব্যাপার যুগপৎ আলোচনা করা অথবা তা নিয়ে দরকষাকষি করা আমার মতে ঠিক হবে না। এই দুই প্রশ্ন পৃথক্‌ভাবে এবং সম্পূর্ণ উপযোগিতার ভিত্তিতে বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত।

সম্মেলনে যখন যাই এইসব চিন্তা আমার মনে ছিল। সভায় অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন, অবশ্য পরবর্তীকালে জনসভায় যেমন হাজারো লোকের ভিড় দেখা যেত তার তুলনায় জনসমাগম ছিল নগণ্য। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি খিলাফৎ বনাম গো-সংরণের প্রসঙ্গটা আলোচনা করি। তিনি আমার বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার ক'রে নেন এবং বলেন আমিই যেন সভার সামনে এই প্রসঙ্গ তুলি। কথাটা আমি হেকিম সাহেবের সঙ্গেও আলোচনা ক'রে নিয়েছিলাম। সম্মেলনের সামনে আমি যে যুক্তি উপস্থাপিত করি, তা ছিল এইরকম :

খিলাফতের প্রশ্নটা যদি ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত হয়, আমার ধারণায় তা ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত, এবং তা নিয়ে ব্রিটিশ সরকার যদি ঘোরতর অন্যায় ক'রে থাকেন, তাহলে

মুসলমানদের সঙ্গে একযোগে হিন্দুদেরও এই অন্যায়ের প্রতিকার করা অবশ্যকর্তব্য। খিলাফতের প্রসঙ্গে গো-সংরক্ষণের কথাটা জুড়ে দেওয়া অথবা তাই নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে একটা রফা-নিষ্পত্তিতে আসা, তাদের পক্ষে অশোভন হবে। তেমনি খিলাফতের ব্যাপারে হিন্দুদের সহযোগ পাবার বদলে মুসলমানেরা গো-বধ বন্ধ করতে পারে, এইরকম শর্ত করাও মুসলমানদের পক্ষে শোভন হবে না। কিন্তু একই দেশের অধিবাসী ব'লে, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যবোধে, হিন্দুদের ধর্মীয় সংস্কারে আঘাত না-দেবার উদ্দেশ্যে মুসলমানেরা যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গো-বধ বন্ধ করে, তাহলে তাদের সে কাজ কেবল সুষ্ঠু হবে এমন নয়, উপরন্তু প্রশংসার যোগ্যও হবে। কোনো চুক্তি বা শর্তের অপেক্ষা না-রেখে তারা যদি পৃথক্‌ভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করে, তারা কেবল যে তাদের কর্তব্য পালন করবে এমন নয়, নিজেদের গৌরবান্বিতও করবে। কিন্তু হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্যবোধে মুসলমান যদি গো-বধ বন্ধ করতে চায়, তাহলে হিন্দুরা খিলাফতের ব্যাপারে তাদের সহায়তায় এগিয়ে এল কি না-এল সেদিকে না-তাকিয়েই তাকে তার কর্তব্য ক'রে যেতে হয়। পরিশেষে আমি বলি, "তা-ই যদি হয়, তাহলে পরস্পর-নিরপেক্ষভাবে এই দুই প্রশ্নের বিচার করতে হয়, এবং আমার মনে হয়, বর্তমান সম্মেলনে কেবল খিলাফৎ নিয়ে আলোচনা করাটাই সমীচীন হবে।" আমার এই যুক্তি সমবেত সকলের মনে ধরে, ফলে গো-সংরক্ষণের প্রশ্ন সেই সভায় কেউ উত্থাপন করেননি।

একমাত্র মৌলানা আবদুল বারী সাহেব, আমার এইভাবে সামধান ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও, বললেন : "হিন্দুরা আমাদের সাহায্য করুক বা না-ই করুক, যেহেতু আমরা একই দেশে বসবাস করি, হিন্দুদের মনের দিকে তাকিয়ে মুললমানদের কোরবানি বন্ধ করা উচিত।"

তাঁর এই কথার এমন প্রতিক্রিয়া হয় যে একসময় মনে হয়ছিল মুসলমানেরা সত্য-সত্যই বুঝি গো-বধ নিবারণ করবে।

কেউ-কেউ প্রস্তাব করেছিলেন, খিলাফৎ সম্পর্কিত অবিচারের সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্জাবের প্রশ্নও যেন জুড়ে দেওয়া হয়। আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করি। আমি বলি যে পঞ্জাবের প্রশ্ন একটি অঞ্চল-বিশেষের ব্যাপার, তার সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-শান্তি উৎসবে ভারতীয়দের যোগ দেওয়া বা না-দেওয়ার প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। যেহেতু খিলাফতের প্রশ্ন শান্তিচুক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, নিছক স্থানীয় সমস্যার সঙ্গে তাকে যুক্ত ক'রে দেখা অবিবেচনার কাজ হবে। আমার এই যুক্তি সমবেত সকলের মনঃপূত হয়।

সভায় উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, তাঁদের একজন হলেন মৌলানা হসরত মোহানী। তাঁর সঙ্গে পূর্ব-থেকেই আমার পরিচয় ছিল। তবে তিনি যে কেমন লড়িয়ে লোক, এই সভাতেই প্রথম তার একটু আঁচ পাই। শুরু থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল হয়নি, আমাদের সেই মতভেদ আজও অব্যাহত।

এই সভায় অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাব ছিল হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে স্বদেশীয় ব্রতগ্রহণ ও তারই পরিপূরক হিসেবে বিদেশী বস্তু বর্জন। খাদি তখনো তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হসরত সাহেব এই প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না। খিলাফতের ব্যাপারে

অন্যায় করলে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের ওপর একহাত নেওয়া উচিত, এই ছিল তাঁর ধারণা। তাই তিনি একটা পাল্‌টা প্রস্তাব উপস্থাপিত ক'রে বললেন যে যতটা সম্ভব কেবল ব্রিটিশ মাল বয়কট্‌ করা হোক্‌। কী-কী কারণে বৃটেন-জাত সবরকম পণ্য বয়কট্‌ করা সম্ভবপর নয়, উচিতও নয় ; সেইসব যুক্তি দেখিয়ে আমি তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করি। আমার সেসব যুক্তি দেশের কাছে এখন আর অজানা নয়। এছাড়া সভার সামনে অহিংসা-নীতির বিষয়েও আমার বক্তব্য পেশ করি। লক্ষ করলাম, সভাস্থ সকলের মনে আমার যুক্তি গভীর প্রভাব বিস্তার করল। ইতিপূর্বে হসরত মোহানীর বক্তৃতা দেবার সময় লোকে এমন তুমুল হর্ষধ্বনি তুলেছিল যে আমার আশঙ্কা হয়েছিল আমার বক্তৃতা হবে নিছক অরণ্যে রোদন। আমার বক্তব্য সভার সামনে উপস্থাপন না-করলে আমার কর্তব্যের খেলাপ হবে, কেবল এই ভেবেই আমি বক্তৃতা করেছিলাম। কিন্তু সানন্দ বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, সভায় উপস্থিত সকলেই গভীর আগ্রহে আমার বক্তব্য অনুধাবন করলেন। মঞ্চে যাঁরা বসেছিলেন, সবাই আমার যুক্তিতে তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জানালেন। পরপর একাধিক বক্তা আমার মতের সপক্ষে বক্তৃতা দিলেন। নেতারা বুঝতে পারলেন, কেবল ব্রিটিশ মাল বয়কট্‌ ক'রে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, বরঞ্চ তাতে ক'রে লোকচক্ষে উপহসিত হতে হবে। সেই সভায় এমন একটি লোকও হয়তো ছিলেন না, যিনি তাঁর অঙ্গে কোনো-না-কোনো ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্র ধারণ করেননি। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে তাই বুঝতে পারলেন, যে প্রস্তাব তাঁরা নিজেরাও কার্যে পরিণত করতে পারবেন না, সে প্রস্তাব পাশ করা মনে অনর্থ ডেকে আনা।

হসরত মোহানী যে কথা বলতে চেয়েছিলেন তা ছিল মোটামুটি এই :

"কেবলমাত্র বিদেশী বস্ত্র বয়কট্‌ ক'রে আমরা তুষ্ট থাকতে পারি না। কে নিশ্চিত বলতে পারে, আমাদের চাহিদা মেটাবার মতো প্রচুর পরিমাণে স্বদেশী কাপড় আমাদের দেশে কবে তৈরি হবে। যতদিন তা না-হয়, বিদেশী বস্ত্র বর্জন কি বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর হবে? আমরা এমন-কিছু চাই যার প্রভাব সদ্য-সদ্য গিয়ে পড়বে ব্রিটিশের ওপর। আপনি বিদেশী বস্ত্র বয়কট্‌ করার প্রস্তাব তুলেছেন, সে প্রস্তাব না-হয় আমরা মেনে নিলাম। কিন্তু তাছাড়াও এমন-কিছু একটা আমাদের হাতে দিন যা কালবিলম্ব না-ক'রে কার্যকরী হবে, ইত্যাদি।"

তাঁর ভাষণ শুনতে-শুনতে আমারও মনে হচ্ছিল, বিদেশী বস্ত্র বয়কট্‌-এর অতিরিক্ত নতুন-কিছু একটা করা দরকার। রাতারাতি বিদেশী বস্ত্র বর্জন যে সম্ভবপর হতে পারে না, সে আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম। তখন আমি জানতাম না যে ইচ্ছা করলে আমরা আমাদের কাপড়ের সমস্ত চাহিদা খাদি উৎপাদন ক'রে মেটাতে পারি। এই সত্যটা আবিষ্কার করেছিলাম পরে। অপরপক্ষে এটাও আমি তখনই বুঝেছিলাম যে বিদেশী বস্ত্র বর্জন কার্যকর করার জন্য আমরা যদি কেবল দেশী মিল্‌-এর ওপর নির্ভরশীল হই, আমাদের ঠকতে হবে। সন্দেহে-সংশয়ে আমার মন যখন দুলছে, মৌলনা মোহানীর বক্তৃতায় ছেদ পড়ল।

বক্তৃতা দিতে গিয়ে একটু মুশকিলেই পড়লাম, লাগসই হিন্দি বা উর্দু কথা ঠিক যেন আমার মুখে জোগাচ্ছিল না। মূলত উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের কোনো সমাবেশে বিতর্ক-মূলক বক্তৃতা দেওয়া, সেই আমার প্রথম। ইতিপূর্বে কলকাতায় মুস্‌লিম লীগ্‌-এর

একটি অধিবেশনে আমি একবার উর্দুতে বক্তৃতা দিয়েছিলাম সত্য। কিন্তু সে বক্তৃতা ছিল নিছক কয়েকমিনিটের বক্তৃতা এবং তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করা। আর এখানে ছিল একেবারে অন্যধরনের পরিস্থিতি। এখানে ঠিক বিরোধী না-হ'লেও সমালোচক শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে আমার বক্তব্য বিশদ ক'রে ধরতে হবে। কিন্তু এ যাত্রা আমার লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই ছিল না। আমি তো সেখানে দিল্লীর খানদানি মুসলমানদের কাছে চোস্ত উর্দুতে আমার বয়ান দেবার জন্য দাঁড়াইনি, আমি দাঁড়িয়েছি আমার টুটাফুটা হিন্দিতে আমার মতামতের সপক্ষে দু-চার কথা বলতে। আর সে কাজটা আমি বেশ সফলভাবেই করেছিলাম। এই সভাতেই আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই যে, ভারতের রাষ্ট্রভাষা ব'লে স্বীকৃত হবার যোগ্যতা আছে একমাত্র হিন্দি-উর্দুর। আমি যদি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতাম তাহলে তার তেমন প্রভাব হ'ত না, মৌলানাও তাহলে হয়তো তর্ক-যুদ্ধে নামার জন্য তেমন তাগিদ অনুভব করতেন না, এবং যদি নামতেনই আমার হয়তো সাধ্যও হ'ত না তাঁকে ঠিকমতো জবাব দিতে।

যে নতুন আইডিয়াটা মাথায় আসছিল হিন্দি কিংবা উর্দুতে তাকে প্রকাশ করার মতো ঠিক শব্দটা মুখে আসছিল না ব'লে ভারি অস্বস্তি হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত নন্-কো-অপরেশন কথাটা জুটে গেল। সেই প্রথম সেই সভায় আমি নন্-কো-অপরেশন কথাটা ব্যবহার করলাম। মৌলনা মোহানীর বক্তৃতা শুনতে-শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভবপর কিংবা বাঞ্ছনীয় না-হয়, তাহলে যে সরকারের সঙ্গে একাধিক ব্যাপারে তিনি সহযোগ ক'রে চলেছেন, সেই সরকারের প্রতি বিরোধিতা কার্যকর ক'রে তোলবার কথাটা নিতান্তই কথার কথা হতে বাধ্য। বিনা-অস্ত্রে যদি সরকারের বিরোধিতা করতে হয়, তাহলে তার একমাত্র উপায় হ'ল তার সঙ্গে সমস্ত সহযোগ বন্ধ রাখা। এইভাবে 'নন্-কো-অপরেশন' কথাটা প্রথম আমার মুখ দিয়ে বের হয়। তখন এই কথাবার্তার নানারকম তাৎপর্য বিষয়ে আমার কোনো সম্যক্ ধারণা ছিল না। তাই এর খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ না-ক'রে আমি শুধু বলেছিলাম, "মুসলমানেরা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ভগবান না-করুন, তবে যদি যুদ্ধ-শান্তির শর্ত তাঁদের প্রতিকূলে যায়, তাঁরা যেন সরকারের সঙ্গে সকলরকম সহযোগিতা বাতিল ক'রে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ করায় মানুষের জন্মগত অধিকার, তার এই অধিকার থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। সরকারের দেওয়া খেতাব বা তক্‌মা রাখতে, কিংবা সরকারের তাঁবেতে নোক্‌রি করতে কেউ আমাদের বাধ্য করতে পারে না। খিলাফতের মতো মহৎ ব্যাপারে সরকার যদি আমাদের প্রতারণা করেন, তাহলে সেই সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকে না। সরকার যদি বিশ্বাসভঙ্গের অন্যায় করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে অসহযোগ করার অধিকার আমাদের অবশ্যই আছে।

কিন্তু 'নন্-কো-অপরেশন' কথাটা চালু হতে আরো বেশ কয়েকমাস লাগে। তখনকার মতো সে কথা সেই সম্মেলনের প্রতিবেদনের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে থাকে। সত্য বলতে কী, এই সম্মেলনের একমাস পরে আমি যখন অমৃতসরে আহূত কংগ্রেস-এর অধিবেশনে

'কো-অপরেশন' প্রস্তাবের সমর্থন করি, আমার আশা ছিল যে, খিলাফতের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার কখনো তঞ্চকতা করবেন না।

৩৭. অমৃতসর কংগ্রেস

পঞ্জাবে ফৌজি আইনের জমানায়, যেসব ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছিল, সেগুলি নামে-মাত্র ছিল আদালত। তুচ্ছ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এইসব আদালত থেকে শত-শত পঞ্জাবিকে কয়েদখানায় পোরা হয়েছিল। অনির্দিষ্টকালের জন্য এদের জেল হাজতে ধ'রে রাখার সাধ্য ছিল না পঞ্জাব সরকারের। তাদের সেই জঘন্য অবিচারের প্রতিবাদে দেশময় জনমত এমনই মুখর হয়ে উঠেছিল যে, বেশিদিন কয়েদ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল। কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হবার কিছুকাল আগেই অধিকাংশ বন্দী মুক্তিলাভ করে। অধিবেশন চালু থাকা অবস্থায় লালা হরকিষণলাল ও অপর কয়েকজন নেতা জেল থেকে ছাড়া পেলেন। আলী-ভায়েরাও জেল থেকে সোজা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন। ব্যাপার দেখে লোকের আনন্দ আর ধরে না। যে ব্যক্তি ওকালতি ব্যবসায় তাঁর বিরাট পসার ছেড়েছুড়ে, পঞ্জাবে থেকে সে দেশের সেবা করেছেন অজস্রভাবে, সেই মোতিলাল নেহরু হয়েছিলেন অমৃতসর অধিবেশনের সভাপতি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী।

এতকাল কংগ্রেস অধিবেশনে আমার কাজ ছিল হিন্দিতে বক্তৃতা দিয়ে ভারতের জাতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দির দাবিটুকু তুলে ধরা। এইসব বক্তৃতার বিষয় হ'ত ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় বহির্ভারতীয়দের সমস্যা। অমৃতসর অধিবেশনে আমায় এর অতিরিক্ত কিছু করতে হবে ব'লে আমি ভাবিনি। কিন্তু ইতিপূর্বে বারবার দেখেছি হঠাৎ কেমন ক'রে যেন দায়িত্বপূর্ণ কাজের বোঝা কোথা থেকে এসে আমার ঘাড়ে চাপে। এবারেও ঠিক সেইরকম ঘটল।

ভারতের শাসন-সংস্কার বিষয়ে সম্রাট-বাহাদুরের ঘোষণা তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। আমি যে আমি, আমার কাছেও এইসব প্রস্তাব সর্বতোভাবে সন্তোষজনক ব'লে মনে হয়নি। আর-সকলে যে পছন্দ করবে না সে তো জানা কথা। কিন্তু তখন-তখন আমার মনে হয়েছিল কিছু খুঁত, কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব মেনে নিলে ক্ষতি হবে না। সম্রাট-বাহাদুরের ঘোষিত প্রস্তাবগুলিতে ও তাদের ভাষায় লর্ড সিন্‌হার হাত আছে ব'লে আমার ধারণা হয়। সেই ধারণার ফলে আমার মনে একটি ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু লোকমান্য ও দেশবন্ধুর মতো অভিজ্ঞ ও শক্তিমান্ নেতারা মাথা নাড়লেন। পণ্ডিত মালব্যজী এপক্ষ-ওপক্ষ কোনোপক্ষেই যোগ দিলেন না।

কংগ্রেস শিবিরে পণ্ডিত মালব্যের জন্য যে ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল, অনুগ্রহ ক'রে তিনি সেই ঘরেই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-উৎসবের সময় তাঁর সহজ সরল জীবনযাত্রার একটা আভাস আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু এবার একই ঘরে তাঁর

সঙ্গে থাকতে পেরে, মালব্যজীর দিনচর্যার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমি প্রত্যহ দেখলাম। যা দেখেছিলাম, তা আমায় বিস্ময়-আনন্দে অভিভূত করেছিল। তাঁর সেই ঘর তো ঘর ছিল না, ছিল যেন গরীব অভাগাদের ধর্মশালা। এত লোকের ভিড় যে, ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অবধি হাঁটাচলা ঘোরাফেরা মুশকিল। যে কোনো সময় যে কোনো লোকের কাছে তাঁর এই ঘর ছিল অবারিতদ্বার। যদৃচ্ছা বিষয় নিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা আলাপ-আলোচনার অধিকার নিয়েই যেন লোকজন আসত, কেউ তাদের মানা করত না। এই ঘরের একটি কোণে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল আমার খাটিয়া।

কিন্তু মালব্যজীর দিনচর্যার বর্ণনা দিতে তো আমি বসিনি, সুতরাং আমায় মূল প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হচ্ছে।

একই ঘরে থাকার ফলে মালব্যজীর সঙ্গে প্রতিদিন আমার আলাপ-আলোচনার সুযোগ মিলত। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মতো গভীর স্নেহে ভিন্ন-ভিন্ন দলের ভিন্ন-ভিন্ন মতামতের কথা আমায় ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলতেন। এইসব আলাপ-আলোচনার ফলে আমার মনে হ'ল শাসন-সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব যখন কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থাপিত হবে, আমার চুপ ক'রে থাকা চলবে না। দু-চার কথা না-ব'লে উপায় নেই। তাছাড়াও আমার মনে হয়েছিল, যেহেতু পঞ্জাবের অন্যায়-অত্যাচার তদন্ত করায় ও সেই বিষয়ে রিপোর্ট প্রণয়নে অপর ব্যক্তিদের সঙ্গে কংগ্রেস আমাকেও ভার দিয়েছিলেন, সেই প্রারব্ধ দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার জন্য বাকি কিছু কাজ আমায় করতেই হবে। রিপোর্ট সম্পর্কে পঞ্জাব সরকারের সঙ্গে কিছু কথাবার্তার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ছিল খিলাফতের প্রশ্ন। তখন আমার ধারণা হয়েছিল, মিস্টার মন্টেগু ভারতের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ নিজে তো করবেনই না, অন্যেরা করতে চাইলেও তাদের ঠেকিয়ে রাখবেন। আলী-ভাইদের ও অন্যান্য বন্দীদের জেল থেকে মুক্তি পাওয়াটা আমার কাছে মনে হয়েছিল শুভ লক্ষণ। এইসব কারণে আমার মনে হয়, শাসন-সংস্কারের ঘোষণাকে বর্জনীয় ব'লে নিন্দা না-ক'রে বরং গ্রহণীয় ব'লে অভিনন্দিত করা উচিত এবং সেই মর্মে অমৃতসর অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। অপরপক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বমতে দৃঢ় থেকে বললেন যে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং সন্তোষজনক নয়, সুতরাং এ প্রস্তাব সরাসরি বর্জন করা যুক্তিযুক্ত। লোকমান্য এ বিষয়ে মোটামুটি নিরপেক্ষ থাকলেও স্থির করেছিলেন যে দেশবন্ধু যে প্রস্তাবের পক্ষে যাবেন, সেইদিকেই তিনি ঝুঁকবেন।

এইরকম বিচক্ষণ ও লোকপ্রিয় নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে, এই সম্ভাবনার চিন্তাও আমার কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। কিন্তু অন্যদিকে বিবেকের নির্দেশ ছিল স্পষ্ট। কংগ্রেস অধিবেশন থেকে স'রে পড়বার চেষ্টা করলাম। পণ্ডিত মালব্যজী ও মোতিলালজীকে বললাম, আমি যদি অধিবেশনের বাদবাকি কয়েকটা দিন গরহাজির থাকি তাহলে সবদিক থেকে ভালো হয়। তাহলে এরকম শ্রদ্ধাভাজন নেতাদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতা করার দায় থেকে আমি রেহাই পেতে পারি।

কিন্তু এই দুই বয়োজ্যেষ্ঠ আমার এই প্রস্তাব মেনে নিতে চাইলেন না। আমার এই

অভিপ্রায়ের কথা কী ক'রে যেন লালা হরকিষণলালের কানে পৌঁছয়। তিনি এসে ব'লে গেলেন, "এ হতেই পারে না। এরকম ঘটলে পঞ্জাবিদের মনে ভীষণ বাজবে।" লোকমান্য, দেশবন্ধু ও মিস্টার জিন্নার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি অনেক আলাপ-আলোচনা করলাম। কিন্তু তা থেকে কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষপর্যন্ত আমার মনের বেদনা মালব্যজীর কাছে খুলে বললাম, "আপস-রফার তো কোনো সম্ভবনা দেখছি না। প্রস্তাব যদি আমায় একান্তই পেশ করতে হয়, তা হ'লে তার পক্ষে ও বিপক্ষে কারা-কারা আছে, নির্ধারণ করার জন্য ভোট নিতে হয়। এখানে তো তার কোনো ব্যবস্থাই দেখছি না। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে এপর্যন্ত আমরা হাত তুলে ভোট নিয়েছি। তাতে ক'রে সদস্যের ও দর্শকের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। এরকম বিরাট জনসভায় ভোট গণনার কোনো ব্যবস্থাই আমাদের নেই। সুতরাং প্রস্তাবের সপক্ষ-বিপক্ষ নির্ধারণ করার জন্য আমি যদি ভোট নেবার কথা বলি, সে কথার কোনো মানে থাকবে না, কারণ ভোট নেবার সুযোগ-সুবিধা এখানে নেই। লালা হরকিষণলাল এগিয়ে এসে বললেন, তিনি যথাপ্রয়োজন ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। "যেদিন ভোট নেওয়া হবে, সেদিন আমরা দর্শকদের সভার মণ্ডপে আসতে দেব না। তার ভোট গণনার ভার আমি নিজেই নেব। কিন্তু আপনার গরহাজির থাকা কিছুতেই চলবে না।" আমি তাঁর এই শর্ত মেনে নিলাম। আমার প্রস্তাবের মুসাবিদা প্রস্তুত করলাম আর কম্পিতবক্ষে তা পেশ করবার জন্য স্বীকৃত হলাম। স্থির হ'ল, পণ্ডিত মালব্যজী ও মিস্টার জিন্না আমার প্রস্তাব সমর্থন করবেন। প্রস্তাবের সপক্ষে-বিপক্ষে যেসব বক্তৃতা হ'ল, তাদের মধ্যে মতভেদ যথেষ্ট থাকলেও কোনো তিক্ততা ছিল না, যা ছিল তা নিছক যুক্তির বিচার। তৎসত্ত্বেও লক্ষ করলাম, স্রেফ্ মতভেদটাই উপস্থিত সদস্যদের মনঃপূত হ'ল না। মতান্তর তাঁদের কাছে পীড়াদায়ক—সমস্ত যুক্তি-তর্কের শেষে তাঁরা যেন চাইছিলেন একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

মঞ্চে যখন একের পর এক বক্তৃতার পালা চলেছে, তখনো দেখা গেল মঞ্চেই উভয়পক্ষের মধ্যে একটা মিট্‌মাট্ ঘটাবার চেষ্টা চলেছে, নেতারা ঘন-ঘন পরস্পরের মধ্যে চিরকূট আদানপ্রদান ক'রে চলেছেন। আপস-রফার জন্য মালব্যজী নানাভাবে চেষ্টা করছিলেন। এই অবসরে জয়রামদাস আমার হাতে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব তুলে দিলেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ মিষ্ট কথায় আমায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, যেন ভোট দেবার উভয়সঙ্কট থেকে আমি সদস্যদের অব্যাহতি দিই। তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব আমার মনে ধরল। কোথা থেকে একটু আশার আলো দেখা যায়, সেই সন্ধানে মালব্যজী তখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখছেন। আমি তাঁকে বললাম যে জয়রামদাসের সংশোধনী প্রস্তাব হয়তো উভয়পক্ষেরই মনঃপূত হতে পারে। অতঃপর লোকমান্য প্রস্তাবটি দেখে বললেন, "সি. আর. দাস যদি মেনে নেন, আমার কোনো আপত্তি হবে না।" শেষপর্যন্ত দেশবন্ধু নরম হয়ে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের দিকে সমর্থনের ইঙ্গিত চেয়ে তাকালেন। মালব্যজীর অন্তরে আশার সঞ্চার হ'ল। সংশোধনী প্রস্তাবটি ছিনিয়ে নিয়ে, দেশবন্ধু সুনিশ্চিতভাবে 'হ্যাঁ' বলবার আগেই, তিনি জোরগলায় ব'লে উঠলেন, "সদস্য ভাইসকল, আপনারা শুনে খুশি হবেন, একটা

আপস-রফা হয়ে গেছে।" এরপর যা ঘটল তা কথায় বর্ণনা করা শক্ত। ঘন-ঘন করতালি-ধ্বনিতে সারা মণ্ডপ যেন ফেটে পড়ার দাখিল হ'ল, সমবেত সদস্যদের মলিন মুখ হাসিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল।

সেই সংশোধনী প্রস্তাবের বয়ানটুকু এখানে উদ্ধৃত করার বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখি না। আমি কেবল এইটুকুই বলতে চাই যে অমৃতসর অধিবেশনে আমি যে প্রস্তাব পেশ করেছিলাম, তা ছিল সত্যের সন্ধানে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষারই অঙ্গস্বরূপ।

এই আপস-রফার ফলে আমার দায়িত্ব বহুগুণিত হয়।

৩৮. কংগ্রেস-কর্মে দীক্ষা

কংগ্রেস অধিবেশনের বাক্-বিতণ্ডায় আমার প্রত্যক্ষ যোগদান ঘটে অমৃতসরে। বস্তুতপক্ষে বলা যায়, কংগ্রেসের রাজনীতিক কর্মে সামিল হওয়া সেই আমার প্রথম। ইতিপূর্বে আমি কংগ্রেস অধিবেশনে হাজিরা দিয়েছি নেহাৎ যেন বৎসরান্তে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য। এইসব অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে মনে-মনে ভেবেছি, আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন নগণ্য পদাতিক ছাড়া আর-কিছু নই, তার বেশি কোনো চিন্তা আমার মনে উদয় হয়নি।

অমৃতসরের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, দু-একটা ব্যাপারে আমার এমন কতকগুলি সহজ প্রবণতা আছে যা না-কি কংগ্রেসের কাজে লাগতে পারে। পঞ্জাব তদন্তের ব্যাপারে আমার কাজকর্ম দেখে লোকমান্য, দেশবন্ধু, পণ্ডিত মালব্যজী ও অন্য নেতারা যে খুশি হয়েছেন, সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। তাঁরা আমায় তাঁদের ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করতেন। দেখতাম, এইসব বৈঠকেই বিষয়-নির্বাচনী সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তাবাদি প্রস্তুত করা হ'ত। নেতাদের নিতান্ত বিশ্বাসভাজন লোক কিংবা তাঁদের সহায়কবর্গ ছাড়া, এসব ঘরোয়া বৈঠকে অন্য-কেউ বড়ো-একটা আমন্ত্রিত হ'ত না। অবশ্য ছলচাতুরী ক'রে কিছু-কিছু লোক যে বৈঠকে ঢুকে পড়ত না এমন নয়।

আগামী বছরে কংগ্রেসের দুটি করণীয় কাজ সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ছিল। অবশ্য এই দুটি কাজে আমার কিছু যোগ্যতাও থাকতে পারে ব'লে আমার মনে হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মারকরূপে একটা-কিছু গ'ড়ে তোলা ছিল এই দুটি কাজের একটি। অমৃতসর অধিবেশনে এ নিয়ে যখন একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, সদস্যদের মধ্যে সবিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। এই স্মারক প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ লাখ টাকার একটি তহবিল সংগৃহীত হবে ব'লে স্থির করা হয়। এই তহবিলের অন্যতম ট্রাস্টি বা ন্যাসিকরূপে আমায় নিযুক্ত করা হয়। দেশের কাজে চাঁদা তোলার ব্যাপারে পণ্ডিত মালব্যজীর বেশ-একটা সুনাম ছিল, তিনি ছিলেন এইধরনের ভিখিরিদের রাজা। অবশ্য এ কাজে আমার পারদর্শিতা কিছু কম ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে লোকের কাছে হাত পেতে-পেতে আমিও হাত পাকিয়েছিলাম। ভারতের

রাজন্য-সম্প্রদায়ের কাছে থেকে রাজকীয় হারে চাঁদা তোলার জাদুমন্ত্রটুকু একমাত্র মালব্যজীই জানতেন। সেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি তেমন আমার সাধ্যও ছিল না। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মারণিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজারাজড়ার কাছে হাত পেতে যে কোনো লাভ হবে না—সে কথা আমি জানতাম। সূচনাতেই মনে হয়েছিল দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি ব'য়ে বেড়াবার কাজটা হয়তো আমার ঘাড়েই চাপবে। শেষপর্যন্ত হ'লও তাই। বোম্বাইয়ের বদান্য নাগরিকেরা দরাজ হাতে টাকা দিলেন! স্মারক ট্রাস্ট-এর নামে আজ বেশ-একটা মোটা টাকা ব্যাঙ্ক-এ জমা প'ড়ে আছে। দেশের সামনে আজ একটি যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হ'ল এই : যে ভূমি হিন্দু, মুসলমান ও শিখের মিলিত রক্তধারায় পবিত্র হয়েছিল, সেই ভূমিতে কীধরনের স্মারক নির্মাণ করলে সবদিক থেকে সুষ্ঠু হয়। এই তিন সম্প্রদায় কোথায় প্রীতি ও সৌহার্দের সূত্রে মিলিত থাকবে, তা না-হয়ে আজ দেখা যাচ্ছে তারা পরস্পরকে হানাহানি করতে উদ্যত। তার ফলে দেশ বুঝে উঠতে পারছে না, স্মৃতি-তহবিলের গচ্ছিত টাকার কীভাবে সদুপযোগ করা চলে।

আমার অপর ক্ষমতাটা ছিল মুসাবিদা-রচনার কুশলতা। বহুকালের অভ্যাসের ফলে অল্পকথায় বক্তব্য প্রকাশ করায় আমি যে নিপুণতা অর্জন করেছিলাম, সে ব্যাপারটা কংগ্রেস নেতাদের নজর এড়িয়ে যায়নি। যে বিধান অনুসারে তখনকার দিনে কংগ্রেসের কাজকারবার চলত, তা ছিল গোখলের উত্তরাধিকার। কংগ্রেসের কাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়মকানুন বেঁধে দেন। এসব নিয়ম রচনার মজাদার কাহিনী আমি স্বয়ং গোখলের মুখে শুনেছিলাম। কিন্তু ওই সামান্য কয়েকটি নিয়মের ধাঁচার মধ্যে কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান কাজের বহর আঁটানো যে সম্ভবপর হচ্ছে না, এ কথা সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন। সমস্যাটা প্রতি বছর কংগ্রেস অধিবেশনে আলোচিত হ'ত। দুটি বৎসরান্তিক অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে মামুলি কাজ চালিয়ে যাবার মতো কংগ্রেসের কোনো সংস্থা ছিল না, জরুরি বিষয় উপস্থিত হ'লে তার সমুচিত ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা। নিয়ম অনুসারে তিনজন সেক্রেটারি থাকবার কথা। কিন্তু আসলে সকর্মক সেক্রেটারি ছিলেন একজনই এবং তিনিও কাজ করতেন তাঁর অবসর সময়ে। একাহাতে তিনি কংগ্রেসের দফতর সামলাবেন, ভবিষ্যতের কার্যসূচি ঠিক করবেন, পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলিতে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির দায় সমালাবেন, এরকমটা তো প্রত্যাশা করা যায়-না। অমৃতসর অধিবেশনে সবাই বুঝতে পারলেন, পরের বছর কংগ্রেস সংবিধানের প্রশ্ন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করবে। কংগ্রেসের সাধারণ সভা জনসভা-বিশেষ, সেখানে দেশ ও দশের সমস্যার সুষ্ঠু আলোচনা হবে, তেমন আশা দুরাশা। কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যার তখন কোনো বাঁধাধরা সীমা ছিল না, প্রদেশ কংগ্রেসগুলি যার যেমন খুশি প্রতিনিধি নির্বাচন ক'রে পাঠাত। এই বিশৃঙ্খলার নিরসন হওয়া নিতান্তই দরকার ব'লে সকলেই বুঝতে পারলেন। আমি কংগ্রেসের সংবিধান রচনার দায়িত্ব স্বীকার করেছিলাম একটি বিশেষ শর্তে। লক্ষ করেছিলাম, দেশের জনগণের ওপর সেসময় সর্বাধিক প্রভাব ছিল দু-জন নেতার। তাঁরা হলেন লোকমান্য ও দেশবন্ধু। আমি অনুরোধ জানাই যে জনমতের প্রতিনিধিরূপে তাঁরা যেন আমার সঙ্গে সংবিধান-সংস্কার-সমিতিতে

যুক্ত থাকেন। আমি অবশ্য পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম, এই দু-জনের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সংবিধান রচনার কাজে হাত লাগানো সম্ভবপর হবে না। সেইজন্য প্রস্তাব করি, এই দুইজন নেতার বিশ্বাসভাজন দু-জন ব্যক্তি যেন সেই কমিটিতে আমার সঙ্গে থাকেন এবং মোট সদস্যসংখ্যা যেন তিনের বেশি না-হয়। লোকমান্য ও দেশবন্ধু আমার প্রস্তাবে সম্মতি দেন এবং যথাক্রমে শ্রীযুক্ত কেলকর ও শ্রীযুক্ত আই. বি. সেনকে তাঁদের প্রতিনিধিস্বরূপ নির্বাচন করেন। একটি দিনের জন্যও এই কমিটির তিনজন সদস্য একত্র হবার সুযোগ পাননি। কিন্তু চিঠিপত্রে আমরা পরস্পরের সঙ্গে মতামত আদানপ্রদান করতাম এবং শেষপর্যন্ত কংগ্রেসের সামনে আমরা একটি সর্বসম্মত রিপোর্ট পেশ করি। এই সংবিধানের কথা যখন ভাবি, আমার মনে কিঞ্চিৎ গর্বের সঞ্চার যে না-হয়, এমন নয়। আমার দৃঢ় ধারণা, আমরা যদি এই সংবিধান-মাফিক কাজ ক'রে যেতে পারি, সেই কাজের সূত্রেই স্বরাজ লাভ করা যাবে। বলা যেতে পারে যে এই সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণের সূত্রে কংগ্রেসের রাজনীতিক কর্মের ক্ষেত্রে আমার সত্যকার প্রথম পদক্ষেপের সূচনা।

৩৯. খাদির জন্মকথা

ভারতের ক্রমবর্ধমান দৈন্যদশা থেকে উদ্ধারলাভের উপায় হিসেবে আমি যখন আমার *হিন্দ্ স্বরাজ* বইয়ে হাতে-কাটা সুতো ও হাতে-বোনা কাপড়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, তখনো পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ অবধি, তাঁত বা চরকা আমি স্বচক্ষে দেখেছি ব'লে আমার মনে পড়ে না। আমার সেই বইয়ে আমি স্বতঃসিদ্ধভাবে ধ'রে নিয়েছিলাম, যেদিন এ দেশের জনগণ দারিদ্রের জাঁতাকলে পিষ্ট হবার দুরদৃষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করবে, সেদিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯১৫-য় আমি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে আসি, তখনো চরকা যে কী জিনিস নিজের চোখে দেখিনি। সাবরমতীতে সত্যাগ্রহ আশ্রম পত্তন হবার পর সেখানে আমরা কয়েকটি তাঁত বসাই। তাঁত বসাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা একটা মুশকিলে পড়লাম। আমরা সকলেই ছিলাম তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর—কেউ পেশাদার, কেউ-বা ব্যবসাদার। আমাদের মধ্যে একজনও কারিগর ছিল না। তাঁতে বসবার আগে তাঁত চালানোর শিক্ষা আমাদের নিতে হবে একজন অভিজ্ঞ তাঁতির কাছে। পালনপুর থেকে একজন সুদক্ষ তাঁতিকে খুঁজেপেতে তো আনা হ'ল। কিন্তু দেখা গেল, সে যেন কিছুটা রেখে কিছুটা ঢেকে শেখাতে চায়, সবটুকু বিদ্যা হুট্ ক'রে হস্তান্তর করতে চায় না। কিন্তু মগনলাল গান্ধী ছিল নাছোড়বান্দা মানুষ, একটা কাজ হাতে নিলে সহজে ছাড়ত না। তাছাড়া যন্ত্রাদি চালানোর ব্যাপারে তার একটা সহজ দক্ষতা ছিল। অল্পসময়ের মধ্যে বুনাইয়ের কাজের সমস্ত খুঁটিনাটি সে আয়ত্ত ক'রে নিল। তারপর তার দেখাদেখি আশ্রমের বেশ কয়েকজন লোক বুনাইয়ের কাজে পোক্ত হয়ে উঠল।

আমাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের ব্যবহারের সমস্ত কাপড়চোপড় আমরা নিজের হাতে

তৈরি ক'রে নেব। অগৌণে মিল্-এর তৈরি কাপড় বর্জন ক'রে, আমরা সাব্যস্ত করলাম যে আশ্রমের লোকেরা কেবল দেশী সুতোর হাতে-বোনা কাপড় পরিধান করবে। এই সিদ্ধান্ত নেবার ফলে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধি নানাভাবে বিস্তার লাভ করে। প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পাই, তাঁতিদের জীবনযাত্রার কথা, গড়পড়তা তাদের উৎপাদনের কথা, সুতো যোগাড় করতে তাদের কীরকম বেগ পেতে হয়, কীভাবে মহাজন ও দোকানির হাতে তাদের পদে-পদে ঠকতে হয় এবং কেমন ক'রে তাদের ধারকর্জের বোঝা দিন-দিন ভারি হয়, এইসমস্ত নানা প্রসঙ্গ। নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার মতো সবটুকু কাপড় আমরা তখন-তখনই বুঝে উঠতে পারব, আমাদের তেমন অবস্থা তখনো হয়নি। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আমরা স্থির করেছিলাম, নিজেরা যেটুকু বুনে না-উঠতে পারব, তা আমরা তাঁতিদের দিয়ে বুনিয়ে দেব। কিন্তু দেশী মিল্-এর সুতোর তাঁতে বোনা কাপড় সেসময় সহজে মিলত না, না কাপড়ের দোকানে না তাঁতিদের বাড়ি থেকে। দেশী মিল্-এ তখন মিহি সুতো কাটা হ'ত না ব'লে, মিহি সুতোর সমস্ত কাপড় তাঁতিরা বুনত বিদেশ থেকে আমদানি করা সুতো থেকে। আজকের দিনেও দেশী মিল্ থেকে কাটা মিহি সুতোর উৎপাদন খুবই সামান্য। অধিকতর সূক্ষ্ম তারের সুতো তো তারা আদপেই কাটতে পারে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর কয়েকঘর তাঁতিকে রাজি করানো গেল স্বদেশী সুতোয় আমাদের জন্য কাপড় বুনতে। তারা এই শর্তে রাজি হ'ল যে স্বদেশী সুতো দিয়ে তারা যে কাপড় বুনবে, তার সবটুকু আশ্রম থেকে আমরা কিনে নেব। এইভাবে তৈরি স্বদেশী কাপড় আমরা নিজেরা পরতাম, বন্ধুবান্ধবদেরও পরতে বলতাম ; অর্থাৎ আমরা যেন স্বেচ্ছায় ও বিনা-কমিশনে ভারতীয় সুতাকলগুলির এজেন্ট হলাম। এইপ্রকারে আমরা সুতাকলগুলির সংস্পর্শে আসি এবং তাদের কাজকর্ম কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, কী-কী অসুবিধা তাদের ভোগ করতে হয়, এইসব বিষয়ে কিছু-কিছু তথ্য জানতে পারি। দেখা গেল, মিল্গুলিতে যত সুতো কাটা হয়, পারতপক্ষে তার অধিকাংশ সুতো দিয়ে তারা নিজেরাই কাপড় বুনতে চায়। তাঁতিদের সুতো সরবরাহ ক'রে তারা যে সহযোগ করে তা স্বেচ্ছাক্রমে নয়, নিতান্তই দায়ে প'ড়ে ও অন্য উপায় না-থাকায় সাময়িক ব্যবস্থামতে তারা তাঁতিদের কাছে সুতো বেচে। এইসমস্ত দেখেশুনে আমরা নিজেদের হাতে সুতো কাটার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, নিজেদের সুতো নিজেরা যতদিন না-কাটব, মিলের মুখ তাকিয়ে, তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে, আমাদের থাকতে হবে। ভারতীয় সুতোকাট্নি মিল্গুলির দালাল হয়ে আমরা দেশের প্রকৃত সেবা করতে পারব না, এ আমরা ঠিকই বুঝেছিলাম।

পুনরায় আমাদের নানারকম অন্তরায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হ'ল। না-পারলাম চরকার যোগাড় করতে, না কাটুনীর। চরকা যদি-বা যোগাড় হ'ল, হাপিত্যেশ ক'রে খুঁজতে হ'ল এমন কাটুনীর যে না-কি আমাদের সুতো কাটায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারে। তাঁতে বোনবার জন্য নলীতে-মাকুতে সুতো জড়াবার চরকি ছিল আমাদের আশ্রমে। একটু হেরফের ক'রে চরকিকেই যে চাকায় রূপান্তর করা চলে, সে কথা আমাদের জানা ছিল না। একদিন কালিদাস ঝাভেরি এসে বললেন তিনি এক মহিলা কাটুনীর সন্ধান পেয়েছেন এবং সে না-কি দেখাতে

পারে, কীভাবে সুতো কাটতে হয়। নতুন-নতুন কাজ ঝট্ ক'রে আয়ত্ত করতে পারে, এইরকম একজন ব্যক্তিকে আশ্রম থেকে পাঠানো গেল। কিন্তু সুতো কাটার কৌশলটুকু আয়ত্ত করতে না-পেরে তিনি ফিরে এলেন বিফলমনোরথ হয়ে।

এইভাবে যতই সময় বৃথা ব'য়ে যেতে লাগল, আমার সহিষ্ণুতার বাঁধ ততই যেন ভেঙে যাবার দাখিল হ'ল। হাতে সুতোকাটার ব্যাপারে খবরাখবর রাখতে পারেন, এরকম মনে হ'লেই আশ্রমে রবাহূত অতিথি-সজ্জনদেরও আমি এ বিষয়ে প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতাম। কিন্তু সুতোকাটার ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই মেয়েলি, এবং কাটুনীর কাজ একপ্রকার লোপ পাওয়ার দাখিল হয়েছিল ব'লে, দেশের কোন্ প্রত্যন্ত কোণে এক-আধজন কাটুনী তখনো টিকে আছে, সে খবর দিতে পারত মেয়েদের মধ্যে থেকেই কোনো-একজন।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি শিক্ষা-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য বন্ধুরা আমায় ভারোচে নিয়ে যান। সেই শহরেই আমি অদ্ভুতকর্মী গঙ্গাবেন মজমুদারের সাক্ষাৎ লাভ করি। তিনি ছিলেন বিধবা, কিন্তু কাজেকর্মে তাঁর যে উৎসাহ ছিল, তেমনটা সচরাচর দেখা যায় না। লেখাপড়া বলতে আমরা যা বুঝি, সেই নিরিখে তিনি হয়তো স্বল্পশিক্ষিতাই ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে সৎসাহস ও প্রখর সাধারণজ্ঞান দেখেছিলাম, তেমনটি শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যেও দুর্লভ। ছুঁৎমার্গের অভিশাপ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। কারো পরোয়া না-রেখে প্রকাশ্যে তিনি অন্ত্যজদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ও তাদের সেবাযত্ন করতেন। কিছু সঙ্গতি তাঁর ছিল, চাহিদাও ছিল কম। তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য ছিল পাকাপোক্ত, কোনো সঙ্গী-সাথীর অপেক্ষা না-রেখে যদৃচ্ছ তিনি ঘুরে বেড়াতেন। ঘোড়ায় চড়তেও তাঁর কোনো সঙ্কোচ ছিল না। গোধ্রা সম্মেলনে তাঁর নিকট-সংস্পর্শে আসার পর, কথায়-কথায় তাঁকে চরকা বিষয়ে আমার গভীর দুঃখের কথা বলি। তিনি আমার এই দুশ্চিন্তার বোঝা হাল্কা করার জন্য কথা দেন যে যতদিন-না চরকার দেখা মেলে, তিনি অক্লান্ত উদ্‌যোগে অবিরাম খোঁজ ক'রে চলবেন।

৪০. খোঁজ পাওয়া গেল

গুজরাটের তামাম তল্লাট টুঁড়ে বেড়াবার পর, ব্‌রোদা রাজ্যের বিজাপুরে গঙ্গা বেন চরকার দেখা পান। সেখানে অনেকের ঘরেই চরকা ছিল, অনাবশ্যক জঞ্জালের সঙ্গে টঙে তোলা অবস্থায়। চরকার মালিকানরা গঙ্গা বেন-কে বলে যে কেউ যদি নিয়মিত তুলোর পাঁজের যোগান দেয় ও হাতে-কাটা সুতো কিনে দিতে রাজি থাকে তাহলে তারাও আবার চরকায় সুতো কাটতে রাজি। গঙ্গা বেন এই আনন্দ-সংবাদ আমার গোচরে আনলেন। তুলোর পাঁজ যোগান দেওয়া বেশ কঠিন কাজ হবে ব'লে মনে হ'ল। আমার এই মুশকিলের কথা উমর সোবানীকে বলায়, তিনি তদন্তে তার আসান ঘটাবেন বললেন, বললেন যে তাঁর নিজের সুতোকল থেকে তিনি পর্যাপ্ত পাঁজের যোগান দেবেন। উমর সোবানীর কাছ থেকে পাওয়া

পাঁজ আমি গঙ্গা বেন-কে পাঠিয়ে দিতে লাগলাম। এবার হাতে-কাটা সুতো এমন দ্রুতহারে হাতে আসতে লাগল যে তার বুনাই নিয়ে বেশ ফাঁপরে পড়লাম। সামাল দেওয়া শক্ত হয়ে উঠল।

উমর সোবানীর বদ্যান্যতার তুলনা হয় না, কিন্তু তাঁর সেই বদান্যতার সুযোগ তো চিরকাল নেওয়া চলে না। ক্রমাগত তিনি পাঁজ সরবরাহ ক'রে চললেন দেখে আমার কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগল। তাছাড়া, মিল্-এর পাঁজে সুতো কাটার ব্যাপারটার মধ্যেও আমি গোড়ায় একটা গলদের আভাস পেলাম। মনে হ'ল, মিল্-এর পাঁজে যদি আপত্তি না-থাকে তাহলে মিল্-এর সুতোর কী দোষ? সেখানে যখন চরকায় সুতো কাটা হ'ত, তখন তো পাঁজ যোগান দেবার কোনো মিল্ ছিল না। তাহলে তো তারা নিশ্চয় নিজের পাঁজ নিজেরাই তৈরি ক'রে নিত। এইসব চিন্তা মনে উদিত হওয়ায়, গঙ্গা বেন-কে লিখলাম পাঁজ সরবরাহ করতে পারে এমন ধুনুরী তিনি যেন সন্ধান ক'রে দেখেন। আত্মপ্রত্যয়ে নির্ভরশীল হয়ে তিনি সে ভার নিলেন। পাঁজ তৈরি করার মতো তুলো ধুনতে রাজি এরকম একটি ধুনুরীকে তিনি কাজে বহাল করলেন। মাসে পঁয়ত্রিশ কিংবা তার চেয়েও বেশি একটা তলব সে দাবি ক'রে বসল। টাকার প্রশ্ন তখন আমার কাছে অবান্তর। গঙ্গা বেন কয়েকটি বালককে ধুনাই করা তুলে থেকে পাঁজ তৈরি করার কায়দা শিখিয়ে দেন। তুলো ভিক্ষা ক'রে আমি বোম্বাইয়ে চিঠি লিখলাম, শ্রীযুক্ত যশোবন্তপ্রসাদ দেশাই তুলো যোগান দেবার ভার নিলেন। গঙ্গা বেন-এর কাজ আশাতিরিক্তভাবে প্রসারলাভ করতে লাগল। বিজাপুরের হাতে-কাটা সুতো দিয়ে, তিনি বিজাপুরের তাঁতিদের দিয়েই কাপড় বুনাই শুরু করলেন। অল্পকালের মধ্যে বিজাপুর খাদির বেশ নাম হ'ল।

বিজাপুরে যখন এসব কাণ্ড ঘটছে, আশ্রমেও চরকার কদর বেশ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। যান্ত্রিক ব্যাপারে তাঁর আশ্চর্য উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রয়োগ ক'রে মগনলাল গান্ধী চরকার অনেক উন্নতিসাধন করলেন। আশ্রমেই চরকা ও তার আনুষাঙ্গিক সমস্ত-কিছু তৈরি হতে লাগল। আশ্রমে তৈরি প্রথম খাদি থানের পড়তা পড়েছিল গজ-প্রতি সতেরো আনা। সেই মোটা খাদি সেই চড়া দরে কোনো-কোনো বন্ধুকে কিনে নিতে বলি। তাঁরা খুশিমনেই কিনে নিয়েছিলেন।

অসুখ হওয়ার ফলে বোম্বাইয়ে আমায় শয্যা নিতে হয়। ওই অবস্থাতেও আমি সর্বদা চরকার বিষয়ে খোঁজখবর করতাম। সেখানে দু-জন কাটুনীর সন্ধান মেলে। এক সের অথবা আটাশ তোলা সুতো কাটার মজুরি হিসেবে তারা এক টাকা দাবি করে। খাদির গণিতে তখন আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। তাছাড়া হাতে-কাটা সুতোর জন্য তখন আমি যে কোনো দাম দিতেই প্রস্তুত। বোম্বাইয়ে যে হারে এরা মজুরি নিচ্ছিল, বিজাপুরের হারের সঙ্গে তার তুলনা করতে গিয়ে দেখি, আমায় এরা ঠকাচ্ছে। সের প্রতি এক টাকার কমে তারা কিছুতেই রাজি হ'ল না ব'লে, কাটুনী দু-জনকে বিদায় করতে হ'ল। কিন্তু তাদের দিয়ে আমার একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। শ্রীমতী অবন্তিকাবাঈ, শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের বিধবা মা, শ্রীমতী রামীবাঈ কামদার ও শ্রীমতী বসুমতী বেন তাঁদের কাছে সুতো কাটা শিখে নিয়েছিলেন।

আমার রোগীর ঘর চরকার গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল। আমায় নিরাময় ক'রে তুলতে এই গুঞ্জন বেশ কার্যকর হয়েছিল এ কথা যদি বলি, তাহলে তা নিতান্ত বাড়িয়ে বলা হবে না। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে শরীর অপেক্ষা মনের ওপরেই প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বেশি। প্রকারান্তরে এ থেকেই তো বেশ বোঝা যায়, মানুষের শরীরের ওপর মনের ক্রিয়া কতখানি শক্তিশালী। চরকায় আমিও হাত লাগিয়েছিলাম, কিন্তু তখন সুতো কাটায় এমন-কিছু অগ্রসর হতে পারিনি।

বোম্বাইয়েও হাতে তৈরি পাঁজ সংগ্রহের সমস্যা দেখা গিয়েছিল। শ্রীযুক্ত বেরাশঙ্করের বাড়ির পাশ দিয়ে দৈনিক এক ধুনাইকর তার পিঞ্জনের তাঁত বাজাতে-বাজাতে চ'লে যেত। একদিন তাকে ডেকে তার কাছ থেকে আমি জানলাম যে সে তোষকে পোরবার জন্যই কেবল তুলো ধোনে। তাকে বলায় সে কাটাইয়ের জন্য তুলো ধুনতে রাজি হ'ল, কিন্তু মজুরি চাইল বেশ বেশি। আমি তা-ই দিতে রাজি হয়ে গেলাম। ওই পাঁজে-কাটা সুতো আমি জনকয়েক বৈষ্ণব-বন্ধুর কাছে বিক্রি করেছিলাম। তাঁরা সেই সুতো দিয়ে পবিত্র একাদশী পালনের জন্য মালা তৈরি করেছিলেন। শ্রীশিবজী বোম্বাইয়ে একটি সুতো-কাটার ক্লাস খোলেন। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বেশ মোটারকমের খরচ হয়েছিল। দেশপ্রেমিক, দেশভক্ত ও খাদিতে আস্থাবান্ বন্ধুরা খুশি হয়ে সেসব পয়সা জুগিয়েছিলেন। আমি সবিনয়ে বলব, তাদের সে অর্থ বৃথা অপব্যয় হয়নি। এখন পোশাকে-পরিচ্ছদে সম্পূর্ণ খাদি ধারণ করার জন্য আমি অধীর হয়ে উঠি। আমি তখনো পর্যন্ত ভারতীয় মিল্-এর ধুতি পরতাম। আশ্রমে ও বিজাপুরে যে মোটা খাদি বুনাই হ'ত, তার বহর হ'ত মাত্র ত্রিশ ইঞ্চি। গঙ্গা বেন-কে নোটিশ দিলাম একমাসের মধ্যে তিনি যদি আমার জন্য পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বহরের ধুতি বুনিয়ে না-দিতে পারেন, বাধ্য হয়ে আমায় সেই মোটা খাদির হ্রস্ব কাপড়ই পরতে হবে। আমার কাছ থেকে এই চরম কথা শুনে গঙ্গা বেন তো প্রমাদ গণলেন। কিন্তু দ'মে যাবার পাত্রী তিনি নন। আমার দাবির জবাবে, একমাসের মেয়াদের মধ্যেই তিনি আমায় এক জোড়া পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ধুতি পাঠিয়ে একটা অস্বস্তিকর সম্ভাবনা থেকে আমায় রেহাই দিলেন।

ঠিক এইরকম সময়ে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীদাস লাঠি অঞ্চল থেকে এক তাঁতি-দম্পতিকে আশ্রমে নিয়ে আসেন, এঁরা হলেন শ্রীযুক্ত রামজী ও তাঁর স্ত্রী গঙ্গা বেন। খাদিব প্রচারে এই দু-জনের দান যৎসামান্য নয়। গুজরাট ও গুজরাটের বাইরের অনেককে এঁরা হাতে-কাটা সুতো বোনবার কৌশল শিখিয়েছিলেন। গঙ্গা বেন যখন তাঁতে বসতেন, মনে উদ্দীপনার সঞ্চার হ'ত। এই নিরক্ষর অথচ আত্মপ্রত্যয়ী ভগ্নীটি যখন তাঁত চালান, তাঁর কাজে এমনই তদ্‌গত হয়ে যান যে চারিদিকের কোনো ব্যাপারে তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। তাঁত তিনি এমনি ভালোবাসেন যে তাকে দেখে-দেখে আঁখি যেন আর ফিরতে চায় না।

৪১. একটি অপূর্ণ আলাপ

খাদি আন্দোলনকে তখন বলা হ'ত স্বদেশী আন্দোলন। প্রথম থেকেই এই আন্দোলন নিয়ে মিল্-এর মালিক সম্প্রদায় নানারকম সমালোচনা করতেন। মিল্-মালিক হিসেবে উমর সোবানী ছিলেন করিৎকর্মা মানুষ। তিনি এ বিষয়ে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমায় অনেক-কিছু বলতেন। আন্দোলন সম্পর্কে অপরাপর মিল্-মালিকদের মতামতও আমায় জানাতেন। এঁদের একজনের যুক্তি তাঁর মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আমি যেন এই ব্যক্তিটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি, এ নিয়ে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই। সোবানীর মধ্যস্থতায় আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। আলোচনার সূত্রপাত করলেন মিল্-এর মালিক ভদ্রলোক। তিনি বললেন : "ইতিপূর্বেও যে স্বদেশী আন্দোলন হয়ে গেছে, সে আপনি নিশ্চয় জানেন?" আমি জবাবে বললাম, "সে আমি জানি বৈ-কি।"

"বঙ্গভঙ্গের সময় স্বদেশী আন্দোলনের ধুয়ো ধ'রে আমরা মিল্-মালিকরা খুব একচোট নিজেদের সুবিধা ক'রে নিয়েছিলাম, সে আপনার জানা থাকবে। আন্দোলন যখন চরমে উঠল, আমরা কাপড়ের দাম চড়িয়ে দিয়েছিলাম, এবং তার চেয়েও খারাপ কাজ করিনি যে এমন নয়।"

"সেসব কথা কিছু-কিছু শুনেছি, শুনে খারাপও লেগেছে।"

"আপনার খারাপ লেগে থাকতে পারে, কিন্তু খারাপ লাগার সঙ্গত কারণ কিছু ছিল ব'লে আমার তো মনে হয় না। আমরা পরহিতব্রত নিয়ে তো ব্যবসা ফাঁদি না। ব্যবসা করি মুনাফার খাতিরে, কারবারে যাদের শেয়ার আছে, তাদের খুশি রাখতে। মালের দাম নামে-ওঠে লোকের চাহিদা-মাফিক। চাহিদা-মোতাবেক যোগান দেবার সনাতন নিয়ম কে পাল্টাতে পারে বলুন! আন্দোলনের ফলে স্বদেশী কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে-সঙ্গে দামও বৃদ্ধি পাবে, এই সহজ কথাটা বাঙালিদের বোঝা উচিত ছিল।"

আমি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললাম, "বাঙালিদের স্বভাবটাই আমার মতো বিশ্বাসপ্রবণ। আপনাদের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে তারা ভেবেছিল স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে মিল্-মালিকেরা দেশদ্রোহিতা করবে না। দেশের সঙ্কট-মুহূর্তে দেশকে ঠকাবে না। জোচ্চুরি ক'রে স্বদেশীয় নামে বিদেশী কাপড় চালাতে চাইবে না। মিল্-মালিকেরা এতখানি জঘন্য কাজ করতে পারে, এ তারা ভাবতেও পারেনি।"

শেঠজী বললেন, "আমি তো জানি আপনিও একজন বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ। জানি ব'লেই আমার কাছে ডেকে এনে আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। আমার উদ্দেশ্যটা আর-কিছু নয়, আপনাকে আগের থেকে সাবধান ক'রে দেওয়া, পাছে আপনিও সরলহৃদয় বাঙালিদের মতো মন-গড়া ভুলের ফাঁদে পা দিয়ে বসেন।"

এই ব'লে শেঠজী ইশারায় তাঁর গোমস্তাকে ডেকে মিল্-এ তৈরি কিছু কাপড়ের নমুনা আমার হাতে দিতে বললেন। নমুনার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমায় বললেন : "মালটা

একবার দেখে রাখুন। এইধরনের জিনিস আমাদের মিল্ থেকে নতুন তৈরি হচ্ছে। এ মালের বেজায় চাহিদা। ছাঁট তুলো থেকে বানানো তো, তাই দামেও শস্তা। দূর-দূর জায়গায়—এমন-কি হিমালয়ের পাদদেশেও—আমাদের এ মাল সরবরাহ হয়। আমাদের দালালরা রয়েছে সমস্ত দেশ জুড়ে—এমনসব জায়গাতেও আছে যেখানে আপনার বাণী তো দূরের কথা, আপনার এজেন্টরাও কোনোকালে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং বুঝতেই পারেন, আপনাদের মতো এজেন্ট ছাড়াও আমাদের ব্যবসা ঠিকই চলবে। তাছাড়া, যে পরিমাণ কাপড় আমাদের দরকার, সে অনুপাতে এ দেশে কাপড় তৈরি হয় অনেক কম, সে আপনার নিশ্চয় জানা আছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, স্বদেশীয় প্রশ্নটা আসলে উৎপাদনেরই প্রশ্ন। আমরা উৎপাদন বাড়িয়ে যদি চাহিদা-মাফিক যোগান দিতে পারি, উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে পারি, বিদেশী বস্ত্রের আমদানি আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমি বলি কী, আপনার এই আন্দোলনের মোড়টুকু ঘুরিয়ে দিয়ে, নতুন-নতুন মিল্ পত্তন করার দিকে মন দিন। আমাদের দেশে স্বদেশী মালের চাহিদা বাড়াবার জন্য প্রচারের দরকার নেই, দরকার উৎপাদন বাড়ানো।"

আমি বললাম, "যদি উৎপাদন বাড়াবার দিকেই নজর দিয়ে থাকি, তাহলে তো নিশ্চয় আপনি আমাদের কাজটাকে ভালো কাজই বলবেন?"

একটু থতমত খেয়ে তিনি বললেন, "সে কীরকম? তবে বুঝি আপনারা নতুন-নতুন কাপড়ের কল খোলার ব্যাপারটা সমর্থন করার কথা ভাবছেন? তা যদি ভেবে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনাদের সাধুবাদ দেব।"

আমি আমার কথাটা বিশদ করার জন্য বললাম, "না, আমরা ঠিক তেমনটা করছি না। চরকা-শিল্পটাকে আবার একবার চাঙ্গা ক'রে তুলতে চাইছি।"

এবার তো শেঠজী অথৈ জলে পড়লেন, জিজ্ঞেস করলেন, "সেটা কী ব্যাপার?"

চরকা যে কী বস্তু এবং কত খোঁজাখুঁজি করার পর আমি চরকার সন্ধান পেয়েছি, সেইসব গল্প করবার পর শেঠজীকে আমি বলি : "দেখুন, মিল্-এর একপ্রকার দালালগিরি করা আমার পক্ষে যে কোনো কাজের কথা নয়, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ আপনার সঙ্গে একমত। তাতে দেশের পক্ষে লাভ না-হয়ে উল্‌টে বরঞ্চ লোকসানই হবে। আমাদের মিল্‌গুলির খদ্দের কমবে, এরকম সম্ভাবনা আমি আপাতত তো দেখি না, আরো বহুকাল ধ'রে তাদের চাহিদা মিটিয়ে যেতে হবে। আমার কাজ হবে হাতে-কাটা সুতো দিয়ে তাঁতে-বোনা খাদি উৎপাদন করা ও সেই খাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। তাই খাদি উৎপাদনের দিকে আমার সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিয়েছি। এইধরনের স্বদেশী আমার কাছে ব্রত-বিশেষ, কারণ এর মধ্যে দিয়ে আমি আধা-বেকার আধপেটা ভারতের স্ত্রীজাতিকে খেটে খাবার উপায় বাৎলাতে পারব। আমার বাসনা, দেশের এইসব তাবৎ স্ত্রীলোক যেন সুতো কাটে, এবং সেই সুতোয় বোনা খাদি-কাপড়ে সারা দেশ তার লজ্জানিবারণ করার ব্যবস্থা করে। বর্তমানে আমার এই আন্দোলন তো সবে শুরু হয়েছে, জানি না, এ কাজ কতটা সফল হবে। তবে এ কাজে আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ফলাফল যা-ই হোক্-না-কেন, এ থেকে তো দেশের কোনো

ক্ষতি হবে না। অপরপক্ষে এই আন্দোলনের ফলে দেশে কাপড়ের উৎপাদন যদি যৎসামান্যও বৃদ্ধি পায়, ততটাই হবে ছাঁকা লাভ। সুতরাং এই আন্দোলনের গলদ কোথায় বোঝাতে গিয়ে আপনি যেসব কথা বলছিলেন, সেসব দোষ থেকে আমার আন্দোলন মুক্ত থাকবে ব'লে আমার ধারণা।

শেঠজী আমার কথা শুনে বললেন : "অধিকতর উৎপাদনই যদি আপনার আন্দোলনের লক্ষ্য হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। এই যন্ত্রের যুগে চরকা ঠিক চলবে কি-না এবং চললে কতদূর চলবে, সেসব কথা আলাদা বিচার ক'রে দেখতে হয়। আমি নিজে আপনাদের এই আন্দোলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।"

৪২. উজানের স্রোতে

খাদির ব্যাপারে আমরা কীভাবে ক্রমে-ক্রমে এগিয়ে যেতে থাকি, এখানে তার বিশদ বিবরণ দিতে যাওয়া নিরর্থক হবে। আমার যেসব কার্যকলাপ লোকদৃষ্টির গোচরীভূত হয়ে গেছে তার ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে যাওয়া বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। সে বিষয়ে বর্ণনা দিতে গেলে আলাদা বই লিখতে হয়। সত্যের সন্ধানে কীভাবে নানা ঘটনা একপ্রকার আপনা থেকে একে-একে ঘ'টে গেছে, কেবল সেইসব ঘটনার অবতারণা করাটাই আপাতত আমার লক্ষ্য!

তাহলে এখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক্। আলী-ভাইদের প্রবর্তনায় খিলাফৎ আন্দোলন বেশ যখন জোরদার, সেসময় মৌলানা আবদুল বারী ও অন্য উলেমাদের সঙ্গে আমার প্রচুর আলাপ-আলোচনা হয়। অহিংসার নীতি মুসলমানেরা কতদূর পর্যন্ত মেনে চলতে পারবে, এই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়। শেষপর্যন্ত তাঁরা স্বীকার করেন যে কার্যসিদ্ধির উপায় হিসেবে অহিংসা-নীতিকে মেনে নিতে ইস্‌লামের দিক থেকে কোনো বাধা নেই। আর মেনে নেবে ব'লে যদি তারা কথা দেয়, তাহলে সে কথার খেলাপ তারা করতে পারে না। খিলাফৎ কন্‌ফারেন্স-এ দীর্ঘ আলোচনা ও বহু তর্ক-বিতর্কের পর শেষপর্যন্ত অসহযোগের প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং গৃহীতও হয়। আমার এখনো মনে আছে, একবার এলাহাবাদে এ নিয়ে একটি কমিটি সারা রাত ধ'রে আলোচনা চালিয়েছিল। অহিংস থেকে অসহযোগ করা যায় কি-না, সে সম্বন্ধে গোড়ায় হেকিম সায়েবের মনে একটা সংশয় ছিল। সংশয় নিরসন হয়ে যাবার পর তিনি মন-প্রাণ ঢেলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাকে সফল ক'রে তোলার জন্য যে পরিমাণ মদৎ দেন তার মূল্য নিরূপণ সম্ভব নয়।

খিলাফৎ কন্‌ফারেন্স-এর অল্পকিছুদিন পরে, গুজরাটের প্রদেশ রাষ্ট্রীয় সমিতির একটি অধিবেশন হয়। সেখানে আমি অসহযোগ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত করি। প্রস্তাবের বিরোধিতা যাঁরা করলেন, তাঁদের যুক্তি-মতে কোনো একটা বিষয় কংগ্রেস-এ উত্থাপিত

হবার আগেভাগে, ত-ই নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করার অধিকার কোনো প্রদেশ-সমিতির থাকতে পারে না। প্রতিবাদে আমি বলি যে, যে আন্দোলন প্রগতির পরিপন্থী তার বিরুদ্ধে এরকম নিষেধ যুক্তিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু শাখা-সংস্থার যদি এগিয়ে যাবার মতো শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় থাকে তাহলে প্রগতিমূলক আন্দোলনের সূত্রপাত করার তার যে কেবল অধিকার আছে এমন নয়, পরন্তু সেরকম করাটাই তার পক্ষে কর্তব্যবিশেষ। মূল সংস্থার গৌরব যাতে বাড়ে, সেরকম প্রচেষ্টায় কারো অনুমতির অপেক্ষা করতে হয় না। অবশ্য সে কাজের ঝুঁকি ও দায়িত্বটুকু শাখা-সংস্থাকেই বহন করতে হয়। অতঃপর প্রস্তাবের দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা হয়। তর্ক-বির্তকের মধ্যে বেশ ধার ছিল, আবেগ ছিল, কিন্তু আবহাওয়ায় কোনো বিক্ষোভ ছিল না, সবাই চেয়েছিলেন যুক্তি-বিচারের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের বক্তব্য বুঝে নিতে। ভোট-গণনার পর দেখা গেল, বিপুল সংখ্যাধিক্যে অসহযোগের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এই সাফল্যের মূলে যাঁদের কৃতিত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি, তাঁদের অন্যতম ছিলেন বল্লভভাই ও আব্বাস তৈয়বজী। তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল গভীর, আর কন্‌ফারেন্স-এর সভাপতি তৈয়বজী তো প্রথম থেকেই আমার অসহযোগ প্রস্তাবের প্রতি অনুকূল ছিলেন।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি এই প্রশ্ন আলোচনার জন্য ১৯২০-র সেপ্টেম্বর মাসে একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকবে ব'লে স্থির করে। বেশ এলাহি মাপে এই বিশেষ অধিবেশনের জন্য তোড়জোড় শুরু হ'ল। লালা লাজপত রায় সভাপতি নির্বাচিত হলেন। বোম্বাই থেকে কলকাতা যাবার জন্য কংগ্রেস ও খিলাফৎ থেকে স্পেশাল ট্রেন্‌-এর ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতার সেই অধিবেশনে সদস্য ও দর্শকদের এক বিরাট সমাবেশ ঘটেছিল।

মৌলানা সৌকত আলীর অনুরোধে আমি ট্রেন্‌-এ ব'সেই অসহযোগ বিষয়ক প্রস্তাবের খসড়া রচনা করি। এ যাবৎ আমার রচিত মুসাবিদায় আমি 'নন্‌-ভায়োলেন্ট' অথবা 'অহিংসা' বলাটা একপ্রকার বর্জন ক'রেই এসেছি। অবশ্য মৌখিক ভাষণে কথাটা নিয়তই প্রয়োগ করতাম। অসহযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে আমার শব্দসম্ভার আমি তখনো ঠিকঠাক তৈরি ক'রে নিতে পারিনি। যেসব সভায় গরিষ্ঠসংখ্যক শ্রোতা মুসলমান, সেইধরনের সভায় 'নন-ভায়োলেন্ট' কথার অর্থে সংস্কৃত প্রতিশব্দে 'শান্তিপূর্ণ' কিংবা 'অহিংস' কথা ব্যবহার ক'রে আসল ভাবটুকু শ্রোতাদের মনে ঠিক পৌঁছে দেওয়া যায় না ব'লে দেখেছিলাম। তাই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর কাছ থেকে অন্য-কোনো প্রতিশব্দ পাওয়া যায় কি-না খোঁজ করি। 'নন-ভায়োলেন্ট' কথার অর্থে 'বা-আমন্‌' এবং 'নন-কোঅপরেশন্‌' অর্থে 'তর্ক-ই-মওয়ালত'—এই দুটি প্রতিশব্দ তিনি প্রস্তাব করেন।

'নন-কোঅপরেশন্‌' কথাটার হিন্দি, গুজরাতি অথবা উর্দু প্রতিশব্দ ঠিক কী হতে পারে, এই নিয়ে যখন আমি মাথা ঘামাচ্ছি, সেই সময়েই কংগ্রেস-এর সেই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে পেশ করার জন্য আমায় অসহযোগ-বিষয়ক প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করতে বলা হয়। মূল খসড়ায় 'অহিংস' কথাটা বাদ পড়েছিল। মৌলানা সৌকত আলী ও আমি ছিলাম একই গাড়িতে। তাঁর হাতে যখন খসড়াটা দিই তখন খেয়াল হয়নি যে কথাটা বাদ প'ড়ে গেছে। রাত্রে মনে হ'ল, কথাটা বাদ দিয়ে তো ভুল ক'রে ফেলেছি। সকাল হতেই মহাদেবকে

বলি সে যেন মৌলানাকে ব'লে আসে যে খসড়াটা ছাপতে দেবার আগেই যেন ভুলটুকু শুধ্রে দেওয়া হয়। আমার কেমন যেন মনে পড়ে যে খসড়াটা ছাপা হয়ে বেরুবার আগে 'অহিংস' কথাটা জুড়ে দেওয়া যায়নি। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা ছিল বিষয়-নির্বাচনী সমিতির বৈঠক। সুতরাং বৈঠকে ব'সে-ব'সেই আমায় হাতে-লিখে ছাপা খসড়ায় প্রয়োজনমতো সংযোজন করতে হয়। পরে বুঝেছিলাম, এ কথাটা আগেভাগে সম্পন্ন ক'রে ভালোই করেছিলাম। তা না-হ'লে আমায় বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হ'ত।

এসব সত্ত্বেও আমার অবস্থা হয়েছিল খুবই শোচনীয়। কে যে প্রস্তাবের সপক্ষে যাবে, কে-বা বিরোধিতা করবেন, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। স্বয়ং লালাজীর মনোভাবই-বা কেমন হতে পারে—তা-ও ছিল আমার সম্পূর্ণ অজানা। কলকাতার এই রণক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসবদের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম ব্যূহবদ্ধ প্রবীণ সংগ্রামীদের অক্ষৌহিণী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর বেশান্ত্, পণ্ডিত মালব্যজী, শ্রী বিজয়রাঘবাচারি, পণ্ডিত মোতিলালজী ও দেশবন্ধু।

আমার প্রস্তাবে অসহযোগের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল খিলাফৎ ও পঞ্জাবের অনাচারের প্রতিকার লাভের উপায় হিসেবে। শ্রী বিজয়রাঘবাচারি এত অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে চাইলেন না। তিনি বললেন, "অসহযোগ যদি ঘোষণা করতেই হয় তাহলে বিশেষ-বিশেষ অন্যায়ের প্রতিকার লাভের জন্য কেন? যেসব অন্যায়ের ভারে আজ আমাদের দেশ বিপর্যস্ত, তার মধ্যে ঘোরতর হ'ল স্বাধীনতা-হীনতা। সেই দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ করা উচিত। আমরা অসহযোগ করব স্বরাজলাভের জন্য।" পণ্ডিত মোতিলালজীও চাইলেন, অসহযোগ প্রস্তাবের সঙ্গে স্বরাজের দাবি যেন যুক্ত করা হয়। আমি কালবিলম্ব না-ক'রে সেই সঙ্কেত মেনে নিলাম এবং আমার প্রস্তাবে স্বরাজের দাবির কথাটা জুড়ে দিলাম। তর্ক-বির্তকের ঝড় বইল, গভীরভাবে সমস্ত প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হ'ল, তারপর নানা আলোচনার শেষে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

অসহযোগ আন্দোলনে মোতিলালজী দাঁড়িয়েছিলেন সবার আগে। প্রস্তাবের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার যে মিষ্টমধুর আলোচনা হয়েছিল, তার কথা আজও আমার মনে পড়ে। প্রস্তাবের ভাষায় তিনি কিছু-কিছু অদলবদলের কথা বলেছিলেন। তা আমি মেনে নিয়েছিলাম। আন্দোলনের সপক্ষে দেশবন্ধুকে টেনে নেবার ভার তিনিই নিয়েছিলেন। ভাব ও ভাবনার দিক থেকে দেশবন্ধুর ঝোঁক ছিল এইদিকে। কেবল দেশের লোক এই সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করতে সমর্থ হবে কি-না, সে বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি লালাজী ও দেশবন্ধুর সর্বান্তঃকরণ সমর্থনলাভের জন্য আমার কংগ্রেস-এর নাগপুর অধিবেশন অবধি অপেক্ষা করতে হয়।

লোকমান্যের অভাবটা কলকাতার এই বিশেষ অধিবেশনে আমি খুবই অনুভব করেছিলাম। আজও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বিশেষ অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন, আমায় তিনি আশীর্বাদ করতেন। আমার এই অনুমান যদি অলীক প্রমাণিত হ'ত, যদি এই আন্দোলনের বিরোধিতাও তিনি করতেন, তাঁর প্রতিবাদকে আমি

শ্লাঘার বিষয় ব'লে মনে করতাম ও তা থেকে শিক্ষালাভের চেষ্টা করতাম। তাঁর সঙ্গে আমার সর্বদাই মতের অমিল হ'ত, কিন্তু কখনো মতান্তর ঘটেনি। আমার প্রতি তাঁর আচরণের মধ্যে দিয়ে লোকমান্য যেন সর্বদা বোঝাতে চাইতেন, আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ যেমন নিকট, তেমনি গভীর। এইসব কথা বলতে গিয়ে তাঁর মৃত্যুর ঘটনা যেন স্পষ্ট হয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তখন দুপুর-রাত ; আমার তৎকালীন সহকর্মী পটবর্ধন টেলিফোন-যোগে লোকমান্যের মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। সঙ্গীসাথীরা ব'সে ছিলেন আমার চারিদিক ঘিরে। দুঃসংবাদ পেয়ে স্বতঃই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "আমার প্রধান নির্ভরটুকু অন্তর্হিত হ'ল।" অসহযোগ আন্দোলন তখন চলছে পুরোদমে। আকুল আগ্রহে আশা করেছিলাম, তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করব। আন্দোলন যখন চরমে পৌঁছয়, তিনি তা কোন্ চোখে দেখতেন, আজ সেটা নিতান্তই অনুমানের বিষয়, আজ সে অলসকল্পনার কোনো অর্থও হয় না। তবে এ কথাটা ঠিক, কলকাতায় উপস্থিত সকল লোকের মনে তাঁর মৃত্যুজনিত শূন্যতা গভীরভাবে বেজেছিল। জাতির ইতিহাসে সেই সঙ্কট-মুহূর্তে এই জ্ঞানবৃদ্ধের উপদেশ-নির্দেশের অভাবটুকু সকলেই অনুভব করেছিলেন।

৪৩. নাগপুর

কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়, নাগপুরের বার্ষিক অধিবেশনে সেগুলি অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার কথা। কলকাতার মতো নাগপুরেও সদস্য ও দর্শকসাধারণের সমাগম হয়েছিল প্রচুর। কংগ্রেসের প্রতিনিধি-সদস্যের সংখ্যা নির্ধারিত করার বাঁধাধরা নিয়ম তখনো পর্যন্ত চালু করা হয়নি। ফলে, যদ্দুর আমার মনে পড়ে, এই অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় চোদ্দ হাজারে। বিদ্যালয় বয়কট্ করার ব্যাপারে লালাজী একটি সামান্য সংশোধনী প্রস্তাব আনেন এবং আমি তা মেনে নিই। তেমনি দেশবন্ধুর নির্দেশক্রমে দু-চারটে অদলবদল করার পর সর্বসম্মতিক্রমে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কংগ্রেস সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব এই অধিবেশনে বিবেচিত হবে ব'লে কথা ছিল। আমাদের সেই উপসমিতির খসড়া প্রস্তাব পেশ করা হয়ে গিয়েছিল কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে। সুতরাং প্রস্তাবিত বিষয় প্রচারিত ও আলোচিত হয়েছিল প্রভূত পরিমাণে। এবার নাগপুর অধিবেশনে, শ্রী বিজয়রাঘবাচারির সভাপতিত্বে সেই খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হবার কথা। একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন-সাপেক্ষে বিষয়-নির্বাচনী সমিতি এটি গ্রহণ করার সপক্ষে মত দেন। আমাদের খসড়ায় নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা আমরা সম্ভবত নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলাম দেড় হাজারে। বিষয়-নির্বাচনী সমিতি সেই সংখ্যা বাড়িয়ে করেন ছ-হাজার। আমার মতে, এই সংখ্যাবৃদ্ধির প্রস্তাবটা তড়িঘড়ি স্থির করা হয়, খুব বেশি ভাবনাচিন্তা না-ক'রেই। এত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমার ধারণাই ঠিক। সদস্যের

সংখ্যা অধিক হ'লে কাজ অধিক ভালো হয় অথবা নীতিগতভাবে গণতন্ত্র সুরক্ষিত হয়, এরকমের ভাবনা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না এইরকম যেন তেন প্রকারেণ নির্বাচিত ছ-হাজার প্রতিনিধির তুলনায়, গণস্বার্থ-সংরক্ষণে একনিষ্ঠ, সত্যবাদী ও উদারহৃদয় পনেরোশোজন প্রতিনিধির হাতে যে কোনো সময়ে গণতন্ত্র ঢের বেশি সুরক্ষিত। গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করতে হ'লে দেশের জনগণের স্বদেশচিন্তায়, আত্মমর্যাদাবোধে ও ঐক্যচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ থাকা উচিত। তাঁরা যেন সৎলোক ও খাঁটি লোক ছাড়া আর কাউকেও তাঁদের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচন না-করেন। কিন্তু মোট সংখ্যার মোহে বিষয়-নির্বাচনী সমিতি গোড়ায় চেয়েছিলেন ছ-হাজারেরও বেশিসংখ্যক প্রতিনিধি। সংখ্যা শেষপর্যন্ত ছ-হাজারে সীমিত হয় অনেক রফা-নিষ্পত্তির পর।

কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শ কী হওয়া উচিত, এই নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ হয়েছিল, সংবিধানের যে খসড়াটি আমরা পেশ করেছিলাম, তাতে বলা হয়েছিল, কংগ্রেসের লক্ষ্য হ'ল স্বরাজ, সম্ভবপক্ষে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে, অন্যথায় তেমন প্রয়োজন হ'লে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হয়ে। কংগ্রেসের একদল সদস্য বললেন, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকেই কংগ্রেস স্বরাজলাভ করতে চায়, এইভাবে কংগ্রেসের লক্ষ্য বিবৃত হোক্। এই দলের মুখপাত্র ছিলেন পণ্ডিত মালব্যজী ও মিস্টার জিন্না। কিন্তু তাঁরা বেশিসংখ্যায় ভোট পেতে পারেননি। খসড়া সংবিধানে উপরন্তু বলা হয়েছিল, স্বরাজলাভের উপায় হবে শান্তিপূর্ণ ও বৈধ। এ কথা নিয়েও বিরোধিতা হয়। স্বরাজলাভের জন্য কীধরনের উপায় অবলম্বন করা উচিত তা নিয়ে কোনো শর্ত বা নিয়ম বেঁধে দেওয়া ঠিক হবে না, এই ছিল বক্তব্য। যা হোক্, নানারকম জ্ঞানগর্ভ ও স্বাধীন মতামত যদি যথোচিত সততা, নিষ্ঠা ও শুভবুদ্ধির প্রয়োগে প্রতিপালিত হ'ত, তাহলে লোকশিক্ষার শক্তিশালী বাহন হতে পারত এবং এই বিধান কার্যকর ক'রে তোলার প্রচেষ্টার ফলেই আমরা স্বরাজ লাভ করতাম। কিন্তু সে সম্ভাবনার আলোচনা এখানে অবান্তর।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও খাদি প্রবর্তন বিষয়েও নাগপুর অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপর থেকে কংগ্রেসের হিন্দু সদস্যেরা হিন্দু সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। খাদির মারফৎ কংগ্রেস ভারতের জীবন্ত 'কঙ্কাল'দের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত হয়েছে। খিলাফতের খাতিরে অসহযোগের সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রে, কংগ্রেস হিন্দু-মুস্‌লিম ঐক্যের মহান্ প্রযত্ন বাস্তব ক'রে তোলবার পথে পা বাড়িয়েছে।

বিদায়

এবার সময় এসেছে সমস্ত কথার শেষে একটা ছেদ টানার।

আমার জীবনকথার এমন একটি পর্বে আমি এখন এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে প্রায় কিছুই আর রাখা-ঢাকা নেই। আমার এমন কোনো কথা নেই যা পাঁচজন লোকে জানে না। তাছাড়া ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে এমনি ওতপ্রোত হয়ে আমি কাজ ক'রে এসেছি যে তৎপরবর্তীকালে আমার জীবনের কোনো ঘটনার কথা বলতে গেলেই, তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা না-ব'লে উপায় থাকবে না। যদিও শ্রদ্ধানন্দজী, দেশবন্ধু, হকীম সাহেব ও লালাজী ইহজগতে আর নেই, সৌভাগ্যগুণে অন্য অনেক নেতা আমাদের মধ্যে থেকে কাজও ক'রে চলেছেন। ইতিপূর্বে আমি যেসব বিরাট পরিবর্তনের কথা বলেছি, তারপরেও কংগ্রেস-এর ইতিহাস রচনার কাজ অব্যাহত চলেছে। গত সাত বছর সত্যের সন্ধানে আমার প্রধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে মূলত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। আমার প্রয়োগ-পরীক্ষার কথা যদি ব'লে যেতে চাই, নেতাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা না-ব'লে পারব না। সেসব সাম্প্রতিক কথা সদ্য-সদ্য বলা চলে না, অন্তত্পক্ষে ভব্যতার খাতিরে। তাছাড়া বর্তমান প্রয়োগ-পরীক্ষা থেকে আমি যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি, সেগুলিই যে আমার চরম সিদ্ধান্ত, এমন কথা আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারছি না। তাই মনে হয়, এইখানেই আমার বক্তব্যের ছেদ টানা কর্তব্য। তাছাড়া আমার মনের সঙ্গে তাল রেখে লেখনীও আর যেন সরতে চাইছে না।

আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমি যে বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব না-করছি, এমন নয়। আমার প্রয়োগ-পরীক্ষার মূল্য আমার কাছে অনেক। জানি না, যথাযথভাবে তাদের বিষয়ে বলতে পেরেছি কি-না। চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি, এইমাত্র বলতে পারি। সত্য আমার কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, যেমন-যেমনভাবে আমি সত্যের উপলব্ধিতে পৌঁছেছি, তার প্রকৃত বর্ণনা দেবার জন্য আমি নিরন্তর প্রয়াস পেয়েছি। এই প্রযত্নের ফলে আমার চিত্তে আমি পরম শান্তি লাভ করেছি, কারণ আমার একান্ত আশা ও বিশ্বাস যে আমার এই আত্মসমীক্ষা সংশয়ী মনে সত্য ও অহিংসায় আস্থা-সঞ্চারের সহায়ক হতে পারে।

একনাগাড়ে বহুকালের অভিজ্ঞতার ফলে আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, সত্যই ভগবান, অথবা ভগবান সত্য ছাড়া আর-কিছু নন। সত্য উপলব্ধির একমাত্র উপায় যে অহিংসা, এটা যদি আমার জীবনকথার প্রতিটি বাক্যে পরিস্ফুট না-হয়ে থাকে, তাহলে বুঝব জীবনকথা রচনায় আমার সমস্ত প্রযত্ন ব্যর্থ হয়েছে। আর যদিও-বা আমার এই প্রযত্ন বিফল হয়ে থাকে, আপনারা জেনে রাখুন, সেই ত্রুটির জন্য দায়ী এই বাহন। যে মহাতত্ত্ব আমার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে চেয়েছে তার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। আমার অহিংসার সাধনা যতই একান্তিক হোক্-না-কেন, তা সম্পূর্ণ হয়নি, নিশ্ছিদ্র হয়নি। যে সূর্যকে প্রত্যহ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার তেজ যদি লক্ষ-লক্ষ গুণে বহুগুণিত হয়, তবুও তা সত্যের অনির্বচনীয় দিব্যদ্যুতির তুলনায় ম্লান। হঠাৎ আলোর ঝিলিকের মতো সত্যকে আমি যতটুকু দেখেছি, তা থেকে এই জ্যোতির্ময় সত্যের

কতটুকু পরিচয়ই-বা আমি দিতে পারি। সেই দীপ্যমান মহাজ্যোতির অতিক্ষীণ আভাসমাত্র কদাচিৎ আমার মানসগোচর হয়েছে। তবে আমার প্রয়োগ ও পরীক্ষার ফলে যতটুকু দেখেছি, যতটুকু জেনেছি, তার ভিত্তিতে নির্ভর ক'রে নিঃসংশয়ে বলতে পারি, অহিংসার সাধনায় সম্পূর্ণ সফল না-হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সত্যের পূর্ণদর্শন লাভ করা যায় না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত এই সত্যস্বরূপকে কেউ যদি মুখোমুখি দেখতে চায়, তাহলে সৃষ্টির ন্যূনতম জীবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাকে আপন ব'লে ভালোবাসতে হবে। যিনি এই সাধনমার্গের অধিক, জীবনের কোনো ক্ষেত্র থেকে তিনি স'রে থাকবেন, এমন উপায় তো তাঁর থাকে না। তাই সত্যের সাধনা আমায় অনিবার্যভাবে টেনে নিয়ে গিয়েছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। আরেকটা কথাও আমি সবিনয়ে অথচ নিঃসংশয়ে বলব, যাঁরা বলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোনো সংশ্রব নেই, তাঁরা জানেন না ধর্ম কী বস্তু।

আত্মশুদ্ধি-ব্যতিরেকে সর্বভূতের সঙ্গে আত্মবৎ হওয়া অসম্ভব। আত্মশুদ্ধি-ব্যতিরেকে অহিংসার সাধনা করতে যাওয়া স্বপ্নের মতো অসার। অন্তর যদি শুদ্ধ না-হয় ভগবৎ-উপলব্ধি করা যায় না। অতএব আত্মশুদ্ধির অপর অর্থ হ'ল জীবনের সকল ক্ষেত্র পূতপবিত্র ক'রে তোলা। পবিত্রতা এমনই সংক্রামক ব্যাপার যে আত্মশুদ্ধি যাঁর ঘটে, তাঁর চারিদিকে পরিবেশও ক্রমে-ক্রমে শুচিস্নিগ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এই আত্মশুদ্ধির পথ ক্ষুরধার ও দুর্গম। যিনি সম্পূর্ণ শুচিশুদ্ধ হতে চান, চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে তাঁকে সম্পূর্ণ নির্বিকার নির্লিপ্ত হতে হয়। অনুরাগ-বিরাগ, আসক্তি-নিরাসক্তি, আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রভৃতি বিপরীত ভাবের ঊর্ধ্বে তাঁকে উঠতে হবে। নিরন্তর প্রযত্ন ক'রেও, 'কায়েন মনসা বাচা' ত্রিবর্গী পবিত্রতা আমি এখনো লাভ করতে পারিনি, সে আমি জানি। তাই বিশ্ব-সুদ্ধু লোকের স্তুতিতে আমি বিচলিত হই না, অনেকসময় মনে হয় এ তো প্রশংসা নয়, যেন বৃশ্চিক-দংশন। আমার ধারণা, অস্ত্রবলে জগৎ জয় করা বরং সহজ, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম মনের বিকার দমন করা বড়োই কঠিন। দেশে ফিরে আসবার পর থেকে একাধিকবার লক্ষ করেছি, বাসনা-কামনা থেকে আমি মুক্ত হতে পারিনি, আমার মনের মধ্যে এইসব প্রবৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে আছে। এই কথা বুঝতে পেরে মনে-মনে গ্লানি অনুভব করেছি, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিনি। আমার প্রয়োগ ও পরীক্ষা আমায় ভরসা দিয়েছে, প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি, এখনো আমার সামনে যে কঠিন পথ, তা আমায় বহুকষ্টে অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। তা যদি করতে হয়, আমায় শূন্য হতে হবে, আমার ব্যক্তিসত্তাকে সর্বভূতাত্মার মধ্যে বিলীন ক'রে দিতে হবে। মানুষ যতদিন স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজেকে সবার পিছে সবার নিচে রাখতে না-পারে, ততদিন তার মুক্তি নেই। অহিংসা মানে নম্রতার পরাকাষ্ঠা—আত্মবিলুপ্তি।

আপাতত সকলের কাছে বিদায় নেবার বেলায় একটি নিবেদন পেশ করি : সত্যস্বরূপ ভগবানের কাছে আমি যখন মননে, বচনে ও কর্মে অহিংস হবার বর প্রার্থনা করি, আপনারাও যেন আমার সেই প্রার্থনায় যোগযুক্ত থাকেন। নমস্কার।

—